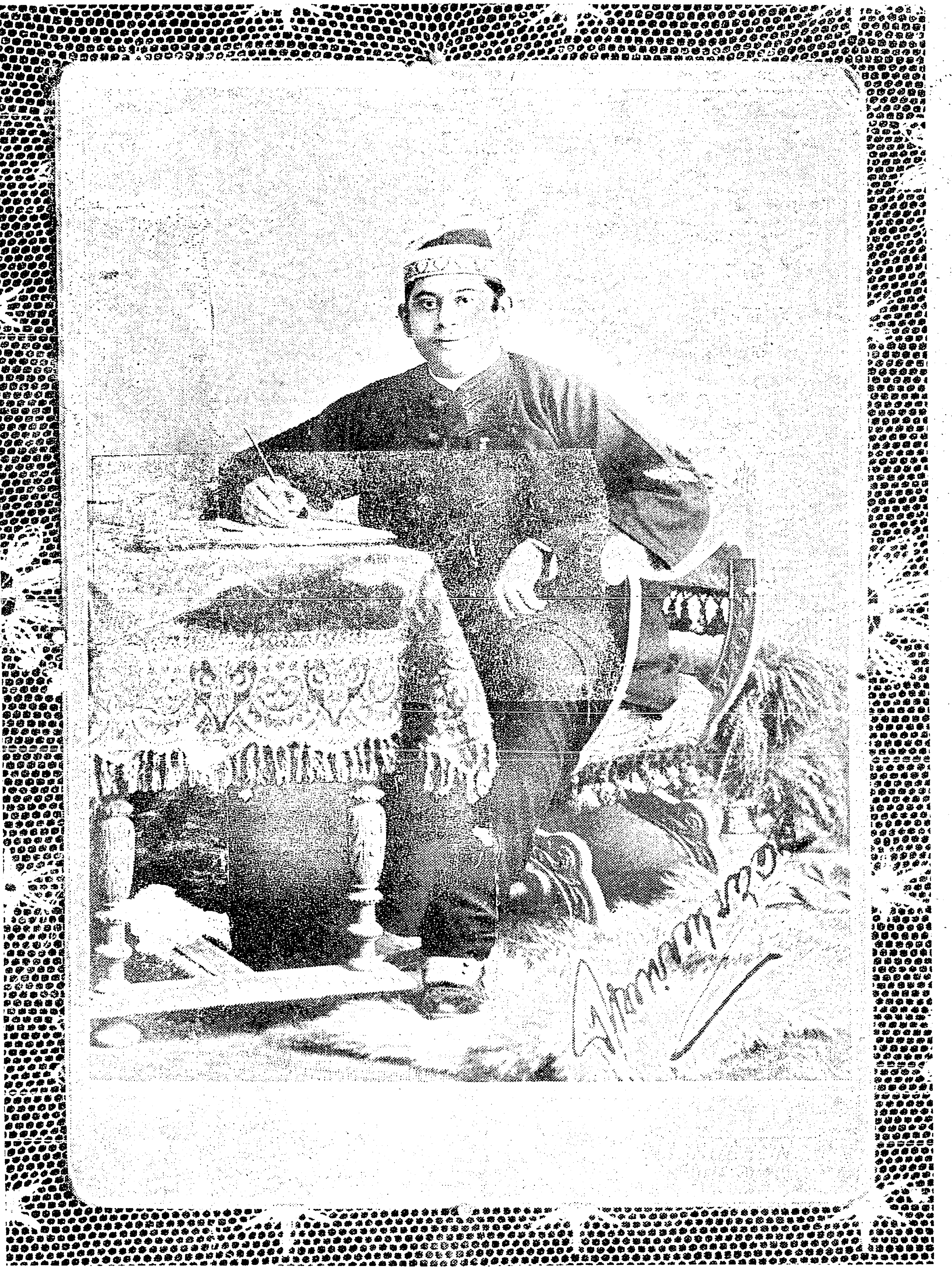

বর্দ্ধমানাধিপতি

মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর।

KUNTALINE PRESS.

সন ১২৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত

৬ষ্ঠ ভাগ। বৈশাখ, ১৩০৯। ১ম সংখ্যা।

নববর্ষ।

আজ তব নূতন জীবন
বিদায় লইল ফের ওই পুরাতন।
নূতন জীবনে তব হউক সুন্দর সব
হও প্রিয় মনের মতন।
পোহা'ল আঁধার রাতি কনক উজ্জ্বল ভাতি
সমুদিত তরুণ তপন।
এ নব প্রভাত সনে আসুক তোমার মনে
নব সাধ নবীন সাধন।
প্রস্ফুট কুসুম সম সুকোমল নিরুপম
কান্তি তব হউক শোভন।
হও পূত নিরমল হোক্ জ্যোতি সুবিমল
শুধু মম এই আকিঞ্চন।
বিধাতা করুণা কোরে শুভাশীষ দিয়া শিরে
সাধ আশা করুন পূরণ।

রামায়ণী কথা।

অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত রামায়ণকে দুই ভাগে বিভক্ত করি[illegible]ন পৃথক কাব্যে পরিণত করা যাইতে পারে। এক খানি অযোধ্যাকাণ্ডেই আরব্ধ ও অযোধ্যাকাণ্ডেই পরিসমাপ্ত—বিষয় রামবনবাস। আর এক খানি আরণ্যকাণ্ডে আরব্ধ ও লঙ্কাকাণ্ডে পরিসমাপ্ত—বিষয় সীতার উদ্ধার। এই দুই অংশের সঙ্গে কাব্যগত কোন স্বাভাবিক বন্ধন লক্ষিত হয় না। রামবনবাসের পর সীতাহরণ ও তাঁহার উদ্ধার হইয়াছে, ইহাতে সাময়িক পৌর্ব্বাপর্য্যের সংশ্রব আছে কিন্তু কাব্য-হিসাবে এই দুই ঘটনা পরস্পর নিরপেক্ষ। ইহা ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয়াংশের রচনায় আর একটী বৈলক্ষণ্য আছে। প্রথমাংশের বিষয় ও ঘটনা বহুজনতাপূর্ণ রাজধানীর মধ্যে বিকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ঘটনার পর্য্যায় ও জটিলতা, সেই অংশে কতকটা নাটকীয় পদ্ধতির উপযোগী হই-

য়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় অংশের বর্ণনার স্থান অরণ্য; সেখানে চরিত্রের বাহুল্য ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের অবকাশ অল্প। সুতরাং রামায়ণের এই অংশের গতি মন্থর; ইহার সৌন্দর্য্যের আলেখ্য উদার এবং ইহাতে আরণ্য-দৃশ্যরাশির উপভোগের জন্য পাঠকচক্ষুর পূর্ণ অবকাশ প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠক এই অংশে কৌতূহলের অঙ্কুশাঘাতে তাড়িত হন না; এখানে "পদ্মোৎপলঝষাকুলা" পম্পার বর্ণনা ও শনৈঃ শনৈঃ প্রদর্শিত শরৎ কালীয় নদীপুলিনের বর্ণনা লইয়া পাঠক একপ্রহরকাল নিবিষ্ট থাকিতে পারেন। সহসা বীণার তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেলে যেরূপ পুনঃ তারসংযোজনা পর্য্যন্ত নব তন্ত্রীর স্বর-পরীক্ষাজনিত আলাপ লইয়া শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়, সীতার সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত পাঠককে সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বিরহগাথা শুনাইয়াই কবি নিযুক্ত রাখিতেছেন—সুর বাঁধিতে বাঁধিতে দুইটী অধ্যায় কাটিয়া গিয়াছে।

অযোধ্যাকাণ্ডের বর্ণনা করুণরসে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যময়ী। সুনীতি ও সুকবিতা এই দু'য়ের সমন্বয় অযোধ্যাকাণ্ডে যেরূপ লক্ষিত হয়, পৃথিবীর অন্য কোন কাব্য সেই উন্নত আদর্শের সন্নিহিত হইতে পারে নাই। গুরুভক্তি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, পাতিব্রত্য, অপত্যস্নেহ, ভ্রাতৃবাৎসল্য, গার্হস্থ্যজীবনের যাহা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি, কবি এই অধ্যায়ে তাহার মুক্ত পরিবেশন করিয়া দেখাইয়াছেন। এ সম্পদের বিপণি অনন্যসাধারণ, গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য-সূত্র এখানে কোন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য বা চাণক্য নীরস লেখনী লইয়া লিখেন নাই; এখানে সরস্বতী নিজ হস্তে তুলি লইয়া গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কর্ত্তব্য এবং কবিত্ব এ স্থলে অভিন্ন। এখানে কবিত্বের স্বাধীন বসন্ত-বায়ু প্রবাহিত হইয়া সমাজের পর্ণশালা উৎক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে নাই; এখানে গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে নন্দন বনের সমস্ত কুসুমতরু উপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন কবি বাস্তব জগতে আবদ্ধ থাকিলে তাঁহার দৃষ্টি সংকীর্ণ ও তাঁহার প্রতিভা শৃঙ্খলিত হয়, তাঁহারা এই স্থলে দেখিবেন বাস্তব জগৎই কবিতার প্রকৃত রাজ্য; যাঁহারা স্বর্গের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চাহেন তাঁহাদের গৃহের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অবাধ স্বাধীনতার খেলা খেলিতে হয় না; মর্ত্ত্যে যদি কোথাও স্বর্গ প্রতিভাত হয়, তবে তাহা স্বগৃহে।

এইবার আমরা মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। দশরথ রাজা সর্ব্ব বিষয়ে একজন আদর্শ নরপতি ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের যশ সমস্ত স্থানে প্রচারিত ছিল,—এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও একবার দৈত্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া সাহায্যের জন্য ইঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই দশরথ রাজার একটী প্রধান দোষ ছিল, ইনি ইন্দ্রিয়াশক্ত ছিলেন। রামায়ণের অনেক স্থলে একপত্নীব্রতের পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে। "ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি।" রাম সম্বন্ধে এরূপ কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। সুতরাং সেকালে রাজাদের নৈতিক আদর্শ স্বতন্ত্র বলিয়া আমরা দশরথকে ক্ষমার্হ মনে করিতে পারি না। দশরথ রাজার ৩৫০টী মহিষী বিদ্যমান ছিল। দশরথের ইন্দ্রিয়-প্রশ্রয়ই শান্ত অযোধ্যানগরীর বক্ষে তুমুল অশান্তির সৃষ্টি করিয়া রামায়ণের ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিল। কৈকয়ীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি কেকয়রাজার নিকট তাঁহার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার পুত্র রাজা পাইবে কেকয়রাজ এই আশঙ্কা জ্ঞাপন করাতে তিনি প্রতিশ্রুত হন্, কৈকয়ীর গর্ভে যে পুত্র হইবে তাহাকেই তিনি রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিবেন। (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ) তৎপর দেবাসুর যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইলে কৈকয়ী তাঁহার শুশ্রূষা করেন, তখন দুইটী বর দিতে তিনি প্রতিশ্রুত থাকেন। এ সকল অবশ্য রাম জন্মের পূর্ব্বের ঘটনা। কালে রাজার চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ইঁহারা চারি জনেই রাজার প্রিয় ছিলেন কিন্তু রাম তাঁহার প্রিয়তম ছিলেন। "তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ।" অপর দিকে তরুণ বয়স্কা কৈকয়ীর প্রতি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আসক্তি ছিল। "স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী।" তিনি কৈকয়ীর গৃহেই প্রায় সর্ব্বদা পড়িয়া থাকিতেন। (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৭২ সর্গ, ১২শ শ্লোক)। জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার প্রতি উপেক্ষা এ অবস্থায় স্বাভাবিক। কৌশল্যা রামের নিকট বলিতেছেন—"স্ত্রীলোকের প্রধান সুখ স্বামীর প্রেম, আমার জীবনে তাহা সংঘটন হয়

নাই। আমি কৈকয়ীর দাস দাসীর দ্বারা সর্ব্বদা উৎপীড়িত। স্বামী তাহা দেখিয়াও দেখেন না। কোন দাসী আমার সেবায় নিযুক্ত হইলে কৈকয়ীকে দেখিয়া ভীত হয়।"—(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২০শ সর্গ, ৩৭—৪৩ শ্লোক।) এই অংশের সরল কাতরতা আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। কিন্তু কৌশল্যা কৈকয়ীর প্রতি কখনও কুব্যবহার করেন নাই। ভরত কৈকেয়ীকে বলিতেছেন "আমার জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যা তোমাকে সর্ব্বদা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন।" এস্থলে ব্যথিতা কৌশল্যার উদারতায় আমরা তাঁহাকে আদর্শ পত্নী বলিয়া পূজা করিতে পারি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দশরথ কেকয়রাজার নিকট কৈকেয়ী-পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু প্রাণসম জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বগুণ বিভূষিত রামকে তিনি কি বলিয়া উপেক্ষা করিবেন। বিশেষ সে প্রতিশ্রুতির কথা এক্ষণে আর কাহারও মনে নাই। রাম তাঁহার চরিত্রগুণে অযোধ্যাবাসী সমস্ত লোককে তাঁহার আপনার করিয়া তুলিয়াছিলেন। "রামোহি ভরতাদ্ ভূয়স্তব শুশ্রূষতে সদা।" সুতরাং কৈকেয়ীও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে রাজা রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যদিও রামের প্রতি প্রজা ও স্বগণ বৃন্দের স্বাভাবিকী প্রীতি বশতঃ দশরথের মনে কোন ভীতি কিম্বা আশঙ্কার কথা স্থান পায় নাই তথাপি অভিষেককার্য্য ভরতের অনুপস্থিতিতে ও কেকয়রাজের অগোচরে শীঘ্র শীঘ্র শেষ হইয়া যায় এই জন্য দশরথকে একটু ত্বরান্বিত হইতে দেখা যায়। প্রকাশ্যভাবে কোন আশঙ্কার কথা মনে উপস্থিত না হইলেও তাঁহার হৃদয়ের অতি নিভৃতে স্বীয় প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গজনিত কোন দুর্ঘটনার ভাবী ভয় জাগিতেছিল কি না বলিতে পারা যায় না। তিনি রামের নিকট বলিলেন "শুভ ঘটনায় অনেক বিঘ্ন আশঙ্কা করি, ভরত দূরে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক শেষ হইয়া যায় এই আমার ইচ্ছা। যদিও ভরত সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী কিন্তু তথাপি সদ্ব্যক্তিরও মন সময়ে বিচলিত হইতে পারে।"—(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ, ২৪—২৭ শ্লোক।) ভ্রাতৃবৎসল ভরত বয়সে কনিষ্ঠ সুতরাং ইক্ষ্বাকুবংশের চিরানুগত প্রথানুসারে রাজ্য ভরতের প্রাপ্য নহে, তথাপি রাজার এই আশঙ্কার কারণ কি? হয়ত কেকয়-রাজার নিকট স্বীয় প্রতিশ্রুতির কথা তাঁহার মনে নিভৃতে ক্রিয়া করিতেছিল। এ বিষয়ে স্পষ্টতর প্রমাণ আছে। কেকয় এবং জনক রাজাকেও তিনি এই অভিষেক ব্যাপারে নিমন্ত্রণ করেন নাই। কেকয়-রাজ উপস্থিত হইয়া মহর্ষি জনক রাজার সমক্ষে যদি পূর্ব্বকথার উল্লেখ করেন তবে বিভ্রাট ঘটিতে পারে—ইহা কি এই আশঙ্কায় নহে? এবং বোধ হয় এই জন্যই "নতু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ। ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ং॥" সুতরাং তিনি এ বিষয়ে আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিলেন।

কবি রামের রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে সমারোহপূর্ণ আনন্দোৎসবের মধ্যে ভয়ানক দুর্ঘটনার বীজ কৌশলে লুকাইয়া রাখিলেন। দশরথকে আমরা এই অভিষেক ব্যাপার শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত দেখিতে পাই; যেন কোন দৈব প্রতিকূলতার আশঙ্কা সম্মুখের ঘটনাবলীর উপর ছায়াপাত করিতেছিল; দশরথের অতি ব্যস্ততা ও অতি ব্যগ্রতাই তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া দিতেছে। তিনি বলিতেছেন "পুণ্য চৈত্র মাস, কাননরাজি সুপুষ্পিত, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, কল্যই অভিষেক শেষ করা যাউক।" সুতরাং রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে একত্র স্নান করিয়া উপবাস ব্রত পালন পূর্ব্বক অভিষেকের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

যে দিক হইতে বিপদ আশঙ্কা করা যায় বিপদ সচরাচর সে দিক হইতে আসে না। কেকয়-রাজ সদলবলে উপস্থিত হইয়া দশরথকে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য আবদ্ধ করিলেন না; কিন্তু সময় পূর্ণ হইলে পাপের অবধারিত ফল এক দিক না এক দিক হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। মন্থরা উৎসবময়ী অযোধ্যার চিত্র দেখিয়া কৌতূহল-পরবশ হইল; সে জানিতে পারিল রামের অভিষেক উৎসবে অযোধ্যাপুরী মাতিয়া উঠিয়াছে, সে যাইয়া কৈকয়ীকে এই সংবাদ প্রদান করিল। কৈকেয়ী ভরত কর্ত্তৃক "আত্মকামা," "প্রজ্ঞামানিনী" ও "চণ্ডী" বলিয়া অভিহিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হৃদয়-শূন্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রামকে তিনি নিজের পুত্রের ন্যায়ই ভাল বাসিতেন। "রাজ্য যদি হি

রামস্য ভরতস্যাপি তৎ তদা । রামেবা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।” ইত্যাদি বলিয়া তিনি মন্থরার ক্রোধের কারণ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, বরং এই সুসংবাদের পুরস্কার স্বরূপ মন্থারকে রত্নহার প্রদান করিলেন। কিন্তু মন্থরা সেই হার ঠেলিয়া ফেলিল এবং মহারাজকে “শঠ” সংজ্ঞায় অভিহিত করিল। মন্থরা সেই প্রতিশ্রুতির কথা জানিত কি না বলা যায় না। ইহার পর মন্থরার শিক্ষানুসারে কৈকেয়ী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিল। এই স্থল হইতে কাব্যোক্ত ঘটনার প্রতি কৌতূহল বিশেষরূপে জাগিয়া উঠে। সেই চন্দ্রনক্ষত্রশালী নিশিথে অশ্রুগ্রথিতবদ্ধদৃষ্টি রাজার শোক-করুণ মুহ্যমান দৃশ্য আমাদিগের হৃদয় আমূল ব্যথিত করিয়া তুলে। “কিং নু মেহয়ং দিবা স্বপ্ন চিত্ত মোহোহপি বা মম।” কৈকেয়ীর নিদারুণ, চিত্তহীন বাক্যজাল রাজার নিকট “অনুভূত উপসর্গ” বা “চিত্ত উপদ্রবের” ন্যায় বোধ হইতেছিল ; সেই নৈরাশ্য পূরিত রাজার পরিবেদনাময় একান্ত সকাতর দৃষ্টি আমাদিগের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া ফেলে এবং তাঁহার পূর্ব্বের শত অপরাধের কথা বিস্মৃত করাইয়া দেয়। “শস্য সলিল বিনা কিম্বা জগৎ সূর্য্য বিনা তিষ্ঠিতে পারে কিন্তু রাম ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারিব না।” কখনও বা রাজা কৃতাঞ্জলি, কখনও বা সংজ্ঞাহীন রাজার নিস্তেজ আঁখি-প্রান্ত-সংলগ্ন অশ্রুবিন্দু,— কখনও বা “ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে॥” বলিয়া গগনাসক্তদৃষ্টি রাজা প্রলাপ বলিতেছেন, কখনও বা দীর্ঘবাহু ইন্দীবরশ্যাম রামের চন্দ্রমুখ মনে করিয়া পরিতাপে দগ্ধ হইতেছেন। এই বিষম রজনীর উৎকট শোকের চিত্র কবি কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তদ্দর্শনে রামচন্দ্রোক্ত একটী কথা মনে হয় “অর্থধর্ম্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ত্ততে। এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা॥”

দশরথের মুখে আর বড় বেশী বাক্য নিঃসৃত হয় নাই। ভূষণ-ধ্বনি মিশ্রিত স্ত্রীলোকের আর্ত্তকণ্ঠনিঃসৃত “হা রাম” নিনাদ সেই ভূতল-পতিত নিশ্চেষ্ট লজ্জাবিমূঢ় বিলুপ্তসংজ্ঞ রাজাকে শোকবাণে বিদ্ধ করিতেছিল। রাম যখন বিদায় ভিক্ষা করিয়া রাজার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়াছিলেন তখন দশরথ একটি মাত্র প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, “হে পুত্র, আজ রাত্রে তুমি যেয়ো না, তুমি আর একটী দিন মাত্র থাক, আমি এবং তোমার মাতা আর এক দিন তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করি।” কিন্তু রাম এই প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। যখন সুমন্ত্র রামকে রথে লইয়া যান, তখন নগ্নপদে সংজ্ঞাহীন রাজাধিরাজ দশরথ সেই রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন, সেই দৃশ্য দেখিয়া অযোধ্যাবাসীদের উচ্ছ্বসিত শোকবেগ দ্বিগুণতর হইয়াছিল। রথ লইয়া সুমন্ত্র চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধ দশরথ পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

সুমন্ত্র রামকে বনে রাখিয়া দশরথকে সংবাদ কহিলেন, দশরথ সেই রাত্রে প্রাণত্যাগ করিবেন—সেই রাত্রে তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা বড় তীব্র হইয়া উঠিল, সুমন্ত্রকে বারংবার বলিতে লাগিলেন আমাকে রামের নিকট রাখিয়া আইস। কৌশল্যাকে বলিলেন তুমি আমাকে হাত দিয়া স্পর্শ কর, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। রামের রথের ধূলি দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষের দৃষ্টি সেই সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া পাই নাই। কৌশল্যা রামের বনবাসের কথা কহিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা করাতে রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সে রাত্রে তাঁহার প্রাণান্তকর যন্ত্রণা হইতেছিল। একবার অন্ধমুনির বৃত্তান্ত কৌশল্যা ও সুমিত্রার নিকট বলিলেন। তৎপর বলিলেন “যদি রাম একবার আসিয়া আমাকে স্পর্শ করে তবে বোধ হয় আমি বাঁচিতে পারি। একবার যদি তাঁহার চন্দ্রমুখ আবার দেখিতে পাইতাম!” যাঁহারা চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত হইলে রামচন্দ্রকে পুনরায় প্রত্যাগত হইতে দেখিতে পাইবে দশরথ তাঁহাদিগকে পুণ্যবান বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন—“চারু শুভকুণ্ডল রামের তারাধিপের ন্যায় সুন্দর মুখখানি যাঁহারা চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইলে আবার দেখিতে পাইবেন তাঁহারা মনুষ্য নহেন তাঁহারা দেবতা, আমার অদৃষ্টে সে সুখ নাই।” এই ভাবে অর্দ্ধ রাত্রে দশরথের প্রাণত্যাগ।

দশরথের যেরূপ শোক হইয়াছিল কৌশল্যার তাহা হয় নাই। কৌশল্যা চিরদুঃখসহিষ্ণু, বিশেষতঃ স্বকৃত পাপের ফলে এই অনর্থোৎপাত ঘটিয়াছিল এই অনুশোচনায় দশরথ দগ্ধ হইতেছিলেন,—তাঁহার শোচনীয় পরিণাম দর্শনে আমরা তাঁহার সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হই

এবং আদর্শ পিতা বলিয়া তাঁহার পদে প্রীতিনমস্কার দিতে কুণ্ঠিত হইতে পারি না।

কিন্তু যিনি বহুদ্রুমাবৃত পুষ্পসংস্তরসুন্দর পার্ব্বত্য কাননরাশি, এবং ক্বচিৎবেণীকৃত, ক্বচিৎ আবর্ত্তশোভী, ফেণনির্ম্মলহাসিনী ও জলাঘাত অট্টহাসোগ্রা গঙ্গাধারা দেখিতে দেখিতে রাজ্যশোক ভুলিয়া বিশ্বস্ত পত্নী এবং ভ্রাতার স্নেহচ্ছায়ায় বনে বিহার করিতেছিলেন সেই রামচন্দ্রের চরিত্রও এই অযোধ্যাকাণ্ডে পূর্ণরূপে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিব না, প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

কে ?

কে হবে আমার প্রিয়া ?
আজো তারে দেখি নাই কি লাবণ্য দিয়া
গড়েছে দুর্লভ করি’ দেবতা তাহারে ;
শুনি নাই তার স্বর,— কি মধু ঝঙ্কারে
হর্ষ তরঙ্গিয়া দেয় শিরায় শিরায় !
তাই মোর অপ্রশস্ত মানস-কারায়
ধরে না সে মায়ামূর্ত্তি অকূল অপার।
কোন কবি রটে নাই তার সমাচার ;
ভাগ্যবান শিল্পী কেহ বিবিধ যতনে
দৈব প্রেরণার কোন সুদুর্লভ ক্ষণে
পারে নাই আঁকিবারে চারু চিত্রলেখা
তার। তবু সে লক্ষ্মীরে যায় যেন দেখা,
শুনা যায় বাণী তার, দক্ষিণ সমীরে
উড়ে তার স্খলিত অঞ্চল, লাগে ধীরে
পরশ তাহারি !
জন্ম জন্ম অজ্ঞাত প্রিয়ারে
তবু ভালবাসি যেন ! পাব কভু তারে,
এই আশে এ দুর্ব্বহ জীবনের ভার
অক্লান্ত সন্তোষে বহি। বাসনা আমার
তারি লাগি ফিরে নিত্য ব্যর্থ অভিসারে
নগরে প্রান্তরে গ্রামে পাথারে কান্তারে !
কথনো নির্জ্জনে
ব’সে থাকি তারি আশে যদি সে গোপনে
আমারে বিস্মিত করি সহসা সাক্ষাতে,
দেখা দেয় কোন এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যাতে
চঞ্চল সৌভাগ্যসম। না হেরি আমায়
ফিরে যায়, আর যদি না-ই আসে হায় ?
বাহি’ জনহীন পথ
ফিরি শেষে ক্ষুণ্ণ গৃহে ভগ্ন-মনোরথ
চিরশূন্য শয্যা পানে। থাকি স্বপ্নাবেশে,
যদি সে স্বপ্নের মাঝে মূর্ত্তি ধ’রে এসে
মোরে ধরা দেয় ! কতবার ঘুম ঘোরে
চমকি উঠেছি হায়, বৃথা আশা করে !
বিফল, বিফল !
রাত্রি যায় নিদ্রাহীন ; দিবস সকল
বিরহ হতাশ মাঝে করে পলায়ন।
তবু নিত্য আপনারে রাখি সচেতন
কি দুর্ব্বোধ দুরাশায় ?
যেন মনে হয়,—
এক দিন পাব তারে ; ঘুচিবে সংশয়
করুণাময়ীর স্পর্শে ! হৃদয়ে হৃদয়ে
কখন পড়িবে গ্রন্থি—প্রেম বিনিময়ে !
পাইব বন্ধনে তারে ! সে হবে আমার ;
হাতে ধরে নিয়ে যাবে সংসারের পার,
অনন্ত আনন্দ রাজ্যে ! বক্ষে নিবে টানি
আমার তৃষিত বক্ষ ; সুকোমল পাণি
বুলাবে ললাটে কেশে, কণ্ঠে দিবে মালা
অভিনব মিলনের স্নেহ-অশ্রু ঢালা !
ভুলাবে সকল দুঃখ, দৈন্য, অপবাদ,
স্খলন, পতন, ভুল। ছাড়ি অবসাদ
সে দিন প্রথম এক ভ্রান্ত অন্ধ প্রাণ
চির-পূর্ণিমার মাঝে হবে চক্ষুস্মান্ !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

বুদ্ধ ঘোষ।

বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত ধর্ম্ম কালসহকারে জগতের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। যে সকল মহাত্মা উক্ত ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন বুদ্ধ ঘোষ তাঁহাদিগের অন্যতম। মহাবংশ নামক সুবিপুল পালি গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। মগধের বোধিদ্রুম সমীপে এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। তিনি সমগ্র বিদ্যায় ও সমগ্র কলায় সুনিপুণ ছিলেন ও বেদত্রয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি একদা রেবত নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন এবং পরাজিত হইয়া বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। উক্ত ব্রাহ্মণের স্বর বুদ্ধ দেবের ন্যায় ওজস্বী ও সুমধুর ছিল বলিয়া বৌদ্ধগণ তাঁহাকে বুদ্ধ ঘোষ এই উপনাম প্রদান করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি বুদ্ধ ঘোষ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর বুদ্ধ ঘোষ জ্ঞানোদয় নামে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনন্তর তিনি ত্রিপিটকের টীকা বিরচন করিবার মানস করেন। এই সময়ে রেবত ভিক্ষু তাঁহাকে বলেন, "জম্বুদ্বীপে ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থ মাত্র বিদ্যমান আছে কিন্তু উহার ব্যাখ্যা এ দেশে বর্ত্তমান নাই। সুবিজ্ঞ মহেন্দ্র খৃঃ পূঃ ২৪১ অব্দে সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন উহা অবলম্বন করিয়া পালি ভাষায় ত্রিপিটকের টীকা বিরচন কর। ইহাতে জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।"

রেবত ভিক্ষুর পরামর্শ অনুসারে বুদ্ধঘোষ সিংহল যাত্রা করেন। এই সময়ে (৪১০—৪৩২ খৃঃ অব্দে) মহানাম সিংহলের রাজা ছিলেন। বুদ্ধ ঘোষ সিংহলের অনুরাধপুর নগরস্থিত মহাবিহারে উপস্থিত হইয়া স্থবির সংঘপালের নিকট ত্রিপিটকের সিংহলী ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। সিংহলবাসিগণ তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অৎথকথা (অর্থকথা) নামক পুস্তক প্রদান করেন। এই অৎথকথাই ত্রিপিটকের পালি ব্যাখ্যা। বুদ্ধ ঘোষ এই অৎথকথা পালি ভাষায় অনুবাদিত কয়িয়া জম্বুদ্বীপে ত্রিপিটকের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রচার করেন। বুদ্ধ ঘোষ সিংহল হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ গ্রন্থের উদ্ধার করেন, বার্মীজ বা ত্রৈলঙ্গী অক্ষরে ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত হয়। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার বৃদ্ধি হয়। তদনন্তর তিনি মগধের উরুবেল নগরে বোধিদ্রুম-মূলে প্রত্যাগমন করেন।

বার্মীজগণ মহাভক্তি সহকারে বুদ্ধ ঘোষের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন বুদ্ধ ঘোষ সুবর্ণ দ্বীপে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশের থ্যাটন্ নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে তিনি ত্রিপিটকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। মাগধী অক্ষরে লিখিত ত্রিপিটক তিনি ত্রৈলঙ্গী (বার্মীজ) অক্ষরে লিখিয়া আনিয়াছিলেন। সিংহল হইতে ত্রিপিটক আনয়নের ৬৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১০৫০ খৃঃ অব্দে উহা থ্যাটন হইতে পেগান নগরে প্রবেশ করে। বুদ্ধ ঘোষের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত বুদ্ধঘোষুপ্পত্তি নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ঐ গ্রন্থখানি পালি ভাষায় লিখিত এবং বোধ হয় কোন ব্রহ্মদেশীয় পণ্ডিত ঐ গ্রন্থের রচয়িতা। সিংহলবাসিগণের মতে বুদ্ধ ঘোষ প্রথমে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন ও তদনন্তর ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশবাসিগণের মত এই যে বুদ্ধ ঘোষ প্রথমে ব্রহ্মদেশের পেগু নগরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন ও তদনন্তর তিনি সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

বিসুদ্ধিমগ্‌গ (বিশুদ্ধি মার্গ) গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে মহাবংশে এক কৌতুকাবহ গল্প লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধ ঘোষ মগধ হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করিয়া তত্রত্য স্থবিরগণের নিকট নিবেদন করেন—"মহাশয়গণ! আমি সিংহলী অৎথকথা পালিভাষায় অনুবাদিত করিব বলিয়া মনঃস্থ করিয়াছি। আপনারা আমাকে একখণ্ড সিংহলী অৎথকথা প্রদান করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।" তাঁহারা বুদ্ধ ঘোষের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে দুইটী মাত্র শ্লোক প্রদান করিয়া বলেন—"তুমি অগ্রে এই দুইটী গাথার পালি ব্যাখ্যা লিখিয়া আন, যদি উহা আমাদের মনঃপূত হয় তাহা হইলে সমগ্র সিংহলী অৎথকথা তোমাকে প্রদান করিব।" বুদ্ধ ঘোষ ঐ দুইটী গাথা অবলম্বন করিয়া ত্রিপিটকের সাহায্যে সুবিপুল বিসুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থ বিরচন করেন। যখন তিনি স্থবির-

গণের সমক্ষে ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন তখন কোন অদৃশ্যরূপী দেবতা ঐ গ্রন্থ কোথায় লইয়া গেলেন। তদনন্তর বুদ্ধ ঘোষ দ্বিতীয় বার বিসুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থ বিরচন করেন। এবারেও উক্ত দেবতা ঐ গ্রন্থ লইয়া যান। যখন বুদ্ধ ঘোষ তৃতীয় বার বিসুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থের রচনা শেষ করেন, তখন পূর্ব্বোক্ত দেবতা অপর দুইখানি বিসুদ্ধিমগ্‌গ প্রত্যর্পণ করেন। স্থবিরগণ তখন তিন খানি গ্রন্থ যুগপৎ পাঠ করিয়া দেখেন উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কোন শ্লোকে, বাক্যে বা পদে প্রভেদ না দেখিয়া স্থবিরগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ছিলেন ঃ—"স্বয়ং মৈত্রেয়-বুদ্ধ বুদ্ধঘোষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" তদনন্তর স্থবিরগণের নিকট হইতে সিংহলী অৎথকথা লইয়া তিনি অনুরাধপুরের গ্রন্থাকর বিহারে অবস্থান পূর্ব্বক পালি অৎথকথা বিরচন করেন। স্থবিরগণ এই অৎথকথাকে ত্রিপিটকের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। বুদ্ধ ঘোষের পালি অৎথকথা ভারতের এক বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই অৎথকথা বিরচিত হইয়াছিল।

বুদ্ধ ঘোষের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। অধুনা সকল পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ সিংহলরাজ মহানামের সমসাময়িক সুতরাং ৪১০—৪৩২ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

বুদ্ধ ঘোষের সিংহলী জীবন চরিত মহাবংশ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। খৃষ্টীয় ৪১০—৪৩২ অব্দে মহানাম নামক কোন সিংহলী পণ্ডিত ঐ গ্রন্থ বিরচন করেন। মহাবংশই সিংহলের প্রাচীন ও প্রামাণিক ইতিহাস। উহা ১০০ একশত অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ৩৭ অধ্যায় মহানামের বিরচিত। বুদ্ধ ঘোষের জীবন চরিত ৩৭শ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। মহাবংশের রচয়িতা ও বুদ্ধঘোষ এক সময়ের লোক। অতএব মহাবংশ বর্ণিত বুদ্ধ ঘোষের জীবন চরিত অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ছন্দ।

কবিতার ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে আমরা ১৩০৭ সালের কার্ত্তিকের "ভারতী"তে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। ১৩০৮ সালের চৈত্রের "সাহিত্যে" সেই আলোচনা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবিবাবুর রচনা ও আমাদের মন্তব্য সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইলেও উহা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উহার অধিকাংশ স্থলই ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। তাই দুই চারিটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

আমরা বলিয়াছিলাম—কোন শব্দের আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দ একাক্ষর হইলে, সেই অক্ষরটি রবিবাবু গুরু ধরিয়া থাকেন, কিন্তু সেই শব্দটি একাধিক অক্ষরের হইলে তিনি তাহার শেষ বর্ণটিকে * গুরু ধরেন না। সমালোচক মহাশয় এই নিয়মটি মানিয়া লইয়া বলেন—কবির এই পার্থক্য করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কবি লিখিয়াছেন,—

কহিলাম আমি তুমি ভূস্বামী,
ভূমির অন্ত নাই।

তিনি লিখিতে চান,—

কহিলাম আমি হৃদয়-স্বামী
ব'সহ হৃদয়াসনে।

কবি লিখিয়াছেন,—

স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম যোড় করে;

সমালোচক লিখিতে চান,—

স্বদেশেব কাছে দাঁড়ায়ে প্রাতে
কহিলাম যোড় করে;

অর্থাৎ চিহ্নিত অক্ষর গুলির গুরু উচ্চারণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই পরিবর্ত্তিত ছত্রকয়টি কি

---

* আমাদের লেখায় "আবশ্যক মত" এই শব্দদ্বয় ছিল, কিন্তু সমালোচক মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, ইহার আলোচনা যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

কুৎসিত শুনাইতেছে? আমরা বলি, হাঁ বড়ই খারাপ লাগিতেছে। ইহাতে ভাষার সরল সাধারণ স্বাভাবিক উচ্চাচরণ অনর্থক বিকৃত করা হইতেছে। কবিতা হইলেই যে ভাষার প্রকৃতির অনুসরণ না করিয়া কথায় কথায় ভিন্ন পথে চলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কবি লিখিয়াছেন,—

ঘুমের দেশে | ভাঙিল ঘুম || উঠিল কল- স্বর, (১৭)
গাছের শাখে জাগিল পাখী কুসুমে মধু- কর।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ জাগিল রাণী- মাতা,
কচালি আঁখি কুমার সাথে জাগিল রাজ- ভ্রাতা।

এখানেও সমালোচক মহাশয়ের মতে, রবিবাবুর "কলস্বর" ও "রাজভ্রাতা"র প্রত্যেকটিকেই চারি অক্ষর ধরা অন্যায় হইয়াছে! তিনি সংশোধন করিয়া এইরূপ পাঠ দিয়াছেন—

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর (১৮)
গাছের শাখে জাগিল পাখী কুসুমে মধুপবর।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ জাগিল রাণীর মাতা,
কচালি আঁখি কুমার সাথে জাগিল রাজ-ভ্রাতা।

অর্থাৎ ঊর্দ্ধরেখ অক্ষরদ্বয়ের গুরু উচ্চারণ করিয়া প্রথম ও চতুর্থ ছত্রে এক একটি মাত্রা অধিক ধরিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রে পরিবর্ত্তিত ছন্দের অনুরোধে এক একটি অক্ষর অধিক বসাইয়া দিয়াছেন। এখানে আমাদের বক্তব্য, এইরূপ পরিবর্ত্তনে রবিবাবুর ছন্দের ক্ষিপ্রগতি ছত্রশেষে প্রতিহত হইতেছে। যাঁহাদের ছন্দের কান আছে তাঁহারা কবিতাটি পড়িতে আরম্ভ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে পঞ্চম অক্ষরে কিঞ্চিৎ থামিয়া দশম অক্ষরে কিছু বেশি থামিতে হইবে; পঞ্চদশ অক্ষরেও সামান্য একটু বিরাম আছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, শেষের দুই অক্ষর বাদ দিলে তৎপূর্ব্ব যতিস্থান ষোড়শ অক্ষরে অযথা নির্দ্দিষ্ট হইয়া কবির বাঞ্ছিত ছন্দটি বড়ই লাঞ্ছিত হইতেছে। তবে, ইচ্ছা করিলে রবি বাবু ঐরূপ লিখিতে পারিতেন—কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাই তাঁহার হয় নাই। হইলেও তাঁহার "কলস্বর" ঠিক থাকিত কি না সন্দেহ—কিন্তু 'রাজ-ভ্রাতা' যে 'রাজার ভ্রাতা' হইতেন তাহা নিশ্চিত।

অতঃপর সমালোচক মহাশয়, "কলধ্বনি," "শুভগ্রহ," 'পুরদ্বার' ইহাদিগের প্রত্যেকটিতেই নাকি রবি বাবু চারি অক্ষর ধরিয়াছেন, অথচ 'অনুগ্রহ' 'পুরস্কার' প্রভৃতি শব্দকে পাঁচ অক্ষর ধরিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর লিখিয়াছেন—রবি বাবুর মতে 'প্রতিধ্বনি' শব্দকে পাঁচ অক্ষর ধরা উচিত, কিন্তু 'সমস্ত' না থাকিয়া ব্যস্ত ভাবে 'প্রতি ধ্বনি' থাকিলে চারি অক্ষর ধরা তাঁহার অভিমত। আমরা বলি, এ ঠিক কথাই বটে; এই দুই স্থলে উচ্চারণ ও অর্থ উভয়েরই পার্থক্য আছে। লেখক মহাশয়ের "কানে বা জ্ঞানে" এই দুই পার্থক্য ধরা পড়িল না কেন বলিতে পারি না। 'কল ধ্বনি' 'শুভ গ্রহ' ইত্যাদির চারি অক্ষর ধরা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা ক্রমে বলিতেছি—আগে তাঁহার উদাহরণ গুলির একে একে অনুসরণ করা যা'ক—

"কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্ব্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।"

এখানে লেখক মহাশয় 'বেদব্যাস' শব্দের 'দ'এর গুরু উচ্চারণ সম্বন্ধে কবির কোন দোষ নাই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু 'মুনি ব্যাস' লিখিলে রবি বাবু 'নি'র গুরু উচ্চারণ ধরিতেন না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। লেখকের মতে, এইরূপ বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি কবির পক্ষপাত (!) রাশি রাশি দৃষ্ট হয়। যথা,—

হু হু করে' বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘ শ্বাস!
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস।

এখানে 'জলোচ্ছ্বাস' পাঁচ মাত্রা হইল, অথচ নিম্নের উদাহরণে তুল্যাবস্থ সন্ধিসমাসবদ্ধ 'মনোব্যাকুলতা" শব্দকে সাত মাত্রা না ধরিয়া কবি কেন ছয় অক্ষর ধরিলেন!—

শুধু একটি মুখের এক নিমিষের
একটি মুখের কথা
তারি তরে বহি চির জীবনের
চির মনোব্যাকুলতা।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শ্রীনিবাস বাবুর মনে হই-

করুণের

য়াছে (ক) "সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে 'রাজভ্রাতা' 'মনোদ্বার'* প্রভৃতি শব্দের ন্যায় একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট ভিন্ন শব্দ থাকিলে এবং উভয় শব্দের মধ্যে সন্ধি সমাস থাকিলে ঐ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে আবশ্যকমত দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে। যেখানে সন্ধি না হইয়া কেবল সমাস হইয়াছে সেখানেও দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে।"

আমাদের মন্তব্য:—ঐরূপ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে 'আবশ্যক মত' দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে ধরা যায়,—তাহা সন্ধি, কিংবা সমাস, কিংবা উভয় হইলেই হয় না। ভাষার উচ্চারণের প্রকৃতিই তাহার কারণ। বাঙ্গালায় অনেক শব্দ সংস্কৃত নিয়মে বর্ণবিন্যস্ত হয়, কিন্তু উচ্চারণ সর্ব্বত্র তাহার অনুগামী হয় না; সন্ধি সমাসগ্রস্ত হইলেও নয়। রবি বাবু 'মনোব্যথা' 'মনোব্যাকুলতা' 'মনোদ্বার' 'রাজ-ভ্রাতা' ইত্যাদির ব্যবহার কালে বাঙ্গলা চলিত উচ্চারণের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এখানে একটি কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, 'মনোব্যথা' শব্দ 'মন ব্যথা' লিখিলেও চলিত, কারণ বাঙ্গলায় 'সমস্ত' ভাবে 'মন' শব্দ প্রায়শ হসন্ত উচ্চারিত হয় না। 'মন' শব্দের হসন্ত উচ্চারণ ঠেকাইবার জন্যই 'মনোব্যাকুলতা' শব্দ সংস্কৃত আকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মনসাধ' শব্দটি দেখুন—ইহাত 'সমস্ত' শব্দ? তবে সংস্কৃত আকারে 'মনঃসাধ' লিখি না কেন? কারণ উহার উচ্চারণ বাঙ্গলায় ওরূপ নয়। বোধ করি ইহার উচ্চারণ অনুসরণ করিতে গিয়া হঠাৎ রবিবাবুও একবার "মনোসাধে" বাঁশী বাজাইয়াছিলেন, আর কোন কোন প্রতিবাদীর 'ব্যাকরণ' কাঁদিয়া উঠিয়াছিল!

এইরূপ, 'জলোচ্ছ্বাস' শব্দে পাঁচ অক্ষর ধরিবার আবশ্যকতা শ্রীনিবাস বাবুর নিয়মের সন্ধি সমাস জনিত নহে, পরন্তু কবির নিয়মের উচ্চারণ বশত। 'উচ্ছ্বাস' শব্দটি একক যদি কবির নিয়মে চারি মাত্রার কম না হয়, তবে জল+উচ্ছ্বাস সন্ধি হইয়া কখনই চারি মাত্রা হইতে পারে না—সুতরাং ইহাকে 'আবশ্যক মত' দীর্ঘ হ্রস্ব উচ্চারণ করা যায় না। উহার উচ্চারণ সর্ব্বদাই দীর্ঘ ধরিতে হইবে। লেখক আরও বলেন, "রবি বাবুর লেখা দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্ব্বপদ একাক্ষর হইলেই তিনি কেবল দীর্ঘ ধরিতে ইচ্ছুক, অন্যত্র নহে।" এখানেও পূর্ব্ববৎ 'উচ্চারণ জনিত আবশ্যকতা বোধ হইলে' বুঝিতে হইবে।

শ্রীনিবাসবাবুর উক্তি:—"যদি পূর্ব্বপদ পরপদের সহিত রক্তে মাংসে মিলিত হইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন অভিধানলভ্য নূতন পদের সৃষ্টি করে (যেমন বেদব্যাস, প্রতিধ্বনি, অনুগ্রহ, পুরদ্বার * প্রভৃতি শব্দে) তাহা হইলে তিনি [রবি বাবু] সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে দীর্ঘ ধরিতে রাজী আছেন; কিন্তু 'মুনি ব্যাস' 'প্রতি ধ্বনি' 'শুভ গ্রহ' 'মনো দ্বার' প্রভৃতি স্থলে রাজী নন।" ইহা পড়িয়া বোধ হয় যে, আমাদের প্রদর্শিত নিয়মটিই টানিয়া বুনিয়া ফেনাইয়া ঘনাইয়া বলিতে বলিতে লেখক রবিবাবুর নিয়ম অনেকটা ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তিনি "এরূপ পক্ষপাতের (!) পক্ষপাতী" নহেন! হায়, এইখানেই যত গোলযোগ!

শ্রীনিবাস বাবু আরও বলেন যে রবিবাবু নাকি অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রস্তাবিত প্রসারিত নিয়মের অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী উদাহরণে "কাণ্ডজ্ঞান" শব্দের "ণ্ড" কে দীর্ঘ ধরিয়াছেন:—

অনেক মূর্খে করে দান ধ্যান,
কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান!
[ভারতী। ১৩০৫ লক্ষ্মীর পরীক্ষা। ৯৭৪ পৃ।

পাঠক দেখিবেন, এখানেও রবিবাবু প্রচলিত উচ্চারণকেই আমল দিয়াছেন; "দান ধ্যানের" হ্রস্বতাতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—সমাস জনিত প্রয়োজন বশত অজ্ঞাতসারে তাঁহার "কাণ্ডজ্ঞান" গুরু হয় নাই, উহা প্রকৃতই গুরু।

(খ) "যেখানে সন্ধি বা সমাস কিছুই হয় নাই, সেখানেও আবশ্যক মত দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে" শ্রীনিবাস বাবু

* সমালোচক মহাশয় উদাহরণ দেন নাই—আমরা একটি দিলাম।

রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।
—মানসী (গুপ্তপ্রেম)।

* শ্রীনিবাস বাবু এক স্থানে "পুরদ্বার" শব্দকে রবিবাবু চারি অক্ষর ধরিয়াছেন বলিয়াছেন [সাহিত্য পৃঃ ৭০১, পং ১১]

তাঁহার এই মত সমর্থনের জন্য "ছন্দোভঙ্গদোষস্পর্শরহিত" স্বরচিত একটি কবিতার নমুনা দিয়াছেন, যথা—

জোছনার মত স্বচ্ছ শীতল
হৃদয় কি শোভা ধরে,
হাসি হাসি মুখে অমিয় উৎস
ঝরে তাহার স্বরে।

এবং যদি কেহ বুঝিতে না পারেন এই জন্য বলিয়া দিয়াছেন—"এখানে তাহার শব্দের 'র' কে দীর্ঘ ধরা হইল।" আমরা ইহার কি টীকা করিব? তবে অনুমান করি, শ্রীনিবাসবাবুর উপদেশ অনুসারে "ঝরে তাহার স্বরে" পাঠ করিলে কবিতাটির অমিয় উৎস উপভোগে পাঠকের মুখ হাসি হাসি হইয়া উঠিবে। আমাদের মতে, যেখানে সন্ধি সমাস কিছুই হয় নাই সেখানেও উচ্চারণের খাতিরে দীর্ঘ ধরিবার আবশ্যকতা হইতে পারে, খাম-খেয়ালি বশত নহে।

রবি বাবু লিখিয়াছেন,—

বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির
অসংশয়ে করি স্থির
মোদের বড় এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর। [মানসী, ১২০ পৃঃ]

এখানে "করি" শব্দের "রি" গুরু। এই উপলক্ষে লেখক বলেন—"কবিও অন্ততঃ একবার অজ্ঞাতসারে বোধ হয়, ভাষার সহজ প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া এরূপ স্থলে দীর্ঘ ধরিয়াছেন।"

আমরাও বলি, ভাষার "উচ্চারণের" সহজ প্রকৃতির প্রভাবেই রবি বাবুর রচনায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় কোথায়ও তিনি তাহার অতিক্রম করিতে অগ্রসর হন নাই; এবং এখানে যে "রি" গুরু ধরিয়াছেন তাহাও নিতান্ত 'অজ্ঞাতসারে' করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ঃ—

পথিক, তোমার দলে
যাত্রী ক'জন চলে?

গণি তাহা ভাই শেষ নাহি পাই
চলেছে জলে স্থলে।
[ভারতী। বৈঃ, ১৩০৮]

এখানে "জলে"র "লে" গুরু। কে ইহাকে লঘু করিয়া পাঠ করিতে পারে? কতকগুলি শব্দ আছে (যেমন স্ফূর্ত্তি, স্পষ্ট, স্থল ইত্যাদি) তাহাদের উচ্চারণ করিতে হইলে পূর্ব্ব পদের স্বরান্ত বর্ণ কিছুতেই হ্রস্ব উচ্চারিত হইতে পারে না। ব্যস্তভাবে উচ্চারণ করাও একটু কঠিন। এই জন্যই ইংরাজি 'স্কুল' বাঙ্গালা 'ইস্কুল' হইয়া পড়িতেছে।

লেখক উক্ত উভয় নিয়ম সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা বলিয়াছেন, তাহারও আলোচনা আবশ্যক। শ্রীনিবাস বাবু বলেন "উপরি লিখিত যে যে স্থলে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে 'আবশ্যক মত' দীর্ঘ ধরিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ঐ সকল স্থলে সর্ব্বদাই দীর্ঘ ধরিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। অর্থাৎ কোন কবি ইচ্ছা করিলে রবি বাবুর মত হ্রস্বও ধরিতে পারেন, কেহ বা ইচ্ছা করিলে দীর্ঘও ধরিতে পারেন।"

আমাদের মন্তব্য ঃ—কোন কবির ইচ্ছার উপর অপর কাহারও হাত নাই। "ঝরে তাহার স্বরে"র গুরুত্বেই তাহার প্রমাণ হাতের কাছেই আছে। তবে উপযুক্ত সমজদার পাওয়াই মুস্কিল!

যাহা হউক, শ্রীনিবাস বাবু শেষের কথাটি অনেকটা ঠিক বলিয়াছেন,—"যে স্থলে ঐ সংযুক্ত বর্ণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যতি পড়িবে, সে স্থলে তাহার পূর্ব্ব বর্ণকে দীর্ঘ ধরা কদাপি সঙ্গত নহে। যথা—

চমকি মুখ দুহাতে ঢাকে সরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভেনি সেই ক্ষণ।

এ স্থলে প্রদীপ শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ন' অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরিতে কেহই পরামর্শ দিবেন না।"

আমাদের মন্তব্য ঃ—আমরা "যতি"কে সর্ব্বদা ততটা প্রাধান্য দিই না যতটা 'উচ্চারণ'কে দিয়া থাকি। আর যতিও অনেক সময়ে উচ্চারণ ও অর্থ-সৌকর্য্যার্থেই পতিত হয়। ঐ ছত্র দুইটি যদি কেহ অজ্ঞতা বশত এইরূপ পাঠ করে, যথা—

চমকি | মুখ দুহাতে | ঢাকে সরমে | টুটে মন,
লজ্জা | হীন প্রদীপ | কেন নিভে নি | সেই ক্ষণ।

তাহা হইলেও রবি বাবুর নিয়মে "হীন" শব্দের 'ন' গুরু হইত না। আরও একটি উদাহরণ দেখুন,—

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি।
[সোনার তরী। নিরুদ্দেশ যাত্রা]

এখানে 'ক্ষুব্ধ' শব্দের আগে কি যতি পড়িয়াছে? নিশ্চিতই পড়ে নাই। তবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী "নো"র উচ্চারণ লঘু ধরা কি অস্বাভাবিক হইয়াছে?

এই জন্যই লেখকের নিয়ম অনুসারে তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত পদ্যের সমাসবদ্ধ "অধীশ্বরী"র "ধী"কে হ্রস্ব ধরা সঙ্গত হয় নাই, সুতরাং ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে ঃ—

কোথা সে পাষাণী কোথায় এখন
মম হৃদি অধীশ্বরী যেই জন।

আমরা উহাকে এইরূপ লিখিতাম ঃ—

কোথা সে পাষাণী কোথায় এখন
এ হৃদি অধীশ্বরী যেই জন।

মাত্রামিত কবিতায় যতিপতনের কার্য্যকারিতা মোটেই নাই একথা বলিতে পারি না। যেমন,—

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কল স্বর,

এখানে "কল" শব্দের "ল" কতকটা যতিপতনে এবং কতকটা উচ্চারণ বশেই লঘু হইয়াছে। এইরূপ "রাজ-ভ্রাতা" শব্দের "জ" লঘু ঃ—

কচালি আঁখি কুমার সাথে জাগিল রাজ-ভ্রাতা।

অথচ শ্রীনিবাস বাবু প্রবন্ধারম্ভে "কল স্বর" ও "রাজ-ভ্রাতা"র গুরু উচ্চারণ করিয়া ভ্রমে পতিত এবং কবির 'একদেশদর্শিতা' (!) দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন! আরও বক্তব্য, এখানে "কল" শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ এবং "রাজ" শব্দের হসন্ত উচ্চারণ ধরিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

আমরা এতক্ষণ দেখাইলাম যে, পাকা পাকি নিয়মে গুরু লঘু না ধরিয়া ইচ্ছামত ধরিলে অনেক পাঠককে অনেক সময়ে এইরূপে বিড়ম্বিত হইতে হয়। আমাদের কবির ছন্দ উচ্ছৃঙ্খল নয়, নিয়মও সহজ উচ্চারণরূপ ভিত্তির উপরই স্থাপিত। তিনি খেয়াল বশত কোন স্থলেই গুরুলঘু উচ্চারণ ধরেন নাই। তথাপি দুঃখের বিষয়, লেখক মহাশয়ের মত নিপুণ পাঠকও পদে পদে স্খলিত হইয়াছেন। আমরা একে একে তাঁহার ভ্রম নিরাকরণের চেষ্টা করিতেছি।

লেখক বলেন, (১) "কবি 'ঙ্গ' বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে কখন বা হ্রস্ব, কখন বা দীর্ঘ ধরিয়াছেন। হ্রস্ব, যথা—

নয়ন যদি মুদিয়া থাক,
সে ভুল কভু ভাঙ্গিবে নাক। [মানসী, ১২০ পৃ]

দীর্ঘ, যথা—

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি,
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি। [সোনার তরী, পৃ ২০৬]
কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়,
কখনো মিশে যায় ভাঙ্গিয়া। [মানসী পৃ, ১৩৭]

আমাদের মন্তব্য ঃ—উপরের উদাহরণে "ভাঙ্গিয়া" শব্দ দুই স্থানেই হ্রস্ব। প্রথম উদাহরণে হ্রস্ব, আর দ্বিতীয় উদাহরণে দীর্ঘ নয়। কোন কোন অঞ্চলে 'ভাঙ্গিয়া' শব্দ উচ্চারণে "ভাঙ্‌গিয়া" যায়। সুতরাং কবির সতর্ক হইয়া বর্ণবিন্যাস করা উচিত ছিল! কিন্তু শ্রীনিবাস বাবু আশ্বস্ত হউন, আজ কাল এ সম্বন্ধে কবি বেশ সজাগ—গদ্যেও তিনি এখন "ভাঙা বাংলা" লিখিতেছেন। কিন্তু হায়, তাহাতেও দেখিতেছি কবির নিস্তার নাই! লেখক বলিতেছেন ঃ—

(২) "সাধারণতঃ তিনি 'ঙ' (ঙ?) এর পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণকে হ্রস্ব ধরিয়া থাকেন। কিন্তু প্রয়োজনানুসারে দীর্ঘও ধরিয়া থাকেন; যথা—মানসী, ১৩৭ পৃ—

কখনো ঘন নীল বিজুলি ঝিলিমিল
কখনো ঊষারাগে রাঙিয়া।"

আমাদের অধিক টীকা অনাবশ্যক। তিনি "রাঙিয়া" লিখিলেও "রাঙ্‌গিয়া" বা "রাঙ্‌ঙিয়া" কেন পড়িলেন তাহার কারণ ঠিক পাওয়া গিয়াছে। তিনি যে একটু আগেই পড়িয়াছেন—

কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়
কখনো মিশে যায় "ভাঙ্‌গিয়া";

সুতরাং, কখনো ঘন নীল বিজুলি ঝিলিমিল
কখনো ঊষারাগে "রাঙ্‌গিয়া"!

না পড়িলে মেলে কৈ!

(৩) শ্রীনিবাস বাবু বলেন—'ক্ষ' বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে

কবি কথন হ্রস্ব কথনবা দীর্ঘ ধরিয়াছেন। হ্রস্ব, যথা—

ম্যাট্ সিনি-লীলা এমন সরেস,
এরা সেকথার না জানিল লেশ,
হায় অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ
লজ্জায় মুথ ঢাকো। [মানসী, ১২৬পৃ]"

আমাদের মন্তব্য ঃ—এই উদাহরণে 'অশিক্ষিত' শব্দ হ্রস্ব উচ্চারণে "অশিখিত" হয়—শ্রীনিবাস বাবু কি ঐরূপ পড়েন? আমরা বলি কবি এখানেও নিজের নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাথিয়াছেন। 'অশিক্ষিত' শব্দের 'শি' গুরু ধরিয়া এইরূপ পড়ুন ঃ—

হা(য়) অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ
লজ্জায় মুথ ঢাকো।

ভরসা করি এথন গণনায় মিলিয়াছে। এইরূপ দুই একটি উপেক্ষণীয় অনুচ্চার্য্য অক্ষর ব্র্যাকেট কণ্টকিত* করিয়া না লিখিলে পদ্য অশুদ্ধ হয় না। "য়" টা ছাপাখানার ভূতের কাণ্ডও ত হইতে পারে!

(৪) সমালোচক বলেন,—"ঔকারকে নিম্নলিখিত স্থলে কবি হ্রস্ব করিয়াছেন ; যথা—

দুর হৌক এ বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের ভাণ
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনা ভরা প্রাণ। [মানসী, ১১৩ পৃ]
জগৎ ছানিয়ে কি দিব আনিয়ে
জীবন যৌবন করি ক্ষয়। [মানসী, ১৭৯ পৃ]

আমাদের মন্তব্য ঃ—"ঔ"কার লঘু উচ্চারিত কোথায়ও হয় নাই, এথানেও নহে। এখানেও ব্র্যাকেট থাটাইয়া পাঠ করুন,—

দূর হৌক [এ] বিড়ম্বনা।

অথবা, ওকার স্থলে ছাপার ভুলে ঔকার হইয়াছে উহার সংশোধিত পাঠ এইরূপ হইবে ; যথা—

দূর হোক এ বিড়ম্বনা।

দ্বিতীয় উদাহরণে "যৌবন" দীর্ঘ রাখিয়া "জীবন" একটু খাটো করিয়া লইতে হইবে ; যথা—

জীব[ন্]-যৌবন করি ক্ষয়।

(৫) লেথক বলেন—"কবি সাধারণতঃ এক শব্দের অন্তর্গত সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে দীর্ঘ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত স্থলে হ্রস্ব ধরিয়াছেন" ঃ—[আমরা দৃষ্টান্তগুলির ক্রমে উল্লেখ করিয়া আমাদের নিজের মীমাংসা প্রত্যেকটির নীচে দিলাম।]

"ওই কারা ব'সে আছে দূরে
কল্পনা উদয়াচল পুরে। [মানসী, ১৪৫ পৃ]"

লেখকের মতে "কল্পনা" শব্দের "ক" হ্রস্ব। আমরা তাহা বলি না, কারণ এটি মাত্রাবৃত্ত কবিতা নয়—সুতরাং "কল্পনা" তিন অক্ষর ধারায় দোষ নাই ; উচ্চারণ ঠিক গুরুই আছে।

"হেথা কেন দাঁড়ায়েছ কবি
যেন কাষ্ঠপুতল ছবি। [মানসী, ১৪১ পৃ]"

লেথক বলেন, "কাষ্ঠ" দুই অক্ষর। উত্তর এটা মাত্রামিত কবিতা, সুতরাং "কাষ্ঠ" তিন মাত্রা। তবে "পুত্তল" শব্দে ছাপার ভুল ছিল, আমরা উহার সংশোধিত পাঠ "পুতল"ই লিথিলাম। পদ্যে "পুত্তল" লিথিলে দোষ হইবে কি ?

"রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে,
সাত সমুদ্র তের নদী পার,
যেথানে যত মধুর ছবি আছে
বাকী ত কিছু রাথি নি দেথিবার।
[সোনার তরী, ১৫ পৃ]"

শ্রীনিবাস বাবু বলেন, "এখানে সমুদ্র শব্দকে তিন অক্ষর ধরা হইয়াছে।" আমরা বলি চারি অক্ষর। বিশ্বাস না হয়, চতুর্থ ছত্রের অক্ষরসংথ্যার সহিত মিলাইয়া দেথিবেন, দ্বিতীয় ছত্রেও বারো মাত্রা হয় কি না। আর চতুর্থ ছত্রই বা বলি কেন, সকল ছত্রই একরূপ।

"দেখ হেথা নূতন জগৎ,
ওই কারা আত্মহারাবৎ।
যশ অপযশ বাণী—কেহ কিছু নাহি মানি,
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ। [মানসী, ১৪৪ পৃ]"

* শ্রীনিবাস বাবু তাঁার প্রবন্ধের এক স্থলে তাঁহার স্বরচিত একটি ছত্রে "ও" কে ব্র্যাকেট বদ্ধ করিয়া উহা যে অনুচ্চার্য্য তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন,—"উচিত হয় মিঠাই এনে
থাইতে দে[ও]য়া ভাই!"

লেথক বলেন, এখানে "দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রের সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে হ্রস্ব ধরা হইয়াছে।" আমরা "আত্মহারাবৎ" লঘু উচ্চারণ কথন ধরি না, আর "ভবিষ্যৎ"ও আমাদের মতে সর্ব্বদাই দীর্ঘ। এ কবিতাটি মাত্রামিত নহে, বর্ণবৃত্ত ; সুতরাং নূতন নিয়মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত।

(৬) সমালোচক বলেন,—"সাধারণতঃ কবি অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ণকে, দীর্ঘ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিম্ন-লিথিত স্থলে হ্রস্ব ধরিয়াছেন ঃ—

ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াশিংটনের জন্ম বরষ
মুথস্থ হল নাক। [মানসী, ১২৬ পৃ]"

আমাদের বক্তব্য ঃ—কবি সর্ব্বত্রই সানুস্বার বর্ণ গুরু ধরিয়াছেন, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম করেন নাই। আর একবার বন্ধনী দিয়া পাঠের সন্ধান লওয়া যা'ক ঃ—

"ওয়াশিংটনে(র্) জন্ম বরষ
মুথস্থ হল নাক।

শ্রীনিবাস বাবু এই ছয় দফায়, কবিবর নিজ-নিয়মের নিজেই অপব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও দফায় দফায় তাহার ব্যাথ্যা করিলাম, এখন পাঠকই বিচার করুন কোন্ ব্যাখ্যা সমীচীন। ফলতঃ রবি বাবু আপনার ছন্দের শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল করিয়া পায়ে জড়াইয়া বসেন নাই ; তিনি ছন্দের নূপুর কবিতার চরণে পরাইয়া তাহাকে শিঞ্জামুথরিত করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা পুনর্ব্বার বলি, কবি ছন্দোবিষয়ে শ্রীনিবাস বাবুর ব্যাথ্যামত অতটা উচ্ছৃঙ্খল নহেন। আজ কাল রবি বাবুর ভক্ত শিষ্য অনেক আছেন, তাঁহা বোধ করি কবিরও অজ্ঞাত নাই। কিন্তু যদি কেহ তাঁহার অন্ধ অনুকরণকারী হইয়া থাকেন, তবে সে দোষ কাহার ?

অতঃপর আমাদের নিজের পালা। আমরা শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর উদ্ধৃত তুলসীদাসের একটি কবিতা সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে লিখিত অথচ উহাতে সংস্কৃতের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই কেন, ইহার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছিলাম। দীনেশ বাবু বলিয়াছিলেন যে, "কোন কবিই সংস্কৃত ছন্দগুলি প্রাদেশিক ভাষায় আনিতে যাইয়া সংস্কৃত হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের নিয়ম উৎকৃষ্টভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই।" আমরা বলিয়াছিলাম—"ইহা অনেকাংশে ঠিক হইলেও (কি না, সর্ব্বাংশে ঠিক না হইলেও—অর্থাৎ, কোন কবিই পারেন নাই এ কথা ঠিক না হইলেও—চাই কি, কেহ কেহ পারিয়া থাকিলেও) বোধ হয় যে কবিরা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই ঈষৎ স্খলিত হইয়াছেন।" আমাদের এই কথার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, যাঁহাদিগকে পারেন নাই বলা হইল, তাঁহাদিগের সে ক্ষমতা ছিল না এরূপ বলাটা অসঙ্গত। যেথানে স্খলিত-পদ হইয়াছেন সেখানে ইচ্ছাপূর্ব্বকই হইয়াছেন বোধ হয়। ইহার প্রমাণ আমরা আলোচ্য প্রবন্ধেই কথঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছি। সেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কবিদের কেহ কেহ হয় ত বুঝিয়াছিলেন যে প্রাদেশিক ভাষায় (অন্তত বাঙ্লায়) সংস্কৃত ছন্দে কাব্য লেখা পণ্ডশ্রম, তাই অনেকেই মাঝে মাঝে দুটি একটি ক্ষুদ্র পদ্য তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, গজগতি ইত্যাদি ছন্দে লিথিয়া গিয়াছেন।* এথনও কোন কোন পত্রিকায় কথন কথন সংস্কৃত ছন্দের গুরু লঘু নিয়মে বাঙ্লা পদ্য প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সে গুলি সংস্কৃত ও বাঙ্লা উচ্চারণের থিচুড়ীবিশেষ। চেষ্টা করিলেই সংস্কৃত নিয়মে বাঙ্লা লেখা যাইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত ও প্রচলিত বাঙ্লা উচ্চারণের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য নাই বলিয়া কবিও তথন

"ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে"

* বর্ত্তমান লেখকের পঠদ্দশায় কলিকাতায় তাঁহার এক সতীর্থ একথানি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গলা কাব্য-গ্রন্থ দেথাইয়াছিলেন—কিন্তু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়ের নামই এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছি। মাত্র একছত্র মনে পড়িতেছে—

"তোমার ভাগ্যে ঘটিবে জয়শ্রী।" (ইন্দ্রবজ্রা)

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বলেন—"মাইকেলের সমসাময়িক কবি বলদেব পালিত রচিত 'ভর্তৃহরি' কাব্যে এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। যথা—

বংশস্থবিল—

তথায় ভীমাসিত বর্ম্মভূষিত
প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে।
সবিদ্যুতাগ্নি প্রলয়োন্মুখাভ্রবৎ
কৃপাণপাণি প্রহরী ব্রজে ভূমে।"

কিন্তু পালিত কবিরও ছন্দপতন হইয়াছে। চতুর্থ চরণের "ভূ" হ্রস্ব হওয়া উচিত ছিল।

নতুবা উহা সংস্কৃত ছন্দ কি বাঙ্‌লা ছন্দ তাহা জানিবার সহজ উপায় নাই। যাঁহারা এইরূপ সংস্কৃত ছন্দে লিখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্তত "সংস্কৃত নিয়মে" এই কথাটুকু গোড়াতেই বলিয়া দেন, তাহা হইলে আর পাঠকের অপ্রস্তুত হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ, সংস্কৃত উচ্চারণের যে বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, পাঠক সেই নিয়ম অনুসারে পদ্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন; বাঙ্‌লা সহজ সাধারণ উচ্চারণকে তখন কিছুকালের জন্য বিদায় দিলেই হইল! নিম্ন লিখিত শ্লোকটি সংস্কৃত নিয়মে লেখা এ কথা বলিয়া না দিলে হঠাৎ কে ইহাকে "দ্রুতবিলম্বিত" ছন্দে পাঠ করিবেন?—

অতি অনন্যপরায়ণ এ হিয়া
হৃদয়সন্নিহিতে অয়ি! অন্যথা
যদি মনে করলো মদিরেক্ষণে!
মদন বাণ হতে বধিবে তবে।

অথবা লেখক-উদ্ধৃত কবিতা লওয়া যা'ক:—
"বাসবদত্তায়"—

বরিব না ইহ নরে কহি নহি ধ্বনি করে।
নৃপবরে করপুটে, স্তুতি করে দ্রুত উঠে।

ইহা 'গজগতি'চ্ছন্দে রচিত, কিংবা শুধু "সংস্কৃত নিয়মে লিখিত" এইরূপ কিছু পূর্ব্বপরিচয় বা ইঙ্গিত না পাইলে কে চিহ্নিত বর্ণগুলির গুরু উচ্চারণ ধরিয়া পাঠ করিতে অগ্রসর হইবে?—"সদ্ভাবশতকে"—

ধন্য স্বাধীন দ্বিজ।
কি সুখ মধুপূর্ণ তব চিত্তসরসিজ।
সুখময় তব তরু কোটর।
সুধাময় তব তিক্ত ফল-নিকর।

ইহা যে সংস্কৃত 'আর্য্যা'ছন্দে রচিত তাহা টিকিট্‌মারা না থাকিলে কে হঠাৎ প্রথম ছত্রে বারো মাত্রা ধরিয়া পাঠ করিবে? উহা বাঙ্‌লায় আটমাত্রার বেশী ধরিলে নিতান্তই শ্রুতিকটু হয়। দ্বিতীয় ছত্রটায় আপত্তি উঠিবে না, কারণ উহা বাঙ্‌লা উচ্চারণের সঙ্গে মিলে, কিন্তু তৃতীয় ছত্রে আবার "কোটরে" গিয়া ঠেকিবে!

আমরা বলিয়াছিলাম—"বাঙ্‌লা ছন্দে দীর্ঘস্বরের সমস্তই গুরু উচ্চারণ করিলে নিতান্ত শ্রুতিকটু হয়।" লেখক ইহাতে আপত্তি তুলিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত দুটি একটি পদ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে এগুলি শ্রুতিমধুর এবং রবি বাবুর নিয়মে লিখিলে ইহাদের সৌন্দর্য্য থাকিত না। যথা,—

[১] বাসবদত্তা—শীতল ধরনীতল জলপাতে
ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে।*

(২) দ্বিজেন্দ্র বাবুর—
জান নাকি কদাচন মূঢ়,
কর্ণবিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ়।

আমাদের মন্তব্য:—বাসবদত্তার শ্লোকটি 'পজ্‌ঝটিকা' ছন্দে রচিত হইলেও উহার প্রথম আবৃত্তির সময় যেন কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে পড়িয়া ইতস্তত করিতে হয়। তবে হেডিং দেওয়া থাকিলে কোন শঙ্কা নাই—কারণ তাহাতে তাঁহার খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দের প্রকৃত উচ্চারণের ধাঁধা ও ক্ষণেকের জন্য "ছাড়িতে পারে।"

আর দ্বিজেন্দ্র বাবুর "কর্ণবিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ়" তাহা বিজ্ঞ ভুক্তভোগীরাই বলিতে পারেন; তাহা "জানি নাক কদাচন, মূ'ঢ়" আমরা! এই ছত্র দুইটির কি ছন্দ তাহা শ্রীনিবাস বাবু উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ইহার শ্রুতিমধুরতা ছন্দের জন্য, না ছন্দোভঙ্গের জন্য, না বাঙ্‌লা উচ্চারণ বিকৃতির জন্য, ভাল বুঝিতে পারা গেল না।

যাহা হউক, আমরা ভারতচন্দ্র, মদনমোহন, 'সদ্ভাব-শতক'কার কিম্বা দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিন্দা করিতেছি না। তাঁহারা ভাবের উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগে অনেক স্থলেই সংস্কৃত ছন্দের চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য বাঙ্‌লায় তোটকাদি ছন্দে রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদের বক্তব্য ছিল বাঙ্‌লা ছন্দে সংস্কৃতের গুরু লঘুত্ব লইয়া। কিন্তু শ্রীনিবাস বাবুর আপত্তি ভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে বলিয়াই এইরূপে দেখাইলাম যে যখন সংস্কৃত ছন্দেই বাঙ্‌লা শব্দের স্বাভাবিক গুরু লঘু উচ্চারণ পদে পদে পর্য্যুদস্ত হয়, তখন বাঙ্‌লা ছন্দে সমস্ত দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণই সংস্কৃতভাবে করিলে কত শ্রুতিকটুই না হইতে

* ইহার সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া বাঙ্‌লা ছন্দেও আনা যাইতে পারে। যথা—
শীতল ধরণী জলধারা পাতে
ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে।

পারে! এই জন্যই আমাদের কবি অসামান্য প্রতিভা বলে ভাষার অন্তর্নিহিত উচ্চারণের 'অমিয় উৎস' হইতে ছন্দের স্রোতোধারা বহাইয়াছেন—ইহাতে সংস্কৃতের নিয়ম কতকটা ভাঙিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষার উর্ব্বরতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যে সহস্রগুণে বাড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এই যে, সংস্কৃতে যেমন গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই গুরুলঘুভেদ সমান, তেমনি রবি বাবুর নিয়মেও বাঙ্‌লা গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ 'প্রায়' এক; এবং তাহাই কি বাঞ্ছনীয় নয়? বোধ হয় ভাষা মাত্রেরই এই রীতি; তবে অনন্ত শব্দ-সিন্ধুর মধ্যে সামান্য দুচারিটি বিন্দুর অসঙ্গতি অনেক ভাষারই থাকিতে পারে; তাহাতে কিছু আসে যায় না।

কথা উঠিয়াছে, রবীন্দ্র বাবুর নিয়মে বাঙ্‌লায় সংস্কৃত ছন্দ সর্ব্বত্র ঠিক রাখা যায় না। তাহার উত্তর এই—বাঙ্‌লায় অন্য কোন্ কবির নিয়মে তাহা পারা যায়? যাঁহারা সংস্কৃত ছন্দে লিখেন তখন বাঙ্‌লা শব্দের হ্রস্ব দীর্ঘ একরূপে ধরেন, আবার পয়ার ইত্যাদিতে অন্যরূপে গুরু লঘু উচ্চারণ ধরেন। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" কি সংস্কৃত নিয়মে লেখা? অথচ "ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে" আকার একার দীর্ঘ সংস্কৃত নিয়মে ধরা হইয়াছে। রবি বাবু সংস্কৃত ছন্দে লিখিলে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতেন সে প্রশ্ন উত্থাপনের আবশ্যকতা কি? তবে স্বীয় নিয়মে চলিলেই যে তাঁহার লেখনী 'স্বাধীন স্ফূর্ত্তির' অধিকতর অবকাশ পাইত তাহার সন্দেহ নাই। রবি বাবু তোটক প্রভৃতি ছন্দে ছত্রশেষে গুরুবর্ণ সহজে পাইতেন না বটে—কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে তাঁহার যেখানে একবার পদস্খলনের সম্ভাবনা, সেখানে অন্যান্য কবিরা বাঙ্‌লা শব্দের অযথা উচ্চারণ করিয়া পদে পদে পতিত হইবেন। আর তিনি যদি সংস্কৃত নিয়মেই সমস্ত বাঙ্‌লা শব্দের উচ্চারণ ধরিয়া লিখেন তবে অন্যেরও যে দশা তাঁহারও সেই দশা!

আমরা লিখিয়াছিলাম—সাধারণত পয়ারের কম অক্ষর হইলে রবি বাবু গুরু লঘু ভেদে কবিতা লিখিয়া থাকেন। আর, যতি আট অক্ষরের কমে পড়ে, তবে পয়ারাধিকে ও পয়ারেও কখন কখন গুরুলঘুভেদে লিখিয়া থাকেন।—সমালোচক বলেন "কথাটা সর্ব্বাংশে ঠিক নহে।"

আমরাও বলি, তিনি যেরূপে আমাদের নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছেন "তাহাও সর্ব্বাংশে ঠিক নহে।" কারণ আমরা উহা ছাড়া আরও লিখিয়াছিলাম—"পংক্তি সকলের ক্ষিপ্রগতি, অথবা শব্দের ঝঙ্কারের উপর ঝোঁক দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও এই নিয়মে চলিয়া থাকেন।"

সুতরাং তিনি যে সকল স্থলে আমাদের নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সে সব স্থলে বাস্তবিক কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাই। যথা,—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল,
ঊর্দ্ধে পাষাণ তট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

এখানে ছত্রের ক্ষিপ্রগতি ও শব্দের ঝঙ্কারে ঝোঁক দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া পয়ার * মাত্রামিত।

* রবি বাবুর "আমরা ও তোমরা" নামক কবিতা হইতে আমরা—

"অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গ পাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।"

প্রভৃতি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া এক স্থলে বলিয়াছিলাম, ইহা পয়ার। কারণ মাত্রা হিসাবে প্রতি পংক্তি চৌদ্দ অক্ষর। লেখক ইহা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই এই অপরাধে দুইটি শ্লোক রচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—চৌদ্দ অক্ষর হইলেই যদি পয়ার হয় তবে এ গুলিও কি পয়ার?—

নং ১, "পাখী সব গাহে গান আপন মনে,
বালিকা বধূ ঘাটে যায় শাশুড়ীর সনে।"
নং ২, "কেঁদ না প্রাণ তব হইবে না রাঁধিতে,
চিবা'য়ে চাল আমি শুয়ে রব নিশিতে।"

আমাদের মন্তব্য:—বর্ত্তমানে চৌদ্দ অক্ষরেই যে 'পদ্য' হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রাচীন কালে পয়ারে চৌদ্দ অক্ষরের কম হইলেও হইত বেশি হইলেও হইত। প্রমাণ অনাবশ্যক! ভারতচন্দ্র যে নিয়মে পয়ার রচনা করিয়া গিয়াছেন, এখনকার কবিরাও অধিকাংশ স্থলে সেই পথেই চলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের কবি যতি ছয় অক্ষরে ফেলিয়া, অবশিষ্ট আট অক্ষর প্রায়শ তিন শব্দে ৩ + ৩ + ২ সংখ্যায় নির্দ্দেশিত করিয়া, অনেক স্থলে পয়ার লিখিয়া থাকেন। রবি বাবুর উল্লিখিত কবিতার ছত্রগুলিরও এই নিয়ম—সুতরাং ইহাকে "সমহ্রস্ববিরাম" পয়ার বলিলে ক্ষতি কি? আর শ্রীনিবাস বাবু যদি অভয় দেন, তবে তাঁহার রচিত পদ্য দুইটিরও নাম করণ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমে জিজ্ঞাস্য, ১নং পদ্যে "বালিকা বধূ ঘাটে যায় শাশুড়ীর সনে" কি চৌদ্দ অক্ষর হইয়াছে? প্রাচীন নিয়মের হইলে ইহা "গঙ্গাজলী" পয়ার; নব্য নিয়মের হইলে এটি "শ্বশ্রূ-চরণ-ভঙ্গ" পয়ার! ২নং পদ্যে কোন হাঙ্গামা নাই, সুতরাং তাহার নাম "চা'ল চর্ব্বণ" পয়ার রাখা গেল।

"শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি';
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।"

এখানেও ছত্রসমূহের ক্ষিপ্রগতি বশতই কবিতা মাত্রামিত।

"কেন আন বসন্ত নিশীথে
আঁখি ভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?" [মানসী—৬৫ পৃ]

ইহার প্রথম দুই ছত্র পয়ারের অপেক্ষা কম অক্ষর বটে, কিন্তু যতি ছত্র শেষেই পতিত হইতেছে; এবং ইহাতে এমন একটি "আবেশ বিহ্বলতা" আছে যাহাতে করিয়া ছত্রগুলির গতি এইরূপ মৃদুমন্থর; সুতরাং ইহা বর্ণবৃত্ত।

আমরা "সাধারণতঃ" "প্রায়শঃ" ইত্যাদি কথা দ্বারা আমাদের বক্তব্য মোটামুটি ভাবে পাঠকসাধারণকে নিবেদন করিয়াছিলাম, তাহাতে একেবারেই প্রতিপ্রসব নাই, বা থাকিতে পারে না, এরূপ মনে করাই অন্যায়। কিন্তু শ্রীনিবাস বাবু এই "স্থূল কথা" বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছেন "কবি কোন্ স্থলে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে কবিতা লেখেন, এবং কখন লেখেন না, তাহা আলোচনা করিবার এখনও সময় আসে নাই।" অথচ প্রবন্ধের আরম্ভেই সমালোচক মহাশয় মনে করিয়াছেন "রবি বাবুর লেখা সম্বন্ধে যত বেশী আলোচনা হয়, ততই দেশের গৌরব ও বাঙ্গালীর গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রকাশ পায়।" তাঁহার এই উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? অধিকন্তু রবি বাবু ভবিষ্যতে কিরূপ ছন্দে লিখিতে পারেন তাহারও আভাস ইঙ্গিত সমালোচক মহাশয় দিয়াছেন!

তারপরে শ্রীনিবাস বাবুর একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর। "কোন কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উহা গুরু-লঘুভেদে লিখিত কি না তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি? উত্তর---নাই।" আমাদের মন্তব্য :---এমন কোন ভবিষ্যদ্বিৎ পাঠকই নাই যিনি পড়িবার "পূর্ব্বেই" সব জানিতে পারেন। যাহা হউক কবিতা পাঠ আরম্ভ করিয়াই নিপুণ পাঠকের তাহা বুঝিতে পারা আবশ্যক বটে---সংস্কৃতেও তাহা পারা যায়। রবি বাবুর নিয়মেও তাহা পারা যায়। "সোনার তরী"র "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা" এই প্রথম ছত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারা যায় যে এটি মাত্রামিত কবিতা—তজ্জন্য সমালোচক মহাশয়ের মত, দুই তিন পৃষ্ঠা দৌড়িয়া শেষে "শূন্য নদীর তীরে" পড়িয়া যদি পাঠটি ঠিক ধরিতে পারা যায়, তবে পাঠকের নিপুণতার নিতান্তই প্রশংসা করিতে পারি না।

শ্রীনিবাস বাবু এইরূপ আরও অনেক কবিতা পাঠের গোলযোগে পড়িয়াছেন :--

(১) (মানসী)—

প্রভাতের আলোকের মনে
অনাবৃত প্রভাত গগনে
বহিয়া নূতন প্রাণ ঝরিয়া পড়ে না গান
ঊর্দ্ধ নয়ন এ ভুবনে।

শ্রীনিবাস বাবু বলেন,---ইহা লঘুগুরুভেদে লিখিত কবিতা এবং রঙ্গলালের "একতায় হিন্দুরাজগণ" প্রমুখ কবিতাটির ছন্দের সঙ্গে মিলে না, কারণ "ঊর্দ্ধ" এই শব্দটি তিন অক্ষরের সমান। আমরা বলি, ইহা মাত্রামিত কবিতা নহে—"ঊর্দ্ধ" শব্দের উপর কিঞ্চিৎ মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া কবি এখানে উচ্চারণ অনুমোদিত দীর্ঘ পাঠই প্রশস্ত ধরিয়াছেন মাত্র।

(২) সোনার তরী—

"দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যে বেলা
শৈশবে কত গল্প কত বাল্য খেলা।"

শ্রীনিবাস বাবু বলেন "এখানে হঠাৎ 'শৈশবে'র ঐকার গুরু ধরা হইয়াছে।" আমরা বলি, এই শ্লোকটির ক্ষিপ্রগতি নাই, সুতরাং ইহা মাত্রামিত নহে। আমাদের মতে, এখানে ছাপাখানার প্রেতের দৌরাত্ম্যে "শৈশবে" শব্দের পরে একটি "র" পঞ্চত্ব পাইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ঐকার লঘু নয়—কারণ সাধারণত বর্ণবৃত্ত পয়ারে দীর্ঘস্বরের যথেষ্ট অবসর থাকে। "শৈশবে"র ঐকার গুরুই ধরিতে হইবে—তথাপি তাহার পরে একটি অক্ষরের আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই অক্ষরটি "র"। পড়ুন,—

শৈশবের কত গল্প কত বাল্য খেলা।

সমালোচক, সোনার তরীর "সুপ্তোত্থিতা" নামক কবিতার "কে পরালে মালা" এই চরণটির "কে" শব্দটিকে দুই বর্ণের সমান ধরা হইয়াছে বলিয়াছেন। আমরা বলি

এখানে এই চরণটি কবিতার একটি "উপ" চরণ, সুতরাং ইহাতে অন্যান্য চরণের সঙ্গে অক্ষরের মিল না ধরিলেও ক্ষতি নাই। পড়িবার সময় "কে" র একটু টানা উচ্চারণ হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে দুই মাত্রা না ধরিলেও চলে।

যাহা হউক শ্রীনিবাস বাবু একাধিক বার স্বীকার করিয়াছেন যে, "অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এ সব কবিতা পড়া কষ্টকর হইবে, এমন বলিতে পারি না।" কিন্তু ইহা নব নিয়মের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তাহা ভাল জানা গেল না। কারণ, সমালোচক মহাশয় নীচের কবিতাটি কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের "রাত পোহাল ফরসা হল, ফুটলো কত ফুল" ইত্যাদি কবিতার নাচুনী-ছন্দে লিখিত মনে করিয়া পড়িতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তৃতীয় চরণে আসিয়াই নাকি 'অপ্রস্তুত' হইয়াছেন! দুই চরণ "উজাইয়া গিয়া" আবার নূতন করিয়া গুরু লঘু মানিয়া পড়িয়াছেন!—

সন্ধ্যা পবন কুঞ্জ ভবন
নির্জ্জন নদী-তীর,
আর চাহি শুধু বুক ভরা মধু
ভালবাসা প্রেয়সীর।

আমরা কিন্তু আশা করি, অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রই "সন্ধ্যা পবন কুঞ্জ ভবন" পাইয়াই 'মাত্রা' বুঝিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবেন। শেষ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া পুনর্ব্বার 'উজাইয়া' "নির্জ্জন নদী তীরে" যাইতে হইবে না। সোজা কথায়, ইহা যে দীনবন্ধু মিত্রের "রাত পোহাল" কবিতার ছন্দে লিখিত নয় তাহা প্রথমেই সহজেই বোঝা যায়।

শ্রীনিবাস বাবু পরিশেষে নীচের কবিতা (!) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন এইরূপ উজাইয়া যাওয়া নাকি বাঙ্‌লা কবিতার নূতন নহে :—

"কড় কড় নড় নড় বহিছে ঝড়,
পড়ে ঘর কোঠা বাড়ী গাছ বড় বড়।"

কিন্তু আমরা এবম্প্রকার কবিতার ঝড়ে পড়িয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও শঙ্কিত হইয়াছি, তাই আর না উজাইয়া আজকার মত এই খানেই নৌকা ভিড়াইলাম!

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

টেলি—ফটোগ্রাফি।

আমি বলিয়াছিলাম ফটোগ্রাফেরও টেলিগ্রাফের ক্ষমতা আছে। ফটোগ্রাফ্ টেলিগ্রাফের মত দূরের সংবাদ নিমেষ মধ্যে আনিয়া জানাইয়া দেয়। (১৩০৮ চৈত্রের প্রদীপ)। আজ এতৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

লণ্ডনের "রয়াল ফটোগ্রাফিক্ সোসাইটি" অল্পদিন হইল একটি প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন; তাহাতে 'মণ্ট ব্লাঙ্ক' পাহাড়ের এক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহার নীচে লেখা ছিল ৫০ মাইল দূর হইতে গৃহীত। ফটোখানি কিন্তু বেশ সুস্পষ্ট, প্রত্যেক দ্রব্য ও দৃশ্য স্পষ্টদৃশ্য,—৫০ মাইল দূর হইতে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ইহা দর্শক মাত্রেরই ধারণার অতীত হইয়াছিল। তখন অনেকে উক্ত ফটোগৃহীতা Dallmeyer সাহেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

Mr. T. R. Dallmeyer F. R. A. S. রয়াল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি। তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে অমর হইয়াছেন। ফটোগ্রাফের সাধারণ যন্ত্রে দূর হইতে ছবি তুলিলে, ঈপ্সিত একটি দ্রব্যের ছবি লইবার সুবিধা হয় না, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বহু দৃশ্য সেই ছবিতে স্থান অধিকার করিয়া ঈপ্সিত পদার্থকে ক্ষুদ্র ও অস্পষ্ট করিয়া দেয়। বড় করিয়া ছবি লইতে হইলে আবার দূর হইতে কার্য্য চলে না, নিকটে কল পাতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা Dallmeyer সাহেবের আবিষ্কার দ্বারা অপনীত হইয়াছে।

Dallmeyer তাঁহার যন্ত্রের নাম রাখিয়াছেন 'Telephoto-graphic lens'. গ্রীক্ 'টেলি' শব্দের অর্থ 'দূর'। দূর হইতে ফটোগ্রাফ লওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম তিনি "টেলি-ফটোগ্রাফ" রাখিয়াছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র যেমন দূরবস্তু বীক্ষণে আমাদের চক্ষুকে সাহায্য করে, Dallmeyer সাহেবের lensও তেমনি ফটোগ্রাফের যন্ত্রকে সাহায্য করিয়া থাকে—ইহা ফটোগ্রাফ যন্ত্রের পক্ষে

টেলিস্কোপ-স্বরূপ। দূরবীক্ষণ কতকগুলি lens ভিন্ন আর কিছুই নহে; ঐ সকল lens এর সাহায্যে প্রকৃত পদার্থের একটা প্রতিচ্ছায়া বড় হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। 'টেলি-ফটোগ্রাফিক লেন্সে'ও প্রকৃত পদার্থের একটা বৃহৎ প্রতিচ্ছায়া শূন্যে সৃষ্ট হয় এবং সেই শূন্যসৃষ্ট প্রতিচ্ছায়ারই ছবি ফটোপ্লেটে উঠিয়া যায়, অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই লেন্স দূরস্থ দ্রব্যকে নিকটস্থবৎ করিয়া দেয় মাত্র, ইহার আর কোন উপকারিতা নাই।

Dallmeyer বলেন যে সাধারণ যন্ত্রে দুই মাইল দূর হইতে গৃহীত ফটোকে (enlarged) করিলে যে ফল হইয়া থাকে 'টেলি-ফটো' যন্ত্র সেই ব্যবধান হইতে ব্যবহার করিলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছবি হইয়া থাকে, অথচ একেবারেই বড় চিত্র পাওয়া যায় বলিয়া পরিশ্রমেরও অৰ্দ্ধেক লাঘব হয়।

ছায়াবাজির (Magic Lantern) চিত্র অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহা কিঞ্চিৎ দূর হইতে দেখিলে বেশ সুস্পষ্ট মনে হয়। নিকটে যাইলে বড় লেপা, জড়ান অস্পষ্ট দেখায়। ফটোহাফটোন চিত্রও এইরূপ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। হাফটোন চিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর ঘন ও বিরল সন্নিবেশে সৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল বিন্দুকে ইংরাজিতে 'গ্রেন' (grain) বলে। হাফটোন চিত্র চক্ষুর নিকটস্থ করিলে এই সব বিন্দু বিরল-সন্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে চিত্রে আলো ও ছায়ার ব্যতিক্রম হওয়ায় দ্রষ্টব্য বিষয় সম্যক উপলব্ধি হয় না বা অস্পষ্ট বোধ হয়। যেখানে আলো সেখানে বিন্দু সমাবেশ বিরল, ও ছায়াস্থানে বিন্দু সমাবেশ ঘন হইয়া থাকে। সাধারণ ফটো যদি বড় করা যায় তাহা হইলে সে চিত্রেও 'গ্রেন' সকল ফাঁক ফাঁক ভাবে সজ্জিত হওয়ায়, নিকট হইতে চিত্র বড় লেপা ও অস্পষ্ট বোধ হয়, দূর হইতে ঠিক দেখায়। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য ১ম বর্ষের ১০।১১ সংখ্যা প্রদীপে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী রচিত "হাফটোন ছবি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু 'টেলি-ফটো' সকল দূর হইতে ত' ভাল দেখাইবেই, নিকট হইতেও অস্পষ্ট দেখায় না, কারণ তাহারা খুব বড় দ্রব্যের (বা প্রতিচ্ছায়ার) নিকট হইতে গৃহীত বড় ছিত্র। ছোট চিত্রকে বড় করা নহে।

'টেলিফটোগ্রাফ' যন্ত্রে ছবি লইতে সাধারণ ফটোগ্রাফ যন্ত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সময় আবশ্যক হয়, এজন্য অনেকে উহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু Dallmeyer ও তাঁহার শিষ্যবর্গ জীবন্ত প্রাণীর সুন্দর সুন্দর চিত্র ১ সেকেণ্ড সময়মধ্যে লইতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহাকে বর্ত্তমান Instantaneous ফটোর প্রায় সমকক্ষ বলা যাইতে পারে *।

'টেলি-ফটোগ্রাফির' লেন্স সম্বন্ধে এখনো কিছু জানা যায় নাই, কালে তাহা অপ্রকট থাকিবে না। এক্ষণে Dallmeyer ইহা প্রকাশ করিতেছেন না; তবে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ইহা অধিক দিন গোপন থাকিবে না নিশ্চিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি (Mont Blank) মন্ট ব্ল্যাঙ্কের ছবি ৫০ মাইল দূর হইতে লওয়া হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে ২০।৩০ মাইলের খবর আমরা ঘরে বসিয়া পাইতে পারিব। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার বড় আদর হইয়াছে। দূর হইতে, গোলাগুলির আয়ত্তাতীত হইয়া, স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ-বার্ত্তা সংগ্রহ করিতে 'টেলি-ফটোগ্রাফি' পরম সুহৃৎ, চীন-জাপানের যুদ্ধ কালে প্রথম এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। জাপান গবর্ণমেণ্ট ইহা লইয়া যান। জাপান, চীনের যে "টি-ইয়েন" নামক বৃহৎ রণ-পোত ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহা যে সময় ডুবিতে ছিল, ঠিক সেই সময় দুই মাইল দূর হইতে তাহার এক বৃহৎ ছবি তুলিয়া জাপান নিজের ও Dallmeyer সাহেবের কীর্ত্তিকে দীর্ঘজীবী করিয়াছেন। তৎপরে আমেরিকা ও স্পেনের যুদ্ধে (ফিলিপাইন দীপপুঞ্জ লইয়া) ইহা Mr Dwight L. Etmendorf কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। এই Etmendorf ৩০ মাইল দূর হইতে ছবি তুলিয়াছিলেন। গত ট্রান্সভাল যুদ্ধে ইহার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইয়াছে। সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ সকলেই এক একটি যন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন। যুদ্ধ বিভাগ হইতেও বহু যন্ত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, দূর হইতে বেলুনে বা পর্ব্বতে চড়িয়া শত্রুর গতিবিধি দুর্গের অবস্থান, রক্ষণাদির সন্ধান সংগ্রহ করা হইয়াছিল, অথচ শত্রুগণ ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

বেলুনে চড়িয়া এই যন্ত্রদ্বারা ছবি গৃহীত হইতে পারে। ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ যন্ত্রে এরূপ হওয়া সুকঠিন, কারণ, বেলুন গতিশীল বলিয়া যন্ত্র নড়িয়া যায়, তাহাতে সাধারণ যন্ত্র গৃহীত ফটো জীবন্ত ও স্পষ্ট হয় না।

* ফটো প্লেট তিন প্রকার প্রস্তুত হয়—(১) ordinary বা বিলম্ব, (২) rapid বা দ্রুত (৩) instantaneous বা তৎক্ষণ।

Mr. W. K. Dickson এই যন্ত্র-সাহায্যে বহু চিত্র তুলিয়া "Biograph & Mutoscope Co,"কে দিতেছেন, এবং তাহার কিঞ্চিৎ আভাস কলিকাতার Biograph বা বায়োস্কোপে পাওয়া গিয়াছে।

নিরাপদ থাকিয়া যুদ্ধ-সংবাদ সংগ্রহ করার পক্ষে এমন সুবিধা পূর্ব্বে ঘটে নাই। ইহার আদর য়ুরোপের সকল রাজ্যেই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইহা শান্তি ও সংগ্রাম উভয় কালেই বহু সাহায্যে লাগিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

জ্যোতির্বিদগণ কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছেন, বেলুনে উচ্চে উঠিয়া এই যন্ত্র-সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের ফটো যে বহু নূতন তথ্যাবিষ্কারের সাহায্যকারী হইবে, তাহাতে তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক Dallmeyer তাঁহার এই অভিনব আবিষ্কার দ্বারা সভ্য জগতের বহু উপকার করিতে সক্ষম হইবেন এবং তাহারাও তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিবে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফুলকুমারী।

আমার নাম ফুলকুমারী, আমার ভাই ভগিনী অসংখ্য। সকল ভাই ভগিনীই আমার সহোদর সহোদরা নহে; অনেকেই বৈমাত্র। কিন্তু আমার সকল ভগিনীই আমার মত ফুলকুমারী, ভ্রাতারা ফুলকুমার। আমাদের বংশ অতি পুরাতন। আমাদের বংশের যে, কবে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তবে এটা স্থির যে, পৃথিবী মানবে পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, আমাদের আদি পিতা মাতার এখানে আবির্ভাব হইয়াছিল। শুনিতে পাই, তাঁহারা স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আসিয়াছিলেন। আমাদের কুলবংশের কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, একটা দৃষ্টান্তেই তাহা বুঝিতে পারিবে। উদ্যান-ফুলের ত কথাই নাই, বিলাতের মত শীতপ্রধান দেশেও এখন বনফুল ২ হাজার বংশে বিভক্ত। দেবতাদের সঙ্গেই আমাদের আত্মীয়তা অধিক; দেবতারাই আমাদের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন, এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও তাই আমরা এখনও দেব দেবীর সেবা করিয়া থাকি, করিতে ভালও বাসি। দেব দেবীরাও আমাদিগকে বড় ভাল বাসেন, বড় আদর করেন। আমরা যাই তাঁহাদিগের পদচুম্বন করিতে, তাঁহারা কিন্তু আমাদিগকে বুকে করিয়া রাখেন; আমাদিগকে তাঁহার মাথায় বসান। দেবতার দেখাদেখি, মর্ত্তের নর নারীও আমাদিগকে আদর করিতে শিখিয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে যত জীব জন্তু আছে, তাহার মধ্যে মানবই দেবতার আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বে মানব, দেবেরই মত, শুদ্ধচিত্ত ছিল। এখন মানবসমাজে পাপের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু এখনও নর অপেক্ষা নারীর হৃদয় মন অধিক বিশুদ্ধ—অধিক নির্ম্মল—অধিক পবিত্র। এই জন্যই, এখন মর্ত্ত্যলোকে আমরা নর অপেক্ষা নারীর কাছেই যাইতে ভালবাসি; নারী-হস্তের স্পর্শে আমরা কষ্টবোধ করি না। মানবীরাও, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবীর মত সাজিয়া থাকেন। আমরাও মানবীদিগকে ভালবাসি। কিন্তু দেব দেবীর যেরূপ চরণ-স্পর্শ করিতে ভালবাসি, আমরা মানব মানবীর সেরূপ চরণ-স্পর্শ করিতে ভালবাসি না। আর আমরা দেবতার মাথায় বসিতে পাই বলিয়া, বুদ্ধিমতী মানবীরাও কদাচ আমাদিগকে পদস্পর্শ করিতে দেন না। মানব-সমাজের পুরুষেরাও আমাদিগের আদর করেন, কিন্তু আপনাদের জন্য তত নহে, যত মানবীদিগের জন্য। মানবীরাইত মানবসমাজের দেবী।

একটু পরিচয়।

প্রথমেই বলিয়াছি, আমরা যত ভগিনীই ফুলকুমারী, যত ভ্রাতাই ফুল কুমার। কিন্তু সাধারণ নামে ঐক্য থাকিলেও আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বংশগত ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বলিয়াছি আমরা সকলেই সহোদরা নহি। আমার ভ্রাতারাও সকলে সহোদর নহে। আবার বৈমাত্র ছাড়া আমাদের অন্য ভাই ভগিনীও অনেক আছেন, আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব অসংখ্য। আমাদের মধ্যে

কেহ কেহ গোলাপকুলে জন্মগ্রহন করিয়াছেন, কেহ কেহ কমলকুলে, কেহ কেহ চম্পককুলে, কেহ কেহ মল্লিকাকুলে, কেহ কেহ যুথিকাকুলে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কুলও আছে আমাদের অসংখ্য, আবার, এক কুলেই ভিন্ন বংশ হইয়াছে। এই ধর না কেন, আমারই গোলাপ-কুলেই কত বংশ! এই গোলাপ-বংশ পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ভারতেই আমাদের কত বংশ! বংশ পারস্যে আছে, তুরস্কে আছে, ইউরোপে আছে, চীনে আছে, জাপানে আছে; আছে অনেক স্থানে। আবার সর্ব্বত্রই আমাদের বংশের নানাবিধ শাখা দেখিতে পাইবে। তুরস্কে যাও, বসোরাবংশে ভিন্নভিন্ন শাখা দেখিতে পাইবে। ইউরোপে যাও, বুলগেরিয়ায় নানা শাখা নয়নগোচর করিতে পাইবে। আবার ইউরোপেরই ফরাসিদেশে যে সকল শাখা দেখিতে পাইবে, হয়ত ইতালি-দেশে তাহার সমস্ত দেখিতে পাইবে না। একটা রহস্যে তোমরা বিস্মিত হইবে। যে বিলাত এখন দেব-ভূমি বলিয়া পরিচিত, সে বিলাতে আমাদের কুলীনবংশ পূর্ব্বে ছিল না। সে দেশের জল বায়ু আমাদের সহ্য হইত না। এরূপ অনেক স্থান আছে, যেখানকার জল বায়ু আমাদের গোলাপবংশের পক্ষে একান্ত অসহ্য। কিন্তু বিলাতের দেব দেবীরা অনেক কষ্টে এখন আমাদিগকে বাস করা-ইতেছেন। পূর্ব্বে কেবল বন-গোলাপ বিলাতের স্থলে স্বয়ং জন্মিত। গোলাপকথা পরে শুনিও।

অসবর্ণবিবাহ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা সকল সমাজেই বিপ্লব ঘটাইতেছে। মানবসমাজের ন্যায়, আমাদের ফুলসমাজেও অসবর্ণ-বিবাহের ধূম লাগিয়াছে। অসবর্ণবিবাহের জন্য, আমা-দের বংশের নানারূপ অবান্তরবংশ উৎপন্ন হইতেছে। এখনকার ফুলসমাজে এই জন্যই তোমরা নানা প্রকৃতির নানা আকৃতির নানা গুণের নানা বর্ণের গোলাপ-কুমার এবং গোলাপ-কুমারী দেখিতেছ। নানা অবান্তর-বংশের নানারূপ নাম-করণ হইয়াছে। যুগধর্ম্মের অদ্ভুত মাহাত্ম্য, পাশ্চাত্য সভ্যতার অপূর্ব্ব মহিমা! অসবর্ণ বিবাহে যে সকল কুমার কুমারীর উৎপত্তি হইতেছে, পাশ্চাত্য সমাজে তাহাদিগেরই আদর অধিক। পাশ্চাত্য সমাজে অসবর্ণ বিবাহের বড় আদর, অসবর্ণজাত বংশেরও বড় খাতির। কেবল মানব সমাজেই নহে, পশু সমাজেও পক্ষি-সমাজেও অসবর্ণ বিবাহের ধূম লাগিয়াছে। দেখিতেছ না, কুকুরবংশে কত জারজবংশ আবির্ভূত হইয়াছে। অশ্বগবাদিবংশেও ত অসবর্ণজাত বংশভেদের অভাব নাই। পক্ষিসমাজেও অভাব দেখিতে পাইবে না। উদ্ভিজ্জ সমাজেও অসবর্ণবিবাহের প্রচলন হইয়াছে। এখনকার পাশ্চাত্য বিবাহ প্রথায় বাধা বন্ধন বড় কম। যাহাকে তোমরা ব্যভিচার বল, কোন কোন পাশ্চাত্য সমাজে তাহাও বিবাহ। আমার ফুলসমাজেও এরূপ বিবাহ অনে-কের হইয়া থাকে। এখনকার অনেক ফুলকুমার ফুল-কুমারী তোমাদের বিবেচনায় হয় ত জারজ-পর্য্যায়ে পরি-গণিত হইবে। আমার নিজ গোলাপবংশেও তুমি এইরূপ জারজ জারজা অনেক দেখিবে। কিন্তু পাশ্চাত্যসমাজ তোমার বিচার সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য করিবেন না। অতএব, তুমি আর বৃথা অপদস্থ হইও না, জারজ অজারজের ভেদ করিবার জন্য বিব্রত হইও না। তোমার ভারতেও ত অসবর্ণ-বিবাহ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার ব্রাহ্ম-সমাজে ত অনেক স্ত্রী পুরুষকে অসবর্ণবিবাহে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। খৃষ্টানসমাজেও ত অসবর্ণবিবাহের অভাব নাই। এরূপ বিবাহের সন্তানদিগকে ত তুমি এখন আর জারজ বলিতে পার না। ঘরে বসিয়া সকলেই রাজার নামে ডাইন বলিতে পার; তুমি যদি প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম খৃষ্টানদিগের অসবর্ণ বিবাহজাত সন্তানগণকে জারজ বল, তাহা হইলে ডিফামেসনে পড়িয়া জেলে যাইবে। আমাদের ফুলসমাজও ডিফামেসন বুঝেন। আর জগতে যত রাজা রাণীর সহিত আমাদের আত্মীয়তা। ইংরেজ আমাদের রাজা, ইংরেজ মহিষী আমাদের রাণী; ইঁহারাইত তোমাদিগেরও রাজা রাণী। বড়দিনের সময়ে আমাদের আদর দেখিয়াছিলে? কলিকাতায় এমন সাহেব বিবী ছিলেন না, যাঁহারা আমা-দিগকে বুকে করিবার জন্য পাগল হন নাই। স্পর্শসুখ যাঁহা-দের ভাগ্যে ঘটে নাই, তাঁহারা আমাদিগের রূপ দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। আমাদের দর্শনীর হার কত বাড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়াছিলেন কি? এক দিকে টাকা এক দিকে আমরা। তৌলদাঁড়ীর এক দিকে এক একটী গোলাপকুমারী বা গোলাপকুমারকে চড়াইয়া, অন্যদিকে

টাকা চড়ান হইয়াছিল। তথাপি, আমাদের মন উঠে নাই। তথাপি আমরা সাহেব বিবীদের কাছে যাইতে চাই নাই। এত আদর আর কাহারও দেখিয়াছ কি?

তাই বলিতেছি, সাবধান হও, ডিফামেশনে পড়িও না। ফুলসমাজ যদি একবার বিচলিত হন, তাহা হইলে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে; মর্ত্তের দেবতা—রাজা ইংরেজ তোমাদের মুণ্ডপাত করিবেন। আবার স্বর্গের দেবতাও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। ইহকালে হইবে কারাবাস, পরকালে নরকবাস! আর, অভিসম্পাতেও তোমাদের নিপাত হইবে। বুঝিয়া রাখ, আমাদের ফুল-কুলে ব্যভিচার নাই, জারজ নাই, অবসর্ণ বিবাহ আমাদের ফুলশাস্ত্রে ধর্ম্মসম্মত। যাহা পাশ্চাত্য দেবকুলে প্রচলিত, আমাদের ফুলকুলেও তাহা প্রচলিত।

গোলাপসুন্দরী।

তোমাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছি, আমাদের ফুলজাতি নানা বংশে বিভক্ত। গোলাপবংশই রূপে গুণে ধনে মানে গন্ধে গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি যে, এই শ্রেষ্ঠবংশের—জগদ্বিখ্যাত গোলাপবংশের ফুলকুমারী, আমি ফুলকুমারী যে, গোলাপ-সুন্দরী; তাহা তোমরা আমার কথার ভাবে পূর্ব্বেই বুঝিয়াছ। একে আমি রমণী, তাহাতে সুন্দরী; তাহাতে জন্মিয়াছি রাজবংশে। আমার আত্মশ্লাঘা তোমা-দিগকে সুতরাং একটু সহিতে হইবে। তোমাদের মানবসমা-জেও ত কুলীনের গৌরব অধিক। হিন্দুকুলে কি কুলীন-ললনা একটু গর্ব্বিতা হন না? কুলীনের মেয়েদের একটু বাচালতা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাও। আমাকে দোষ দিলে চলিবে কেন? তোমারা যাহাই বল, আমি কুলীন-তনয়া, সুন্দরী, রাজদুহিতা গোলাপসুন্দরী। আমার বংশের—আমার বিশ্ব-বিখ্যাত গোলাপবংশের কথা অগ্রে কহিব; আর গোলাপবংশের কথাই অধিক করিয়া কহিব। শুনিতে না চাও, অন্যত্র যাও।

"উড়ে গিয়ে বসো ভ্রমর কেতকীর ফুলে।" মল্লিকা মালতী যাতি যূথি রজনীগন্ধা প্রভৃতি আমার কাছে অগ্রাহ্য। অন্যের মজলিসে ইহারা উচ্চ উচ্চ আসন পাইতে পারে, আমাদের মজলিসে ইহাদিগকে দাসী বাঁদীর মত থাকিতে হয়। কমলিনী জলের আদরিণী, স্থলের তিনি কে? আর কমলিনী ত কলঙ্কিনী, অমন সোনারচাঁদ স্বামী সূর্য্য থাকিতে যে কমলিনী কালো ভোমরাকে দেখিয়া ভুলিয়া যায়; সন্ধ্যাগমে সূর্য্যকে বিদায় দিতে না দিতে, ভোমরাকে নিজের গাউনের ভিতর লুকাইয়া রাখে। সারা রাত্রি সেই কৃষ্ণবর্ণ উপপতিটাকে বুকের ভিতর পূরিয়া রাখে, তাহা কি তোমরা দেখ না? তোমরা অতি নির্লজ্জ, তাই আমার কাছে কমলিনীর নাম কর। আমি তাহাকে স্পর্শও করি না। তাহাকে দেখিলেও আমাদের গোলাপ-তনয়াদিগকে অপবিত্র হইতে হয়। ফুলকুমারী সংসারে অনেক আছে, গন্ধরাজ চম্পক প্রভৃতি ফুলকুমারেরও অভাব নাই। কিন্তু আমাদের সঙ্গে উহাদের তুলনা করিও না। এ অবমান আমরা সহ্য করিতে পারি না। তোমাদের গুণে ঘাট নাই, যাহাকে ভালবাস তাহাকে আকাশে তোল। মল্লিকা ছুঁড়ীকে আবার বেলা বলিয়া ডাকা হয়! যাতি তোমাদের কাছে চামেলী! তোমার বেলা চামেলী যুই কি আমাদের কাছে দাঁড়াইতে পারে? যেমন তোমরা, তেমনই তোমাদের গৃহিণীরা; যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা! আবার, বেলা, চামেলী, যুইকে খোঁপায় রাখা হয়, গলায় রাখা হয়। লক্ষ তারাও এক চাঁদের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারে না। একটী গোলাপসুন্দরী তোমার লক্ষ লক্ষ বেলা চামেলী প্রভৃতিকে দেশছাড়া করিতে পারে। বড় দিনে কি অন্ধ হইয়া ছিলে? গোলাপ সুন্দরীরা লাটের প্রাসাদে—লাটমহিষীর কাছে—কিরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পোড়া চক্ষে দেখিয়া ছিলে কি? বিলাতে গেলে সম্রাটের প্রাসাদে দেখিতে আমাদের গোলাপকুলের কিরূপ আদর।

আমাদের যত্ন আদর ত তোমাদের ভারতেও কম নহে। বৈদ্যনাথ এখন আর বৈদ্যনাথের জন্য বিখ্যাত নহে, সেখানকার গোলাপনাথদিগেরই জন্য এখন বৈদ্যনাথের নাম ডাক। মধুপুর যে, এখন গোলাপনগরী। আর জৌন-পুর গাজিপুরের কথা ভুলিও না। গাজিপুরেও আমাদের বংশ ৫০০ বিঘা জমিতে বসবাস করিতেছে। কাশ্মীর ত আমাদের জন্যই মর্ত্যলোকের স্বর্গ; নন্দনকানন সেইখানে। পারস্যে আমাদের আদর ধরে না। পারস্যরাজ শাহ ও তাঁহার মহিষীরা স্বহস্তে আমাদিগের প্রতিপালন করেন। তুরস্কের বসোরায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পুরাতন বাস

সেখানেও ত আদর কম নহে। পিতামহীর মুখে শুনিয়াছি, মিসরে আমাদের যে বংশ অতি পূর্ব্বকালে আধিপত্য করিয়াছিল, সেই বংশের পুত্র কন্যারাই ইউরোপে গিয়া বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করিয়াছেন। ইউরোপের তুরস্করাজ্যে আমাদের কিরূপ সম্মান, তাহা দেখিয়াছ কি? সেখানে আমরা সুলতানের সহিত সোহাগ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের এতই গৌরব যে, এ সোহাগ দেখিয়া শুনিয়া সুলতানারা আমাদিগকে অনাদর করিতে পারেন না; তাঁহারাও আমাদিগকে মাথায় করিয়া রাখেন।

বুলগেরিয়া রাজ্যের নাম শুনিয়াছত? পূর্ব্বে বুলগেরিয়া তুরস্কের অংশ ছিল? এখন কতকটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়াছে। সেইখানেই আমাদের প্রধান উপনিবেশ। চল্লিশ মাইল জুড়িয়া আমাদের গোলাপবংশই সেখানে বসবাস করিতেছে। গোলাপবংশের সেখানে একাধিপত্য; যেমন সংখ্যায়, তেমনই সম্মানে। ইউরোপের যেখানে আমাদের থাকিতে কষ্ট হয়, সেখানেও আমাদিগের বসবাস হইয়াছে। লোকে নানা উপায়ে বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া জল বায়ু ভূমি আমাদিগের রুচিসম্মত করিয়া দিয়াছেন। যেখানে বড় শীত, বরফ হিমের বড় ভয়, সেখানে আমাদের জন্য কাচগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এত যত্ন কি আর কোন ফুলকুমারী বা ফুলকুমারের দেখিতে পাও? তোমার সাধের বেলা চামেলী কি কোন স্থানে এত আদর পাইয়া থাকে? তোমার সোহাগের কমলিনী—জলের কমলী—বারমাস জলে গলা ডুবাইয়া থাকিতে বাধ্য। পৌষ মাসের শীতেও তাহায় নিস্তার নাই! আর আমাদের জন্য দেখ, তোমার রাজার দেশেও রাণীর আদর! কাচের ঘর—যেমন করিয়া হউক, গরম করা হয়! যে আদর দেব মানবের নাই, পৃথিবীর অধিরাজ বা স্বর্গের দেবরাজ যে আদর পান না, আমরা সে আদর পাইয়া থাকি!

বংশকীর্ত্তন।

আমাদের গোলাপ-বংশ নানা শাখায় বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন শাখার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কিন্তু আদিকালে আমাদের মূলবংশকে বনবাসী হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল। তখনও বংশের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ছিল, তখন বর্ণভেদেই শাখা-ভেদ স্থির হইত। আমাদের আদি বর্ণ চারি... মানবেরও ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারি... আদি বংশ বা আদিবর্ণ। আমাদেরও আদি শা... চতুষ্টয়ে বন্যগোলাপবংশের সম্প্রদায়চতুষ্টয়ে—শ্বেত, পী... গোলাপী এবং লাল, এই চারি বর্ণে চারি শাখাই বিরা... করিত। গোলাপী বর্ণের বংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছি... তাই আমাদের নাম হইয়াছিল গোলাপ। কিন্তু শে... পীত এবং লোহিতকেও গোলাপ বলিতে হইত। এখন... লালকালী, নীলকালী, বেগুণেকালী প্রভৃতি কালী... নানাভেদ দেখিতে পাও। বস্তুতঃ কালী হইতেছে কৃষ্ণব... বন্য গোলাপ এখনও নানা দেশের নানাস্থানে দেখি... পাওয়া যায়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধের নানাস্থলে আম... দের বন্য বংশ এখনও বিদ্যমান। আফরিকার আবি... সিনীয়া, এশিয়ার ভারত এবং আমরিকার মেক্সি... দেশেই বন্য গোলাপের অধিক প্রাচুর্ভাব; উত্তর গ্রী... মণ্ডলেও না আছে এরূপ নহে। বিলাতেও বন্য গোলা... আছেন। কিন্তু বিলাতের স্কটলণ্ডেই তাঁহার আধি... প্রতিপত্তি। বন্য গোলাপ গন্ধে বড় হীন, স্কটলণ্ডে... বন্য গোলাপের মত যত বন্য গোলাপই একবা... গন্ধবর্জ্জিত।

পূর্ব্বতন উদ্ভিজ্জবিৎ ঔদ্যানিকেরা বন্য গোলাপবং... দুইশতেরও অধিক ভিন্ন ভিন্ন শাখা স্থির করিয়াছিলে... পরে দুইশতাধিককে ৪০ শাখায় পরিণত করা হ... সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। এখন উদ্যান-গোলাপের মাহেন্দ্রযোগ, তাঁহারই একাধিপত্য।

উপবনগোলাপ।

বনগোলাপের আদর নাই; উপবন-গোলাপ... উদ্যান-গোলাপই এখন জগতের সর্ব্বত্র পূজিত। উদ্যা... গোলাপের প্রতি মানবের যত্নও আজিকার নহে। কি... এখনকার উদ্ভিজ্জবিজ্ঞান আমাদিগের বংশে যেরূপ উন্ন... করিতেছে, পূর্ব্বে সেরূপ উন্নতি দেখা যাইত না। পূর্ব্বে... ইত বলিয়াছি, এখনকার বিজ্ঞান বর্ণসঙ্করের বড় পক্ষপা... অসবর্ণ বিবাহের বড় অনুরক্ত। অসবর্ণ বিবাহ এবং ব... সঙ্করেই আমাদের গোলাপদেহে বড় সৌন্দর্য্য বাড়িতেছে... আমাদের আয়তনও বাড়িতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানবিদ্যাবিশারদেরা এখনকার উদ্যান-গোলাপকে ভিন্ন ভিন্ন প্রধান বংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন। উদ্যানশাস্ত্রবিৎ বেনার সাহেব উদ্যানগোলাপকে ১০টী প্রধান শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন; কিন্তু উইলিয়ম পল আবার ঐ দশ শাখাকেই ছয় শাখায় পরিণত করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গোলাপের আদর কম ছিল। ফুল ফরাসীর কাছে যত আদর পাইতেন, ইউরোপের অন্য কাহারও কাছে তত আদর পাইতেন না। ইতালিতেও আদর ছিল, কিন্তু ফ্রান্সের মত নহে।

ইংলণ্ডে এখন গোলাপ-শাস্ত্র একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত। গোলাপশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে এখন বিলাতের সর্ব্বত্র। গোলাপশাস্ত্রে যাহাদের অনুরাগ এবং অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগের একটা সভা হইয়াছে। সভার নাম "নেশনাল রোজ সোসাইটি" বা জাতীর গোলাপ-সভা। গোলাপ সম্বন্ধে অধুনা এই সভার মতই সকলের শিরোধার্য্য। সভার অধ্যক্ষেরা এখন উদ্যানগোলাপকে ছয়টী মুখ্য শাখায় বিভক্ত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কেবল সৌন্দর্য্যেরই আদর ছিল, এখন সৌরভেরই আদর ক্রমে বাড়িতেছে। কিন্তু যাঁহার সৌন্দর্য্য গন্ধ দুই অধিক, গোলাপ-যুবতীদিগের ভিতর তিনিই ধন্যা। দেবী মানবীদিগের ভিতরও ত দেখিতে পাই, কেবল সৌন্দর্য্যে তাদৃশ গৌরব হয় না; যিনি রূপে রূপবতী এবং গুণে গুণবতী, তিনিই শ্রেষ্ঠ। মানুষের সৌরভ যশে, আমাদের সৌরভ গন্ধে। মানবসমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই রূপ গুণ দুই থাকিলে আদর। আমাদের ফুলসমাজেও রূপ এবং গন্ধ দুই না থাকিলে স্ত্রী পুরুষ কাহারই তেমন আদর হয় না। যাঁহারা বলেন, বিলাতের নর নারী কেবল রূপে মুগ্ধ, তাঁহারা এখনকার অবস্থা জানেন না। বিলাতের সকল নর নারী যদি কেবল রূপে মুগ্ধ হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের উদ্যানে কেবল শিমূল পলাশের আদর দেখিতে; গোলাপের একাধিপত্য দেখিতে পাইতে না। বিলাতের হাটে বাজারে, ঘরে বাহিরে, মজলিসে সাইকেলে, বিবাহে বাসরে, সর্ব্ববিধ উৎসবেই গোলাপের আদর; সুগন্ধ বলিয়াই গোলাপ সকলের শিরোধার্য্য। ব্যসনে—অন্ত্যেষ্টি সময়েও গোলাপ আদৃত। গোলাপ যে, দেবলোকের শ্রদ্ধের।

ফুলের গঠনভেদে, পত্রের গঠনবর্ণাদিভেদে, পাপড়ীসংখ্যা-সৌষ্ঠব-স্থূলতা-পুষ্টি-ভেদে গোলাপের বংশভেদ—শাখাভেদ হইয়াছে। আবার যে দেশে শীত বড় অধিক, সে দেশে আমাদের ফুল জাতি বসন্তেই অধিক প্রস্ফুটিত হয়, বসন্তেই অধিক সৌরভ দেয়। যে দেশে শীত কম, সে দেশে শীত কখনও ফুলের তাদৃশ প্রতিকূল নহে। অন্যান্য ফুলবংশে যে নিয়ম আমাদের গোলাপ-বংশেও সেই নিয়ম। বিলাতে গোলাপসুন্দর ও গোলাপসুন্দরীর নবযৌবন বসন্তে. ভরা যৌবন গ্রীষ্মে। যৌবনেই রূপ অধিক, যৌবনেই গন্ধ অধিক। কিন্তু শীতপ্রধান বিলাতেও অনেক গোলাপ বারমাস রূপ দেখান, বারমাস গন্ধ দেন। তবে তারতম্য আছে; বসন্তে গ্রীষ্মে যত রূপ, যত গন্ধ, যত সৌষ্ঠব, অন্য সময়ে তত নহে।

ভারত শীতপ্রধান দেশ নহে। ফুলের যৌবন বিলাতে যখন হয়, ভারতে তখন হয় না। ভারতের মানবকুলে জন্তুকুলে যে নিয়ম, এখানে ফুলকুলেও সেই নিয়ম। এখানে যৌবন-বিকাসটা কিছু শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। ভারতের গোলাপ পৌষ মাঘে যেমন ফুটে, বিলাতের গোলাপ সেরূপ ফুটেনা। ভারতের পৌষ মাঘের শীতে আর বিলাতের মার্চ্চ এপ্রেলের শীতে সৌসাদৃশ্য, তাই ফুলের যৌবনবিকাসেও ঐ দুই সময়ে সৌসাদৃশ্য।

নিদাঘের গোলাপ।

বিলাতের নিদাঘ-গোলাপগণের ভিতর প্রসিদ্ধ হইতেছেন, বোরসল্ট, স্কচ্, ডামাস্ক, প্রোভন্‌স, মস, ফ্রেঞ্চ, সঙ্করফ্রেঞ্চ বোর্ব্বোঁ, সঙ্করচীন, অষ্ট্রীয়ান, পলিয়ান্থা, ব্রাইয়ার, এয়ারশায়র, এভারগ্রীণ, মল্‌টিফ্লোরা, প্রেয়ারী, ব্যাঙ্কশিয়ান ইত্যাদি। অনেকেই রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিলাতের নৈদাঘ গোলাপের ভিতর "মস" গোলাপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাহার যেমন রূপ, তেমনই গুণ!

বারমেসে বা চিরযৌবন।

এ দলে আছেন, চীন বা মাসিক গোলাপ, জারজ বারমেসে, চা-গন্ধী, বোর্ব্বোঁ, নয়সেট ম্যাকর্টনি, রুগোসা, মাইক্রোফিলা, লরেন্সানা, স্কচ্-বারমেসে, ইত্যাদি। চীন বা মাসিক গোলাপ, বোর্ব্বোঁ এবং নয়-

সেট, এই তিন সম্প্রদায়ের খুব আদর। কিন্তু বারমেসে জারজ আর চা-গন্ধী, এই দুই গোলাপেরই একাধিপত্য। বারমেসে জারজ হইয়াও রাজা, চা-গন্ধী, রাণী। ইঁহাদের সৌন্দর্য্য অধিক, ঔজ্জ্বল্য অধিক, অথচ কোমলতার একশেষ। আবার চা-গন্ধীর স্বভাবে লজ্জা-শীলতার পরাকাষ্ঠা; চা-গন্ধী যেন লজ্জায় সর্ব্বদাই মুখ ঢাকিয়া আছেন; পাপড়ী বড়ই ঘন, বর্ণ সুন্দর, কিন্তু মুখ দেখিলে মনে হয় যেন সুন্দরী কেবল চিন্তা করিতেছেন; ভাবটা বড় বিমর্ষ। এই বিমর্ষভাবের জন্যই চা-গন্ধী কবি-মনোমোহিনী। বারমেসে জারজের বড় গর্ব্ব; জারজের লজ্জাহীনতা চির-প্রসিদ্ধ। সাহসের সীমা নাই; বাহারে জারজ অদ্বিতীয়, এত শোভা আর কাহারও নাই, বর্ণ যেমন সুন্দর তেমন উজ্জ্বল। আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন মখমলের মত নরম; পাপড়ী যেমন নরম, তেমনই পুরু। জারজকে দেখিলেই লোকে ভুলিয়া তাহার কুহকে পড়ে, জারজ বারমেসে, তাইত লোককে বারমাস মজাইতেছে।

চাগন্ধীকে রাখিতে হয় বড় যতনে। ইনি আশ্রয় না পাইলে ঢলিয়া পড়েন, অভিমানে মাটীতে লুটান। খুব শক্ত গোলাপে যোড়কলম করিলে, তবে ইনি কথঞ্চিৎ মাথা তুলিতে পারেন।

ইহলোকে উপসংহার।

আমাদের গোলাপ গোলাপীর যে আদর, যে যত্ন, তাহা রাজা রাণীরও নাই, আমাদের মধ্যে অনেকে শীত আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। শীতপ্রধান রাজ্যের উদ্যান উপবনে তাহাদিগকে কাচের ঘরে রাখিতে হয়।

ইউরোপ আমরিকার সবর্ণজ অসবর্ণজ যত গোলাপেরই তোমাদের ভারতেও শুভাগমন হইয়াছে। গোলাপের আদর যে,ভারতেও বাড়িতেছে, তাহা তোমরা দেখিতেছ। অসবর্ণ বিবাহে বর্ণসঙ্করে গোলাপের বৎসর বৎসর নব নব বংশ আবির্ভূত হইতেছে। কিন্তু পুরাতন বংশেরও ক্রমেই লোপ হইতেছে। "নূতনে যেমন মন পুরাতনে নয় তেমন।" গোলাপ শাস্ত্র এখন বৃহৎ শাস্ত্র, ফুল-পুরাণের ত কথাই নাই! ফুল-পুরাণের অন্তর্গত এই গোলাপ খণ্ডই বিশাল বিস্তৃত! ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। পালন পোষণ রোপণ কর্ত্তনাদির কথা কহিতে গেলে, আমি অষ্টাদশ পর্ব্বেও পার পাইব না। সর্ব্বতথ্যের অলোচনা করা বা আভাস দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নহে, স্বতর গোলাপের ঐহিক তথ্য এইখানে সমাপ্ত হইল; ফুলকু রীরও ঐহিক কথা এইখানেই ফুরাইল। অতঃপর সংক্ষে পরলোকের কথা কহিব। ফুলকুমারী গোলাপ সুন্দরী প্রাণ ও আত্মার কথাই পরে আমার আলোচ্য হইবে।

গোলাপসুন্দরী পরলোকে।

দেখ দেখি—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাকে দেখিতে পাইতেছ কি না—আমাকে চিনিতে পারিতে কিনা? আমি তোমাদের সেই ফুলকুমারী—গোলাপ সুন্দরী। আমিই ফুলদেহে—আমার নশ্বর গোলাপদেহে— তোমাদের সহিত কথা কহিতেছিলাম। এখন আমি পরলোকে আসিয়াছি, আমার দেহ তোমাদের মর্ত্ত্যলোকে পচিয়া মাটী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার প্রাণ— আমার আত্মা বিদ্যমান। কেবল আমার নহে, আমার মত কোটি কোটি ফুলকুমারী—কোটি কোটি গোলাপ সুন্দরীর প্রাণ এখন মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়াছে। আমাদিগকে এখন আর তোমরা বনে উপবনে দেখিতে পাইবে না। দেবীর পাদ-পদ্মে বা মানবীর কমনীয় দেহে এখন আর আমাদিগের স্থান নাই। প্রাণময়ী আমরা এখন সিসির স্বর্গে—বোতলরূপ দেবলোকে—কার্ক্রূপ অমরভবনে— বিরাজ করিতেছি। এতকাল কবিরাই আমাদিগের অমর বুঝিতে পারিতেন, আমাদের সৌরভময় প্রাণ এত দি কবি ও ভাবুকদিগেরই হৃদয়ঙ্গম হইত। এখন জ্ঞানবা বৈজ্ঞানিকেরাও আমাদের অমরত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন আমাদের প্রাণের কথা—আত্মার কথা এখন তাঁহারা কহিতেছেন।

যিনি জীবতত্ত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন, কীটাণু হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলকেই যিনি এক পর্য্যায়ে ফেলিবার চে করিয়াছিলেন, তোমাদের নরকুলকে যিনি বানরকুলের সন্তানরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, সেই চার্লস ডা ইনকে চেন কি? তোমরা সকলে না চেন, কেহ কে অবশ্যই চেন। তাঁহার "ডিসেণ্ট অব ম্যান" বা মান বংশ, তাঁহার "অরিজিন অব স্পীশিস" বা জীবসম্প্রদা সমূহের মূল প্রভৃতি গ্রন্থ তোমাদের অনেকেরই অধী হইয়াছে। চার্লস ডারুইনের প্রতিপত্তি এখন জগদ্ব্যাপ্ত প্রাণীতত্ত্বে তিনিএকটা নবযুগই উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন

ভারত-বন্ধু

স্বর্গীয় মহাত্মা কেইন সাহেব।

KUNTALINE PRESS.

সেই চার্লস ডারুইনের পুত্র—পিতার অনুরূপ কুলতিলক পুত্র—ফ্রান্সিস ডারুইনের সহিত যদি তোমাদের পরিচয় না হয়, তাহা হইলে, তোমাদের জীবনই ব্যর্থ! বিলাতের বৃটিশ এসোসিয়েশনের মত পণ্ডিতসভা আর নাই; যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এই সভার সভ্য। এই সভার তরফে ফ্রান্সিস্ ডারুইন যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শুনিয়াছ কি? যদি না শুনিয়া থাক, তবে বড়ই বঞ্চিত হইয়াছ। শুদ্ধ ইহাঁরই উপদেশ শুনিবার জন্য, তোমাদিগের বিলাত যাওয়া উচিত ছিল।

ফ্রান্সিস ডারুইনের উপদেশাবলী পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পুস্তক খানা যদি না পড়, তবে তোমাদিগের পড়া শুনা মিথ্যা। ফ্রান্সিস ডারুইনের মত উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত জগতে নাই। কেবল যুক্তিতর্ক নহে—তিনি প্রমাণ-প্রয়োগে দেখাইয়াছেন; বৃটিশ এসোসিয়েশনের পণ্ডিতপ্রবর সভ্যদিগকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া, শ্রোতৃবৃন্দকে পুলকিত করিয়া দেখাইয়াছেন, "উদ্ভিজ্জেরও প্রাণ আছে, আত্মা আছে; জগতের যত তরুলতাই নর নারীর মত প্রাণেশ্বর ও প্রাণেশ্বরী; সকলেরই ইন্দ্রিয় আছে। তরুলতাও সুখ দুঃখের ভোগ করে, আঘাতে কষ্টবোধ করে; উৎকৃষ্ট জল বায়ু এবং সার পেয়রূপে ভক্ষ্যরূপে পাইলে, আনন্দিত হয়, খাদ্য পেয়ে বঞ্চিত হইলে, একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। তরু লতাও হাসে কাঁদে, উৎসাহে উত্তেজিত হয়, অবসাদে অবসন্ন হয়।"

যে সকল অবোধ মানব তরুলতাকে আঘাত করে, কষ্ট দেয়, কাটিয়া ফেলে, পোড়াইয়া থাকে, তাহাদিগকে যে, পরকালে নরকে পুড়িতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার কথায় অবিশ্বাস করিও না, ফ্রান্সিস ডারুইনের বাক্য বেদ-বাক্য। ভারতের ঋষি মহর্ষিরাও তরুলতাদির প্রাণ ও আত্মার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তরু লতার প্রতি তাই তাঁহারা নিষ্ঠুরতা করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাই হিন্দু শাস্ত্রে তরুলতাকে জল দেওয়া পুণ্য, তাই দেবতা-প্রতিষ্ঠার ন্যায় বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; তাই বট, অশ্বথ, মনসা প্রভৃতি বৃক্ষের পূজা বিধেয়। তাই বট, অশ্বথ, পর্কটী প্রভৃতি পঞ্চবটীর তলেই তপঃসিদ্ধি হইয়া থাকে। পুষ্প ফল তরুলতার সন্তান, তাই ফুলে দেবতার তুষ্টি, তাই ফলে দেবতার তৃপ্তি। দেবদ্বিজের সেবার জন্য তরুলতাই সন্তান দান করিতে কাতর নহে। তাহাদেরও ধর্ম্মজ্ঞান আছে; তাহারাও জানে, দেবদ্বিজের তুষ্টির জন্য পুত্র কন্যাকে বলি দিলেও দোষ হয় না। কিন্তু ঋষিরা করুণাময়; পক্ক ফলই পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রস্ফুটিত পুষ্প না হইলে পূজা সিদ্ধ হয় না। ফল পক্ক হইলে, ফুল পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইলে, নিজেই পড়িয়া যাইবার উপযুক্ত হয়, তখন তাহাদিগকে দেবপদে বা দ্বিজ-চরণে ন্যস্ত করিলে, তরুলতাকে কষ্ট দেওয়া হয় না। আর যেমন ছাগ মেষ মহিষ দেবতার বলি হইবার জন্য জন্মগ্রহ করে, পুষ্প ফলও সেইরূপ দেব পূজার জন্যই জন্মগ্রহ করিয়া থাকে। মানব দেবতার নাম করিয়া ছাগ মেষাদির মাংস খায়, মানব দেবতার প্রসাদরূপ পুষ্প ফলেই অধিকারী। সংসারে যাহারা বৃথা মাংসে দগ্ধোদর পূর্ণ করে, তাহারাই বৃথা ফুলে নাসিকা এবং বৃথা ফলে উদর তৃপ্ত করিয়া থাকে। কলিযুগে মানুষ অজ্ঞানে আবদ্ধ, তাই তরুলতার প্রাণ বা আত্মা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। অধুনা যে, চার্লস ডারুইনের মত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের গৌরবের বিষয়; পৃথিবীতেও মঙ্গলের সূত্রপাত।

আমাদের প্রাণ বা আত্মার সহিত পরিচয় করিতে হইলে, তোমাদিগকে ভারতের গাজিপুরে যাইতে হইবে। সেখানকার পাঁচ শত বিঘা গোলাপবাগে আমাদের মর্ত্ত্য ভাই ভগিনীদিগেরই সহিত তোমাদের দেখা শুনা হইবে; আমাদিগের পরলোকগত প্রাণ বা আত্মার সহিত সে গোলাপবাগে পরিচয় হইবে না। যেখানে আতর প্রস্তুত হইতেছে, তোমাদিগকে সেইখানে যাইতে হইবে, আতরের শিশি খুলিয়া পরলোকগত গোলাপসুন্দরী বা অন্যান্য ফুলকুমারীর সহিত পরিচয় করিতে হইবে।

নুরজাহান জলে প্রভূত গোলাপ ফেলিয়া, সেই জল রৌদ্রে দিয়াছিলেন। বাদশাহ জাঁহাগীরের অসাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্না বেগম নুরজাহান, সেই জলে তৈল ভাসিতেছে, দেখিয়া, পাখীর কোমল পালক দিয়া, সেই তৈল তুলিয়া লইয়াছিলেন। তৈলে প্রাসাদ আমোদিত হইয়াছিল। সেই দেবভোগ্য তৈলকে নুরজাহান "আতর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই আতরই এখন নানা স্থানে সঞ্চিত হইতেছে, নানা ফুল হইতেই আতর গৃহীত হইতেছে।

এখন ফুল জলে সিদ্ধ করিয়া, ফুল-জল চোয়াইয়া, সেই ফুল-জলের ধূম হইতে, আতর লব্ধ হইয়া থাকে। কেহ কেহ সূর্য্যপক্ক ফুল-জলেও আতর পান। এখন নানা ফুলেই আতর হইয়া থাকে; কিন্তু গোলাপের আতরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আতর। শুনিয়া হাসিবে, কোন কোন স্থানে একপ্রকার মাটী হইতেও আতর নিঃসারিত হয়; গন্ধময়ী মেদিনীর গন্ধ আতরে পরিণত হয়। নাক সিঁটকাইও না। কেহ কেহ অশ্বপুরীষ হইতে আতর বাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ আতরে আমরা কাতর হইয়া থাকি। এরূপ আতরকে তোমরা আতর বলিতে পার, তোমরা এরূপ আতরে তর হইয়া যাইতে পার; আমরা কিন্তু এরূপ আতরকে আতর বলিনা।

আমাদের আতর আমাদের প্রাণ। গস্‌নেল, পাইভার জোয়ানা মেরীয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় নর নারীদিগের নানারূপ সুরভি পুষ্পসার তোমরা দেখিয়াছ, অনেকের অনেক এসেন্‌সই তোমাদিগের নাসিকার তৃপ্তি-সাধন করিয়াছে। কিন্তু আমি পরলোক হইতে দেখিয়া বলিতেছি, ফরাসী জর্ম্মণ গন্ধব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা বিলাতের সৌরভ-ব্যবসায়ী গ্রস্‌মিথ সর্ব্বাংশে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ, গ্রস্‌মিথের মত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সৌরভব্যবসায়ী জগতে আর দেখিতে পাইবে না। লণ্ডনে তাঁহার সৌরভাগার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ফরাসি রাজ্যের গ্রাস জেলায় তাঁহার জন্য অসীম উদ্যানে অনন্ত সুরভি ফুল দিবারাত্র ফুটিতেছে সেইখানেই পুষ্পসার নিঃসৃত হইয়া, বসায় প্রবিষ্ট হইয়া, লণ্ডনে যাত্রা করিতেছে। লণ্ডনে সেই সৌরভপূর্ণ বসা সুরাসারে পড়িয়া গলিয়া যাইতেছে। তৎপরে সেই সুরভি সুরাসার হইতে গন্ধসার নিঃসৃত করিয়া, গ্রস্‌মিথের গন্ধ-পারদর্শী শিল্পীরা অসংখ্য অতিসুন্দর বিচিত্রগঠন কাচকোষ সেই গন্ধসারে পূর্ণ করিতেছেন। ঐ সকল গন্ধসার-পূর্ণ কাচকোষ নানাদেশে প্রেরিত হইতেছে; নানা নামে প্রচলিত হইয়া, নর নারীদিগের সুখবৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু সে কথা পরে শুনিবে। ঐ গন্ধবিশারদ গ্রস্‌মিথ নিজে কি বলিতেছেন, অগ্রে তাহা শুন। তিনি বলিতেছেন, "পুষ্পের প্রাণ আছে—আত্মা আছে, ইহা কি তোমরা জান না? আমি বলিতেছি, যত ফুলকুমারী ও ফুলকুমারেরই আত্মা আছে। আমাদের মত গন্ধবিশারদ গন্ধব্যবসায়ীরা ফুলের সৌরভেই ফুলের আত্মার সহিত পরিচয় করিয়া থাকেন। মানুষের প্রাণ—আত্মা- যেরূপ তাহার দেহ ইহলোকে ফেলিয়া পরলোকে থাকে ফুলের আত্মাও সেইরূপ তাহার ফুল-দেহ ছাড়িয়া পরলো অবস্থিতি করে। ফুলের সৌরভ অচেতন পদার্থ নহে; এ সৌরভকে ফুলের এই জীবাত্মাকে, মানুষ নষ্ট করি ফেলিতে পারে; কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিে মানুষই এই পৌষ্পাত্মাকে চিরস্থায়ী করিতে পারে।"

গ্রস্‌মিথের বাক্য বেদবাক্য। ঐ শোননা তিনি আবা বলিতেছেন ঃ—

"পুষ্পের আত্মা অবিনাশী। এই দেখ, এই কাচাকো গোলাপের গন্ধসার রহিয়াছে। আমরা বেশ দেখি, শী কালে এই গন্ধসারের যেরূপ গন্ধ, বসন্তে তদপেক্ষা অনে অধিক। বাগানের গোলাপ বসন্তকালে ফুটে, বস কালে গন্ধে দশ দিক আমোদিত করে। দেহী গোলা বসন্তে অধিক তেজস্বী হয়, এই দেখ, দেহ-হীন গোলাপ- এই গোলাপী গন্ধসার—শীতে স্বল্প গন্ধ দিয়া, এখন বস অধিক গন্ধবিস্তার করিতেছে। বসন্তে উদ্যানের সজীবদে গোলাপ অধিক গন্ধ দেয়, তাহার দেহ-হীন প্রা বসন্তে অধিক গন্ধ দিতেছে। তথাপি কি বলিবে, ফুে প্রাণ নাই?" আমি বলিতেছি যাহা গোলাপে, তা অন্য ফুলে; আমাদের ফুলবংশেরই এটা সাধারণ ধ কেন না, ফুলবংশের সকল ফুলেরই প্রাণ আছে—আ আছে।

ঘ্রাণশক্তি ও গন্ধবিদ্যা।

আমি সেই গোলাপসুন্দরী, এখন পরলোকে আ স্বর্গাবাস আমাদের নানাস্থানে। যেখানে গন্ধশিল্প, সেইখ আমাদের আবাস। যেখানে আতর ও এসেন্‌সের দোক সেখানে আমাদের গতিবিধি, যেখানে আতর বা এসেন্ শিশি, সেইখানেই আমাদিগের অবস্থিতি। আমাদের কোন্ ফুলকুমার বা ফুলকুমারীর কোন্ স্থানে বাস, ত আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু কোন্ আবাসে কে ফুলকুমার ফুলকুমারীর বাস, কোন আবাসে—কোন ক গৃহে—কোন বংশের গোলেপার প্রাণ অবস্থিতি করিতে কোন কাচকোষে চামেলীর প্রাণ রহিয়াছে, কো মল্লিকার প্রাণ বিদ্যমান, কোথায় কমলালেবুর প্রাণ নিে বিরাজমান, ইত্যাদি রহস্য আমরা জানিতে পারি; আঘ্রাণে তোমরাও বলিতে পার। কিন্তু গ্রস্‌মিথের মত পুষ্পতত্ত্ব-বিশারদেরা যেরূপ পারেন, তোমরা সেরূপ পার না। অতএব, এখন আমি নিজের উক্তি ছাড়িয়া, তাঁহার উক্তিই তোমাদিগকে শোনাইতেছি। গ্রস্‌মিথই বলিতেছেন;—

"মানুষ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উন্নতি-কল্পে কত কাণ্ড করিয়া থাকেন; চক্ষুরোগের কতপ্রকার চিকিৎসা প্রচলিত রহিয়াছে, নেত্রচিকিৎসার কত চর্চ্চা, কত উন্নতি, কত যন্ত্র, কত বিদ্যালয়, কত পুস্তক! শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতিও মানুষের যত্ন কম নহে; যেখানে নেত্র-চিকিৎসা, সেইখানেই কর্ণ-চিকিৎসা! জিহ্বার কথা ত কহিতেই হয় না; রসনেন্দ্রিয় লইয়াই, ঔদরিক মানব দিবারাত্র ব্যস্ত। মানুষ স্পর্শেন্দ্রিয়েও উদাসীন নহে, উদাসীন কেবল নাসিকায়। শ্রবণবিদ্যার যেরূপ চর্চ্চা হইতেছে, সংগীতের যেরূপ আলোচনা হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কি সেরূপ হইতেছে? শব্দের যেরূপ আলোচনা হইতেছে, গন্ধের কি সেরূপ আলোচনা হইতেছে? গন্ধের কিছুই হইতেছে না। তাই গন্ধ-বিজ্ঞানেরও সেরূপ উন্নতি হইতেছে না। এই জগতে বুদ্ধিমান্ মানবও গন্ধভেদ করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হন। গন্ধ-ব্যবসায়ী আমরা যেরূপ গন্ধভেদ করিতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বৈজ্ঞানিকেরাও সেরূপ পারেন না। আমি ৬।৭টা ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পসার লইয়া মিশাইয়া দিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতের নাকে ঠেকিল, তিনি গন্ধ পাইলেন। কিন্তু ৭ পুষ্পের সপ্তসারের স্বতন্ত্র সৌরভ কেহই পাইলেন না। ৭ টার এক একটাই এক একজনের নাসারন্ধ্রে অনুভূত হইল। কেহ বলিলেন, গোলাপসার কেহ বলিলেন মল্লিকাসার, কেহ বলিলেন যূথিকাসার, কেহ বা বলিলেন অন্যসার। কিন্তু আমি অনায়াসেই নাসাস্পর্শমাত্র বলিয়া দিব, এটা মিশ্রিত সার, ইহাতে গোলাপ আছে, বেলা আছে, যুই আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের ঘ্রাণশক্তি যেরূপ শিক্ষিত হইতেছে, আমরা যেরূপ গন্ধ-বিদ্যায় অধিকার-লাভ করিতেছি, গন্ধের বিদ্যালয় থাকিলে, বিদ্যা থাকিলে—বিদ্যার চর্চ্চা থাকিলে, ত সকলেই সেইরূপ ঘ্রাণশক্তির লাভ করিতে পান; গন্ধবিদ্যায়ও অধিকার-লাভ করিতে পারেন।" গ্রস্‌মিথের বাক্য বেদবাক্য!

গন্ধের উগ্রতা ও মৃদুতা।

গোলাপ-সুন্দরীর গ্রস্‌মিথই বলিতেছেন, "সকল গন্ধ সমান নহে, কোন কোন গন্ধ অধিক দূর পর্য্যন্ত স্বীয় তেজের বিস্তার করিতে পারে, কোন গন্ধ পারে না। কোন গন্ধ অধিক দিন থাকে, কোন গন্ধ থাকে না। পুষ্পের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, গোলাপের গন্ধ অপেক্ষা চম্পকের গন্ধ অধিক দূর গমন করিয়া থাকে। আবার গন্ধগোকুলা, কস্তুরী-মৃগ প্রভৃতির শরীর-নিঃসৃত গন্ধ দুই তিন শতাব্দীতেও উড়িয়া যায় না। গন্ধ গোকুলার জান্তব গন্ধ যে দস্তানায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পড়িয়াছিল, সেই পুরাতন দস্তানায় এখনও তাহা রহিয়াছে। মৃগনাভি যে ঘরে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চুনকামের সহিত দেওয়া হইয়াছিল, সে ঘরে এখনও বিরাজ করিতেছে। এইজন্যই ত আমরা সকল পুষ্পসারেই কস্তুরীমৃগের নাভিগন্ধ অতিসূক্ষ্ম মাত্রায় মিশাইয়া দিই। এত সূক্ষ্ম মাত্রায় মিশাই যে, কস্তুরীর গন্ধ পুষ্প গন্ধে ঢাকিয়া যায়, কিন্তু কস্তুরীর জন্য পুষ্পগন্ধ বহুদিন স্থায়ী হয়। আবার দেখ, আমার গন্ধাগারে বাহিরের কোন লোক আসিলেই গন্ধে আমোদিত হন, ঘরের গন্ধময় বায়ু তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু আমরা এই ঘরে দিবা রাত্র থাকি বলিয়া, কোন গন্ধই পাই না। ঘরের সুগন্ধ আমাদের নাসাস্থ শিরায় অনুভূত হয় না। কিন্তু বৈচিত্র্য দেখ, এই শিশির ভিতর দশপ্রকার গন্ধসার মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, আমি প্রত্যেক সারের স্বতন্ত্র গন্ধ জানিতে পারিতেছি; দশবিধ গন্ধের দশবিধ স্বাতন্ত্র্য পূর্ণমাত্রায় আমার নাসিকায় অনুভূত হইতেছে; কিন্তু তোমাদের নাসিকায় অনুভূত হইতেছে না। অতি মৃদু গন্ধেরও তেজ আমরা টের পাই, তোমরা পাও না। শিক্ষার তারতম্যই এই প্রভেদের হেতু। তোমরা যদি গন্ধ-বিদ্যার আলোচনা করিতে, যদি গন্ধবিদ্যার স্বতন্ত্র লেবরেটরি বা পরীক্ষাগারে তোমরা সর্ব্বদা থাকিতে পাইতে, তাহা হইলে, তোমাদিগেরও এইরূপ দক্ষতা হইত। শিক্ষার অভাবই মানুষকে গন্ধজ্ঞানে কুণ্ঠিত করিয়া রাখিতেছে।"

সারসংগ্রহে গোলাপসুন্দরী।

গ্রস্‌মিথকে ছাড়িয়া দিয়া, এবার আমাদের গোলাপসুন্দরী নিজেই সারচর্চ্চা আরম্ভ করিতেছেন। তাঁহার

সৌরভময় আত্মাই একটা কাচকোষ হইতে বলিতেছেন ; "পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুরস্কের উত্তরে—বুলগেরিয়া দেশের কেজানলিক নামক গোলাপ জনপদে ৪০ মাইল ধরিয়া কেবল গোলাপরাজ্যই দেখিতে পাইবে। সেই গোলাপাবাসেই গোলাপের আতর প্রস্তুত হইয়া চারিদিকে প্রেরিত হয়। অর্থাৎ সেই গোলাপরাজ্যের যত গোলাপকুমারী ও গোলাপ-কুমারদিগকে, গন্ধের জন্য, মনুষ্য হস্তে প্রাণ দিতে হয়। আমরা অপঘাতে মরি, আমাদের সৌরভময় অসংখ্য প্রাণ চারিদিকে প্রেরিত হয়, আমাদের প্রাণের মূল্য বড় কম নহে! সুবর্ণ অপেক্ষা আতরের মূল্য অধিক। মূল্য অধিক না হইবে কেন? ২ টন অর্থাৎ ৫৬ মন গোলাপ না হইলে ত আর ২।০ ভরি আতর উৎপন্ন হয় না। বুল-গেরিয়ায় প্রতি বৎসর ২।০ টন অর্থাৎ ৭০ মন আতর প্রস্তুত হয়, ইহার জন্য ৮ হাজার টন অর্থাৎ ২ লক্ষ ২৪ হাজার মন গোলাপকে প্রাণ দিতে হয়। ৪০ সেরে এক মন, তাহা হইলে ৯০ লক্ষ সের গোলাপকে প্রাণ দিতে হয়। কয়টা গোলাপে এক সের হয়? অত হিসাব করিতে পারিব না, বংশনাশের চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িব ; পরলোকে থাকিয়াও পাগল হইব। মনে হইতেছে, বৎসর ৬০ কোটি গোলাপের হত্যা করিয়া, বুলগেরিয়ার নিষ্ঠুর মানব নিজের ধনবৃদ্ধি করিতেছে ; আর জগতের যত বিলাসী বিলাসিনীর নাসারন্ধ্র পরিতৃপ্ত করিতেছে! বুয়রাজ্যের যুদ্ধে ৫০ হাজার মানুষের হত্যা হয় নাই। ইহাতেই ত্রিভুবন ক্রন্দনে পূর্ণ হইয়াছিল, ধরাতল নেত্রনীরে প্লাবিত হইয়াছিল! আর, এক বুলগেরিয়ার দেশেই আমা-দের অন্যূন ৬০ কোটি গোলাপ প্রতি বৎসর নিষ্ঠুর মানবের হস্তে প্রাণ দিতেছে! এরূপ গোলাপনাশ পৃথিবীর নানা-স্থানে হইতেছে, অন্যান্য ফুলবংশেরও নানাস্থানে ধ্বংস হইতেছে! স্বার্থপর অজ্ঞানান্ধ মানুষ একবারও ভাবে না! আমাদের উদ্ভিজ্জদেহে যে প্রাণ আছে, আমরা যে, অসহ্য কষ্টভোগ করি, আমরা যে, মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হই, তাহা স্বার্থপর মানব একবারও বুঝে না!

কেবল বিলাস।

এই যে, মানুষ এত পাপ করিতেছে, ইহাও কেবল বিলাসের জন্য! কেবল নিজের পার্থিব, নিজের তামসিক সুখ সন্তোষ বাড়াইবার জন্য! মানুষ যদি লোকহিতে জন্য আমাদিগের হত্যা করিত, তাহা হইলেও বরং আম মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। এই ত দেব দেবী তুষ্টির জন্য আমরা আত্মবলি দিতেছি, দেব দেবীর পা পদ্মে পুত্র কন্যাকেও অকাতরে বলি দিতেছি। এই পরলোকগত মানবাত্মার মঙ্গলের জন্য সমাধি মন্দিরে গি আবার পুত্র কন্যা সহ আত্মবিসর্জ্জন করিতেছি ; এই হিন্দুর দেবালয়ের ন্যায় খৃষ্টানের গির্জ্জা চাপেলের শোভ বর্দ্ধন জন্য আমরা সপরিবারে অকালে প্রাণ দিতেছি ইহাতে ত আমরা কাতর নহি! পরকালের মঙ্গলের জ আমরা প্রাণ দিতে অকুণ্ঠিত, পরের প্রকৃত হিতের জন্য আমরা অকাতরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে অকুণ্ঠিত পুষ্পসারে—আতর এবং আতরানুরূপ গন্ধসারে রোগনা হয়। বিলাতের অদ্বিতীয় চিকিৎসাপত্র লেন্‌সেটেই দেখ :—

"এখন রমণীরা পুষ্প ও পুষ্পসারে স্বীয় অঙ্গ সুরভি করিতেছেন কেবল পুরুষের মন হরিবার জন্য। পুরুষ নিজের অঙ্গ সুরভিত করেন, রমণীর মন ভুলাইবার জন্য কিন্তু আতর বা আতরসদৃশ পৌষ্প তৈল যে, রোগমূল কীটা বীজাণু নষ্ট করিতে অদ্বিতীয়, তাহা এখনও সকলে বুঝে না ; সকল চিকিৎসকও তাহা জানে না। কার্ব্বলিকে যে কাজ না হয়, আতর বা এসেন্‌সে সে কাজ হয় ; ভাল হয়। যক্ষ্মাদি সংক্রামক রোগে সুগন্ধের যে, একা উপযোগিতা, রুমালে আতর বা এসেন্স থাকিলে যে যক্ষ্মাদির কীটাণু বীজাণু ততটা অপকার করিতে পারে না তাহা এখনও চিকিৎসকেরা বুঝেন না, ইহাই বিচিত্র—ইহা দুঃখজনক।"

এইরূপ এবং অন্যরূপ লোক-হিতকর কার্য্যে যখ আমাদের গন্ধ ব্যবহৃত হইবে, তখন আমরা অপঘাতে সুখানুভব করিব। কেননা, "পরোপকারায় সতাং হি জীবনং।" কিন্তু কেবল বহিঃপ্রয়োগে—কেবল দুর্গন্ধ বিনাশে—যে, আমাদের উপযোগিতা আবদ্ধ থাকিবে এরূপ মনে করিও না। হেনিমান যে পথ দেখাইয়া দি গিয়াছেন, ক্রমেই তাহার উন্নতি হইবে। এখন হোমিও প্যাথিক চিকিৎসকেরাই সুরাসারে বা সর্করানির্ম্মিত সর্ষপা কার বর্ত্তুলে বা সর্করাচূর্ণ ঔষধ মিলাইয়া, রোগীর ঔষধ সেবন সুখকর করিয়াছেন, এলোপ্যাথিকদিগের সে গাল

ভরা কটুতিক্ত বিষে অনেকেই অব্যাহতি পাইতেছেন। কবিরাজদিগের দুষ্পেয় পাচনেও এখন আর সকলকে উদর পূর্ণ এবং মুখ বিকৃত করিতে হইতেছে না। হেনিমানের কল্যাণে এখন ঔষধ সুপেয় এবং সুভক্ষ্য হইয়াছে। কিন্তু আমি ভূতপূর্ব্ব গোলাপসুন্দরী গাজিপুরবাসিনী ফুলকুমারী দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইতেছি, শীঘ্রই পুষ্পসার এসেন্সই মানুষের রোগনাশে সুখকর সহায় হইবে। এখন রোগীকে মুখ দিয়া, দন্তবিকাশপূর্ব্বক, ঔষধ-সেবন করিতে হই-তেছে, তখন রোগীকে নাসারন্ধ্রেই ঔষধ-সেবন করিতে হইবে। এখন যত ঔষধই খাদ্য না হয় পেয়, তখন যত ঔষধই হইবে—নাসাসেব্য—ঘ্রেয়। রোগের ঔষধ এখনও অদৃশ্য অনুমেয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাত্রায় তরলরূপে বা অতিক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকারে—মুখ দিয়া রোগীর দেহে প্রবেশ করিতেছে ; তখন সেই অত্যতিসূক্ষ্ম মাত্রাই আতর বা এসেন্সে মিশ্রিত হইয়া সুঘ্রেয়রূপে রোগীর নাসারন্ধ্র দিয়া দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, রোগ নাশ করিবে। তখন মানুষ রোগশয্যায় পড়িয়াও স্বর্গীয় সুখের উপভোগ করিবেন।

রসিক পাঠক, এ মত যে, কেবল গোলাপসুন্দরীর মুখেই শুনিতে পাওয়া গেল, এরূপ নহে। বিলাতের গন্ধ-রাজাধিরাজ সৌরভসম্রাট গ্রস্‌স্মিথও এই মতের ঘোষণা করিতেছেন। ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিশারদ চিকিৎসককুলতিলকদিগের মধ্যেও অনেকে এই মতের পোষকতা করিতেছেন। ভিষক্‌কুলের তিলক না হই-য়াও ভিষক্‌বংশজ আমরা এই মত সমর্থন করিয়া থাকি। কিন্তু গোলাপসুন্দরীদিগের প্রাণও ত আমাদিগের প্রাণা-ধিক। কোটি কোটি গোলাপকুমার ও গোলাপকুমারীর হত্যা হইতেছে ; নিত্য নিত্য প্রাণের জন্য, অসংখ্য-কোটি ফুল-কুমারী ও ফুলকুমারকে প্রাণ দিতে হইতেছে ; ইহা ভাবিয়া আমরা শোকে অধীর হইয়াছি। যাহার প্রাণের মূল্য অধিক, মৃত্যু তাহাকেই অকালে টানিয়া লয়, ইহা দেখিয়া-ই ত আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, কবিবর শেলির বাক্য বেদবাক্য ;—সত্যই এ সংসারে এখন শয়তানই প্রধান রাজা, ভগবান ও তাঁহার পুণ্যসৈন্যকে শয়তান ও তাহার পাপ পলটনের হাতে পরাজিত হইতে হইয়াছে!

অতএব, ফুল-প্রাণের মূল্য সম্বন্ধেও ত দুই কথা কহিতে হয়। আমরা নিজে কোন কথা কহিব না, ফুল রাজরাজেশ্বরের কন্যা গোলাপকুমারীই মূল্যের কথা নিজে কহিতেছেন। তিনিই বলিতেছেন ;—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুলগেরিয়া প্রদেশেই আমাদের গোলাপবংশের বিশাল বাসস্থান ; সেখানে ৪০ মাইল ভূমি কেবল গোলাপেই গোলাপময়ী। পূর্ব্বে স্থূল হিসাব দিয়াছি—টন হইতে নামিয়া মনের হিসাব দিয়াছি ; মনকে সেরে পরিণত করিয়াও যে, হিসাব না দিয়াছি এমন নহে। কিন্তু এখন আর একটু সূক্ষ্ম হিসাব দিতেছি। ৭২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৬০০ সের গোলাপ অর্থাৎ বাছা গোলাপ-পাপড়ী না হইলে, ২।০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ সের ২ ছটাক আতর হয় না। এই ৩৬০০ সের গোলাপ-দলের জন্য ৭।০ বিঘা জমিতে গোলাপ চাষ করিতে হয়। এক সের গন্ধসারের মূল্য ৫৪০ টাকা। ৮০ তোলায় সের ; এক তোলা বা এক ভরিতে পড়িল ৭ টাকা। এ দর পাই-কেড়ী ; যিনি দশ বার সের আতর কেনেন, তিনিই এই দরে পান ; মূল্য কম হইল না। খুজরা লইতে গেলে, প্রতি ভরি ১৬৲ টাকা দিতে হয়। কিন্তু এই গোলাপ-গন্ধসারের এই আটা বা আতর মূল্যের আবার ইতরবিশেষ আছে ; সকল গাছের ফুলে সমান আতর হয় না, আবার এক গাছের ফলেই সকল সময়ে সমান আতর হয় না। আতরে তারতম্য হয়, নানা কারণে। জল বায়ুর সহিত—আর্ত্তব আনুকূল্য প্রতি-কূল্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রথমশ্রেণীর আতরের মূল্য অনেক সময়েই ভরি ১৬৲ টাকারও অধিক হইয়া থাকে। ফরাসিরাজ্যের নর নারীই সকল বিলাসের ন্যায় গন্ধ বিলাসেও অদ্বিতীয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট আতর ফরাসিরাজ্যেই গিয়া থাকে। তারপর অস্ট্রিয়া এবং আমেরিকা। ইংরেজ আরও নীচে। বুলগেরিয়া-পার্শ্বচরী রুমেনিয়া হইতে বৎসর যে ১২ লক্ষ টাকার আতর রপ্তানী হয়, তাহার সারভাগ ফরাসি-অঙ্গেই স্থান পায়। কিন্তু এমন আতর অন্যান্য স্থান হইতেও ফরাসীকে লইতে হয়। ফরাসীর স্বরাজ্যেও আতর হয়। বুলগেরিয়ার গোলাপ-হিসাব পূর্ব্বে দিয়াছি, একবার দক্ষিণ ফরাসিরাজ্যের হিসাবেও ইঙ্গিত করিতেছি। সেখানেও বৎসর ৩ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটি ৫০ লক্ষ সের গোলাপ-দল উৎপাদিত এবং সংগৃহীত হয়। আমাদের কত গোলাপ-সন্তানকে প্রাণ দিতে

হয়, ভাব দেখি! এখানেও ২॥০ ভরি গোলাপ তৈল অর্থাৎ আতরের জন্য ১৫০ সের গোলাপকে অপহৃত হইয়া অগ্নিতে সিদ্ধ হইতে হয়। একগুণ গোলাপ-জলে দুইগুণ জল আবশ্যক, দশ সের জলে পাঁচসের পাপড়ী যোগাইতে হয়। এইরূপ সিদ্ধ গোলাপের ধূম শীতল হইয়া গোলাপজলে পরিণত হয়। সেই গোলাপজলে অতিসূক্ষ্মস্তরে পুষ্পতৈল ভাসে,তাহাই আতর। বলিয়াছি ত পাখীর কোমল পালকে করিয়া সেই তৈল—পুষ্পের সেই প্রাণ তুলিয়া লইতে হয়। কামিনীর কোমল হস্তেই ঐ কুসুমপ্রাণ সুচারুরূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আতরের কথা—প্রাণের কথা—আত্মার কথা আর কহিতে পারি না; কত কোটিকোটি গোলাপসন্তানকে প্রাণ দিতে হইতেছে! তাহা আর ভাবিতে পারি না! বংশ নাকি আমাদের রক্ত বীজের ঝাড়,তাই এখনও নির্ম্মূল হইতেছে না। মহাসাগর মৎস্যহীন হইতেছে না, মৎস্য-বংশ অনন্ত বলিয়া, এক মীনসুন্দরীর এক গর্ভে কোটি সন্তানের উপযুক্ত ডিম্ব থাকে বলিয়া,মৎস্যবংশ নির্ব্বংশ হইতেছে না। গোলাপবংশের গোলাপকামিনীরাও বহুপ্রসবিনী,ফুলজাতির ফুলসুন্দরী মাত্রেই বহুপ্রসবিনী তাই ফুলবংশ—বিশেষতঃ আমাদের গোলাপবংশ—এখনও সমূলে বিনষ্ট হয় নাই; নতুবা মানুষের গুণে ত পালান দিতে নাই! কি নিষ্ঠুরতাই ভগবান্ মানবহৃদয়ে ন্যস্ত করিয়াছেন; রাক্ষস বা কোথায় লাগে! দুর্ব্বল কোমল নিরীহ নিষ্পাপ কুসুমবংশের পক্ষে মানুষ রাক্ষসের অধম; আবার গোলাপবংশের পক্ষে তোমাদের মানুষ রাক্ষসাধমেরও অধম!"

এই কথা কহিতে কহিতে প্রাণময়ী গোলাপকুমারীর আত্মা যে,শিশির ভিতর, অশ্রুবর্ষণ করিল না, ইহা আমরা মনে করি না। তাহার উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে যে, কাচকোষ ফাটিল না, ইহাই বিচিত্র। কে বলে কাচ ভঙ্গুর? আমাদের ত মনে হয়, কাচ অপেক্ষা কঠোর হীরা কাচকে কাটে সত্য, কিন্তু একবার দেখিয়াছ কি কাচও হীরাকে কাটে কি না!

উপসংহারে গোলাপ সুন্দরী বলিলেন,—"মর্ত্ত্য পুষ্পের গৌরব দেখাইবার জন্য,একবার তোমাদিগকে আমেরিকায় লইয়া যাই। দেখিবে, ফুলের কৃপায় কত সেখানে লোক কুবের হইতেছে! মার্কিণরাজ্যের নিউইয়র্ক সহরে কি হইতেছে, জান কি? একটা সহরে বৎসরে ২ কোটি টাকার ফুল খরচ হইতেছে, এক হাজার বাগান সহরকে ফুল যোগাইতেছে। নিউইয়র্কে প্রাতে ৬টার সময়ে ফুলের হাট বসে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই কেনা বেচা ফুরাইয়া যায়। ফুলের দর এক এক সময়ে এতই চড়িয়া উঠে যে, স্বর্ণকেও পুষ্পের কাছে পরাজিত হইতে হয়। আমাদের গোলাপবংশেরই গৌরব অধিক। বড় দিনের উৎসবে একবার নিউইয়র্কে যাইও, দেখিবে, চারি গোলাপের এক একটী তোড়া কত হাতে কত বুকে শোভা পাইতেছে! ৪টী গোলাপে কত পড়ে, শুনিবে? প্রত্যেক গোলাপে পড়ে ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫ টাকা, চারি গোলাপে ১৮০ টাকা! ওজন করিলে বুঝিবে, গোলাপের দর স্বর্ণের আট গুণ। এক ভরি সোণায় যদি ২৫ টাকা হয়, ত এক ভরি গোলাপে ২০০ টাকা! বুঝিলে, কেন আমাদের এত অহঙ্কার?" পুষ্প সাম্রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী গোলাপ সুন্দরী নীরব হইলেন; শিশি-স্বর্গে বসিয়া প্রাণময়ী পুষ্পেশ্বরী কি ভাবিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না! কিন্তু বুঝিলাম, পুষ্পই জগতের শ্রেষ্ঠবস্তু, এই জন্যই দেবতারা পুষ্পেই অধিক তুষ্ট হইয়া থাকেন, এই জন্যই ভারতের বর্ত্তমান দেবদেবী সাহেব বিবি ফুলে মুগ্ধ! বুঝিলাম, ফুল নিজের মর্য্যাদা বুঝে, এই জন্যই প্রথমে ভারতের মোগল-রাজরাজেশ্বরী নূরজাহান বেগমের কোমল করে নিজের প্রাণ ন্যস্ত করিয়াছিল; নিজের আতর-প্রাণকে ফুলেশ্বরী ভারতেশ্বরীর হস্তে তুলিয়া দিয়া, মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল!

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত।

আস্থা।

মুর্শিদাবাদ জেলার কিন্নরগঞ্জ গ্রাম দিবসের কর্ম্মাবসানে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। শীতকাল, মাঘমাস; সন্ধ্যা ঘনাইবার পূর্ব্বে গো-কুল গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে; কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে গৃহে ফিরিয়াছে; পল্লী বালকদিগের দাঁড়াগুলি বা কপাটি খেলা বন্ধ হইয়াছে, গ্রামে একটা নীরবতা আসিয়া বসিয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দূরে এক এক দল শৃগাল চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য সারমেয়গণ নিজ নিজ বীরত্ব খ্যাপনে চেষ্টিত হইতেছিল। গোহালে গোহালে ধোঁয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই ধূমরাশি সমুদ্রের জলস্তম্ভের মত প্রথমে আকাশের দিকে উঠিয়া পরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, শিশিরসিক্ত বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ-শূন্যে উঠিতে পারিতেছিল না। সেই ধূমরাশি সমগ্র পথ ঘাট ধূসরচ্ছায়ায় পরিব্যাপ্ত করিয়া পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকুঞ্জ আশ্রয় করিয়া যেন "প্যারালেল বারে" উলটি পালটি করিয়া "জিমনাষ্টিক" খেলিতেছিল। সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল, কিন্তু তার লাল ছটা এখনো একটু বৃক্ষশিরে লাগিয়াছিল। এই লালিমা ধূসরতায় মেশামিশি হইয়া গ্রামে একটা তাম্র আভা প্রকটিত হইয়াছিল। একটা তারা তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাইয়া, কাঁপিতেছিল, এবং পথের উভয় পার্শ্বে দূরে দূরে প্রদীপের ক্ষীণ পীতাভ আলোগুলি ক্রমশঃ জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

এক গৃহের দাওয়ায় হারাধন কর্ম্মকার বসিয়া বসিয়া তাহার জরাদুষ্ট ক্ষীণ দৃষ্টি কষ্টে চালনা করিয়া এ সকল নিরীক্ষণ করিতেছিল।

হারাধনের বয়স ষাটের কিঞ্চিদধিক হইবে। কিন্তু সে এতদূর জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাকে দেখিয়া তাহার অতীত যৌবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা দুরূহ হইয়া উঠে। তাহার অতি ক্ষীণ দেহযষ্টি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার হস্ত ও মস্তক সদা কম্পনশীল এবং তাহার লোল বদনমণ্ডলে একটা শিশুত্বের ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার একটা অভ্যাসদোষ ছিল, সে প্রকাশ্য কথা কহিয়া চিন্তা করিত। এমন কি, এখনো তাহার শুষ্ক ওষ্ঠ নড়িতেছিল, এবং নিজের বিরলকেশ-মস্তকে হাত বুলাইতেছিল। সে তাহার চিন্তায় এতদূর নিমগ্ন হইয়াছিল যে, তাহার পশ্চাতে পদশব্দ ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলেও তাহার সংজ্ঞা হয় নাই। প্রশ্ন পুনরুক্ত হইল। হারাধন ফিরিল।

প্রশ্নকর্ত্তা এক জন শুষ্কদেহ যুবক; বিশীর্ণ ও পাণ্ডুর মুখশ্রী; বেশ ভদ্রোচিত অথচ দারিদ্র্যব্যঞ্জক; পায়ে এক জোড়া ছিন্ন বহু তালিগ্রস্ত ধূলিধূসরিত জুতা তাহার দীর্ঘ পথ পর্য্যটন জ্ঞাপন করিতেছিল। যুবকের পশ্চাতে কিছু দূরে একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী যুবতী দণ্ডায়মান ছিল; তাহারও দেহযষ্টি অনুন্নত ও ক্ষীণ; কিন্তু এখনো তাহার মলিনমুখে বিগত সৌন্দর্য্যের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, এখনো সে মাধুরিমার বহু ভগ্নচিহ্ন তাহার দুঃখ দারিদ্র্যের ইতিহাস স্বরূপে বর্ত্তমান ছিল, কারণ দুঃখ ও সৌন্দর্য্য সখ্যতা করিতে পারে না। "ধনের ঘরে রূপের বাসা।"

বৃদ্ধ হারাধন তাহাদের দিকে ফিরিয়া তাহার ক্ষীণদৃষ্টি তাহাদের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল্লে?' বৃদ্ধ ফিরিয়া প্রশ্ন করিলে যুবক সচকিত-ভাবে চাহিয়া রহিল, সহসা উত্তর করিতে পারিল না কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আত্মসংবরণ করিয়া কহিল—

"আমরা আজ রাত্রের মত একটু আশ্রয় চাই, কোথায় পাইব বলিতে পারেন কি?"

"এখানে শ্যামসুন্দর ঠাকুরের অতিথিশালায় স্থান পাইতে পার, কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু এখনি যাইবে কেন? এখনো রাত হয়নি, হাত মুখ ধুইয়া তামাক খাইয়া যাইবে।"

পল্লীবাসী ও নগরবাসীর পার্থক্য এইখানে।

যুবক যাইয়া দাওয়ায় উঠিল। রমণী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; সে যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে চাহে; কিন্তু যুবকের একটি দৃষ্টি তাহার সে দ্বিধাভাব ঘুচাইয়া দিল; সে অতি সলজ্জভাবে, তার একটু ঘোমটা টানিয়া জড়সড় হইয়া, দাওয়ার একধারে আসিয়া বসিল। যুবকও বৃদ্ধের একটু তফাতে আলোর দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমরা কোথা থেকে আসছ?"

"আজ আমরা নলহাটি থেকে আস্‌ছি; কল্‌কাতা থেকে আজ ১০ দিন রওনা হয়েছি।"

"কল্‌কাতা থেকে! ১০ দিন বেরিয়েছ, তবে বুঝি বরাবর হেঁটেই এসেছ? মা লক্ষ্মীর তবে ত' বড় কষ্ট হয়েছে। অন্যায়, অন্যায়!"

যুবতী লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। বৃদ্ধ কেমন উন্মনস্ক হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ সচিন্তভাবে চালের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিল, যুবকও স্থিরদৃষ্টে বৃদ্ধের ভাবাবলোকন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বৃদ্ধ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলঃ—

"আমার একটি ছেলে কল্‌কেতায় আছে। সে বড় ভাল ছেলে, কল্‌কাতার মধ্যে একজন গণ্যিমান্যি লোক হয়েছে। ছেলে বেলায় সকলে তাকে দেখে মনে কর্‌ত, সে একটা কিছু হ'বে। সর্ব্বদাই বই নিয়ে থাক্‌ত। আমি তাকে কত বারণ কর্‌তাম্ যে, 'বাবা অত পড়লে মাথা ধরবে, চোখ খরিয়ে যাবে,' সে কিন্তু শুন্‌ত না, মোটেই আমার কথা শুন্‌ত না। সে কত কাগজ লিখ্‌ত, ছড়া লিখ্‌ত, সে নিজে নিজেই লিখ্‌ত, আর লিখে কল্‌কাতার খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিত, তারা সে গুলো ছাপিয়ে ধন্যি ধন্যি কর্‌ত। তার গর্ভধারিণী ছেলের কতই না গরব কর্‌ত! বাছাকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে সে আর ছ' মাসও বেঁচে ছিল না।" বৃদ্ধের স্বর একটু অধিক কম্পিত হইয়া উঠিল, একটা উষ্ণ নিশ্বাস, তাহার বক্ষশোণিত খানিকটা শোষণ করিয়া বাহিরের হিম বাতাসে মিশিয়া গেল। বৃদ্ধ নীরব হইল। দাওয়ার সেই নীরবতা বড়ই মর্ম্মবিদারক বোধ হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিল—

"আমিও আমার ছেলের অহঙ্কার করতাম, কিন্তু আমার বোধ হয় আমার চেয়ে তার গর্ভধারিণীই তাকে ভাল বুঝ্‌তে পেরেছিল। যখন বাবা আমার পড়্‌ত, কি লিখ্‌ত, সে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে তার কাছে বসে থাক্‌ত। ওগো, আমরা গরিব লোক, যদি আরো পড়াতে পারতাম, তবে বাবা আমার নিশ্চয় হাকিম টাকিম একটা কিছু হ'ত। যা' হোক, তোমাদের কল্যাণে তার ভালই হয়েছে। সে কল্‌কাতায় চাকরি করতে গিয়ে ছাপাখানায় এক ভাল কর্ম্ম পেয়েছে। অনেক টাকা রোজগার করছে। সে আমাকে খুব ভাল ভাল চিঠি লিখ্‌ত; তার বিদ্যের কথা কি বল্‌ব বাবা, চিঠির সব কথা আমি বুঝ্‌তেই পার্‌তাম না।

"তার পরে খবর পেলাম সে এক বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছে। তার পর থেকে তার চিঠি আসা বন্ধ হ'য়ে গেল; আর আমি তার কোন খবর পাই নি। সে আ—জ পাঁচ বছর হ'ল! তুমি তার কোন খবর জান কি বাবা? তার নাম ফটিক চন্দর কর্ম্মকার।"

যুবতী বিস্ফারিত লোচনে বৃদ্ধের কাহিনী শুনিতেছিল এবং যখন বৃদ্ধ পুত্রের নামোচ্চারণ করিল, সে একটি অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। পথিক তাড়াতাড়ি তাহার হাত টিপিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল—"আমি তার কোন খবর জানি না।"

"বটে? বোধ হয় তার অনেক কাজ, চিঠি লেখার সময় পায় না। তোমাদের কল্যাণে, দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে তার কোন অকল্যাণ হবে না, আমি তার বড় অহঙ্কার করে থাকি। সে যেখানে যেমন থাকুক, তার বুড়ো বাপকে সে মনে করেই। তার একটু অবকাশ হইলেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, হয় ত' তার বৌ নিয়েই আস্‌বে। তার গর্ভধারিণী মরে যাওয়ার পর আমি অনেক দিন নিজের বাড়ীতে একলাই ছিলাম, মনে কর্‌তাম, সে বৌ নিয়ে এসে আমায় দেখ্‌বে। কিন্তু অনেক দিন দেখ্‌লাম সে এল না, আমিও অশক্ত হ'য়ে পড়্‌লাম, তখন আমার মেয়ে আমায় তার বাড়ীতে নিয়ে এল। এই আমার মেয়ের বাড়ী, এখানে বেশ সুখেই আছি, মেয়ে জামাই খুব যত্ন করে। যখন ফটিক বাড়ী আস্‌বে, তখন আর আমার ভাবনা কি? আবার নিজের বাড়ী ফিরে যাব, নতুন করে' ঘর তুলব—"

যুবতী ত্রস্তভাবে দাওয়া হইতে উঠিয়া বাহিরে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া দাঁড়াইল। যুবক তাহা দেখিয়া তাহার নিকটে গিয়া দেখিল—সে কাঁদিতেছে। যুবক বলিল "ক্ষীরো,—" যুবকের কণ্ঠরোধ হইল নয়ন সিক্ত হইয়া উঠিল।

যুবক অনতিবিলম্বে আত্মসংবরণ করিয়া বৃদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিল, বৃদ্ধ তখনো সেইরূপ ভাবে দুই হাতে মাথা ধরিয়া আপন মনে বসিয়াছিল।

যুবক আসিয়া আবার বসিল, পরে ধীরে বলিতে লাগিল—"আপনার কি বিশ্বাস হয় যে আপনার ছেলে তা'র বিয়ের পর অদৃষ্টবশে স্বর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছে এবং দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে মনুষ্যোচিত সংগ্রাম না করিয়া উচ্ছন্ন গিয়াছে! আমি আপনার ছেলেকে বিলক্ষণ চিনি, সে যতদূর নীচ ও কুক্রিয়াশক্ত হইতে পারে হইয়াছিল এবং একটি তদ্গতপ্রাণা লক্ষ্মীস্বরূপা সরলাকেও নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। কিন্তু আবার ঈশ্বরানুগ্রহে ও তাহার লক্ষ্মী স্ত্রীর একান্ত যত্নে সে এক্ষণে সমস্ত কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সুদিনের আশায় বুক বাঁধিয়াছে। তাহারা এখন একান্ত নিঃস্ব।"

বৃদ্ধ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই ক্ষীণ আলোকে একবার যুবকের দিকে মিটমিট করিয়া চাহিয়া দেখিল এবং একটু হাসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"তুমি আমার ছেলেকে জান না?"

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজাধিরাজ

শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর।

রাজবংশের ইতিবৃত্ত।

লাহোরের অন্তঃপাতী কোটলি গ্রামে সঙ্গম রায় নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি জাতিতে কপূর কায়স্থ। বাণিজ্য ব্যপদেশে সঙ্গম রায় নিজ পুত্র বঙ্কবিহারী রায়ের সহিত বর্দ্ধমানের অনতিদূরে বৈকুণ্ঠপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বঙ্কবিহারীর পুত্র আবু রায় হইতেই বর্দ্ধমান রাজবংশের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়; ফলতঃ আবু রায়ই বর্দ্ধমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আবু রায়ের পরলোক-প্রাপ্তির পর, তৎপুত্র বাবু রায় বর্দ্ধমান ষ্টেটের অধিকারী হন, এবং তাঁহার পুত্র ঘনশ্যাম রায়ের রাজত্বকালে বিখ্যাত "শ্যাম সায়ার" নামক দীর্ঘিকা খনিত হইয়া ঘনশ্যাম রায়ের এক বিপুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ঘনশ্যাম রায়ের তিরোধানে কৃষ্ণরাম রায় পৈত্রিক জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। তিনিও বর্দ্ধমানের 'কৃষ্ণসায়ার' নামক দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সম্রাট আরঙ্গজেবের নিকট হইতে সম্মান-জনক সনন্দ প্রাপ্ত হন। তৎপরে জগৎরায় ও কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বর্দ্ধমানে রাজত্ব করেন। দিল্লীর বাদসাহ কীর্ত্তিচন্দ্রকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন এবং তৎপুত্র চিত্রসেন "মহারাজ" উপাধিপ্রাপ্ত হন। চিত্রসেনের পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় পিতৃব্য মিত্র সেনের পুত্র তিলকচন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর সম্রাট আহম্মদসা কর্ত্তৃক সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং "মহারাজাধিরাজ" ও "পঞ্চাহাজারি" উপাধিদ্বয় লাভ করেন। পঞ্চহাজারির অর্থ পাঁচ হাজার সৈন্যের নেতা। তিনি পাঁচ হাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, এবং কামান রাখিবার ও রণবাদ্য ব্যবহার করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় পুত্র তেজচাঁদ বাহাদুর বর্দ্ধমানের গদি লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলসূত্র—১৭৯৩ সালের ১নং রেগুলেশন প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজ তেজচন্দ্রের জীবিতাবস্থায়ই তদীয় পুত্র প্রতাপচাঁদ কিছুকালের জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহারাজ প্রতাপচাঁদ বাঙ্গলা দেশে পত্তনি মহলের প্রবর্ত্তন করেন, এবং তাহা হইতেই ১৮১৯ সালের পত্তনি আইন বিধিবদ্ধ হয়। মহারাজ তেজচাঁদের জীবিতাবস্থায়ই মহারাজ প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হয়। প্রায় ৬০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৮৩২ সালে মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পোষ্যপুত্র মাতাবচাঁদ বাহাদুর বর্দ্ধমান গদিতে অভিষিক্ত হন। তিনি একক্রমে ৪৭ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং বঙ্গদেশে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত হন। তৎকালীন গবর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। মহারাজ মাতাব চাঁদের পূর্ব্বে অন্য কোন বঙ্গসন্তান এ গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। মহারাজ মাতাবচাঁদ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করেন। ১৮৭৭ সালের দিল্লী দরবারে তিনি রাজ গৌরবসূচক ১৩ তোপের সম্মান লাভ করেন, এবং অন্যান্য করদ ও মিত্র রাজগণের ন্যায় তিনিও "হিজ হাইনেস্" এই ব্যক্তিগত উপাধি প্রাপ্ত

হন। মহারাজ মাতাবচাঁদ ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পোষ্যপুত্র আবতাবচাঁদ বাহাদুর সিংহাসন প্রাপ্ত হন—কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৮৮৫ সালের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে মহারাজ আবতাবচাঁদ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পত্নী নাবালিকা থাকা হেতু বর্দ্ধমান রাজষ্টেট কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের অধীনে আইসে।

মহারাজ আবতাবচাঁদের উইলানুসারে মহারাণী যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। তৎপরে বর্ত্তমান মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর পোষ্যপুত্র রূপে গৃহীত হন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে গবর্ণমেণ্ট এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ অনুমোদন করেন।

জন্ম ও শিক্ষা।

১৮৮১ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য পিতা রাজা বনবিহারী কর্পূর সাহেব বাহাদুর সেই সময়ে বর্দ্ধমান ষ্টেটের সহযোগী ম্যানেজার রূপে কার্য্য করিতেছিলেন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দ হইতে তিনি সোল-ম্যানেজার রূপে কার্য্য করিয়াছেন। রাজা বনবিহারীর ন্যায় বিচক্ষণ ধীরপ্রকৃতি এবং বিষয়-কার্য নিপুণ কৌশলী পুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একদিকে যেমন বর্দ্ধমান ষ্টেটের সুব্যবস্থা করিয়াছেন, অপর পক্ষে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের সুশিক্ষার বন্দোবস্তের ত্রুটি করেন নাই। উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে পুত্রের শিক্ষাভার ন্যস্ত করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। রাজা সাহেব সর্ব্বদা পুত্রের নৈতিক বৈষয়িক ও চরিত্রগত উন্নতি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আজি তাহারই গুণে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ বাহাদুরের শিক্ষা দীক্ষা, বদান্যতা ও সহৃদয়তার যশঃসৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

রাজ্যাভিষেক।

বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী আমাদিগের অস্থায়ী ছোটলাট মাননীয় বোডিলন বাহাদুর বর্দ্ধমানে যাইয়া মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এ উপলক্ষে আমোদ প্রমোদ যথেষ্ঠ হইয়াছে, অধিকন্তু মহারাজাধিরাজ প্রজার খাজানা রেহাই প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া স্বীয় বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এতকাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। এখন মহারাজ রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন। বিগত করোনেশন দরবারে তিনি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর যেমন সুশিক্ষিত গুণগ্রাহী এবং মহানুভব—সেইরূপ তিনি বাঙ্গলাভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং অনুরাগী। মহারাজ যে কমলার বরপুত্র হইয়াও বাণীর আরাধনায় অমনোযোগী নহেন—তাঁহার রচিত "বিজয় গীতিকা"ই ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

আমরা আশীর্ব্বাদ করি মহারাজ দীর্ঘজীবী হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করুন, এবং দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া যশস্বী হউন।

মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার।*

এদেশের ইংরাজী শিক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইলেই স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচরণ সরকারের নাম স্মৃতিপথে উদিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি তাঁহার ফার্ষ্ট বুক পাঠ করেন নাই। ফলতঃ ফার্ষ্ট বুকেই অনেকের ইংরাজী অক্ষর-পরিচয় হইয়াছে। এ দেশে প্রাইমারি শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সর্ব্বতোমুখী চেষ্টার বিষয় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহাত্মা প্যারীচরণের কর্ম্মময় জীবন লোক-শিক্ষাকল্পেই ব্যয়িত হইয়াছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এতকাল পর্য্যন্ত এই মহাত্মার সাধু জীবনচরিত সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, মহাশয় প্যারী বাবুর এক খানি জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়া সাধারণের অভাব কতক পূরণ করিয়াছেন।

লোকশিক্ষার ন্যায় পবিত্র কার্য্য এ জগতে আর নাই, কিন্তু বৈষয়িক অন্য কার্য্যের ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ ও পদ-গৌরবের আশা শিক্ষা-কার্য্যে আদৌ নাই। মহাত্মা প্যারীচরণ এ সব দিকে দৃষ্টি না করিয়া লোক-শিক্ষা কার্য্যই জীবনের সার ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা প্যারীচরণের এই ক্ষুদ্র জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার অলৌকিক স্বার্থত্যাগ অসাধারণ ন্যায়-পরায়ণতা অপরিসীম বদান্যতা সর্ব্বোপরি তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাই। তাঁহার এই নিরুপম চরিত্রগুণে তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতার একান্ত প্রিয় ও বরেণ্য হইয়াছিলেন। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণ প্যারিচরণের বড়ই আদরের বস্তু ছিল। তাহাদের ভাবী উন্নতিবিধানই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল—গ্রন্থ মধ্যে আমরা ইহার পরিচয় পাই, সেই জন্যই গ্রন্থকার কর্ত্তৃক—এই মহৎ জীবনচরিত যাহারা প্যারীচরণের অতি প্রিয় ও যাহাদের মঙ্গল সাধনই তাঁহার একমাত্র জীবনব্রত ছিল—সেই ছাত্রবৃন্দের পবিত্র নামেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

তিনি বারাসত অবস্থান কালে তথায় বালিকা-বিদ্যালয় শ্রমজীবি-বিদ্যালয় কৃষি বিদ্যালয় প্রভৃতি বিবিধ সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন ও তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। মফঃস্বলবাসী ছাত্রগণের থাকিবার অসুবিধা দূর করণোদ্দেশে তিনিই প্রথমে ছাত্রাবাস প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতার হিন্দুহোষ্টেল ও বারাসতে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে প্যারীচরণ সাধারণের শিক্ষা ও লোক-হিতকর বহু সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন। পরদুঃখে তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইত, তাই আমরা দেখিতে পাই তিনি নিজে ঋণগ্রস্থ হইয়াও পরদুঃখ মোচনে অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন। তিনি দান করিয়া ভ্রমেও কখনও আত্মগৌরব অনুভব করেন নাই, কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন মাত্র এইরূপ বোধ করিতেন। কি পরিবারপ্রতিপালনে কি বন্ধু বান্ধবের সহিত ব্যবহারে সর্ব্ব বিষয়েই তিনি বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন।

তাঁহার অচলা মাতৃভক্তি ও অকৃত্রিম বন্ধু বাৎসল্য দর্শনে আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হই। বারাসতের স্বর্গীয় ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র, কালীকৃষ্ণ মিত্র, এবং মহাত্মা বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহানুভবগণ তাঁহার অন্তরঙ্গ ও পরমবন্ধু ছিলেন। উল্লিখিত বন্ধুগণের সাহচর্য্যে তিনি বহু সদনুষ্ঠান করিয়াছেন। সমাজ সংস্কার কার্য্যে প্যারীচরণ মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই প্যারীচরণ সুরাপানের বিরুদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তদীয় শিক্ষাগুরু মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার এ বিষয়েও তাঁহার মন্ত্রদাতা ছিলেন। যখন প্রথম এ দেশে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার হয় তখন দেশীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায় মধ্যে এক ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে সুরাপান না করিলে ইংরেজদিগের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব নহে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক শিক্ষিত যুবা সুরা রাক্ষসীর করাল-কবলে নিপতিত হন। সুরাপানের বিষময় ফল ও সমাজের ভাবী অনিষ্টের বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিয়া মহাত্মা প্যারীচরণ সুরারাক্ষসীর বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধে ব্রতী হন। সভাসমিতি করিয়া, সংবাদ পত্রে লিখিয়া এবং বক্তৃতা প্রদান করিয়া, সুরাপানের অপকারিতা সাধারণের নিকট ঘোষণা করেন। যাহাতে এই বিষম ব্যাধি সমাজ-দেহকে জরাজীর্ণ করিতে না পারে তাহার জন্য মহাত্মা প্যারীচরণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার ফলে মাদক নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত ও "ওয়েল উইশার" নামক একখানি ইংরেজি মাসিক পত্র ও ইংরাজি

* জীবনচরিত—শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, প্রণীত, মূল্য ১।০

জন্য "হিতসাধক নামক" বাঙ্গলা মাসিক পত্র প্রচার হয়। প্যারীচরণ বিশেষ দক্ষতার সহিত এই পত্রদ্বয় পরিচালন করিয়াছিলেন। এই "ওয়েল উইশার" ও "হিত সাধকে"র মলাটে মাদক-সেবন-বৃক্ষের যে রূপক চিত্র মুদ্রিত করিতেন, তাহার ভীষণ সত্যতা সাধারণের মনে আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল। "পাপপ্রবৃত্তি, চিত্তদৌর্ব্বল্য, ভোগলালসা, কুসংসর্গ, অন্ধ সৃষ্টান্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ঐ মাদকসেবন তরুর মূল; দরিদ্রতা, কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা, দুষ্ক্রিয়াশক্তি, রিপুপ্রভুত্ব, বুদ্ধিভ্রংশতা উহার শাখাবলী এবং মনস্তাপ, ক্রোধ, ব্যভিচার, আত্মহত্যা, অকাল মৃত্যু, অপমৃত্যু ঐ পত্রপুষ্প-শোভাশূন্য সতেজ বীভৎস বৃক্ষের অগণিত ফল। এক দিকে সয়তান উহার পদমূলে জলসেচন করিতেছে অপর দিকে মৃত্যু উহাকে ভূমিসাৎ করিবার জন্য কঙ্কালসার হস্তে কুঠার উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান এবং পরমেশ্বরের রোষাগ্নি উহাকে বিদগ্ধ করিবার মানসে শিখর দেশে অবতরনোন্মুখ।"

এক সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত এডুকেশন গেজেটের বেতন ভোগী সম্পাদক ছিলেন। ইহার পরিচালনে তিনি প্রভূত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও উক্ত ভার পরিত্যাগের সময়েও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন।

আমরা অতি সংক্ষেপে মহাত্মা প্যারীচরণের মহৎ জীবনের আভাষ প্রদান করিলাম মাত্র। কিন্তু সকলকেই একবার এই সুলিখিত জীবনচরিতখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে জানিবার শুনিবার শিখিবার অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা মার্জ্জিত ও সরল। পাঠক মাত্রেই ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন আশা করা যায়—সেই জন্যই ইহার বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়।

সপত্নী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নরেশ বাবু প্রয়োজন উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। অদ্য প্রাতে তিনি হরিপুরে ফিরিয়াছেন। হরিপুর তাঁহার পৈতৃক-বাসস্থান নহে শ্বশুরবাটী। নরেশচন্দ্র বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র সুন্দরী কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং তদবধি এই স্থানেই বাস করিতেছেন।

নরেশ বাবু সুপুরুষ, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান যুবক। বিষয়কর্ম্ম করিলে তিনি সংসারে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিতেন না, এমন নহে। কিন্তু অদৃষ্টের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা হেতু তাঁহাকে জীবন-সংগ্রামের কোনই কঠোর আঘাত ভোগ করিতে হয় নাই এবং জীবিকাপাতের জন্য তাঁহাকে কোনই আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। সর্ব্বপ্রকার ভোগৈশ্বর্য্য পরিবৃত হইয়া তিনি বিলাসের ক্রোড়ে কালপাত করিতেছেন; অভাব অপ্রতুলতা জনিত নিদারুণ উদ্বেগ তাঁহার সমীপেও অগ্রসর হইতে অশক্ত। তথাপি নরেশচন্দ্র অসুখী, অশান্ত ও অপ্রসন্ন।

নরেশচন্দ্র কুলীন সন্তান। অতি শৈশবে কলিকাতা-সন্নিহিত উত্তরপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র ব্যক্তির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই বালিকার পিতা নরেশচন্দ্রের পিতামাতার সাতিশয় বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত দীনতা হেতু বৈবাহিকের কোন প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কন্যাকে বা জামাতাকে দেশকাল-পাত্রানুরূপ কোন প্রকার বস্ত্রাভরণ প্রদান করিতে পারেন নাই। নরেশের পিতা বৈবাহিকের এই অপরাধ হেতু পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টায় ছিলেন। রত্নেশ্বর বাবু সেই সময় কন্যার বিবাহার্থ পাত্রের অন্বেষণ করতেছিলেন। কন্যাকে মনের মত পাত্রে সমর্পণ করিয়া এবং এই জামাতাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। নরেশ পরম গুণবান্ হইলেও, বিবাহিত, সুতরাং কুলে শীলে গৌরবজনক জানিয়াও রত্নেশ্বর বাবু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু নরেশের পিতা এই বিবাহ ঘটাইবার

জন্য সাতিশয় উৎসুক হইলেন। তিনি স্বীকার করিলেন, তাঁহার পুত্র আত্মীয় স্বজনের সহিত আর একত্রাবস্থান করিবেন না, পূর্ব্ব-পত্নীর সহিত কোন সম্পর্ক রাখা দূরে থাকুক কখন তাহার নামও করিবেন না এবং সর্ব্বথা রত্নেশ্বর বাবুর বাসনা পরতন্ত্র হইয়া, তাঁহার পুত্রনির্ব্বিশেষে জীবনযাপন করিবেন। বিবাহ স্থির হইয়া গেল। পিতার একান্ত আজ্ঞাধীন পুত্র কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। অচিরে নরেশচন্দ্র রত্নেশ্বর বাবুর বিশাল অট্টালিকায় জামাতারূপে পরিগৃহীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত? তাঁহার কথা কেহই ভাবিল না; কেহই তাহার সন্ধান করিল না; কেহই তাহার অবস্থা বুঝিল না। পিতৃভক্ত নরেশ বুঝিলেন, তিনি পাপাচরণ করিলেন, এক কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া অন্য গুরুতর কর্ত্তব্য অবহেলা করিলেন এবং চিরদিনের জন্য শান্তি ও সন্তোষ হারাইলেন।

পিতামাতার সহিত নরেশের কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়। তাহাতে তাঁহারা দুঃখিত নহেন, পুত্র যে রাজতুল্য ভাগ্যবান্ হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের পরমানন্দ। পাঁচ বৎসর হইল এই বিবাহ হইয়াছে; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একদিনও কাহার নিকট তাঁহার প্রথমা পত্নীর নামও উচ্চারণ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় কি এই কল্পনাতীত ভোগৈশ্বর্য্যে আত্মবিক্রয় করিয়া সুখী হইয়াছে?

কলিকাতা হইতে নরেশ গৃহে—এখন রত্নেশ্বর বাবুর ভবনই তাঁহার নিজগৃহ হইয়াছে—প্রত্যাগত হইবামাত্র দাসদাসী বিবিধ বিধানে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছে; স্বয়ং রত্নেশ্বর বাবু আসিয়া তাঁহার শারীরিক কুশলবার্ত্তা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া আনন্দাশ্রু পাত করিতে করিতে ছয় দিন পরে তাঁহার অন্ধকার ভবন পুনরায় আলোকিত হইল বলিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সকলেই সর্ব্বপ্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল আইসেন নাই একজন। নরেশ বাবুর পত্নী হেমলতা এখনও স্বামীর মন্দিরে আইসেন নাই, স্বামীও পত্নীসম্ভাষণের কোন আয়োজন করেন নাই। কেন?

দাসদাসীর যত্নে স্নানাদি শেষ হইল; শ্বশ্রূঠাকুরাণীর যত্নে আহারাদি সমাপ্ত হইল। নরেশ বাবু বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষ বিবিধ মহামূল্য শোভন পদার্থে পরিপূর্ণ। নরেশ একখানি সংবাদ পত্র হস্তে লইয়া তত্রত্য এক মকমল মণ্ডিত কৌচে উপবেশন করিলেন। ধীরে ধীরে পার্শ্বের দ্বার দিয়া এক সপ্তদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কামিনী তথায় প্রবেশ করিলেন এবং নিঃশব্দে আসিয়া নরেশের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পরমাসুন্দরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সুন্দরী বলিলে যে সকল লক্ষণ প্রথমেই আমাদের মনে হয়, সকলই তাঁহার আছে। তাঁহার দেহের বর্ণ চাঁপাফুলের মত, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন সুসঙ্গত ও সুপরিণত, তাঁহার নাক মুখ চ'খ বেশ মানানসহি। তাঁহার কেশরাশি এখন অবেণীসংবদ্ধ। পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিয়া সেই ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপ যেন সুন্দরীর রক্তিম চরণযুগল চুম্বন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। সুন্দরীর সকলই শোভাময় হইলেও, যেন তাঁহার রূপের অনেক অভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নয়নে যেন কামিনীসুলভ সরলতা নাই, তাঁহার দেহে যেন ললনোচিত মধুরতা নাই। যেন পরুষ পুরুষভাবে তাঁহার দেহের সর্ব্বত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার গতি ভঙ্গী সকলই কঠোরতায় প্রলিপ্ত। এই সুন্দরী রত্নেশ্বর বাবুর একমাত্র তনয়া, নরেশ বাবুর পত্নী হেমলতা।

হেমলতা অগ্রসর হইয়া নরেশ বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিরহের পর প্রথম প্রণয়িনী-সন্দর্শনে হৃদয় যেরূপ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, নরেশচন্দ্রের তাহা করিল কি? নরেশচন্দ্র একটু বিচলিত হইলেন, হাতের সংবাদপত্র পড়িয়া গেল একবার অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন তাহার পর একটু কৃত্রিম হাসির সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি ভাল আছ হেমলতা?"

হেমলতার মুখখানা যেন মেঘাচ্ছন্ন। স্বামীর সহিত ছয় দিনের পর সাক্ষাতে তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল না। স্বামীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কয়দিন কি তুমি কলিকাতাতেই ছিলে?"

নরেশ বলিলেন,—"হাঁ।"

হেমলতা জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় ছিলে?"

নরেশ বলিলেন,—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? সুরেশ আমার বাল্যবন্ধু, তাঁহার বাসাতেই আমার থাকিবার কথা ছিল তুমি জান। সেখানেই আমি ছিলাম।"

হেমলতার মুখ যেন আরও গাঢ়তর মেঘাচ্ছন্ন হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সেখানে কে কে ছিলেন?”

নরেশ একটু চিন্তাকুল হইলেন। বলিলেন,—“সুরেশের মা, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার শিশু পুত্র, ঝি ছিল।”

হেমলতার বদনে যেন ক্রোধের রেখা প্রকটিত হইতে লাগিল। একটু বিকৃত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—“আর?”

উদ্বিগ্ন নরেশ বলিলেন,—“আর কি?”

হেমলতা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আর কে সেখানে ছিল, সত্য করিয়া বল।”

একটু বিরক্তির সহিত নরেশ উত্তর দিলেন, “তুমি এরূপ কর্কশভাবে কথা কহিতেছ কেন? আমার ইচ্ছা না হইলে, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি, ইহা মনে রাখিয়া তোমার কথা কহা উচিত।”

হেমলতা একটু চিন্তা করিলেন। মুখে যে কথা বাহির হইতেছিল, তাহা চেষ্টা করিয়া প্রাণের মধ্যে ফিরাইয়া লইলেন। তাহার পর বলিলেন,—“তুমি সত্যবাদী, ধার্ম্মিক বলিয়া লোকে তোমার সুখ্যাতি করে। আমি জানিতাম, সত্য কথা বলিতে তুমি কখনই ভয় পাইবে না। এখন বুঝিলাম, সত্য কথা বলিবার সাহস তোমার নাই।”

নরেশ বলিলেন,—“বড় অন্যায় কথা তুমি বলিতেছ। সত্য কথা কখনই প্রচ্ছন্ন করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমি সত্য কথা বলিতে ভয় পাইতেছি না, কিন্তু তোমার ভঙ্গী দেখিয়া কথা কহিতে আমার সাহস হইতেছে না।”

আবার হেমলতা আর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আমি সকল কথাই জানি। তথাপি তোমার মুখ হইতে কথাটা শুনিতে আমার ইচ্ছা আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কলিকাতায় সুরেশ বাবুর বাসায় আর কাহারও সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই কি?”

নরেশ বাবু বিশেষ বিরক্তির সহিত বলিলেন,—“তোমার এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নহি। তথাপি বলিতেছি, সেখানে আমার পত্নী কুমুদিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাক্ষাৎ হইয়াছিল কেন—আমরা কয়দিন একত্র বাস করিয়াছি। তুমি জান বা না জান, এ কথা তোমার নিকট লুকাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। তবে এখনই না বলিয়া সময়ান্তরে ইহা তোমাকে জানাইতাম। তোমার দৌরাত্ম্যে এখনই তোমাকে জান-ইতে হইল।”

তখন হেমলতা কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠি-লেন। কি বলিতে হইবে, কি করিতে হইবে, তাহা যেন তিনি ভুলিয়া গেলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল, দেহের নানা স্থানে উচ্চ শিরাসকল দেখা দিল। অধর কম্পিত হইতে থাকিল। সেই সুন্দরীকে তখন বিকট-কায়া রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—“বিশ্বাসঘাতক, তাহার সহিত জীবনে আর কখনই সাক্ষাৎ করিবে না,এই সত্যে তুমি বদ্ধ ছিলে না?”

অসীম ধৈর্য্যের সহিত নরেশ বাবু বলিলেন,—“না। আমার পিতা তোমার পিতার সহিত এইরূপ সত্যবদ্ধ করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। পিতৃ সত্য পালন করিতে আমি নিশ্চয়ই বাধ্য। কিন্তু তাঁহার সত্যবন্ধনের বহুপূর্ব্বে নারায়ণ, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া, পবিত্র বেদমন্ত্র সহকারে আমি যাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাকে নিরপরাধে ত্যাগ করিবার কোনই কারণ আমি দেখিতে পাই নাই; সেই জন্য যদি তাঁহার সহিত কয়দিন একত্র বাস করিয়া থাকি, তাহাতে কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। তুমি এই উপলক্ষে যে ভাবে আমার সহিত কথা কহিতেছ, তাহা অতিশয় নিন্দনীয় ও বিরক্তিকর। আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি আর কখনই এভাবে আমার সহিত কোন কথা কহিও না।

হেমলতা ঘোর বিরক্তি-সূচক হাস্য করিয়া বলিলেন,—“ধন্য তোমার স্পর্দ্ধা! তুমি আমাকে সাবধান করিতেছ কেন, এরূপে কথা কহিলে তুমি আমাকে ফাঁসি দিবে কি? কৃতঘ্ন, নরাধম, জান না, তুমি কি অবস্থা হইতে এই সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাইয়াছ? যাহার জন্য তোমার এই সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, তাহার নিকট চিরদিন বিনীত ও কৃতজ্ঞ না থাকিয়া আজি তুমি তাহাকে দম্ভ দেখাইতে, তাহার কার্য্যের দোষ দেখাইতে এবং তাহার সহিত সমান ভাবে কথা কহিতে সাহসী হইয়াছ। কেন? তোমার এ সাহসের পরিণাম অতি ভয়ানক হইবে জানিও হেমলতা কখনই এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে না।

নরেশের কোন উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই হেমলতা বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই দিন বৈকালে রত্নেশ্বর বাবু একজন দাসীর দ্বারা নরেশকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হেমলতার সহিত সাক্ষাতের পর হইতে অতি কষ্টে নরেশের সময় কাটিতেছিল। তিনি কি করিবেন, অতঃপর কি ভাবে তাঁহার জীবনপাত করা বিধেয়, ইত্যাদি বিবিধ চিন্তায় তিনি নিতান্ত কাতর ছিলেন। সহসা রত্নেশ্বর বাবুর আহ্বানে নরেশ বিচলিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন হেমলতা যে প্রসঙ্গ অবলম্বনে, অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যবহারে উৎপীড়িত করিয়াছেন, তাঁহার পিতাও নিশ্চয়ই তাহারই উত্থাপন করিবেন। তাহাতে ক্ষতি কি? জীবনের যে গতি স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ব্যাকুল হইতেছিলেন, হয়তো রত্নেশ্বর বাবুর সহিত আলাপে তাহা নির্ণীত হইবে এবং নরেশ হয়তো কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

যে দাসী ডাকিতে আসিয়াছিল তাহার নাম লবঙ্গ। সে অনেকদিন রত্নেশ্বর বাবুর সংসারে কাজ করিতেছে, এবং পারিবারিক সমস্ত ব্যাপারেই লিপ্ত হইয়া জীবনপাত করে। তাহার বয়স চল্লিশ অতিক্রম করে নাই, বয়স যতই হউক, সে আপনাকে যুবতী বলিয়া জ্ঞান করে, এবং তদনু-রূপ বেশভূষা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। নরেশ বাবুর যে ব্যবহারে হেমলতা নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, লবঙ্গ তাহার সকলই জানে।

নরেশ জিজ্ঞাসিলেন,—“আমাকে এ অসময়ে কর্ত্তা বাবু কেন ডাকিতেছেন লবঙ্গ?”

লবঙ্গ বলিল,—“আমি দাসী আমার কোন কথা বলিবার দরকার নাই। আপনি সকলই জানিতে পারিবেন জামাই বাবু! দিদি বাবুর সহিত কর্ত্তা বাবুর দেখা হইয়া-ছিল। অনেক কাণ্ড ঘটিয়াছে।”

নরেশ বাবু অনেক কাণ্ড ঘটিবে বলিয়া জানিতেন এবং সে জন্য প্রস্তুত ছিলেন। একবার ইচ্ছা হইল লবঙ্গের নিকট অনেক কাণ্ডের কতক আভাষ জানিবার চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? আবার মনে হইল, একটা দাসীর সহিত এ সকল পারিবারিক অকৌশলের আলোচনা করা অনাবশ্যক। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি এখন যাও লবঙ্গ, আমি এখনই কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট যাইতেছি।”

অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াও লবঙ্গ প্রস্থান করিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল,—“জামাই বাবু, আপনার বড় স্ত্রী নাকি খুব সুন্দরী?”

নরেশ বিরক্ত হইলেন। কোন উত্তর দিলেন না। লবঙ্গ আবার বলিল,—“তা তিনি দেখিতে যতই সুন্দরী হউন না কেন, তাঁহার সহিত দেখা করা আপনার ভাল হয় নাই। এখানে যেরূপ কাণ্ড উপস্থিত তাহাতে এ জীবনে তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাতের আর কোনই উপায় থাকিবে না।”

নরেশ বাবু এই সকল অযাচিত আত্মীয়তা ও উপদেশ শ্রবণে মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু সাবধানে হৃদয়-ভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া বলিলেন,—“যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই ঘটিবে। তুমি এখন যাও, আমি কর্ত্তার নিকট যাইতেছি।

নরেশ বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। অগত্যা লবঙ্গ-লতাকে প্রস্থান করিতে হইল।

অন্তঃপুরের অন্যতম এক কক্ষে এক পর্য্যঙ্কোপরে রত্নেশ্বর বাবু উপবিষ্ট। তাঁহার পত্নী পর্য্যঙ্ক পার্শ্বে মার্ব্বেল আবৃত মেজের উপর আসীনা। রত্নেশ্বর বাবুর দেহ সুদীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, ললাট প্রশস্ত, নেত্রদ্বয় বিস্তৃত, মস্তকের কেশরাশি শ্বেত কৃষ্ণ সংমিশ্রিত, গোঁফ জোড়াটী ঘন, লম্বা ও সযত্ন বিন্যস্ত। বক্ষদেশ লোমাবলী সমাচ্ছন্ন। তাঁহার পত্নী পরমাসুন্দরী, বয়স চল্লিশের অধিক হইলেও, এখনও তাঁহাকে পরিণতাবয়বা যুবতী ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না।

নরেশ ধীরে ধীরে ও অবনত মস্তকে এই দম্পতীর সম্মুখাগত হইলে, গৃহিণী তাঁহাকে সাদরে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নরেশ অন্য কোন উচ্চ আসনে উপবেশন না করিয়া দূরে ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন।

রত্নেশ্বর একটু বিচলিত স্বরে বলিলেন,—আমি শুনি-য়াছি, তুমি কলিকাতায় গিয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। ইহার সমুচিত সুব্যবস্থা না হইলে, আমি তোমার উপর অতিশয় বিরক্ত হইব। তাহার ফল তোমার পক্ষে বড়ই অমঙ্গল জনক হইবে।”

নরেশ কম্পিতকণ্ঠে কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ব্যবস্থা করিতে আমাকে আদেশ করিতেছেন।”

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—“আমার আদেশ করা নিষ্প্রয়োজন, তুমি বুদ্ধিমান ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে তোমার আচরণ বড়ই জঘন্য হইয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই। ভবিষ্যতে এরূপ কোন কার্য্য যেন তোমার দ্বারা আর ভ্রমেও অনুষ্ঠিত না হইতে পারে, তোমাকে অদ্য আমাদের সম্মুখে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।”

নরেশ নিরুত্তর। একটু উত্তেজিত স্বরে রত্নেশ্বর বলিলেন,—“কথা কহিতেছ না কেন? প্রতিজ্ঞা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছ কেন?”

নরেশ বলিলেন,—“আমি জানি না, আমার বিবাহিতা সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করায় আমার কি অন্যায় হইয়াছে। ভবিষ্যতে আর কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতাদি করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা নিতান্ত অসঙ্গত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।”

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—“অন্নহীন, আশ্রয়হীন ভিক্ষুকপুত্র যখন আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলে তখন, তোমার এ ধর্ম্ম জ্ঞান কোথায় ছিল? তোমার পিতা বারংবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তোমার পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।”

হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস অতি আয়াসে সংযত করিয়া নরেশ বলিলেন,—“আমার পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা আমার বেশ মনে আছে।”

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—“তবে হতভাগ্য, সে কথা ভুলিয়া কার্য্য করিতে এখন তোমার লজ্জা হয় না কি?”

নরেশ বাবু বলিলেন,—“পিতার আদেশে এক স্ত্রী থাকিতে অন্য বিবাহ করিয়া আমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা পালনে ও তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য সাধনে আমি বাধ্য। সুতরাং তাঁহার আজ্ঞায় কোন গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াও আমি দুঃখিত হই নাই। আমার পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতাদি বিষয়ে আমার পিতার কোন বিশেষ আজ্ঞা আমি প্রাপ্ত হই নাই। তিনি এ সম্বন্ধে আমাকে কোন নিষেধসূচক আদেশ করিলে, আমি কখনই এ কার্য্য করিতে সাহসী হইতাম না।”

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—“তাহার আদেশ পাও ব না পাও আমাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতে তুমি বাধ্য। সে যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আপাততঃ অধিক বাদ্‌বিতণ্ডা অনাবশ্যক। আমি তোমার পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছি। সে আসিলেই তাহার সম্মুখে সকল কথা শেষ করিব। তোমার এই দারুণ দুর্ব্ব্যবহারে আমি এতই বিরক্ত হইয়াছি যে, যতক্ষণ ইহার একটা শেষ করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার আর কোন শান্তির আশা নাই।”

নরেশ অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। রত্নেশ্বর বাবুর কথাবার্ত্তা বড়ই অপমানজনক নিতান্ত মর্ম্মবিদারক বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তাঁহার পিতা বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কতকগুলি লোকের ক্রীতদাস করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরকীয় বাসনানুবর্ত্তিতা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, ইহা তিনি একবারও মনে করেন নাই। পিতার আজ্ঞায় তিনি দারান্তর পরিগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু কখনও সুযোগ হইলে পূর্ব্ব স্ত্রীর মুখাবলোকন করিলেও তাঁহার পাপাচরণ হইবে, ইহা তিনি কখনি জানিতেন না। অদ্য তিনি আপনার অবস্থা স্পষ্টরূপে প্রণিধান করিলেন। হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ জ্বালা! তিনি বুঝিলেন, শকটবাহী অশ্বতরের অথবা ভারবাহী বলীবর্দ্দের অবস্থাও তাঁহার ন্যায় শোচনীয় নহে। অনেকক্ষণ অধো- মুখে বসিয়া থাকার পর ভীতভাবে নরেশ জিজ্ঞাসিলেন,— “আমার প্রতি আর কোন আদেশ আছে কি? আমি এক্ষণে প্রস্থান করিব কি?”

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—“হাঁ—আপাততঃ প্রস্থান করিতে পার। কিন্তু সাবধান, আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে তুমি এ বাটী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিও না। তোমার পিতা আসিলে তাঁহার সহিত কথা শেষ করিয়া তোমার সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিব।”

নরেশ নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিলেন এবং নিঃশব্দে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

মহারাজা বাহাদুর সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

কে, সি, আই, ই।

বিগত ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্নে শোভাবাজার রাজবংশের মুকুট-মণি মহারাজা বাহাদুর সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব কে, সি, আই, ই, পরলোক গমন করিয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও মহারাজ যুবজনোচিত পরিশ্রমে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী সদালাপী স্বদেশ-হিতৈষী অতি বিরল। তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহারে কি রাজপুরুষগণ কি স্বদেশবাসী-আপামর সাধারণ সকলেই মুগ্ধ হইতেন। মহারাজ প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় মধ্যে সেতুস্বরূপ বিরাজিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত এবং শোকার্ত্ত।

১৮২২ খৃঃ অব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে মহারাজ জন্ম পরিগ্রহ করেন। রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার পিতা ও সুবিখ্যাত মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর পিতামহ। বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দু কলেজে মহারাজা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হন। এবং নয় বৎসর কাল দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া স্বেচ্ছায় ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। এই সময় হইতে মহারাজ দেশহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। যখন কলিকাতা জষ্টিস্ অব্ পিস্ দ্বারা শাসিত হইত তখন হইতে আমরণ কাল পর্য্যন্ত মহারাজ কলিকাতা-মিউনিসিপালিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। মহারাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার মৃত্যুতে মিউনিসিপাল আফিস একদিন বন্ধ হইয়াছিল।

তিনি সমাজনৈতিক রাজনৈতিক এবং দেশহিতকর অশেষবিধ অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যোগদান করিতেন। গবর্ণমেণ্টের কোন বিধি ব্যবস্থার প্রতিবাদকালে রাজপুরুষগণের অসন্তোষ উৎপাদন না করিয়া সসম্মানে ধীর ভাবে তিনি স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিতেন।

মহারাজ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং কয়েকবার ইহার সভাপতিত্বও গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক তিনি রাজোপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭৭ সালে তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রাইভেট প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন। ঐ সালের দিল্লী দরবারে আমন্ত্রিত হইয়া মহারাজা বাহাদুর উপাধি এবং পরে কে, সি, আই, ই, উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন।

সেদিন নিমতলায় যখন তাঁহার দেহ সৎকারার্থ নীত হয় তখন বহু হিন্দুসন্তান তথায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের প্রতি তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

ইতিমধ্যে মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, ছোটলাট সাহেব তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

মহারাজ দিকপাল সদৃশ দুইটি পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সিভিল সার্ভিসের গৌরব হুগলীর সেসন জজ কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং সুবিখ্যাত এটর্ণি কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কনিষ্ঠ পুত্র।

আমরা শোকসন্তপ্ত রাজপরিবারের প্রতি হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। বিধাতা তাঁহাদিগকে শোকে সান্ত্বনা দান করুন, এবং মহারাজের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ সাধন করুন।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেইন।

বিলাতী তারের সংবাদে প্রকাশ ভারত-হিতৈষী মহাত্মা কেইন সাহেব আর ইহ জগতে নাই। এই নিদারুণ সংবাদে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসী মর্ম্মাহত ও শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। ভারতবাসী চির দরিদ্র, নানারূপ অভাব-সাগরে নিমগ্ন, তাহারা একটি মিষ্ট কথার কাঙ্গাল। যিনি এই দুঃস্থ দরিদ্র জাতিকে সহানুভূতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, একটি মিষ্ট কথা দ্বারাও তুষ্ট করেন, তিনিই তাহাদিগের অন্তরঙ্গ এবং পরম বন্ধু। চিরদুঃখী ভারতবাসীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মা কেইন পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতের হিতকর বিষয় সমূহ সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করন ও সৈন্য সংরক্ষণের ব্যয়-হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

যে কারণে স্বর্গীয় ফসেট, ব্রাইট্ এবং ব্রাড্‌লা প্রভৃতি ভারত-হিতৈষী মহাত্মাগণ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছিলেন, সেই কারণে মহাত্মা কেইনও আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

মিঃ কেইন সুরাপাননিবারণ কল্পেও প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, বিলাতের সুরাপান-নিবারিণী সভার তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও পরামর্শে নানা স্থানে সুরাপান নিবারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তিনি কংগ্রেসকেও অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এবং দুইবার কলিকাতার অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

১৮৪০ খৃঃ অব্দের ২৬শে মার্চ্চ বিলাতের চেশায়ারের অন্তঃপাতি সিকোম্বে নগরে মিঃ কেইনের জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে লিভারপুলের রেভা-রেণ্ড ষ্টোয়েল ব্রাউন সাহেবের কন্যা এলিসের পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে দুইবার পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইতে চেষ্টা করেন কিন্তু দুইবারই অকৃতকার্য্য হইয়া ১৮৮০ সালে প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সদস্যরূপে মনোনীত হন। মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রিত্ব কালে তিনি সিভিল বোর্ড অব এডমিরালিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যরূপে ভারতবর্ষের অশেষবিধ কল্যাণ সাধনে ব্রতী ছিলেন।

ভগবান মহাত্মা কেইনের শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করুন, এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

স্বর্গীয় মহারাজ,

সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

KUNTALINE PRESS.

প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা বি-এ, শ্রীযুক্ত কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, এম্-এ ও সম্পাদক।

সূচী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	পুরাতন পুঁথি	৪৩
২।	সেকেন্দ্রা (সচিত্র কবিতা)	৪৭
৩।	কবিরঞ্জন	৪৯
৪।	পৃথিবীর ইতিহাস (সচিত্র)	৫৯
৫।	সে আমার—আমি তার (কবিতা) ...	৬৫
৬।	লুসাই জাতি (সচিত্র)	৬৬
৭।	কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় (প্রতিকৃতি সহ) ...	৭১
৮।	সপত্নী (উপন্যাস)	৭৭
৯।	বহরমপুর "কন্‌ফারেন্স" (সচিত্র) ...	৮৬
১০।	কবিতা-গুচ্ছ	
	মলয় পবন	৮৭
	আভাস	৮৭
	বাসনা	৮৭
	স্বার্থপর	৮৮
	বৈতরণী	৮৮
	চাহিনা	৮৮

প্রদীপের নিয়মাবলী।

১। প্রদীপের আকার সাধারণতঃ ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৩২ পৃষ্ঠার কম হইবে না।

২। প্রদীপের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য সর্ব্বত্র ২॥০ আড়াই টাকা। বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে কাহাকেও দেওয়া হয় না। অনুমতি পাইলে ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠাইয়া মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকি; কেহ একসঙ্গে পাঁচ জন গ্রাহকের টাকা পাঠাইলে তাঁহাকে এক বৎসরের "প্রদীপ" বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে দিয়া থাকি।

৩। সর্ব্বত্রই প্রদীপের এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্টদিগকে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে অর্থাৎ প্রতি টাকায় ৴০ করিয়া কমিশন দিয়া থাকি।

৪। অমনোনীত প্রবন্ধাদি টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া হয়।

৫। অনেক প্রদীপ ডাকঘরে খোওয়া যায়। কেহ যথাকালে প্রদীপ না পাইলে ডাকঘরে সংবাদ লইবেন। তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। কোন সংখ্যা প্রদীপ না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। অন্যথা আমরা তজ্জন্য দায়ী নহি।

৬। কোন পত্রের উত্তর লইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট সহ পত্র লিখিবেন নচেৎ উত্তর পাইবেন না।

৭। চিঠি, পত্র টাকা কড়ি, প্রবন্ধ, সমালোচ্য পুস্তক ও পত্রিকাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে প্রেরিতব্য।

৮। বিজ্ঞাপনের দর জানিতে হইলে পত্র লিখিতে হয়।

৯। ব্যারিং অথবা ইনসফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী,

প্রদীপ-সত্বাধিকারী।

৯২।৪ নং জানবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

নানারূপ গোলযোগ দূর ও হিসাব নিকাশের সুবিধার জন্য প্রদীপের নববর্ষ—পৌষ হইতে না ধরিয়া বৈশাখ হইতে আরম্ভ করা হইল, ইহাতে গ্রাহকগণের কোনরূপ ক্ষতি বা অসুবিধার কারণ নাই। এখন হইতে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যেই ঐ মাসের প্রদীপ গ্রাহকগণের হস্তগত হইবে।

৬ষ্ঠ বর্ষে আমরা বিপুল আয়োজন করিয়াছি, বর্ত্তমান বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যার কাগজ দেখিলেই সকলে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পরবর্ত্তী সংখ্যাসকল যাহাতে আরও চিত্তাকর্ষক ও নয়নমনোমুগ্ধকর হয় তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব।

সহৃদয় গ্রাহকগণ প্রদীপের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য অবিলম্বে প্রদান করিয়া আমাদিগকে এই বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারে সাহায্য করুন, গ্রাহকগণের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র ভরসা।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী,
প্রদীপ-স্বত্বাধিকারী।
কার্য্যালয়—৯২।৪ জানবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্দ্ধ মূল্য! অর্দ্ধ মূল্য!! অর্দ্ধ মূল্য!!!

আপাততঃ ৫ম বর্ষের প্রদীপ সুন্দর বাঁধাই কয়েক সেট অর্দ্ধ মূল্যে দেওয়া যাইবে, যাঁহার আবশ্যক হয়, সত্বর আবেদন করুন, বিলম্বে হতাশ হইতে হইবে, প্রতি খণ্ডের (১২ মাসের সম্পূর্ণ) মূল্য ১৷০ ও ডাক মাশুল ও ভিঃ পিঃ খরচ ।০ আনা, মোট ১৷।০ দেড় টাকায় দেওয়া যাইবে।

ম্যানেজার,
প্রদীপ-কার্য্যালয়।
৯২।৪ জানবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী প্রণীত

গৌরাঙ্গ—(নব প্রকাশিত) বড় বড় ছয় সর্গে সমাপ্ত উচ্চাঙ্গের কাব্য। আরতি—প্রমথ বাবুর পরিপক হস্তের রচনা। এতৎব্যতীত উপাদেয় কাব্যত্রয় পদ্মা—(দ্বিতীয় সংস্করণ); গীতিকা—(দ্বিতীয় সংস্করণ) ও দীপালী—প্রত্যেকের মূল্য দেড় টাকা। গান—(স্বরলিপি সম্বলিত) মূল্য পাঁচ সিকা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস বাবুর দোকানে ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী এবং ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটিবুক্ সোসাইটিতে প্রাপ্তব্য।

আমার নিকট লইলে ডাক ও ভিঃ পিঃ খরচ লাগে না।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র বসু
৩৫।২ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Pure Silver Buttons.

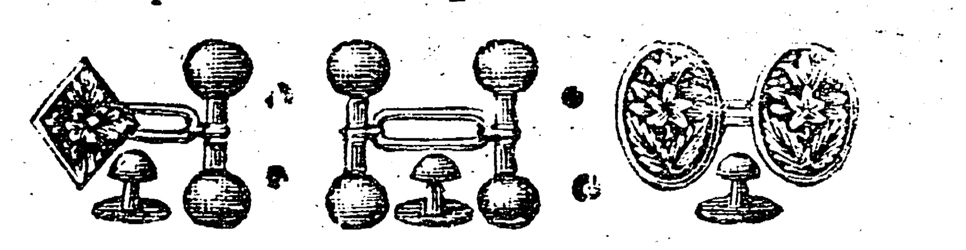

No. 1 Full set Rs. 3. | No. 3 Full-set Rs. 3.
2 do. 2-8. | 4 Canary 4.
Full-set 3 studs 1 collar and pair of sleeve Links.

DASS AND SONS.
15. Charack Danga Road,
P. O. Belleaghatta Road, Calcutta.

THE CORONATION WATCH
INDIAN RAILWAY TIME-KEEPER
HUNTING CASE Rs. 9-8. OPEN FACE CASE Rs. 6—8.
POST FREE- GUARANTEE FOR 5 YEARS

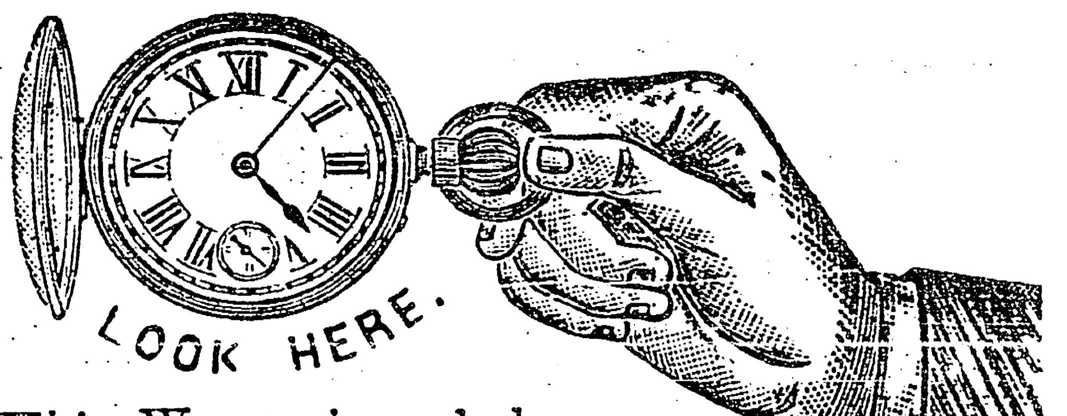

This WATCH is made by Our special orde on the most improved style in order to stand in rough usage suitable for all climates good serviceable and most comfortable to wear : In strong White METAL Case, white Enemelled Dial, Bold Hands, & Figures, sunk Second, 'Key-Less Acction, cylinder Balance, Accurate Time Keeper; with A Decent chain, Glass, spring FREE. ;- Special For Hardworker Over seers And Railway Employees, And to those who Generally go on Horse Back. All WATCHES Regulated And Examined Before Despatch ;-
MANFIELD & CO. WATCH MAKERS
3 MIRZAPUR TANK LANE CALCUTTA

৬ষ্ঠ ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। | ২য় সংখ্যা।

পুরাতন পুঁথি।

(শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল)

যখনকার কথা-প্রসঙ্গের সঙ্গে এই সন্দর্ভের সংস্রব—তখনও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অনেক সাধের বৃন্দাবনের লীলা-খেলা সকল বিস্মৃত হইতে সম্যক্ অসমর্থ। সেই জন্যই তাঁহাকে আপন পোষ্য-পিতা 'নন্দ', পোষণ-কারিণী দয়াময়ী যশোদা, পরম প্রিয় গোপ-বৃন্দ, পরমা প্রীতির নিকেতন গোপীগণ, পরম প্রেমাস্পদীভূত গো-বৎস ও গো-পালক সকলকে অশেষ প্রকারে আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান নিবন্ধন এক সদুপায় সমুদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। তদুদ্দেশ্যেই তিনি আপন প্রাণপ্রতিম অসীম-গুণ-নিধান জীবন-বান্ধব উদ্ধবকে গোকুলে (ব্রজ-ধামে) প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ-গত-প্রাণ অকৈতব বান্ধব উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যথাযথ উপদিষ্ট হইলেন। ভগবানের লিপি লইয়া, সুবর্ণ-রথে বৃন্দাবনে তিনি চলিলেন। রথারূঢ় উদ্ধবের প্রশস্ত চিত্তে এই চিন্তা উদ্ভূত হইল,—"আমার অদৃষ্ট, অত্যন্ত সুপ্রসন্ন ও উন্নত।" কেন না, তিনি তখন কৃষ্ণ-গত-প্রাণা গোপীগণের সন্দর্শন পাইয়া আত্মাকে পুলকিত করিতে পারিবেন। ব্রজধামের নিতান্ত নিরুপম সুদৃশ্য সৌন্দর্য্য ও দৃশ্য সম্ভোগ, তদীয় ভাগ্যে সৌভাগ্যক্রমে সংঘটিত হইবে। যথা,—

"বিমানে চাপিয়া উদ্ধব, ভাবিতে লাগিল।
আজি যে আমারে বিধি প্রসন্ন হইল॥ ১॥
যে গোপিনী, সদা কৃষ্ণ ভাবেন অন্তরে।
তা' সবার দরশন মিলিবে আমারে॥ ২॥
আমার ভাগ্যের কথা বলিতে না পারি।
দেখিব নয়ান ভরি' গোকুল-নগরী"॥ ৩॥

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই—বেলাবসানেই—উদ্ধব, নন্দ-ভবনে উপনীত হইলেন। উদ্ধবকে দেখিতে পাইয়াই, তিনি সম্পূর্ণ-সমাদর-সহকারে মহানন্দে অভ্যর্থনা করিলেন। আহারান্তে উদ্ধব, দিব্য শয্যায় শয়ন করিলেন। গোপরাজ, তাঁহার চরণ-বন্দনে ব্যাপৃত হইবার অবসর লাভ করিয়া, স্বীয় আত্মার কৃতার্থতা ও সার্থকতা—জ্ঞান করিতে লাগিলেন। গ্রন্থে এই বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হইবে,—

"পালঙ্ক-উপরে উদ্ধব, করিল শয়ন।
আসিয়া তো ব্রজরাজ সেবয়ে চরণ"॥ ৪॥

ক্রমে ক্রমে পথ-শ্রান্তি অপনীত হইল। তখন উদ্ধব, শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পুরঃসর উভয় নন্দ-যশোদাকে কৃষ্ণের কথঞ্চিৎ সংবাদ প্রদান করিলেন।

উদ্ধবের বচনাবসানে দেবী যশোমতী, উদ্ধবকে সাদর সম্বোধনে—স-স্নেহ সম্ভাষণে—বলিলেন। দেখ, যখন কৃষ্ণ নিজে না আসিয়া, তোমায় প্রতিনিধি-স্বরূপ পাঠাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই প্রত্যয় হয়—কৃষ্ণ, আর গোকুলে ফিরিয়া আসিবে না। এত দিন কৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষায় তনুতে প্রাণ-সঞ্চার ছিল। এখন এই অসময়ে একমাত্র উপায় বিদ্যমান। যথা,—অনলে প্রাণ বিসর্জন। যশোদা, অক্রূরেরও সেই সূত্রে অনেক কুৎসা করিলেন। বহু দিবস কৃষ্ণের অদর্শন-নিবন্ধন তাঁহার অন্তর-কন্দর, সুত-বাৎসল্য-সমাবেশে উচ্ছলিত হইয়া গেল! কবি কবিচন্দ্রের এই উপলক্ষ্যে উক্তি দেখুন;—

'দারুণ অক্রূর আসি' এত দুঃখ দিল।
নয়নের তারা মোর কাড়িয়া লইল॥ ৫॥
অস্থি-চর্ম্ম-সার হইল কৃষ্ণের শোকেতে।
নিশি দিন কৃষ্ণ-বিনে অন্য নাহি চিতে॥ ৬॥
মনে করি ত্যজি আমি হায় এ শরীর।
বড়ই দারুণ প্রাণ না হয় বাহির॥ ৭॥
যত দিন গেছে বাছা গোকুল ছাড়িয়া।
তত দিবসে * * * রেখেছি বান্ধিয়া॥ ৮॥
নবনী রেখেছি আমি যাহার কারণ।
আসিয়া যাদব মোর করিবে ভক্ষণ॥ ৯॥
আর কত দিনে যাদু আসিবে আমার।
যাদু বিনে দেখি আমি দিবসে আন্ধার॥ ১০॥
যদবধি গেছে বাছা মথুরা-নগরে।
তদবধি গোপী না আইসে মোর দ্বারে॥ ১১॥
তদবধি শিঙ্গা বেণু শুনিতে না পাই।
গোকুল আন্ধার দেখি যেই দিকে চাই॥ ১২॥
ঘর হইল বনবাস বাছার লাগিয়ে।
খসিয়া পড়য়ে বুক ধেনু-পানে চেয়ে'॥ ১৩॥
কহ কাঁহা উদ্ধব আমার রাম-কানু।
ইহা বলি, পড়ে রাণী আছাড়িয়া তনু"॥ ১৪॥

এইরূপই যশোদাদেবীর মর্ম্ম-স্পর্শিনী বিলাপোক্তি। য শ্রবণে ব্যথিত-চিত্ত কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় উদ্ধব। তথাপি না প্রকারে উদ্ধব, যশোদাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা দেখি লাগিলেন। কিন্তু সে সকলই বিফল হইল। সংসারে কেহ কাহারও নহে। চক্ষুঃ মুদিলেই, সব অন্ধকার! পুত্র পৌত্র সকলই মিথ্যা, কেবল মায়ার বন্ধন—ইত্যাকার আধ্যাত্মি তত্ত্ব ও অন্যান্য যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা দ্বারা যশোমতীকে সান্ করিয়া, তদীয় হৃদয়ে দিব্য-জ্ঞান-সঞ্চারের প্রয়াস চলি লাগিল।

যশোদার শোক দেখি' উদ্ধব ভাবিল।
নানামতে যশোদা রাণীকে বুঝাইল॥ ১৫॥
জলের তিলক যেন তিলেক না রহে।
মিছাই সংসার এই জানিহ নিশ্চয়ে॥ ১৬॥
ছাওয়ালে ছাওয়ালে যেন ধূলা খেলা করে।
ধূলার মন্দির ভাঙ্গি' যায় নিজ ঘরে॥ ১৭॥
তেমতি সংসার এই জানিহ নিশ্চয়।
আসিতে যাইতে একা কেহ কার নয়॥ ১৮॥
না বুঝি' দারুণ লোকে বলে, আপনার।
নয়ান বুজিয়া দেখ সকলি আন্ধার॥ ১৯॥
সংসার স্বপন যেন জানিহ নিশ্চয়।
দিন দুই চারি যে পথের পরিচয়॥ ২০॥
পুত্র পৌত্র বলি' কেন পাসর আপনা'।
মোর বশ নহে রাম-কৃষ্ণ দুই জনা॥ ২৩॥
ত্রি-জগতের নাথ তিঁহো সবাকার প্রাণ।
মায়ারূপে তব গৃহে দেব ভগবান্॥ ২২॥
রাম-কৃষ্ণ মনুষ্য নহে জানিহ অন্তরে।
মনুষ্য হইয়া কে বা গিরিরাজ ধরে॥ ২৩॥

এতেক উত্তর যদি উদ্ধব কহিল।
শুনিয়া তো নন্দ-রাণীর দিব্য-জ্ঞান হইল॥ ২৪॥

যশোদার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান সঞ্চারিত হইল সত্য,—কিন্তু শোকবেগ, এতই প্রবল মাত্রায় উঠিল যে, যশোদার পরিতাপের গতিরোধ করা, তাঁহার সাধ্যায়ত্ত রহিল না।

শোক-কাতরা নন্দ-রাণী, তখনও নানা মতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। উদ্ধবকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি তদ্দণ্ডেই বলিতে আরম্ভ করিলেন, নবনীত-হরণের অপরাধে শ্রীকৃষ্ণের কর-চরণাদিতে বন্ধন হইয়াছিল। কৃষ্ণ, তাই ব্রজধাম ত্যাগ করিলেন। এখন তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া, দুঃখে ও ক্লেশে আমার হৃদয়, বিদীর্ণ জীর্ণ ও শীর্ণ।

"না জানি দারুণ প্রাণ আছে কার তরে।
অভাগী ছাড়িয়া বাছা আছে কার ঘরে॥ ২৫॥
চূড়া বান্ধি' দিব রে তিলক দিব ভালে।
পরাইব পীত-ধড়া বন-মালা গলে॥ ২৬॥
শ্রীদাম সুদাম ডাকে যাইতে কাননে।
হাম্বা রব করে' যে ডাকয় ধেনুগণে॥ ২৭॥
আইস আইস কৃষ্ণ বলি' ডাকিতে লাগিল।
অচেতন নন্দ-রাণী ভূমেতে পড়িল॥" ২৮॥

যশোদার শোকাবেগ, ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সমস্ত রজনী গোপ-রাজ নন্দ ও যশোমতী, নিদ্রাসুখানুভবে বঞ্চিত। উদ্ধব, সান্ত্বনা করিতে আসিয়া, তাঁহাদের শোকানল সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন বুঝিয়া, আপনাকে ধিক্কার দিলেন।

এইবার রজনী প্রভাত হইল। উদ্ধব, পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কমণ্ডলু-হস্তে প্রাতঃস্নানের নিমিত্ত যমুনাভিমুখী। যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া, তিনি প্রথমে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হইল, যেন স্বচ্ছ-সলিলা যমুনা, উভয় তীর প্লাবিত করিয়া তরঙ্গ-রঙ্গ-ভঙ্গ করিতে করিতে, প্রবাহিত হইতেছে; পুলিনস্থ কদম্ব-বৃক্ষগুলি, নীরবে মস্তক অবনত করিয়া, দণ্ডায়মান; পক্ষিগণও মনোমোহকারী কল-নিনাদ বিস্মৃত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে। উদ্ধব, মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন—বৃন্দাবনস্থ সমগ্র পশু-পক্ষী,—এমন কি,বৃক্ষলতাও,শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ম্রিয়মাণ। কিন্তু উচ্ছ্বসিত-সলিলা যমুনা, পূর্ব্ববৎই প্রবাহিত। উদ্ধব, স্নান ও ধার্ম্মিকোচিত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে পুলিনাভিমুখে চলিলেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা বৃকভানু-নন্দিনী, বারি আনয়নার্থ সখীগণ সমভিব্যাহারে যমুনা-সন্নিধানে আগমন কালে গোপরাজ নন্দের বহির্দ্বারে এক সুবর্ণ-রথ দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে, কেহ কেহ অনুমান করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ-যশোদাকে মথুরা-পুরীতে লইয়া যাইবার জন্য বৃন্দাবনে সমাগত। কেহ কেহ বা ইহাকে অবিশ্বাস করিলেন। এইরূপে গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, যমুনা-সমীপে উপনীত। উদ্ধব, স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক পীত বস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া যমুনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুসুম-নিভ পরিধৃত পীতাম্বর ও বনমালায় সজ্জিত তাঁহার শ্যাম কলেবর, গোপাঙ্গনাগণের নিকট মানবের কান্তি-বিমিশ্র দিব্য বপুঃ বলিয়াই, প্রতীয়মান হইল; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের ভ্রম অপনোদিত হইল। তাঁহারা উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিলেন। তখন উদ্ধবের পরিচয় ও শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। যখন তাঁহারা জ্ঞাত হইলেন—উদ্ধব,শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ দাস,এবং তাঁহাদের তত্ত্ব লইবার জন্যই তিনি মাধব কর্ত্তৃক প্রেরিত, তখন আনন্দে পুলকিত হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত পত্র শ্রবণ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া, উদ্ধবকে নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উদ্ধব, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের পত্র শোনাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এই—

যেমন প্রাণ,—শরীর ছাড়া নয়,—মৎস্য, জল ছাড়া নয়,—সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণও, শ্রীরাধিকা-ছাড়া নহেন।

'প্রাণ ছাড়া নহে তনু, জল ছাড়া নহে মীন।
তিল-আধ রহিতে না পারি;—
জানিও নিশ্চয় মনে—প্রাণ মোর, তোমার সনে
শূন্য তনু লইয়া আমি ফিরি" ॥ ২৯॥

উত্তরে শ্রীরাধিকা বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিলে, প্রত্যয় হয়; কিন্তু তাঁহার পত্র, কদাপি বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কুল-মান-বিসর্জন দিয়া, তাঁহার সঙ্গ লইলাম! আর—

আমরাই অকূল পাথারে ভাসিলাম! উদ্ধব, তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই গোকুলে আসিবেন।

কখন কখন কুলবধূ, রাত্রিকালে কান্তের বহু ক্ষণ অনুপস্থিতি হেতু যেমন মান-ভরে থাকেন এবং রজনী, ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, অথচ স্বামীর সন্দর্শন লাভ হয় না, কাজেই তাঁহার হৃদয় হইতে অভিমান অপসারিত হয়,—শোকবেগ, আসিয়া তাহার অন্তর আচ্ছন্ন করে; সেইরূপ শ্রীমতী রাধা, বহুদিন কৃষ্ণ-বিরহে জর্জ্জরিত ও অভিমানে অভিভূত; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের কতই দোষারোপ করিলেন—

"ধনলোভে গণিকা লভয়ে অন্য পতি।
নূতন তাহার প্রেম বাড়ে নিতি নিতি॥ ৩০॥
যদবধি সে পুরুষ রহে ধনবান্।
তাবৎ গণিকা, সেই প্রাণের সমান॥ ৩১॥
নির্ম্মূল হইলে আর ফিরিয়া না চায়।
কপট কৃষ্ণের প্রেম জেনো তার প্রায়॥ ৩২॥
সরোবর-মাঝে নিতি হংস-রাজ চরে।
যদবধি সরোবরে না শুকায় নীরে॥ ৩৩॥
শুকাইলে নীর, তায় ফিরিয়া না চায়।
কপট কৃষ্ণের মন, জেনো তার প্রায়॥ ৩৪॥
বিকসিত-পুষ্প-মধু পিয়ে মধুকর।
মধু খেয়ে' বৈসে অন্য পুষ্প মধু'পর॥ ৩৫॥
পুনরপি ফিরিয়া না চায় তার পানে।
কপট কৃষ্ণের প্রীতি জানিহ তেমনে॥ ৩৬॥
সফরীর সলিলে * * * যেমন পিরীতি।
সলিল শুকালে মৎস্য, মরে নিতি নিতি॥ ৩৭॥
সৎস্য মরিলে সলিলের কিছু নাহি দায়।
তেমনি কৃষ্ণের প্রেম জানিহ নিশ্চয়॥ ৩৮॥
এক-বৃক্ষে ফল ধরে অতি মনোহর।
নানা পক্ষিগণ তথা' রহে নিরন্তর॥ ৩৯॥
যদবধি ফল ফুল রহে তরুবরে।
তদবধি পক্ষিগণ তাহাতে বিহরে॥ ৪০॥
ফল তায় শেষ হইলে ছাড়ে পক্ষিগণ।
অন্য বৃক্ষে উড়িয়া করয়ে গমন॥ ৪১॥
পুনরপি সেই বৃক্ষে ফিরিয়া না চায়।
কপট কৃষ্ণের প্রেম জেনো তার প্রায়॥" ৪২॥

অবশেষে শ্রীরাধা, বিচ্ছেদ-জনিত শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। কলঙ্কিনী হইয়া, গুরুজনে গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যে, তাঁহার অদৃষ্টে সুখ হইল না, ইহা তাঁহার ক্ষোভের বিষয়।

"করিয়া কৃষ্ণের প্রেমে কি কাজ করিনু।
নিরবধি বিরহ-অনলে পুড়ে' মনু॥ ৪৩॥
কলঙ্ক রহিল মোর জগৎ ভরিয়া।
গুরুর গঞ্জনে প্রাণ যায় বিদরিয়া॥" ৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণ, ত্বরায় বৃন্দাবনে আসিবেন, এইরূপ আশ্বা দিয়া, উদ্ধবকে, যশোদার, গোপীবৃন্দের ও নন্দের নিক হইতে নিতান্ত নিরানন্দ মনে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল তিনি রথারোহণে গোপীদিগের অনুপম প্রেমের বিষ অনুশীলন ও অনুধ্যান করিতে করিতে, মথুরায় প্রতিগম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর গোকুলের সকলেরই মৃতপ্রা অবস্থা বর্ণনা করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন—ব্রজবাসি গোপিকারা, রাখাল-দল—তৎ-সংসৃষ্ট তাবৎ পশু-পক্ষী অবিশ্রান্ত নিপতিত-নয়ন-বারিতে যমুনার বারি-কলেবর অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছে। ভাবুকপ্রবর উদ্ধবদেবে সেই সকল সকরুণ বচন-শ্রবণে পাষাণও, বিদীর্ণ হয়—শ্রীকৃষ্ণ-প্রমুখের অন্তঃকরণে প্রেমের সঞ্চার হইল, এ কথার উল্লেখ না করিলেও চলে। বাঙ্গালী পাঠক-কু প্রাণ-স্পর্শিনী কঠোর-মধুর "মাথুর" লীলার মাধু আস্বাদনে চির-কাল সমর্থ। ধন্য কবিচন্দ্র! অতুলনা তোমা সুললিত রচনা!

গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(ক) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—কবিচন্দ্র-বিরচিত।
(খ) পত্রসংখ্যা—১২ (বার)
(গ) আকার—দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চ; প্রস্থে—৪ ইঞ্চ।
(ঘ) কাগজ—হরিদ্রা-বর্ণ।
(ঙ) মসী (কালী)—কৃষ্ণ-বর্ণ।
(চ) শ্লোক সংখ্যা—৪০০ (চারি শত)।

"শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" একখানি সুদুর্লভ প্রচীন পুঁথি। ব আয়াসলব্ধ এই পুঁথি-খানি, ১২শ (দ্বাদশ) পত্রে সমাপ্ত পুঁথির ভাষা, অতি সরল। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের সর্ব্বত্রই প্রসাদ

গুণ, বিলক্ষণই বিদ্যমান। ইহাতে শব্দ-চাতুর্য্যের ও ভাব-মাধুর্য্যের তাদৃশ বাহুল্য নাই থাকুক, কিন্তু কবির উৎপত্তির কাল বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত বলিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, নির্দ্দোষ না হইলেও সুকাব্য। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলের সংক্ষিপ্ত বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সময়ান্তরে কবির কবিত্বের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা পাইব। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকাও, অপর সন্দর্ভে বিবৃত হইবে। *

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

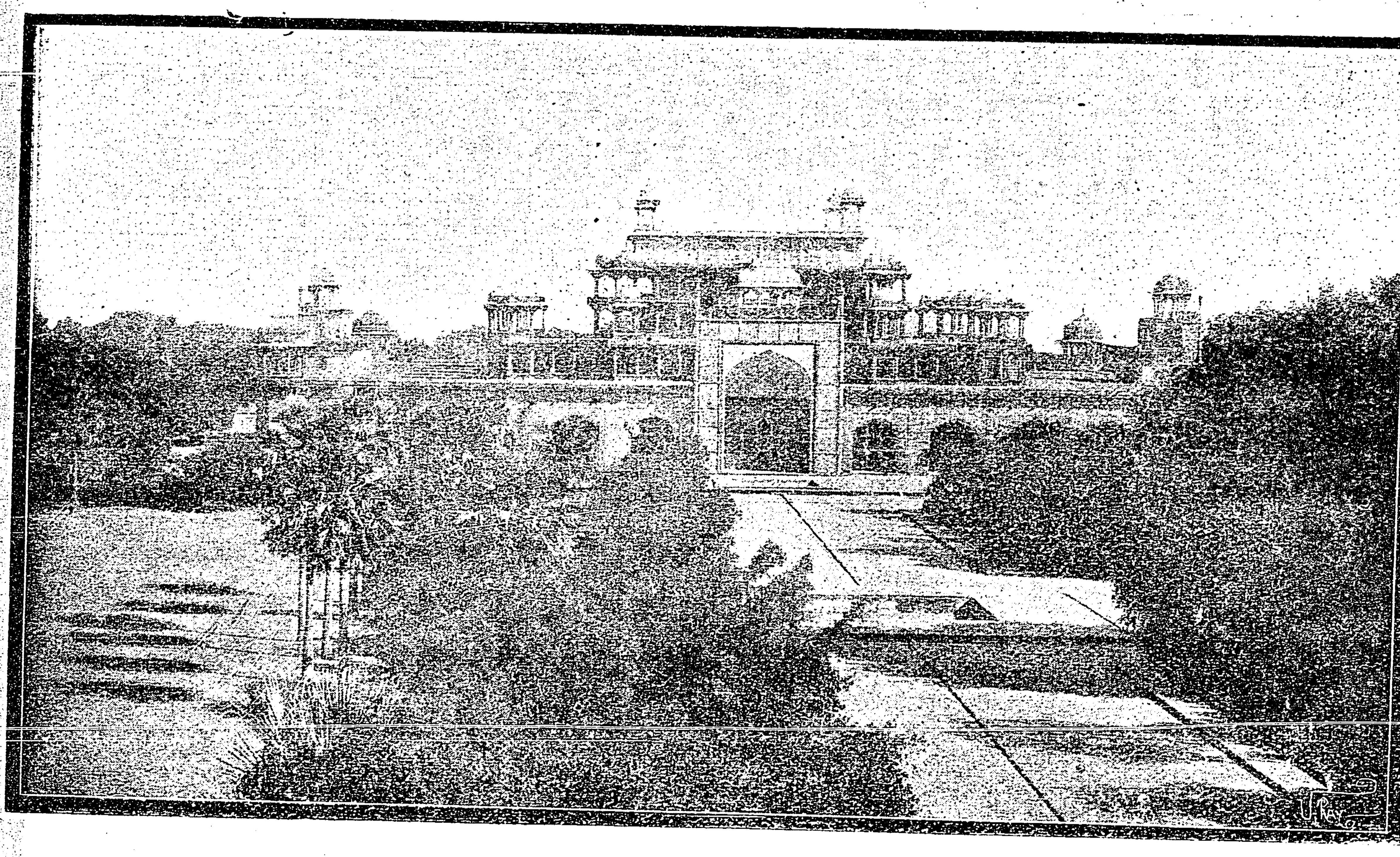

সেকেন্দ্রা।

১

ভারত গৌরব-রবি, মহানিদ্রাবৃত হেথা,
সমাধি শয্যায়;
কি বিস্ময়! কি বিষাদ! মরমে জাগিয়া উঠে,
আসিলে হেথায়!
বিশাল বিরাট শৌধ, চুম্বিছে গগণ-বুক
সমুচ্চ তোরণ!
নয়ন মুদিয়া আসে, নিরখিলে উর্দ্ধপানে
শিল্পের সৃজন!

২

মহাতীর্থ সম এই, নীরব নির্জ্জন স্থল,
পুণ্যের সঙ্গম;
কীর্ত্তিদীপ্ত সম্রাটের, স্মৃতির নির্ঝর বহে
চির মনোরম!
ভূতলে নন্দন সম, কি রম্য উদ্যানরাজী
শোভে চারিধারে;

* এই পুঁথি খানি, মদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব "গোপীনাথ-দাস বেদরত্ন চূড়ামণি" মহানুভবের সংগৃহীত। এই প্রবন্ধের সঙ্কলনে আমাদের ভূতপূর্ব্ব যোগ্য ছাত্র—অধুনা নানা ভাষা-বেত্তা "Edward Institution" স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণের বহুল আনুকূল্য লাভ করিয়াছি। কমলা বাগ্বাদিনী, উক্ত "বিদ্যাভূষণের" সাহায্যকারিনী হউন।

বিটপ বল্লরী ফুল, ভরি' দেয় দশদিক
সৌরভের ভারে।

৩

অশান্ত মানসে মোর, ভেসে আসে শতস্মৃতি
অতীত গৌরব ;
অসীম অবনীতলে কোথায় আছিল আর
এ হেন বৈভব !
সে প্রতাপ ! সে গরিমা ! অদ্ভুত স্বপ্নের সম
সে রাজ-সম্মান ;
খুঁজিলে তুলনা যার, এ বিশ্ব শিহরি' কহে
'উন্মাদ অজ্ঞান' !

৪

কল্পনা, ধারণা, বৃথা, আয়ত্ত করিতে যাহা
আজি মহীতলে ;
সেই স্মৃতি অবশেষ, এ মহামন্দির মাঝে
রক্ষিত কৌশলে ;
সমগ্র জগৎ হ'তে আসে তীর্থ যাত্রী সম
পথিকের দল,
স্তব্ধ ভাবে মৌন মুখে ভূমে নত করি শির ;
সম্ভ্রমে বিহ্বল !

৫

সেকেন্দ্রা ! তোমার অঙ্কে, যুগল দুহিতা লয়ে
দিল্লীর ঈশ্বর,
নিদ্রামগ্ন চিরতরে !—তবু সে ভকতি পূজা
জাগ্রত প্রখর !—
মোগল সাম্রাজ্য ভানু, যবে অস্তাচল চূড়ে,
নাসিছে আঁধার,
দুর্দ্দম নির্ম্মম জাঠ, তোমারে বিধ্বস্ত করে
চূর্ণিয়া মিনার।

৬

আজো সেই ভগ্ন কেতু, তোরণ শিখরে তব
লয়ে জীর্ণ প্রাণ !
কালের ললাট প'রে, রেখেছে অঙ্কিত করি
রাজশ্রী মহান্ !
ভারত জননী যেন, বদ্ধ উন্মাদিনী প্রায়
আসি হেথা ছুটে,
অশ্রুর মুকুতা সার বর্ষেন, মহিমময়
সম্রাট মুকুটে।

৭

মর্ম্মর রচিত তব, সুন্দর পঞ্চম তলে
প্রাচীরের গায় ;
খোদিত কি রত্নাক্ষরে ! ধাতার অপূর্ব্ব নাম
উজ্জ্বল প্রভায় !
সুরম্য অলিন্দ, কক্ষ, কিরীট শোভিত কিবা
সুদৃশ্য বুরুজে ;
ধন্য ! চিরধন্য সেই, এ হেন সমাধি যার,
ত্রিভুবন পূজে।

৮

সেকেন্দ্রা ! সকলি তব কীর্ত্তির ব্রততীজালে
বেষ্টিত সুন্দর ;
রবে এ স্মৃতির মঠ, গৌরব মণ্ডিত শিরে,
যুগ যুগান্তর !
ধরিত্রীর পূত রজেঃ বিলীন সে রাজ দেহ
সাম্রাজ্য শ্মশান !
সমাধি ঐশ্বর্য্য বুকে, রহেছে বিভূতিমাখা
বৈরাগ্য মহান্ !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

কবিরঞ্জন।

(জীবনী)

প্রথম প্রস্তাব।

সে আজ প্রায় দুই শতাব্দীর কথা—সেই যুগে "কবিরঞ্জন" ও "রায় গুণাকর" তাঁহাদিগের ললিত মধুর কোমল পদাবলী রচনা করিয়া বাঙ্গালার পদ্যসাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, সাহিত্য-সাগরে সে বিশাল তরঙ্গের কম্পন এখনও লক্ষিত হয়—কিন্তু তাহা বড় ক্ষীণ ও শক্তিশূন্য। যাহা সরল ও সুন্দর তাহাই মনোমুগ্ধকর, তাই একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, ভুলি ভুলি করিয়াও ভুলিতে পারা যায় না। আকাশে চাঁদ হাসে, কাননে কুসুম কলিকা প্রস্ফুটিত হয়, প্রেমোন্মত্তা তরঙ্গিনী কুলু কুলু গাহিয়া অব্যক্ত প্রেম সঙ্গীতে জগতের অবসাদ দূর করিতে চাহে,—এ সবই তুমিও দেখিতেছ আমিও দেখিতেছি, শুধু একদিন নয়, যুগ যুগান্তর হইতেই সকলে দেখিয়া আসিতেছি,—কৈ ইহারা ত পুরাতন হয় না? বিমল শারদাকাশে চন্দ্রের হাসিরাশি কতদিন দেখিয়াছ, আবার দেখিতে চাও কেন? ক্ষুদ্র কুসুম কলিকা কতদিন নীরবে ফুটিতে দেখিয়াছ—নীরবে ফুটিয়া আবার ঝরিয়া খসিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছ—আবার তাহা দেখিতে চাও কেন? নদীহৃদয়ে কলতান কতদিন মুগ্ধ স্তব্ধ শান্ত হৃদয়ে শুনিয়াছ—আবার তাহা শুনিতে চাও কেন? তোমার ভাল লাগে বলিয়া। যাহা সুন্দর তাহা সর্ব্বকালেই সকলের ভাল লাগে। দার্শনিকতত্ত্ব "Familiarity breeds contempt" এই স্থানে পরাস্ত হয়। পুরাতন অনেক সময় ভাল লাগে না বটে, কিন্তু সকল সময় নহে। কবিপ্রতিভার সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির লীলা কখনও পুরাতন হয় না; তাই পুরাতন হইলেও আবার আমরা কবিরঞ্জনের কবিত্ব সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আমাদিগের দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। তাই কাশীদাস, মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস কবিরঞ্জন, রায় গুণাকর প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজির প্রকৃষ্ট পরিচয় নাই, পূর্ণ ইতিহাস নাই। রত্নের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া মূল্য নিরূপণ করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহার ইতিহাস লিখিতে পারি না! ইংরাজের দেশে একজন কৃত্তিবাস বা মুকুন্দরাম বা চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিলে ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক পুস্তিকায় তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়—ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সমাজেই তাঁহাদিগকে লইয়া আলোচনা আন্দোলন চলিতে থাকে—আর আমরা ভারতবাসী, বিদ্যালয়ে বসিয়া সেই সকল মহানুভবদিগের জীবনী পাঠ করিতে করিতে ধন্য হই,—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে মুখস্থ করিয়া ফেলি। কিন্তু আমাদিগের কাশীদাস কৃত্তিবাসের কথা আমরা জানি না। ইহা পরিতাপের বিষয় বটে—কিন্তু সে দোষ এ যুগের নহে। ইতিহাসের সমাদর বঙ্গবাসী পূর্ব্বে বুঝিত না তাই আমাদিগের পূর্ণ জাতীয় ইতিহাস নাই; যাহা হউক, এখন ক্রমেই তাহারা বুঝিতে শিখিতেছে।

অধুনা বঙ্গভাষার উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর যেমন একাগ্রদৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়, অধিক দিনের কথা বলিতেছি না, বোধ হয় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তেমন ছিল না। ভারতে—সর্ব্বোপরি বঙ্গদেশে মুশলমান রাজত্ব সংস্থাপনের পর পারস্য বা উর্দ্দূ শিক্ষারই বিস্তার হইয়াছিল—সংস্কৃত বা বাঙ্গালার তত আদর ছিলনা। শুনিতে পাওয়া যায়, কবিবর ভারতচন্দ্র পিতার অনিচ্ছা থাকাতেও পারস্য ভাষা অবহেলা করিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন বলিয়া বড়ই তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

প্রজা রাজার পথে চলিবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। তাই তখনকার রাজভাষা বাঙ্গালার ভাষাকে কতকাংশে হীনতেজা করিয়াছিল। ইহাতে যে বঙ্গভাষার কতদূর ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণনীয় নহে। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীন কবিদিগের অনেক গ্রন্থই চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। কে বলিতে পারে যে কৃত্তিবাস, রামায়ণ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন না? যে লেখনী হইতে ভারত প্রসূত, কাশীদাসের সেই শক্তিময়ী কল্পনাময়ী লেখনী যে অন্য চিত্র অঙ্কন করে

নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? কবি-প্রতিভা প্রকৃতি দেবীর অমূল্য দান—তাই বলিয়া যত্ন না করিলে কি সেই প্রতিভা কখন সমুজ্জ্বল হইতে পারে? সেক্সপীয়র একদিনের চেষ্টায় ম্যাক্‌বেথ বা হ্যাম্‌লেট রচনা করেন নাই,—ম্যাকবেথ বা হ্যামলেট রচনা করিবার উপযোগী করিয়া মন ও স্বীয় শক্তিকে গড়িয়া তুলিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। কালিদাস একদিনের যত্নে শকুন্তলা লিখিতে পারেন নাই—শকুন্তলাচরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য পূর্ব্বে তাঁহার আপন হৃদয় মধ্যে বহুদিন ধরিয়া রেখাপাত করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী হস্তে করিবা মাত্রই আমরা চন্দ্রশেখর বা মৃণালিনী বা কপালকুণ্ডলা পাই নাই—কত যত্ন, কত পরিশ্রম, কত উদ্যমের ফলে যে উক্ত সকল অমূল্য গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে তাহা অনন্তুমেয়। ঘসিলে মাজিলে কৃষ্ণ লৌহও শ্বেত হয়—ক্ষীণা প্রতিভাও চমৎকারিত্বের বহুমূল্য ভূষণে ভূষিতা হইয়া থাকে,—যাহার প্রতিভা গিরি নদীর ন্যায় বেগবতী তাহার ত কথাই নাই। আমাদিগের দুর্ভাগ্য যে আমরা প্রাচীন কবিদিগের সেই সকল ঘসা মাজার সুবর্ণ ফল দেখিতে পাইতেছি না। তাহা পাইতেছি না বলিয়াই তাঁহাদিগের অসাধারণ কবিত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিতে পারিতেছি না। শুধু ইহাই নহে, যে কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ পাইয়াছি এখন তাহা লইয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। পূর্ব্বকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় ও ব্যক্তিগত ইতিহাসের সম্যক আদর বুঝিলে এমন হইত না।

যাহা হউক, বঙ্গসাহিত্যের সেই দিনে, সাহিত্যেতিহাসের সেই "কৃষ্ণচন্দ্রীযুগে" কবিরঞ্জন জন্মিয়াছিলেন। তাই তাঁহার-সম্বন্ধে আমরা সকল কথা জানি না—জানিবার উপায়ও নাই। তবে তাঁহার, রচনাদি হইতে সামান্য কিছু জানিতে পাওয়া যায় মাত্র। অনেকে কবিরঞ্জনকে রামদুলাল সেনের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করেন—কিন্তু, তাহা ঠিক নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর হইতেই অনেক স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে;—

রাম রাম সেন নাম, মহা কবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদ পদে,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া॥"

(গণেশবন্দনা)

ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্নাকালিকা কৃপামই॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রাম রাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার,
কৃপামই ময়ি কুরু দয়া॥"

(বিদ্যাসুন্দর)

মশান হইতে সুন্দরকে উদ্ধার করিয়া রাজা যখন বিন বচনে তাঁহাকে তুষ্ট করিতেছেন তাহা বর্ণনা করি যাইয়াও কবি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। সেখানেও ক বলিয়াছেন;—

"ধন হেতু মহাকুল, পুনর্ব্বার শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।"

কেবল "সেই বংশ সমুদ্ভূত" "ধীর সর্ব্বগুণযুত" স্থা আমরা দেখিতে পাই—"সেই বংশ সমুদ্ভব পুরুষার্থ ক কব" এবং সর্ব্বশেষেও "প্রসাদ তনয় তার" ইত্যাদি পরিবর্ত্তে "তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার প দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন উভয়ের মধ্যে আ কোনও বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। বিদ্যা ও সুন্দরে বিবাহান্তর সুন্দরের সস্ত্রীক স্বদেশ গমন বর্ণনার শেষ ভাগে ঠিক পূর্ব্বোক্ত পদাবলীই দৃষ্ট হয়। "অষ্টমঙ্গলা" শেষে আবার উহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই রকল দেখিয়া বেশ অনুমান হয় যে রামপ্রসাদ সেন কখনই রামদুলাল সেনের পুত্র নহেন। তাঁহার পিতা নাম রাম রাম সেন। রামদুলাল রামপ্রসাদের পুত্র। আমরা নিম্নে কবিরঞ্জনের একটী বংশ তালিকা দিতেছি।

(কবিরঞ্জনের বংশতালিকা)

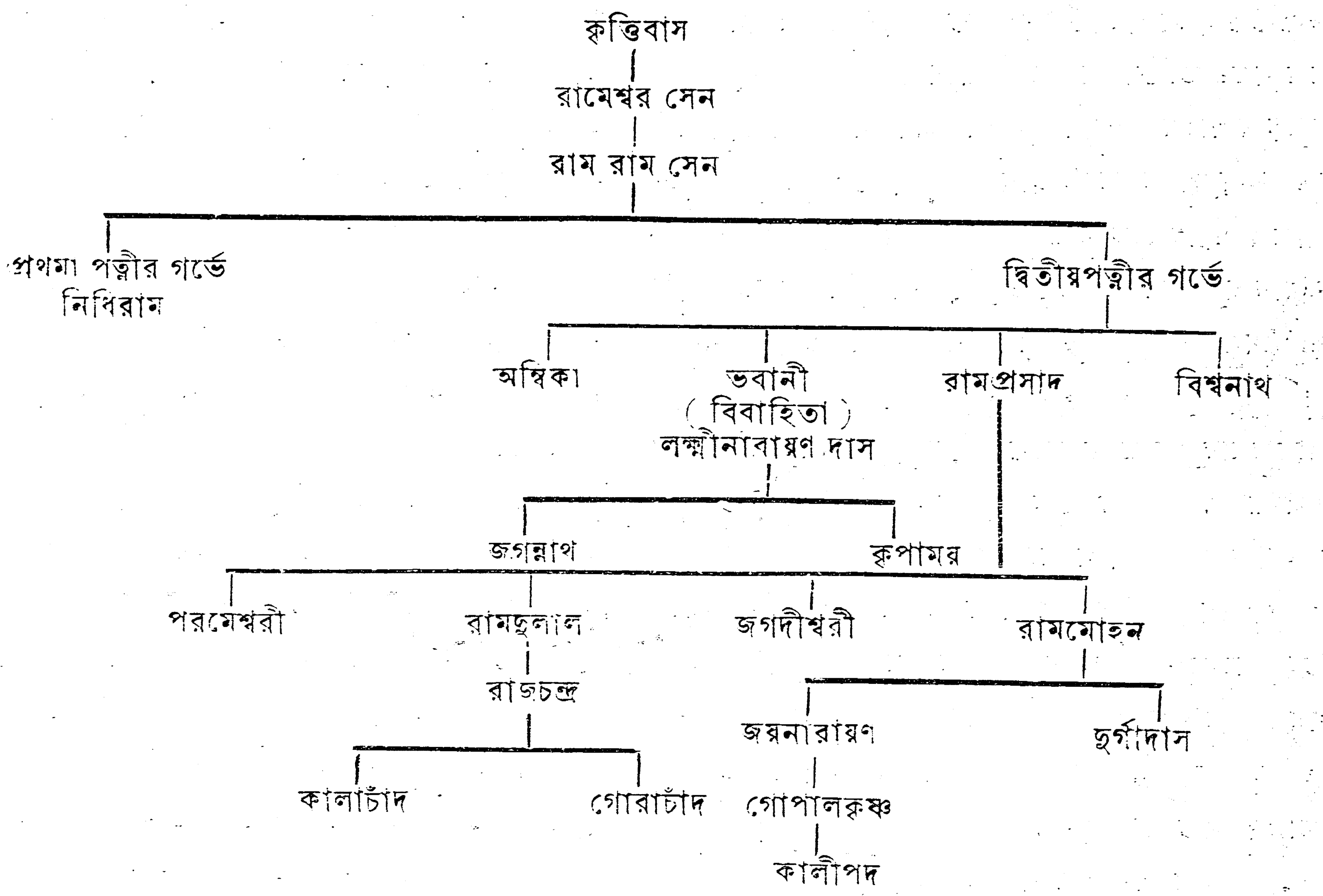

উদ্ধৃত তালিকার সহিত মিলাইয়া নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র কবিতা পাঠ করিলেই কবিরঞ্জনের বংশপরিচয় প্রমাণিত হইবে।

"জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥"
"গুণনিধি কৃপারাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদ ছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥"

বিদ্যাসুন্দর—কবিরঞ্জন।

"শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥"

এইরূপ আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কবি যে ভাবে শ্রীরামদুলালের কথা লিখিয়া গিয়াছেন এবং যতবার তাঁহার জন্য দেবাশীষ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরামদুলাল যে তাঁহার বড় স্নেহের সামগ্রী তাহার আর সন্দেহ থাকে না। রামদুলাল রামপ্রসাদের পুত্র।

হালিসহরের অন্তর্গত "কুমারহট্ট" বা কুমারহাটা গ্রামে কবিরঞ্জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বিদ্যাসুন্দরে বলিয়া গিয়াছেন—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তার মধ্যে সিদ্ধপিঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥"

যে স্থানে কবিরঞ্জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার আর এখন চিহ্ন মাত্রও নাই; তবে যে স্থানে তিনি পঞ্চমুণ্ডী আসন করিয়া সাধনা করিতেন—আসনের সেই স্থান অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজিও লোকে ঐ স্থানটী অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করে—এখনও

অনেক ভিক্ষুক গায়ক ভিক্ষায় বাহির হইবার পূর্ব্বে রামপ্রসাদ-রচিত কালীকীর্ত্তন বা অন্য ভক্তি সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সভয় ভক্তির সহিত সসম্ভ্রমে সেই আসনের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, এবং গান সমাপ্ত হইলে এখনও পঞ্চমুণ্ডী আসনের স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া ভক্তি-ভরে গাত্রে ও মস্তকে ধারণ করে। শুনিয়াছি আজকাল-নাকি রামপ্রসাদের উদ্দেশে এই স্থানে প্রতি বৎসর একটী করিয়া মেলা হইয়া থাকে। কবির জন্ম তিথিই মেলার দিন।

রামপ্রসাদ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কি বৈদ্য ছিলেন তাহা লইয়া একটা বড় তর্ক আছে। প্রসাদী পদাবলীর মধ্যে নাকি কতকগুলি গানের শেষে "দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে" এইরূপ ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়।* ইহা হইতেই অনেকে অনুমান করেন যে কবিরঞ্জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমরা এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কবির অন্যান্য অনেক গানের শেষে নিম্নলিখিত রূপ ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) দাস প্রসাদ বলে ইত্যাদি।
(২) কবি রামপ্রসাদ দাসে ইত্যাদি।
(৩) ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস ইত্যাদি।
(৪) রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাষে।
(৫) ভনে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান।
(৬) প্রসাদ দাসে ভাষে ত্রাহি নিজ দাসে।
(৭) দাস শ্রীকবিরঞ্জনে সকরুণে ভনে।
(৮) ভনে দাস রাম প্রসাদ ইত্যাদি।
(৯) কহিছে প্রসাদ দাস রসদার কিবা হাস।
(১০) কলয়তি রামপ্রসাদ দাস ইত্যাদি।

উক্তরূপ ভণিতার অভাব নাই। কবির আত্মদত্ত বংশ পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইয়াছি, তিনিই বলিতেছেন—"ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস"—ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে কবিরঞ্জন কখনই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে রামপ্রসাদের যুগে ও তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালার বৈদ্যসমাজ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়া পরিচিত করিতে যথাবিহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন—এমন কি তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণের উপবীত পর্য্যন্ত গ্রহণ ও ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সামাজিক আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া ভক্ত রামপ্রসাদও বোধ হয় কোন কোন গীতে আপনাকে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কবিরঞ্জনের প্রকৃতি তরল ছিল না—তিনি দেব দ্বিজে সবিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। একটা সাময়িক অসঙ্গত হুজুকে মাতিয়া কবি যে আপনার জাতিত্ব পরিবর্ত্তন করিবেন এবং আপনাকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিবেন এরূপ বোধ হয় না। প্রচলিত সামাজিক রীতির উপর যাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের সনাতন বিধি ও বিভাগ যাঁহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন নিয়ম ও বিভাগ প্রচলন করিতে প্রয়াসী তাঁহারা সমাজ-সংহারক আর যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার উপর অস্ত্রধারণ করেন তাঁহারা সমাজসংস্কারক। রামপ্রসাদ সংস্কারক ছিলেন না—রামপ্রসাদ সমাজসংহারক ত হইতেই পারেন না; কারণ তিনি গোঁড়া হিন্দু ও ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। যাহা হউক যদি তিনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই অভিহিত করিতেন তাহা হইলে আত্মবংশ পরিচয় দিতে বসিয়া আপনাকে কখন "দাস" আখ্যা প্রদান করিতেন না।

এই "দ্বিজ রামপ্রসাদ" তবে কে? আমাদের বোধ হয় "দ্বিজ রামপ্রসাদ" একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কালক্রমে তাঁহার কতকগুলি গীত কবিরঞ্জনের গীতাবলীর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকিবে। এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে রাম প্রসাদের যুগে ব্যক্তিগত ইতিহাস সঙ্কলন করিবার প্রথা এ দেশে ছিল না। সুতরাং পরবর্ত্তী লেখকগণ যাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহা যে একেবারে অভ্রান্ত হইতে পারে না ইহা সত্য কথা। তাই—দ্বিজ রামপ্রসাদের সঙ্গীতের সহিত কবি রামপ্রসাদের সঙ্গীত স্থানে স্থানে মিশিয়া গিয়াছে।

উক্ত "দ্বিজ রামপ্রসাদ" একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইলে তিনি নিশ্চয়ই রামপ্রসাদের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। তাহা ভিন্ন একের রচিত পদাবলীর সহিত অন্যের রচিত

* আমি যে প্রসাদ পদাবলী পাইয়াছি তাহার ভিতর একটীতেও "দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে" দেখিতে পাইলাম না। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা ভিন্ন আরও পদাবলী বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

পদাবলী কেমন করিয়া মিশিতে পারে। ইহার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে রামপ্রসাদের যুগ বা সময় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

কবি ভারতের জন্মকাল ১৬৩৪ শকাব্দা। কবিরঞ্জন তাঁহারই সমসাময়িক ব্যক্তি। কেহ অনুমান করেন তিনি ১৬৪০-১৬৪৫ শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ বলেন কবিরঞ্জনের জন্মকাল ১৬৪২ শক। যাহা হউক, এইমত গ্রহণ করিলে বাঙ্গলা ১১২৭ সালে কবিরঞ্জনের জন্ম হয়।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কবি গানের বড় আদর ছিল। কবির দলে হরু ঠাকুর, রঘু, রাম বাবু প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অস্তিত্ব দেখা যায়। তখনকার বাঙ্গলার আবাল বৃদ্ধ সকলেই কবির আসরে বসিয়া এক মনঃপ্রাণে "ভবানী বিষয়" "সখীসংবাদ" "বিরহ" ও "খেউড়" প্রভৃতি শুনিতেন। পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া খেউড় শুনিতে কোন আপত্তির কারণ ছিল না। তখনকার সেই এক যুগ। সে যুগে—

"সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয়॥
সুহৃদ ভঞ্জন, লোক গঞ্জন, কলঙ্ক ভাজন হ'তে হয়॥"

প্রভৃতি রাসু নৃসিংহের গানের সুরে দেশ প্লাবিত হইয়াছিল। রাসু-নৃসিংহ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। লালু নন্দলাল এই সময়ের লোক। রাসু নৃসিংহের পর লালু নন্দলালের

"হ'ল এ সুখ লাভ পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে।
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার গিয়েছে না যাবে কুল,
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর!
শেষে এই হ'ল কাণ্ডারী পালাল; তরণী লাগিল
ভাসিতে॥"

বঙ্গীয় বালক যুবক বৃদ্ধের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই লালুর পর প্রসিদ্ধ হরু ঠাকুরের উদয়। কলিকাতা সিমুলিয়ায় ১১৪৫ সালে হরু ঠাকুরের জন্ম। হরুর বিখ্যাত সখী সংবাদ তখনকার বাঙ্গালায় এক রূপ যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। হরুর শেষ অবস্থায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে নীলু, রামপ্রসাদ, উদয় দাস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির কবির দল হয়। উক্ত দলগুলি সমস্তই সমকালবর্ত্তী। হরু ঠাকুরের সময়েই রামবসুর কবির দল ছিল। রামবসু ১১৭৩ কি ১১৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তিনি ৪২ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। নীলুঠাকুরের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ ঠাকুর নীলুর দলের অধিকারী হইয়াছিলেন। রামবসু ও রামপ্রসাদের ভিতর যেরূপ ছড়া কাটাকাটি হইয়াছিল তাহাই ইহার প্রমাণ। শুনিতে পাওয়া যায় শোভাবাজারের রাজা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে ৺শারদীয়া পূজার সময় কবির আসরে রামপ্রসাদ রামবসুকে বিদ্রূপ করিয়া লহরের ছড়ায় গাহিয়াছিলেন—

"নাহিকো রামবোসের এখন সেকেলের পৌরোষ।
এখন দল ক'রে হয়েছেন রামবোস রামকামারের
* * কোষ।"

রামবসুও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, লহর রচনায় তিনিও অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। তাই রামপ্রসাদ বসিবা মাত্রই রামবসু প্রত্যুত্তরে গাহিয়াছিলেন—

"তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটি
দিন।
"যেমন রাত ভিখারীর ধামা বওয়া থাকে এক এক জন,
হরিনাম বলে না মুখে পিছু থেকে চাল কুড়ুতে মন;
কর্ম্মে অকর্ম্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্ম্মা,
নন কাজের কাজি ঠাটর বাজী (ভাইরে)
ঠিক যেন ধোবার বিশকর্ম্মা;
যেমন বিদ্যাশূন্য বিদ্যাভূষণ সিদ্ধিরস্তু বস্তুহীন।
নীলমণি বলে, নীলমণির দলে,
ঢুকুলো শিং ভাঙ্গা এঁড়ে বাছুরের পালে,
যেমন নবাব মলে নবাব হ'ল উজীরালী আড়াই দিন।"
ইত্যাদি।

হরু ঠাকুর, নীলু ঠাকুর, রাম বসু ও রাম প্রসাদের কাল নির্দ্ধারিত হইলেই বুঝিতে পারা গেল যে কবিরঞ্জন ও কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ঠিক সমসাময়িক না হইলেও প্রায় এক সময়েরই বটে। তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কালগত যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহাতে একের রচনা অন্যের রচনার মধ্যে অনায়াসেই প্রবিষ্ট হইতে পারে। তৎকালে

কবিদিগের রচনা বা জীবনী সংগ্রহ করিবার রীতি তেমন প্রচলিত থাকিলে এরূপ ঘটিত না, সুতরাং "দ্বিজ রাম প্রসাদ" যে কবির দলের রামপ্রসাদ হওয়া সম্ভব তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, এবং কবিরঞ্জন যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না বৈদ্য ছিলেন তাহাও বোধ হয় অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষাংশে কবি যে আত্মবংশ পরিচয় দিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার প্রথমেই আছে—

"ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কীর্ত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্ন কালিকা কৃপাময়ী॥"

ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কবি রাম প্রসাদের বংশ নির্ধনের বংশ নহে। তাঁহার জনৈক পূর্ব্ব পুরুষের নাম কীর্ত্তিবাস! এই কীর্ত্তিবাস হইতে রামেশ্বর সেন পর্য্যন্ত যে কয় পুরুষ গিয়াছে তাহা বলা যায় না—কবিও এ বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন।

কবির বাল্যকাল কিরূপে ব্যয়িত হইয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তাঁহার উত্তর কালের ইতিহাসও আমরা সম্পূর্ণ জানি না। পৃথিবীতে যাঁহারাই অনন্যসাধারণ হইয়াছেন, কি ভারতে কি অন্য দেশে, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গেই অনেক কিম্বদন্তি লিপ্ত হইয়াছে। রামপ্রসাদের জীবনেও ইহা বিরল নহে।

কবিরঞ্জনের পিতা যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন পুত্রের সংশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই কবি পারস্য, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। রামরাম সেন মহাশয় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাই অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদের কোমল স্কন্ধে সংসারের গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল। সেই কঠিন পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়াও রামপ্রসাদের কবিত্ব শক্তির হ্রাস হয় নাই—কবিতা দেবী অম্লানবদনে তাঁহাকে অনেক রত্ন দিয়াছিলেন। সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল হইলে, সংসারের ভাবনা অত শীঘ্র ভাবিতে না হইলে হয়ত কবিরঞ্জন আরও উচ্চদরের কবি হইতে পারিতেন।

পিতার মৃত্যুর পরই রামপ্রসাদ বাধ্য হইয়া কলিকাতায় চাকুরির চেষ্টায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাটী কলিকাতায় ছিল। তখনকার সময়ে লোকে জমীদার বা মহাজনের চাকুরি করিত—অন্য স্থানে চাকুরি মিলিত না। শুনিতে পাওয়া যায় রামপ্রসাদ যখন প্রথমে চাকুরি করিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে। তিনি কাহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। কেহ বলেন ভূকৈলাশের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট কবি দাসত্ব স্বীকার করেন; কেহ বলেন নবরঙ্গকুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র তাঁহার প্রভু ছিলেন। এ বিষয়ে এতদিন পর কিছু স্থির মীমাংসা করা চলে না। কিছুদিন চাকুরি করিবার পর এক দিন তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী তাঁহার লিখিত খাতাপত্র দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি দেখিলেন সেই সকল হিসাব নিকাশের খাতার মধ্যে যেখানেই একটু স্থান পাইয়াছেন, রামপ্রসাদ সেই খানেই গান লিখিয়াছেন। কর্ম্মচারী দেখিলেন যে সেই অর্ব্বাচীন "মুহুরীর" হস্তে পড়িয়া জমীদারের পাকা খাতা একেবারে মাটি হইয়াছে। সেই খাতাগুলি তৎক্ষণাৎ প্রভুর সমক্ষে নীত হইল। প্রভু খাতা খুলিয়াই দেখিলেন কবি রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—

"আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
"পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবেত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইত সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥"

রামপ্রসাদের প্রভু গানটী দেখিলেন, দেখিয়া মোহিত হইলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর অলক্ষ্যে কিসের যেন এক মধুর ধ্বনি হইল—হৃদয়ের মোহন বংশী বাজিয়া উঠিল; সেই বংশীধ্বনির মত্তসুরে তিনি প্রসাদ হৃদয়ের বীণাধ্বনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, শ্যামা নামের সুমধুর সঙ্গীতে প্রসাদের সরল সুন্দর সমগ্র বিশ্ব ধ্বনিত হইতেছে—প্রসাদ তখন শ্যামা মায়ের তহবিলদার। তাই তিনি আপন সত্ত্বা ভুলিয়া গিয়া আবেগময় প্রাণের কথা হিসাবের পাকা খাতায় লিখিয়া ফেলিয়াছেন। সেই দিন প্রসাদ-জীবনের একটী বড় স্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতে প্রসাদ স্বাধীন মুক্ত হইয়া শ্যামা মায়ের রাঙ্গাপদ চিন্তায় নিমগ্ন হইবার পরম সুযোগ পাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের প্রভু তাঁহার পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন—রামপ্রসাদের আর চাকুরি করিতে হইল না। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন। সেই দানপত্রে লেখা আছে—"গর আবাদী জঙ্গলভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ।" পলাশী ক্ষেত্রে ইংরেজ পতাকা উড্ডীন হইবার এক বৎসর পর উক্ত দান পত্র লিখিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

কবির চিত্ত স্বাধীন—সেই স্বাধীন মুক্ত চিত্ত যদি অন্যবিধ চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় তাহা হইলেই কবিদিগের কবিজীবন সার্থক হয়—দেশের সাহিত্যও নানারত্নসম্ভারে দিন দিন পূর্ণ হইয়া উঠে। উক্ত ৩০৲ টাকা মাসিক পেন্সন্ পাইবার পর রামপ্রসাদের আর পরোপাসনা আবশ্যক হইত না—জীবিকার জন্যও ভাবিতে হইত না—তাঁহার তখন এক মাত্র চিন্তা "শ্যামা, শ্যামা, শ্যামা।" তাই তখন তাঁহার কবিহৃদয় প্রাণভরা উল্লাসে ভক্তি সঙ্গীত গাহিতে লাগিল—পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় কবি আবার কুমারহট্টে ফিরিয়া আসিলেন। কুমারহট্ট তাঁহার সঙ্গীত স্রোতে টলমল করিতে লাগিল; সেই মধুর সঙ্গীতে আজিও বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া রহিয়াছে।

যদি প্রসাদ-প্রভু তাহার "অর্ব্বাচীন মুহুরীর" কার্য্য দেখিয়া তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির আদেশ করিতেন তাহা হইলেই হয়ত কবিরঞ্জনের নামও কেহ শুনিতে পাইত না। আকর-নিহিত হীরকখণ্ডবৎ, জলদজালাচ্ছন্ন দৃপ্ততপনতেজবৎ, রত্নাকরগর্ভনিহিত রত্নরাজিবৎ, কাননস্থিত সুরভি-কুসুম-সৌন্দর্য্যবৎ, কবিরঞ্জনের কবিত্ব কখনই লোক-লোচনভূত হইত না—তাঁহার কবিত্ব, তাঁহার হৃদয় মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইত; কল্লোলিনী কবিতার সেই প্রথম ক্ষুদ্র বুদ্বুদ কে চাহিয়া দেখিত?

কুমারহট্টে ফিরিয়া আসিয়া ভক্ত রামপ্রসাদ তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডী আসনাদি স্থাপন করিয়া সাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ঠিক কোন সময়ে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার রচনাদির ভিতর কোন স্থানেই তিনি আপন শ্বশুরকুলের পরিচয় দেন নাই।

শুনিয়াছি তাঁহার পত্নীও বড় ভক্তিমতী ছিলেন। ভক্তের সহধর্ম্মিণী যেমন হইতে হয়, তিনিও তাহাই ছিলেন। স্বয়ং কালী স্বপ্নযোগে নাকি তাঁহাকে কখন কখন "প্রত্যাদেশ" করিতেন। তাই আমরা "কবিরঞ্জনে" দেখিতে পাই—

"ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥"

উদ্ধৃত পদ দেখিয়া ইহাও মনে হয় যে রামপ্রসাদ যখন "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন তখন পর্য্যন্ত মনোমত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। মনোমত সিদ্ধিলাভ না হইলেও তিনি যে একেবারে নিরাশ হন নাই তাহার পরিচয়ও বিদ্যাসুন্দরে আছে—

"শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণপুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা॥"

রামপ্রসাদ শক্তিভক্ত ছিলেন বলিয়া পরিচিত। নিম্নোদ্ধৃত স্থান পাঠ করিলে অনুমান হয় যে তিনি তন্ত্রমতাবলম্বী ছিলেন। সুন্দরের শবসাধনা বর্ণনায় তিনি তান্ত্রিক সাধনার অনেক প্রক্রিয়া খুঁটি নাটি করিয়া লিখিয়াছেন;—

"ততঃ পরে কুশ শয্যা করে গুণনিধি।
পূর্ব্ব শির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল।
তাম্বূলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ।

তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাসুখ ॥
বাহু মূল কটিদেশ পরিমাণ তার।
চতুরস্র মধ্যে দেখ তাহে চতুর্দ্বার॥"

ইত্যাদি

প্রসাদের শ্যামা সঙ্কীর্ত্তনের ভাব দেখিয়া যেমন শক্তি-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীত শুনিলেই মনে হয় যে কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, শিব বলিয়া তাঁহার মনে কোন দ্বৈত ভাব ছিল না। একমাত্র পরম দেবতার উপাসনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি গাহিয়াছেন—

"কালী ব্রহ্মময়ী গো।
বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তলাসি।
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী।
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে ধর অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চির বিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
এমা অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥"

অন্য স্থানে দেখিতে পাই:—

"মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি দশ অবতার।
নানারূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সূক্ষ্ম স্থূলা।
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা॥"

ইত্যাদি

রামপ্রসাদের সমকালে তাঁহার নিজ গ্রামেই আজু গোঁসাই নামে একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। রামপ্রসাদ ও গোঁসাই প্রভুর মধ্যে বিষম মতভেদ ছিল। আজু গোঁসাই উপস্থিত কবি ছিলেন— শ্রুত মাত্রেই তিনি "পয়ার রচিয়া" কথা কহিতে পারিতেন। রামপ্রসাদকে বিদ্রূপ করিয়া তিনি অনেকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আজু গোঁসাই স্বরচিত সঙ্গীতে প্রসাদী গীতের উত্তর দিতেন। "কালী কীর্ত্তনে" ভগবতীর গোপবধূ বেশে বেণু বাজাইয়া ধেনু চরাইবার বর্ণনা প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ কতকগুলি ভজন ও পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল গীত শুনিয়া আজু গোঁসাই উত্তর করিয়াছিলেন।

"না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে?
তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি বনে পাঠায় রে।"

ভক্ত প্রসাদ বিবেচনা করিতেন যে জাঁক জমকে মূর্ত্তি গড়িয়া উপাসনা করিলে উপাসকের মনে অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি সাধক, যিনি ভক্ত তিনি আপন উপাস্য দেবতার মনোময় মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বিনা আড়ম্বরে পূজা করিবেন।

তাই প্রসাদ গাহিয়াছেন:—

"মন তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥
জাঁক জমকে কল্লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুই লুকিয়ে তাঁরে করবি পূজা জান্‌বেনারে জগৎজনে॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আলোচাল আর পাকা কলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কি তোর সে রোসনায়ে;
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে দেও না জ্বলুক নিশিদিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলি, বলি দাও ষড়রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দাও করতালি, মন রাখ
সেই শ্রীচরণে॥"

প্রসাদ স্বয়ং শাক্ত হইলেও বোধ হয় শক্তি পূজার সঙ্গে বলি প্রথার তত অনুমোদন করিতেন না। এই নিষ্ঠুর প্রথা ধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্গ কি না বলিতে পারি না,—কিন্তু পূজাঙ্গনে ঢাক ঢোলের উচ্চ কোলাহলেরও উচ্চে যখন উৎসর্গীকৃত মেষ মহিষের মর্ম্মভেদী করুণ কাতর আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে তখন বুকের ভিতর কেমন কাঁপিতে থাকে—মনে হয় বুঝি সেই নিরপরাধ পশু ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে! তারপর যখন পূজাঙ্গনে সেই ছিন্নশির মেষ বা মহিষের তপ্তরক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে তখন সেই দৃশ্য দেখিলে মনে ভয় হয়, ভক্তি পলায়ন করে! ষড়রিপু, দেবতার সমক্ষে বলি দাও, মোক্ষ হইবে—ধর্ম্মের জন্য পশুবধে যদি পাপও না থাকে তবে নিষ্ঠুরতা আছে। ধর্ম্ম, সত্য পবিত্র—নিষ্ঠুরতা অপবিত্র।

রামপ্রসাদ তন্ত্র মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। কিন্তু রামপ্রসাদ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। একবার কেহ তাঁহাকে 'মাতাল' বলায় তিনি গাহিয়াছিলেন—

"ওরে সুরাপান করিনে আমি
সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
যত মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরু দত্ত গুড় ল'য়ে,
প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা।
আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চোঁয়ায় ভাটি,
পান করে মোর মন মাতালে॥
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা,
শোধণ করি বলে তারা মা।
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা,
খেলে চতুর্ব্বর্গ-মিলে॥"

রামপ্রসাদ কবি, রামপ্রসাদ সাধক, রামপ্রসাদ ভক্ত, তিনি সংসারবিরাগী নিস্পৃহ, মহাশক্তির উপাসক—রামপ্রসাদ প্রেমিক! তাই তিনি রাজপ্রসাদ পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। রামপ্রসাদেয় জন্ম-ভূমি কুমারহট্ট রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকার-ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ভ্রমণব্যপদেশে মধ্যে মধ্যে তথায় আসিয়া বাস করিতেন। এই সূত্রে ভক্ত প্রসাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। "গুণী গুণং বেত্তি"—বিদ্যোৎসাহী কবিতাপ্রিয় কৃষ্ণচন্দ্র, সাধু রামপ্রসাদকে চিনিয়া লইলেন; তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয়তায় ও সারল্যে, কবিত্বে ও নির্ম্মল-স্বভাবে রাজার হৃদয় মোহিত হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা রামপ্রসাদ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকেন। প্রসাদের স্বাধীন-হৃদয় রাজভোগ উপেক্ষা করিল—তিনি কাহাকেও খোসামোদ করিতে পারিতেন না। তাঁহার "কবিরঞ্জনে" আছে—"ক্ষিপ্ত যেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে"। রামপ্রসাদ রাজার প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলেন। এই সূত্রে কবি তখন গাহিয়াছিলেন,—

"আর ভুলালে ভুল্‌বো না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে, বিষের কূপে উল্‌ব না গো।
সুখে দুঃখে ভেবে সমান, মনের আগুণ তুল্‌ব না গো॥
ধনলোভে মত্ত হ'য়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হ'য়ে, মনের কথা খুল্‌ব না গো॥
মায়া পাশে বদ্ধ হ'য়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুদ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো॥"

শ্যামা মায়ের আদুরে ছেলে রামপ্রসাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল বলিয়া তিনি কিছু মাত্রও দুঃখিত হন নাই, বরং রামপ্রসাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা আছে যে, কবিরঞ্জন ভারতচন্দ্রের মত রাজার সভায় থাকিতেন; সে ধারণা অমূলক। উদ্ধৃত গীত হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন হইলেন; রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কেবল মাত্র কতকগুলি ভক্তি সঙ্গীত শুনিয়াই প্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরে ও অন্যান্য অনেক পদাবলী ও কালী-কীর্ত্তনে "শ্রীকবিরঞ্জন ভনে" কি অমনি আর একটা কিছু ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতেই অনুমান হয় যে, প্রসাদ কবিরঞ্জন উপাধি প্রাপ্ত হইবার পর উক্ত সকল গ্রন্থ বা পদ রচনা করিয়াছিলেন; উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে রচিত হইলে গ্রন্থ মধ্যে বা গীতে "শ্রীকবিরঞ্জন" এই শব্দ থাকিত না। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে, কি দেখিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধি দিয়াছিলেন? আমাদের মনে হয়, কবির আরও কতিপয় গ্রন্থ ছিল, রাজা তাহাই দেখিয়াছিলেন। এত দীর্ঘকাল পর এ বিষয়ের মীমাংসা করা কঠিন। প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের শেষে যে "অষ্ট মঙ্গলা" আছে তাহা হইতেই যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। পাঠক মহাশয়ের জন্য আমরা সেই "অষ্টমঙ্গলা" অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।—

অষ্টমঙ্গলা।

"নমো বিশ্বভাবিনী, দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশিনী,
জনমিলা পর্ব্বতেশ-ঘরে। (১)
কার্ত্তিকেয় জন্ম হেতু, ভস্ম রাশি মীনকেতু,
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে॥ (২)
দুরন্ত মহিষাসুর তার দর্প কৈলা চূর,
লীলায় হইলা দশভুজা।
মহিষ-মর্দ্দিনী নাম, সেতু-বন্ধে প্রভু রাম,
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা॥ (৩)
শুম্ভ নিশুম্ভের গর্ব্ব, সম্মুখ সমরে খর্ব্ব, (৪)
শক্তি লভে সুরথ সমাধি। (৫)
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জন্মজরা মৃত্যুহরা,
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি॥
বিধি, হরি, ত্রিলোচনে, মহাকালী দরশনে,
গতমাত্র প্রথমতঃ মায়া।
শেষ জন্ম কৃপালেশ, গত যাবতীয় ক্লেশ,
দিলা পদ সরসিজ ছায়া॥ (৬)
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, তোমা পূজে নিত্য ২
লভিল রমণী ভানুমতী। (৭)
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা, মূঢ়মতি জানি কিবা,
কৃপাময়ী অগতির গতি॥
মালাধর হারাবতী, শাপে জন্ম বসুমতী,
ব্রত-কথা জগতে প্রচার। (৮)
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ,
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার॥

উল্লিখিত "অষ্টমঙ্গলা" মধ্যে সর্ব্বশেষ "মঙ্গল"ই যে কবিরচিত বিদ্যাসুন্দরের অন্তর্নিহিত উপাখ্যান তাহার আর সন্দেহ নাই। কবি ইহাকেই সহস্র পল্লবে পল্লবিত করিয়াছেন।

সুন্দর দক্ষিণ কালিকা মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া শব সাধনা করিবার পর যখন সিদ্ধ হইলেন,—অর্থাৎ যখন স্বয়ং জননী আসিয়া সুন্দরকে দেখা দিলেন এবং কহিলেন, "বরং বৃণু, বরং বৃণু,"—তখন পূর্ণমনোভীষ্ট, প্রেমপুলকিত সিদ্ধ সুন্দর কহিলেন;—

"দর্শনে তোমার মাগো! চতুর্ব্বিধ মুক্তি"
নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজি রাজি রাজ্য।
জায়াপত্য দাস দাসী বাসি কিবা কার্য্য॥
মনো মম হংসপাদপদ্মে বিহরতু।

তখন শিবানী সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"তথাস্তু তথাস্তু"। সুন্দরকে মনোমত বর দিয়া জননী নীরদবরণী কলিকালের ভাবী অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

"সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্বকথা কহি।
শাপভ্রষ্ট তোমাদোঁহাকার জন্ম মহী॥
বিদ্যাবতী হারাবতী, তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর॥
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র, পূর্ণ বটে কাল।
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল॥"

অষ্টমঙ্গলাতেও এই কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই;—

"মালাধর হারাবতী শাপে জন্ম বসুমতী
ব্রতকথা জগতে প্রচার।
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার॥"

সুতরাং মালাধর ও হারাবতীর উপাখ্যান যে বিদ্যা-সুন্দরের অন্তরে অন্তরে রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। বিদ্যা হারাবতী এবং সুন্দর মালাধর তাহাও কবি বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু "অষ্টমঙ্গলায়" ইহাই অষ্টম "মঙ্গল"। "কবিরঞ্জন" সেই অষ্টমঙ্গের ফল। তবে পূর্ব্বোক্ত ৭টী মঙ্গল কি হইল? রামপ্রসাদ যে ৭টী মঙ্গল বাদ দিয়া প্রথমেই—অষ্টম মঙ্গলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। আর যদি তাহাই করিতেন তাহা হইলে "অষ্টমঙ্গলা" লিখিয়া বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না।—"অষ্টমঙ্গলা" মঙ্গলাচরণ নহে; মঙ্গলাচরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও উহা গ্রন্থের শেষভাগে স্থান পাইতে পারে না; গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ লিখিবার পরেই গ্রন্থারম্ভ করিয়া থাকেন।

অষ্টমঙ্গলার সহিত বিদ্যাসুন্দরের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই উহা বিদ্যাসুন্দরের অঙ্গীভূত নহে—না লিখিলেও কোন ক্ষতি হইত না, বিদ্যাসুন্দর যেমন আছে তেমনি থাকিত।

এই সকল কথা মনে করিলেই অনুমান হয় কবিরচিত অপর কয়েকখানি গ্রন্থ আমরা পাই নাই—সে সমুদয় লুপ্ত হইয়াছে। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীহর্ষ-রচিত নৈষধের অনেকগুলি অধ্যায়ের শেষে কবি স্বরচিত কোন না কোন গ্রন্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা একখানি বই শ্রীহর্ষের অন্য কোন গ্রন্থ দেখিতে পাই না।

রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বগামী কবি কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, তাঁহারই "কালিকা-মঙ্গলের" অন্তর্গত বা কালিকামঙ্গলের শাখা। প্রসাদের গ্রন্থ রচিত হইবার পর ভারতের বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়। সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু ভারতের বিদ্যাসুন্দরও একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, উহা তাঁহার অন্নদামঙ্গলের শাখা। তাই অনুমান হয় প্রসাদের বিদ্যাসুন্দরও তাঁহার কোন একখানি মহাগ্রন্থের অন্তর্গত হওয়াই সম্ভব। এতকাল পর আনুমানিক প্রমাণ ভিন্ন প্রত্যক্ষ প্রমান নির্দ্দেশ করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

তাহার পর একথাও এখানে বিবেচ্য যে রামপ্রসাদ "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রাপ্ত হইবার পরই বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া থাকিবেন। কারণ বিদ্যাসুন্দরের ভনিতায় স্থানে স্থানে "কবিরঞ্জন" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। উপাধি পাইবার পূর্ব্বে রচিত হইলে "কবিরঞ্জন" শব্দের উল্লেখ বিদ্যাসুন্দরে থাকিত না।

বর্ত্তমান যুগে যেমন উপাধিলাভ বড় সুলভ হইয়াছে,—কবিরত্ন বা কাব্যতীর্থ বা তর্কবাগীশ প্রভৃতির দল যেমন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, সেকালে তেমন ছিল না। প্রকৃত বিদ্যা ও ক্ষমতা না থাকিলে সেকালে কেহ উপাধি পাইতেন না। "কবিরঞ্জন" শব্দের অর্থ বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে সামান্য দুই চারিটা গান বা পদ রচনায় সক্ষম কবি উহার উপযুক্ত নহে। তাই মনে হয়, যখন স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধি দিয়াছিলেন তখন তিনি চারিদিক বিবেচনা করিয়াছিলেন। কে বলিতে পারে যে তিনি রামপ্রসাদ-রচিত অষ্টমঙ্গলার পূর্ব্বে সপ্তমঙ্গলানুরূপ ৭ খানি গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন না? হইতে পারে পরে ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় রামপ্রসাদের সে সকল গ্রন্থ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি অন্য সাতখানি গ্রন্থ থাকিত তাহা হইলে বিদ্যাসুন্দরে তাহার পরিচয় পাইতাম। আমরা বলি, বিদ্যাসুন্দরে তাহাদিগের যতটুকু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, কবি অষ্টমঙ্গলা লিখিয়াই তাহা দিয়া গিয়াছেন, তদধিক আর আবশ্যক করে না।

"অষ্টমঙ্গলার" শেষ মঙ্গল লিখিবার পরই, অর্থাৎ "কে বা বুঝে চরিত্র তোমার" এই পংক্তির পরই ঐ অষ্টমঙ্গলা মধ্যে কবি আত্মবংশ পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে তিনি তাঁহার মহাগ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া প্রাচীন প্রথানুসারে স্বরচিত সকল গুলি গ্রন্থের আকারে প্রকারে পরিচয় দিয়া শেষে নিজকে পরিচিত করিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

পৃথিবীর ইতিহাস।

মানুষ যে জিনিষটা লইয়া নাড়াচাড়া করে তাহারই একটা তথ্য বা ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা তাহার মনে স্বভাবতঃ উদিত হইয়া থাকে। মানুষ যে পৃথিবীর জীব, সেই পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও ধারণা কিরূপ উন্নত হইয়াছে তাহাই এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১। **পৃথিবীর বয়স**—বাইবেলের মতে ৪ হাজার বৎসর মাত্র। হিন্দুদিগের পৌরাণিক সাহিত্যে পৃথিবীর বয়স চারি যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতা ১২৯৬০০০ বৎসর; দ্বাপর ৮৬৪০০০ বৎসর; এবং কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর। এক্ষণে কলি-যুগ চলিতেছে। হিন্দুশাস্ত্র মতে কলির ৫০০৪ বৎসর গত হইয়াছে। তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স বর্ত্তমানে ৩৮৯৩০০৪ বৎসর; কোন কোন পুরাণের মতে আরো বেশী। সে যাহাই হউক পৌরাণিক প্রমাণ আজ কাল আর বৈজ্ঞানিক যুগে কলিকা পাইবে না। ভূস্তর পরীক্ষা দ্বারা ভূতত্ত্ববিদ্-গণও ঐরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

২। **পৃথিবীর গঠন ও আকার**—ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্য জাতি;

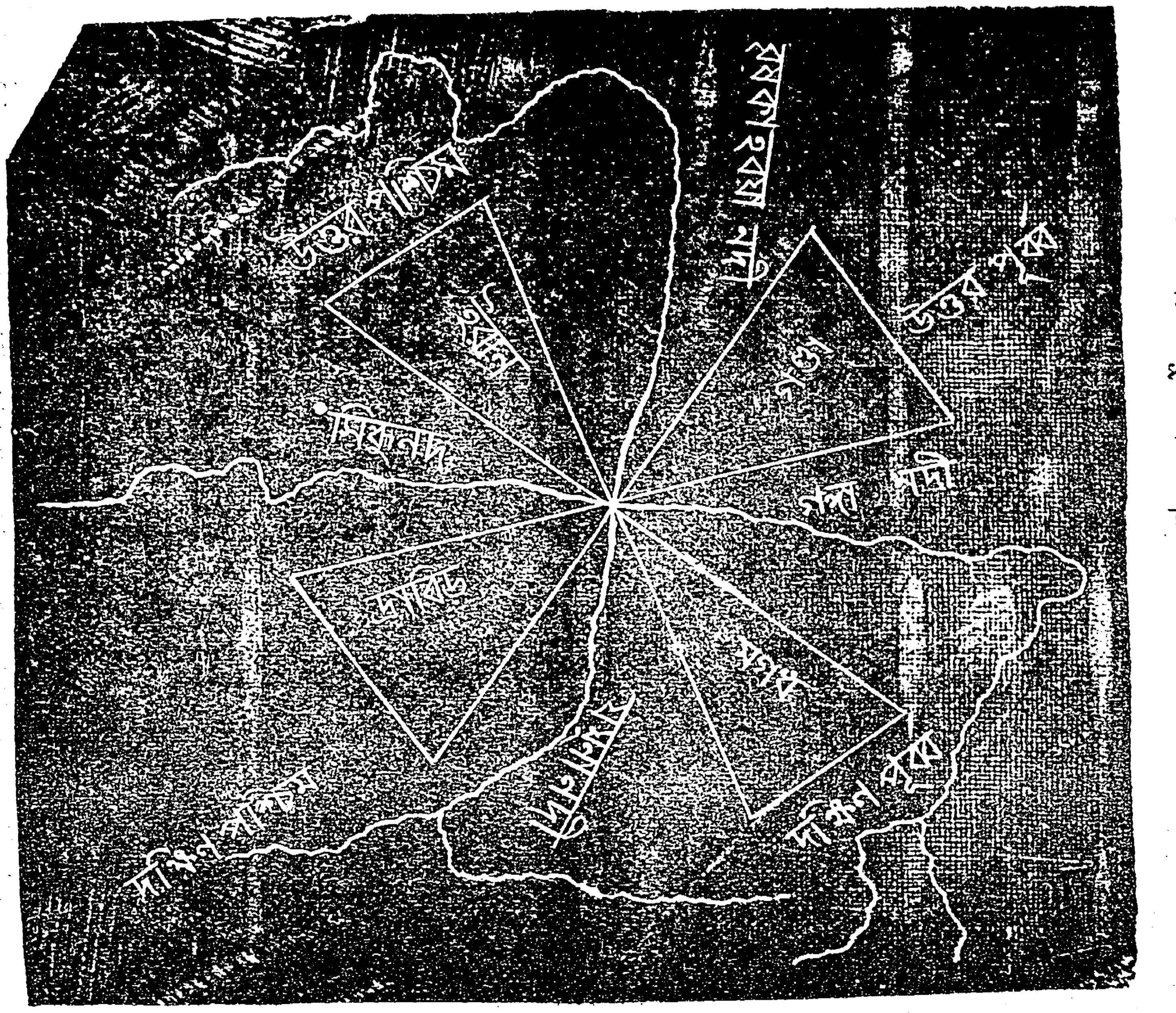

তাঁহাদের পৃথিবী সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল তাহাই সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য, পৌরাণিক যুগে পৃথিবীকে ত্রিকোণ আকার প্রদত্ত হইয়াছে। বরাহমিহিরের গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত) পৃথিবীর যেরূপ আকার প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এস্থলে প্রকটিত হইল। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্ব্বত। এই সুমেরু যে কোন্ পর্ব্বত তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে উত্তর মেরু এবং কেহ বা পৃথিবীর অক্ষদণ্ড (Axis) বলিয়া অনুমান করেন, মেরু সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলিতেছে—

"তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতাস্তেজোযুক্তা মহাবলাঃ।
কুমুদাভাঃ স্ত্রিয়স্তত্র চারুনাসাঃ সুলোচনাঃ॥
* * * * ন বিশন্তি দিবাকরম্।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিমেব শতানি চ।
আদিত্য তপ্তাস্তে সর্ব্বে বিশন্তি শশিমণ্ডলম্॥"

এই বর্ণনা হইতে মেরু অর্থে North pole বলিয়াই মনে হয়। এই কালে পৃথিবীর অবস্থান সম্বন্ধেও অদ্ভুত কল্পনা করা হইত; বাসুকী নাগ, অতিকায় কচ্ছপ প্রভৃতি অনেক জন্তুর ঘাড়ে এই বিশাল পৃথিবীর বোঝা চাপাইয়া লোকের কৌতূহল নষ্ট করা হইত, তৎপরে যবনাচার্য্য-কৃত "যবন-জ্যোতিষ" নামক গ্রন্থে সৌরজগতের প্রকৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই যবনাচার্য্য যে কে তাহা জানা যায় নাই। তবে কথিত আছে যে তিনি "যোন" রাজ্যে (Ionia) যাইয়া পিথাগোরাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং যবনরাজ্যে গমন হেতুই তাঁহাকে যবনাখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল, পিথাগোরাসের আবির্ভাব কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্যকৃত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক পুস্তকে পৃথিবীর আকার আমলকী ফলবৎ গোল ও উহা মহাশূন্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পৃথিবীকে "খেট" ও "ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডজঠরে ভ্রমদ্ভচক্রচক্রান্তর্গগনে নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। একস্থানে আবার "ভূরচলা স্বভাবতঃ" বলিয়া স্বকীয় উক্তির বিপরীত কথা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই মনে হয় যে তিনি এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। হিন্দুগণ নানা বিষয়িণী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেও ভূগোল বিদ্যার উন্নতি-পরিচায়ক কোন নিদর্শন রাখিতে পারেন নাই। কিম্বদন্তি আছে যে হিন্দুগণ খগোল, ভূগোল ও পাতাল বিদ্যা (Geology) সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সকল গ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "ক্ষেত্রসমাস" নামে কেবল মাত্র একখানি ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থের অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত আছি। আর যে সকল বর্ণনা আছে তাহা বিক্ষিপ্ত। হিন্দু জাতি চিরকালই শান্তিপ্রিয় ও একান্ত রক্ষণশীল, গৃহকোণ ছাড়িয়া "পাদমেকং ন গচ্ছতি"। ঘরে বসিয়া বা দায়ে পড়িয়া যে সব দেশ বা জাতির খবর পাইতেন বা সংস্রবে আসিতেন তাহাদের সম্বন্ধেই দুই চারি কথা নিজেদের রচিত গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করিতেন। ইহা হইতে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ভারতবর্ষ বা জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অনেকটা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসাদি কবির গ্রন্থ হইতে প্রচুর প্রমাণ পাইবেন। চীন, পারস্য, কাম্বোডিয়া (কম্বোজ) প্রভৃতি সুদূর রাজ্য সকলও তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত কম্বোজরাজ্য ভারতীয় নরপতিরই অধীন ছিল। (See Ancient India as described by

Ptolemy, translated by J. W. Mc. Crindle). তৎকালে ঢাকা নগরই ভারতের শেষ সীমা ছিল; এবং বর্ত্তমান কালে যেমন গ্রিনউইচ্ নগরকে কেন্দ্র ধরিয়া মানচিত্রে স্থানের দূরত্ব নির্দ্দেশ করা হয়, তৎকালে ঢাকা সহরকেই কেন্দ্র ধরিয়া হিন্দুগণ স্থানের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতেন। (See Ptolemy's Book on Ancient India). মহাভারতে শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ আছে; কেহ বলেন ইহা ইংলণ্ড, কিন্তু ইহা অসম্ভব। মহাভারত রচনাকালে গ্রীক্ বা রোমানগণই উক্ত দ্বীপের অস্তিত্ব অপরিজ্ঞাত ছিলেন, এবং ইংলণ্ডবাসীগণ অর্দ্ধনগ্ন আমমাংশভোজী অসভ্য জাতি ছিল। দ্বীপ বলিলেই যে island বুঝিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই; "দ্বয়োঃ দিশোঃ আপঃ যস্য তৎদ্বীপম্"—ইহাই সংস্কৃত ব্যাকরণের মত। কেহ কেহ শ্বেতদ্বীপ অর্থে য়ুরোপ বলিতে চাহেন। এলফিন্ষ্টোন্ সাহেবের মতে শ্বেতদ্বীপ আলেকজান্দ্রিয়া। ইহা সম্ভব হইতে পারে; আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত হিন্দুগণ বাণিজ্য ব্যাপদেশে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পাণ্ডবগণ যখন বনগমন করেন, তৎকালে বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। "ম্লেচ্ছ" অর্থে যাহা অবোধ্য এবং "কিরাতশবরপুলিন্দাদি জাতিঃ" ম্লেচ্ছজাতি (অমর কোষ); "শকাজবন কাম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্নবাস্তথা, কোলিসর্পাঃ সমহিষা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ" "অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা বিসর্জ্জয়ৎ, জবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কম্বোজানাং তথৈব চ, পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্নবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।" (বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ), "গোমাংসখাদকো যস্ত বিরুদ্ধং বহুভাষতে, সর্ব্বাচার বিহীনস্ত ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত বৌধায়ন বচনম্)। মনুসংহিতায় ম্লেচ্ছজাতির নাম লিখিত আছে—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদা খশাঃ॥"

অমরকোষে "ম্লেচ্ছাস্যম্" ও "ম্লেচ্ছমুখম্" তাম্রের প্রতিশব্দ রূপে লিখিত হইয়াছে। উপরে যে সকল ম্লেচ্ছ জাতির নাম লিখিত হইয়াছে, তাহাদের অনেকেরই তাম্র বর্ণ। অশোকের শিলালিপিতে "অন্তিয়কো যোন রাজা" লিখিত আছে। ইনি বোধ হয় গ্রীক Antiochus হইবেন। মালবিকাগ্নিমিত্র, পাণিনি প্রভৃতি গ্রন্থেও "যবন" শব্দের উল্লেখ আছে; এই নামে গ্রীক, আয়োনিয়, ও পারসিকগণ সূচিত হইত।

"সিদ্ধান্তশিরোমণি" গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) "রোমকসিদ্ধান্তের" উল্লেখ আছে, এই রোমক রাজ্যের সংস্থান সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটির্ অস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেহথ যাম্যে বড়বানলশ্চ॥"
"লঙ্কাপুরেহর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাম্।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরে হস্তকালঃ স্যাদ্ রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥"

লঙ্কার পশ্চিমে রোমকপত্তন; লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয় সেখানে তখন রাত্রি। এ রোমকপত্তন কোন স্থান তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা জানাইয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল—"রোমকপুর, সিদ্ধপুর প্রভৃতি সংজ্ঞা সাঙ্কেতিক। আজকালির জ্ঞাত কোন প্রদেশের সহিত মিলিবে না। সেকালেও সিদ্ধান্তোক্ত স্থানে ছিল না। লঙ্কা কাল্পনিক। নিরক্ষবৃত্তের (equator) পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত, কারণ নিরক্ষবৃত্তের নিকটে লঙ্কা অবস্থিত। কেহ বা লঙ্কা শব্দে উজ্জয়িনীগত রেখাস্থিত স্থানবিশেষ বুঝিবেন। * * * উদ্ধৃত শ্লোকে লঙ্কা = Lat. 0°, Long. 0°. উহা দিয়া রেখা উজ্জয়িনী দিয়া যাইত। তাহা prime meridian (যেমন সাহেবদের meridian of Greenwich)। তথা হইতে 180° distant সিদ্ধপুর, 90° distant যমকোটি ও রোমকপুর।" বিশদীকৃত ব্যাখ্যা পাইবার জন্য আমরা তাঁহার জ্যোতিষ গ্রন্থের মুদ্রণশেষ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

মুসলমান সাহিত্যে তুরস্কের সুলতান "রুমের বাদসাহ" বলিয়া খ্যাত। প্রসিদ্ধ পারস্য অভিধান "গিয়াস্ উল্ লোগাত্" হইতে পৃথিবীর যে মানচিত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে রুম রাজ্যের রাজধানী লিখিত হইয়াছে, "কুস্তুন্তুনিয়া" (Constantinople). এই মানচিত্র কবে কাহার দ্বারা অঙ্কিত, স্থির করিতে পারি নাই। ঐ অভিধানে স্বীকৃত হইয়াছে যে উহা "মোফরল্ কুলুব", "সরে চকমিনি", "সরে তজগেরা," "মহক্কক্ তুসী", "মেরাতুল

খেয়াল" ও "তকবিস্ উল্ বুলদান্" প্রভৃতি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত এবং ঐ মানচিত্র সেকেন্দর্-শাহের (Alexander) সময়ে স্থিরীকৃত। শেষোক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয় না, উহাতে ইংলণ্ড, রুষ, প্রভৃতি য়ুরোপীয় রাজ্য, জাপান প্রভৃতি পূর্ব্ব রাজ্য অঙ্কিত রহিয়াছে। পশ্চিম রাজ্য বলিয়া যে স্থান চিহ্নিত হইয়াছে তাহা কি আমেরিকা? য়ুরোপের রাজ্যগুলির সংস্থান বড় চমৎকার, চিত্র দর্শনে স্পষ্টীকৃত হইবে। যদি কোন পারস্যনবীশ পাঠক অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বকথিত পুস্তকাদি অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় সকল প্রকাশ করেন তবে ভাল হয়।

ভারতবাসী কয়েক ব্যক্তি আমেরিকা আবিষ্কারে সঙ্গ হইয়াছিলেন। Hewitt সাহেব বলেন যে কতকগুলি ভারতবাসী আমেরিকায় উপনিবেশী হইয়া তথায় তুলা চাষ আরম্ভ করেন। তুলা চীন ও ভারতের স্থানী (indegenous) ফসল। "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গ্রন্থে antepodes বৃত্তান্ত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে চমৎকৃত হইয়া যাইতে হয়।

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীতলস্থমাত্মানমস্যা উপরিস্থিতঞ্চ।
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থসংস্থা মিথশ্চ তে তির্য্যগিবামনন্তি॥
অধঃ শিরস্কা কুদলান্তরস্থা চ্ছায়া মনুষ্যা ইব নীরতীরে।
অনাকুলাস্তির্য্যগধঃ স্থিতাশ্চ, তিষ্ঠন্তি তে তত্র, বয়ং যথাত্র॥"

প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি (প্রবাসী ১৩০৯, আষাঢ়) যে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে চীনগণই প্রথম দিগ্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কার করেন ও তৎসাহায্যে বহুদূর দেশেও বাণিজ্য ব্যপদেশে গমনাগমন

করিতেন। চীন সম্রাট শি-হোয়াংটি'র সময়ে (২১৩ খৃঃ পূর্ব্ব) সমস্ত গ্রন্থ, ইতিহাস ও ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি নষ্ট করা হয় তাহাতে চীন দেশের প্রাচীনতম বৃত্তান্ত কিছু জানা যায় না।

আসিয়া মহাদেশের সভ্যজাতিদিগের মধ্যে সতত-ভ্রমণকারী আরবজাতিই ভূগোলতত্ত্ব আলোচনায় রীতিমত প্রবৃত্ত হয়েন। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবদাল্লা আহামদ মোকাদ্দাসী নামক একজন আরব ভ্রমণকারীর মনে উক্ত কল্পনা উদিত হওয়ায়, তিনি জিব্রল্‌টার হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বহুদেশের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অমানুষী পরিশ্রম আমাদের নিকট বিফল বলিয়াই বোধ হয়; তিনি দেশ বিদেশের নাম ও আচার ব্যবহারাদি মাত্র সঙ্কলন করিয়াছেন, কিন্তু কোনও জনপদের স্থিরসংস্থান ও পরস্পর তুলনায় দিঙ্‌নির্দ্দেশাদি করিতে পারেন নাই বলিয়া এক্ষণে সেই সকল স্থানকে "সেনাক্ত" করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। মহম্মদের মৃত্যুর পরে (৬৩২) তাহারা সমগ্র দক্ষিণ-য়ুরোপ ও উত্তর আফ্রিকা, এবং সমগ্র আসিয়ার (সাইবিরিয়া বাদে) বৃত্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহারা এতদূর কৃতকার্য্য হইলেও পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারেন নাই।

তৎপরে মিশর ও গ্রীস এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভূগোলতত্ত্ব আলোচনা করিয়া গিয়াছেন—(১) Hekatens of Miletus (খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন)। (২) Artimidorus ১০০ খৃঃ পূ; (৩) Marinos of Tyre খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আজো দেখিতে পাওয়া যায়—(১) Ptolemy কৃত ভূগোল (Geography, ২য় শতাব্দী); (২) The Periplus of the Erythrean Sea; (৩) Strabo লিখিত ভূগোল, ১৯ খৃষ্টাব্দ; (৪) Pomponius Mila প্রণীত The Compendium of Geography, ৪২ খৃঃ অঃ; (৫) Compendium of Solinus, ২৩৮ খৃষ্টাব্দ; (৬) Periplus of the outer Sea ৪০০ খৃষ্টাব্দে হিরাক্লিয়া নিবাসী Marcianus কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহাঁদের মধ্যে Ptolemy সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কোপরনিকস বিরচিত "De Revolutionibus Orbium Cælestium" নামক গ্রন্থে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের ধারণা কিরূপ ছিল তাহা লিখিত হইয়াছে। "Empedocles ও Anaxemenes (৪৪৪ খৃঃ পূ) পৃথিবীকে চেপ্টা মনে করিতেন; Leucippus ইহাকে তূর্য্যাকার (Trumpet shaped) মনে করিতেন; Heraklidus (৫০০ খৃ পূ) ও Demokritus (৪৭০—৩৬২ খৃ পূ) ইহাকে কটাহের আকার প্রদান করিতেন; Anaximander (৬১০—৫৪৭ খৃ পূ) ইহাকে ফাঁপা নলের মত মনে করিতেন; Xenophenes (৬২৮-৫২০ খৃ পূ) মনে করিতেন "পৃথিবী একটা চেপ্টা থালার মত, এবং ইহার কিনারা ক্রমশ পাতলা হইয়া গিয়া অসীম সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে।" এতদ্ভিন্ন হিজিয়ডের সমসাময়িক (৮০০ খৃ পূ) গ্রীকগণ পৃথিবীকে সমুদ্রবেষ্টিত একটি চক্র (flat disc) বলিয়া অনুমান করিত; তাহাদের চক্ষু দিগ্বলয় পর্য্যন্ত প্রসারিত ও প্রতিহত হইত, তাহাতেই তাহাদের এই অনুমান বা সিদ্ধান্ত। প্রথমতঃ তাহাদিগের নিকট পৃথিবীর পরিসর পূর্ব্বে ককেসস্ পর্ব্বতজা ফেসিস নদী ও পশ্চিমে সিসিলি দ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, পরে পশ্চিম সীমা জিব্রল্‌টার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ঐ স্থান Pillars of Hercules নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, এই চক্রাকার স্থলভাগ বেষ্টন করিয়া অনন্ত অগম্য সমুদ্র তাহার ক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি সর্ব্বদা আস্ফালন করিতেছে। মনস্বী প্লেটো মনে করিতেন যে পৃথিবী ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাকৃত নহে, পরন্ত উহা অনন্ত-বিস্তৃত এবং উহার আকার পাশাখেলার পাশটির মত চারিটী পার্শ্ব বিশিষ্ট।

Pythagoras (৫৮০-৫০০ খৃ পূ) ও Herodotus (খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৮৪-৪২০) কেবল মাত্র বলিয়া গিয়াছেন যে পৃথিবী গোল। কিন্তু পিথাগোরাসের সমসাময়িক যবনাচার্য্য (ভারতবাসী) সৌরজগতের সম্বন্ধ ও স্থিতি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আরিষ্টটল প্রভৃতি পরবর্ত্তী গ্রীক্ মনস্বীগণ পৃথিবীকে গোলক বলিয়া বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, কেবল সমুদ্রপথে বিশ্ববেষ্টন পরবর্ত্তী কালের জন্য ছিল। Ptolemy (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) পৃথিবীকে গোল বলিয়া জানিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ইহাকে অগমন-পটু মনে করিয়াছিলেন।

দুই একজন পণ্ডিতের ধারণা অভ্রান্ত হইলেও জনসাধারণ এবং এমন কি পূর্ব্বোক্ত মতের প্রচারাভাবে পণ্ডিতবর্গও বহু অর্বাচীন কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই জন্যই যখন কর্ম্মবীর কলম্বস পৃথিবীর গোলত্ব প্রচার করেন, তখন সালামানকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ কলম্বসের উক্তির ঘোর প্রতিবাদ করেন (১৪৯০ খৃষ্টাব্দ)। এতৎসমকালেই প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কোপরনিকসও (১৪৭৩—১৫৪৩) পৃথিবীকে গোল বলিয়া প্রচার করেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কলম্বস তাঁহার উক্তি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত পশ্চিম মুখে সমুদ্র যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প করেন এবং তাহার ফলে ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তিনি আমেরিকাকে নবরাজ্য না মনে করিয়া ভারতেরই একাংশ বা ভারত-সংলগ্ন কোন রাজ্য বলিয়া অনুমান করেন। ভাস্কো ডি গামাও পৃথিবী আবেষ্টন করিয়া ভারতে যাইবার মানসে যাত্রা করিয়া ১৪৯৭ সালে আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া ভারতে উপস্থিত হয়েন।

নুরনবর্গ্ নিবাসী মার্টিন বেহেম প্রথম অনুমান করেন যে আমেরিকা ও ভারতবর্ষ সংলগ্ন নহে, উভয়ের মধ্যে এক মহাসাগরের ব্যবধান আছে। ১৫২০ অব্দে ম্যাগাল্‌হেন্ এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন এবং তাহার প্রমাণের ফলে আমেরিকার আট্‌লাণ্টিক্ সাগর সন্নিহিত Patagonia পর্য্যন্ত মানচিত্রে অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কার্য্য উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। তাঁহার পর ১৫৭৭-১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ ড্রেক নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ পৃথিবী আবেষ্টন করিয়া আসেন। ছয় বৎসর পরে টমাস ক্যাভেণ্ডিশ নামক ইংরাজ ও তৎপরে কয়েকজন ওলন্দাজ এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করেন, ১৬১৪-১৬১৭ অব্দে জর্জ্জ স্পিলারী (Spillery) নামক এক জর্ম্মণ তৎপথাবলম্বী হয়েন।

পৃথিবীর গোলত্বের অপর একটি প্রমাণ উচ্চতার সহিত দিগ্বলয়ের বিস্তৃতি। পুরাকালের লোকদিগের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী চক্রাকার থালার মত বলিয়া দিগ্বলয় চক্রাকার দেখায়; তৎপরবর্ত্তীকালে স্থির হইল যে, চক্ষুর একটা দৃষ্টি-সীমা আছে, সেই জন্য মানুষ নিজেকে কেন্দ্র করিয়া যে দৃষ্টি প্রসারিত করে তাহাতেই বৃত্তাকার দিগ্বলয়ের সৃষ্টি হয়। পরে দেখা গেল উচ্চতার সঙ্গে সীমাও নিম্নলিখিত অনুপাতে বাড়িয়া চলে; ১০ ফুট উ স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে ৮ মাইল; ১০০ ফুট উচ্চ স্থান হই চতুর্দ্দিকে ২৫ মাইল, ও ১০০০ ফুট উচ্চ স্থান হই চতুর্দ্দিকে ৪০ মাইল পর্য্যন্ত দেখা যায়, এবং এমন অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ২৬০ মাইল পর্য্যন্ত দেখা গিয়া ১৬৩৪ সালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্যাস্কাল বায়ুমান (Bar meter) যন্ত্র দ্বারা পর্ব্বতের উচ্চতা নির্ণয়প্রণালী উদ্ভা করিয়া ভূগোল বিস্তার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

পৃথিবীর গোলত্ব হইতেই এক স্থানে দৃষ্ট গ্রহণ, তার নক্ষত্রাদি অন্য স্থান হইতে দেখা যায় না, কোপরনি পাশ্চাত্য জগতে ও ভাস্করাচার্য্য ভারতবর্ষে তাহা প্র করেন।

এই সকল প্রমাণ হইতে যদি স্থির হইল যে পৃথি গোল, তবে হিমালয়াদি উচ্চ ভূধরশ্রেণী ও সুগভীর উপত্য বলী ইহার গোলত্বের ব্যাঘাত ঘটায় না কেন? ই উত্তর, পৃথিবীর বৃহৎ আকারের তুলনায় পর্ব্বত-উপত্যক দির নগণ্যত্ব। যদি পৃথিবীকে ১৬ ফুট ব্যাসের এক গোলক বলিয়া ধরা যায়, তবে সেই অনুপাতে অত্যু পর্ব্বত ১/১২ ইঞ্চের অধিক হইবে না। একটা ক্রীড়াকন্দুকে গাত্রসংলগ্ন ধূলিকণা যেরূপ গোলত্বের ব্যাঘাতক না ধরণীগাত্রলগ্ন পর্ব্বতাদিও সেইরূপ।

"সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রকরৈরিব॥"

(সিদ্ধান্ত শিরোমণি)

পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর পণ্ডিত ইহার উদ্ভব প্রণালীও স্থির করিয়াছেন। ইহা আ তরলাবস্থায় ছিল, তরল পদার্থরাশি যদি কোন ব প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তবে তাহা গোলাক ধারণ করে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। তরল পৃথিবী ঘূর্ণাবেগ সংযুক্ত হওয়াতে তাহার উদর কিঞ্চিৎ স্ফী হইয়া ঊর্দ্ধাধঃ (অর্থাৎ মেরুপ্রদেশ) কিঞ্চিৎ চেপ্টা হই যায়; পরে তরলাবস্থা হইতে কাঠিন্য লাভ করিয়া পৃথিবীর পূর্ব্বাকার ঘুচে নাই। ইহার আকার পাশ্চা পণ্ডিতগণ কমলালেবুর সহিত ও হিন্দু জ্যোতিষী আ লকী ফলের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

অনেকের অনুমান যে তরল পৃথিবী ভয়ানক তাপযুক্ত ছিল, এবং কালে সেই তরল অগ্নির উপরে কঠিন সর পড়িয়া পৃথিবী বর্ত্তমানে মৃন্ময়ী হইয়াছে, এই উক্তি সমর্থনের জন্য তাঁহারা বলেন যে উপরে মৃৎসর পড়িলেও ইহার উদরে এখনো দ্রবাগ্নির ঢেউ খেলিতেছে; কেন না, আমরা পৃথিবীর যত নিম্নাভ্যন্তরে যাই, তত তাপবৃদ্ধি অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু নরচেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত ৩০০০ ফুটের অধিক গভীর কোন খনিতে বা গহ্বরে কেহ নামিতে পারে নাই। ঐ গভীরতা পৃথিবীর বিশাল ব্যাসের তুলনায় অতি তুচ্ছ; সুতরাং উহা হইতে কোন সিদ্ধান্ত আনুমানিক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হিন্দু পুরাণেও "মেদিনী" আদৌ জলময়ী ছিল, তৎপরে তাহার গঠন আরম্ভ হয়। তাহার ইতিহাস অদ্ভুত; "মেদিনী" শব্দের ইতিহাস অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে আমার—আমি তার।

সে আমার—আমি তা'র—
আপনা সঁপেছি তা'য়,
হেরিলে সে মুখ-শশী
ভরে হিয়া জ্যোসনায়!
হোক্‌না তোদের কাছে
কুৎসিত অঙ্গার সম,—
সে ভাই হৃদয় জোড়া
কৌস্তুভ-রতন মম!
তোদের থাকে তো আঁখি
তোরা সবে দেখ্ রূপ,
অন্ধ আমি!—জানি শুধু—
সে জন সুধার কূপ!
ড়'বেছি ম'জেছি তাহে,—
আমি তো আমাতে নাই,
দোষ গুণ বাছা বাছি
তোরা গিয়ে কর্ ভাই।
তুচ্ছ মানি রূপ গুণে,—
ধারিনে তা'দের ধার,
আমি বুঝি সোজা সোজি—
"সে আমার—আমি তার!"
দুইটি জলের বিন্দু
কমলের দল'পরি,
গোধূলি-গগণে চে'য়ে—
রাঙা রবি সাক্ষি করি,—
গিয়াছে মিশিয়া কবে!
(কি যোজনা বিধাতার,)—
মিলিয়াছে এ পরাণ
কোমল পরাণে তা'র!
তারা যথা ডু'বে যায়
রবি-কর দরশনে,
খদ্যোতের আলো মিলে
উষার হাসির কোণে,—
তেমনি গিয়েছে মিশে
সে জীবনে এ জীবন,—
দুখের সংসার যেন
হ'য়েছে নন্দন-বন!
যখন ভাবিহে মনে
"সে আমার—আমি তা'র,"—
এ ক্ষুদ্র হৃদয় যেন
হয় প্রেম-পারাবার!
প্রেমের প্রবল বাণে
ভে'সে যায় ধরাতল,
লহরী লীলায় বহে
প্রেম ধারা অবিরল!
অলক্ষিতে সে সায়রে—
পরাণ ডুবিয়া যায়,
"সে আমার—আমি তা'র,"—
শুধু এ ঝুমড়ি গায়!!

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

"লুসাই" জাতি।

নিরক্ষর অসভ্য জাতিগণের আচার ব্যবহার ও তাহাদের পুরাতত্ব সংগ্রহব্যাপার নিতান্ত কঠিন। এরূপস্থলে অনেক সময়ে কল্পনা ও অনুমানের সাহায্য লইতে হয় এবং নানাপ্রকার কিম্বদন্তীর আশ্রয়ে তাহাদের পুরাতত্ব একরূপ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, নতুবা গত্যন্তর নাই। মণিপুরী, নাগা প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির সম্বন্ধে যেমন এক প্রকার কিম্বদন্তী আছে তৎসাহায্যে তাহাদিগের পুরাবৃত্ত অনেকাংশে জ্ঞাত হওয়া যায় কিন্তু অসভ্য লুসাইদিগের সম্বন্ধে তেমন কিছুই নাই। ইহাদের ভাষা, নাম, আচার ব্যবহার লইয়া অনেকে বহুকালাবধি আলোচনা করিয়াও কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক প্রয়াস করাও আমাদিগের বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা হউক আজ পাঠকগণ সমীপে আমরা এই জাতির আচার ব্যবহারের কিয়দংশ আলোচনা করিব।

লুসাই নিষ্ঠুর জাতি।

বাহ্য প্রকৃতি, শান্ত কার্য্য কলাপের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহাদিগকে আপাততঃ শান্ত শিষ্ট জাতি বলিয়া সহজেই উপলব্ধি হইবে। বোধ হইবে পর্ব্বতের নিভৃত কক্ষে থাকিয়া—শান্ত প্রকৃতির কোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া ইহারা নিরীহ জাতিদিগের অগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাদের কার্য্যকলাপের অভ্যন্তরীণ অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আপনার সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রম-মূলক বলিয়া স্থির হইবে। জগতে বোধ হয় এমন কোন প্রাণী নাই (তাহাদের দেশে) যাহা তাহাদিগের রসনা-স্পৃষ্ট হয় না। পাইলে ইহারা সবই ভক্ষণ করিতে পারে। শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, ইন্দুর, বানর প্রভৃতি এমন কি সর্প-মাংস পর্য্যন্ত সকল প্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে, অধিকন্তু মস্তকের উৎকুণটী পর্য্যন্ত বাদদিতে ইহারা নারাজ। তজ্জন্য ইহাদিগকে "সর্ব্বভুক্" বলিলেও অন্যায় হইবে না। জন্তুকে যন্ত্রণা না দিয়া হনন করা ইহাদিগের রীতিবিরুদ্ধ। লুসাইদিগের অন্যান্য আমোদ প্রমোদের মধ্যে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া "মেটনা" বধ একটী প্রধান। দশ বার জন লুসাই দল বাঁধিয়া বন্য মেটনা (গয়লা) শিকার করিতে যায়,—খোঁচাইয়া তাহাকে নিহত করিয়া মহানন্দে সকলে গৃহে ফিরিয়া আইসে। নিষ্ঠুরতা ইহাদিগের জীবনের প্রধান উপাদান। বাল্যকাল হইতেই এই মন্ত্রে ইহাদিগের প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া থাকে। শুনা যায় যুদ্ধের সময় যাহারা ইহাদিগের হস্তে নিপতিত হইত অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া তাহাদিগের প্রাণ বধ করিত। প্রাণান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যহ ইহারা হতভাগ্যের এক একটা অঙ্গ কাটিয়া দিত। এতদপেক্ষা গভীর নিষ্ঠুর কার্য্য আর কি হইতে পারে?

দানবে দেবত্ব বা অতিথি-সংকার।

যে জাতি যতই কেন অসভ্য হউক না; সভ্যতার নিম্নতম স্তরে যতই অধিরোহণ করুক না কেন সকল জাতির মধ্যেই একটা দেবদত্ত স্বর্গীয় গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তাহাদের নিজস্ব—ইহার জন্য সে কাহারও নিকট কখনও ঋণী নহে; মরুভূমির মধ্যে শস্য-শ্যামল উদ্যান 'ওয়েসিসের' মত কিংবা প্রচণ্ডাতপদগ্ধ ধরণীর স্নিগ্ধ তরুছায়ার মত এই প্রকার একটী একটী সদ্গুণ তাহাদিগের মধ্যে আপনি ফুটিয়া উঠে। মানব যে ঈশ্বর-সৃষ্ট ঈশ্বরদত্ত সদ্গুণ সমূহের প্রকৃত অধিকারী ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে। প্রায় প্রত্যেক কার্য্যে নিষ্ঠুরতার কঠোর নিদর্শন দৃষ্ট হইলেও এই অসভ্য জাতির এমন একটী সদ্গুণ আছে যাহাতে অনেকানেক সভ্য জাতিও অধিকারী প্রাপ্ত হয়েন নাই। অতিথি-সংকার লুসাইদিগের কর্ম্ম-জীবনের একটী মহৎ অংশ। লুসাই যুবকগণ কখনও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে রাত্রি যাপন করে না—তাহাদিগের রাত্রিবাসের নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রামে "জলবউক" নামে একটী গৃহ আছে। দিবাভাগে আপনাপন পারিবারিক কার্য্য সম্পাদনান্তর শ্রান্ত গ্রাম্য যুবক আমোদ প্রমোদের সহিত এইখানে রাত্রযাপন করে। এই "জলবউকের" এক অংশে অতিথি-সংকারোপযোগী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। স্বদেশী বা বিদেশী লোক আসিলে স্বেচ্ছাক্রমে সেই গৃহে বাস করে। গ্রামবাসিগণ কর্ত্তব্য বোধে নানাপ্রকার পানীয়, ফল মূল প্রভৃতি আহার্য্য দিয়া অতিথিসৎকার করিয়া থাকে। আজ কালকার সভ্যতা স্বার্থগন্ধ বিজড়িত; অসভ্য লুসাইগণ সভ্যতার মর্ম্ম অল্প অল্প বুঝিয়াছে—সুতরাং তাহাদিগের অর্থ লিপ্সা বাড়িয়াছে। কিছুদিন হইল এই লিপ্সা-বশবর্ত্তী হইয়া লুসাইগণ কয়েকটী মনুষ্য জনকে খুন করিয়াছে। অর্থই অনর্থের মূল!

এক আশ্চর্য্য প্রথা জন্ম ও মৃত্যু।

লুসাইশিশু ভূমিষ্ঠ হইলে সকলে মিলিয়া জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া চাটিয়া তাহাকে পরিষ্কার করে। অন্যান্য অনেক অসভ্য জাতির তুলনায় এই কার্য্যে তাহাদিগের কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ হয় না। এই এক আশ্চর্য্য প্রথা। 'মৃত্যু সকলেরই হইবে—একাকী মরিতে নাই।' এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লুসাইগণ আরও ২।১ জনকে মারিয়া সেই সঙ্গে কবরস্থ করে। রাজ্যের রাজার মৃত্যু হইলে মন্ত্রী-স্বরূপ আর একজনকে সেই সঙ্গে কবর দেওয়া হয়। মৃতদেহ একদিনে কবরস্থ করা নিষিদ্ধ। প্রসূতির মৃত্যুর পর সদ্যোজাত শিশুকে একত্রে জীবন্ত সমাধিস্থ করে। লুসাইদিগের নিষ্ঠুরতার আর একটী প্রধান নিদর্শন এই। মেজর সেক্সপীর এবং আরও কয়েকজন ইংরাজ এই নিষ্ঠুর সমাধি কার্য্য হইতে কয়েকটী শিশুপ্রাণ রক্ষা করেন।

লুসাই বালিকাত্রয়।

লুসাই রমণী

পার্শ্বে তিনটী লুসাই বালিকার ফটো দেওয়া হইল। লুসাই অসভ্য জাতি—কিন্তু ছবির দিকে—লুসাই রমণীর দিকে চাহিয়া কে বলিবে ইহারা অসভ্য। বালিকা তিনটীই সমবয়স্কা; প্রত্যেকের মুখে এক একটী ধূমপানের নল। লুসাই জাতি অত্যন্ত ধূমপান প্রিয়, কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেই সকল সময়ে অনবরত ধূম পান করিতেছে। বালিকা তিনটী কোন নৃত্যে যাইতেছে; উপযুক্ত বেশভূষা করিয়া বাহির হইয়াছে—অসভ্যতার কঠোর ক্রোড়ে থাকিয়াও কেমন মাধুর্য্য ফুটিয়া পড়িতেছে; কেমন কমনীয়তা আনন্দ জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে; লুসাই জাতির এইটুকুই লাভ; অসভ্য হইলেও অসভ্যতার মধ্যে এইটুকুই গৌরবের বিষয়।

পুরুষ জাতির মধ্যে ষোল আনা অসভ্যতা ও কঠোরতার চিহ্ন দৃষ্ট হইবে কিন্তু রমণী জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান। সর্ব্বদা কলহে, যুদ্ধে, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রাণি-হনন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় পুরুষজাতি বিলাস ব্যসনের দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর পায় না। রমণীগণ আপনাদের নিভৃত শান্ত কুটীরে—শ্যামল পাহাড়ের বিস্তৃত উপত্যকায় নির্ব্বিবাদে জীবন যাপন করে; আলস্যে জীবনটা যাপন করা অপেক্ষা, পাহাড়ে ফুল তুলিয়া ফুলের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া কখনও নিজে পরিয়া কখন বা অপরকে পরাইয়া অথবা সুচারুরূপে আপনাদের মাথার চুলগুলি আঁচড়াইয়া দুই একটী বিননী করিয়া তাহাতে দুই একটী শ্বেত পুষ্প গুঁজিয়া দিয়া যতটুকু বিলাস লালসা পরিতৃপ্ত করা এবং আপনাদের যতটুকু সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া সুন্দর হওয়া বিশেষ গৌরবজনক এবং প্রয়োজনীয় বোধ করে ততটুকু ইহারা করিয়া থাকে। ইহারা পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করে।

পর পৃষ্ঠায় ছবি দেখ! ইহাকে অসভ্য বলিবে কি? মুখ হইতে ধূম পানের নলটী কাড়িয়া লইয়া ইহাকে বঙ্গমহিলা-মণ্ডলীর মধ্যে বসাইয়া দাও চিনিতে পারিবে না। এই যুবতিটীর বয়স ১৮।১৯ বৎসর অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই—বোধ হয় মনোমত পাত্র মিলে নাই। বিবাহ ব্যাপারে, পতি নির্ব্বাচন-বিষয়ে লুসাই রমণী সম্পূর্ণ স্বাধীনা।

রমণীর দিকে চাহিয়া দেখ—ইহার সর্ব্বাঙ্গ পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত বস্ত্র দ্বারা আবৃত, পরিধানে অঙ্গরাখা, হস্তে

লুসাই যুবতী।

(ইহার বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর, অদ্যাপি ইহার বিবাহ হয় নাই।)

পুষ্পবলয়; পিত্তলের অলঙ্কার। কেশপাশ কেমন বিন্যস্ত; দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নহে, কেমন সরল! কোমলতা ও মাধুর্য্যে লুসাই যুবতীর লাবণ্য উছলিয়া উঠিতেছে।

অধিক বয়সে বিবাহ প্রথা লুসাইদিগের একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়। হতভাগ্য বাঙ্গালিদিগের ন্যায় বাল্য-বিবাহের বিষময় বীজ এখনও ইহাদিগের মধ্যে উপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পতি-নির্ব্বাচন বিষয়ে লুসাই রমণী সম্পূর্ণ স্বাধীনা।

বিবাহ প্রথা

বিবাহ দুই প্রকার। প্রথমতঃ পাত্র পাত্রী পরস্পর মনের মিল করিয়া—পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিলে কোন সবিশেষ নিকট আত্মীয় দ্বারা তাঁহাদিগকে জানায়। বিবাহের পূর্ব্বের এই প্রথাকে পাশ্চাত্য 'কোর্টসিপ'ই বলুন অথবা 'পূর্ব্বরাগ' বলিতে হয় বলুন। এই প্রকারে মনে মনে মিল হইয়া গেলে তখন বরের পিতা কন্যার পিতার নিকট প্রস্তাব করিয়া পণের টাকা নির্দ্ধারণ করে। পণ গ্রহণ বিবাহের দ্বিতীয় অঙ্গ; সর্ব্বদাই বরকে পণের টাকা দি[illegible] হয়। সমস্ত একবারে দিতে হয় না ক্রমে ক্রমে দাও[illegible] চলে তবে কন্যার দোষে বিবাহ ভঙ্গ হইলে ঋণ পারি[illegible] করা না করা বরের ইচ্ছা। অনেক সময়ে পাত্রের মাতা[illegible] কন্যার জন্য অর্থ দিতে শুনা যায়। ১৫।২০।৩০ টাকা হই[illegible] ১৫০৲ টাকার উপর পর্য্যন্ত পণ নির্দ্ধারিত হয়। শূ[illegible] মেটনা, থালা, বাটী প্রভৃতি পণাঙ্গীয় দ্রব্য। পণের [illegible] টাকা অগ্রে দিলেই বিবাহ হয়।

বিবাহের দিন যথোপযুক্ত আড়ম্বরের সহিত বরযাত্র[illegible] কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হয়। গ্রামের মধ্যস্থ [illegible] অতি সতর্কতার সহিত পাত্রীকে বিবাহ সভায় উপ[illegible] করে। বর কন্যা এবং মধ্যস্থের মধ্যে পদস্খলন বি[illegible] অমঙ্গলের চিহ্ন। পাত্রী উপস্থিত হওয়া মাত্র সক[illegible] আছাড়িয়া কক্কুট, বিড়াল প্রভৃতি বধ করে, এরূপ কা[illegible] বিশেষ শুভজনক, ভবিষ্যতে পাত্র পাত্রীর সুখকারক এ[illegible] সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে ত্রাণকারক হইয়া থাকে। অত[illegible] পাত্র পাত্রী পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কি[illegible] এই প্রশ্ন উভয় পক্ষ হইতে উত্থাপিত হয়। তৎপ[illegible] পরস্পর পরস্পরকে মদ্যপান করাইলেই বিবাহ নি[illegible] হইল।

বিবাহসভায় আনীতা পাত্রীর গাত্রে যে সকল [illegible] থাকিবে চাহিবা মাত্র তাহা দান করিতে হইবে। সুত[illegible] অনেক সময়ে নগ্ন দেহে বিবাহ করিতে হয়—এই [illegible] আশ্চর্য্য প্রথা। বিবাহের অনতিপরেই নূতন বস্ত্র দ্বা[illegible] দেহ আবৃত করিতে হয়। কুমারী অবস্থায় সকলে স্বা[illegible] জন্য এক এক খানি বস্ত্র বয়ন করিয়া রাখে, বিবাহের [illegible] স্বামীকে সেই বস্ত্র পরায়। সেই দিবস স্বামী স্ত্রী পর[illegible] পৃথক গৃহে অবস্থান করে; পর দিন স্ত্রী স্বামীর গৃহে যা[illegible] সমস্ত বিবাহিত জীবন ব্যাপিয়া পরস্পর পরস্পরকে বি[illegible] করিয়া জীবন যাপন করে।

লুসাইগণের ধর্ম্মজীবন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারম[illegible] অধুনা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে পাদরী মহাশয়দি[illegible]

ধর্ম্মোৎসব

কৃপায় অনেকে আলোকে আসিতেছে[illegible] পিতৃ পৈতামহিক ধর্ম্ম আর এখন ভাল লাগিতেছে ন[illegible] অনেক লুসাই খৃষ্টান হইয়াছে। লুসাইগণ "পাথিয়া[illegible] নামক দেবতার পূজা করে। এই দেবতাই তাহা[illegible] সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, বিপদ ও রোগমোচনকর্ত্তা। অন্যান্য দেবতার পূজা কেবল পাথিয়ানের অংশ মাত্র পূজা। সমস্ত পূজার প্রধান অঙ্গ শূকর, কুকুর প্রভৃতি জন্তু হত্যা, মদ্য পান ও নৃত্য। পাথিয়ান নাকি বড় কুক্কুর প্রিয়। বংশখণ্ড কুক্কুরের গুহ্য দ্বারে প্রবেশ করাইয়া বধ করা পাথিয়ান পূজার বিশেষত্ব। লুসাই-উৎসবের নৃত্য বড় কৌতুক-জনক না হইলেও অনিষ্টকর সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে একজন এরূপ লিখিয়াছেন:—

"কতকগুলি লোক একসঙ্গে ঢোলের এবং বাঁশীর শব্দের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, কখন কখন হো হো শব্দ করিয়া কোন একটী কথা উচ্চারণ করে। চারিদিকে গ্রামস্থ যুবকগণ ঘিরিয়া বসে এবং প্রত্যেকের ক্রোড়ে এক একটী বালিকা বসে। সকলে মিলিয়া মদ্যপান করে। জনাকীর্ণ অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র একপ্রকার তীব্র গন্ধে আকুল হইয়া পড়িলাম। গৃহপ্রস্তুত মদ ও "বাইবেলস্থ" সাদা তামাকের ধূমের গন্ধে তাহাদের অপরিষ্কার বস্ত্র ও গৃহ পার্শ্বস্থ মল মূত্রের গন্ধের সহিত মিলিত হইয়া কি যে এক অদ্ভুত তীব্র গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। তাহারা আমাদিগকে যত্ন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে নৃত্য গীতাদির মধ্যে অতি সমাদরে বসিবার স্থান দিল। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অতি কষ্টে অল্প সময় কাটাইয়া শেষে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

অসভ্য জাতি মাত্রেই বহুবিধ কুসংস্কারের দাস।

থরিং

লুসাইগণও ইহা হইতে অবশ্য অব্যাহতি পায় নাই। তাহাদিগের নানা প্রকার কুসংস্কারের মধ্যে "থরিং" (ডাইন) বধ একটা বিশেষ ভয়াবহ ব্যাপার। জগতের মধ্যে যত প্রকার অনিষ্টকর প্রাণী আছে থরিং তাহাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় "থরিং" আছে, ইহার মধ্যে পুরুষ "থরিং" বিশেষ অনিষ্টকারী। তাহাদিগের সহবাসে ও দৃষ্টিতে নানা প্রকার পীড়া জন্মিবেই ত, অব-শেষে প্রাণহানি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে পূর্ব্বে এই প্রকার ডাইনদিগকে জীবন্ত দগ্ধকরার প্রথা ছিল। লুসাই ডাইনদিগকে একা চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হয়। অধিক কুদৃষ্টি পরিচালনা করিলে সকলে একত্র হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করে। প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল নর্থ লুসাইতে ডাবাবিলি নাম্নী একটী লুসাই রাণীর গ্রামে ৬।৭টী লোক থরিং বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। রাণী তাহাদিগকে অনেক বার গ্রাম পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন এমন কি প্রাণ বিনাসেরও ভয় দেখা-ইয়াছিলেন। তখন তাহারা ভীত হইয়া লুংলের পলিটিক্যাল অফিসারের নিকট আবেদন করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে থাকিবার আদেশ পাইয়াছিল। একদা পূর্ব্বস্থান হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্য তাহারা ডাবাবিলির (Dowabili) গ্রামে গিয়াছিল। আবার ঠিক সেই সময়ে গলদেশের পীড়ায় রাণীর একটী সন্তানের মৃত্যু হয় এবং অল্পক্ষণ পরেই স্বয়ং ডাবাবিলি সেই পীড়ায় পীড়িত হন। তখন সকলে থরিংদিগের প্রতি সন্দেহ করিল। রাণী রোগ-শয্যায় থাকিয়া তাহাদিগের ধ্বংশের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিজের গ্রামীয় লোকদিগের দ্বারা এ কার্য্য সংসাধিত হইবে না ভাবিয়া পরবর্ত্তী গ্রামের সর্দ্দারদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবস ৩।৪ শত লোক দা প্রভৃতি লইয়া "থরিং" দিগকে আক্রমন করিল। ৪ জনকে হত্যা করিল। একটী বালককে মৃত জ্ঞানে ফেলিয়া দিয়া গেল। লুংলের আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন মহা-শয়ের কৃপায় বালকটী রক্ষা পাইয়া তাঁহার সহিত আছে। মৃত থরিংদিগের যকৃতের এক এক খণ্ড তখনই সকলের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল, থরিং-দৃষ্টি হইতে শান্তি পাইবার জন্য সকলে সযত্নে গৃহে লইয়া গেল। ডাবাবিলির জন্যও একখণ্ড প্রেরিত হইল। কিন্তু হায় সেই "থরিং"-দৃষ্টি-শান্তকারী যকৃতখণ্ড পৌছিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধা রাণীর প্রাণ-পাখী দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া গিয়াছিল। আরও আশ্চর্য্য এই যে যখন ঘটনা অনুসন্ধান হয় তখন সকলে অম্লানবদনে দোষ স্বীকার করিয়াছিল। যেন অভিনব কিছুই ঘটে নাই!!

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এই অসভ্যদিগের মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করিতেছে—কিছুদিন পরে সমস্ত জাতিটা সভ্যতার আসনে আসীন হইতে পারিবে—সুসভ্য বৃটিশ রাজত্বের এইটুকু বিশেষ গৌরবের বিষয়।

সভ্যতাবহ্নি ধূমায়মান

লুন্দলে, আইজোল প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীগণ সভ্যসমাজ সংস্পর্শে সভ্য হইতেছে। অনেকে এমন হইয়াছে যে পৈত্রিক সংস্কারের ছায়াস্পর্শ করিতেও স্বীকার করে না—আবার

কেহ কেহ তদ্বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই সম্পূর্ণ নারাজ। অনেকে ধুতি, পেণ্টুলেন, জুতা, কোট, পরিধান করিতেছে। শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে লুসাইদেশে দধিদুগ্ধাদির আধিক্য স্বত্বেও লুসাইরা কখনও তাহা আহার করে না—এক্ষণে সে হাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—অনেকে দধিদুগ্ধাদি আহার করিতেছে। পরিধানে কোট, পেণ্টুলেন, মাথায় কেশবদ্ধখোপা বড়ই আমোদজনক দৃশ্য। পৈতে নামক

পৈতা পুরুষদ্বয়।

এক সম্প্রদায় মাথার উপর খোঁপা বাঁধিয়া থাকে—উপরে চিত্র দেখুন।

লুসাইগণ ভাত খাইয়া থাকে, নানাপ্রকার বনজ শাক সবজী ও তরকারীসিদ্ধ জল দিয়া অন্ন আহার করিয়া

ভেতো লুসাই

থাকে। এই সমস্ত দ্রব্য অল্প লবণ লঙ্কা সহযোগে সিদ্ধ হইলেই আ... উৎকৃষ্ট হইল। এ প্রকার আহার্য্য ভক্ষণ ও পর্ব্বত পা... সরচাচর গমনাগমন বশতঃ বোধ হয় লুসাই জাতি দীর্ঘজী... নয়। স্থানীয় স্বাস্থ্যোৎকৃষ্টতা বয়োধিক্যে বিবাহ প্রভৃ... ইহাদিগের বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় হইবার প্রধান কা... অনুমেয়।

লুসাই নামের অর্থ কি? অনেকে অনেক সিদ্ধা... করিয়াছেন। লুসাই ভাষায় লু=মাথা, সাই (সাত)=

লুসাই মাথা কাটা

কাটা অর্থাৎ মাথা কাটিয়া লইত বলি... লুসাই নাম হইয়াছে। এই প্রকা... 'লুসাই'—'লুচাই', 'লুসেই,' প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাখ...

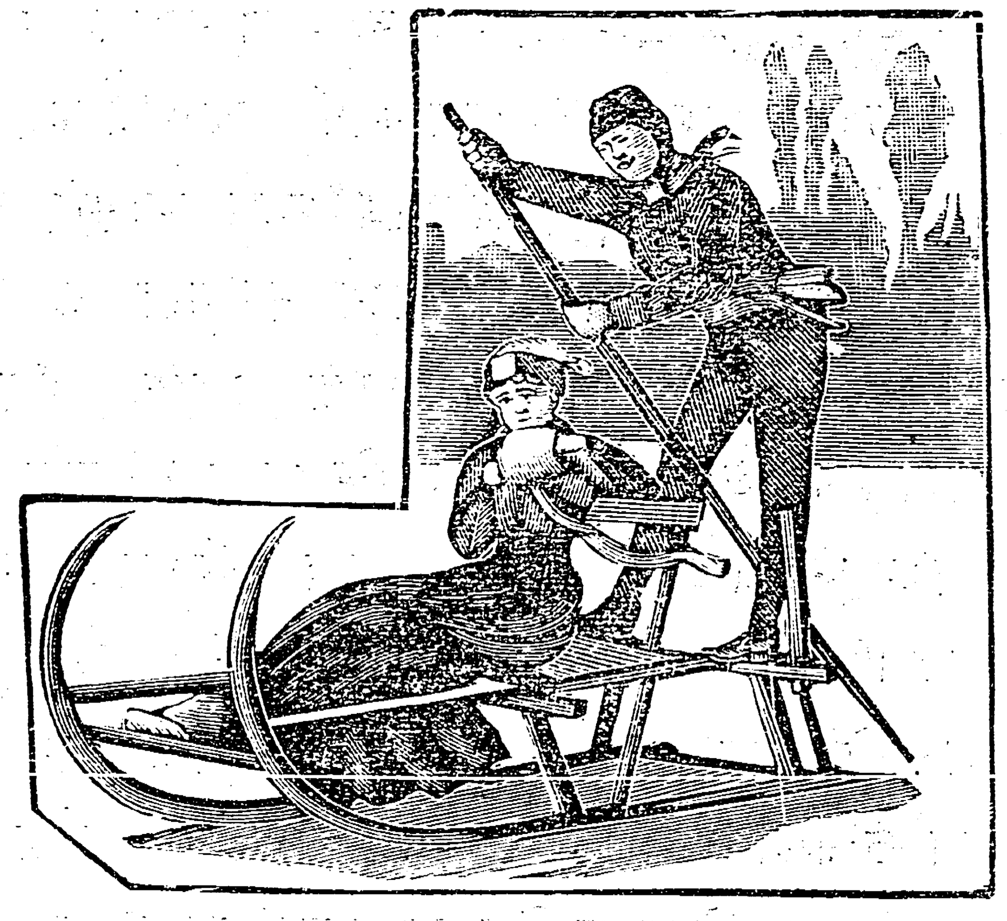

(কোট পেণ্ট্‌লেন পরিহিত পুরুষ ও বিবী বেশীনী লুসাই কুমারী।

করিয়া সকলে স্ব স্ব মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছে... সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বিচার না করিয়া পাঠকবর্গে... উপর সে ভার প্রদান করিয়া অদ্য এই খানে ক্ষা... হইলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ।

কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায়।*

কবির জীবন দুঃখের জীবন—এ কথা এক রকম সর্ব্ববাদী সম্মত। আমাদের অদ্যকার প্রবন্ধের আলোচ্য কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনীও সেইরূপ দুঃখ-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। দুঃখের সহিত কবিতার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিরূপে হয়, আর কবিতাই বা সেই চিরসঙ্গী দুঃখকে কিরূপে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লয়—আমি অদ্যকার এই প্রবন্ধে কেবল তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। চেষ্টা করিব—বলিলাম, কেন না—এরূপ বিদ্বজ্জনসমাজে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা এরূপ সামান্য প্রতিজ্ঞার পূরণ হওয়াও আমি তত সহজ মনে করি না। তবে আমাদের হতভাগ্য কবিবরের ন্যায়, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন কবি এত আশৈশব ও আমরণ দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই—ইহাই আমার এক মাত্র ভরসা। আর এক কথা—রাজকৃষ্ণের দুঃখময় জীবনের অধিকাংশ সময় এ প্রবন্ধলেখকের সহিত একত্রে কাটিয়াছে, আর সেই কারণেই বোধ হয়, বান্ধব-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ আমার অযোগ্যস্কন্ধে এই গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন। বাস্তবিক আমি কবিবরের জীবনীর এত দুঃখকাহিনী জানি, যে এই অপরাহ্ণে প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ করিয়াও, সমস্ত রাত্রি আপনাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে পারি। তবে আপনাদিগের সে ভয় নাই। যে রাজকৃষ্ণ এই হতভাগ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিদিন শত সহস্র নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার দুঃখময় জীবনীর অসংখ্য দুঃখ কাহিনীর মধ্যে দুই একটি বর্ণন করিয়া বৎসরান্তে এক দিন সেই হতভাগ্য কবিবরের শোকে আপনাদিগের দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল বিমোচনের সাহায্যকারী হইতে পারিলেই আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি।

এক সময়ে যোড়াশাঁকো-পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের একটি সামান্য খোলার ঘরে একটি মাতৃহীন বালক প্রতিপালিত হইয়াছিল। এ পৃথিবীতে বালকের এক দরিদ্র পিতা মাত্র ভরসা। অষ্টম বৎসরের বালক স্থানীয় পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিয়া আসিত, আর বালকের পিতা নিকটবর্ত্তী কোন ধনাঢ্যের গৃহে সামান্য চাকুরী করিত। এইরূপে কিছুদিন যায়, হঠাৎ একদিন বিসূচিকা রোগে সেই বালকের পিতার মৃত্যু হইল। বালক চারিদিক অন্ধকার দেখিল। শেষে এক মাতৃস্বসা আসিয়া বালকের সহায় হইল, নিরাশ্রয় বালক তখন আবার আশ্রয় পাইল। পিতার যৎকিঞ্চিৎ ছিল, তাহার উপর মাতৃস্বসার গুরুতর দৈহিক পরিশ্রমজাত কিছু কিছু উপার্জ্জনে, এই পিতৃ-মাতৃহীন বালক প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতে লাগিল। তখন কে জানিত যে ভবিষ্যতে এই দরিদ্র বালকই প্রহ্লাদ চরিত্র, নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি ৩০ খানি নাটক ও লয়লা-মজনু চতুরালী প্রভৃতি ৮ খানি গীতিনাট্য এবং অসংখ্য কবিতা ও গানের রচয়িতা কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় হইবে? কে জানিত যে এই অজ্ঞাত দরিদ্র বালকের লেখনী হইতে কত কাব্য—কত উপন্যাস ও কত প্রহসন প্রসূত হইবে! কে জানিত যে ভবিষ্যতে এই পিতৃ-মাতৃ ও জ্ঞাতিকুটুম্বহীন দরিদ্র বালকই একদিন আপনার অমানুষিক কবিত্বশক্তি প্রভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় দুই খানি প্রকাণ্ড মহাকাব্যের পদ্যানুবাদে সক্ষম হইবে?

সন ১৮৮১ সালে কবিবরের "স্তবমালা" নামক প্রথম কবিতা পুস্তিকা বাহির হয়, তাহার পূর্ব্বে কেবল "এডুকেশন গেজেটে" তাঁহার কয়েকটি কবিতা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন কবিবরের বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর হইবে। তবেই দেখুন—দারিদ্র্যের ক্রোড়ে পালিত বালক প্রথমেই কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাতৃভাষানুরাগী যুবক মাত্রেই প্রথমে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন সত্য, কিন্তু আমাদের কবিবরের ন্যায় তাঁহারা এরূপ ধারাবাহিকরূপে কবিতা পুস্তক প্রসব করিতে পারেন না। তাহার পর-বৎসরেই কবির "নাট্যসম্ভব" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা প্রকাশিত হয়। কবি যে শক্তি প্রভাবে ৩০ খানি নাটক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র উপরূপক নাটিকাতে আমরা সেই শক্তির অঙ্কুর দেখিতে পাই। তখনই বুঝিলাম—কবি কবিতা ও নাটক লইয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিবেন। সেই বৎসরেই আবার তিনি "পতিব্রতা" নাম্নী একখানি গীতিনাট্য আর এদেশে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌সরূপে আগমন উপলক্ষে

* সাহিত্য পরিষৎ গৃহে বান্ধব সমিতির অনুষ্ঠিত কবিবরের স্মৃতি সভায় পঠিত।

"ভারতে যুবরাজ" নামক কবিতা পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু কবির এই সকল প্রথম উদ্যমে লোকের চিত্ত ততদূর আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই, শেষে তাহার পর বৎসরেই (সন ১২৮৩ সালে) যখন তাঁহার "অবসর সরোজিনী" প্রকাশিত হইল, তখন কাব্যজগতে এই নূতন উদীয়মান কবির কবিত্ব শক্তির প্রভা দেখিয়া সকলেই চমকিত হইলেন। ঠিক এই সময়েই কবিবরের সহিত এই প্রবন্ধ লেখকের প্রথম আলাপ হয়। নিতান্ত ব্যক্তিগত হইলেও কিরূপে সে আলাপ হইল—আমি এস্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কলিকাতার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, তাঁহার সাধের বীণা থিয়েটারের পার্শ্বে, যেখানে কবির ছাপাখানা ছিল, এই সময় সেখানে এলবার্ট প্রেস নামে অপর এক ব্যক্তির এক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। একদিন সেই ছাপাখানায় কোন কারণ বশতঃ তাহার মালিকের অপেক্ষায় ২।৩ ঘণ্টা কাল আমায় অপেক্ষা করিতে হয়। ঘটনাক্রমে রাশিকৃত "অবসর-সরোজিনী" পুস্তক এক টেবিলের উপর দেখিয়া, আমি তাহার একখানি টানিয়া লই এবং ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার পাঠ সমাপন করি। তখন এই উদীয়মান কবির কবিত্বগুণে আমি মোহিত হইয়া গিয়া সেই দিনই সেই স্থলে উপযাচক ভাবে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। সেই হইতেই রাজকৃষ্ণ আমার চক্ষে কেবল কবিবর নহেন, আমার বন্ধুবরও বটেন। এই অবসর সরোজিনীর প্রকাশ করিয়াই রাজকৃষ্ণ কবিসমাজে যশস্বী হইলেন। কবি কেমন ধীরে ধীরে আপনার গন্তব্যপথে চলিয়াছেন দেখিলেন?

আমি প্রথমেই বলিয়াছি—দুঃখের সহিত কবিতার বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমার মনে হয়, দুঃখের পেষণে হৃদয় চূর্ণ হইয়া বড়ই কোমল হইয়া যায়, আর সেই কোমল হৃদয়েই সাহিত্যের অন্য ফসল অপেক্ষা কবিতার আবাদটাই খুব ভাল হইয়া থাকে। আবার মনে হয়—দুঃখই যেন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আপনার ক্ষত বক্ষের প্রলেপ স্বরূপ কবিতাকে সেই বক্ষে টানিয়া লয়। কবিবর রাজকৃষ্ণ প্রথমে আর কোন কার্য্যই না করিয়া—কেবল যে কবিতারই চর্চ্চা করিয়াছিলেন—ইহা আপনাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করাই আমার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।

অবসর সরোজিনীর পর একে একে কবির "নিশীথ চিন্তা" "নিভৃত নিবাস," "ভারত গান," "অবসর সরোজিনী, ২য় ভাগ" প্রভৃতি ৪।৫ খানি কবিতা পুস্তক দুই বৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কবিও তখন আশাতীত যশস্বী হন।

কিন্তু কেবল যশ লইয়া কি হইবে? সে যশে দরিদ্র কবির দুঃখ ত ঘুচিবে না। কবি দেখিলেন—এদেশে কবিতার বড় আদর নাই—অর্থাৎ কবিতা পুস্তক বড় বিকায় না, তাহা অপেক্ষা উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতিই বরং অধিক বিক্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং দারিদ্র যন্ত্রণায় হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য কবি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন ১২৮৬ সালে কবির হিরণ্ময়ী উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হইল। দুঃখের তাড়নে কবি আপনার গন্তব্যপথ কেমন ছাড়িয়া চলিয়াছেন—দেখিতেছেন?

প্রথমে কবির সহিত আমার যখন পরিচয় হয়, তখন কবি চোরবাগানের এক বাসাড়ে বাড়ীর নিম্নতলের একটি ক্ষুদ্র কুঠুরীতে বাস করিতেন। কর্ম্মের মধ্যে আলবার্ট প্রেসের ম্যানেজারী, আর তাহাতেই যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতেন, অতি কষ্টে আপনার বাসা খরচ ও ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। সন্ধ্যার সময় মধ্যে মধ্যে আমি সেই বাসায় গিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতাম, আর তিনি তাঁহার স্বরচিত কবিতা ও গান আমায় শুনাইতেন, কখন বা সেই স্বরচিত গান আবার সেতারে আলাপ করিয়া তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যাপটুতা দেখাইতেন, আর আমি মুগ্ধের ন্যায় সেই আলাপে একবারে তন্ময় হইয়া গিয়া কবির মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম। প্রথমে এইরূপ সামান্য অবস্থায় থাকিয়া পরে কবির যশসৌরভ এরূপ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, যে রাজকৃষ্ণের ন্যায় আত্মীয়স্বজন ও গৃহসংসারবিহীন দরিদ্র কবিরও বিবাহের কন্যা জুটিল। গঙ্গার অপর পারে সাল্‌কীয়া গ্রামে স্বজাতীয় এক কন্যা বিবাহ করিয়া কবিও শেষে সংসারী হইয়াছিলেন।

এদিকে কবির দারিদ্র যন্ত্রণার দিন দিন হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, কবির সহৃদয় গ্রন্থ-প্রকাশক আমাদের বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কবির জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। অনেক চিন্তার পর, তিনি অর্থাগমের যে উপায়

স্থির করিলেন—তাহা কবির গ্রন্থাবলী ১ম ভাগের বিজ্ঞাপনেই প্রকাশিত হইয়াছে। সে বিজ্ঞাপনের কতক অংশ আমি এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"বহুদিন হইতে পুস্তকের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকায়, আমার বিশ্বাস আছে যে মূল্যাধিক্যপ্রযুক্তই আমাদের দেশে কোন পুস্তকই অধিক বিক্রয় হয় না। সেই বিশ্বাসেই আমি রাজকৃষ্ণ বাবুকে তাঁহার গ্রন্থাবলী অল্প মূল্যে প্রকাশ করিবার কথা বলি। তাহাতে তিনি সম্মত হইলে আমি এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। বলা বাহুল্য যে এই উদ্যমে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজন করা হইয়াছে।"

ইহাই কবির সুলভমূল্যে গ্রন্থাবলী প্রকাশের সূত্রপাৎ। আজকাল অনেক কবির গ্রন্থাবলী যে সুলভ মূল্যে প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে পূজনীয় গুরুদাস বাবুই কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীতে তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা গুরুদাস বাবুর ন্যায় একজন বিচক্ষণ পুস্তকব্যবসায়ীর মস্তিষ্কসম্ভূত বলা যাইতে পারে এবং বাঙ্গালা সুলভ সাহিত্য প্রচারের এই নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই তিনি ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

প্রথম সংস্করণের পর, দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলী এক কালীন দুই সহস্র কাপি মুদ্রিত হয়, কিন্তু সে দুই সহস্র কাপিই অল্পদিবসের মধ্যে একবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়—এমন কি বঙ্গবাসী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে গুরুদাস বাবুকে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিতে হয় যে "আর কেহ মূল্য পাঠাইবেন না, গ্রন্থাবলী নাই।" এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ধীরে ধীরে কবির আর্থিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা এই সময় তিনি অর্থের মুখ দেখিতে পান। প্রেসের কাজকর্ম্মও এই সময় তাঁহার ভালরূপ চলিতে থাকে। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত, ও ডাক্তার আর, জি, কর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের পুস্তক তাঁহার প্রেসে ছাপা হইতে থাকে। কবির দুঃখময় জীবনে এই সময় কেবল সুখের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশই যেন কবির অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার জীবিতকালে এই গ্রন্থাবলীর পঞ্চম সংস্করণ পর্য্যন্ত ছাপা হয়, তাঁহার মৃত্যুর পর, বিগত ৮।৯ বৎসরে কেবল আর এক সংস্করণ মাত্র ছাপা হইয়াছে। গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগের পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার সাতভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। কিন্তু কি জানি কেন—প্রথম ভাগের ন্যায় তাহাদের সেরূপ আদর হয় নাই। আপনারা শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে এই সাতভাগ গ্রন্থাবলীতে তিনি ছোট বড় ৯৪ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি আরো কত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কবিতা ব্যতীত তিনি কেন যে অন্য শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিতে ধাবিত হইতেন, তাহার রহস্য কথা আমি জানি। কবি আপনার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া কেন যে অন্য পথে যাইতেন, সে কথা আমি আজ অপনাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিব। এক সময় আমিই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"রাজকৃষ্ণ বাবু, আপনি কবিতা ছাড়িয়া উপন্যাস ধরুন। যখন আমাদের মতন লেখকের উপন্যাস বিক্রয় হইতেছে, তখন আপনার উপন্যাসও না বিকাইবে কেন?" রাজকৃষ্ণ বাবু অমনি "কিরন্ময়ী", "জ্যোতির্ম্ময়ী" "অদ্ভুত ডাকাত" প্রভৃতি ৪।৫ খানি উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সুহৃদ নবকৃষ্ণ বাবু একদিন কহিলেন—"কবিবর, আপনি নাটক, উপন্যাস ছাড়িয়া স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করুন।" আমাদের দরিদ্র কবি কেবল অর্থ উপার্জ্জনের আশায় অমনি "কবিতা কৌমুদী," "সরল কবিতা" "শিশু কবিতা" প্রভৃতি ৩৪ খানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়া বসিলেন। দুর্গাদাস ভায়া একদিন কহিলেন—"ভারতে রুষ আসিতেছে, এই সময় রুষের ইতিহাস লিখিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইতে পারে।" তৎপর দিবসেই রাজকৃষ্ণ বাবু "রুষের ইতিহাস" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন ভাল পুস্তক নাই দেখিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেবের সাহায্যে "ভারত কোষ" নামক এক বৃহৎ অভিধান গ্রন্থ সংগ্রহ ও সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে "ভারত কোষ"ও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন। বাস্তবিক বোধ হয়, কেবল পুস্তক রচনার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তা কে জানে কাব্য—কে জানে উপন্যাস—কে জানে প্রত্নতত্ত্ব—আর কে জানে

ইতিহাস! তাঁহার সর্ব্বগ্রাসিনী প্রতিভা যে কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহে। আমি জানি তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া লিখিতে বসিতেন, আর বেলা ১০টা কোন দিন ১১টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত লিখিতেন, সে লেখায় তাঁহার পরিশ্রম হইত, বলিয়াত বোধ হইত না—কেন না আমার স্মরণ হইতেছে, রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রেসে গিয়া আমি একদিন শুনিলাম, আজ ৪।৫ দিন তাঁহার জর হইয়াছে, তিনি প্রেসে আসেন নাই। কিন্তু বাসায় গিয়া দেখিলাম—তিনি সেই জ্বর গায়েই রামায়ণের পদ্যানুবাদে ব্যস্ত। নিবারণ করিলে বলিতেন—ইহাতে আর পরিশ্রম কি?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এক সময়ে গ্রন্থাবলীর ও প্রেসের আয়ে তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হয়। সে সময় তাঁহার বীণা প্রেসে দুই তিনটা প্রেস দিবারাত্র চলিত, এবং কম্পোজিটার ও প্রেসম্যানে প্রায় ২৫।৩০ জন লোক খাটিত। এইরূপ স্বচ্ছল অবস্থায় তিনি ৩।৪ বৎসর মাত্র কাটাইতে পারিয়াছিলেন। এই সময় সন ১২৯২ সালের ২৮শে আশ্বিন তারিখে "বঙ্গ রঙ্গভূমিতে" তাঁহার প্রহ্লাদচরিত্র নাটকের প্রথম অভিনয় আরম্ভ হয়। এই সর্ব্বজনপ্রিয় নাটক খানির রচনা কবি ৫।৬ দিনে সম্পূর্ণ করেন। উক্ত নাটকের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—"এক প্রহ্লাদচরিত্র নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শক সংখ্যা হইয়াছে,এবং উক্ত থিয়েটার কোম্পানি প্রায় ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।" রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের সহিত কবির এই বন্দোবস্ত ছিল যে কোন অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা করিয়া দিলে প্রথম দশটি অভিনয় রাত্রে যত টাকার টিকিট বিক্রয় হইবে, তিনি তাহার শতকরা ১০ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের প্রথম কয়েক অভিনয় রাত্রে ভালরূপ টিকিট বিক্রয় হয় নাই, সুতরাং এই নাটক রচনা করিয়া কবি বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। আবার উক্ত রঙ্গভূমিতে প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইবার পর হইতে ৩।৪ মাস কাল রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ কবির নিকট হইতে আর কোন নূতন নাটক গ্রহণ করিলেন না, ইহাতে কবির পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি হইতে লাগিল। আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন যে বঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনেতাগণ বেতন পান না,অংশ পান। রাজকৃষ্ণ বাবু এই সময় অধ্যক্ষগণের নিকট কমিশনের পরিবর্ত্তে একটি প্রথম শ্রেণীর অংশ চাহিলেন। তখন প্রথম শ্রেণীর অংশের মূল্য মাসিক শতাধিক টাকা; সুতরাং অধ্যক্ষগণ সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহাদের উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন, এবং নিজে থিয়েটার করিবার একটা বলবতী ইচ্ছা এই সময় তাঁহার মাথার মধ্যে প্রবেশ করিল। পেসাদারী থিয়েটারে অভিনেত্রী থাকায় অনেক সময় অনেক গোলযোগ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন,সেই কারণ অভিনেত্রীর অংশ পার্শী থিয়েটারের ন্যায় বালকের দ্বারা চালাইবার মৎলব স্থির করিলেন। একবার ভাবিলেন না যে, একটি থিয়াটার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অভিনয় চালাইতে হইলে কত অর্থের আবশ্যক—একবার ভাবিলেন না যে কেবল নাটক লিখিবার ক্ষমতা থাকিলেই থিয়েটার চালান যায় না। এইবার আপনারা দেখুন—কবি ইচ্ছা করিয়া দুঃখকে কেমন ধীরে ধীরে আপন ক্রোড়ে টানিয়া আনিতেছেন।

আমাদের কবি যেন বীণা ছাড়া একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না। তিনি বীণা প্রেসের স্বত্বাধিকারী, বীণা কাগজের সম্পাদক,এইবার আবার যে নূতন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহারও নামকরণ করিলেন—"বীণা থিয়েটার"। এই বীণা থিয়েটারই শেষে তাঁহার কালস্বরূপ হইল। থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার কথা শুনিলেন না। শেষে আমাকেই আবার সেই থিয়েটারের অবৈতনিক ম্যানাজারের কার্য্য করিতে হয়। থিয়েটার চালান একটি রাজ্য চালান অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য বলিয়া মনে হয়, এমন ঝকমারীর কার্য্য এ সংসারে আর কিছু আছে বলিয়া আমারত বিশ্বাস হয় না।

এই বীণা থিয়েটারের ঋণজালে তিনি বড়ই জড়িত হইয়া পড়েন। স্ত্রী ও পুত্রের যে কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা সমস্তই বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। থিয়েটারের গৃহ ত অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বন্ধক পড়িয়া যায়। শেষে ছাপাখানাও বন্ধক পড়ে। তথাপি ঋণের কিছুই কিনারা করিতে পারেন নাই। এমন কি ঋণের জালায় কাগজ ছাপাইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী হন,কিন্তু তাহাতেও কোন ফললাভ করেন নাই। এই সময় উত্তমর্ণের যে

সকল অত্যাচার তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন, তাহা মানুষের সাধ্য নহে। শেষে বিরক্ত হইয়া তিনি থিয়েটার গৃহ ও ছাপাখানা বেচিয়া বড় বড় মহাজনদের দেনা কোন রকমে পরিশোধ করিলেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের পর্য্যন্ত বড় কষ্ট আরম্ভ হইল—এমন কি এক এক দিন সপরিবারে তাঁহাকে উপবাসীও থাকিতে হইয়াছিল।

দুঃখের সীমা নাই—দেনার অন্ত নাই—কাল কি খাইবেন, এমন কোন সংস্থান নাই—এইরূপ সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়া আমাদের কবিবর যখন হাবুডুবু খাইতেছেন, নানারূপ দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় কবির স্বাস্থ্য ও মন একবারে যখন ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে—অর্শরোগ ও দারিদ্র্য যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য কবি যখন আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত, রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে রোগ শয্যায় পড়িয়া কবি যখন নিয়তই কাতরকণ্ঠে ডাকিতেন—"ভগবান, আমার অদৃষ্টে কি মৃত্যু নাই?" এমন সময় স্বয়ং ভগবানই যেন ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষরূপে আমাদের কবিকে দর্শন দিলেন—নিরাশ্রয় কবি ষ্টার থিয়েটারে আশ্রয় পাইলেন। যে কবি নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও কোন বিশেষ সাহায্য পান নাই—যিনি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে সাধারণের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়াও সম্পূর্ণ বিফলমনোরথ হন, সেই কবির দুঃখের কাহিনী শুনিয়া ষ্টার থিয়েটারের প্রধান অধ্যক্ষ আমাদের অদ্যকার সভার সভাপতি তাঁহাকে মাথায় করিয়া আপন থিয়েটারে আনিলেন। তাঁহার অর্থকষ্ট দূর করিলেন—তাঁহার রোগের চিকিৎসা ও সুশ্রূষারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নিরাশ্রয় রুগ্ন কবি শেষ দশায় এই আশ্রয়ে থাকিয়া অনেকটা সুস্থ হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময় তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"যদি গুরুদাস বাবু ও ষ্টার থিয়েটার না থাকিত, তবে আমার দশা কি হইত?" বাস্তবিক আমাদের পরমভক্তিভাজন শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদাস বাবু আজ পর্য্যন্ত মৃত-কবির বিধবাপত্নী ও নাবালকপুত্রের সংসার খরচ যোগাইতেছেন এবং ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষগণও কবির মৃত্যু হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন। ইহার জন্য তাঁহারা সাধারণের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ বলিয়া আমি মনে করি।

এই ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া কবি রুগ্নশয্যায় পড়িয়াও "নরমেধযজ্ঞ", "লয়লামজনু", "ঋষ্যশৃঙ্গ", "বনবীর", "বনজীর বদরেমনির" এই পাঁচ খানি নাটক ও গীতিনাট্য রচনা করেন, এবং তাহাদের অভিনয়েও বিশেষ সুখ্যাতি হয়। "নরমেধযজ্ঞের" কুশীদজীবী মণিদত্তের চরিত্র কবির হাড়ে হাড়ে গাঁথা ছিল। নাটকেও সেই চরিত্র বড় উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। আমরা জানি—এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া তাঁহার জনৈক ভয়ঙ্কর সুদখোর মহাজন তাঁহাকে সমস্ত সুদ রেহাই দিয়াছিলেন।

সাংসারিক লোকের ন্যায় কবির সংসার অভিজ্ঞতা থাকে না। কবির বিষয় বুদ্ধিও বড় দেখিতে পাওয়া যায় না—সেই কারণেই আমাদের মনে হয়—কবি মাত্রেই যেন দুঃখকে চিরসঙ্গী না করিয়া থাকিতে পারেন না। ফল কথা প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়—দুঃখী না হইলে প্রায়ই কবি হয় না—আবার কবি হইলেই যেন কোথা হইতে দুঃখকে টানিয়া আনে। আমাদের কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনীতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

এইবার আমরা কবির দুইটি কীর্ত্তিস্তম্ভের উল্লেখ করিয়া আমাদের এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিবরের প্রথম কীর্ত্তি—রামায়ণ, দ্বিতীয় কীর্ত্তি—মহাভারত। কবি যদি আর কোন গ্রন্থ না লিখিয়া কেবল এই দুইখানি রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি অমরত্বলাভ করিতেন। ভবিষ্যতে তাঁহার আর সমস্ত গ্রন্থ আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি—কিন্তু তাঁহার রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। এই মহাগ্রন্থের মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া কবিবর বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত পদ্যে রচিত হইলেও তাহা মূল সংস্কৃতের অনুবাদ নহে। এমন কি—তাঁহাদের উভয়েই নাকি সংস্কৃত আদৌ জানিতেন না। কথকের কথকতা শুনিয়াই নাকি তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। মূলের সহিত অনেক স্থলেই উভয় গ্রন্থের অনৈক্য দেখা যায়। কোথাও মূলের অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, কোথাও বা মূল অপেক্ষা অনেক পরিবর্দ্ধিত দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ দুই গ্রন্থকে কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতই বলা যাইতে পারে। আমাদের কবি মূল সংস্কৃত বজায় রাখিয়া এই

দুই গ্রন্থের পদ্যানুবাদে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কি মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা আমি বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর কেবল কি পদ্যানুবাদ? এই দুই গ্রন্থের যে সকল টীকা তিনি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্য, অমানুষিক অধ্যবসায় ও গুরুতর পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত সাধারণ লোকশিক্ষার জন্যই রচিত হয়, আমাদের কবিও সেই জন্য এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় ইহাদের অনুবাদে কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, সে অনুবাদ সাধারণের বোধগম্য হইবে। এমন কি স্ত্রীলোকগণের বুঝিতেও কোনরূপ কষ্ট হইবে না। সুতরাং সাধারণ লোকশিক্ষার্থে কবি আমাদিগকে যে দুই অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে শোভাবর্দ্ধন করিবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা দুই ছত্র কবিতা লিখিতে গিয়া এক গা ঘামিয়া পড়ি। আর আমাদের কবিবর কিরূপে অবলীলাক্রমে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন আমি এই স্থলে তাহার সেই আশ্চর্য্য কবিতা রচনা-ক্ষমতার কিছু পরিচয় দিব। তাঁহার রামায়ণ ছাপা চলিতেছে, শ্রীমান দুর্গাদাস লাহিড়ী, বাবু শরচ্চন্দ্র দেব ও আমি সে দিন তখন তাঁহার ছাপাখানায় বসিয়া আছি। কথায় কথায় দ্রুত কবিতা রচনার কথা উঠিল। রাজকৃষ্ণ বাবু আমাদিগের তিন জনকে কাগজ ও কলম লইতে বলিলেন। আর তিনি রামায়ণের তিনটী বিভিন্ন সর্গ ধরিয়া আমাদের তিন জনকে একে একে মনে মনে পদ্যে অনুবাদ করিয়া মুখে মুখে কবিতা বলিতে লাগিলেন। আর আমরা তিনজনে অতি দ্রুত লিখিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম। মনে রাখিবেন—মুল রামায়ণের তিনটি বিভিন্ন স্থল হইতে তিনি একই সময়ে পদ্যে অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন, আর আমরা তিন জনে তাহা লিখিয়া শেষ করিতে কষ্ট পাইতেছি! ইহা অপেক্ষা দ্রুত কবিতা রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

এদেশে কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। তখন চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দই কেবল বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ছিল। বঙ্গ রঙ্গভূমিতে যখন মাইকেলের মেঘনাদ বধের অভিনয় প্রথম আরম্ভ হইল, তখন দেখা গেল যে সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভাঙ্গিয়া একটা আভিনয়িক ছন্দ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তাহাতে আর চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হয় না, অথচ সে ছন্দ অভিনয়ের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী হয়। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কবি গিরিশচন্দ্রই প্রথমে বাঙ্গালার নাটকে এই ছন্দের অবতারণা করেন। কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় কিন্তু তাঁহার হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তিনিই প্রথমে অভিনয়োপযোগী নাটকে এই ছন্দের পক্ষপাতী হন, এবং গিরীশ বাবুর ঐ ছন্দের নাটক বাহির হইবার পূর্ব্বে সন ১৮৮ সালে "নিভৃত নিবাস" নামক তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থে এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনিই প্রথম নমুনা দেখান।

আমি কবির অসংখ্য গ্রন্থ ও কবিতা রচনার কতক আভাস মাত্র আপনাদিগকে দিয়াছি, এবং তাঁহার সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াও আপনারা অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্বের সম্বন্ধে এখনও কোন কথা বলা হয় নাই। উপসংহার কালে সে কথা না বলিয়াও আমি থাকিতে পারিতেছি না। রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় সরল, সহৃদয়, সত্যানুরাগী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। এমন সরল মন—যে, যে যাহা বলিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই বিশ্বাস করিতেন। কাহার প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস ছিল না। ইহার জন্য হয়ত কতবার তাঁহাকে প্রতারিত হইতে হইয়াছে, তথাপি তাঁহার সে মনের পরিবর্ত্তন আমরা কখন দেখি নাই। তিনি নিজে আশৈশব দরিদ্র ছিলেন বলিয়া দরিদ্রের দুঃখ বুঝিতেন। কাহার দুঃখের কাহিনী শুনিলে তিনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেন। একদিনের একটি ঘটনার কথা বলি শুনুন। তখন তাঁহার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। প্রেসের লোকজনের অনেক মাহিনা বাকি পড়িয়া গিয়াছে। গুরদাস বাবুর নিকট হইতে কিছু টাকা হাওলাৎ করিয়া সেদিন সকলকে কিছু কিছু মাহিনা দেওয়া হইল। একটি মাত্র টাকা নিজের সংসার খরচের জন্য রাখিলেন। সে দিনকার চাউল, কয়লা, বাজার ইত্যাদি সমস্তই সেই টাকাটির উপর নির্ভর করিতেছে। এমন সময় তাঁহার দপ্তরী আসিয়া কহিল —"বাবু দেশে আমার স্ত্রীর ভয়ঙ্কর পীড়ার সংবাদ পাইয়াছি, রাহাখরচ অভাবে দেশে যাইতে পারিতেছি না। রাজকৃষ্ণ বাবু সে কথা শুনিয়া সেই অবশিষ্ট টাকাটি তৎক্ষণাৎ সেই

দপ্তরীকে দিলেন" এবং মিনতি করিয়া কহিলেন—"বাপু, আমার আর এক কপর্দ্দকও নাই"। আমিত অবাক্ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি কহিলাম—"আজ আপনার সংসার খরচের কি উপায় হইবে?" কবিবর ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ভগবান্ দেন উপায় হইবে, নচেৎ সপরিবারে উপবাস করিব।" এরূপ কত শত ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাহাতে তাঁহার মনুষ্যত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা বলিতে বাকি রহিয়া গেল। আমার মনে হইতেছে যেন তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও বলা হয় নাই। সম্প্রতি সাংসারিক ও বৈষয়িক ঘটনায় আমি এরূপ বিব্রত যে সে সকল কথা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিবার আমার আদৌ অবসর নাই। তবে একটি কথা বলিব—কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় কোন্ শ্রেণীর কবি কিম্বা তাঁহার কাব্য ও নাটকাদির সমালোচনা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে এবং আমর দ্বারা তাহা সম্ভব বলিয়াও আমি মনে করি না। আমার মতে সে সময়ও এখন উপস্থিত হয় নাই। আজিকার এই শোক সভায় কবির জন্য শোক করিতে আমরা আসিয়াছি সেই কারণ আমিও কেবল তাঁহার দুঃখের কাহিনীর অবতারণা করিয়া সেই শোক উদ্রেকের চেষ্টা পাইয়াছি। আর তিনি যে কিরূপ দারিদ্র্য যন্ত্রণার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এই সকল অসংখ্য কাব্য ও নাটকাদি লিখিয়াছেন, তাহাও দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছি।

আজ যে আমরা আমাদের কবিবর ৺রাজকৃষ্ণের জন্য শোক করিতে এতগুলি সাহিত্যসেবী এই স্থলে একত্রিত হইতে পারিয়াছি—ইহাতেও আমার আনন্দ হইতেছে। এস ভাই এই সভায় সকলে মিলিয়া আমাদের মৃত কবির উদ্দেশে দুই ফোঁটা চক্ষের জল ফেলি। রাজকৃষ্ণের স্মৃতি চিহ্নের আবশ্যক নাই। তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থরাশিই তাঁহার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন হউক। আর যদি মৃত কবির প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য নিতান্তই আমাদের মন অস্থির হয়, এস ভাই তাঁহার গ্রন্থ খরিদ করিয়া তাঁহারই অনাথা বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করি।

কবিবর! তুমি বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছ। সুতরাং তুমি ধন্য। তুমি সেই অনন্তধামে গিয়া সাংসারিক সকল দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ, সুতরাং এখন তুমি ভাগ্যবান্ পুরুষ। আমরা আর তোমার সেই হাসি মুখ দেখিতে পাইব না। আর তোমার স্নেহপূর্ণ মিষ্টকথাও শুনিতে পাইব না।—কারণ এক্ষেত্রে আমরাই ভাগ্যহীন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সপত্নী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রত্নেশ্বর বাবুর নিকট অপমানজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া নরেশচন্দ্র অবনত মস্তকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ শ্বশুরগৃহে আর এক দিনও তাঁহার বাস করা উচিত নহে। অতঃপর তিনি এ স্থানে আর থাকিবেন না বলিয়া সংকল্প করিলেন। তিনি যখন চিন্তাকুল ভাবে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, তখন বাহির হইতে শব্দ হইল, "বাবা এখানে আছ কি?"

রত্নেশ্বর বাবুর পত্নী বাহির হইতে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র নরেশচন্দ্র সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন মা, বড়ই ভাল করিয়াছেন, আমি এ বাটীতে আর থাকিব না, আপনি আমাকে গর্ভধারিণীর ন্যায় স্নেহ যত্নে পালন করিতেছেন, এজন্য আপনার চরণ হইতে বিদায় লইতে আমার কষ্ট হইবে। কিন্তু মা, এ অধম সন্তান যে ভাবে যেখানেই থাকুক না কেন, চিরদিন আপনার অনুগত, আজ্ঞাধীন ও চিরকৃতজ্ঞ সন্তানরূপেই কালযাপন করিবে সন্দেহ নাই। এ বাটীতে আর কাহারও সহিত শেষ সাক্ষাৎ বা কাহারও নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের প্রয়োজন নাই। আপনার শ্রীচরণ দর্শন না করিয়া যাত্রা করিতে হইলে আমার ক্লেশের সীমা থাকিত না। আমার বড়ই সুকৃতি যে বিদায় কালে আপনার চরণকমল দর্শন করিতে পাইলাম। এ বাটীর কোন সামগ্রীই আমার নহে। আমি রিক্ত হস্তে

আপনাদের আশ্রয়ে আসিয়াছিলাম; রিক্ত হস্তে অন্য প্রস্থান করিতেছি।

নরেশ অতি বিনম্রভাবে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর চরণে প্রণাম করিলেন। গৃহিণী অধোমুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার নয়নে জল। প্রণাম সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, "বাবা তোমার সহিত হেমলতা যেরূপ মন্দ ব্যবহার করিয়াছে তাহার কথা আমি শুনিয়াছি; কর্ত্তা যেরূপ রূঢ় কথা তোমাকে বলিয়াছেন, তাহাও আমি শুনিয়াছি। কিন্তু যিনি যাহাই বুঝিয়া থাকুন, আমি বেশ জানি তুমি তোমার প্রথমা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন মন্দ কার্য্য কর নাই। সে বালিকা তোমার ধর্ম্মপত্নী; তাহার সহিত তুমি কখন আলাপ না রাখিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে। তোমার আর এক স্ত্রী আছে জানিয়াই তোমাকে আমরা কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে সে জন্য তোমার সহিত মন্দ ব্যবহার করিলে পাপ হইবে। যাহা হইয়াছে তাহা মনে করিয়া তোমার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছি না। এরূপ ব্যবহারের পর তোমার আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতে ইচ্ছা না হওয়াই উচিত। তা বাবা, আমি তোমার মা, তুমি মার অনুরোধ রক্ষা কর। অজি তুমি এস্থানে থাক, আমি একবার সকলের সঙ্গে কথা কহিয়া ভাব গতিক বুঝি; তাহার পর আমার হয়ে সকল কথা শুনিয়া তুমি যাহা হয় করিও।"

নরেশ বলিলেন,—"আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য নাই। আজি অতি কষ্টে আমি এ স্থানেই থাকিব; কিন্তু মা, কল্য আর আপনি কোন অনুরোধ করিবেন না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কল্য কি হইবে, তাহা এক্ষণে ভাবিয়া কাজ নাই। তুমি আমার অনুরোধ পালনে সক্ষম হওয়ায় আমি পরম সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার চরণে যেন কখন কুশাঙ্কুরও না বিদ্ধ হয়। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি। আবার শীঘ্র সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা জানাইব।

নরেশ অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

দিনমান একরূপে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর রত্নেশ্বর বাবু বৈঠকখানা হইতে নরেশচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নরেশ অকুণ্ঠিতচিত্তে ও অকাতরভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন। নরেশ বাবু দেখিলেন, তথায় তাঁহার শ্বশুর মহাশয় একজন বন্ধু সহ বসিয়া আছেন; আর তাঁহার পিতৃদেব একটু দূরে এক স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট। নরেশচন্দ্র প্রথমেই পিতার সমীপস্থ হইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পিতা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সকলের মুখের ভাব দেখিয়া নরেশ বুঝিলেন, পূর্ব্বে নিশ্চয়ই অনেক কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে। তিনি নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"তোমার পিতা আসিয়াছেন। তোমার হাতে যখন কন্যা দান করি, তখন তোমার পিতা ধার্য্য করিয়াছিলেন, যে তুমি তোমার প্রথমা পত্নীর সহিত জীবনে কখন সাক্ষাৎ করিবে না। এ কথা সত্য কি না, তুমি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পার।"

নরেশ বাবু বলিলেন,—"আমার পিতা যে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি।"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"তবে তুমি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অপরাধী হইলে কেন?"

নরেশ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার হাত নাই। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই নরেশ বাবাজি বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন। এবার আপনি ক্ষমা করুন, আর কখন এরূপ ঘটিবে না।"

নরেশ বলিলেন,—"বাবা, আপনার সত্য পালন করিতে যদি আমার জীবনান্ত হয়, তাহাতে আমি কদাপি পশ্চাৎপদ হইব না। প্রার্থনা করিতেছি, আপনার চরণে ধরিতেছি, আপনি এ সম্বন্ধে আর কোন সত্যে বদ্ধ হইবেন না। আমি সম্প্রতি এখানে যে সকল ব্যবহার সহ্য করিয়াছি, তাহার পর ভবিষ্যতে আমি কি করিব তাহা এখন বলিতে পারি না।"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—"তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহার মত কোন শাস্তিই তোমাকে এখনও ভোগ করিতে হয় নাই; তথাপি তুমি আমাদের ব্যবহার মন্দ বলিয়া স্থির করিয়াছ; বেশ করিয়াছ, তাহাতে আমাদের

কোনই ক্ষতি নাই। তোমার অবিবেচনায়, তোমার ঘৃণিত দোষে আমার একমাত্র তনয়ার হৃদয়ে শেল বিঁধিয়াছে। সে নিরন্তর কাঁদিয়া কাল কাটাইতেছে। তাঁহার চক্ষুতে যে হতভাগ্য জল ফেলাইয়া সুখী হয়, আমি তাহাকে অনায়াসে রসাতলে পাঠাইতে পারি। সে কথা যাউক, তোমার পিতার অনুরোধে আমি তোমাকে এবার ক্ষমা করিতে সম্মত আছি। তুমি ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা জানিতে পারিলে, আমিও তোমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করিব। অতএব বল, তোমার মনের অভিপ্রায় কি?"

নরেশ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা বলিলেন,—"অভিপ্রায় কি, কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যাহা আপনি বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে। ছেলে মানুষ না বুঝিয়া অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, আপনি পরম বিজ্ঞ; পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য।"

নরেশ বলিলেন,—"আমি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি। বাবা, আপনি সত্য করিয়াছিলেন, আপনার প্রথমা পুত্রবধূর সহিত আমি কখন সাক্ষাৎ করিব না। আমি যথাসাধ্য যত্নে এ পাঁচ বৎসর সে সত্য পালন করিয়াছি, তাঁহার সহিত সম্প্রতি আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক সাক্ষাতের কোন আয়োজন করি নাই। যাহা হইয়াছে তাহাতে যে কোন পাপ ঘটিয়াছে এরূপ আমি মনে করি না। আমি সে জন্য অনেক অপমান, তিরস্কার ও অসদ্ব্যবহার ভোগ করিয়াছি। অতঃপর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি আর কোন সত্য বন্ধন করিবেন না; আমিও সে বিষয়ে কোনই প্রতিজ্ঞা করিতে পারিব না।"

রত্নেশ্বর বাবু ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ চট্টোপাধ্যায়, তোমার পুত্রের সাহস দেখ। যে হতভাগ্য পথের ভিক্ষুক হইয়া কাল কাটাইত, যাহার অন্ন বস্ত্রের কোনই সংস্থান ছিল না, আমি দয়া করিয়া কন্যা দান না করিলে যাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না, যে এখন আমার জামাতা হইয়া সুখ ভোগ করিতেছে তাহার অহঙ্কারের কথা শুনিয়া ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে। নরাধম, তুই তোর পিতাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন প্রতিজ্ঞা করিতে নিষেধ করিতেছিস্! তুই কি পরে ইচ্ছামত ব্যবহার করিবি মনে করিয়াছিস্?"

নরেশ নীরব। পিতৃ সমক্ষে এরূপ নিষ্করুণ তিরস্কার তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করিল। তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। এ অপমান তাঁহার পিতার হৃদয়েও বড়ই গুরুতররূপে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, আপনি আমাকে বৈবাহিক বলিয়া একবারও সম্বোধন করেন নাই, আমাকে কোনরূপ সমাদরও করেন নাই। সত্য বটে আপনি রাজরাজেশ্বর, আর আমি নিতান্ত দীনহীন। কিন্তু আমি আপনার অপেক্ষা কুলে বড় এবং আমি পুত্রের পিতা। এ অবস্থায় বোধ হয়, সমাজে আমারই বেশী সম্মান হওয়া সঙ্গত। সে কথা যাউক, আমার পুত্র যে কার্য্য করিয়া আপনার বিরাগভাজন হইয়াছে, তাহা যে এককালে অকর্ত্তব্য পাপকার্য্য এ কথা কোন বিজ্ঞ লোকই বলিতে পারেন না। আপনি ও আপনার কন্যা এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আমার পুত্রের যেরূপ দুর্গতি করিতেছেন, তাহাতে তাহার মন সহজেই বিরক্ত হইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে উদ্যত হইতে পারে। বাস্তবিকই আমার পুত্র নিতান্ত দরিদ্র; কিন্তু সে লেখা পড়া শিখিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মক্ষম হইয়াছে। সে যে কোনরূপ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকাপাত করিতে পারিত না, এরূপ মনে করা অন্যায়। সত্য বটে, আপনার জামাতা হওয়ায় তাহার অনেক সৌভাগ্য হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া সে আপনার ক্রীতদাস হয় নাই এবং সকল স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বতোভাবে আপনার আজ্ঞাধীন হয় নাই। আপনার ব্যবহারে আমি অতিশয় অপমানিত ও দুঃখিত হইয়াছি।"

রত্নেশ্বর বাবু অতিশয় উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,— "তুমি অপমানিত হইয়াছ, তুমি দুঃখিত হইয়াছ! তবে তো আমার সর্ব্বনাশ হইবে দেখিতেছি। তোমার মত সামান্য লোকের আবার অপমান কি? তোমার ন্যায় ইতর লোকের পুত্রকে আমি কন্যাদান করিয়াছি, ইহাতে আমার লজ্জার সীমা নাই, তোমাকে বৈবাহিক বলিয়া ডাকিতে হইলে আমার মাথা কাটা যাইবে। তোমার ন্যায় অনেক কুলীন আমার পাকশালায় কাজ করে। যাও তুমি, এখান হইতে দূর হইয়া যাও।"

তৎক্ষণাৎ নরেশচন্দ্রের পিতা গাত্রোত্থান করিলেন। পুত্রও সঙ্গে সঙ্গে পিতার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা, বাবা! এ অধম সন্তানের জন্য আজি আপনাকে এই অপমান সহিতে হইল। যদি কখন এ অপমানের প্রতীকার করিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিব। এক্ষণে চলুন, আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।"

রত্নেশ্বর বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"তুই কোথায় যাইবি? তোর পিতা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, কিন্তু তুই আমার অমতে একবারও এ বাটীর বাহিরে যাইতে পাইবি না।"

সঙ্গে সঙ্গে রত্নেশ্বর বাবু তাঁহার বন্ধুকে বলিয়া দিলেন,—"যাও তুমি, জমাদারকে বলিয়া দেও, সে যেন আমার বিনা হুকুমে নরেশকে কখনও ফটকের বাহিরে যাইতে না দেয়। এ সম্বন্ধে সে যেন পাহারাওয়ালাদের বিশেষ সতর্ক করিয়া রাখে। আমিও তাহাকে একথা স্বয়ং বলিয়া দিব।"

বন্ধু "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে রত্নেশ্বরও কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতাসন্নিহিত বালীগ্রামের উত্তর প্রান্তে গঙ্গাতীরে ৺গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র ভবন। বাসগৃহ গোলপাতাচ্ছাদিত ও অতি জীর্ণদশাগ্রস্ত। দুই খানি মাত্র ঘর; অপেক্ষাকৃত বৃহৎখানিতে ভবনবাসীরা শয়ন করেন, অপর খানিতে পাক হয়। অঙ্গন অতি ক্ষুদ্র; চারিদিকে বৃক্ষলতাদি রচিত বেড়া। গোবর্দ্ধন বড়ই দুঃখী লোক ছিলেন। অতি কষ্টে কথঞ্চিৎরূপে শাকান্ন ভোজন করিয়া ও সামান্য মাত্র বস্ত্রে দেহ আচ্ছন্ন করিয়া তিনি ও তাঁহার পরিবারগণ জীবন যাপন করিতেন। গোবর্দ্ধন, তাঁহার পত্নী ও এক মাত্র কন্যা ব্যতীত সংসারে আর লোক ছিল না। স্বচ্ছন্দ ভাবে এই তিন ব্যক্তির জীবন নির্ব্বাহ করার সামর্থ্যও গোবর্দ্ধনের ছিল না। এই অবস্থায় যাহা হউক করিয়া দিন কাটিতেছিল; তিন বৎসর হইল গোবর্দ্ধনের স্বর্গলাভ হইয়াছে। তাহার পর হইতে তাঁহার বিধবা পত্নী ও পিতৃহীনা কন্যার কষ্টের সীমা নাই। একবেলা অন্নও জুটে না, ছিন্ন বস্ত্রও আর মিলে না, দিন আর কাটে না।

কন্যা কুমুদিনীর বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। তিনি কৃষ্ণকায়া; সুতরাং তাঁহাকে সুন্দরী বলিতে অধিকার আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু যিনি বিশ্বের সকল শোভা[illegible] আধার সেই ভগবানই নবজলধররুচি শ্যামসুন্দর; যি[illegible] ভুবনবিজয়ী পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণস্বরূপা তিনিও অযোনি[illegible] সম্ভবা কৃষ্ণা; আর যিনি সকল শক্তির মূল, দেবগণের[illegible] রক্ষয়িত্রী সেই পরমা প্রকৃতি ভগবতীও শ্যামা; এবং যি[illegible] সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণ পুরুষ সেই ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্রও ন[illegible] দূর্ব্বাদলকান্তি। অধুনা গৌরের প্রতি আমাদের [illegible] আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা চিরদিনই ছিল কি না সন্দেহ[illegible] গোবর্দ্ধনের কন্যা শ্যামা হইলেও, পিতা মাতা আদর করি[illegible] দুহিতার নাম কুমুদিনী রাখিয়াছেন, কুমুদিনীর শোভ[illegible] তাঁহার বর্ণে আছে কি? না থাকিলেও "খাঁদাপুত্রের[illegible] নাম পদ্মলোচন রাখিতে পিতামাতা বিরত হন কি! কুমুদিনীর অঙ্গের গঠন এবং মুখশ্রী বড়ই রমনীয়। তাঁহা[illegible] লোচনযুগল আরও পরম শোভাময়; বোধ হয় তাঁহা[illegible] দেহের কৃষ্ণতা হেতু নয়নের শোভা আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাঁহার মুখখানি যেন বাটালিকাটা। নাসা, ওষ্ঠ ও চিবু[illegible] সকলই সুচিক্কণ ও সুঠাম।

কুমুদিনী অন্নবস্ত্রবিহীনা দুঃখিনী। সমুচিত পান[illegible] ভোজনে দেহের যে উজ্জ্বলতা হয়, তাহা তাঁহার নাই; লোচনযুগলের স্বাভাবিক আভা নাই; দেহের চর্ম্মে[illegible] যথোচিত মসৃণতা ও লাবণ্য নাই; নিবিড় কেশরাশি[illegible] সমুচিত উজ্জ্বলতা ও শোভা নাই। কুমুদিনীর বসন নাই, ভূষণ নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই।

কুমুদিনী লেখাপড়া জানেন, বঙ্গভাষার সুপাঠ্য সম[illegible] পুস্তকই তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি বিবিধ শিল্প[illegible] কর্ম্মনিপুণা। আপনি কাটছাট ঠিক করিয়া তিনি নানা প্রকার জামা প্রস্তুত করিতে পারেন; মকমলের উপর রেশমী ফুলের কাজ করিতে জানেন এবং কার্পেট বুনিতে[illegible] তাঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে। তথাপি তিনি অনাদৃতা, আনন্দবিহীনা।

কুমুদিনী যুবতী; যৌবনের এই পূর্ণোপভোগ কালে, বিলাস লালসার এই আবেগময় দিনে, ভোগবাসনার এ[illegible] আনন্দময় সময়ে কুমুদিনী বিশুষ্কা, মলিনা, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায়, শাখাভ্রষ্ট বল্লরীর ন্যায় শোভাহীনা, সজীবতা-পরিশূন্যা।

কুমুদিনী আমাদের সুপরিচিত নরেশ বাবুর প্রথমা পত্নী। পরম রূপবান্ ও সদ্বিদ্বান্ স্বামী থাকিলেও, তিনি কুমুদিনীর কেহই নহেন; কুমুদিনীর সহিত আলাপ-পরিচয়ে বা তাঁহার খোঁজ-খবর লইতে স্বামীর অধিকার নাই। সুতরাং কুমুদিনীর এই দুর্দ্দশা; তাই এই শোভার লতিকা শুকাইয়া যাইতেছে; তাই এই আনন্দ-প্রদীপ সোহাগ-তৈলাভাবে নিভিয়া যাইতেছে।

অতি কষ্টে কুমুদিনীর দিন কাটিতেছে। পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন; এই সামান্য পর্ণকুটীর ব্যতীত আর কিছুই তিনি রাখিয়া যান নাই, কাজেই তাঁহাদের অর্থ নাই, অলঙ্কার নাই, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নাই, তৈজসাদিও নাই। কন্যা বিবিধ শিল্প কর্ম্ম করেন, জননী তাহা বিক্রয় করেন, তাহাতে যৎসামান্য আয় হয়; সেই সামান্য আয়ে অতি কষ্টে মা ও মেয়ের দিন যাপন করিতে হয়। সামান্য আহারে জীবন ধারণ, সামান্য বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ ব্যতীত আর কিছুই হয় না।

বিবাহের পর বালিকাকালে কুমুদিনী দুই তিন বার স্বামীকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তিনি স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে সাহস করেন নাই, স্বামী যে কিরূপ দেবদুর্ল্লভ পদার্থ তাহা তখন ভাল করিয়া বুঝিতেও পারেন নাই এবং স্বামীর চরণে কিরূপে আত্মদান করিয়া স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহাও তিনি তখন শিখিতে পারেন নাই। তাহার পর হইতে কয়েক দিবস পূর্ব্বে সেই দেবচরণের পবিত্র ধূলি মস্তকে ধারণ করিবার অনেক সুযোগ তিনি অন্বেষণ করিতেছিলেন; সুযোগ ঘটিয়াছিল। নরেশ বাবু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; সুরেশ বাবু তাঁহার বাল্য বন্ধু; সেখানেই তিনি ছিলেন। সেই সুরেশ বাবুর সহধর্ম্মিণীর সহিত কুমুদিনীর বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। সুতরাং কুমুদিনীর দেবপূজার সদুপায় উপস্থিত হইয়াছিল। সে কি আনন্দ! সে সুখের মদিরা কুমুদিনীকে অবশ করিয়াছে; তাঁহার সকল দুঃখ জালা ভুলাইয়া দিয়াছে; তাঁহাকে নন্দনের আনন্দে মাতাইয়া দিয়াছে। তিনি আত্মহারা হইয়াছেন; সে সুখের স্মৃতি তাঁহার অবিচ্ছিন্না সহচরী হইয়াছে।

তাহার পর? তাহার পর সুখের মাত্রা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক আয়াসে যে দেবতার কুমুদিনী সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তাঁহার সেই সর্ব্বস্ব ধন একবার দেখা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আবার লোক পাঠাইয়া কুমুদিনীর সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার সংবাদ লইতে এবং তাঁহাকে সংবাদ দিতে নরেশ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া লবঙ্গ একদিন আসিয়াছিল। কেবল একদিন পাঠাইয়াই নরেশ স্থির হন নাই। আজি আবার সেই লবঙ্গ আসিবে কথা আছে।

বেলা তিনটা, শীতকাল—রৌদ্রের প্রখরতা হইলেও, মিষ্টতা যথেষ্ট। কুমুদিনী আজি স্নান করিয়াছেন। রৌদ্রে অবেণীসম্বদ্ধ কেশরাশি ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া ঘরের দাবায় কুমুদিনী কম্ফর্টার বুনিতেছেন। তাঁহার জননী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা। কুমুদিনী ভাবিতেছেন, এখনও আসিল না। আমাকে ভুলিয়া গেলেন কি? যে সকল দয়ার কথা শুনিয়াছি, যে সকল মিষ্ট ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব। ভুলেন নাই। লোক পাঠাইবার সুযোগ হয় নাই কি? লবঙ্গ বড় ভাল লোক। তাহার কথায় মধুমাখা। আমার জন্য তাহার কত চিন্তা, আমাকে সে কতই ভালবাসে। নিশ্চয়ই সে সুযোগ করিয়া আমার সহিত দেখা করিবে। আজি আসিবার কথা। অবশ্য আসিবে। এখনই আসিবে।

তাহাই ঠিক হইল, তখনই সেই কুটীর প্রাঙ্গনে হাস্যমুখী লবঙ্গলতা হেলিতে দুলিতে দেখা দিল। লবঙ্গ রিক্ত হস্তে আইসে নাই। তাহার বাম হস্তে একটী ক্ষুদ্র পুঁটুলি। লবঙ্গকে দর্শনমাত্র কুমুদিনী হাতের কাজ ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি সমাদরে তাহাকে বসিতে বলিলেন। লবঙ্গ গঙ্গার জলে হাত পা ধুইয়া আসিয়াছিল। সে স্নেহপূর্ণ সুমধুর হাসির সহিত কুমুদিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং সেই ঘরের দাবায় উঠিয়া বসিল।

কুমুদিনী বলিলেন, "দিদি, আর জন্মে তুমি আমার কে ছিলে। আপনার লোক না হইলে পরের জন্য কেহ এত কষ্ট স্বীকার করে কি?"

লবঙ্গ বলিল,—"দিদি, আর জন্মের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু এ জন্মে যে তোমাকে মার পেটের ভগ্নী ছাড়া আর কিছুই মনে করি না, তাহার আর ভুল নাই। মা কোথায়?"

কুমুদিনী বলিলেন,—"বোধ হয় রান্নাঘরের কোন কাজে আছেন। বাবুর সহিত তাঁহার এ দুঃখিনী দাসীর সম্বন্ধে এবার কি কথা হইয়াছে দিদি?"

লবঙ্গ বলিল,—"অনেক কথা হইয়াছে। নরেশবাবু তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের জন্য পাগল।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"এ দাসী তাঁহার চরণ সেবার অযোগ্যা। তথাপি যদি তিনি দাসীর সামান্য সেবায় তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পরম সৌভাগ্য। কিন্তু সত্য করিয়া বল, লবঙ্গ দিদি, তিনি আমার সেই সুন্দরী সতিনীর নিকটে গিয়া আমাকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই তো?"

লবঙ্গ বলিল,—"সত্য করিয়াই বলিতেছি, তিনি তোমাকে ভুলেন নাই। ভুলা দূরে থাকুক, তাঁহার মুখে সারাদিন কেবল তোমারই কথা, তাহাতেই তো গোল বাধিয়াছে। তিনি তোমার সেই সতিনীর কাছেও তোমার অনেক সুখ্যাতির কথা কহিয়া ফেলিয়াছেন। সে বড় রাগী, ভারী ঝগড়াটে। সে নরেশ দাদার সহিত অনবরত ঝগড়া করিয়া বড় বিব্রত করিয়াছে।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"তবে কি হইবে? এ ক্ষুদ্র সেবিকার জন্য তাঁহাকে এখন অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে।"

লবঙ্গ বলিল,—"তা হইতেছে সত্য, কিন্তু সে জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। দাদা জোর করিয়া বলিয়াছেন, 'এমন করিয়া আমাকে জ্বালাতন করিলে, আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।' কাজেই হেমলতা মনের আগুন মনেই ঢাকিয়া আছেন।"

কুমুদিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তোমার নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছিলাম তাহার কি হইল? আর একবার সাক্ষাৎ! লবঙ্গ দিদি, আর একবার সেই দেবতার চরণ দর্শন করিতে পাইলে তাঁহার দাসী প্রাণ ভরিয়া মনের কথা নিবেদন করিত।"

লবঙ্গ একটু হাসিয়া বলিল,—"তাহাও হইবে, তিনি সেজন্য খুব ব্যস্ত আছেন। তোমার লবঙ্গ দিদিকে যখন সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার ভার দিয়া তিনি নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সকলই ভাল হইবে। শীঘ্রই শুভ সংবাদ পাইবে। আজি আমি আর বেশী ক্ষণ থাকিব না। নৌকা দাঁড়াইয়া আছে। আবার শীঘ্র আসিব। যখন সকল দিকেই তোমার মঙ্গল হইবে, তখন কিন্তু দিদি, এ লবঙ্গী পোড়ারমুখীর কথা ভুলিও না।"

কুমুদিনী একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ভগবান জানেন, তোমাকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি কি না। তুমি আমার জন্য যে কষ্ট করিতেছ, তাহার পুরস্কার নাই। আমি হেমলতাকে বঞ্চিত করিতে চাহি না। তাহার হাত হইতে স্বামী কাড়িয়া লইতে চাহি না; তিনি স্বামীর বিবাহিতা ধর্ম্ম পত্নী, তিনি সুন্দরী, তিনি ধনবতী, গুণবতী। স্বামী তাহার হইয়াই স্বচ্ছন্দে থাকুন, ইহাই আমার কামনা। আমি কেবল কখন কখন, স্বামীর সুযোগ ও অবসর মতে এক একবার তাহার চরণ দর্শন করিতে চাহি। আমার এ সৌভাগ্য কি ঘটিবে লবঙ্গ দিদি?"

লবঙ্গ বলিল,—"অবশ্য ঘটিবে। সকলই ভাল হইবে। তোমার আশার অপেক্ষা অনেক বেশী ফলই তুমি পাইবে। এতক্ষণ অন্য কথায় রহিয়াছি, কাজের কথা বলা হয় নাই। তোমার জন্য এক জোড়া দেশী ধোয়া সাড়ী আর দশটী টাকা পাঠাইয়াছেন।"

পুঁটুলী খুলিয়া লবঙ্গ এক জোড়া উত্তম বস্ত্র বাহির করিল এবং অঞ্চল বস্ত্রের প্রান্ত হইতে দশটী টাকা বাহির করিল।

কুমুদিনী বলিলেন,—"স্বামীর প্রদত্ত সামগ্রী বড় আদরের ধন। আজি আমি এ জীবনে প্রথম স্বামীর অন্ন ভোজন করিব, স্বামীর বস্ত্রে দেহ ঢাকিব। আজি আমার শুভদিন।"

কুমুদিনী অঞ্চল বস্ত্রে নয়ন মার্জ্জন করিলেন। লবঙ্গ বলিল,—"তবে দিদি এখন আমি আসি। আমার আজি অনেক বরাত। আবার তিন চারি দিন পরে দেখা করিব। এবার বোধ হয় তোমাদের মিলনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতে পারিব।"

লবঙ্গ গাত্রোত্থান করিল। কুমুদিনী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"আমি কি বলিব? আমার সকল ভরসাই তোমার হাতে। দিদি, আমি যেন আশায় বঞ্চিত না হই।"

লবঙ্গ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"কোন চিন্তা নাই। সকলই ভাল হইবে।"

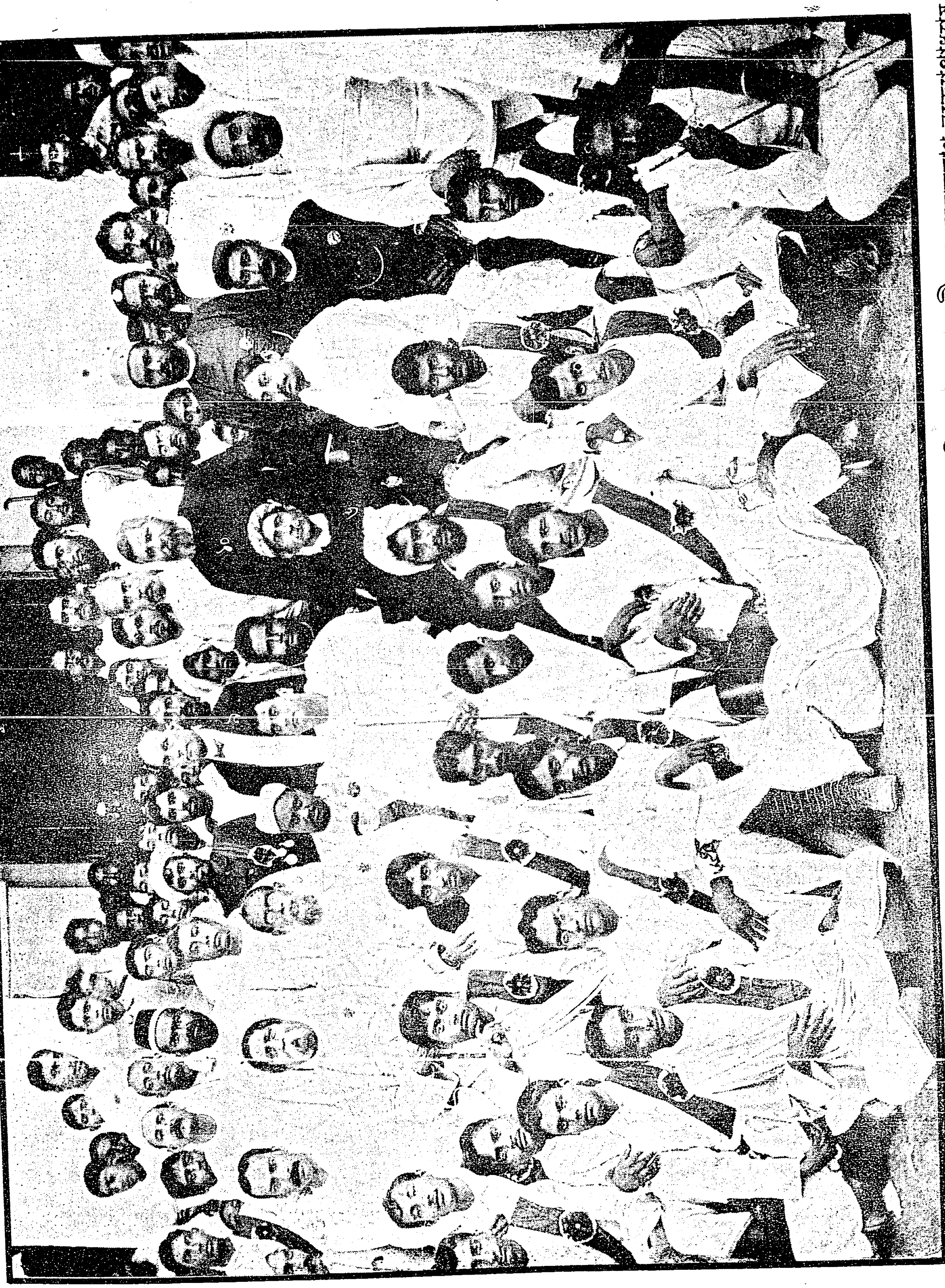

১। মহারাজ শ্রীল জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর। ২। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন। ৫। শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী। ৬। রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর। ৭। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন।
৮। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন। ৯। শ্রীযুক্ত জে, ঘোষাল। ১০। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ১১। মৌলবী আবদুল কাসিম।

Classic Press.

তাহার পর লবঙ্গ চলিতে লাগিল। কুমুদিনী অঙ্গনপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার অনুগামিনী হইলেন। লবঙ্গ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে গঙ্গাতীরে পৌছিল। তথায় একখানি ছোট ভাউলিয়ায় সে আরোহণ করিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। তীর-বেগে পানসী কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইল।

পানসী অদৃশ্য হইলে কুমুদিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ভাবিলেন, আশা ফলিবে কি? অবশ্য ফলিবে। তিনি দেবতা—লবঙ্গ বড় চমৎকার লোক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চারিদিন পরে লবঙ্গলতা আবার কুমুদিনীর কুটীর-প্রাঙ্গনে দেখা দিল। এবার সে বড়ই সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছে—নরেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন। কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত তিনি উন্মাদপ্রায় হইয়াছেন। পরম মিত্র সুরেশের বাসায় তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। কুমুদিনীকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য লবঙ্গলতা দূতীর শুভাগমন হইয়াছে। বড়ই সুসংবাদ—কুমুদিনী আনন্দে বিহ্বলা, সন্ধ্যার পর নৌকা করিয়া তাঁহারা যাত্রা করিবেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতা পৌছিবেন।

বড় আনন্দের দিন। কুমুদিনীর জননী যথাসম্ভব যত্নে লবঙ্গের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বার বার তাহাকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইতেছেন, কুমুদিনীর কৃতজ্ঞতা অসীম। তিনি লবঙ্গকে আপনার ইষ্টদেবী জ্ঞানে তাহার প্রসাদনে প্রস্তত। হাস্য, কৌতুক, আনন্দ ও উৎসাহে সময় যাইতেছে। তথাপি যেন দিন যায় না। কুমুদিনী ভাবিতেছেন, সন্ধ্যার আর কত দেরী। পোড়া সন্ধ্যা রোজ শীঘ্র শীঘ্র আইসে; আজি এত বিলম্ব কেন?

কুমুদিনীর জননী চক্ষুতে একটু কম দেখেন। সন্ধ্যার পর গৃহকর্ম্ম সম্পাদন বা ঘরের বাহিরে গমনাগমন তাঁহার পক্ষে কষ্টকর। কুমুদিনী দুই তিন দিন বাটী থাকিবেন না তাই তিনি জননীর সাহায্যার্থ আগামী কয়দিনের যে যে কার্য্য অগ্রে করিয়া রাখিলে চলে, তৎসমস্ত ব্যস্তভাবে সম্পন্ন করিতেছেন। জননীর নিষেধ না মানিয়াও দুহিতা অস্থির ও চঞ্চলভাবে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে এক একবার রৌদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভাবিতেছেন, বুঝি সন্ধ্যা হইয়া গেল, না না, এখনও দেরী আছে।

স্থির ছিল, সন্ধ্যার পর পান্‌সী আসিবে। কুমুদিনী গৃহ-কর্ম্ম সমাপ্তির পর লবঙ্গলতার কাণে কাণে জিজ্ঞাসিলেন,—"কই দিদি, নৌকা এখনও আসিল না?"

লবঙ্গ বলিল,—"সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই আসিবে। দাদা বাবুর কথারও নড় চড় হয় না, ব্যবস্থারও কোন অন্যথা হয় না, সে জন্য কোন চিন্তা নাই। তুমি এখন সাজগোজ কর।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"সাজগোজ! আমার আছেই বা কি? করিবই বা কেন? আমি কুৎসিতা—দীনহীনা দেব-চরণে প্রণাম করিতে যাইব—সাজগোজের প্রয়োজন কি দিদি?"

লবঙ্গ বলিল,—"তা সত্য, তোমার কিছুই নাই, কিন্তু আমি ঠিক বলিতে পারি, দাদা বাবু নিশ্চয়ই অল্প দিনের মধ্যে তোমায় সোণায় মুড়াইয়া দিবেন।"

কুমুদিনী অধোমুখে বলিলেন,—"ছি দিদি সোণার কামনা আমার নাই। তাঁহার চরণ ধূলার আমি ভিখারিণী, তাহা পাইলেই আমি চরিতার্থ হইব। আর তুচ্ছ অলঙ্কারে দেহ সাজাইয়া ফল কি? আমার গৌরবের অলঙ্কার সিঁথার সিন্দুর যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত বজায় থাকে। আর কিছু আমি চাহি না।"

লবঙ্গ বলিল,—"তা ভাই তোমার যেরূপ গড়ন পেটন তার উপর অলঙ্কার উঠিলে অলঙ্কারের জন্ম সার্থক হইবে। সে জন্যও অলঙ্কার পরিতে হইবে।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"আমি কালো বলিয়া দিদি আমাকে তামাসা করিতেছ না কি? যে কালো যে কুৎসিতা তাহার সকল লোভই ত্যাগ করা উচিত। সত্যই দিদি, আমি সংসারের সকল লোভই ছাড়িয়া দিয়াছি। কেবল এক লোভ আমি ছাড়িতে পারি নাই, কখনও পারিব না। তাঁহার সেই চরণ কমলের সেবা করিবার সাধ, বোধ করি মরণের পরও আমি ছাড়িতে পারিব না। আমার সে সাধও সীমাবদ্ধ। তিনি আমার হইলেও, এখন পরের। প্রার্থনা করি, তিনি

পরের হইয়াই সুখ সচ্ছন্দে থাকুন। সেই পর যদি দয়া করিয়া, আমাকে দুঃখিনী ভগ্নী জ্ঞান করিয়া কখন কখন এক একবার সেই দেব সেবার অধিকার দেন, তাহা হইলেই এ দুঃখিনী শত রাজরাণীর অপেক্ষাও সুখী হইবে। আমি দেবতার ভালবাসা চাহি না, আদর চাহি না, সোহাগ চাহি না, তাঁহাকে আপন করিয়া ভোগ করিতে চাহি না। সে সকল স্পর্দ্ধা ও অমন সাহস এ দুঃখিনীর নাই। আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা কেন করিব দিদি! আমি কেবল কাতরভাবে সেই দেবতার চরণ স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করি, দয়াময়! এই ভিক্ষা দেও, যেন কখন কখন তোমার চরণ সেবার সুখ আমার অদৃষ্টে ঘটে।”

অনেক কথা বলা হইল। প্রাণের পবিত্র মন্দির হইতে অনেক পরিমল সম্পৃক্ত ভাব-কুসুম ভাষার দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটু লজ্জা হইল। পাছে লবঙ্গ তাঁহাকে প্রগল্‌ভা মনে করিয়া বিরক্ত হয়, এজন্য একটু ভয় হইল। লবঙ্গ মনে কি ভাবিল, তাহা নারায়ণ বলিতে পারেন। সে প্রকাশ্যে বলিল,—“আশা কম করাই ভাল। কিন্তু ভাই তুমি যাই বল, যেরূপ ঘটনা দেখিতেছি, তাহাতে সে দেবতা তোমার ছাড়া আর কাহারও পূজা যে গ্রহণ করিবেন, এমন বোধ হয় না। তোমার সতিনীর পূজায় তিনি আর পরিতৃপ্ত নহেন, তোমার পূজার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যে তোমারই নিজস্ব হইবেন, তাহার আর ভুল নাই।”

কুমুদিনী অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—“এরূপ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই; তথাপি তুমি বলিতেছ বলিয়া ইহার উত্তর দিতেছি। তিনি ধর্ম্মাত্মা, মহাপুরুষ। তাঁহার কার্য্যে কোন দোষ হওয়া সম্ভব নহে। আমার পরে আবার যে ভাগ্যবতীকে তিনি ধর্ম্ম-পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পূজায় সে সুন্দরীর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। তাঁহার সে অধিকার কাড়িয়া লইতে কাহারও সাধ্য নাই। আমার দয়াময় দেবতা সেরূপ পাপাচরণে অসমর্থ। দেবতারও কখন কখন মতিভ্রম হয় স্বীকার করিলেও, তাঁহার এ দীনা দাসী করজোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার নিকট হইতে অভয় ভিক্ষা লইয়া, তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতে সাহস করিবে। সে হাত ধরিয়া সেই দেবতাকে সেই পুণ্যবতী সপত্নীর পার্শ্বে লইয়া যাইবে এবং তাঁহাদের মিলন ঘটাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবে। তিনি আমার নিজস্ব নহেন, আমি তাঁহাকে নিজস্ব করিবার কোন চেষ্টাও কখন করিব না।”

আবার লবঙ্গ মনে মনে কি ভাবিল তাহা ভগবান্ জানেন। সে প্রকাশ্যে বলিল,—“সেই তো ভাল। চেষ্টা করিয়া আপন করা—পোড়া কপাল! আপনি যদি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া আপন হইয়া না দাঁড়ায় তবে সে আপনে কাজ কি? সে কথা যাউক ভাই, তুমি এখন বাবুর দেওয়া ভাল কাপড় একখানি পর, চুল বাঁধা আছে, তবু সুমুখটায় একবার চিরুণ দেও। কপালে একটী টিপ পর।”

কুমুদিনী বলিলেন,—“আচ্ছা।”

তিনি লবঙ্গকথিত কর্ম্ম সামাধা করিতে গমন করিলেন। সন্ধ্যাও চুপি চুপি চোরের মত উঁকি দিতে লাগিল। কুমুদিনী ফিরিয়া আসিলেন। ছিন্ন বসন ছাড়িয়া তিনি নূতন বস্ত্র পরিয়াছেন। বিশৃঙ্খল কেশগুলি যথাস্থাপিত করিয়াছেন, কপালে একটী টিপ লাগাইয়াছেন। তাঁহার প্রকোষ্ঠে কাচের চুড়ি। আর কোথাও কোন শোভা সংবর্দ্ধক সামগ্রী নাই। তথাপি তাঁহাকে—সেই কৃষ্ণকায়া যুবতীকে পরমা সুন্দরী দেখাইতেছে। মনের পবিত্রতা, হৃদয়ের উচ্চতা, বাসনার উদারতা, পাপের সংস্পর্শ বিহীনতা এবং কুচিন্তা ও কুপ্রসঙ্গের সঙ্গ-শূন্যতা তাঁহার দেহে এক অলৌকিক জ্যোতিঃ ঢালিয়া দিয়াছে; তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে শোভাময় ও আভাময় করিয়া তুলিয়াছে এবং তাঁহার শরীরে এক অপূর্ব্ব রমণীয়তা আনয়ন করিয়াছে। লবঙ্গ অনেকবার চিন্তাযুক্ত নয়নে কুমুদিনীর প্রতি নেত্র-পাত করিয়াছে। আজি একটু বিশেষ ভাবান্তরের সহিত তৃপ্ত নয়নে সেই সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া দেখিল। কুমুদিনী জিজ্ঞাসিলেন,—“কি দেখিতেছ দিদি? আমার মুখে কি আছে?”

লবঙ্গ বলিল,—“তোমার মুখে কি আছে জানি না, কিন্তু যাহা দেখিতেছি তাহা দেখিয়া নরেশ বাবু কেন অনেক বাবুই কাবু হওয়া সম্ভব।”

কুমুদিনী বলিলেন,—“ছি! আমার রূপ দেখিয়া তিনি কেন পাগল হইবেন দিদি? আমার তো রূপ নাই, যদি থাকিত তাহা হইলেও রূপের ফাঁদে ফেলিয়া তাঁহাকে বশ করিতে আমার বাসনা হইত না; তিনি রূপের মোহে মত্ত হইয়া আমাকে কৃপা করিতেন না। যদি কখন আমার পূজায় তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে ভক্তি দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা আত্ম-নিবেদন দ্বারা, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা রূপের জোরে—ধিক্ সে নারীকে যে কেবল দেহ সাজাইয়া শরীর দেখাইয়া স্বামীর প্রেম অধিকার করিতে চাহে। সে কথা যাউক সন্ধ্যাত হইলা গেল—কই দিদি নৌকা তো এখনও আসিল না।”

ধীরে ধীরে কুমুদিনীর হৃদয় আশায় ও উৎসাহে প্রফুল্ল করিয়া সন্ধ্যা আসিল। কত পতি-বিয়োগ-বিধুরা সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া চমকিতে লাগিল; কত দুঃখের ও সুখের পূর্ব্ব স্মৃতি তাহাকে এখন নূতন করিয়া দহিতে লাগিল। কত নারীর কর্ম্মবীর পতি হয়তো এই রজনীতে মেলট্রেণে প্রবাসে যাইবেন—পতি পত্নী উভয়েই অপরিহার্য্য বিরহের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তথাপি অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া সন্ধ্যা আসিল। হিন্দু গৃহস্থগণের পুর মধ্যে শাঁকধ্বনি হইতে লাগিল। সকল গৃহেই প্রদীপ জ্বলিল। কুমুদিনীও ব্যস্ততা সহ ঘরের দ্বারে জল দিলেন, আলোক জ্বালিয়া বাসগৃহে, পাকশালার তুলসী বৃক্ষ সমীপে ও মা গঙ্গার অভিমুখে সন্ধ্যা দেখাইলেন। আবার লবঙ্গের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—“সন্ধ্যাতো হইয়া গেল।”

লবঙ্গ বলিল,—“এইবার এখনই মাঝিরা নৌকা লইয়া আসিবে।”

তাহার পর কুমুদিনী জননীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—“মা, কোন চিন্তা করিও না। হরির মা তোমার কাছে রাত্রিতে শুইয়া থাকিবে। সে রাত্রি দশটার পর আসিবে। রাত্রিতে একা ঘরের বাহির হইও না। বাহিরে আসিবার আবশ্যক হইলে হরির মা সঙ্গে আলো লইয়া আসিবে। আমি হরির মাকে সকল কথা বলিয়া রাখিয়াছি। হাতে খরচ পত্র আছে, আবশ্যক মত জিনিষ আনাইও। কোন বিষয়ে কষ্ট করিও না। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না।”

কুমুদিনীর মাতার চক্ষু জলে আপ্লুত। তিনি কষ্টে বলিলেন,—“না মা, চিন্তা কি? তুমি লবঙ্গের সহিত স্বামীর কাছে যাইতেছ, ইহাতে ভাবনার কথা কি আছে? লবঙ্গ বড় ভাল মেয়ে; আমাদের খুব আপনার লোক। স্বামীর সুনজরে পড় মা, তাহা হইলেই সকল চিন্তার শেষ হয়। তা মা, আমি কতক্ষণে খবর পাইব?”

কুমুদিনী বলিলেন,—“কালি প্রাতেই যেমন করিয়া হউক, তোমার কাছে খবর আসিবে।”

এক ব্যক্তি বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে বলিল,—“মা ঠাকুরুণ, নৌকা আসিয়াছে।”

লবঙ্গ বলিল,—“কেও—সুন্দর?”

বাহির হইতে উত্তর হইল,—“আজ্ঞা, হাঁ।”

লবঙ্গ বলিল,—“আচ্ছা, তুমি নৌকায় যাও—আমরা যাইতেছি।”

বিদায়, প্রণাম, ক্রন্দন, উপদেশ, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি ব্যাপারে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

রাত্রি সার্দ্ধ আট ঘটিকার সময় সেই প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী-তীরে দুই নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। একজন কুমুদিনী, অপরা লবঙ্গলতা। তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। সুধাংশুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণজালে ধরণী সুশোভিতা। সেই বিমানবিহারী নিশানাথের কোমল কান্তি বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তিময়ী সুরধুনী তর্ তর্ বেগে বহিয়া চলিয়াছেন। তরঙ্গ ভঙ্গ সহকারে নাচিতে নাচিতে শঙ্করজটাবিহারিণী চন্দ্রমা ও নক্ষত্র-কিরণকে কখন বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, কখন বা সোহাগে সাগ্রহে সকলকেই বক্ষে স্থান দিতেছেন। দেখিতে দেখিতে গঙ্গা-হৃদয়ে অগণ্য হীরক খণ্ড বিকাশ পাইতেছে, আবার লুকাইতেছে, আবার আসিতেছে। ক্রীড়াশীল শিশুর ন্যায় হাসিতে হাসিতে, ছুটিতে ছুটিতে চন্দ্রমা চলিতেছে। শীতকালের রজনী। মানবগণ আশ্রয়গত হইয়াছে। গঙ্গাতীর জনশূন্য। নদী-বক্ষে নৌকাও আর নাই, ঐ একখানি পান্‌সী আসিতেছে। এখানে লাগিবে না; ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে পান্‌সী চলিয়া গেল! আবার সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। সহসা আবার পারের পাটের কল হইতে সুতীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ-স্থায়ী বংশিধ্বনি আরম্ভ হইল। তীব্র স্বর যেন বাতাসের সহিত দুলিতে দুলিতে যোজন পথ অতিক্রম করিল। স্বর

থামিয়া গেল। আবার সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। কোন দিকে কোন লোক নাই। সম্মুখে এই আরোহীদিগকে বহন করিবার অভিপ্রায়ে একখানি সুন্দর ছোট ভাউলিয়া কুলের নিকট গা ভাসাইয়া নাচিতেছে। আর কোন দিকে কোন নৌকা নাই।

কুমুদিনী ও লবঙ্গ নৌকার নিকটে আসিলেন। লবঙ্গ ডাকিল,—"সুন্দর!"

"আজ্ঞা।"

"লগি ধরিয়া দাঁড়াও—নৌকা যেন না দুলে। সাবধানে দিদি ঠাকুরাণীকে উঠিতে দেও।"

সুন্দর তাহাই করিল।

লবঙ্গ অগ্রে নৌকায় উঠিল এবং অতি সাবধানে ও বিশেষ যত্ন সহকারে হাত ধরিয়া কুমুদিনীকে নৌকায় উঠাইল। উভয়ে নৌকা মধ্যস্থ কামরায় প্রবেশ করিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

বহরমপুর 'কন্‌ফারেন্স।'

বিগত ৮ই এপ্রেল বহরমপুর সহরে মহাসমারোহের সহিত বর্ত্তমান বৎসরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। এবারের সমিতির কার্য্য প্রত্যেক দিনই অতি সুশৃঙ্খলার সহিত ও সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারের প্রতিনিধির সংখ্যাও বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল। বিশেষতঃ স্থানীয় জনসাধারণের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। কি ধনী, কি দরিদ্র—এমন কি রাজা মহারাজ হইতে সামান্য কুটিরবাসী পর্য্যন্ত স্থানীয় সকল লোকেই, এই শুভানুষ্ঠানে, প্রকাশ্য ভাবেই হউক, আর অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, যোগদান করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ৺রামদাস সেন মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবার জমীদার-শ্রেণীর অনেকেই এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন দেখিয়া, আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সর্ব্বসম্মতিক্রমে 'কন্‌ফারেন্সের' সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার বহু গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বহরমপুরের এই কন্‌ফারেন্সের কিছু নূতনত্ব দেখিতে পাইয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। যাহাতে কন্‌ফারেন্সের কার্য্য কেবল তিন দিনের আমোদ আহ্লাদে পর্য্যবসিত না হয়, বিগত সভায় তাহার সুন্দর নিয়মাদি উদ্ভাবন করা হইয়াছে। সে নিয়মাদি কার্য্যে পরিণত হইলে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইব। আর এক নূতনত্ব দেখিলাম—জাতীয় ব্যায়াম ও কুস্তী প্রভৃতি খেলার প্রবর্ত্তন। যে কয়েকটি প্রস্তাব সে সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহাও আমাদের মতে সময়োপযোগী হইয়াছে।

কনফারেন্সের প্রতিনিধিবর্গের একখানি 'হাফটোন' চিত্র স্থানান্তরে সন্নিবিষ্ট হইল। পাঠকগণ দেখিবেন মাতৃপূজায় দীক্ষিত প্রতিনিধিবর্গের মুখে কেমন এক স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রের সম্মুখে ও পশ্চাতে 'ভলাণ্টিয়ার' দলের ছাত্রবৃন্দ পুষ্পচিহ্নিত উত্তরীয় ধারণ করিয়া উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান আছেন। ইঁহারা যেন উৎসাহ ও আনন্দের জীবন্ত মূর্ত্তি।

চিত্রের মধ্যস্থলে সভাপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর জাতীয় বেশে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে যথাক্রমে হিতবাদী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভারত-গৌরব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির প্রাণভূত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, দেশীয় শিল্পের উন্নতি-কল্পে উৎসৃষ্ট-প্রাণ শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী প্রভৃতি উপবিষ্ট আছেন। সভাপতি মহাশয়ের বাম-পার্শ্বে যথাক্রমে বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সদুত্তমশীল শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন, সদুৎসাহী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি। জাতীয় মহাসমিতির সেবা-ব্রতে ব্রতী শ্রীযুক্ত জে ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সভাপতি মহাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন।

৬ষ্ঠ ভাগ। | আষাঢ়, ১৩১০। | ৩য় সংখ্যা।

কবিগুরু হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র অস্ত গেল অনন্তের কোলে
বঙ্গকাব্যাকাশ হ'তে। গেল কবি চলে'
দিব্য ধামে ; অন্ধতার দারুণ আঁধার
সেথা নাই ; দারিদ্র্যের ভীষণ আকার
সেথা নাহি যায় দেখা। সেথা শুধু আলো,
স্বচ্ছলতা, সুখ, শান্তি,—যতকিছু ভাল।
যাও কবি রাখি পিছে গুঞ্জরিত গানে
বাণীপদ কোকনদে, মত্ত মধুপানে।
শুনি শুনি সেই গান ভারত নিদ্রিত
যদি জাগে কোন দিন, তা হ'লে নিশ্চিত
তুমি তব স্বর্গ ছাড়ি অন্য কবি মুখে
আবার গাহিবে গান। মা'র সুখে দুখে
যে কবির হৃদি-তন্ত্রী করিবে ঝঙ্কার
জন্মভূমি-দুঃখাতুর তব আত্মা তাঁর!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কনারক মন্দির।

পুরীর প্রায় দশক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে সাগর-সৈকতে কনারক ক্ষেত্রে অর্কদেবের মন্দির (Kanarak temple) অবস্থিত ছিল। সে মন্দির এখন ভগ্নস্তূপ, কেবল ভদ্রক বা মোহন মন্দিরটী জরাজীর্ণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। আবুল ফজল হইতে আরম্ভ করিয়া ষ্টার্লিং, ফার্গুশন্, হাণ্টার্ যে কোন বহুদর্শী ইতিহাসকার, প্রত্নতত্ত্ববিৎ বা শিল্পগুণগ্রাহী ঐ ভগ্ন মন্দির দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বলেন এরূপ প্রকাণ্ড ও সুরম্য মন্দির উড়িষ্যায় আর ছিল না। হাণ্টার্ সাহেব বলেন: ["The most exquisite memorial of sun-worship in India or I believe in any country is the temple of Kanarak upon the Orissa shore. The temple of Jagannath has been already described, but it falls far short of this marvellous structure which

rose in honour of the sun fifty years later."]* 'সূর্য্য-আরাধনার এরূপ সুকুমার স্মৃতি-মন্দির ভারতে বা কোন দেশেই আর নাই, অর্কদেবের এই বিচিত্র নিকেতন জগন্নাথ দেবের মন্দিরকেও ম্লান করিয়াছিল।' সে মন্দির এখন ভূমিশায়ী ও বালুকাগর্ভে সমাধিগত। কেবল জগমোহনের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াই গুণগ্রাহী দর্শকগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান, যদি পূর্ণাবয়বে সে মন্দির আজ বিরাজমান থাকিত তাহা হইলে, মুসলমান রাজত্বের শ্রেষ্ট-কীর্ত্তি-মন্দির, জগতে অতুল্য 'মর্ম্মর প্রস্তরের স্বপ্ন' তাজ-মহলের ন্যায়, প্রাচীনতর হিন্দু-রাজত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কীর্ত্তি এই অর্কমন্দিরেরও দ্বারদেশে আসিয়া জগতের কলানুরাগী জনগণ বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন। এখন সে কীর্ত্তি কিয়দংশ ব্যতীত, ভগ্নস্তূপে পরিণত! হাণ্টার্ সাহেবের কথায় সেই ভগ্নমন্দির এক্ষণে এক প্রকাণ্ড বিশৃঙ্খলতাময় স্তূপাকারে ভূমিতে পড়িয়া আছে, এবং সেই পাষাণ খণ্ডগুলির বিরাট আকারের সহিত, তাহাদের বহির্দ্দেশের প্রায় প্রতি বর্গইঞ্চব্যাপী শ্রমসাধ্য ভাস্কর্য্যের তুলনা করিলে, বিশপ্ হিবরের সমালোচনার কথাটী স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়—ভারতবাসীরা দৈত্যদের মত নির্ম্মাণ করিয়া মণিমুক্তাকারদের মত উহা শেষ করিত। ("The ruins now lie heaped upon the floor, a gigantic chaos; and the contrast between their unwieldy bulk, and the laborious sculpture, which covers at almost every square inch outside, forces on the memory Bishop Heber's criticism that the Indians built like Titans and finished like jewellers.")

এই মহামন্দির, জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মত চতুর্গৃহবিশিষ্ট—১ম বড় দেউল বা শ্রীমন্দির, ২য় ভদ্রক বা মোহন, ৩য় নাটমন্দির এবং ৪র্থ ভোগমণ্ডপ, এই পরস্পর সংলগ্ন মন্দির চতুষ্টয় সমন্বিত ছিল। প্রাচীন ইংরাজ পুরাতত্ত্ববিৎগণ, উড়িষ্যার বড় বড় মন্দিরগুলির এই বিশেষত্বটী বিস্মৃত হইয়া এই অর্ক মন্দিরের বর্ত্তমান ভগ্নদশা দেখিয়া উহাকে দুইটী গৃহবিশিষ্ট বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ফার্গুশন্ সাহেব, যাঁহার প্রাচীন স্থাপত্য সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান প্রায়ই অভ্রান্ত, তিনিও লিখিয়াছেন যে, এই মন্দিরে বড় দেউল ও মোহন এই দুইটী মাত্র অংশ ছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথমে এই অনুমানের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রস্তর-প্রাচীর ছিল, এবং এই প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে অতি সুন্দর সিংহদ্বার ছিল; সিংহদ্বারের বহির্দ্দেশে একটী সুরম্য কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত স্তম্ভ ছিল, এবং সিংহদ্বার হইতে পূর্ব্বদিকে অতি সন্নিকটেই বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখা যাইত। এক্ষণে সমুদ্রতট মন্দির হইতে প্রায় আড়াই মাইল পথ দূরে অপসৃত হইয়াছে। সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে সোপানাবলী আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে ভোগ-মণ্ডপ, পরে নাটমন্দির, তৎপরে মোহন এবং পশ্চাতে ও পশ্চিম সীমায় বড় দেউল ছিল। জগমোহনে প্রবেশ করিবার তিনটী দ্বার ছিল, একটী ভোগমণ্ডপ ও নাটমন্দিরের মধ্য দিয়া, অপর দুইটী দ্বারে প্রবেশ করিবার উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী চূড়াবিশিষ্ট স্বতন্ত্র তোরণ ছিল। ভোগমণ্ডপ ও সিংহদ্বারের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে নবগ্রহমূর্ত্তি খোদিত প্রকাণ্ড প্রস্তর-চূড় একটী খিলান বা মণ্ডপ ছিল। প্রাচীর-সীমাবদ্ধ প্রাঙ্গণের মধ্যে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মন্দির ছিল।

এই মন্দির পূর্ণাবয়বে ঠিক কিরূপ ছিল, তাহা অনুমানসাপেক্ষ। ইহার আদিমবস্থার কোন প্রতিকৃতি বা বিস্তৃত বর্ণনা নাই। যে প্রবীণ তালপত্রে লিখিত মাদলা পঞ্জিকায় জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাস লিখিত আছে, তাহাতে ঐ অর্ক মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাল ও অপরাপর কথা ব্যতীত আকার ও গঠন সম্বন্ধে এই মাত্র উল্লেখ আছে যে, এই মন্দিরের চূড়া "আকাশ স্পর্শ করিত।" বাদসাহ আকবরের জীবনচরিতকার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুলফজল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির দর্শন করিয়া যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, হাণ্টার্ সাহেবের ইংরাজী অনুবাদ হইতে তাহা নিম্নে অনূদিত হইল :—

জগন্নাথ ক্ষেত্রের নিকটেই সূর্য্যের মন্দির। উহা নির্ম্মাণ করিতে উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের সমস্ত রাজস্ব ব্যয়িত হইয়াছিল। সেই বিরাট মন্দির দেখিলে কেহ বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। যে প্রাচীর উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া আছে, উহার উচ্চতা ১৫০হস্ত

* Dr. W. W. Hunter's Orissa, also the same author's Statistical Account of Bengal, vol. XIX.

এবং বেধ ১৯ হস্ত। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত ৫০ গজ উচ্চ একটী অষ্টকোণ স্তম্ভ আছে। নয়টী সোপানস্তর অতিক্রম কয়িয়া এক সুপরিসর উন্মুক্ত ভূমিতে পতিত হওয়া যায়। সেখানে একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত খিলান আছে। ঐ খিলান প্রস্তরোপরি সূর্য্য ও নক্ষত্রনিচয় খোদিত আছে এবং উহার চারিধার বেষ্টন করিয়া একটী পাড় আছে। ঐ পাড়ে নানা জাতির, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক মূর্ত্তি, কেহ নিম্নমস্তক ঊর্দ্ধপদ, কেহ উপবিষ্ট কেহ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণত, কেহ বা সস্মিতানন, কেহ বা ক্রন্দনপরায়ণ, কেহ হতবুদ্ধি, এবং কেহ বা সজ্ঞান। তদ্ভিন্ন গায়ক ও এরূপ কতকগুলি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত প্রাণী তাহাতে খোদিত আছে, যাহাদের অস্তিত্ব মনোরাজ্যে ব্যতীত আর কোথাও নাই। এই প্যাগোদার (মন্দিরের) কাছে আরও আটাশটী দেবালয় আছে এবং ঐ দেবতারা সকলেই কোন না কোন অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

এই বর্ণনায় বড় দেউলটীর কোন বিশেষ উল্লেখ নাই বলিয়া হাণ্টার্ সাহেব অনুমান করেন যে, আবুল ফজল্ কনারকে গমন করিবার পূর্ব্বেই ঐ গগনস্পর্শী মন্দিরের পতন হইয়াছিল। ইংরাজী ১৮২০ সালে ষ্টার্লিং সাহেব এই মন্দির দর্শন করিয়া ইহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখন মন্দির ভগ্নদশাপ্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত। যদিও ভদ্রকটীর অবস্থা তখন বর্ত্তমান দশা হইতে কিছু ভাল ছিল এবং তখন বড়দেউলটীর কিয়দংশ দণ্ডায়মান ছিল, পরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন ফার্গুশন্ সাহেব ঐ ভগ্নমন্দির দর্শনে গমন করেন তখনও বড় দেউলটীর ঐ অবশিষ্ট অংশ অচির-পতনোন্মুখ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল, এবং তৎকালে ফার্গুশন্ সাহেব উহার একটী প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তদীয় Picturesque Illustrations of the Architecture of Hindoostan নামক পুস্তকে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী কালে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হাণ্টার্ সাহেব প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিৎগণ যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহার সহিত বর্ষত্রয় মাত্র পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড কর্জ্জন্ বা ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ৺ সার্ জন্ উড্‌বরন্ সাহেব যে দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহার কিছু বিশেষ প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

এক্ষণে কেবল ভদ্রক বা মোহনটী (Porch or Audience Hall) বিদ্যমান আছে; তাহার পশ্চাতে বা পশ্চিম-পার্শ্বে বড়দেউলটীর ভগ্নাবশেষই প্রকাণ্ড পাষাণের স্তূপাকার হইয়া আছে। জগমোহনের বহিরাবয়ব এখনও অটুট আছে, কিন্তু উহার বহির্দ্দেশের গাত্র হইতে অনেক কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহার অভ্যন্তরে প্রকৃত ছাদ বা চূড়ার নিম্নে একটী সাজান ছাদ ছিল, সেটী পড়িয়া গিয়া জগমোহনের গৃহতলে প্রকাণ্ড পাষাণ-রাশি ও লৌহ কড়িখণ্ড ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া দ্বাররোধ করিয়া রাখিয়াছে। জগমোহনের সোপানাবলী, ভিত্তি ও দ্বার পর্য্যন্ত বালুকায় আচ্ছাদিত হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন মাত্র জাগিয়া আছে। জগমোহনের পূর্ব্বদিকে নাটমন্দিরের চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয় না, ভোগমণ্ডপ বালুকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, কেবল উহার চূড়াস্থিত সিংহ মূর্ত্তিটি পূর্ণাবয়বে বালুকার উপরে পরিদৃশ্যমান আছে। সিংহদ্বার ও প্রাচীর সাগরোৎক্ষিপ্ত বালুকাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে; কেবল দুই একটি স্থলে প্রাচীরের চিহ্ন দেখিয়া উহার সীমা ও ব্যাপ্তি নির্ণয় করিতে পারা যায়। মোহনের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখের যে দুইটি তোরণ ছিল, সে দুইটিও বালুকাতলে লুক্কায়িত হইয়াছে; কেবল তাহাদের উপরিস্থিত হস্তিদ্বয় ও অশ্বযুগল দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে।

কিছুই নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহারও তুলনা বোধ হয় আর কোথাও নাই। যে জগমোহনটি এখনও সেই অর্কমন্দিরের স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিয়াছে সেটি একটী অসাধারণ কীর্ত্তি। উহা একটি চতুষ্কোণ মন্দির, দীর্ঘে ও প্রস্থে উভয় দিকেই ৬৬ ফিট অর্থাৎ ইহার গৃহতল প্রায় ৬ কাঠা পরিমিত ভূমি অধিকার করিয়াছে। উহার প্রাচীর চতুষ্টয় বালুকার উপরিভাগ হইতে ঋজুভাবে ৬০ ফিট উত্থিত হইয়াছে, পরে সোপান শ্রেণীর ন্যায় স্তরে স্তরে ও ক্রমসূক্ষ্ম ভাবে উহার ছাদ আরও ৬৫ ফিট (ঢালুভাবে ৭২ ফিট) ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; ছাদের নিম্নপ্রান্তে প্রথমে ৭টী কার্ণিশ বাহির হইয়া আসিয়াছে, পরে কিয়দ্দূর ছাদ ঋজুভাবে উত্থিত হইয়া পুনরায় ছয় শ্রেণী কার্ণিশ বাহির হইয়াছে, পুনরায় ছাদ ঋজুভাবে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আবার সারি সারি কার্ণিশ বাহির হইয়া তাহার উপর একটী খাঁজ কাটা গোলাকার চূড়া, উহার চারিধারে নতজানু সিংহ মূর্ত্তিশ্রেণীর উপর আর একটি ক্ষুদ্র চূড়া তাহার উপর একটি কলস বা অন্য কিছু ছিল, উহা স্থানচ্যুত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড অশীতি হস্ত উচ্চ মন্দির প্রায় সমস্তই লোহিতাভ গ্র্যানাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু কতক বা কালবশে কতক বা বাহির প্রাচীর গাত্রের কৃষ্ণ

প্রস্তর নিবন্ধন উহাকে দূর হইতে কৃষ্ণবর্ণ দেখায় বলিয়া ইংরেজেরা উহার Black Pagoda (ব্ল্যাক্ প্যাগোডা) নাম দিয়াছেন। অর্ণবপোতের নাবিকগণকে এই সুউচ্চ মন্দির উড়িষ্যা উপকূলের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

এই মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারোপরি সন্নিবিষ্ট নীলাভ কৃষ্ণ প্রস্তরে যে ভাস্কর কারুকার্য্য আছে তত সুন্দর ও সুশোভন হিন্দু ভাস্করশিল্প আর কোথাও নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যায় ভাস্করশিল্প যে চরমোন্নতি লাভ করিয়াছিল, এই ভগ্ন মন্দিরের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড তাহার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। দ্বারের দুইপার্শ্ব ও উপরিভাগ বেষ্টন করিয়া নয় পংক্তি কারুকার্য্য। উহাতে অহিফনা, নর নারী, শাখামৃগ, লতা পল্লব ও কৃত্রিম কারুকার্য্য খোদিত আছে। দ্বারের মস্তকোপরি মধ্যের চারিটি পংক্তিতে ধ্যানমগ্ন ঋষিগণের সৌম্যমূর্ত্তিশ্রেণী। অপ্সরী-প্রতিমা গুলি সুঠাম লালিত্যে ও সুচারু বদনশোভায় রমণী-সৌন্ধর্য্যের আদর্শ স্থানীয়।

ষ্টার্লিং সাহেব বলেন*—"The whole of sculpture on these figures comprsing men and animals foliage and arabesque patterns is executed with a degree of taste, propriety and freedom, which would stand a comparison with some of our best specimens of Gothic architectural ornament. The workmanship remains too as perfect as it had just come from the chisel of the sculptor owing to the extreme hard-ness and durability of the stone."—"এই মানব ও পশু মূর্ত্তি এবং বৃক্ষপত্র ও কারুকার্য্য সমন্বিত সমস্ত ভাস্কর কর্ম্ম এত রুচি উপযোগিতা ও স্বাধীনতার সহিত প্রস্তুত হইয়াছিল, যে সেগুলি ইউরোপীয় গথিক্ স্থপতি-শিল্পের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সহিত তুলনায় পরাজিত হইবে না। সেই কারুকর্ম্মগুলি আবার পাষাণের নিরতিশয় কাঠিন্য ও স্থায়িত্ব প্রযুক্ত এরূপ অক্ষুণ্ণ আছে যে, যেন সেগুলি সবে মাত্র ভাস্করের বাটালি হইতে সৃষ্টিলাভ করিয়াছে।" ছাদের নিম্ন স্তরের ত্রয়োদশ সারি কার্ণিসে জনতাশ্রেণী, মৃগয়া, সামরিক দৃশ্যাবলী এবং তৎকালীন সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও আমোদ উৎসবের বহুতর দৃশ্যের প্রতিকৃতি পাষাণ গাত্রে উচ্চভাবে খোদিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ফার্গুশন্ সাহেব লিখিয়াছেন *—"The immense variety of illustrations of Hindu manners contained in it may be imagined when we think that with a height of one foot or eighteen inches the frieze extends to nearly three thousand feet in length and contains probably at least twice that number of figures."—"হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের এই কার্ণিস গাত্রে কত বিবিধ ও অসংখ্য আলেখ্য আছে, তাহা—ইহা ভাবিলেই ধারণা করিতে পারা যায় যে, ঊর্দ্ধে এক ফুট কি এক হস্ত মাত্র স্থানে এই কার্ণিস দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন সহস্র ফিট ব্যাপিয়া আছে এবং তাহার মধ্যে বোধ হয় অন্ততঃ উহার দ্বিগুণ সংখ্যক মূর্ত্তি খোদিত আছে।" ঐ কার্ণিসগুলির মধ্যের প্রত্যেক খাঁজ অর্দ্ধাঙ্গ ঊর্দ্ধবাহু মানব-মূর্ত্তিমালা বিরাজিত—সবগুলিই নিপুণ কারিকরের অমরকীর্ত্তি।

এই জগমোহনের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যে হস্তিযুগল ও অশ্বদ্বয়ের প্রশান্ত মূর্ত্তি আছে, সেগুলি স্বভাবসুন্দর। বাজি আরোহীকে যুদ্ধে লইয়া যাইবার জন্য সুসজ্জিত। করীবরও তেজোমত্ত ও সুঠাম। অশ্বগুলির গাত্র দুই একটী স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকেরা সেই বিদীর্ণ স্থানে সিমেণ্ট ও চূণ লেপন করিয়া বিকৃত করিয়াছে—এই সংস্কার অনাবশ্যক কারণ এই মূর্ত্তিগুলি কঠিন অখণ্ড প্রস্তর হইতে খোদিত এবং ঐ দীর্ণতা বৃদ্ধি হইবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সিংহটী অক্ষতদেহ, কিন্তু পশুরাজের গঠন উড়িষ্যার অপরাপর স্থানের সিংহমূর্ত্তিরই ন্যায় অস্বাভাবিক—সেগুলি শিল্পীর মনোরাজ্যের মৌলিক সৃষ্টি, হাণ্টার্ সাহেবের কথায়—"evolved from the artists' inner consciousness."

এই মন্দিরের অর্দ্ধক্রোশ দূরে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর বালুকার উপর পড়িয়া আছে। আবুল ফজল্ সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে যে প্রকাণ্ড প্রস্তর-চূড় কারুকার্য্য খচিত খিলানের কথা বলিয়াছেন ইহা সেই

* Mr. A, Stirling's Orissa.

* Mr. James Fergusson's "History of Architecture." Vol. II.

প্রস্তর। ইহার চতুর্দ্দিকে নবগ্রহের মূর্ত্তি (আবুল ফজল্ যে গুলিকে ভ্রমবশতঃ উপাসক মণ্ডলী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন) খোদিত আছে, তজ্জন্য উহাকে "নবগ্রহ শিলা" বলে। এই নবগ্রহ শিলাখানি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, ইহার ভাস্কর্য্য অতি উচ্চদরের। ইহাতে নয়টী কক্ষ খোদিত আছে এবং প্রত্যেক কক্ষে এক একটী গ্রহমূর্ত্তি। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল বুধ ও শনির পাঁচটী শান্ত ঋষিতুল্য সৌম্য মূর্ত্তি, সকলেই পদ্মাসনে উপবিষ্ট, মস্তকে উচ্চ কোনাকার কিরীটী, এক হস্তে কমণ্ডলু অপর হস্তে জপমালা, বৃহস্পতি সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, শুক্র একটী পুষ্টবপু সুন্দরী তরুণী প্রতিমা। কেতুর অধোদেহ মৎস্যপুচ্ছাকৃতি, রাহু একটী বীভৎস আবক্ষ রাক্ষস মূর্ত্তি—মস্তকে রুক্ষ কেশরাশি, ওষ্ঠোপরি এক দীর্ঘ দন্ত, এক করে কুঠার, অপর করে চন্দ্রখণ্ড। এই বিশাল সুমোহন গোলাকার শিলাখানি অর্ক মন্দিরের সম্মুখে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু উহার রূপই উহার কালস্বরূপ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ উহার শোভায় মুগ্ধ হইয়া কলিকাতা মিউজিয়মে উহাকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহাকে স্থানচ্যুত করিয়া হস্তী ও অপরাপর বলসাহায্যে উহাকে কোনরূপে অর্দ্ধ মাইল পথ স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবিধ আয়াসেও উহাকে আর অগ্রসর করাইতে পারেন নাই। ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাঁহারা এই অমূল্য পাষাণখানিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন কিন্তু তত্রাচ ইহাকে বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হয়েন নাই। শেষে ঐ প্রস্তরখানি চারিখণ্ড না করিলে উত্তোলিত হইবার সম্ভাবনা নাই, গবর্ণমেণ্টের নিকট এই কথা জ্ঞাপন করিলে তৎকালীন ছোটলাট ইডেন সাহেব তাঁহাদের সেই ধ্বংশকারী ও উনবিংশ শতাব্দীর পক্ষে লজ্জাকর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তদবধি ঐ প্রস্তর বালুকার উপর পড়িয়া আছে। প্রস্তরখানি অখণ্ড অবস্থায় পরিমাণে ১৯ × ৪ ১/২ × ৩ ১/২ ঘন ফুট এবং গুরুত্বে ৬৫০মণ ছিল! উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, ষ্টীম ও তড়িৎ শক্তির নব নব প্রয়োগের দিনে, ঐ একখানি প্রস্তর স্থানান্তরিত করণ দুঃসাধ্য কর্ম্ম বলিয়া ধন ও শক্তিশালী রাজকর্ম্মচারীগণ হতাশ হইয়াছিলেন, আর ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দু স্থপতিগণ, ৪০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী উড়িষ্যার গিরিপ্রদেশ হইতে ঐরূপ ও উহা হইতেও গুরুভার একখানি দুইখানি নহে, শত সহস্র প্রস্তর, জলাভূমি ও সেতুহীন নদ নদী অতিক্রম করিয়া, বহন করিয়া আনিয়া ঐ অর্কমন্দির গ্রথিত করিয়াছিল। সেই প্রাচীন কালে কি করিয়া হিন্দুগণ এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারগণের চক্ষুস্থির হইয়া যায়! হাণ্টার্ সাহেব বলেন—'The arehitects of the twelfth century trusted to their improved mechanical appliances for lifting enormous weights and handled their colossal beams of iron and stone with as much ease and plasticity as modern workmen put up pine-rafters, and fitted in blocks of twenty to thirty tons with absolute precision at a height of eighty feet"—"খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর (হিন্দু) স্থপতিগণ তাহাদের বিষম গুরুভার উত্তোলনের উন্নতি প্রাপ্ত উপায় বা যন্ত্রের উপর নিঃশঙ্কচিত্তে নির্ভর করিত, এবং অধুনাতন কালের কারিকরগণ যেরূপ ভাবে দেবদারু কাষ্ঠের বরগা স্থাপন করে, ঠিক সেইরূপ সহজে ও সুন্দরভাবে ৫০০ শত মণ হইতে ৮০০ মণ পাষাণখণ্ড অশীতি ফিট উচ্চে, নিরূপিত স্থানের তিলার্দ্ধমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া স্থাপিত করিত।"

আবুল ফজল্ সিংহদ্বারের সম্মুখে, বহির্দ্দেশে যে একটী কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তম্ভের বর্ণনা করিয়াছেন, সৌভাগ্যক্রমে সেটী এখনও পূর্ণাবয়বে বিদ্যমান আছে। অর্কমন্দির ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইলে এ স্তম্ভটী পুরীতে নীত হইয়াছে এবং জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে স্থাপিত হইয়া পুরীর শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। এই প্রসিদ্ধ অরুণ স্তম্ভটী একখানি সুচিক্কণ কৃষ্ণ প্রস্তর black basalt হইতে খোদিত এবং চল্লিশ ফিট উচ্চ (আবুল ফজল্ ভ্রমবশতঃ বা অতিরঞ্জিত বর্ণনা নিবন্ধন ইহাকে ৫০ গজ বলিয়াছেন)। এই স্তম্ভটী বহুভূজাকারে গোলাকার; মধ্যভাগে কোন কারুকার্য্য নাই, ঊর্দ্ধে ও অধোদেশ এরূপ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ও সুগঠিত যে, কলানুরাগী মাত্রেই ভাস্করের রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। স্তম্ভের উপরিভাগে একটী গরুড় মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পূর্ব্বে উড়িষ্যায় এরূপ সুশোভন স্তম্ভ অনেকগুলি ছিল, প্রতিমাভঙ্গকারী মহম্মদীয়গণের অনুগ্রহে সকলগুলিই ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই অরুণ স্তম্ভ ব্যতীত আর দুইটী মাত্র অবশিষ্ট আছে—একটী কেন্দ্রাপাড়ার এক বিজন প্রদেশে, আর একটী যাজপুরে।

ইহাই মহান্ অর্কমন্দিরের ধ্বংশাবশেষ। এই ভগ্ন মন্দিরকে দেখিবার জন্য বিদেশীয় পুরাতত্ত্ববিৎ ও সৌন্দর্য্যের উপাসকগণ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসেন এবং দর্শনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন, আর দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী আমরা, পুরী হইতে দশ ক্রোশ মাত্র বিজন বালুকাপথ, শকট ও শিবিকাসত্ত্বেও দুরতিক্রম্য বোধে পুরীতে গমন করিয়াও এই প্রাচীনভারতের অতুল্য কীর্ত্তি দর্শন হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করি।

কিম্বদন্তী এই যে শ্রীকৃষ্ণের শাম্ব নামক জনৈক তরুণবয়স্ক পুত্র, কনারকের অন্তর্বর্ত্তী চন্দ্রভাগা নদীজলে কেলিরত সুন্দরী বিমাতাগণকে পাপচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া অভিশাপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়েন। পরে আরাধনা-তুষ্ট সূর্য্যদেবের বরে রোগমুক্ত হইয়া শাম্ব অর্কদেবের এই মন্দির স্থাপনা করেন। তদবধি উড়িষ্যার এই উপকূলভাগ—কোনা বা অংশ—অর্কদেবের নামপূত হইয়া কোনার্ক—কনারক Kanarak নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

উড়িষ্যার তালপত্রে লিখিত ইতিহাসে Palm-leaf records এবং অপরাপর বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শনে এই জানা যায় যে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি নরসিংহ দেব প্রথম কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১২৫০ হইতে ১২৮০ সালের মধ্যবর্ত্তী কালে, কাহারও কাহারও মতে খৃষ্টীয় ১২৪১ হইতে ১২৬১ অব্দে, বিংশতি বর্ষ অবিরাম পরিশ্রমে ও উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজস্ব ব্যয়ে এই মহামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মন্দির স্থাপনার ন্যায় উহার ধ্বংশ সম্বন্ধেও প্রবাদ এবং ঐতিহাসিক অনুমান উভয়ই আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অর্কমন্দির যে সময় বিনির্ম্মিত হয় তৎকালে সমুদ্রতীর মন্দিরের অতি নিকটবর্ত্তী ছিল,—ভক্তবৃন্দ মন্দিরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সাগরজল হইতে অরুণোদয়ের মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। তৎকালে কনারকের সমুদ্রোপকূল শৈলময় ছিল বলিয়া উহা সতত উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ও অর্ণব যাত্রীগণের বিপজ্জনক ছিল। অসংখ্য অর্ণবপোত এই স্থানে তুফাণাক্রান্ত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত; এই কারণে নাবিকগণের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত এবং পরে সেই সন্দেহ ধ্রুব বিশ্বাসে পরিণত হয় যে, অর্কমন্দিরের চূড়াদেশে স্থাপিত এক প্রকাণ্ড চুম্বক প্রস্তর এই অনর্থের মূল, উহার আকর্ষণেই অর্ণবযান সমূহ মন্দিরের সমীপবর্ত্তী শৈলময় তটদেশে আঘাতিত ও বিলয় প্রাপ্ত হয়। এবং জনপ্রবাদ এই যে, জনৈক মুসলমান নাবিক (বোধ হয় কালাপাহাড়ের কোনও বংশধর হইবেন) পরিশেষে মন্দিরচূড়া হইতে সেই চুম্বক-প্রস্তর বিচ্যুত করিয়া লইয়া যায়, এবং যবন স্পর্শে মন্দির অপবিত্র হওয়াতে পুরোহিতগণ সূর্য্যমূর্ত্তিকে পুরীতে লইয়া গিয়া স্থাপন করেন, তৎপরে পরিত্যক্ত মন্দির ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

ইতিহাস বলে যে,খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে উড়িষ্যার রাজা নরসিংহদেবের আজ্ঞায় সূর্য্য মূর্ত্তি পুরীতে নীত হয়। তাহার পূর্ব্বেই—আবুল ফজল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে অর্কমন্দির দর্শন করিবার পূর্ব্বে—অর্কদেবের প্রধান মন্দির সম্ভবতঃ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, কিন্তু ঐ মন্দির ভগ্ন হইলেও বহুবর্ষ অর্কদেবমূর্ত্তি কনারকেই অধিষ্ঠিত ছিল। নরসিংহ দেব যখন অর্কদেবকে স্থানান্তরিত করেন তখন বড় দেউলটী ব্যতীত অর্কমন্দিরের অপরাপর অংশেরও ধ্বংশ ও পতন অচিরসম্ভব হইয়াছিল। বড় মন্দিরটী সম্ভবতঃ নিজ মস্তকভারে প্রপীড়িত হইয়া ভূমিশায়ী হয়। উড়িষ্যার স্থপতিগণের ছাদ নির্ম্মাণের অপরিণামদর্শিতা, তাহাদের অপরাপর বিষয়ে সুদৃঢ় স্থাপত্যবিদ্যার একটী ত্রুটি স্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে। তৎকালে অর্দ্ধবৃত্তাকার বা সূক্ষ্মাগ্র খিলান (Roman or Gothic arch) এদেশের স্থপতিগণের অপরিজ্ঞাত ছিল, (মহম্মদীয় স্থপতিগণ এদেশে খিলান গঠনের প্রবর্ত্তন করে) এবং উড়িষ্যার স্থপতিগণ প্রাচীরের চতুর্দ্দিক হইতে সোপানের মত প্রস্তর সজ্জিত করিয়া কোনাকার ছাদ নির্ম্মাণ করিত; ঐ কোনাকার ছাদ অল্পে অল্পে ঢালু হইলে বেশ দৃঢ় হইত, কিন্তু ঢালু কম হইলে বা মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ সুপরিসর হইলে ছাদ অধিকাংশ স্থলে নিজ ভার বহন করিতে অসমর্থ হইত এবং স্থপতিগণকে ছাদের কিয়দংশ নির্ম্মাণ করিয়াই নিম্ন দেশ হইতে স্তম্ভ বা লোহার কড়ি স্থাপন করিতে হইত। সেই স্তম্ভ সময়ে সময়ে ৪০।৫০ ফিট উচ্চ হইত। ভুবনেশ্বরের মোহনে এই ভারবাহী স্তম্ভ স্থাপনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্কমন্দিরেও পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এইরূপ স্তম্ভ

বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অর্কমন্দির বালুকাভূমির উপর গঠিত হইয়াছিল বলিয়া সেই স্তম্ভও সম্ভবতঃ ভূমিগর্ভে নিমজ্জিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং পরে মন্দির সমেত ধরাশায়ী হয়। সৈকত-ভিত্তিই অর্কমন্দির ধ্বংশের (পণ্ডিতগণের মতে) বোধ হয় মূল কারণ।

সূর্য্যমূর্ত্তি পুরীতে নীত হইলেই অর্কতীর্থে যাত্রী সমাগম বন্ধ হয়, এবং অপরাপর দেবদেবীও পরিত্যক্ত হইয়া অর্কক্ষেত্র বিজনতা প্রাপ্ত হয়! সূর্য্যমূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করিবার সময় রাজা নরসিংহদেব কনার্ক মন্দিরের ও জগন্নাথ মন্দিরের পরিমাণ গ্রহণ করেন। এই পরিমাণগুলি মাদল পাঁজিতে লিখিত আছে। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় স্থপতিগণ এই ভগ্ন মন্দিরের অনেক কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া গিয়া পুরীর শোভা সৌষ্ঠব সম্পাদন করে, এবং অরুণ স্তম্ভটীও সেই সময়ে কনার্ক ক্ষেত্র হইতে জগন্নাথের মন্দিরতোরণ সম্মুখদেশে স্থানান্তরিত হয়। কনারক মন্দিরের কয়েকখানি বিচ্ছিন্ন প্রস্তর কলিকাতা মিউজিয়মে আনয়ন করা হইয়াছে। সার চার্লস্ এলিয়ট্ সাহেব মন্দিরদ্বারের উপরিস্থ একখানি বৃহৎ হরিতাভ প্রস্তরের কারুকার্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, উহাকে কলিকাতা মিউজিয়মে আনিতে আদেশ দেন। কিন্তু মন্দির হইতে এক মাইল পথ দূরে প্রস্তরের গুরুত্ব নিবন্ধন বহনকারী শকট ভগ্ন হইয়া যায়, তদবধি সে প্রস্তরখানি সেই বিজন সৈকতে পতিত আছে।

এখনও মাঘমাসে অরুণোদয় সপ্তমীর দিন শত সহস্র যাত্রী, যে চন্দ্রভাগা নদীতটে শাম্ব শাপগ্রস্ত হইয়া অর্কদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই চন্দ্রভাগা জলে প্রাতঃস্নান করিতে দূর দূরান্তর হইতে গমন করিয়া থাকেন। সে দিন অর্কক্ষেত্রের বিজন সৈকতভূমি যাত্রীসমাগমে, নবশ্রী ধারণ করে এবং মানব কণ্ঠস্বরে মুখরিত হইয়া থাকে। পরদিন হইতে একবর্ষ আবার কনারক নীরব নিস্তব্ধ। কিন্তু সে যাত্রীগণেরও পদচিহ্ন অর্কমন্দিরের দ্বারদেশ অবধি পঁহুছায় না। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সেই ভগ্নমন্দিরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত। কনারক তীর্থ এখন শ্মশান ভূমি—আপনার প্রাচীন গৌরবের অস্থিকঙ্কাল রাশি বুকে করিয়া অজ্ঞাত বাস করিতেছে। ক্বচিৎ কোন বিদেশীয় ভ্রমণকারী সেই সৌন্দর্য্য-নিলয়ের দ্বারদেশে যাইয়া বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া থাকেন, ও ভারতের প্রাচীন কালের সেই মহান্ ও অতুল্য কীর্ত্তির উদ্দেশে প্রণিপাত করেন।

উড়িষ্যার এই প্রাচীন মন্দিরগুলির বিশেষতঃ কনারকের ভাস্করশিল্প-প্রসঙ্গে উহার একটী দোষের কথা উল্লেখ না করিলে বোধ হয় এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধও অসম্পূর্ণ বিবেচিত হইবে, সেই জন্য নিম্নলিখিত বিষয়টী উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

উড়িষ্যার অমর ভাস্কর-কীর্ত্তির শুভ্র সৌন্দর্য্যে একটী কলঙ্ক রেখা আছে—অশ্লীলতা। কেবল নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি নহে; তাহাতে যদি কিছু দোষ থাকে, তাহাত নিপুণশিল্পীর হস্তে সৌন্দর্য্যাবরণে ঢাকিয়া যাইত, শিল্প হিসাবে তাহা দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত না; সুন্দরের সৃষ্টিই ললিতকলার চরমোদ্দেশ্য, সুতরাং দেবতার প্রতিরূপ, সুন্দরের সার রমণীমূর্ত্তির নগ্নশোভা ত ভাস্কর ও চিত্রকরের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইবেই এবং সে আদর্শকে যদি শিল্পী কৃত্রিম আবরণে বিকৃত করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তাহাতে তাঁহাকে কলারসজ্ঞ দোষ দেন না। কিন্তু উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে ত সে চিত্র নহে, সে যে শয়তান-কল্পিত নরকের প্রতিকৃতি! ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র জগন্নাথের মন্দিরাভ্যন্তরের কয়েকটি মূর্ত্তিকে "disgustingly obscene" ঘৃণাকর অশ্লীল বলিয়াছেন। ঐ মন্দিরের বহির্দ্দেশে, ভুবনেশ্বরের সুকুমার শিল্প-খচিত মন্দিরে,এবং অতুলনীয় কনারক মন্দিরের গাত্রে যেখানে নরনারীর যুগমূর্ত্তি, প্রায় সেইখানেই মকরকেতনের পৈশাচিক লীলা—সে দৃশ্য অতি জঘন্য, শিল্পীগণের উদ্ভাবনী শক্তি নারকীয় পূতিগন্ধময়। পরন্তু ইন্দ্রিয়সেবারত বাদসাহ নবাবগণের বিলাস-নিকেতনে,সে দৃশ্য স্থান পাইলে তত বিস্ময় বা ক্ষোভের কারণ হইত না, কিন্তু এগুলি স্থান পাইয়াছে কোথায়? ভগবানের পূজাভবনে, যেখানে লোকে জননী সহধর্ম্মিণী পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে পুণ্য সঞ্চয় কামনায় গমন করেন! সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের পুরনারীগণ, দেবদেবীর দর্শন-লালসায় এত ব্যগ্র থাকেন যে, তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মন্দির-শোভা দর্শন করিবার অবসর হয় না, এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিল্পীর কারুকার্য্যের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ। কেহ বা উহা দেখিয়াও দেখেন না, কেহ বা সেগুলি দর্শন করা

সময়ের অপব্যবহার বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যে কোন কলানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে সেই দৃশ্য পতিত হয় তিনিই আক্ষেপ করেন, হায়! কেন সেই অমানুষী ভাস্কর-প্রতিভার সহিত এরূপ নরক-কল্পনা বিজড়িত হইল!

'যাহা ভাল তাহা যদি আরও ভাল হইত'—মানব মনের এই দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা উড়িষ্যার এই অমর-কীর্ত্তি প্রসঙ্গে উক্ত শোচনীয় ক্রটীটী পাঠকের গোচরে আনিলাম, নতুবা যে কীর্ত্তি কালমাহাত্ম্যে পবিত্র হইয়া গিয়াছে, যে কীর্ত্তি নিজস্ব শোভার গৌরবে প্রতিমা-ভঙ্গকারী মহম্মদীয়গণের মনে সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বজনীন সৌন্দর্য্যের প্রগাঢ় অনুরাগ উদ্রিক্ত করিয়া তাহাদের সর্ব্ব-নাশকর হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিয়াছে, যে কীর্ত্তি এই পতিত জাতির চির-গৌরব-স্থানীয়, সে অমূল্য কীর্ত্তি বিন্দু মাত্র বিলয় বা বিরূপ প্রাপ্ত হউক, ইহা কোন সহৃদয় ব্যক্তির মনে উদিত হইতে পারে না।

উদার ও কলানুরাগী ইংরাজ রাজ সেই প্রাচীন কীর্ত্তি-মন্দিরগুলির আবিষ্কার, সংস্কার ও রক্ষার জন্য সম্প্রতি বিশেষ উদ্যোগী হইয়া চারি বর্ষ হইল, একটী নূতন বিভাগ (Archæological Survey Department) স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং সুবন্দোবস্তে ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাচীন ও ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই সঙ্গে কনারক মন্দিরের সংস্কার ও রক্ষণের বন্দোবস্ত হইবার, মন্দিরের নবগ্রহ শিলা ও অপরাপর স্থানচ্যুত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাষাণগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশনের এবং মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বালুকামুক্ত করিবার আদেশ হইয়াছে। এই মন্দির সংস্কারার্থে ব্যয়ের জন্য ইংরাজি ১৯০৩-৪ সালের বজেটে ৩৮০০০৲ আটত্রিশ সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কনারকের যাহা আছে, তাহাও সংস্কারের অভাবে ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হইবার সমূহ আশঙ্কা ছিল; সেই আশঙ্কা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট গবর্ণমেন্ট ধন্যবাদার্হ।*

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

* এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ (জগন্নাথ মন্দির ও ভুবনেশ্বর মন্দির) প্রয়াগ পত্রে, ১৩০৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় "উড়িষ্যার তিনটি শ্রেষ্ঠ মন্দির" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক।

শিশু।

১

কোথা হতে এলে শিশু ধরণী-মাঝারে,
ভাসাইতে ধরিত্রীরে প্রেম-পারাবারে;
মরুভূমি হবে ধরা ভেবে ভেবে হয়ে সারা
প্রেরিলা বিধাতা কিরে মরত ভুবনে;
জুড়াইতে দগ্ধ মহী প্রেমের সিঞ্চনে।

২

কি মধু মাখান হাসি যাই বলিহারি,
কি মধুর কোমলতা আহা মরি মরি,
যখনই দেখি তোরে আপনা পাশরি ওরে
সংসারের যত জ্বালা সব ভুলে যাই;
ত্রিদিব মাধুরী সব দেখি এক ঠাঁই।

৩

কি দিয়ে গড়িল তোমা বিধাতা সুন্দর,
দেখাইতে নিজ কারুকার্য্য মনোহর;
কমল সুরভি দিয়া গড়েছে কি তব হিয়া
চম্পকের দাম দিয়া বদন কোমল,
কনক নিন্দিত কান্তি কিবা সুবিমল।

৪

পীযূষ ভাণ্ডার আহা হৃদয় ভিতরে,
রেখেছে যতনে বিধি সঙ্গোপন করে;
শত্রু মিত্র ভেদ নাই সমভাব সর্ব্ব ঠাঁই
ডাকিলেই কাছে যাও হাসিতে হাসিতে
সরল সুন্দর হেন কি আছে মহীতে?

৫

মা মা বলে ডাক যবে আধ আধ স্বরে,
প্রেমসিন্ধু ব'হে যায় মায়ের অন্তরে;
কতই সোহাগভরে তুলে নেন অঙ্কোপরে
অমিয় পূরিত বাণী শুনেন যখন;
কত ভাগ্যবতী মনে ভাবেন তখন।

৬

যতনে নির্ম্মাণ করি সুধা দিয়ে তোরে,
পাঠাইলা জগদীশ অবনী মাঝারে,
হাসিলে মুকুতা ঝরে বচনে অমিয় ক্ষরে
রোদনেও সুধাধারা ঝরে অশ্রুধারে
সুধার পুতলী শিশু মরত মাঝারে।

৭

হাস হাস হাস শিশু হাস আরবার,
মুক্তা বিনিন্দিত দন্ত করিয়ে বিস্তার;
শারদ কৌমুদী হেন হাসাইয়া এ ভুবন
প্রীতিপূর্ণ কর সবে শান্তি সুধাধারে
ডুবে যাক শোক তাপ বিস্মৃতি সাগরে।

৮

কিন্তু এ নির্ম্মল হাসি থাকিবে না আর,
দুই দিন পরে হায় হইবে সংহার;
সৌদামিনী জ্যোতি প্রায় ক্ষণেক উজলি হায়
পুনর্ব্বার নিভে যাবে আঁধার মাঝারে
তাই বলি শিশু এবে হাস প্রাণ ভরে।

৯

সংসার সমুদ্র এই ঘূর্ণাবর্ত্তময়,
বড়ই নিষ্ঠুর আহা নির্ম্মম নিদয়
একবার প্রবেশিলে সুখ শান্তি নাহি মিলে
বাড়ব অনলে জ্ব'লে হবে ছারখার,
তাই বলি শিশু এবে হাস আরবার।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র পাহাড়ী।

পৃথিবীর ইতিহাস।

(২)

আকারের পরিমাণ—পৃথিবীর আকার মীমাংসা হইতে তাহার পরিমাণ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার-রক্ষক Eratosthenes সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃত পরিমাপ (measurement) দ্বারা পৃথিবীর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার দুঃসাহস হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সুদূর অতীত কালেই ইহা দুঃসাহস বলিয়া বিবেচিত হইলেও, তিনি আপন প্রতিভা-বলে জয়ী হইয়াছিলেন। একদা তিনি সংবাদ পাইলেন যে মিশরদেশীয় সীন নগরের একটি কূপের জল বৎসরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহা হইতে তিনি স্থির করিলেন যে ঐ দিন ঐ সময়ে ঐ কূপের ঠিক উপরে সূর্য্য উপস্থিত হয়। তিনি বৎসরের ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখিলেন যে সূর্য্য আলেক-জান্দ্রিয়ার শীর্ষদেশ হইতে তাহার দৈনিক বৃত্তাকার পথের ১/৫০ অংশ অন্দাজ দূরে অবস্থান করিতেছে। সীন হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যবধান ৫০০০ ষ্টাডিয়াম্। তাহা হইলে সূর্য্যের সমগ্র পথের পরিমাণ অবশ্যই ৫০×৫০০০ =২৫০০০০ ষ্টাডিয়াম্ হইল। (১ষ্টাডিয়াম্ ১/১০ মাইল)।

ইঁহার পর একজন গ্রীক্ পণ্ডিত স্থির করেন যে, রোড্স্ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত যে বৃত্তাংশ, তাহা সমগ্র বৃত্তের ১/৪৮ ভাগ। উভয় স্থানের ব্যবধান ৫০০০ ষ্টাডিয়াম্; সুতরাং সমগ্র বৃত্তের পরিমাণ ৪৮×৫০০০= ২৪০০০০ ষ্টাডিয়াম্ বা ২৪০০০ মাইল। এই সংখ্যা সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অভ্রান্ত বলিয়াই লোকের ধারণা ছিল।

নবম শতাব্দীতে কালিফ অল্-মামুন্ পৃথিবীর পরিধি-পরিমাপ জন্য দুইজন পণ্ডিত (আব্দুল্ মালিক্ ও আলি বেন্ ইশা) নিযুক্ত করেন। তাঁহারা গজ দিয়া মাপিয়া দুইটি স্থানের মধ্যে ব্যবধান ৪৫০৬০০ এল্ বলিয়া স্থির করেন; এবং ইহাও স্থির করেন যে ঐ দুই স্থান দুই ডিগ্রি অন্তর। ইহা হইতে সমগ্র পরিধি ১৮০×৪৫০৬০০= ৮১১০৮০০০ এল্, স্থির হইল। (ছয় যবোদরে এক ইঞ্চ,

২৭ ইঞ্চে এক এল্)। এই গণনা আজও অনেকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১৬৬৪ অব্দে পিকার্ড ডিগ্রি দ্বারা পরিমাণ স্থির করিবার পন্থা অবলম্বন করেন। ১২৪৮০৫ গজে এক ডিগ্রি বা অক্ষাংশ। তাহা হইলে ভূ-পরিধি ৩৬০ × ১২৪৮০৫ = ৪৪৯২৯৮০০ গজ হইল। গ্রীক পণ্ডিতের গণনা অপেক্ষা এই পরিমাণ প্রায় দুই হাজার মাইল কম হইল।

"সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গ্রন্থেও ভূপরিধিকে ৩৬০ অক্ষাংশে ভাগ করা হইয়াছে এবং এক অক্ষাংশের পরিমাণ ৪৯৬৭ ধরা হইয়াছে। উহা সম্ভবতঃ যোজন সংখ্যা; যদি যোজন সংখ্যা হয় তবে পরিধি পরিমাণ কিছু অধিক হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে জোতিষ শাস্ত্র হিন্দুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আরব ও গ্রীকগণ প্রকৃত পরীক্ষা দ্বারা তাহার উন্নতি করিয়াছিলেন। হিন্দুর নিকট হইতেই যে প্রথম জ্যোতিষ আরবে গিয়াছিল তাহা নিম্ন সাক্ষ্যই এস্থলে যথেষ্ট হইবে।

"Greek traditions assign considerable astronomical knowledge to the Chinese, who record observations in the 25th century B. C. Some of the Indian sacred books refer to astronomical knowledge acquired several centuries before this time. At Al Mansur's court arrived a scholar from India (772), bearing with him an Indian treatise on astronomy, which was translated into Arabic by order of the Caliph, and remained the standard treatise for nearly half a century." A. Berry, in his "Short History of Astronomy."

অর্থাৎ হিন্দুগণ খৃষ্টজন্মের ২৫ শতাব্দীরও পূর্ব্বে জ্যোতিষ বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ আরবে নীত হয় ও উহা অর্দ্ধ শতাব্দী কাল তথায় আদর্শরূপে মান্য হইয়াছিল।

নিউটন্ প্রথম প্রচার করেন যে পৃথিবীর মেরু বেষ্টন করিয়া যে পরিধি তাহা বিষুব রেখা বেষ্টনকারী পরিধি অপেক্ষা ছোট, কারণ পৃথিবী মেরু স্থলে চেপ্টা।

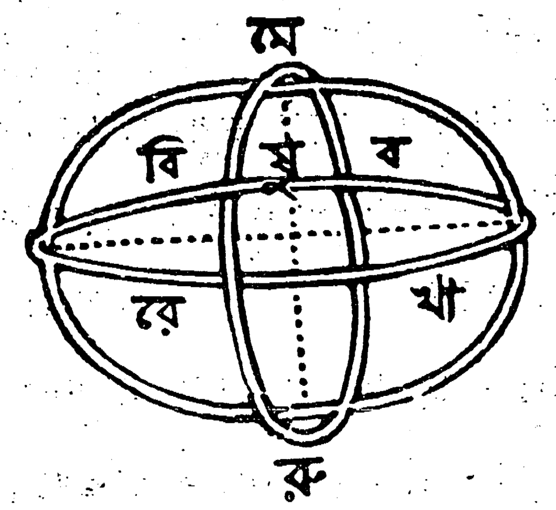

এই উক্তির সত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত ফরাশিশ্ গভর্ণমেণ্ট প্রথমে পেরুতে পরে লাপ্লাণ্ডে লোক পাঠাইয়া দুইটি বৃত্ত পরিধির পরিমাপ গ্রহণ করেন। এই পরীক্ষা হইতে জানা যায় যে মেরু প্রদেশে এক ডিগ্রিতে ১২১০৭৩ গজ এবং বিষুব রেখ সন্নিহিত স্থানে ১ডিগ্রিতে ১২৩৫৩২ গজ; এবং বিষুবরেখা সন্নিহিত ব্যাস ৭৯২৭ মাইল ও মেরুদ্বয় সংযোগকারী ব্যাস উহা অপেক্ষা ২৭ মাইল ছোট, অর্থাৎ পূর্ব্ব ব্যাসের ১/২৮৯ অংশ। বিষুব রেখার বৃত্তপরিধি ২৪৮৫৬ মাইল (২০২৪ গজে এক ভৌগলিক মাইল ধরিতে হইবে।)

পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ জমির পরিমাণ ১৯৭০০০০০০ বর্গ মাইল এবং সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণ ২৬০০০০০০০০০০ ঘন মাইল। "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গ্রন্থে পৃষ্ঠ ক্ষেত্রফল =৭৮৫৩০৩৪ লিখিত আছে।

বিষুবরেখার সন্নিহিত ভূপৃষ্ঠও ঠিক বৃত্তাকার নহে; মেরু প্রদেশে ত' নহেই। উহাকে বৃত্তাভাস (elliptical) বলা যাইতে পারে। গিনি উপসাগরের সন্নিহিত প্রদেশ ও পশ্চিম পলিনেসিয়া পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত। লঙ্কাদ্বীপ ও পানামা যোজকের নিকটও বিষুবরেখার একটু স্ফীতভাব (১০০০ ফিট) লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বে প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী স্থাবর, "ভূরচলা," এবং সূর্য্যাদি অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র ইহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে! কারণ তাহাদের মনে হইত যে পৃথিবী গতিশীল হইলে, গাড়ীর চাকা হইতে কাদা যেমন ছিট্‌কাইয়া পড়ে, তেমনি ভূপৃষ্ঠস্থ যাবতীয় পদার্থই ছিট্‌কাইয়া শূন্যে চলিয়া যাইত। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে।

কোপরনিকস্ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ৮ম পরিচ্ছেদে পৃথিবীর গতি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, চলনশীল যান হইতে পরিদৃশ্যমান বস্তু সকল যেমন চলন্ত বলিয়া মনে হয়, পৃথিবীর গতি বশতঃ আমরা তেমনি সূর্য্যাদিকে চলিতে দেখি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা চলে না। হিন্দু জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন—

"আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে, তৎ পততীব ভাতি, সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে?"

কিন্তু তিনি বলিয়াছেন "মরুচ্চলা ভূরচলা স্বভাবতঃ যতো বিচিত্রা খলু বস্তুশক্তয়ঃ।" এদিকে আবার পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ভূগোল ১২৮ অধ্যায়ে ঐ একই কথা লিখিত আছে—

"তমাদিত্যোহনুপর্য্যেতি সততং জ্যোতিষাং বরঃ।
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রো বায়ুশ্চৈব প্রদক্ষিণম্॥"

সর্ব্বপ্রথমে নিউটন্ই পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর আবর্ত্তন প্রমাণিত করিবার প্রয়াসী হয়েন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে যে বস্তু যতদূরে থাকিবে সে বস্তু তত দ্রুত আবর্ত্তিত হইবে। ক, খ, দুইটী বৃত্ত যদি একত্রে গ কেন্দ্রকে আবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে থাকে, তবে ক বৃত্ত, ক স্থান হইতে ঘুরিয়া ক স্থানে ফিরিতে যে সময় ব্যয়

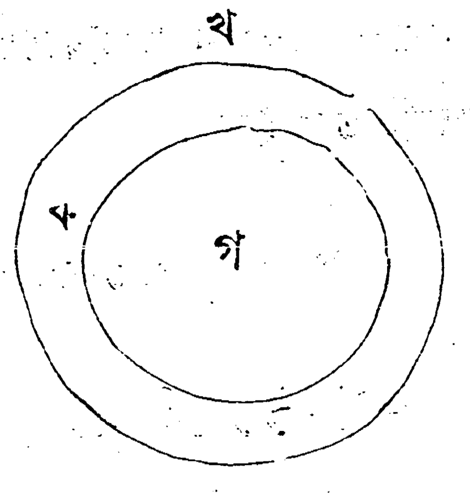

করিবে, খ বৃত্তের খ বিন্দুও স্বস্থানে ফিরিতে সেই একই সময় লাগিবে। কিন্তু একই সময়ে খ, ক অপেক্ষা, অধিক পথ পর্য্যটন করিতেছে, অর্থাৎ খ, ক অপেক্ষা, দ্রুততররূপে গ কেন্দ্রকে আবেষ্টন করিতেছে। বিষুবরেখার সন্নিহিত ভূপৃষ্ঠই কেন্দ্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী, সুতরাং সেই স্থানের দ্রব্যাদি পৃথিবীর সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা দ্রুততর আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। নিউটন এই গতির পরিমাণ সেকেণ্ডে ১৫১৪ ফিট ধার্য্য করিয়াছেন। বিষুবরেখা হইতে মেরুর দিকে যত অগ্রসর হইবে ততই গতিরও হ্রাস হইবে। ৪০° উত্তর বা দক্ষিণ নিরক্ষবৃত্তে (latitude) গতি সেকেণ্ডে ১১৫৯ ফিট; ৫০° ডিগ্রিতে ৯৭৩; ৬০°তে ৭৫৭ ফিট মাত্র। এইরূপে ভূপৃষ্ঠস্থ যে দ্রব্য ভূপৃষ্ঠ হইতে যতদূর উচ্চে অবস্থিত থাকে, তাহা তত অধিক বেগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতে থাকে। Benzenberg, Foucault, Garthe, Schwerdt নামক বৈজ্ঞানিকগণ "দোলক" (pendulum) পরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা নিউটনের উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ ইহাও স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবী আবহমান কাল একই অনুপাতে চলিতেছে না। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের গতি অপেক্ষা পৃথিবী অধুনা কিছু অলস মন্থর হইয়াছে। ইহার ফলে তদানীন্তন দিন অপেক্ষা বর্ত্তমান দিনমান ১/৮৩ সেকেণ্ড দীর্ঘ হইয়াছে। কি সূক্ষ্ম পরিমাণ!

পৃথিবীর আহ্নিক গতির ন্যায় আর একটি বাৎসরিক গতি আছে; দৈনিক গতি তাহার অক্ষদণ্ডে একবার আবর্ত্তন, বাৎসরিক গতি তাহার কক্ষ পথে একবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ। অক্ষদণ্ডে আবর্ত্তনের ফলে দিন রাত্রি হইয়া থাকে; এবং বাৎসরিক গতির ফলে সূর্য্য ঠিক বিষুবরেখার উপর স্থির না থাকিয়া বৎসরে ২৩ ১/২ ডিগ্রি বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে সরিয়া যায়; এবং এইজন্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঋতুপর্য্যায় সংঘটিত হইয়া থাকে। দিবস রজনীর দৈর্ঘ্য-তারতম্যতাও এই কারণেই ঘটে; ২১° উত্তর বা দক্ষিণ নিরক্ষবৃত্তে (latitude) দীর্ঘতম দিনমানে ১৩ ১/২ ঘণ্টা; ৫০°তে ১৬ ঘণ্টা; ৬৬°তে ২৪ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। সূর্য্যকিরণের বক্রতাও (refraction) দিনমানের দীর্ঘত্বের কারণ।

ভূ-পৃষ্ঠের বৃত্তান্ত—ভূপৃষ্ঠ জল ও স্থলময়। ইহাতে স্থল অপেক্ষা জল ভাগ ২ ৩/৪ গুণ অধিক। উত্তর গোলার্দ্ধ স্থলবহুল এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধ জলবহুল। মহাসমুদ্র সকল দক্ষিণে চৌড়া উত্তরে ক্রমশ পরিসর কম হইয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর ঠিক এই রূপ। আটলান্টিক মহাসাগর যেন ঠিক নদীর মত; তাহার এক পাড়ে আফ্রিকা ও য়ুরোপ, অপর পারে অমেরিকা মহারাজ্য; আফ্রিকাকূল যেখানে খোল হইয়া গিয়াছে, আমেরিকার কূল সেখানে সমুদ্রের মধ্যে বাহির হইয়া আসিয়াছে; আফ্রিকার যে পশ্চিমাংশটা বরাবর সমুদ্রের মধ্যে ঠেলিয়া গিয়াছে, ঠিক তাহারই অপর পারে আমেরিকার কূল খোল হইয়া গিয়াছে। এরূপ কেন হইয়াছে, কোন বৈজ্ঞানিক ইহার

মীমাংসা করিয়াছেন কিনা জানি না; প্রাচীন বঙ্গদর্শনে কোন এক প্রচ্ছন্ননামা লেখক অনুমান করিয়াছিলেন যে প্রলয়ের জলপ্লাবন দক্ষিণ হইতে ছুটিয়া উত্তরাভিমুখে আসিয়াছিল, তাহতেই ওরূপ ঘটিয়াছে। ইহা স্বীকার করিলে পৃথিবীকে পূর্ব্বাপর স্থলময়ী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়; স্থলময়ী মেদিনীতে কোন এক অতীত যুগে জলপ্লাবন ঘটিয়াছিল, এবং তাহা দক্ষিণ মেরু হইতে আসিয়াছিল, ইহা অনুমান মাত্র বলিয়া মনে হয়, বৈজ্ঞানিক কোন সত্য প্রচ্ছন্নভাবে আছে কিনা জানি না।

Humboldt প্রথমে ভূমির পরিমাণ করিবার চেষ্টা করেন। তৎপরে Peschel অধুনা Leipoldt স্থির করিয়াছেন যে য়ুরোপখণ্ডের ভূমির সমুদ্রতল হইতে উচ্চতা গড়ে ৩২৮ গজ। ইঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া Krummel স্থির করিয়াছেন যে, সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্র-তল হইতে সমস্ত ভূমির পরিমাণ মোট ১২৭৫৭৫০০ ঘন মাইল। সমুদ্রজলের পরিমাণ ২৮৫৯৫০২৫০ ঘন মাইল। সমুদ্রতলের উপরিস্থিত সমগ্র স্থলভাগের ২২ গুণ করিলে পৃথিবীর বিরাট সমুদ্রের উদর পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু স্থল এই ক্ষতি তাহার গুরুত্ব দ্বারা সম্পূরণ করিয়া লইয়াছে। Krummel বলেন জল-পরিমাণ অধিক হইলেও কঠিন স্থল ও তরল জলের ওজন সমতুল্য।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—স্থল,জল অপেক্ষা উচ্চ হইল কেন? আমেরিকার প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিশারদ Dona ও সুইজরলণ্ডের ভূতত্ত্ববিদ্ Heim এক মত হইয়া বলিয়াছেন যে তরল পৃথিবী উত্তপ্তাবস্থা হইতে শীতলতা হেতু কাঠিন্য প্রাপ্ত হইবার কালে ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। পর্ব্বত ইহারই বিশেষ স্ফীতাংশ। তরল পৃথিবী জমিয়া যাওয়ায় তদানীন্তন পরিধি অপেক্ষা বর্ত্তমান পরিধি ১০০ অংশ ছোট হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর স্থল বিভাগ আবহমান কাল যে একই আকারে আছে, তাহা নহে; স্থল সমুদ্র হইতে উঠিতেছে, আবার তাহাতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। অনেক দ্বীপ দেখিয়া (যথা, দক্ষিণ গোলার্দ্ধের দ্বীপপুঞ্জ) ভূতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, সে সকল কোনও না কোনও মহা-দেশের সহিত সংলগ্ন ছিল, কালে সেই সেই মহাদেশের কতকাংশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় অপরাংশ দ্বীপাকার ধারণ করিয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ দ্বীপ-সন্নিহিত সমুদ্র মধ্যে অরণ্য ও মনুষ্য সমাধি, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। অনেকের অনুমান, ভূমধ্য-সাগর দ্বারা পৃথকীকৃত য়ুরোপ ও আফ্রিকা এককালে পরস্পর সংলগ্ন ছিল। লঙ্কা ও ম্যাডাগাস্কারও এককালে এক মহাদেশের অন্তর্গত ছিল।

এই পরিবর্ত্তন খুব ধীরে ধীরে বহুকাল ব্যাপিয়া সংঘটিত হয়। জলপ্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনার বিষয় স্বতন্ত্র। ১৭৪৩ সালে Celsius স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়া প্রদেশের সমুদ্রোপকূলের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে পুস্তক (Diminution of the waters of the Baltic and adjoining oceans) লিখেন, তাহাতে সমুদ্রের নিম্না-বতরণ স্থলের উচ্চতা-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। ১৮০২ সালে Playfair ইহার বিপরীত মত প্রচার করেন,—তিনি বলেন, স্থল ফাঁপিয়া উচ্চ হয় বলিয়াই সমুদ্র সরিয়া নীচু হইতে বাধ্য হয়। সমুদ্রতল হইতে ৪৯৫ ফিট উচ্চ পর্ব্বতে সামুদ্রিক জীবের অস্থিকঙ্কাল বা অবশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালে ডারউইন ৯৪৭ ফিট উচ্চে এরূপ নিদর্শন পাইয়াছেন যে কোন কালে সেখানে সমুদ্র প্রবাহিত হইত।

ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিজ্ঞা পালন।

(ক্ষুদ্র গল্প)

(১)

শ্যামাচরণ চৌধুরী ও হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী—পরস্পর সম্বন্ধে জ্ঞাতি-ভ্রাতা; উভয়েরই নিবাস কলিকাতা। উভয়ে বাল্যে একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একত্র অধ্যয়ন, একত্র অবস্থান, এক বয়স ও এক স্বভাব—ইহাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতি সঞ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক—হইয়াছিলও তাই। প্রৌঢ়ে এখনও বাল্যের সেই অনাবিল প্রগাঢ় প্রীতি

অক্ষুণ রহিয়াছে, কিন্তু বিধি-নির্ব্বন্ধে উভয় বন্ধুর চাক্ষুষ সাক্ষাৎ এখন অতি অল্পই ঘটে। কারণ পাঠ সমাপনান্তে উভয়ে যখন চাকুরীর অন্বেষণে ঘুরিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই হরিশ্চন্দ্র খুল্লতাতের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া সুদূর পশ্চিমে তাঁহার নিকটে চলিয়া গেলেন। খুল্লতাত মহাশয় তথায় কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ও বিপত্নীক। হরিশ্চন্দ্র প্রাণপণে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিলেন—সাধ্যমত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়া বৃদ্ধ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র খুল্লতাতের মৃত্যুকালীন উইলানুসারে তাঁহার ত্যক্ত যৎকিঞ্চিৎ নগদ সম্পত্তির অধিকারী হইলেন এবং সামান্য চেষ্টাতেই তিনি তাঁহার খুল্লতাতের আপিসের বড় সাহেবের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তথায় একটী চাকরী পাইলেন এবং দেশ হইতে পরিবার পরিজনদের লইয়া গিয়া সেই হইতে সেই সুদূর পশ্চিমেই বাস করিতে-ছেন। শ্যামাচরণ কলিকাতায় কোন সওদাগরী-আপিসে চাকরী লইয়া নিজ গৃহেই স্থায়ী হইলেন। শ্যামাচরণের পরিবারও অধিক নহে—গৃহিণী ও একটিমাত্র কন্যা—পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করেন সুতরাং মাহিয়ানা অধিক না হইলেও তাঁহার তাহাতে এক প্রকার সচ্ছন্দেই চলিয়া যায়। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের সন্তান সন্ততি এবং পোষ্য অনেকগুলি—দূর প্রবাসে রহিয়াছেন—সেখানে ব্যয়ও অধিক—কলিকাতার পৈতৃক বাড়ীটি ভাড়া দিয়া কিঞ্চিৎ আয় হয়—তাহা দ্বারা এবং মাহিয়ানা যাহা পান—তাহাতে তাহাকে কায়-ক্লেশেই সংসার চালাইতে হয়।

(২)

আজ পূর্ণ ত্রয়োদশ বর্ষ পরে হরিশবাবু দেশে আসিয়া-ছেন—তাঁহার প্রথমা কন্যা নলিনী সম্প্রতি চতুর্দ্দশ বর্ষে পদা-র্পণ করিয়াছে, বিবাহ আর না দিলে নয় তাই অনেক কষ্টে মাত্র দেড়মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন—তাঁহারা পথশ্রান্ত হইয়া আসিতেছেন নিজ বাড়ীতে উঠিয়া নূতন গৃহস্থালী পাতিয়া আহারাদি করিতে কষ্ট হইবে বলিয়া শ্যামবাবুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া দুই এক দিনের জন্য তাঁহার বাড়ীতেই উঠিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষ পরে উভয় বন্ধুর সম্মিলনে যে আনন্দ তাহা অবর্ণনীয়। উভয়ে কত কথা হইল; এই তের বৎসরের কথা কি দুই এক ঘণ্টায় বা দুই এক দিনে শেষ হয়। সে দিন কোনও পর্ব্বো-পলক্ষে শ্যামবাবুর আপিস বন্ধ সুতরাং বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর কালে উভয়ে গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন। শ্যামবাবু প্রতিদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিতেন আজ বন্ধু সমাগমে প্রাতে স্নানের অবসর ঘটিয়া উঠে নাই তাই বেলা দ্বিপ্রহরেই গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন।

কলিকাতার নিম্নবাহিনী পূত-সলিলা ভাগীরথী কলস্বরে সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছেন—সেদিন তখন জোয়ার আসিয়াছে,তরঙ্গিণী কূলে কূলে পরিপূর্ণা। ঘাট অপেক্ষাকৃত জন-বিরল হইয়া আসিয়াছে, উভয় বন্ধু ক্ষণকাল তীরে দাঁড়াইয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ নয়নে ভাগিরথীর অসীম সৌন্দর্য্য দর্শন করিলেন, ভক্তিভরে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে জাহ্নবীর শীতল সলিলে আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল পরে হরিশ বাবু শ্যাম বাবুর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "শ্যাম আজ তের বৎসর পরে আবার আমরা একত্রে গঙ্গাস্নান করিতেছি।" ঈষৎ হাসিয়া শ্যাম বাবু উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই, আজ তের বৎসর পরে আবার যে তোমায় দেখে এত সুখী হব তা ভাবি নাই।" হরিশ বাবু একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলি-লেন,—"এত সুখেও আমার মন যেন কেমন অপ্রসন্ন হইয়া রহিয়াছে নলিনীর বিবাহ না হলে আর আমার মনের সুখ শান্তি কিছুই ফিরিয়া পাইব না। ছুটী মোটে দেড়মাস তার ত কদিন কেটেই গেল, কিক'রে যে ভাই নির্ব্বাহ হবে তাই ভেবেই আমি আকুল হইতেছি।—" "কেন তুমি এত ভাব্‌ছো আমি ত বলে'ইছি যে তোমার কোন ভাবনা নাই, এই এক মাসের মধ্যেই নলিনীর বিবাহ দিব আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া একথা বলিতেছি। তুমি টাকা দিবে আর আমি যদি একটু পরিশ্রম ক'রে তোমার কাজ সমাধা না করিতে পারি তবে আর কেন? তুমি মিছে ভেব না, নিশ্চিন্ত থাক আমার যে কথা সেই কাজ, তুমি তা না জান এমন নয়।" হরিশ বাবু আশ্বস্ত চিত্তে বন্ধুর প্রতি চাহিলেন—বলিলেন, "ভাই আর আমার কোন ভাবনা নাই। তুমি যখন এই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে তখন আর আমার চিন্তার কিছু কারণ নাই। ভগ-বান তোমার প্রতিজ্ঞা সফল করুন। এখন এই প্রার্থনা।"—

(৩)

শ্যাম বাবুর একমাত্র কন্যা প্রভাবতী বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ, ক্রোড়ে নবনীতসুকুমার ছয় মাসের একটি ক্ষুদ্র শিশু, প্রভা দ্বিপ্রহরে আপন ঘরে বসিয়া গুণ গুণ স্বরে ঘুম পাড়ানীয়া গীত গাহিয়া গাহিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইতেছিল, সহসা পশ্চাৎ দিক হইতে কে যেন তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিল,—কৃত্রিম বিরক্তি সহকারে প্রভা বলিল—"আঃ সর না নলি, এই গুমটে প্রাণ যায় আবার উনি এলেন জ্বালাতন কোত্তে, কবে যে তোর বর এসে তোকে নিয়ে যাবে তাই ভাবি।" নলিনী চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিল তাহার উজ্জ্বল কৃষ্ণতার নয়নযুগলে রক্তিম অধরপুটে তরল হাস্যরাশি উছলিয়া পড়িতেছিল। এই দুই দিনেই দিদির সহিত তাহার প্রগাঢ় ভালবাসা সংস্থাপিত হইয়াছিল—হাসিতে হাসিতে নলিনী বলিল "বলে আপনি শুতে ঠাই পায় না শঙ্করাকে ডাকে, আপনার ভাবনায় বাঁচেন না আবার পরের ভাবনা। তা আর ভাবতে হবে না দিদি, তোমার বরতো আজই আস্‌বে।" ছেলে ঘুমাইয়াছিল প্রভা সন্তর্পনে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিয়া বলিল "তা বেশ তুই সাবধানে থাকিস্—দেখিস্ যেন নিয়ে না যায়,"—"আমার আর তাতে কি তোমারই ত সতীন হবে।—আচ্ছা দিদি সতীন হ'লে কি হয়—?" "দূর হতভাগী" বলিয়া প্রভা নলিনীর আরক্ত কপোলদ্বয় টিপিয়া দিল, নলিনী পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "সত্যি দিদি আজ রায় মহাশয় আস্‌বেন শুনে আমার ভারি আনন্দ হচ্চে।—" প্রভা বলিল—"কেন তোর তাতে কি?" "আমি তাঁর সঙ্গে একটু গল্প করিব কত ঠাট্টা তামাসা করিব তিনি কেমন লোক দেখিব—আর আবার কি—" প্রভা ঈষৎ হাসিয়া বলিল "এত বড় মেয়ে হয়েছিস তবু তোর ছেলেমানুষী গেল না"।

প্রভার স্বামী ললিতমোহন মেসে থাকিয়া পড়া শুনা করিতেন, তিনি এম্, এ পাশ করিয়া এখন ওকালতীর জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, ললিতমোহন সচ্চরিত্র মিষ্টভাষী বিনয়ী নম্রস্বভাব ও সুপুরুষ। শ্যামবাবু সর্ব্বস্ব ব্যয়ে জামাতা আনিয়াছিলেন। জামাতা তাঁহাদের মনের মত হইয়াছিল এজন্য তিনি ও গৃহিণী উভয়েই মনে মনে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। ললিতমোহন প্রায় প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শ্বশুরালয়ে আসিয়া সোমবারে আবার মেসে চলিয়া যাইতেন। আজ শনিবার তাই তাঁহার আগমন আশায় প্রভা ও নলিনী উভয়ে উৎসুক হইয়াছিল।

(৪)

সন্ধ্যার সময় ললিতমোহন আসিলেন। বাড়ীর ভিতর আসিয়া শাশুড়ী ও নলিনীর মাতাকে প্রণাম করিতেছেন এমন সময়ে নলিনী ও তাহার ছোট ভাই বোনেরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, গৃহিণী সকলের পরিচয় দিলেন। নলিনীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এইটি আমার দেবরের বড় মেয়ে এরই বিবাহের ভাবনায় ঠাকুরপোর আমার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গেছে।" জলযোগান্তে ললিতমোহন বসিলে গৃহিণী নলিনীর বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা তুলিলেন। নলিনী ললিতমোহন আসিলে কত গল্প করিবে ঠাট্টা করিবে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই তাহার বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিল বলিয়া সে বড়ই দমিয়া গেল তাহার মুখে একটী কথাও ফুটিল না সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(৫)

চন্দ্রনাথ রায় একজন বনিয়াদি বড় গৃহস্থ। কলিকাতায় তাঁহার তিন চারি খানা বাড়ী সহরতলীতে দুই খানা বাগান, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি যাহা যাহা থাকিলে অধুনা বড় মানুষ হওয়া যায় তাঁহার সে সব কিছুরই অভাব নাই, এতদ্ব্যতীত মহাজনী কারবারেও তাঁহার বিস্তর টাকা খাটিতেছে। সুদ আদায় সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু দ্বিতীয় 'সাইলক' বিশেষ কিন্তু সে কথা থাক্। সর্ব্বোপরি চন্দ্রনাথ বাবু তিনটি পাশ করা পুত্রের পিতা তন্মধ্যে দুইটি অবিবাহিত সুতরাং তাঁহার অহঙ্কার যে অপরিমেয় একথা বলাই বাহুল্য।

চন্দ্রনাথ বাবুর বৃহৎ বৈঠকখানা গৃহ আজকাল কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবক ও ঘটক সমাগমে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। কারণ তাঁহার মধ্যম পুত্রটি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ছেলেটি অতিশয় সুশ্রী ও সচ্চরিত্র। সুতরাং কন্যাদায়গ্রস্ত মাত্রেই যে চন্দ্রনাথ বাবুর শ্রীচরণে তৈল মর্দ্দনে অগ্রসর হইবেন ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু তাঁহার

ধনুর্ভঙ্গ পণ শ্রবনে বহু ব্যক্তিই ভগ্নমনোরথ হইয়া পশ্চাৎ পদ হইয়াছেন। অদ্য চন্দ্রনাথ বাবুর বৈঠকখানায় হরিশবাবু এবং শ্যাম বাবুও ছিলেন। ইহারা নলিনীর বিবাহার্থে পাত্র অন্বেষনে যান নাই এমন স্থান কলিকাতায় খুব কমই আছে। কিন্তু কোন স্থানেই হরিশবাবু তাঁহার মনোমত পাত্র পান নাই। কোথাও বর ভাল কিন্তু ঘরে কিছুই নাই অথবা কুলহীন, কোথাও অবস্থা কিম্বা কুল হয়ত মন্দ নহে কিন্তু বর মূর্খ বা অসচ্চরিত্র অথবা সুশ্রী নহে। দুই তিনটি স্থানে মনোমত পাত্রও হয়ত পাইয়াছিলেন কিন্তু তথায় দেনা পাওনা বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন—এইরূপ। ফলকথা প্রায় একমাস মধ্যে দিবারাত্রি সমভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়াও কোথাও সুবিধা হয় নাই। চন্দ্রনাথ বাবুর পুত্রটি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ও সুশ্রী। চন্দ্রনাথ বাবুও ধনে মানে কুলে শীলে কোন বিষয়েই সমাজে হীন নহেন। এ প্রকার সুপাত্র সহসা মিলে না। এদিকে চন্দ্রনাথ বাবুর পণও হরিশবাবুর সাধ্যাতিরিক্ত। ছুটীও ফুরাইয়া আসিতেছে কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া হরিশবাবু বিষম চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভাবিবারও সময় বেশী নাই ছুটী ফুরাইল আবার সম্মুখে চৈত্র মাস। হরিশবাবু স্থির করিলেন "যে রূপেই হউক সর্ব্বস্ব ব্যয়ে অথবা ঋণগ্রস্ত হইয়া যে রূপে হয় এই পাত্রেই নলিনীর বিবাহ দিব আমার ভাগ্যে যাই হউক মেয়ে ত আজীবন কোনও কষ্ট পাইবে না সেই যথেষ্ট।" তাই আজ তিন দিন যাবৎ চন্দ্রনাথ বাবুর বৈঠকখানায় উভয়ে যাতায়াত করিতেছেন, কাকুতি মিনতি খোসামোদ কিছুতেই চন্দ্রনাথ বাবুর কঠিন পণ এ পর্য্যন্ত টলাইতে পারেন নাই। অদ্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে উঠিয়া গেলে শ্যামবাবু বলিলেন—"তবে রায় মহাশয়, আমাদের প্রতি কি অনুমতি হয়?" রায় মহাশয় উত্তর দিলেন "অনুমতি আর কি বলুন আমার বক্তব্য যা তা তো সবই প্রায় বলেছি। আমার নিজের এ বিষয়ে কোনই হাত নাই বাড়ীর ভিতর হইতে যে বন্দোবস্ত হয়েছে তার অন্য রকম করিতে আমি পারি না। আপনাদের সহিত কুটুম্বিতা ত আমার শ্লাঘার বিষয় কিন্তু কি করি মহাশয়, আমার কোনও হাত নাই।" হরিশবাবু কাতরভাবে বলিলেন "মহাশয় আমি দরিদ্র, আপনি দয়া না করিলে আমার আর উপায়ান্তর নাই আপনি একবার বাড়ীর ভিতর বলিয়া দেখুন"—"না না সে কথা মনেও স্থান দিবেন না সেখানে কিছু হইবে না। বড় ছেলের বিবাহ আমি স্বেচ্ছামত দিয়াছিলাম কিন্তু গৃহিণীর তাহা মনোমত হয় নাই, এজন্য মেজ ছেলেটির বিবাহের সমস্ত বিষয় তিনি নিজের হাতে রাখিয়াছেন। শ্যাম বাবু ও হরিশ বাবু পুনর্ব্বার বলিলেন "তবে মহাশয় আমাদের উপায়! আমরা যে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া আপনার ভরসায় আছি।" কিন্তু কিছুই হইল না, চন্দ্রনাথ বাবুকে আর অধিক বাক্যব্যয় করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া উভয়ে বিদায় চাহিলেন। আসিবার সময় বলিলেন "মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমরা কাল সন্ধ্যাকালে আবার আসিব।"

(৬)

চন্দ্রনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ তাঁহার গৃহিণীর মনোমত হয় নাই—তিনি হরিশ বাবুদিগের নিকট একথা বলিয়াছিলেন ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক সত্য। চন্দ্রনাথ বাবু ধন লোভে কন্যাটি দেখিয়াও দেখেন নাই কিন্তু গৃহিণীর নিকট অতি সুরূপা সুন্দরী বলিয়াছিলেন। বিবাহ হইয়া গেলে—বধূ দেখিয়া গৃহিণী রোদন করিতে বসিলেন, তাঁহার পুত্রদিগের কেহ কুৎসিত নহে, কন্যাদ্বয় পরমা সুন্দরী তিনি নিজেও লক্ষ্মীরূপিনী—সকলেই ইহা বলিত, তাঁহার বড় আদরের বড় যত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সে কিনা কালো কুৎসিৎ হইল! গৃহিণীর আর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। গৃহিণীর রোদন বিবরণ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু অন্তঃপুরে গমন করিতে শঙ্কিত হইলেন। যাহা হউক এ নিমিত্ত চন্দ্রনাথবাবু এমন শিক্ষা পাইলেন যে, প্রতিজ্ঞা করিলেন আর দুই পুত্রের বিবাহে তিনি কখন কন্যা দেখিবেন না গৃহিণীর উপরেই সে ভার রহিল। এখন মেজ ছেলের বিবাহের কথা উঠিতেই গৃহিণী বলিয়াছেন—"দেনা পাওনার আমি কিছু জানিও না বুঝিও না। কিন্তু আমি মেয়ে দেখিয়া পছন্দ করিলে তবে কথা দিও তাহার পূর্ব্বে নহে।" বড় ছেলের বিবাহের কথা চন্দ্রনাথ বাবু ভুলেন নাই সুতরাং সম্মত হইলেন।

ঘটকী আসিয়া একদিন রায় গৃহিণীকে জানাইল—"হরিশ চৌধুরীর মেয়ের মত সুন্দরী মেয়ে সে আর দেখে নাই—তিনি যেমন সুন্দর বউ চান—তা হতেও মেয়ে সুন্দরী।" গৃহিণী সুন্দরী বউ চাহেন সে গরীবের মেয়েই হউক আয় ধনীরই হউক। কর্ত্তাকে বলিলেন—"হরিশ চৌধুরীর মেয়েটি নাকি বড় সুন্দরী?" ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কর্ত্তা বলিলেন—"কে বলিল?" "মতি ঘটকী আজ এসেছিল, সেই বলেছে বড় সুন্দরী। অমন সুন্দরী নাকি দেখা যায় না আর হরি চৌধুরী ত কুলেও খাটো নয়।" কর্ত্তা ঈষৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন "ও সব কথা তুমি শোন কেন—হরিশ চৌধুরী কুলে যদিও খাটো নয়—কিন্তু বড় গরীব—কিছু দিতে থুতে পারবে না—গরীবের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চাও নাকি?" গৃহিণী মুখ ভার করিয়া বলিলেন—"আমি গরীব বড় মানুষ বুঝি না—আমার বউটী সুন্দর হলেই হলো, এইত কত জায়গায় কত মেয়ে দেখে এলুম—যদি হরিশ চৌধুরীর মেয়ে সুন্দর হয় তবে তোমাকে সেখানেই রাজেনের বে দিতে হবে। আমি ঘট্‌কীকে বলেছি কাল গিয়ে মেয়ে দেখে আস্‌বো।" চন্দ্রনাথ বাবু প্রমাদ গণিলেন তিনিও শুনিয়াছিলেন—মেয়েটি সুন্দরী, গৃহিণীর যদি দেখিয়া পছন্দ হয়—তবেই সর্ব্বনাশ। তিনি নগদ ৫ হাজার, দেড় শত ভরি সোণা, চাঁদির বাসন ইত্যাদি নানা বহুমূল্য সামগ্রী ছেলের বিবাহে সংগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন—এইবার সব মাটী হয়, কেন না দরিদ্র হরিশ চৌধুরী কিছুতেই এত দিতে পারিবে না। অথচ গৃহিণীর ক'নে পছন্দ হইলে বিবাহ দিতেই হইবে। চন্দ্রনাথ বাবুকে লোকে স্ত্রৈণ বলিত; তিনি স্ত্রৈণ হউন বা না হউন গৃহিণীকে যে ভয় করিয়া চলিতেন এ কথা সত্য। বিবাহের অগ্রে শ্বশ্রূর ভাবী বধূদর্শন স্থলবিশেষে প্রাচীন প্রথাবিরুদ্ধ হইলেও রায় গৃহিণী যথা সময়ে গিয়া নলিনীকে দেখিয়া আসিলেন। উদার মতাবলম্বী পিতৃগৃহের শিক্ষার ফলে কোন কোন প্রাচীন প্রথার তিনি বড় পক্ষপাতিনী ছিলেন না।

নলিনীর কোমল মধুর লাবণ্যে রায় গৃহিণী মুগ্ধ হইলেন—এই টুকটুকে মেয়েটি যদি তার বউ না হয় তবে সবই বৃথা। গৃহিণী বুঝিয়াছিলেন গরীব বলিয়া এখানে বিবাহ দিতে কর্ত্তার মত নাই। কিন্তু হইলে কি হয় গৃহিণী সংকল্প করিলেন—এই গরীবের ঘরেই ছেলের বিবাহ দিবেন—এমন মধুর লাবণ্য ধনীর গৃহে সব সময়ে দেখা যায় না। পরিশেষে কর্ত্তার সহিত মতভেদে গৃহিণীই জয়ী হইলেন এ কথা বলা বাহুল্য।

(৭)

তাহার পরে হরিশ বাবু ও শ্যাম বাবু আসিয়া পূর্ব্ব মত চন্দ্রনাথ বাবুর বহু স্তুতি মিনতি করিলে চন্দ্রনাথ বাবু প্রথমে পূর্ব্বমত দৃঢ়তা দেখাইলেন তার পরে বলিলেন, "আচ্ছা আমি সম্মত হইলাম, কিন্তু নগদ তিন হাজার দিবেন। আর এক শত ভরি সোনা দিবেন। ইহাপেক্ষা কম হইলে আমি অপারক হইব, জানিবেন। দান সামগ্রীর কথা আর বেশী কি বলিব—প্রথা-মত সকলই দিবেন—তার কিছু ইতর বিশেষ করিবেন না। আমি গৃহিণীকে বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি এই প্রকারে রাজী হইয়াছেন।" হরিশবাবু অনেক অনুরোধে একশত ভরি সোনার স্থলে আশি ভরিতে রাজি করাইলেন। আর কিছুই কমাইতে পারিলেন না। চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন "আমার কথা ও আপনাদের কথা কাহারও কথা বজায় না থাকিয়া এই মাঝামাঝি রফা হইল। ইহার পরে আর আপনারা কিছু অনুরোধ করিবেন না। ইহাতে সম্মত হন ভালই নচেৎ আমার সহিত কুটুম্বিতার আশা আপনারা ত্যাগ করুন।" অগত্যা হরিশ বাবু ও শ্যাম বাবু রাজি হইলেন—চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়া দিলেন—"আশি ভরি গিনি সোনা দিবেন—আমি বউ মাকে গহনা যা দিতে হয় সব গড়াইয়া দিব। কারণ সেকরারা বিবাহের গহনা প্রস্তুত করিতে বড় তঞ্চকতা করে। ইহাতে আপনারাও মজুরীর হাঙ্গামাটা বাঁচিয়া যাইবেন—কেমন রাজি আছেন ত?" শ্যাম বাবু ও হরিশ বাবু আর উপায় নাই দেখিয়া বলিলেন "কাজেই আপনি যখন আর কিছুই কমাইবেন না তখন নিতান্ত বাধ্য হইয়াই আমরা সম্মত হইলাম। আর উপায় কি?"—তখন অন্যান্য বিষয় এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া দান সামগ্রী প্রভৃতির ফর্দ্দ লইয়া উভয়ে বাটী ফিরিলেন।

(৮)

বাটী আসিয়া কি উপায়ে টাকা সংগ্রহ হইবে ভাবিয়া হরিশ বাবু আকুল হইলেন। তাঁহার হাতে দুই হাজার টাকা মাত্র আছে, অবশিষ্ট টাকা কিরূপে যোগাড় হয়? অনেক চেষ্টায় ভদ্রাসনখানি বাঁধা রাখিয়া আর দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। শ্যাম বাবু নিজেই ঋণগ্রস্ত সুতরাং তিনিও যৎসামান্য কিছু সাহায্য করিলেন। কোনরূপে আর সমস্তই হইল—কেবল মাত্র নগদ যে তিন হাজার দিতে হইবে তাহার এক হাজার টাকা অকুলান রহিল।

২৭সে ফাল্গুন বিবাহ, ২৬শে পর্য্যন্ত সে টাকার যোগাড় হইল না দেখিয়া হরিশ বাবু নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া শ্যাম বাবুকে বলিলেন—"ভাই এখন উপায় কি করি বল—তুমি আমার বল ভরসা সমস্তই—আমি আজীবন প্রবাসী। আমাকে কেই বা জানে আর চেনে, তুমি যদি এ টাকার যোগাড় না করিতে পার তবে সমস্তই যে গেল।"—শ্যাম বাবু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"ভাই অত ভাবিও না—দেখিতেছ আমি টাকার জন্য কত ঘুরিতেছি, কি করি বল—অদৃষ্ট ক্রমে কোথাও টাকা পাইতেছি না—শ্যামবাজারের সেই ভদ্রলোক তো টাকা দিবেন বলিয়াছেন—আজ কি কাল দিবেন, এই রকম বলিয়াছেন। যদি অদৃষ্ট ক্রমে এখানেও না হয় তাহা হইলে রায় মহাশয়কে বলিয়া কহিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া কোন রকমে কাজ সমাধা করিলেই চলিবে।" হতাশ ভাবে হরিশ বাবু বলিলেন—"আমার তো মনে হয় না যে রায় মহাশয় টাকা না পাইলে বিবাহ হইতে দিবেন—তিনি সে রকম লোক হইলে আর ভাবনা কি ছিল। এই কয়দিন ধরিয়া তাঁহার কত খোসামোদই না করিলাম—তবু তাঁর ফল এমন কি বেশী হইল। এমন স্তুতি মিনতি কোন দেবতাকে করিলে তিনিও বোধ হয় সদয় হন—কিন্তু রায় মহাশয়ের মন কি কঠিন, একটুও ভিজিল না। কি যে হবে আমি ত কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না।" "তুমি অনর্থক চিন্তা কর, দেখিও সব সুরাহা হইয়া যাইবে। রায় মহাশয় সহজে সম্মত না হন—একখানা হ্যাণ্ড নোট লিখিয়া দিলেই চলিবে, আমরা ত আর তাঁহাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করিতেছি না, কেন তিনি সম্মত হবেন না? তোমার কোনও ভাবনা নাই।" শ্যাম বাবু মুখে বলিতেছেন ভাবনা নাই—কিন্তু রায় মহাশয়ের প্রকৃতি তিনি কতকটা না জানিতেন এমন নয়—তবে তাঁহার আশা ছিল যে টাকা পাওয়া যাইবে। কেননা

যিনি টাকা দিবেন তিনি অতি সদাশয় মহৎ ব্যক্তি; কোন দৈব ঘটনা ব্যতীত তাঁহার নিকট টাকা পাইবার পক্ষে আর কোন বাধা নাই। এই আশ্বাসেই তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

(৯)

২৭শে ফাল্গুন, আজ নলিনীর বিবাহ। শ্যাম বাবুর আবাস বাটী পত্রপুষ্প পতাকায় সুসজ্জিত উজ্জ্বল আলোক মালায় সুশোভিত হইয়া উৎসব আনন্দে ভাসমান, হর্ষ কোলাহলে মুখরিত হইতেছে। বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক কুটম্ব কুটম্বিনী বালক বালিকা দাস দাসী প্রভৃতিতে বাটীতে আর তিল ধারণের জায়গা নাই। নিমন্ত্রিতগণ আলোকে উজ্জ্বল সভামণ্ডপ জমকাইয়া বসিয়াছেন—অবিরত হাস্য কৌতুক ও আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। অন্তঃপুরে সর্ব্বাপেক্ষা সমারোহ—বিবিধ উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কার শোভিতা বিচিত্রবর্ণ বহুমূল্য বসন পরিহিতা নিমন্ত্রিতাগণ হাস্য কৌতুক আনন্দরাশি বর্ষণ করিয়া পুষ্পসার এবং আতর গোলাপের সৌরভ ছড়াইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছেন ফিরিতেছেন কেহ বা কোন কার্য্যে যোগদান করিতেছেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে একটি বৃহৎ কক্ষে যুবতীবৃন্দ কন্যা সাজাইতে বসিয়াছেন—কক্ষ মধ্যে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে; পুষ্প ও গন্ধ দ্রব্যের সৌরভরাশিতে মৃদু মন্দ মলয় বায়ু যেন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সকলে কন্যাকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। দুই জন তাহার কেশ-বিন্যাসে রত হইয়াছেন আর কয়েকজন বস্ত্রালঙ্কারে অলকা তিলকায় তাহাকে সজ্জিতা শোভিতা করিতেছেন। লজ্জাবনতমুখী নলিনী নিঃশব্দে যুবতীগণের শত অত্যাচার শত রহস্যবাণী সহ্য করিতেছে। সহসা অদূরে তুমুল বাদ্যোদ্যম শ্রুত হইল। সকলে বলিয়া উঠিল—"বর আসিয়াছে, বর আসিয়াছে," বালক বালিকাদল কোলাহল করিতে করিতে বহির্বাটী অভিমুখে ছুটিল—যুবতীগণ ছাদে গবাক্ষে বারান্দায় যিনি যেখানে সুবিধা পাইলেন বরদর্শন আশায় ত্রস্ত গমনে চলিলেন।

(১০)

সুসজ্জিত বিবাহ-মণ্ডপ, পত্র পুষ্প ও আলোকমালায় পরম রমনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। সভা-মণ্ডপ পূর্ণ করিয়া নিমন্ত্রিতগণ বসিয়াছেন, হাসি তামাসা খোসগল্প

এবং সুবাসিত পান তামাক অনবরত চলিতেছে। আতর গোলাপ মুহুর্মুহু সভামধ্যে বর্ষিত হইতেছে। বিবাহ বেদিকার এক পার্শ্বে দান সামগ্রী-সম্ভার সজ্জিত হইয়াছে। বরকর্ত্তা স্বয়ং চন্দ্রনাথ বাবু সেগুলি পরিদর্শন করিতেছেন, তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। দান সামগ্রী কিছুই তাঁহার মনোমত হয় নাই, তাঁহার মতে সমস্তই 'খেলো' হইয়াছে। তাই নানারূপে কখন ভাবে কখন ইঙ্গিতে কখন বা বাক্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন। হরিশ বাবু বৈবাহিক মহাশয়ের আচরণ দর্শনে অন্তরে অন্তরে কম্পিত হইতেছিলেন—অবশিষ্ট এক হাজার টাকা এখনও সংগ্রহ হয় নাই, ললিতমোহন সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্যামবাজারে গিয়াছেন, এখনও ফিরিলেন না। কি উপায় হইবে তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন।

ক্রমে লগ্ন নিকটবর্ত্তী হইল, চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন "কই চৌধুরী মহাশয় কোথায় আসুন এই বেলা টাকার হেঙ্গামটা চুকিয়ে ফেলা যাক, এদিকে তো যা কর্‌বার কোরেছেন আর উপায় কি?" হরিশ বাবু ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, শ্যামবাবু প্রমাদ গণিলেন—এই সময়ে ললিতমোহন আসিয়া জানাইলেন—"না, আজ আর হইল না, কোনও দৈবদুর্ব্বিপাকে মহাজন বিব্রত। আজ কিছুতেই হইবে না।"—অগত্যা হরিশ বাবু নগদ দুই হাজার টাকা ও গিনি প্রভৃতি সভাস্থ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে চন্দ্রনাথ বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি কন্যাদায়গ্রস্ত, বিপন্ন, নিতান্ত দরিদ্র, মহাশয় অতি মহানুভব এবং সদাশয়, যদি আপনি আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমার এত অক্ষমতাই সহ্য করিয়াছেন তবে আরও একটু করুন। আমি আপনার মর্য্যাদা হিসাবে নগদ ৩ হাজার টাকার স্থলে—অগ্য দুই হাজার মাত্র"—কথা সমাপ্ত না হইতেই চন্দ্রনাথ বাবু সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন "ওসব জুয়াচুরীর কথা আমি শুনিতে চাই না—৫ হাজার স্থলে ৩ হাজারে সম্মত হইয়াছি বলিয়াই কি আমাকে প্রতারিত করিতে চান? হয় সব টাকা চুকাইয়া দিন—না হয় আমি বর উঠাইয়া লইয়া যাইতেছি।" সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"শান্ত হউন আপনার ন্যায় ব্যক্তির কি এ প্রকার ক্রোধ শোভা পায়. ইহারা আপনার সহিত প্রতারণা করিবেন ইহা কি সম্ভব—আপনার টাকার জন্য হরিশ বাবু লেখাপড়া করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। আর আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমরা এ বিষয়ে জামিন হইতেও রাজি আছি। বর উঠাইয়া লইয়া যাইবেন তাহা কি ভদ্রতা সঙ্গত হইবে?" চন্দ্রনাথ বাবু পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন—"ভদ্রতা অভদ্রতা আমি বুঝি না—হয় টাকা দিন নচেৎ আমি বিবাহ হইতে দিব না। লেখাপড়া জামিন ওসব কিছুতে আমার দরকার নাই।" সকলে চন্দ্রনাথ বাবুকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইলেন হরিশ বাবু ও শ্যামবাবু কত স্তুতি মিনতি করিলেন তাঁহার পণ অটল—তিনি টাকা না পাইলে পুত্রের বিবাহ দিবেন না। পরিশেষে লগ্ন উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া হরিশ বাবু চন্দ্রনাথ বাবুর পদধারণ করিতে গেলেন, তাঁহার নেত্রে শতধারা বহিতেছিল, ভগ্ন স্বরে বলিলেন রক্ষা করুন আমার কুল, মান, জাতি সকলই আজ আপনার হাতে, আপনি দয়া না করিলে আমার আর উপায় নাই, দয়া করিয়া দরিদ্রকে কিনিয়া রাখুন।"—দুই পদ পশ্চাতে সরিয়া তীব্র স্বরে চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন,—"বৃথা চেষ্টা, আমাকে আর ভুলাইতে পারিবেন না, টাকা না পাইলে আর কিছুতেই আমি ভুলিতে পারি না, দরিদ্রের জাতি মান রক্ষাও করিতে পারি না।" শ্যামবাবু কাতরভাবে বলিলেন, "রায় মহাশয় লগ্ন উপস্থিত, কন্যা পাত্রস্থ করিতে অনুমতি দিন।" "না, টাকা না পাইলে সে অনুমতি দিব না, টাকা দিবে কিনা বল?" "কাল আপনার টাকা নিশ্চয়ই দিব আজ দয়া করুন। কাল অবশ্য টাকা দিব একবার আপনার কিসে বিশ্বাস হয় বলুন তাই করি।" "টাকা পাইলেই আমার বিশ্বাস হয় নচেৎ নহে।" "রায়মহাশয় কৃপা করুন আমাদের কুলমান বজায় রাখুন।" বিদ্রুপের স্বরে চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন "দরিদ্র জুয়াচোরের কুল মান আছে তাহা জানিতাম না। ভদ্রলোকের সহিত প্রতারণা করিতে কি কুল মানের হানি হয় না?" ক্রোধকম্পিতস্বরে শ্যামবাবু বলিলেন—"সাবধান হইয়া কথা বলিবেন, আমরা জুয়াচোর আর আপনি ভদ্রলোক! ভদ্রলোক হইলে এরূপ চণ্ডালের ন্যায় আপনার আচরণ কেন? চণ্ডালও আপনার আচরণে লজ্জা পায়!" ক্রোধে ক্ষোভে গর্জ্জিয়া চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন কি! আমার এত অপমান, টাকা দিতে না

পারিয়া কোথায় আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবে তা না আমাকেই গালাগালি ও অপমান! আর এখানে মুহূর্ত্তও না—"উত্তেজিত স্বরে শ্যামবাবু বলিলেন—"যান, চলিয়া যান আপনার ন্যায় চণ্ডালের পুত্রের সহিত আমরা কন্যার বিবাহ দিব না।" চন্দ্রনাথ বাবু রোষে ক্ষোভে কম্পিত কলেবরে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে গিয়া বিবাহবেশধারী পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া ত্বরিত পদে বাহির হইলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল অবিলম্বে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার অনুচর সহচরগণ ও বরযাত্রী-দল একে একে কর্ত্তার অনুগমন করিতে লাগিল।

(১১)

হরিশবাবু এতক্ষণ বজ্রাহতবৎ দণ্ডায়মান ছিলেন, এত অল্প সময় মধ্যে ঘটনাটা ঘটিল যে কেহ আর তাহার প্রতিরোধ করিতে সময় পাইলেন না। সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। হরিশবাবু উন্মত্তবৎ রোদন করিতে করিতে শ্যামবাবুকে বলিলেন—"ভাই একি সর্ব্বনাশ করিলে? তুমি ওরূপ রূঢ় আচরণ না করিলে আর এ সর্ব্বনাশ হইত না এত পরিশ্রম এত কষ্ট সব বৃথা হইল? তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি নিজেই বিফল করিলে—হায় হায় আমার সর্ব্বনাশ হইল।" শ্যামবাবু এতক্ষণ চিত্রপুত্তলীবৎ স্থির ভাবে ছিলেন, বলিলেন—"আমার প্রতিজ্ঞা কখনও বিফল হয় নাই আজও হইবে না।" যেখানে ললিতমোহন দাঁড়াইয়াছিলেন দ্রুতপদক্ষেপে শ্যামবাবু তথায় গিয়া জামতার হস্তধারণ করিলেন, বলিলেন—"আমার সঙ্গে এস" শ্যামবাবু বিস্মিত ললিত মোহনকে দ্বিরুক্তি করিবার অবসর না দিয়া বিবাহ স্থানে লইয়া আসিয়া বরের আসনে উপবেশন করাইয়া দিলেন। ললিতমোহন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি বলিলেন—"ললিত! আমি তোমার পিতৃস্থানীয় আমার আজ্ঞা তোমার অবশ্য পালনীয়। আমার সত্য রক্ষার্থে আমি তোমাকে এই বিবাহ করিতে বলিতেছি, তুমি কোন আপত্তি করিও না। আর আমি পিতা হইয়া একমাত্র কন্যার সপত্নী করিয়া দিতেছি, ইহাতে আমার অপেক্ষা আর কাহার অধিক ক্ষতি? তোমার মাতার অনুমতির জন্য চিন্তা করিতেছ কি? সে ভার আমার হাতে। আর সময় নাই লগ্ন উত্তীর্ণপ্রায়, প্রস্তুত হও।" তাঁহার স্বর স্থির, গম্ভীর, অত্যন্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক। স্তম্ভিতচিত্রপুত্তলিকাবৎ ললিতমোহন বরের আসনে বসিয়া রহিলেন, বিবাহ হইয়া গেল।

শ্রীঃ—

সমাপ্ত।

বৈদিক যুগে আর্য্যভূমি।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যে সভ্যতম জাতি তাহা আজ কাল এক প্রকার সার্ব্বজনীন সত্য। যে সময়ে আমাদের প্রাচীন পিতামহগণ বেদের মধুর ধ্বনিতে পঞ্চনদ প্রদেশ প্লাবিত করিতেছিলেন তখন জগতের অন্যান্য জাতি অজ্ঞানতার ও অসভ্যতার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভারতের এই প্রাচীনত্বের জন্যই আজ আমরা পরাধীন, পদানত হইয়াও সমস্ত সভ্য সমাজে সমাদৃত। ভারতের সহিত পরিচিত হইয়া আজ পাশ্চাত্য জাতিসকল জগতের প্রাচীনতম যুগের সভ্যতার ইতিহাস সন্দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। যতদিন আমরা ও আমাদের সর্ব্বস্বধন বেদ সকল তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল, তত দিন তাঁহারা ইতিহাস-জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনে সমর্থ হয়েন নাই। আজ আমরা তাঁহাদের সেই অভাব দূরীভূত করিয়াছি।

অনেকে মনে করেন, দেশস্থ শাসনকর্ত্তাগণের ধারাবাহিক কাহিনীর নামই ইতিহাস। একথা সত্য নহে। যাহা দ্বারা আমরা জাতির ভাষা, আচার ব্যবহার, নীতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয় অবগত হইতে পারি; তাহাকেই প্রকৃত ইতিহাস বলা যায়। এই হিসাবে জাতীয় সাহিত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস। ঋগ্বেদ জগতের প্রাচীনতম সাহিত্য। এই জন্যই ইহাকে সভ্য সমাজের সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা হয়। আমরা অদ্য জগতের ঐ প্রাচীনতম ইতিহাস হইতে সঙ্কলন করিয়া আমাদিগের পূজনীয় পিতামহগণ সম্বন্ধে কয়েকটি ঐতিহাসিক চিত্র প্রদান করিব। সেই প্রাচীন বৈদিক যুগের সহিত তুলনায় আমরা আজ উন্নত বা অধঃপতিত তাহা বলিব না। নিম্নলিখিত

বিবরণ হইতে পাঠক তাহা অবধারণ করিতে পারেন। শেষ কথা এই যে পূর্ব্ব পুরুষগণের ইতিহাস চিরকাল সর্ব্বত্র সমাদৃত। সেই ভরসায় আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা।*

বিশ্বজগতের ভূগোল।

হিন্দুগণের মধ্যে প্রধানতঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এই ভুবনত্রয়কে যদিও আবার অনেক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু মূলতঃ ঐ ত্রিলোকই প্রধান। কিন্তু আমাদের প্রাচীনতম ইতিহাস ঋগ্বেদে আমরা সচরাচর দুইটি লোকের মাত্র অস্তিত্ব প্রাপ্ত হই। তথায় উহাদিগকে খলোক ও ভূলোক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পাতালের নাম আমরা দেখিতে পাই না। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, আমাদের আর্য্য পিতামহগণ পাতাল সম্বন্ধে কোনও প্রকার মতামত পোষণ করিতেন না। এ সম্বন্ধে একজন বহুদর্শী লেখক বলেন যে, ঐ সময়ে আর্য্য কবিগণ পাপ ও পুণ্যের কোনও প্রকার পরিমিত পার্থক্য নির্দ্ধারিত করেন নাই। তখন তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, জীব মাত্রেই মরণ অবধি এই লোকে বাস করিয়া পরিণামে দ্যুলোকে প্রস্থান করে। পুণ্যাত্মা ও পাপীর জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রয়োজন হয়, ইহা তাঁহারা না বিশ্বাস করাতে পাতাল বা নরকের প্রয়োজনিতা অনুভব করেন নাই। বিশেষ, সভ্যতার সেই প্রথম যুগে তাঁহারা সম্মুখে যাহা দেখিতেন, তাহাই বিশ্বাস করিতেন। চক্ষুর অগোচর বস্তুর কল্পনা করিতে জানিতেন না। পশু-পক্ষী-মানব-সঙ্কুল সুবিশাল পৃথিবী ও মেঘ-নক্ষত্র-তারা-চন্দ্র-সূর্য্যসমন্বিত অনন্ত আকাশ দিন রাত্রি তাঁহাদের সম্মুখে বিরাজ করিত। এই জন্য তাঁহারা ঐ দুই লোকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। চক্ষুর অগোচর গভীর অন্ধকারময় পাতালের কল্পনা করিতে পারেন নাই।

এই স্থানে আর একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। প্রাচীনকালে যদিও আর্য্যগণের মধ্যে পাতালের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু দুই এক স্থানে নাগলোক বলিয়া এক নূতন লোকের কল্পনা দৃষ্ট হয়। † এই নাগলোক অধুনা পাতাল নামে অভিহিত হয়। কিন্তু বৈদিক যুগে উহা স্বর্গের উপরে কল্পিত হইত। পৌরাণিক ভূগোলে ঐ গোলোক-স্থানীয় নাগলোক যে কিরূপে আধুনিক পাতাল বা নরকরূপে পরিণত হইল, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করা বিশেষ দুরূহ।

পৃথিবীর ভূগোল।

ঐ প্রাচীন সময়ে আমাদের আর্য্য পিতামহগণের পৃথিবী সম্বন্ধে বিশেষ কোনও প্রকার জ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ঐরূপ আশা করাই আমাদের সমূহ অন্যায়। তখন সমস্ত পৃথিবী অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত। পঞ্চনদবাসী মুষ্টিমেয় ভারতবাসী তখন কেবলমাত্র সভ্যতার অস্পষ্ট আলোক উপলব্ধি করিতেছেন। তখন রাজনীতি সমাজনীতির অতি শৈশবাবস্থা। সভ্যতার সেই প্রথম যুগে মুষ্টিমেয় আর্য্য সন্তান তখন পঞ্চনদ ক্ষেত্রে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছেন। ঐ সময়ে পৃথিবীর ভূগোল-বৃত্তান্ত দূরে থাকুক, সমগ্র ভারতের প্রকৃত বিবরণ সম্বন্ধেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের নিকট পৃথিবীর ভূগোল আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেই পারে না। এই জন্য ঐ প্রাচীন যুগে আমরা আমাদের আর্য্য পিতামহগণকে পৃথিবীর ভূগোল সম্বন্ধে ঐরূপ অজ্ঞ দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষের ভূগোল।

প্রাচীন আর্য্যগণ যে সর্ব্বপ্রথম পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা ঋগ্বেদের খুব অল্প স্থানেই পঞ্চনদ ছাড়া ভারতের অপরাংশের বিবরণ প্রাপ্ত হই। যে দুই এক স্থানের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ঐ সকল প্রদেশ বা নগর সম্বন্ধে পিতামহগণের অভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প ছিল। পঞ্চনদ প্রদেশ সম্বন্ধে যে তাঁহারা বিশেষ কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ বিবরণও আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই না। ইহাতে বোধ হয় যে, তাঁহারা তখন পঞ্জাবের সর্ব্বত্রও উপনিবেশ সংস্থাপন করেন নাই, সিন্ধু ও সরস্বতীর তটে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন যুগে পিতামহগণ ঐ প্রবাহিনী-কূলে সুনির্ম্মিত শান্তিভাবপূর্ণ আশ্রমসকল নির্ম্মাণ করিয়া বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ ঋগ্বেদের পত্রে পত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ঋগ্বেদের যে সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সঙ্কেত এই প্রকার—প্রথম নম্বরটি অষ্টক, দ্বিতীয়টি অধ্যায়; তৃতীয়টি মণ্ডল, চতুর্থটি সূক্ত ও পঞ্চমটি শ্লোকনির্ণায়ক। যেখানে ৭-৫-৯-১১৩-৬ আছে, সেখানে সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম মণ্ডল শতাধিক ত্রয়োদশ সূক্ত ও ষষ্ঠ শ্লোক বুঝিতে হইবে।

† ঋগ্বেদ—সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম মণ্ডল, শতাধিক ত্রয়োদশ সূক্ত, নবম শ্লোক।

পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ভারতবর্ষীয় ভূগোল-জ্ঞান সম্বন্ধে বলেন—"তাঁহারা উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে আরবসাগর, পশ্চিমে সুলেমান পর্ব্বত ও পূর্ব্বদিকে যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ভিন্ন ভারতের অপর কোনও স্থানের কিছুই জানিতেন না। *

সম্পূর্ণ জীবন যিনি ভারতের চিরগৌরব-ধন ঋগ্বেদ আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সমীচীন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তাঁহার অভিজ্ঞতার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

ভারতবর্ষীয় নদ নদী।

ঐ প্রাচীন যুগে সিন্ধু, শতদ্রু, পরুষ্ণি (Ravi), অসিক্লী (Chinab), বিতস্তা (Jhilam), আজিকীয়া (Bias), সপ্তনদী (Bewa), সরস্বতী, সরযূ, গোমতি ও গঙ্গার উল্লেখ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে শেষের স্রোতস্বিনীত্রয়ের যে ভাবে উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে আর্য্যগণ তাহাদের বিষয় বিশেষ কিছু জ্ঞাত ছিলেন না। প্রথমোক্ত নদ ও নদী কয়েকটির মধ্যে আবার সিন্ধুর উল্লেখ-বাহুল্য দর্শনেই আমরা উপরে বলিয়াছি যে আর্য্যেরা ঐ সময়ে এই নদের উপকূলে বাস করিতেন। এমন কি ঐ সকল নদীর মধ্যে এক মাত্র সিন্ধুরই উৎপত্তি ও পতন স্থান নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এবং তৎসম্বন্ধে কতকটা সাফল্য ও লাভ করিয়াছিলেন। (৮-২-১০-৬৪-৯ ও ৮-৩-১০-৭৫-৫-৬)

নদ নদীর উৎপত্তি।

প্রাচীন সময়ে নদনদীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর্য্যগণ বড় অদ্ভুত অথচ সুন্দর মত পোষণ করিতেন। একস্থানে আমরা ঐ বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা পাঠ করি। "দেবতারা আসিলেন, কুঠার ধারণ করিলেন, জল কাটিয়া দিলেন, মনুষ্যদিগের উপকারার্থ জল বর্ষণ করিলেন। নদী মধ্যে সেই জল রাখিয়া দিলেন। আর যে স্থানে মেঘের মধ্যে জল দেখেন তাহা দগ্ধ করিয়া বাহির করিয়া দিলেন।" (৭-৭-১০-২৪-৪) এই কল্পনাটি যে সেই সেই প্রাচীনতম যুগের প্রথম সভ্যজাতির পক্ষে সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষীয় দেশ সকল।

আর্য্য ঋষিগণ যে সমস্ত জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম আধুনিক জগতে সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুই এক স্থানে বেতসু নামক স্থানের নাম দেখিতে পাওয়া যায় (৮-১-১০-৪৯-৪)। এই স্থান সম্বন্ধে বহুবিধ মতভেদ আছে। অনেকে ইহাকে আধুনিক কাশ্মীর বলিয়া মনে করেন। আবার অনেকে ইহাকে নেপাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্থানটার আধুনিক নাম, যাহাই হউক, উহা যে ঐ সময়ে একটি বিশেষ মনোহর স্থান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত সূক্তের শ্লোকে আমরা বুঝিতে পারি যে ইন্দ্র এক সময়ে কুৎস নামক জনৈক ব্যক্তির প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া ঐ প্রদেশ তাহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ঐ শ্লোকের শেষে বলিতেছেন "আমি পুত্রের ন্যায় তাহাকে ঐ প্রিয় বস্তু প্রদান করি।" নবনবতি নগর আমরা বহু স্থানে দেখিতে পাই—কিন্তু উহার বিষয়ে কোনও সঠিক বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। পিতামহগণ ঐ নগর সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে উহা যে এক সময়ে দাস বা অনার্য্য জাতির আয়ত্ত্বাধীন ছিল তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। (৭-১-৯-৬:-১) এইরূপ আরও অনেক স্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আর্য্যেরা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হই। ঐ সময়ে ভারতের অন্যান্য স্থানে যে, তাঁহারা বসবাস না করিয়াছিলেন এমত নহে। কিন্তু তথায় অনার্য্য-বাহুল্য দর্শনে তাঁহারা বোধ হয় কেবল মাত্র পঞ্চনদ প্রদেশকেই যজ্ঞোপযোগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৮-১-১০-৫৩-৫) ঐ সময়ে তাঁহারা সংখ্যায় খুব কম ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা প্রায়ই আদিম উপনিবেশ

* Max Muller's India : What can it teach us ? 1883 PP. 168, 174.

পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে সাহস করিতেন না। আর যাঁহারা এরূপ অসমসাহসের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে প্রায়ই চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক আক্রমিত ও পর্য্যুদস্ত হইতেন এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। এই সমস্ত দেখিয়াই তাঁহারা পঞ্চনদ প্রদেশকেই যজ্ঞাদি কার্য্যে সর্ব্বপ্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

দিন গণনা।

থাক তুমি যবে সেই সুদূর প্রবাসে
আমি সুধু নিশি দিন এক মন প্রাণে
গণি দিন মুখখানি দেখিবার আশে,
সারাদিন চেয়ে থাকি দিবাকর পানে
কবে তার অস্ত সনে একটি দিবস
বিরহের মালা হতে যাবে গো খসিয়া!
সারা রাত্রি কর্ম্মশ্রান্ত বিরহ বিবশ,
মুখর মিনিটে গণি নীরবে বসিয়া।
কাটেনা গো বিরহের দীর্ঘ দিন গুলি,
মনে যেন বোধ হয় শতেক বৎসর;
বুকেতে পরাণ করে আকুলি বিকুলি,
বিরহের দিন যত হয় হ্রস্বতর।
সাত ছয়, পাঁচ চার তিন দুই এক,
আশায় উৎফুল্ল হয় পরাণ আমার,
এই এস এই এলে, কল্পনা শতেক
খেলে মনে কত খেলা যত খুসী তার।
তারপর দিব্য ওই চরণ-পরশে,
ফুটে ওঠে যাই এই হৃদয়ের ফুল,
সুবাসে রোমাঞ্চ তনু পুলক হরষে
আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্রাণ হয়গো আকুল—
অমনি পশ্চাতে পড়ে বিরহের ছায়া,
শঙ্কায় কম্পিত প্রাণ পুন দিন গণে,
এক না গণিতে দুই মিলায় গো কায়া,
চার ছয় দশ বিশ চলে এক সনে—
যেন দ্রুত পক্ষধর—দেখিতে দেখিতে
ক্ষুদ্র সুখ-মাস মোর চকিতে ফুরায়,
সুখের মিলন মনে বুঝিতে বুঝিতে
বিরহের দিন আসি সম্মুখে দাঁড়ায়।
কঠোর কর্ত্তব্য তোমা লয় ছিনাইয়া
অপলকে চেয়ে রয় সজল নয়ন,
মঙ্গল বাসনা সনে বিদায় করিয়া
হৃদয় চাপিয়া রাখে মরম ক্রন্দন!
আবার গণি গো দিন আশার মায়ায়,
মুছি আঁখি ভাবি মনে ভবিষ্য মিলন,
সারা বর্ষ এইরূপে স্মিরিতি ছায়ায়
দিন গণি কাটে মোর দুঃখের জীবন।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

সৌন্দর্য্যের হাট।

(সিপির মেলা)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, খৃষ্টীয় ১৮২৭ অব্দে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি তদানীন্তন বড় লাট লর্ড আমহার্ষ্ট কর্ত্তৃক সুখশান্তিময় সিমলা শৈলের যে সাধের নিদাঘ-নিকেতন সংস্থাপিত হইয়াছিল, এই সুদীর্ঘ কাল-সহকারে, নিত্য নব আয়োজন-সম্ভারে, তাহা এখন সুরম্য রাজপ্রাসাদে পরিণত হইয়াছে; আর প্রকৃতির বিনোদ ক্ষেত্রে ইংরাজের উদ্ভাবনী শক্তি মিলিত হইয়া সিমলা শৈল মর্ত্তধামে স্বর্গের সুষমা বিস্তার করিতেছে। কিন্তু শিক্ষিতের সমাজমন্দির হইতে লাট-দপ্তরের 'বাবু'গণের অন্তঃপুরপ্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত সে কথার আর নূতনত্ব কিছু নাই। পুস্তকে ও পত্রে, আলেখ্যে ও আলোকচিত্রে সর্ব্বত্র আপনি সিমলার সুদীর্ঘ ও সরস কাহিনী শুনিতে বা নয়নবিমোহন দৃশ্যাবলী দেখিতে পাইবেন। আর

ভৃতিভুক্ কেরাণীকুলের অনুগামিনী অঙ্কলক্ষ্মীগণ সিমলার সৌন্দর্য্যশ্রী ত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে সে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। তবে সিমলার সৌন্দর্য্য-কাহিনীর এক অধ্যায়, পাহাড়ের নিম্নে বহুদূর, বোধ হয়, আজ পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই; স্বদেশী বা প্রবাসী বাঙ্গালী সমীপে তাহা নিবেদন করায় বিশেষ প্রত্যবায় দেখি না।

বৈশাখ বিগত। নৈদাঘ মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন কিরণ বঙ্গদেশের ন্যায় নিতান্ত প্রাণ-মন-বিদগ্ধকারী না হইলেও, সিমলার শৈলশিখরে তাহার প্রতাপ বড় অল্প নহে। সেই মধ্যাহ্ন রবি মস্তকে করিয়া সারি সারি লোক—কেহ পদব্রজে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা রিক্‌শ বাহনে— সিমলার চতুর্দ্দিক হইতে পরমোৎসাহে মশব্রার পথে চলিয়াছে। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ইংরাজ-বাঙ্গালী, পঞ্জাবী-হিন্দুস্থানী, হিন্দু-মুসলমান, জৈন-খৃষ্টান—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নানা শ্রেণীর নানা বয়সের নর-নারী সমান উৎসাহে একই উদ্দেশে অগ্রসর হইয়াছে। পার্ব্বত্যপথ জনস্রোতে পরিপূর্ণ। ব্যাপার কি?—'সিপির মেলা'—সকলের মুখে একই কথা—'সিপির মেলা'। মেলা ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-মহিলারও অসদ্ভাব নাই; তিন বা ততোধিক পুরুষ-বাহিত রমনীয় রিক্‌শ-রথে আরোহণ করিয়া নানা বেশে সুসজ্জিতা ব্রিটিশকুললক্ষ্মীগণ মেলার শোভা দর্শন, পরন্তু মনোহারিত্ব বর্দ্ধন কল্পে পশ্চাৎপদ নহেন। অধিক কি, কোন কোন লাট সাহেবও সময়ে সময়ে সস্ত্রীক শকটারোহণে মেলাস্থলে সমুপস্থিত হইয়া মেলার গৌরব-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। চিরানুগত ব্যবস্থা-বশে, * এই মেলা উপলক্ষে সরকারী আফিস-সমূহও বন্ধ হইয়া থাকে। 'দিল্লীর লাড্ডু'বৎ এহেন মেলার সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে উপভোগ করিতে কাহার না সাধ হয়? সেই সাধ মিটাইবার জন্য রিক্‌শর সাহায্যে আমরাও গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম। এ পথে রিক্‌শই প্রকৃষ্ট যান। মেলা উপলক্ষে তাহার চতুর্গুণ মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে; এই অযথা অর্থব্যয় সহ্য করিয়াও মেলার অপরূপত্ব দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারিলাম না—উষ্ণবায়ু-সঞ্চারিত ধূলিকণার ধূসরিত হইয়া মেলা দর্শনে চলিলাম।

মশব্রা* পথে প্রায় তিন ক্রোশ অতিক্রম করিয়া রিক্‌শ নিম্নপথে অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ নামিতে নামিতে পাহাড়ের তলদেশে আমরা যেন পাতালপুরে উপনীত হইলাম। বস্তুতঃ উহা পর্ব্বতের সানুদেশস্থ এক উপত্যকা-ভূমি বা নাতিপ্রকাণ্ড প্রান্তর। এই স্থানেই মেলা হইয়া থাকে। ইহা স্থানীয় পার্ব্বত্য ভূস্বামী কোটি-রাজের অধিকারভুক্ত। কোটীরাজ ইংরাজরাজের প্রজা নহেন—রাজস্ব বা মর্য্যাদাকল্পে নিতান্ত নগণ্য হইলেও, আপন অধিকার মধ্যে, অন্যান্য মিত্ররাজ্যের ন্যায়, ইঁহার যথেষ্ট প্রভুত্ব চলিয়া থাকে। ইঁহারই কৌলিক ইষ্টদেবতার সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে এই মোহন মেলার সৃষ্টি। তবে আমাদিগের ন্যায় অন্ধবিশ্বাসী ভিন্ন, অন্য কেহ এই দেব-প্রতিমা দর্শনে যা'ন কি না, সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল মেলাক্ষেত্রের অনতিদূরে এক কাষ্ঠ-প্রকোষ্ঠে দেবতার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। প্রতিমা দর্শনে তিনি দেব কি দেবী নির্ণয় করা সুকঠিন; পরন্তু তিনি শিব কি শক্তি, জ্ঞান বা ভক্তি, নির্ব্বাণ না মুক্তি—কিসের বিধাতা, তৎপক্ষেও কোন কিম্বদন্তী নাই। ফলতঃ, আমাদিগের ন্যায় অভক্তের নগ্ননেত্রে রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত সিন্দুর বিলোপিত কোন ধাতুমূর্ত্তি ব্যতীত অপর কিছুই প্রতিভাত হইল না। যাহা হউক এই দেবতা যে কোটীরাজ ও তাহার প্রজাবর্গের পক্ষে সেই সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্মের বিভূতি বিশেষ, তৎপক্ষে সংশয় না থাকায় অন্তরীক্ষে তদুদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া মেলাস্থলে অগ্রসর হইলাম।

* মান্দ্রাজের অন্তর্গত পদুকোটার রাজদরবার কর্ত্তৃক ব্যবস্থা হইয়াছে যে, তত্রত্য চিরানুগত রীত্যনুসারে, রাজপরিবারস্থ পরিজনবর্গ, দেওয়ানজী এবং রাজানুজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন সম্ভ্রান্ত আগন্তুক ভিন্ন অপর কেহ রাজ্যের সীমা মধ্যে 'ঘোড়া গাড়ি' চড়িয়া বেড়াইতে পারিবে না। শ্রদ্ধাস্পদ 'বেঙ্গলি'সম্পাদক মহাশয় এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া সম্প্রতি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, "স্বয়ং বড়লাট সাহেবও এরূপ আদেশ করিতে পারেন না।" কে আদেশ করিতে পারেন, বলিতে পারি না; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, দেখিতেছি, নিশ্চয়ই অবগত নহেন যে, ঐরূপ পুরাগত প্রথানুসারে, বড়লাট, ছোটলাট ও জঙ্গীলাট ভারত-সাম্রাজ্যের উৎপত্তি-স্থিতি-নাশের এই তিন নিয়ন্তা এবং তাঁহাদিগের আত্মীয়-পরিজন ভিন্ন অপর কাহারও সিমলার 'ঠাণ্ডি সড়কে' (Mall) বা অন্য কোন পথে ঐরূপ 'ঘোড়া গাড়ি' চড়িয়া বেড়াইবার অধিকার নাই।

* মশব্রা, সিমলার সন্নিহিত একটী পল্লী। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ব্যারাকপুরের ন্যায় এখানে লাট সাহেবের এক রম্য বিনোদাশ্রম আছে।

মেলার কিন্তু কি বর্ণন করিব, খুঁজিয়া পাই না। হয়-হস্তী দুই দশটার অসদ্ভাব নাই; আর পানের খিলি হইতে পুরি-মিঠাই এবং 'ঈরেটেড্ ওয়াটার' হইতে 'একোয়া ভাইটী' প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আহার্য্য-পানীয়ের ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিপণি-সমাবেশেরও ত্রুটি নাই। 'মেরি-গো-রাউণ্ডে' (বাঙ্গলায় বলিলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোধ হইবে না) সাদা কালা সকল শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের পরিঘূর্ণন ও উচ্চকণ্ঠে অট্টহাস্যের উদ্গিরণ আছে; আর আছে—সাহেব-বিবির অভ্যর্থনার জন্য স্বতন্ত্র আসন এবং 'নেটিভ্ নীগারের' বিদায়ের জন্য কভু পুলিস প্রহরীকর্ত্তৃক গলদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হস্তপ্রসারণ। কিন্তু এ সকল ত মেলামাত্রেরই অঙ্গ,—ইহাতে আর নূতনত্ব কি? ইহারই জন্য এই কষ্ট স্বীকার করিয়া, বিরামপ্রদ বাসা ছাড়িয়া, এত দূরে আসিলাম,—ভাবিয়া নিজের বুদ্ধির প্রতি বিলক্ষণ ধিক্কার জন্মিল।

কৃত কর্ম্মের ফলভোগ অনিবার্য্য ভাবিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছি, সহসা এক দিকে দৃষ্টি পড়ায় চমক ভাঙ্গিল। শুনিয়াছিলাম, সিপির মেলা—সৌন্দর্য্যের হাট: এতক্ষণ সে কথার স্মরণ ছিল না, এখন এই অভিনব দৃশ্যে তাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মিল, সঙ্গে সঙ্গে অতীতের এক অস্ফুট স্মৃতি অন্তরে জাগরুক হইয়া উঠিল। বহুদিন পূর্ব্বে খাসিয়া শৈলে প্রবাস কালে, তত্রত্য নঙ্ক্রেম রাজ্যে এইরূপ কোন পর্ব্বোপলক্ষে খাসিয়ানী সুন্দরীগণের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আর এই সিপির মেলায় অগণন সুন্দরী-সমাগম দর্শনে ততোধিক বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, মেলার একাংশ কেবল এই রমণীকুলে পরিবৃত; বালিকা বা বৃদ্ধা কিছু বিরল—প্রৌঢ়া ও যুবতীর সংখ্যাই অধিক। সুন্দরীরা সারি সারি স্তরে স্তরে বসিয়া মেলার জনসমাগম ও পণ্যায়োজন নিরীক্ষণ করিতেছেন, কেহ বা বিলোল কটাক্ষ-বিক্ষেপে কোন ভ্রান্ত দর্শকের

সৌন্দর্য্যের হাট।

চিত্তবিভ্রম ঘটাইতেছেন। সুন্দরীরা প্রায় সকলেই অবগুণ্ঠিতা,—অলঙ্কারের মধ্যে দোদুল্যমান নাসাভরণই কেবল তাঁহাদিগের লাবণ্যবর্দ্ধন ও মর্য্যাদাবিকাশ করিতেছে। বিচিত্রবসনপরিহিতা নানালঙ্কারভূষিতা মুকুটাবৃতবেণিবদ্ধকুন্তলকলাপশোভিতা খাসিয়া রমণী সৌন্দর্য্যগৌরবে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে সিমলার এই সুন্দরীগণ অপেক্ষা অনেকাংশে গরীয়সী বোধ হয়; অধিকন্তু, তাঁহাদিগের সেই মন্থর মোহন নৃত্য নিতান্তই নয়নানন্দদায়ক সন্দেহ নাই। তবে, সেখানকার সৌন্দর্য্যকলায় কেমন একটু কৃত্রিম পাশ্চাত্যভাব জড়িত, আর এখানকার অঙ্গরাগে এখনও অনাবিল প্রাচ্যভাব অক্ষুণ্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই অবরোধ প্রথার অসদ্ভাব, এবং সেই সূত্রেই সৌন্দর্য্যের পসরাবিস্তারের এরূপ সুযোগ বর্ত্তমান। হাট 'বিকী-কিনি' শূন্য নহে;—শুনিয়াছি, খাসিয়া রমণীর ঐরূপ নৃত্যোৎসব ক্ষেত্রেই অনেক স্থলে বাক্‌দান-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে, আর এখানকার এই মহোৎসব পূর্ব্বে প্রকৃতই রমণীর ক্রয়-বিক্রয়-কাণ্ডে পরিসমাপ্ত হইত। মেলা ক্ষেত্রে এক পক্ষে মনোমত রমণী নির্ব্বাচন ও অন্যপক্ষে যথাযোগ্য মূল্য বিনিময়ে কন্যাসমর্পণ সহজ হইত বলিয়াই এই উপলক্ষে এইরূপ সুন্দরী সমাগমের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সভ্যতার ক্রমোন্মেষ সহকারে ও ইংরাজরাজের তত্ত্বাবধানে এই ঘৃণিত ব্যবসায় ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইলেও, মেলায় মহিলা-সম্মিলনীর আজ পর্য্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটে নাই; পরন্তু, প্রকৃত পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় না ঘটিলেও, এই সূত্রে পাত্রী বিশেষের হস্তান্তর প্রথাও, না কি একেবারে উন্মূলিত হয় নাই।

মেলার এই সৌন্দর্য্য উপভোগ ও শিক্ষালাভ করিয়া আমরা স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এখন পাঠক-পাঠিকার জন্য এই নীরস কাহিনীর বিবরণ ও দুই দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য মেলার সুন্দরী-সমাগমের সামান্য প্রতিকৃতি প্রদর্শন ভিন্ন আমাদিগের অন্য সম্বল নাই।

শ্রী ঃ—

খাসিয়া রমণীগণের নৃত্য।

"কোথা হ'তে আসি---কোথা ভে'সে যাই ?"

গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ দীর্ঘকালব্যাপী ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া চির দুর্ব্বল দেহখানা অধিকতর অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অল্প অল্প জ্বর যেন সর্ব্বদা শরীরে লাগিয়াই আছে--মধ্যে মধ্যে আবার তাহার বেগ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। আহারে অরুচি, শয্যাত্যাগে অনিচ্ছা, খিট্‌খিটে স্বভাব, অনিদ্রা ইত্যাদি ম্যালেরিয়া-সহচর ভাবগুলি অলক্ষিতে প্রবিষ্ট হইয়া, শ্রমপটু শরীরটা সম্পূর্ণ রকমে অকর্ম্মণ্য এবং অশান্তির লীলাভূমি করিয়া তুলিয়াছে।

এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনিচ্ছায় দুই খানা রুটি মুখে দিয়া রুগ্নশয্যা গ্রহণ করিলাম। অনেক চেষ্টার পর একটুকু তন্দ্রা হইয়াছিল, কিন্তু অদূরবর্ত্তী রাজদুর্গস্থ ১০ ঘটিকার তোপের ভৈরব-গর্জ্জনে অল্প কালের মধ্যেই সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; ইহার পর আর নিদ্রা নাই। ক্রমে ক্রমে রজনী গভীরা হইয়া আসিল,—ক্রমে সহরের কোলাহল নীরব হইল। এক জাতীয় কীটের "ঝিঁর্ ঝিঁর্" রবের ঘুম পাড়ানিয়া গীতি ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ কর্ণ কুহরে পৌঁছিতে ছিল না। পৃথিবী নিস্তব্ধ—সুষুপ্ত। কিন্তু আমার রোগ-ক্লিষ্ট হৃদয়ে যেন শত সহস্র সহরের কোলাহল এককালে জাগিয়া উঠিল; অনন্ত চিন্তার বাজার বসিয়া গেল। আমদানী রপ্তানীও অভাব নাই,—শরীরের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা, সংসারের কথা, পরিবারবর্গের কত কথা—পীড়িত প্রবাসী হৃদয়ে কত কথা যে ওতপ্রোত ভাবে জাগিয়া উঠিতেছিল, কত কথা যে ধীরে ধীরে মনের ভিতর মিলাইয়া যাইতেছিল, তাহা ভাষায় পরিব্যক্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে চিন্তার আদি নাই—অন্ত নাই—যেন হৃদয়ের ভিতর দিয়া, যুগ যুগান্ত ব্যাপী একটানা চিন্তা-স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। এই সময় আমার বাসাবাটির পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র পথ দিয়া একজন পথিক গাহিয়া গেল,—

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,—
কোথা হ'তে আসি—কোথা' ভে'সে যাই ?"

পথিকতো কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কণ্ঠস্বর নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দূর দুরান্তরে অনন্ত শূন্যে মিলাইল; কিন্তু সেই মধুময় সঙ্গীতের ভাষাগুলি যেন আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গানটি অনেকবার অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু এমন ভাবে যেন আর কখনো শুনি নাই। ইহার ভিতর যে কি এক সুগভীর ভাব নিহিত রহিয়াছে, এতকাল যেন তাহা বুঝিয়াও বুঝি নাই। আজ তাহার ভাব অনন্ত—টিকা টিপ্পনী অনন্ত! যে-ই যাহা বলুক না কেন, পরলোক এবং পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধীয় অস্পষ্ট বিশ্বাস পূর্ব্ব হইতেই আমার হৃদয়ে জাগরুক আছে। কিন্তু তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানি না—জানিবার চেষ্টাও কোন দিন করি নাই। আজ যেন গায়কের প্রশ্ন শুনিয়া সে চেষ্টা—সে ইচ্ছা আপনা হইতেই জাগরিত হইল। জগতের জীব-প্রবাহ কোথা হইতে আসিতেছে,—আবার দুই দিনে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া কোথায় চলিয়া যায়—ইহারা যে দেশে যাইতেছে সেই দেশটা কি রকম,—কি অবস্থায়ই বা তথায় অবস্থান করিতে হয়? অথবা, মৃত্যুর অন্তরালে অন্য কোনও অবস্থা আছে কিনা,—থাকিলে তাহা কি? ইত্যাদি অনন্ত প্রশ্ন একে একে মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল,—তাহার মীমাংসার নিমিত্ত কত কথা ভাবিতেছিলাম; ভাবিলাম অনেক—কিন্তু বুঝিলাম না কিছুই!

পরদিন অনেক লোকের সঙ্গে এ কথার আলোচনা হইল। অনেকের—অনেক কথা শুনিলাম, কিন্তু কোন কথাই মনোমত হইল না। জনৈক বন্ধু যুক্তি দ্বারা বুঝাইলেন,—"আমরা কোথা হইতেও আসি নাই, কোথাও যাইব না। বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি, আবার দুই দিন হাসিয়া খেলিয়া তাহারই কোলে লয় প্রাপ্ত হইব। মৃত্যুর পর-পারে কিছুই নাই, মৃত্যুর পরে আর জীবের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না।"

তিনি কর্ম্মবাদী—কর্ম্মানুযায়ী ফল-ভোগের কথা স্বীকার করেন। এবং পাপ পুণ্যেও বিশ্বাস আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে চুরি করিলে আমেরিকায় নিয়া বেত্রাঘাত করিবে, একথা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না। এখানকার পাপ পুণ্যের ভোগ এখানেই শেষ হইতেছে; এ বিষয়ের বিচার জন্য স্বতন্ত্র কোন স্থানে (পরলোকে) কোনও বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত নাই। তাঁহার মতে, আত্মগ্লানি বা অনুতাপ পাপের দণ্ড,—ইহাই জ্বলন্ত নরক। আর, আত্মপ্রসাদ পুণ্যের পুরস্কার বা পবিত্র স্বর্গ। অনুতাপানলে দগ্ধ হইলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। চির মলিন আত্মা অনুতাপানলে শোধিত হইয়াছিল বলিয়াই দস্যু রত্নাকর ঋষিত্ব লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন,—চির পাষণ্ড, সুরাসক্ত জগাই মাধাই হরিনামামৃত পানে বিভোর হইয়াছিলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আত্ম-গ্লানিই জ্বলন্ত নরক ভোগ এবং আত্মপ্রসাদই অক্ষয় স্বর্গ লাভ। এতদ্ব্যতীত পারলৌকিক স্বর্গ বা নরকের কথা যে বলা হয়, তাহা প্রলোভন বা ভীতিসূচক বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং মৃত্যুর অন্তরালে কি রহিয়াছে, সে কথা লইয়া বাক্ বিতণ্ডার বা মাথা ঘুরাইবার প্রয়োজন নাই।

বন্ধুর এই সকল বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক না হইলেও তদ্দ্বারা আমার বিশ্বাস কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ভাবী অনুতাপ দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ হইতে পারে; কিন্তু সেই অনুতাপ কয়টি হৃদয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর? যে অনুতাপাগ্নি দ্বারা আত্মার মলিনত্ব ভস্মীভূত হইতে পারে, ভগবান স্বহস্তে প্রজ্বালিত না করিলে, কাহারও আত্মায় সে অনল প্রদীপ্ত হইবার নহে। সুতরাং সে পবিত্র অনল অতি অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যশালীর ভাগ্যেই ঘটিবার কথা। সভা সমিতি বসাইয়া একটুকু অনুতাপ করিলে, তদ্দ্বারা পাপের ধ্বংশ হইতে পারে না। যাঁহাদের আত্মায় প্রকৃত অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাঁহারা মহাপুরুষ—মুক্তি মার্গের পথিক। কিন্তু যাহারা লোক দেখান অনুতাপ করিল অথবা পাপ কার্য্য করিয়া এক মুহূর্ত্তের তরেও যাহারা অনুতপ্ত হইল না, তাহাদের পাপের কি দণ্ড নাই? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কি সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিবে? মন তো একথা স্বীকার করিতে কিছুতেই রাজি হয় না।

সাম্প্রদায়িক মত অলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, বৌদ্ধগণের মধ্যেও এ বিষয় লইয়া মতদ্বৈধ আছে। তাহাদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে "ক্ষণ বিনাশী বিজ্ঞান-প্রবাহই আত্মা।" কোন কোন সম্প্রদায় বলেন,—"আত্মা কোন পদার্থ নহে, শূন্যতার নামান্তর মাত্র।" সুতরাং মৃত্যুর পরে আত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাহার কোনও ভোগ নাই, মৃত্যুই মুক্তি।" বলা বাহুল্য যে এস্থলে পরলোক অস্বীকার করা হইল। ইহাদের এই মুক্তি জ্ঞানকে উপলক্ষ করিয়াই মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—"পিণ্ডপাতেন যা মুক্তিঃ সা মুক্তিঃ শুনি শূকরে।" অর্থাৎ শরীর ধ্বংশ মাত্র যে মুক্তি, তাহা কুকুর এবং শূকরেও আছে।

আর্য্য ঋষি চার্ব্বাকেরও ঐ মত। তিনি পরলোকের সূক্ষ্ম দ্বারে সুদৃঢ় পাষাণ চাপাইয়া দিয়া বলিতেছেন—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" তাঁহার মতে যে উপায়েই হউক অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুখ সচ্ছন্দে জীবনের কয়টা দিন অতিবাহিত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। মৃত্যুর পরে ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া যাইবে, সুতরাং আর জীবের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকিবে না। কল্পনা-প্রসূত পরলোকের বৃথা ভাবনা ভাবিয়া যাহারা ইহলোকের প্রত্যক্ষ সুখ সম্ভোগের আশায় জলাঞ্জলি দিল, চার্ব্বাকের মতে তাহাদের ন্যায় নিরেট মূর্খ ভূ-ভারতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। এই সকল মত সরল এবং সুবিধাজনক হইলেও বিবেক কিন্তু মানুষকে ইহা হইতে অনেক অন্তরে রাখিয়াছে।

বৌদ্ধগণের অপরাপর সম্প্রদায় জন্মান্তরবাদের পক্ষপাতী; তাহারা পরলোক এবং পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করে।

মুসলমানগণের মতে পরলোক আছে,—'ভেহেস্ত' (স্বর্গ) ও দুযোগ (নরক) আছে। নাই কেবল পুনর্জ্জন্ম। যে ব্যক্তি 'গুণা' (পাপ) করিবে তাহাকে 'দুযোগে' যাইতে হইবে। আর 'সোয়াব্' (পুণ্য) কারী ব্যক্তি 'ভেহেস্তের' অধিকারী। কোরাণ সরিফের সুরা এরাফ্ আলোচনা করিলে পরলোক ও পাপ পুণ্য বিষয়ক অনেক কথা পাওয়া যায়। পরলোকে পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া দণ্ড বা পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়, একথা উক্ত সুরাতে লিখিত সুতরাং পরলোক সম্বন্ধে মুসলমানগনের বিশেষ আস্থা আছে। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কোরাণে কোন কথা না থাকিলেও অনেক গণ্য মান্য মুসলমান জন্মান্তর বাদ স্বীকার করেন। মওলানা মস্‌নবীরুম প্রবীণ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক বলিয়া পূজ্য ছিলেন; মুসলমানগণের মতে তিনি "কেরামতী বুজ্‌রুক্" বলিয়া বিখ্যাত। তিনি বলিয়াছেন,—

"হাফ্‌ত্ সাদ্ হাফ্‌তাদ্ কালিব্ দিদা আম্।
হাম্ চুঁ সাবজা বারাহা রো ইদা আম্॥"

এই কবিতায় বলিয়াছেন যে, তিনি এ পর্য্যন্ত ৭৭০ সাত শত সত্তর বার মানব দেহ ধারণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন উদ্ভিদাদির অবস্থায়ও তাঁহাকে অনেক জন্ম অতিবাহিত করিতে হইয়াছে।

সাধারণ মুসলমানগণতো কথায় কথায়ই জন্মান্তরের দোহাই দিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে কোরাণের মত-সম্মত না হইলেও মুসলমানগণের হৃদয়ে জন্মান্তর বাদের ধারণা অনেক কাল হইতে অলক্ষিত ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

খ্রীষ্টানগণের মত ঠিক মুসলমানী মতের অনুরূপ। তাঁহারা বলেন, "আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সহ এই প্রথম সমুদ্ভূত হইয়াছি। স্বাধীনতার সদসদ্ব্যবহারের উপর আমাদের জীবনের ফলাফল নির্ভর করে।" সুতরাং পুনর্জন্ম অস্বীকার করা হইয়াছে। বাইবেলের মতে পুণ্যাত্মা অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী, তাঁহারা কখনও স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন না। আর পাপাত্মাগণ চিরদিন নরকাগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে, কোন কালেই তাহারা নিস্তার পাইবে না। এরূপ স্থলে পুনর্জন্ম গ্রহণের আর অবসর কোথায়? তাঁহাদের মতে পরলোক আছে, এবং পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কারের বিধান থাকাও স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আপনার জীবন দিয়া মনুষ্যকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের কথা আমাদের আলোচ্য নহে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। কিন্তু পাপ পুণ্যের বিচারের ব্যবস্থা বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বাইবেলের মতে পাপের লঘু গুরু ভেদ নাই; সর্ব্ববিধ পাপের নিমিত্তই এক দণ্ড—চিরকাল নরকাগ্নি ভোগ! ইহাই যদি সঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, তবে বাইবেল-সর্ব্বস্ব খ্রীষ্টানগণ আপনাদের প্রচারিত দণ্ড-বিধিতে, অপরাধের অবস্থানুসারে দণ্ডের তারতম্যের ব্যবস্থা করিলেন কেন? ইহা দ্বারা কি বাইবেলের মতকে প্রকারান্তরে অসঙ্গত বলা হইতেছে না? মনুষ্য বুদ্ধিতে যাহা অসঙ্গত বলিয়া ধারণা হইতে পারে, সর্ব্বশক্তিমান, পরম দয়ালু পরমেশ্বর স্বয়ং সে ব্যবস্থা করিয়াছেন, একথা মনে করাও আমাদের মতে সুসঙ্গত নহে।

বর্ত্তমান কালে প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের নির্য্যাস বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে পাশ্চাত্য মতের যথেষ্ট প্রক্ষেপ আছে। ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ন্যায় পরলোক স্বীকার করেন, কিন্তু জন্মান্তর মানেন না। এবং পাপপুণ্যের বিচারের অথবা দণ্ড কি পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থার কথাও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের কথা এই যে "জীবাত্মা সৃষ্ট পদার্থ, সুতরাং ধরাধামে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে আমাদের কোনরূপ অস্তিত্ব ছিল না।" ইহা দ্বারা জীবাত্মার পুনরাগমন অস্বীকার করা হইতেছে। পরলোক সম্বন্ধে বলেন,—"আত্মা অনন্তকাল পরলোকে অবস্থিতি করে এবং ইহলোকের ন্যায় পরলোকেও অনুতাপের দ্বারাই আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।" আরও বলেনঃ—

"স্বর্গলোক হইতে উন্নত স্বর্গলোক লাভ করিয়া, দেবাত্মা* তাহার সমধিক তেজস্বী চক্ষুবলে ও প্রখর বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের বিচিত্র কৌশল সন্দর্শন করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বরের মহিমা জাজ্জ্বল্যতর রূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। সেই কৌশলের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও মঙ্গল ভাবের নিদর্শন পাইয়া, তাহার হৃদয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল। সে দেবতাদিগের সঙ্গে তাঁহার মঙ্গল গীতে স্বর্গরাজ্য পরিপূরিত করিয়া তুলিল। ক্রমে প্রাচীন দেবতাদিগের নিকট শিক্ষা পাইয়া, তাহার বিজ্ঞান আরও প্রসারিত হইতে লাগিল। যখন বিজ্ঞান উজ্জ্বল হইল, প্রেম বিস্তারিত হইল, মঙ্গল ভাবে হৃদয় আর্দ্র হইল, সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, তখন তাহার নিকট উন্নত স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সেখানকার শিক্ষা শেষ হইলে, আবার উন্নততর স্বর্গের শিক্ষা আরম্ভ হইল। লোক লোকান্তর পর্য্যটনে যতই তাহার জ্ঞান প্রসারিত হইতে লাগিল। ততই সে ঈশ্বরের জ্ঞান-ক্রিয়ার পরিচয় পাইতে লাগিল।"

(মোক্ষপ্রদ আধ্যাত্ম বিদ্যা—পরলোক ও মুক্তি। ৩য় অঃ।)

এই সকল মত আলোচনা করিলে বুঝা যায়, কোন অবস্থায়ই আত্মার অবনতি নাই। ইহলোকে যেমন কাজ করিয়াই যাও না কেন, পরলোকে আত্মা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে; কখনও নরক-যন্ত্রণার ধার ধারিবে না। উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহা-

* জীবাত্মার উন্নত অবস্থাকে দেবাত্মা বলা হইয়াছে।

শয়ের মত জানা যাইতেছে। পরলোকগত মাননীয় কেশব চন্দ্রের মতও তাহারই অনুরূপ। পরলোকের ব্যবস্থা যদি প্রকৃত পক্ষেই ঐরূপ হয়, তবে মনুষ্যের আর কোনরূপ ভয় ভাবনার কারণ থাকে না।

ব্রাহ্মগণ জন্মান্তর বাদের বিরোধী; অথচ একথা স্বীকার করেন যে, "মাতৃগর্ভে অবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে আমরা ভাবরূপে ঈশ্বরে বিদ্যমান ছিলাম।" ইহা দ্বারা কি বুঝায়? আমরা কিন্তু পুনর্জন্ম স্বীকারেরই আভাস পাইতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় স্পষ্টরূপেই জন্মান্তর বাদ স্বীকার করিতেন। তাঁহার স্বরচিত গানের দ্বারাই সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি বলিয়াছেনঃ—

"পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না।
বারম্বার যাতায়াতে পাইবে ঘোর যন্ত্রণা॥"

আজকাল এই গানটি সংশোধিত হইয়াছে; "যাতায়াতে" শব্দের পরিবর্ত্তনে "পাপাচার" হইয়াছে। যাহাই হউক না কেন, ব্রাহ্মগণের অন্তরে যে জন্মান্তরের ভাব বা অস্তিত্ব একবারেই নাই, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব?

থিয়সফিষ্টগণ পরলোক ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ঘোর বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে জীবাত্মা বা "ইগো" মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল লোক লোকান্তর ভ্রমণ করিয়া, হাজার দেড় হাজার বৎসরের পর আবার ইহলোকে আসিয়া থাকে।* ইঁহারা দিন দিন পরলোক সম্বন্ধীয় যে সকল আশ্চর্য্য রহস্য আবিষ্কার করিতেছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়, ঘোর নাস্তিকের হৃদয়েও পরলোক-চিন্তার অস্পষ্ট রেখা অঙ্কিত হয়। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয় গুলির আলোচনা করা এস্থলে অপ্রাসাঙ্গিক না হইলেও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

পরলোক ও জন্মান্তর বাদে বিশ্বাস, হিন্দুগণের মজ্জাগত হইয়াছে। সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তি এতদুভয়ের উপর সংস্থাপিত। আজ আর্য্যদিগের দর্শন হইতে পরলোক ও পুনর্জন্মের কথা মুছিয়া ফেলিলে কালই হিন্দু-ধর্ম্মের মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। পরলোক বাদ এবং জন্মান্তর বাদের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের এত গলাগলি সম্বন্ধ আছে বলিয়াই অনন্ত ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া, আজ পর্য্যন্তও হিন্দুধর্ম্ম আপনার দৃঢ়তা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বাস্তব হিন্দুগণ যেরূপ পরলোকের সহিত জড়িত ভাবে ইহলোকে বাস্তব্য করিতে শিখিয়াছেন, জগতের অন্য কোন জাতির তদ্রূপ শিক্ষা লাভ হয় নাই। হিন্দুগণের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে, ইহলোকের বন্ধু বান্ধবগণের ন্যায়, পরলোকের বন্ধু বান্ধবদিগকে আহ্বান করাই এ কথার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্থল।

আর্য্য শাস্ত্রের মত এই যে, মৃত্যুর পরে আত্মা সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া পরলোকে উপস্থিত হয়। সেখানে আত্মার পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া, কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অথবা নরকে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং স্বর্গ বা নরকে প্রেরিত আত্মার কর্ম্মফল ভোগের কাল পূর্ণ হওয়ার পর পুনরায় ধরাধামে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। যত দিন ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিত না হইবে—নদীর জল সাগরের জলে না মিশিবে, ততদিন এই ভাবেই বারম্বার যাতায়াত করিতে হইবে। মুক্ত আত্মা আর ভবার্ণবে আসিয়া কষ্টভোগ করিবে না। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেনঃ—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"
গীতা—৮মঅঃ, ১৬ শ্লোক।

অর্থ—"হে অর্জ্জুন! সমস্ত স্বর্গের উপরিস্থিত ব্রহ্মলোক অবধি সমস্ত ভোগ লোকই অনিত্য এবং পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল। অতএব মরণান্তর ইহার যে কোন লোকে গমন করে, তাহাতেই আবার পতন হইয়া পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে (পরমাত্মাকে) লাভ করে, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া যায়, হে কৌন্তেয়! তাহাদের আর পুনর্জন্ম নাই। ব্রহ্মলোক অবধি সমস্ত স্বর্গকে যে অনিত্য বলিলাম তাহার কারণ এই যে, উহাদের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে এবং উহারা এক একরূপ সীমাবদ্ধ কালস্থায়ী।*"

স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নান্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্॥

* Death and After—Annie Besant.

* পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ হইতে গৃহীত।

তে তং ভুক্‌ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

গীতা—৯ম অঃ, ২০।২১ শ্লোক।

অর্থ—যে সকল ত্রিবেদবিৎ পণ্ডিত কামনা বশগ হইয়া যজ্ঞশেষ সোম পান পূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ-গতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহান্ পবিত্র দেবলোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যে নানাপ্রকার দিব্য দেবভোগ উপভোগ করেন। কিন্তু সেই সকল ভোগ চিরস্থায়ী হয় না। তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ সুবিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যের ক্ষয় হইয়া গেলে পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ভোগ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া বৈদিক কর্ম্মের অনুসরণ করিলে, এইরূপ জন্ম মৃত্যু মার্গই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

এ বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন ঃ—

"প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহকরোত্যয়ম্।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈলোকায় কর্ম্মণে॥"

অর্থ—"জীব ইহ লোকে যে কিছু কর্ম্ম করে, ভোগের দ্বারা সে সমস্তের নাশ হইলে পুনঃ কর্ম্ম করিবার জন্য ইহলোকে আগমন করে।"

এতদ্দ্বারা পরলোক ও পুনর্জন্ম বিষয়ক তত্ত্ব জানা যাইতেছে। যোগ ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতাগণ সিদ্ধি সাধনের পূর্ব্বে যোগভ্রষ্ট ও সংযমশূন্য হইলে, তাহার পরিণাম সম্বন্ধে ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।

এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং॥"

গীতা—৬ষ্ঠ অঃ, ৪০-৪২ শ্লোক।

অর্থ—"হে পার্থ! তুমি যাদৃশ অবস্থাপন্ন লোকের কথা বলিলে, তিনি কখনও ইহকাল কিম্বা পরকাল হইতে বিনষ্ট হইতে পারেন না। কারণ হে তাত! বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কেহই দুর্গতি লাভ করে না। তবে এইমাত্র তারতম্য আছে যে, তত্ত্বজ্ঞানী যোগী যদি মরণকাল পর্য্যন্ত তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়েন, তবে পরম নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যুকালে যোগ হইতে স্খলিত হইয়া যান, তবে সেই মুক্তি লাভই করিতে পারিলেন না; কিন্তু নরক যাতনা কি কারণে হইবে? ফলতঃ যোগসিদ্ধির প্রাক্কালে যিনি যোগভ্রষ্ট হইয়া মৃত হয়েন, তিনি পরকালে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে বসতি করিয়া ইহলোকে পুনর্ব্বার বৈরাগ্য বিবেকাদি গুণসম্পন্ন নিতান্ত নির্ম্মলচেতা সম্রাটের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। আর যদি ধনাভিলাস কিছুমাত্র না থাকে, তবে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অতুল জ্ঞানসম্পন্ন ধীমান্ যোগীকুলেই জন্মগ্রহণ করেন। বাস্তবিক যোগীকুলে যে এইরূপ জন্মগ্রহণ করা, তাহাই অধিকতর দুর্ল্লভ।"

এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিয়া উঠিতে না পারিলেও সৎকার্য্যানুষ্ঠানের পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, যতই পুণ্যকার্য্য, যোগ তপস্যা করা হউক না কেন, আত্মা নিষ্কাম না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ মুক্তি ঘটিবার নহে। নির্ব্বাণমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মাকে কর্ম্মক্ষেত্র সংসারধামে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেই হইবে। ভগবান যোগীদিগকে যে নির্ব্বাণ-মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা এইরূপ ঃ—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং।

যঃ প্রযাতি স মদ্‌ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা সদ্‌ভাব ভাবিতঃ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামৈবৈষ্যস্য সংশয়ঃ॥"

গীতা—৮ম অঃ, ৫-৭ শ্লোক।

অর্থ—"অন্তকালে আমাকেই (আত্মাকেই) স্মরণ করিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক যিনি মৃত্যুলাভ করেন, তিনি আমাতেই বিলীন হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া যান, ইহাতে সংশয় নাই। মৃত্যুকালের চিন্তার বিষয়ে এই সাধারণ নিয়ম আছে যে, ম্রিয়মাণ ব্যক্তি অন্তকালে যে কোন ভাব মনে করিয়া দেহ ত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সেই ব্যক্তি সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মৃত্যুকালে যে যাহা চিন্তা করে, মৃত্যুর পরে সে তাহাই হয়। অতএব তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আমাকে (ঈশ্বরকে) চিন্তাভ্যাস করিতে করিতে যখন এই সকল চিন্তা-সংস্কার ঘনীভূত হইয়া সংস্কার বলে অবশেষে তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতেই (ঈশ্বরেতেই) বিমিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন আর মৃত্যুকালে অন্য চিন্তা আসিতে পারে না। পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার বলে ঈশ্বরের চিন্তাই আসিবে; সুতরাং ঈশ্বরকেই পাইবে। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলে ঈশ্বর-চিন্তা হয় না এবং নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও চিত্ত-শুদ্ধি হয় না।"

নিষ্কামভাবে কার্য্য করা বা তন্ময়চিত্ত হওয়া বর্ত্তমান কালে সকলের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি মৃত্যুর প্রাক্কালে আত্মীয়গণ মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে ভগবানের নাম বলিয়া দেয়। তাহার অন্তরে অন্য ভাব থাকিলে, সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের প্রতি চিত্ত অর্পণার্থ সতর্ক করিয়া দেওয়াই এইরূপ নামোচ্চারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। মুক্তিমার্গ সম্বন্ধে আরও কথা আছে ঃ—

"সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।

মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতোযোগধারণাং॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥"

গীতা—৮ম অঃ, ১২-১৩ শ্লোক।

অর্থ—"সমস্ত ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক যোগ ধারণার অবলম্বন করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিবদ্ধ রাখিবে, এবং প্রাণকে মস্তক মধ্যে উত্তোলন করিয়া রাখিবে। পরে আমাকে (পরমাত্মাকে) স্মরণ করিয়া, ওঁ এই এক অক্ষর মহামন্ত্র উচ্চারণ করতঃ এই দেহ পরিত্যাগ করিলে, পরমা গতি (মুক্তি) লাভ করে।"

এই তো গেল গীতার কথা। কেবল গীতা কেন,—পরলোক, পুনর্জন্ম এবং নির্ব্বাণ মুক্তি বিষয়ে আর্য্যগণের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থই একসুরে বাঁধা;—একপ্রাণে অনুপ্রাণিত। নানা মুনির নানা মত থাকিলেও শেষ সকলেই এক কথা বলিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুগণের এতদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দিহান হইবার কারণ নাই।

আর্য্যগণের মতে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে পর জন্মে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট শ্রেণীতে জন্ম হইয়া থাকে। অবস্থার

তারতম্য ঘটিবারও তাহাই একমাত্র কারণ। ভগবান মনু বলিয়াছেন ঃ—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।

বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥"

অর্থ—"মনুষ্য শারীরিক পাপ দ্বারা স্থাবর যোনি, বাচিক পাপ দ্বারা তির্য্যক যোনি ও মানসিক পাপ দ্বারা অন্ত্যজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

এতদ্ব্যতীত শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

"কেবল ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না, তৎসঙ্গে অন্য নিমিত্ত কারণও আছে। সেই নিমিত্তান্তর বশতঃই এরূপ বিষম সৃষ্টি হয়। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই সেই নিমিত্ত। সৃষ্টি ব্যাপারে তবে ঈশ্বর একমাত্র নিমিত্ত কারণ নহেন, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মও অপর নিমিত্ত কারণ।"

শঙ্কর ভাষ্য—শারীরিক সূত্র, ২।১।৩৪।

পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতাবাক্য দ্বারাও এবিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস না পাওয়া যায় এমন নহে (৮ম অঃ, ৬ শ্লোঃ)। কিন্তু এই মত স্বীকার করিতে যাহাদের আপত্তি আছে, তাহারা বলেন,—

"পূর্ব্ব জন্মের কোন কার্য্যের দরুণ বর্ত্তমান জন্মে দণ্ড বা পুরস্কার ভোগ করিতেছি, তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। যে কার্য্যের দরুণ দণ্ড বা পুরস্কার প্রদত্ত হয়, তাহা বুঝিতে না দিলে জীবের সংশোধনের উপায় হয় না। জন্মান্তরীণ কোন্ পাপের দরুণ আমি এবার দণ্ডিত হইলাম, তাহা বুঝিতে পারিলে এ জীবনে সংশোধিত হইতে পারিতাম, এবম্বিধ দণ্ডের উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু পাপের কথা জানিতে না দিয়া দণ্ড করা হইলে, সেই দণ্ডের দ্বারা কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি এই রকমের উদ্দেশ্য-বিহীন দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।"

আমরা মোহান্ধ জীব—কূপমণ্ডূক। আমাদের মন ঘুরিয়া ফিরিয়া সংসার-কূপের গণ্ডির মধ্যেই ভ্রমণ করিতেছে, আর বিকৃত জল পান করিয়া, বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শাস্ত্র গ্রন্থের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত এ সকল গূঢ় রহস্য ভেদ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আলোচ্য বিষয়ে গীতা বলিতেছেন ঃ—

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দনঃ॥
গীতা—৬ষ্ঠ অঃ, ৪৩ শ্লোঃ।

অর্থ—"হে কুরুনন্দন! যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিলে, ঝটিতিই সেই পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারাপন্ন জ্ঞান লাভ করিতে পারে। জ্ঞান লাভ করিয়াই আবার যোগ সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত সংযত ও যত্নবান হয়।"

আত্মা বিশুদ্ধ হইলে, পূর্ব্ব জন্মের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, উপরি উক্ত বাক্য দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে। কিন্তু হিন্দু মত নিতান্ত পুরাতন, তাহার গায়ে শেয়ালা ধরিয়া গিয়াছে, এজন্য অনেকে তাহার আশে পাশে ঘেঁষিতেও রাজি নহেন। থিয়সফিষ্ট মত নব প্রবর্ত্তিত, অথচ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। সুতরাং আজকাল অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। থিয়সফিষ্টগণই বা এ বিষয়ে কি বলেন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের অনুবাদিত ভাষায় একবার শুনুন ঃ—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি সম্বন্ধে থিয়সফিষ্টগণ বলেন যে, ওরূপ স্মৃতি-লোপ আমাদের মঙ্গল হেতু। একজনের স্মৃতি লইয়াই আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। তাহার উপর ঐ সকল জন্মের বৃত্তান্তসমূহ স্মৃতিপথে আসিলে পাগল হইবার কথা। বিশেষ স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, সে সকল মস্তিষ্ক যখন ধ্বংস প্রাপ্ত, তখন সাধারণ জীবের পূর্ব্ব জন্মের বার্ত্তা মনে পড়া অসম্ভব। তবে যিনি যোগ বলে উন্নত, তিনি "ইগোর" নিকট সংবাদ সংগ্রহ করতঃ তাহাকে বর্ত্তমান মস্তিষ্কের বিষয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এইরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়।" *

তবেই দেখা যাইতেছে, ভগবানের দোষ নাই। তিনি আমাদিগকে পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ সম্বন্ধীয় স্মৃতিশক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমাদের কর্ম্মদোষে সেই দেবতা-বাঞ্ছিত শক্তি মলিন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা হাতিয়ার বিহীন-রামসিংহ জমাদারের ন্যায় বৃথা মনুষ্যত্বের গর্ব্ব করিতেছি মাত্র;—প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যোপযোগী উপকরণ আমাদের কিছুই নাই।

পরলোক ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মমতের সারাংশ উপরে আলোচিত হইল। মোটের উপর পৃথিবীর প্রায় সকল সম্প্রদায়ই পরলোকবাদ স্বীকার করেন। জন্মান্তর বাদ সকল সম্প্রদায়ের স্বীকার্য্য না হইলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অল্পাধিক পরিমাণে তৎসম্বন্ধীয় ধারণা প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। এ স্থলে জন্মান্তর বাদের অনুকূল আর একটি কথা বলিতে চাই—মৃত্যুর পরে আত্মা পরলোকে অবস্থান করে, এ কথা এক রকম সর্ব্ববাদী সম্মত। জীবের মৃত্যু দ্বারা যে আত্মা অবস্থান্তরিত হয়, এ কথাও কেহই অস্বীকার করেন না। ইহলোকে মৃত্যু দ্বারা যদি আত্মার অবস্থান্তর ঘটিতে পারে, তবে পরলোকে তাহা ঘটিবে না কেন? আমরা বলি, যেমন জীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা অবস্থান্তরিত হইয়া পরলোকে গমন করে, তদ্রূপ পরলোক হইতে অবস্থান্তরিত হইয়া, পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করাই সম্ভবপর। যাহার একবার অবস্থান্তর ঘটিতে দেখা গিয়াছে, তাহার পুনঃ পুনঃ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নহে কি? বর্ত্তমান কালে পরলোক ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান বিষয়ে থিয়সফিষ্টগণ সকল সম্প্রদায়কেই পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়াছেন। তাঁহাদের মত আলোচনা করিলে, বিশ্বাসী মনুষ্যের এতদুভয় বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই সকল মত এবং ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারিলে, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় ভাসিয়া যাইব, এই প্রশ্নের উত্তর কিছু সহজ হইয়া দাঁড়ায়।

পরলোক এবং জন্মান্তর বাদ সংসারের বাহিরের কথা। আমাদের ন্যায় সাধারণ জীবের এবম্বিধ অদৃশ্য জটিল বিষয়ে কোনও স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। পারলৌকিক এই সকল গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারেন, এমন জ্ঞানী লোকও আজ কাল অতি দুর্লভ। সুতরাং এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র গ্রন্থের মত এবং সমাজে চির প্রবাহিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা একান্ত আবশ্যক।

অন্ধ বিশ্বাস অপ্রশংসনীয় হইলেও এ স্থলে তাহা অবাঞ্ছনীয় নহে; কারণ, বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্মের অন্য কোনও মূল নাই। এ জন্যই কথিত হইয়াছে,—"ভক্তিতে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" সাধক কবি রামপ্রসাদেরও এইরূপ মত, তিনি বলিয়াছেন,—"সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তা'র দাসী।" স্থূল কথা, পরলোক ও জন্মান্তর বাদে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে, মুক্তিলাভতো দূরের কথা, মানুষ আপনার মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পর্য্যন্ত সমর্থ হয় না। এবং সমাজের শৃঙ্খলতা রক্ষা পাইতে পারে না। কেবল এই বিশ্বাসের কষাঘাতেই মানবগণ অসৎকার্য্য করিতে বিরত এবং সৎকার্য্যানুষ্ঠানে নিরত হইয়া থাকে। সকলেই মনে করে, দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া যদি সৎকার্য্যানুষ্ঠানে জীবনের কয়টা দিন অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারি, তবে পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হইব। এই বিশ্বাসের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়া স্বীকার না করিলেও অথবা পরকালে তাহা কার্য্যকরী না হইলেও ইহ লোকের জন্য যে মহদুপকারী তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কেবল জীবনের দুইটা দিনের ভয় ভাবনা লইয়া ধর্ম্মবীরের অভ্যুদয় সম্ভবপর হইতে পারে না, আমাদের ক্ষুদ্র মনের ধারণায়, জন্মান্তর বাদে অবিশ্বাস দ্বারা জাতীয় উন্নতির মূলোচ্ছেদ করা হয়। এ জন্যই বলিতেছিলাম—অন্ধ বিশ্বাস অপ্রশংসনীয় হইলেও এ স্থলে তাহা অবাঞ্ছনীয় নহে। আমরা পরলোক হইতে আসিয়াছি, দুই দিন পরে আবার কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত পরলোকে গমন করিতে হইবে, এই মঙ্গলময় বিশ্বাস প্রতিহৃদয়ে জাগরিত করিয়া, ভগবান মানবের ও মানব সমাজের মঙ্গল বিধান করুন,ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

* Re-incarnation—Annie Besant.

সপত্নী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভাটার স্রোতে এবং অনুকূল বায়ুর সহায়তায় কুমুদিনী ও লবঙ্গলতাকে বহন করিয়া তরণী তীরবেগে কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। মৃদু মন্দ পবন-হিল্লোলে গঙ্গাবক্ষে লহরীমালা খেলিতেছে, সঙ্গের ক্ষুদ্র তরি হেলিতে দুলিতে ছুটিতেছে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক আনন্দের লহরী লীলা কুমুদিনীর হৃদয়-প্রবাহে প্রধাবিত হইতেছে। মোহিনী আশার সুমধুর হিল্লোল সেই নবীনার অন্তরকে নিরন্তর নাচাইতেছে। আর অল্পক্ষণ—অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র পরে তাহার প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইবে; হৃদয়-মন্দিরের একমাত্র দেব-চরণে তিনি আত্ম সমর্পণ করিতে পাইবেন; যাঁহার নাম শ্রবণে প্রাণ প্রফুল্ল হয়, যাঁহার প্রসঙ্গ আলোচনায় কলেবর পুলকিত হয়, যাঁহার মূর্ত্তি ধ্যানে হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হয়, তাঁহার সেই সর্ব্বস্ব ধন আর অল্প কাল পরেই তাঁহার নয়ন-সমক্ষে সশরীরে বিরাজমান হইবেন। হায় আশা! এ জগতে তোমার অনন্ত লীলা দেখিয়া বিস্ময়ে প্রাণ আকুল হয়। তুমি আছ বলিয়াই সংসার আছে। যে অভাগাকে তুমি ত্যাগ করিয়াছ, তাহার সকলই শ্মশান।

লবঙ্গের প্রতি কুমুদিনীর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। স্বল্প-জ্ঞানসম্পন্না নবীনা বাক্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। যাহা বলিতেছেন, তাহার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক তাঁহার হৃদয়ে অব্যক্তভাবে লুকাইয়া থাকিতেছে। দীনা ভাষায় এমন শব্দ-সম্পদ নাই, যাহা তাঁহার মনের ভাব সম্যকরূপে পরিস্ফুট করিতে সক্ষম, তাঁহার অন্তরে কবিত্বের এমন আবেগ নাই,যাহা তাঁহার প্রাণের কথা ফুটাইয়া দিতে পারে। লবঙ্গ এ অসীম কৃতজ্ঞতা প্রণিধান করিতেছে কি? করিতেছে বই কি? তাহার অধরে মৃদু হাস্য—ভাব গাম্ভীর্য্যময়—অহঙ্কারস্ফীত। নবীনা সঙ্গিনীকে স্বল্প কথায় সে অনেক আশ্বাস দিতেছে, তাঁহার সুখ অব্যাহত ও সম্পূর্ণ করিয়া দিবে বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিতেছে

পার্শ্ব দিয়া কত নৌকা চলিয়া যাইতেছে। কুমুদিনীর সে দিকে দৃষ্টি নাই। একখানি নৌকা হইতে মধুমাখা কোমল স্বরে টপ্পা গান চলিতেছে কুমুদিনীর কর্ণ সেদিকে নাই। নক্ষত্রনিকর-বিরাজিত নৈশ-গগনের অলৌকিক শোভাকে পরাজিত করিয়া অগণ্য আলোকমালা-বিশোভিত মহানগরী কলিকাতা সম্মুখে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কুমুদিনীর নয়ন সে শোভায় আকৃষ্ট হইতেছে না। কতক্ষণে যথাস্থানে নৌকা লাগিবে, এই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন।

ধীরে ধীরে কুমুদিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"লবঙ্গ দিদি, আর কত দেরী? মাঝিরা ঘাট ছাড়াইয়া যাইবে না তো?"

কেহ দেখুক না দেখুক লবঙ্গ একটু হাসিল। হাসির সহিত মিশাইয়া বলিল—"সে ভয় নাই। মাঝিরা নরেশ বাবুর চেনা জানা লোক। ঠিক ঘাটেই নৌকা লাগাইবে। ঐ যে বিদ্যুতের আলো লাগান পুল দেখা যাইতেছে, উহার এ দিকে নৌকা লাগিবে। আর দেরী নাই।"

বাস্তবিকই আর দেরী হইল না। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে নৌকা আসিয়া জগন্নাথের ঘাটে লাগিল। কুমুদিনীর আশা ও আশঙ্কার স্রোত বড়ই বাড়িয়া উঠিল। হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবল-বেগে রক্ত ধাবিত হইতে থাকিল। কুমুদিনী বলিলেন,—"লবঙ্গ দিদি, গাড়ীর ব্যবস্থা কর।"

লবঙ্গ বলিল,—"কোন ব্যবস্থাই করিতে হইবে না। সুরেশ বাবুর গাড়ী সন্ধ্যার পর হইতে ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিবে স্থির আছে। সঙ্গে নরেশ বাবু নিজে থাকিলেও থাকিতে পারেন। যদি কোন কারণে তাঁহার আসা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার কোন বিশ্বাসী লোক গাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে কথা আছে। মাঝি! দেখ দেখি, উপরে কোন লোক গাড়ী লইয়া আছে কি না।"

"যে আজ্ঞা।" বলিয়া মাঝি নৌকা হইতে উপরে উঠিল। অবিলম্বে সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—"সুরেশ বাবু ডাক্তারের গাড়ি লইয়া এক লোক উপরে হাজির আছে।"

লবঙ্গ বলিল,—"দেখিলে দিদি? বন্দোবস্ত সব পাকা।"

কুমুদিনী ভাবিলেন, "লোক? তিনিই কি এ লোক? এত সৌভাগ্য কি হইবে? এখনই কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব?"

হাত ধরিয়া কুমুদিনীকে সঙ্গে লইয়া লবঙ্গ বাহিরে আসিল। ধীরে ধীরে সেই দুই নারী, নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। যে ঘাট সমস্ত দিন স্নানার্থী নরনারীর সমাগমে লোকারণ্য বলিয়া বোধ হয় এখন তথায় দুই চারি জন ভিন্ন আর লোক নাই। তাঁহারা অনায়াসে উপরে উঠিলেন। মাঝিরা ভাড়া বা বখসিস্ কিছুই প্রার্থনা করিল না। সরদার মাঝি সঙ্গে ছিল। সে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল এবং তখনই ঘাটে আসিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা বেগে দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল।

কুমুদিনী ভাবিলেন, মাঝিরা ভাড়া লইল না, সে জন্য কোন কথাও বলিল না কেন? বোধ হয় সকলই পাইয়াছে। কে দিয়াছে? তিনিই দিয়াছেন কি? যাহাই হউক সে সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি লবঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু তাঁহার চিত্ত সে জন্য একটুও বিচলিত হইল না কি?

সত্যই উপরে একখানি সুন্দর গাড়ি ও তাহার সন্নিকটে একটী ভদ্রবেশধারী পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল। সম্মুখে লবঙ্গলতা তৎপশ্চাতে ব্রীড়াবনতা অবগুণ্ঠনবতী স্থূল বস্ত্রাবৃতা কুমুদিনীকে দেখিয়া সেই ভদ্রবেশধারী পুরুষ একটু অগ্রসর হইল এবং দূর হইতে সসম্ভ্রমে বলিল, "আপনারা আসিয়াছেন? আমি সন্ধ্যা হইতে গাড়ি লইয়া খাড়া আছি। এখন গাড়িতে উঠুন।"

লোকটা একটু সরিয়া গেল। লবঙ্গ অস্ফুট স্বরে কুমুদিনীর কানে কানে বলিল,—"সুরেশ বাবুর বিশ্বাসী সরকার। আহা! সন্ধ্যা হইতে এখানে খাড়া থাকিয়া লোকটা বড় কষ্ট পাইয়াছে। এখন চল, শীঘ্র গাড়িতে যাই।"

কুমুদিনী ভাবিলেন, "তিনি তো আইসেন নাই। কেনই বা আসিবেন? বিশ্বাসী লোক—সুরেশ বাবুর গাড়ি, সকলই তো আসিয়াছে। আসিলে তাঁহারও তো ভারী কষ্ট হইত।" তিনি কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার চিত্ত আর একটু বিচলিত হইল না কি?

লবঙ্গের সহিত কুমুদিনী গাড়িতে উঠিলেন। কোচ

বাক্সে কোচমানের পার্শ্বে সেই লোকটী উঠিয়া বসিল। ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে মৃদু কষাঘাত পড়িল। মোড় ফিরাইয়া অশ্বকে বেগে ছাড়িয়া দিল। গাড়ি ছুটিতে লাগিল। সহসা কেন জানি না, কুমুদিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কি যেন ঘোর বিষাদ বদন ব্যাদন করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু না—ভয় আশঙ্কার কোন কারণই থাকিতে পারে না। যখন পরম হিতৈষিণী মঙ্গলময়ী লবঙ্গলতা সকল সুখ সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছে, তখন ভয়ের কথা কিছুই নাই।

অনেক সঙ্কীর্ণ ও বিস্তৃত পথ অতিক্রম করিয়া অনতিকাল মধ্যে অশ্বযান মাথাঘষার গলির সন্নিকটে এক অপ্রশস্ত পথ-পার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড অথচ জীর্ণ ভবন-দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। গাড়ির উপরিস্থিত পুরুষ লাফাইয়া নীচে নামিল এবং একটু দূরে দাঁড়াইল। কুমুদিনী গাড়ির ভিতর হইতে উঁকি দিয়া দেখিলেন। সুরেশ বাবুর বাটীতে একবার তিনি আসিয়াছিলেন এবং তিন দিন বাস করিয়াছিলেন। সে বাটী অতি পরিষ্কার ও সুদৃশ্য। এরূপ বালি খসা, নোনা ধরা বাটী সুরেশ বাবুর ছিল না এবং সে ভবনের সম্মুখস্থ রাজপথও প্রশস্ত ও সুসজ্জিত বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তাঁহার চিত্ত অধিক মাত্রায় বিচলিত হইল।

কুমুদিনীর মনের ভাব বোধ হয় লবঙ্গ বুঝিতে পারিল। সে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল এবং কুমুদিনীর হাত ধরিয়া বলিল,—"তুমি শুন নাই বুঝি, সুরেশ বাবু বাসা বদল করিয়াছেন। শীঘ্র নাম; এখনই এদিক ওদিক হইতে গাড়ি আসিয়া পড়িলে গোল বাধিবে।"

কুমুদিনী কোনরূপ ভাবিবার সময় পাইলেন না। লবঙ্গলতার হাত ধরিয়া তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাড়ি প্রস্থান করিল।

তাঁহারা ভবন মধ্যে প্রবেশ করার পর, সেই পুরুষ দ্বার সন্নিধানে আসিল। লবঙ্গ তাহাকে বলিল,—"ঐ খানে থাক; যাহা করিতে হইবে তাহা পরে বলিব।"

ভবনের অবস্থা বড় মন্দ। ভিতরের উঠানে বন ও বড় বড় ঘাস। কোন দিকে কোন লোক নাই, কোথায়ও আলোক নাই। কুমুদিনীর মন বড়ই বিচলিত হইল। তাঁহার পা আর চলে না, শরীর আর স্থির থাকে না। আসন্ন ঘোর অনিবার্য্য বিপদের নিদারুণ পেষণে যেন তিনি মথিত হইয়া পড়িলেন।

চতুরা লবঙ্গ সকল কথাই বুঝিল। সে সেই পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দেও।"

তৎক্ষণাৎ সদর দরজা বন্ধ হইয়া গেল। লবঙ্গ তাহার পর কুমুদিনীকে বলিল,—"এ বাড়ীর বাহিরটায় এই রকম বন জঙ্গল। ভিতর খুব পরিষ্কার। সেখানেই মেয়েছেলে আর বাবুরা সকলে আছেন। তুমি আর একটু আসিলেই তাঁহাদের দেখিতে পাইবে।"

কুমুদিনী বুঝিয়াছেন, বিপদে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। তাঁহার তখন কথা কহিবার সাধ্য নাই, দাঁড়াইবার শক্তি নাই, নড়িবার সামর্থ্য নাই। তাঁহার দেহ সম্মুখে হেলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া লবঙ্গ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল,—"ভয় নাই, এত উতলা হইতেছ কেন? আইস—ভাল হইবে।"

লবঙ্গ তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যন্ত্রচালিত পুত্তলীর ন্যায় লবঙ্গের দেহে ভর দিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চারিদিকে তৃণগুল্মলতা-সমাবৃত প্রাঙ্গন মধ্যে মনুষ্য গমনাগমনের উপযোগী একটু ফাঁক ছিল। সেই পথ দিয়া তাঁহারা বাটীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও মানবের কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল না। সুরেশ বাবুর পত্নী পূর্ব্ববারের ন্যায় সাগ্রহে আসিয়া কুমুদিনীকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে আসিলেন না। নরেশ বাবুর একটা দূরাগত কণ্ঠধ্বনিও কুমুদিনীর আকুল প্রাণে শান্তি-সুধা সিঞ্চন করিল না। সুরেশ বাবুর অনেক দাসদাসী, একটা দাসীও তো আসিল না। কিন্তু উপর তলায় একটা ঘরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে বলিয়া বোধ হইল। লবঙ্গ বলিল,—"উপরে আইস, উপরে আসিলেই সকলের সহিত দেখা হইবে।"

কুমুদিনীকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া লবঙ্গ উপরে তুলিল। সিঁড়ি দারুণ অন্ধকার ও আবর্জ্জনা-পূর্ণ। উপরেও কেহ নাই। কোন দিকে কোন মনুষ্য মূর্ত্তি দেখা গেল না। যে ঘরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল লবঙ্গ সেই

দিকে কুমুদিনীকে লইয়া চলিল। সে ঘরে একটী মাদুর আছে, একটী মৃৎ কলসে জল আছে, একটী ঘটী আছে, একখানি থালা ও দুইটী বাটী আছে। এক কোণে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। মনুষ্য কোথায়ও নাই। সেই স্থানে গিয়া লবঙ্গ বলিল,—"এখানে বইস, একটু ঠাণ্ডা হও, তাহার পর সকল কথা বলিব।"

তখন সহসা কুমুদিনীর বুদ্ধি ও বিচার শক্তি ফিরিয়া আসিল, বাক্য-কথনের ক্ষমতা পুনরাগত হইল। একান্ত শক্তিহীন দেহে বলের সঞ্চার হইল। নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত কোমলস্বভাব, স্বল্পভাষী লোকেরাও কখন কখন ঘটনার পেষণে বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করে। তাহাদের সাহস হয়, বাক্যের তেজ ও শৃঙ্খলা হয় এবং দেহেও বল হয়। কুমুদিনী বলিলেন,—"লবঙ্গ তোমাকে আমি বড় বিশ্বাস করিয়াছিলাম। তুমি যাহা যাহা বলিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। তোমার কথায় সন্দেহ করিলেও পাপ হয় বলিয়া মনে করিয়াছি। আমি দুঃখিনী। আপনার দুঃখের বোঝা ঘাড়ে লইয়া দুঃখ কষ্টে দিন কাটাইতেছিলাম। তুমি কোথা হইতে আসিয়া আমাকে আমার প্রার্থিত সুখের রাজ্যে বসাইবার ব্যবস্থা করিলে। তুমি কে আমি জানিতাম না, আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য তোমাকে আমি ডাকিতে যাই নাই। তুমি নিজে আসিয়া আমার দুঃখ দূর করিবার ভার লইয়াছ। এক্ষণে আমাকে অকারণ এরূপ বিপদে ফেলিয়া, এরূপে আমার সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া তোমার কি লাভ হইল লবঙ্গ? আমি কখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে কেন লবঙ্গ আমার সহিত তুমি মিথ্যা কথা কহিয়া, নানা বাক্যে ছলনা করিয়া আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিলে? তোমার মনে কি আছে তাহা ভগবান্ জানেন। কিন্তু আপাততঃ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বেশ বুঝিতেছি, আমার ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। কেন লবঙ্গ, তুমি এ দুঃখিনী অবলাকে এরূপ বিপদে ফেলিতেছ? ইহাতে তোমার কি লাভ? আমি ব্রাহ্মণ কন্যা, আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমাকে আমার মা'র কাছে রাখিয়া আইস।"

কুমুদিনী কাঁপিতে কাঁপিতে লবঙ্গের চরণ ধারণ করিলেন। লবঙ্গ তাঁহার হস্ত হইতে চরণ মুক্ত করিয়া একটু পিছাইয়া গেল। তাহার মূর্ত্তি যেন পিশাচীর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল। তাহার কোমলতাপূর্ণ হাসি মাখা মুখ বিকট আকার ধারণ করিল। সে তখন বলিতে লাগিল,—"তুই আমার কোন অনিষ্ট করিস নাই; কিন্তু আমি যাহাকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভাল বাসি যাহার সুখে আমার সুখ, দুঃখে আমার দুঃখ, তুই কোন মতেই যাহার পায়ের নখেরও যোগ্য নহিস, সেই হেমলতার তুই পরম শত্রু। তুই বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে চাহিস্। তুই হেমলতার স্বামীকে দখল করিতে ইচ্ছা করিস্! তোর সর্ব্বনাশ করাই উচিত ছিল; উকুনের মত তোকে নখে পিষিয়া মারিয়া ফেলাই আবশ্যক ছিল। আমার বড় দয়া, আমি তাহা করি নাই। তোর ভালই করিয়াছি। তুই ভাত কাপড়ের অভাবে মরিতেছিলি। আমি তোকে এখানে আনিয়া তোর কষ্টের শেষ করিয়া দিয়াছি। আজিই তোর ধর্ম্ম যাইবে; এই রাত্রি হইতে তুই বেশ্যা হইবি। তোর অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দূর হইবে। আর আমার লাভ? নরেশ বাবু তোকে দর্শন করা থাক, তোর মুখও দেখিবে না; ভদ্র অভদ্র কোন সমাজেই তুই আর স্থান পাইবি না। হেমলতার কণ্টক দূর হইবে, অথচ তোর কষ্ট ঘুচিবে। আর তোর মা'র কথা বলিতেছিস্? সেও কি থাকিবে? এতক্ষণ হয়তো তাহার শেষ হইয়া গেল।"

কুমুদিনী কাঁপিয়া উঠিলেন। কাতর ভাবে বলিলেন, —"লবঙ্গ তুমি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকেই জানে, সতীত্বের কি মর্য্যাদা। লবঙ্গ, আমি কাহারও পথে কণ্টক হইব না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কাহারও কোন অনিষ্ট আমি জীবনে করিব না; তুমি দয়া করিয়া আমার সতীত্ব ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, তাহার উপায় করিয়া দেও। আর দোহাই তোমার লবঙ্গ, তুমি আমাকে রক্ষা কর। আর আমার দুঃখিনী জননী—তাঁহার কি অপরাধ? তোমার পায়ে পড়ি লবঙ্গ, তাঁহার কোন অনিষ্ট তুমি করিও না।"

আবার কুমুদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে লবঙ্গের চরণ ধারণ করিলেন। তখন লবঙ্গ বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। সে হাস্য-ধ্বনি শেলের ন্যায় কুমুদিনীর হৃদয়ভেদ করিয়া

দিল। বলিল,—"তোর মা'র শেষ করাই আগে দরকার। সে বাঁচিয়া থাকিলে লোকের কাছে সকল কথা বলিয়া দিবে। তাহা হইলে আমাদের মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া যাইবে—আমরা ধরা পড়িব। তাহার সর্ব্বনাশ করা চাই-ই-চাই। তাহার পর তোর সতীত্বের কথা! পোড়া কপাল! তোর আবার সতীত্ব কি? যার পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, তার আবার ধর্ম্ম কি? তোর ধর্ম্ম থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি? এখন না হউক, দশ দিন পরে তুই বুঝিতে পারিবি, আমি তোর কত উপকার করিয়াছি। এখন হইতে সকল কষ্টের শেষ হইবে। আর কথা কহিস্ না। যে পথে তুই আজি হইতে দাঁড়াইতেছিস্, যাহাতে ভাল হইয়া সে পথে থাকিতে পারিস, তাহারই চেষ্টা করিতে থাক।"

এতক্ষণে কুমুদিনী আপনার অবস্থা সম্যকরূপে প্রণিধান করিলেন। বুঝিলেন যাহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছেন, সে তাঁহার পরম শত্রু এবং সর্ব্বনাশ সাধনই তাহার ব্রত। তাহার হৃদয়ে দয়া নাই। কোন রূপ বিনয়ে বা কাতরতায় তাহার করুণা উৎপাদন করিবার আশা নাই। তখন তিনি বলিলেন,— "আচ্ছা লবঙ্গ আমি আর কোন কথা কহিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না। কিন্তু তুমি স্থির জানিও, যদি আমার এ ধর্ম্মে মতি থাকে, যদি স্বামী-পদে আমার অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে। ঈশ্বর দয়াময়। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন। আর আমি কোন কথা বলিব না।"

লবঙ্গ আবার সেই উৎকট হাসি হাসিল। তাহার পর বলিল,—"ঈশ্বর! ঈশ্বরের খুব দয়া। তাই তোকে ছারপোকার মত মারিয়া না ফেলিয়া, এই সুখের দশা ঘটাইতে আমার মতি হইয়াছে। থাক্ তুই এখন। আমার আর তোর সঙ্গে বাস করিবার সময় নাই। যাহার জন্য তোকে আনিয়াছি, সে আসিয়া আপন কার্য্য বুঝিয়া লইবে। আমি এখন যাই।"

কুমুদিনী বলিলেন,—"যাও! আর যেন এ জীবনে কখন তোমার মুখ দেখিতে না হয়।"

লবঙ্গ বলিল,—"বেশ্যার সুখ আর কে দেখিবে? তুই যতই মন্দ হ না কেন, আমার দয়ার সীমা নাই। এই পাশের ঘরে চাউল, দাইল, কাঠ কয়লা জল উনান হাঁড়ি সবই আছে। পেটের যখন জ্বালা উপস্থিত হইবে, তখন রাঁধিয়া খাইস্। আমি এখন যাই।"

কুমুদিনী কোন কথা কহিলেন না—ফিরিয়াও চাহিলেন না। লবঙ্গ চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লবঙ্গলতা পরদিন প্রাতে হরিপুরে ফিরিল। ফিরিয়াই সে হেমলতার সহিত সাক্ষাৎ করিল। হেমলতা তখনই শয্যাত্যাগ করিয়াছেন; ঘুমের ঘোর তখনও ভাল করিয়া যায় নাই। তথাপি দূর হইতে লবঙ্গলতাকে দর্শন-মাত্র হেমলতার দৈহিক জড়তা অপগত হইল। তিনি তীরবেগে আসিয়া লবঙ্গের কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তারপর?"

লবঙ্গ আদরের সহিত হেমলতার চিবুক ধারণ করিল। প্রেমে তাহার শরীর কণ্টকিত হইল। চক্ষু একটু আর্দ্র হইয়া পড়িল। একটু স্থির হইয়া লবঙ্গ বলিল,—"সকলই শুভ। যাহা যাহা করিতে সাধ ছিল, সকলই করিয়াছি। এখানকার খবর কি?"

হেমলতা বলিলেন,—"সে কথা বলিব এখন। আগে তুমি সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বল।"

লবঙ্গ বলিল,—"স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শুন। যে অভাগিনী কুঁজো হইয়াও চিত হইয়া শুইবার সাধ করিয়াছিল, যে তোমার দাসীর অযোগ্যা হইয়াও তোমার সমান হইতে চাহিয়াছিল, সে এখন কলিকাতায় এক জন সামান্য বেশ্যা হইয়াছে। নরেশ বাবু তাহাকে স্পর্শ করা দূরে থাক, তাহার নাম শুনিলেও ঘৃণা করিবে। কোন সমাজেই তাহার আর স্থান হইবে না। তাহার জীয়ন্তে মরা হইয়াছে।"

দন্তে দন্ত স্থাপন করিয়া হেমলতা বলিলেন,—"নরেশ! তোমার গৌরবের ধর্ম্ম-পত্নী এখন বাজারের বেশ্যা! তার পর?"

"তারপর এ কাজের এক সাক্ষী তাহার মা। সে বুড়ী, লোকের কাছে বলিলেও বলিতে পারে যে আমি তাহার মেয়েকে ফুসলাইয়া আনিয়াছি। সে পথ বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে নিকাশ করিয়াছি। বোধ হয় সে

কালি রাত্রিতে বেড়া আগুণে বেগুণ পোড়া হইয়া গিয়াছে।”

“বেশ করিয়াছ।”

“বেশ করিয়াছি সত্য। তবে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর মৃত্যু আর এক সতী নারীর ধর্ম্মনাশ ঘটাইলাম। পাপ বিস্তর হইল।”

হেমলতা হাসিয়া বলিলেন,—“পাপ! কিসের পাপ? আমার শত্রু নাশ করিতে যদি দশটা ব্রহ্মহত্যা, নারীহত্যা, ধর্ম্মনাশ করিতে হয়, তাহাও কর্ত্তব্য। যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলাই ধর্ম্ম। স্বামী আমার মনের মত নহে; আমি সে ভেড়াকান্ত স্বামীর প্রেমের জন্য তত ব্যাকুলও নহি। তথাপি সে আমার। যে আমার, সে আমারই থাকিবে। আমি তাহাকে কদাপি পরের হইতে দিব কেন? আমার পিতার প্রভূত অর্থ আছে; ক্ষমতাও আছে। আমি তাঁহার একমাত্র আদরের কন্যা। আমি যে আবদার ধরিব, তাহাই তিনি তৎক্ষণাৎ পূরণ করিবেন, ইহা আমি বেশ জানি। তবে আমি কেন শত্রু নাশ করিতে ভয় পাইব? তুমি বেশ করিয়াছ দিদি। এ জগতে তুমি আমার যত আপনার তাহা আমি জানি। তোমার গুণ বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তোমার ঋণ কখনও শোধ দিতে পারিব না। তথাপি তোমাকে এ কার্য্যের জন্য পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক। কি পুরস্কার তুমি চাহ বল? তোমাকে অদেয় কিছুই নাই।”

সকল দুর্বৃত্তেরই একটা অত্যাসক্তি থাকে। সংসারে যত দস্যু, যত নরহন্তা, যত উৎপীড়ক জন্মিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাবতেই কোন না কোন স্থানে প্রেমসূত্রে বাঁধা। অনায়াসে নরহত্যা করিতে যাহার হৃদয়-একটুও বিচলিত হয় না, অকারণে লোকের সর্ব্বনাশ করিতে যাহার প্রাণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, তাহারাও কোন না কোন স্থানে অচ্ছেদ্য কোমল প্রণয়-মালিকায় গ্রথিত। হয় অপত্য স্নেহ, না হয় নারীর প্রেম, না হয় পিতৃমাতৃ ভক্তি ইত্যাদি কোন না কোন কোমল প্রবৃত্তি সেই সকল কঠোর হৃদয়কে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা স্বহস্ত-ছিন্ন ঊর্দ্ধনেত্র ভূপতিত শোণিত-লিপ্ত নৃমুণ্ড দেখিয়া শিহরে না, যাহারা নিষ্পাপ শোভাময় শিশুর সুকোমল শরীর অসির আঘাতে দ্বি-খণ্ড করিতে কাতর হয় না; নারীর আর্ত্তনাদ বা শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি যাহাদিগকে এক তিলও পাপ-পথ হইতে বিরত করিতে পারে না; সেই কঠোর হৃদয় মানবেরাও হয়তো কোন এক স্থানে শিশু বিশেষের চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়াছে দেখিলে ব্যথায় আকুল হয়। অথবা কোন নারীর নয়নে একবিন্দু মাত্র অশ্রু দর্শনে সর্ব্বনাশ হইয়াছে জ্ঞান করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে, অথবা কোন বৃদ্ধ যথাসময়ে তামাক খাইতে পান নাই জানিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া অনুগত জনগণের জীবননাশে উদ্যত হয়। দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব নারায়ণ মনুষ্য হৃদয়ে এতই রহস্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, চিরদিন চিন্তা করিয়াও তাহার মর্ম্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। মানব-হৃদয় রহস্যের খনি এই দুরবগম্য তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া কবি-শ্রেষ্ঠ লর্ড বাইরণ “করসেয়ার” নামে এক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন। কনরাড কঠিন হৃদয়, পরস্বাপহারী জল দস্যু। কিন্তু হায়! সেই দুরন্ত বীরও মেডোরা নাম্নী ক্ষুদ্রকায়া স্বল্পভাষিণী বালিকার প্রেমে মুগ্ধ। মানুষ অনেক সময়ে পর-তৃপ্তির জন্যেও পাপাচরণ করে। কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই যে সংসারে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয় এমন নহে। অনেক সময়ে এক জনের মুখে একটু হাস্য দেখিবার জন্য অপরে ঘোরতর নৃশংস পাপের অনুষ্ঠান করে। যাহার সুখের ও সন্তোষের জন্য পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, অনেক সময়ে সে হয়তো জানেও না যে, তাহার বিনোদনের নিমিত্ত বসুন্ধরা কিরূপ পাপে পঙ্কিল হইতেছে। কিন্তু এ বিচারে একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন। আমাদের সে স্থান ও সামর্থ্য কই?

বাস্তবিক হেমলতাকে যে লবঙ্গ বড়ই ভাল বাসে। হেমলতার পরিতৃপ্তির জন্য লবঙ্গ সকলই করিতে পারে। হেমলতার জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্যের হিতাহিত বা অগ্রপশ্চাৎ বিচারে তাহার প্রবৃত্তি নাই। শত দুষ্কর্ম্ম করিয়া যদি হেমলতাকে বিনোদিত করা যায়, তাহা লবঙ্গ অন্যায় বা অকর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। কাহারও এরূপ অতুলনীয় প্রেমের আস্পদ হওয়া বড়ই সুখের কথা সন্দেহ নাই। লবঙ্গ বলিল,—“দিদি, আমার পুরস্কার আমি পাইয়াছি। যখন তুমি আমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছ, আমার কৃতকার্য্যে যখন তোমার তৃপ্তি হইয়াছ, তখনই আমার সকল পুরস্কার পাওয়া হইয়াছে। আর পুরস্কার কি আছে? তুমি সুখে থাক, কোন সামান্য কারণেও যেন তোমাকে কষ্ট পাইতে না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।”

লবঙ্গ চুপ করিল। তাহার নয়নে জল। হেমলতা বলিলেন,—“সত্যই লবঙ্গ দিদি, তোমার ভালবাসার সীমা নাই।”

হেমলতা স্বকীয় অঞ্চল বস্ত্রে লবঙ্গের নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। লবঙ্গ জিজ্ঞাসিল,—“এখানকার খবর?”

হেমলতা বলিলেন,—“বাবু তো কয়েদেই আছেন। কোথায় বাহির হইবার উপায় নাই। সর্ব্বদা চিন্তিত।”

“তারপর?”

“আমার সহিত প্রায় দেখা হয় না; দেখা হইলেও ভাল করিয়া কথা হয় না।”

“রাত্রে তোমার কাছে থাকেন তো?”

“না থাকাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে বসিয়া লেখাপড়া করা হয়। তাহার পর যখন আইসে তখন আমি ঘুমাইয়া পড়ি। যখন আমার ঘুম ভাঙ্গে, তাহার আগে বাহিরে চলিয়া যায়। এই যে গেল।”

লবঙ্গ বলিল,—“ভাবগতিক কি রকম?”

হেললতা বলিলেন,—“শরীর খুব খারাপ। উপায় থাকিলে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত।”

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল,—“যায় যাক্। অনেক ঠিকে জামাই বাবু ধরিয়া আনা যাইবে।”

হেমলতা হাসিতে হাসিতে লবঙ্গের পৃষ্ঠদেশে কিল মারিয়া বলিলেন,—“দূর পোড়ারমুখি! সে কথা কি বলিতে আছে?”

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল,—“রাধাকৃষ্ণ! ভাবিতে আছে—বলিতে কখনই নাই। আমি এখন মা-ঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিতে যাই। আবার এখনই আসিতেছি।”

লবঙ্গ প্রস্থান করিল। হেমলতা অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া অনেক কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনিও সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

সেই দিন মধ্যাহ্ন কালে ভোজন কক্ষে নরেশ বাবু আহার করিতে বসিয়াছেন। নিকটে হেমলতার জননী বসিয়া আছেন। নরেশ বাবুর সে লাবণ্য নাই, সে উৎসাহ নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই। পীড়িত ও কাতর ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার দেহ যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার আহার নাই বলিলেই হয়। গৃহিণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া আর চারিটী অন্ন ও একটু দুধ খাইতে অনুরোধ করিতেছেন। নরেশ বলিলেন,—“মা! আমি আপনাকে সত্যই গর্ভধারিনী জননী জ্ঞান করি। আপনি ভাবিয়া দেখুন না, এরূপ কয়েদী হইয়া থাকিতে হইলে কাহারও শরীর ভাল থাকে কি? বাটীর বাহিরে যাইতে আমার সাধ্য নাই, বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাতে আমার অধিকার নাই, স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিতে আমার ক্ষমতা নাই। ইহাতে আমার আনন্দ উৎসাহ কিছুই থাকিতে পারে কি? মা, আমি সেই দিন চলিয়া যাইতাম, কেবল আপনার আজ্ঞা না পাওয়ায় আমার যাওয়া হয় নাই; তাহাতেই আমার এই দুর্গতি। যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে আপনি অনুমতি দিলে, আমি আবার প্রস্থানের উপায় করি।”

গৃহিণী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“এরূপ ভাবে থাকিতে হইলে শীঘ্রই যে তোমার কঠিন পীড়া হইবে সন্দেহ নাই। কর্ত্তা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। তিনি রাগিয়া উঠিলে সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারেন। শেষে আবার হিতে বিপরীত ঘটিবে। তা বাবা, যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে কোন উপায়ে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তর গমন করা উচিত বটে তবে শেষ রক্ষার কি হইবে?”

নরেশ বলিলেন,—“মা সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। সম্প্রতি আমি যে বিপদে আছি, তাহার অপেক্ষা কোনই গুরুতর বিপদ আমার ঘটিবে না। আর আমি বেশী দিন কোথায় থাকিব না, মা। শীঘ্র আসিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব। মা, মা, আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি প্রস্থানের চেষ্টা করি।”

গৃহিণী বলিলেন,—“তা বাবা, সাবধানে কাজ করিও। বড় সর্ব্বনেশে লোক, তিলে তাল হয়। আমি তোমাকে না দেখিলে মরিয়া যাইব, এ কথা যেন কখন ভুলিও না। তা বাবা, যাহা ভাল হয় কর।”

নরেশ বলিলেন,—“আপনার চরণ আশীর্ব্বাদে আমার কোনই বিপদ হইবে না। আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ আমি কখনই ভুলিব না। শীঘ্র আসিয়া আপনাকে দর্শন দিব, আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন।”

উল্লাসে নরেশচন্দ্র আহার সমাপ্ত করিলেন। হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া তিনি বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দাসী তাম্বুল আনিয়া থাকে; কিন্তু আজি এ কি সৌভাগ্য স্বয়ং শ্রীমতী হেমলতা দেবী পানের ডিবা হাতে লইয়া উপস্থিত হইলেন। নরেশ বলিলেন,—এ কি, তুমি যে?”

হেমলতা বলিলেন,—“দুইটা কথা বলিব বলিয়া আসিয়াছি। রাগ করিলে নাকি?”

নরেশ বলিলেন,—“গোলামের কি রাগ সাজে? যে হতভাগ্য আত্মবিক্রয় করিয়া তোমাদের অন্নদাস হইয়া আছে, সে রাগ করিবে কোন সাহসে? তুমি মুনিব আমি চাকর ইহাই যেখানে সম্বন্ধ, তখন রাগ শোভা পায় কি? এক্ষণে বল কি তোমার হুকুম।”

হেমলতা বলিলেন,—“একটা কথা তোমাকে শুনাইতে আসিয়াছি, হুকুম করিলে না করিতে পারি এমন নহে তবে এখন কোন হুকুম করিতে আসি নাই।”

নরেশ অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—“বল, কি কথা শুনাইতে চাহ?”

হেমলতা বলিলেন,—“তুমি শুনিয়াছ কি না জানি না—বড় দুঃখের কথা—বড় লজ্জারও কথা। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে।”

নরেশ বলিলেন,—“না—কোন দুঃখের বা লজ্জার কথা আমি শুনি নাই।”

হেমলতা বলিলেন,—“তোমার—কুমুদিনীর কোন খবর জান কি?”

নরেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—“তাঁহার কোন সংবাদ জানা তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। তথাপি যদি তুমি কিছু জানিতে পারিয়া থাক, তাহা শুনিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু সে অভাগিনীর জীবন কেবলই দুঃখময়। সুতরাং দুঃখ ও লজ্জার কথা

অনেকেই শুনিতে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহা আমার বিশ্বাস, যদি তাঁহার সম্বন্ধে কোন লজ্জাজনক কথা তুমি শুনিয়া থাক, জানিবে তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার দুরবস্থার হেতু ঘটিয়াছে।"

হেমলতা একটু হাস্য করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"তোমার কথাই সত্য বটে। যে দারুণ ঘৃণা-জনক জীবিকা সে এখন অবলম্বন করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই তাহার অত্যন্ত দুরবস্থার হেতুই ঘটিয়াছে।"

নরেশ বলিলেন,—"অসম্ভব নহে। কি হইয়াছে শুনি।"

হেমলতা বলিলেন,—"তোমার গৌরবের কুমুদিনী এখন কলিকাতায় বাজারের বেশ্যা হইয়াছে।"

নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"মিথ্যা কথা! অসম্ভব কথা! আমি এরূপ কথা কাহারও মুখে শুনিতে চাহি না। তুমি যদি এই মিথ্যা কথা প্রচার করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাক, তাহা হইলে আর কোন কথার কাজ নাই। তুমি চলিয়া যাও! তোমার কথা আমি শুনিব না।"

হেমলতার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"তুমি সকল সময়েই আপনার অবস্থা ভুলিয়া যাও। আমাকে তুমি এখান হইতে যাইতে বলিতেছ। আমাকে এ বাটীর কোন স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবার তুমি কে? তোমাকে আমি ইচ্ছা করিলেই তাড়াইয়া দিতে পারি; কিন্তু তুমি! তুমি আমার পিতার অনুগ্রহজীবী তুমি আমাকে তাড়াইতে চাহ কোন্ সাহসে?"

নরেশ বলিলেন,—"কথা ঠিক। আমি একবারও ভুলি নাই যে, আমি তোমাদের ক্রীতদাস। কিন্তু এ অবস্থা আমার প্রার্থনীয় নহে এবং এজন্য আমি কাহারও নিকট কৃতজ্ঞ নহি। তোমার সঙ্গে আমার প্রেমের বন্ধন থাকিলে আমি এ অবস্থায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যখন তুমি ঘটাইলে না, তুমি যখন নিয়ত আপনাকে প্রভু আমাকে ভৃত্য ভিন্ন আর কিছুই মনে করিলে না, তখন তোমাদের অনুগ্রহ আমার পক্ষে নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি তোমরা বিরক্ত হইয়া আমাকে তাড়াইয়া দেও, তাহাতে আমি সুখী ভিন্ন অসুখী হইব না। আমি তোমার পিতার অনুগ্রহজীবী নহি। তিনি একদিন দায়গ্রস্ত হইয়াই আমাকে কন্যাদান করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। আমি কর্ম্মক্ষম পুরুষ। অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত কাহারও নিকট আমি অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে চাহি না।"

হেমলতা বলিলেন,—"তোমার অহঙ্কারের মাত্রা ক্রমেই অতিশয় বাড়িয়া উঠিতেছে। পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার আগে। তোমার সর্ব্বনাশ নিকট।"

নরেশ বলিলেন,—"তোমার ভয়ে ভীত হইয়া কাজ করা কি দুর্ভাগ্য। ন্যায়, ধর্ম্ম ও বিচার মতে তুমি আমার অধীন। তোমার পিতার প্রতাপ বা ঐশ্বর্য্য এবং তোমার অহঙ্কার বা তেজ কিছুই তোমার অধীনতা দূর করিতে পারে না। কিন্তু তোমার ন্যায় সঙ্গিনী লইয়া আমি সুখী হইব না, এজন্য তোমাকে আমি ক্ষমা করিতেছি—তোমায় স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দিতেছি। তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমি তোমাকে আর চাহি না।"

তখন হেমলতা দলিত-ফণা ফনিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"কি! আমি তোমার অধীনা! তুমি আমাকে আর চাহ না! তোমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে আমি পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, দয়া করিয়া এতদিন আলাপ করিতেছি, ইহা তুমি ভাগ্য বলিয়া মান না। থাক তুমি। তোমার এ দারুণ পাপের যথেষ্ট শাস্তি হইবে। তোমাকে—রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিয়া আমার চরণ তলে মাথা লুটাইতে হইবে, নয়ন জলে আমার চরণ ধৌত করিতে হইবে, আজীবন আমার একান্ত অনুগত হইয়া থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তবে তোমাকে ক্ষমা করিব।"

আর কোন কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া হেমলতা সে স্থান হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন।

হেমচন্দ্র।

জুড়ালে কি কবিবর মরমের জ্বালা,
অসহ্য মনের কষ্ট, দুঃখ, দৈন্য, তাপ?
কৃপার সে 'আহা' বাণী হ'তে পরিত্রাণ
পেলে কি হে অভিমানি, এতদিন পরে?

চ'লে গেছ'—বেঁচে গেছ'—কি বলিব আর,—
শত্রুরো এমন দশা যেন নাহি হয়,
উন্নত শিখরে উঠি' লুটেছ গহ্বরে,—
স্মরি' সে অতীত স্মৃতি চোখে আসে জল।

এই জল তব পদে পৌছিবে কি আর?
ভক্তের উত্তপ্ত শ্বাস শুনিবে কি কানে?
করিবে কি আশীর্ব্বাদ সেই মত দেব?
বুকে বুক রেখে, আহা, ভাসায়ে বয়ান!

* * * * *

প্রাণ দিয়ে দেব-ঋণ শোধিলে হে কবি,
মরতে রাখিয়ে গেলে করুণার ছবি!

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

Photo from the original, drawn by J. P. Ganguli.

গ্রাম্য স্নানের ঘাট।

৬ষ্ঠ ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩১০। | ৪র্থ সংখ্যা।

হেমচন্দ্র।

আজ বড় ব্যথিত হৃদয়ে আমরা এ সভায় সম্মিলিত হইয়াছি। কবিকুল-শেখর, কীর্ত্তিমান্ হেমচন্দ্র আর নাই! বঙ্গের সাহিত্য-সমাজ অন্ধকার করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীর আশা-রঞ্জিত হৃদয় শোক-মলিন-করিয়া, আত্মীয়-স্বজন-অনুরক্ত-বন্ধু-বান্ধবকে কাঁদাইয়া, বাঙ্গালীর হেমচন্দ্র সাধনোচিত লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বাঙ্গালীর আজ বড় দুর্দ্দিন!

যাইতে হইবে সকলকেই; কিন্তু দুঃখ এই,—যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না। তেরশত সালের—সেই "জোড়া শূন্যের" বৎসরে, বঙ্কিমচন্দ্র গিয়াছেন,—কিন্তু সে সোণার বঙ্কিম আর হইল না; তেমনি—এই "বিজোড়-শূন্যের" বৎসরে,—ঠিক দশ বৎসর পরে হেমচন্দ্র গেলেন,—এই হীরার হেমও আর হইবে না! উভয়েরই আসন শূন্য—ভগবান্ জানেন, এই শূন্যাসন আর পূর্ণ হইবে কি না!

পরন্তু কবি গিয়াছেন, না বাঁচিয়াছেন!—অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর সংসারের হাত এড়াইয়াছেন! প্রকৃতই, উত্তর-জীবনে হেমচন্দ্রের সর্ব্ববিধ কষ্টই ভোগ হইয়াছিল। সে কষ্টের কথা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করিলে, হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়, চক্ষে জল আইসে, বাঙ্গালী-জীবনে ধিক্কার জন্মে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবিও যেন, বহু পূর্ব্বে, অন্তরের অন্তরে, আপনার এই ভাবী বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি, বাঙ্গালী-গৌরব শ্রীমধুসূদনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন,——

"হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে!
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে?"

কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁহার আত্ম-জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে।

এক হিসাবে বলিতে গেলে, এই দারিদ্র্য-দুঃখই

কবিকে পূর্ণ-পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছিল,—কবি-জীবন সম্পূর্ণ ও সফল করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কিন্তু আজ সে কথা নহে, আজ আমাদের কাঁদিবার দিন। হেমচন্দ্রের দুর্ল্লভ 'কবি-প্রতিভা' স্মরণ করিয়া,—সেই প্রতিভা ইহ জন্মের মত হারাইয়া,আজ আমাদের ভক্তি-অশ্রু ফেলিবার দিন। কবিও অন্তরের অন্তরে তপ্তশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, অরুন্তুদ যন্ত্রণায় কাঁদিয়া গিয়াছেন,—আমরাও আজ সার্ব্বজনীন সহানুভূতির শুভ-সম্মিলনে, তাঁহার উদ্দেশে, এক বিন্দু অশ্রু ফেলিব। বস্তুতঃ স্বর্গীয় মহাত্মা হেমচন্দ্রের জন্য আমাদিগকে কিছু করিতে হইবে। অন্ততঃ সেই উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশে, আজ এই শোক-সভা। "সাহিত্য সভার" পক্ষ হইতে আজ আমি আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি;—আপনারা সকলে মিলিয়া-মিশিয়া একযোগে, আপনাদের প্রিয় কবির জন্য কিছু করুন। জীবিত কালে তিনি যে যশঃ ও সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন, এবং বিধির বিধানে শেষ দশায় অন্ধ হইয়া, যে দুর্ব্বহ দেহ-ভার বহন করিয়া গিয়াছেন,—আজ একটু উদার-উন্মুক্ত সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে, আপনারা সেই অবস্থা স্মরণ করুন। স্মরণ করুন যে, 'বৃত্রসংহারের কবি,'—'দশমহাবিদ্যা' ও 'কবিতাবলী' প্রভৃতির রচয়িতা,—আপনাদের সাধের বাঙ্গলা সাহিত্যে কি অমূল্য মণিমাণিক্য রাখিয়া গিয়াছেন! যাঁহার স্বদেশ-ভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতি 'জাতীয় কবি-জীবনের' আদর্শস্থানীয়;—যাঁহার তেজস্বিনী ভাষা ও উন্মাদিনী শক্তি—কাব্য, মহাকাব্য, গীতি-কাব্য, খণ্ড-কাব্য, বঙ্গ-কাব্য প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েরই প্রসূতি;—যাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে প্রাণ উৎসাহে মাতিয়া উঠে,—হৃদয় অপূর্ব্বভাবে বিভোর হয়;—সেই ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষের পুণ্য-স্মৃতির সম্মান রক্ষার্থ আপনারা কি কিছু করিবেন না? কবি এখন অবশ্য সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় গিয়াছেন;—নিন্দা বা যশঃ তিরস্কার বা পুরস্কার এখন তাঁহার নিকট তুল্য-মূল্য;—তথাপি ব্যবহারিক হিসাবে, কৃতজ্ঞতার কিছু নিদর্শন, আমরা রাখিতে বাধ্য;—অন্ততঃ রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। মৃত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার প্রীত্যর্থে, লোকে শ্রাদ্ধ-শান্তি করে,—কত দান-ধ্যান করে;—পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণ ভরিয়া হরিধ্বনিও করিয়া থাকে;—বাঙ্গালীর জাতীয় কবির হিসাবে হেমচন্দ্রের প্রতিও আমাদের সেইরূপ কিছু সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এ সম্মান, প্রকারান্তরে আমাদের আত্ম-সম্মানরূপেই পরিগণিত হইবে। কেননা, প্রকৃত মানীকে স্বয়ং ভগবানই মান দিয়া রাখিয়াছেন,—তুমি আমি তাহার কতটুকু বাড়াইতে বা কমাইতে পারি? মাননীয় কবিও তাঁর অবিনশ্বর কীর্ত্তি, আপন অমর কাব্যাবলীতেই রাখিয়া গিয়াছেন;—তুমি আমি তাঁর নূতন মান আর কি দিব? তবে, আমরা যে মানুষ—তাহা প্রমাণের জন্য আমাদের আত্ম-ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত,—আমাদের ভাবী বংশধরগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ—এইরূপ একটা কিছু করা বাঞ্ছনীয় বটে। কেননা, আমরা যেন আপন আপন মনকেও বুঝাইতে পারি যে, দেহ রক্ষার্থ, আহার সংস্থানের জন্য, যেমন আমাদিগকে কতই না চেষ্টা করিতে হয়;—তেমনি আমাদের আত্মার পুষ্টিকর আহার, যিনি আপন হৃদয়ের রক্ত দিয়া—স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়া গিয়াছেন,—বিনা আয়াসে, শুইয়া-বসিয়া, মনে করিলেই যাহা আমরা পাইতে পারি,—সেই জীবন-সুহৃদ্, পরার্থপর প্রিয় কবির কৃতজ্ঞতা-নিদর্শন আমরা কিছু রাখিব না? ভ্রাতৃগণ! যে মহানুভব ইংরেজের উচ্চ আদর্শে আমাদের জাতীয়-জীবন গঠনের শুভ-সূচনা হইয়াছে;—যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমরা একযোগে একতাসূত্রে কাজ করিতে শিখিতেছি,—সেই মহাপ্রাণ ইংরেজের জাতীয় আদর্শে—আমরা আমাদের প্রিয় কবিরও সংবর্দ্ধনা না করিব কেন? ইংলণ্ডে কোন প্রতিভাবান্ কবির মৃত্যু হইলে কত শোক-সভা হয়,—কত স্মৃতি-সমিতি বসে,—কত আয়োজন-আন্দোলন-বিচার-বিতর্ক হইয়া থাকে,—মৃত কবি তখন জীবিতস্বরূপ লোকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, দেবতার ন্যায় পূজা পান;—তাঁহার পুত্র-পরিবার বা স্বজন বন্ধুগণ তখন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া আপনাদের উপস্থিত দারিদ্র্য-দুঃখ বা সর্ব্ববিধ মনঃক্ষোভ ভুলিয়া গিয়া থাকেন;—বিংশ শতাব্দীর এই জ্ঞান-বিজ্ঞানময় আলোকে, এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে, কি তাহার এতটুকু ছায়াপাতও হইবে না? আপনাদের অবিদিত নাই যে, মহাকবি সেক্সপীয়র

প্রভৃতি সকল প্রতিভাবান্ মৃত কবিই,—তত্রত্য ভক্ত অধিবাসীবৃন্দের নিকট দেবরূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন;—তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন ও পত্রপুষ্পশোভিত পবিত্র সমাধি-স্তম্ভ কত যত্নে, কত সমাদরে সংরক্ষিত হইতেছে।—সেক্সপীয়রের জন্মস্থান—সেই ষ্টার্টফোর্ড-অন্-আভন্ এখন এক তীর্থ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে;—যে কোন বিদেশীয় পর্য্যটক—এমন কি, কাব্যানুরাগী সম্রাট পর্য্যন্ত হৃদয়ের পরিপূর্ণ অনুরাগে সে তীর্থে গমন করিয়া থাকেন;—মহাকবির উদ্দেশে কত স্তুতি-গাথা, কত শোক-কবিতা তথায় লিখিয়া রাখিয়া আসেন;—মহাকবি যে কক্ষে প্রথম হাসি হাসিয়াছিলেন;—যে পুণ্যময় কক্ষে তাঁহার প্রথম স্বর-সঙ্গীত ঝঙ্কারিত হইয়াছিল;—সেই পবিত্র প্রকোষ্ঠে—কত ভক্তিভরে, কত সম্মানসূচক ভয়ে ভয়ে, একবার মাত্র প্রবেশ করিয়াই কৃতার্থ হন!—মহাকবির সেই প্রাসাদ—সেই চিরস্মরণীয় সূতিকা-কক্ষ আজ তিন শত বৎসরেরও অধিক হইল সংস্থাপিত হইয়াছে;—এখন কত যত্নে, কত সন্তর্পণে তাহার সংস্কার-ক্রিয়া সাধিত হয়;—যেখানে যেটি যেমন ভাবে আছে, সেখানে সেটি যতদূর সম্ভব—তেমনি ভাবে রাখিতে হইবে—এজন্য কত সতর্কতা—কত শিল্পনৈপুণ্য অবলম্বন করিতে হয়;—কেননা লোকে ভক্তি, বিস্ময়ে ও ভাবে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি,—সেই পুণ্য-নিদর্শন পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবে!——কবির সেই প্রিয় জন্মস্থানে এখন কত সভা, কত সমিতি, কত পাঠালয়, কত রঙ্গালয় সংস্থাপিত হইয়াছে;—বাৎসরিক উৎসবে তথায় কত অসংখ্য লোকের সমাগম হয়;—রেল-কোম্পানির কত স্পেশাল ট্রেণও তজ্জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে;—মহাকবির প্রতি সে সম্মানের কথা স্মরণ করিলেও প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়;—চোখে জল আসে।—জীবিতকালে কবি এ প্রীতিসম্মান, সম্যক্ উপভোগ করিতে না পারিলেও, এখন তাঁহার মুক্ত আত্মা সেই আনন্দময় নিত্যধাম হইতে ইহা দর্শন করিয়া, তদীয় কাব্য-উপলব্ধকারী অকপট ভক্তবৃন্দের প্রতি, উদ্দেশে, অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া থাকেন!—বলুন দেখি, ভক্তি ও প্রীতির—ইহা কি সুন্দর অভিব্যক্তি!

অবশ্য সে ইংলণ্ড,—আর এ বঙ্গদেশে!—তুলনা হইতেই পারে না।

তুলনা হইতে পারে না, তা জানি। পরন্তু ইহাও জানি যে, মনুষ্য-হৃদয় সর্ব্বত্র এক ধাতুতে গঠিত। ইংলণ্ডে যে প্রতিভা-স্মৃতি পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে, ক্ষুদ্র বঙ্গে সেই স্মৃতি কি সামান্য একটি স্মরণীয় বিষয়েও পর্য্যবসিত হইতে পারে না? চেষ্টা করিলে বোধ হয়—হয়। আন্তরিক—অকপট—নিঃস্বার্থ চেষ্টায় বোধ করি একটু ফলও ফলিতে পারে।

হাঁ, মনে হইতেছে, দশ বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্যও একবার এইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল,—সে চেষ্টা একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু একবার ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া আর বার যে সে চেষ্টা করিতে নাই,—এমন কোন অর্থ নাই। বেশী আড়ম্বর না করিয়া, মনে জ্ঞানে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিলে, বোধ হয় ফল ফলিতে পারে। দশের অনুরাগ ও ইচ্ছা থাকিলে, না হয় কি? বেশী নয়,—হয়ত একাই কোন মহানুভব ব্যক্তি—হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র—দুয়েরই জন্য দুইটি স্মৃতি-চিহ্ন সংস্থাপিত করিয়া দিতে পারেন। অধিক দূর যাইতে হয় না,—হয়ত এই মহানগরীতে বসিয়াই তাহা সংগৃহীত হইতে পারে। আর,—বলিব কি?—আর মনে হয়, যেন উপস্থিত—এই সভাস্থলেই এমন কোন ভাগ্যবান্ মহাত্মা আছেন, যিনি মনে করিলেই, এই মুহূর্ত্তেই আমাদের আশা পূর্ণ করিতে পারেন!

কিন্তু, বেশী আশা করা ভাল নয়।—বেশী আশা করিলে নাকি বিড়ম্বিত হইতে হয়। অতএব, ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা দশে মিলিয়াই কাজ করুন!—হেমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি-স্বরূপ, বাঙ্গালা সাহিত্যের মর্য্যাদা-কল্পে, আপনারা স্থায়ী একটা কিছু কাজ করুন। কেবল মাত্র তৈল-চিত্র বা পট-ছবির পক্ষপাতী আমরা নহি। নব্যসাহিত্যে, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন গদ্যকাব্যের সম্রাট ছিলেন,—বর্ত্তমান যুগের পদ্যসাহিত্যে,—জাতীয় মহাকাব্যে, হেমচন্দ্রও তেমনই সম্রাট্‌স্থানীয় হইয়া অতুল যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।—উভয়েই প্রতিভাবান্;—উভয়েই মহাকবি পদবাচ্য।

এ হেন হেমচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের মনে হয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পরীক্ষা-বিভাগে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা রচনার জন্য, একটি ছাত্রকে "হেম-

চন্দ্র-বৃত্তি” —অভাবে “হেমচন্দ্র-পদক” পুরস্কার দিতে পারিলেই যেন ঠিক হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও, অনেক যত্ন-চেষ্টার পর, ইহাই হইয়াছে। ইহার অধিক আশা করা, উপস্থিত সময়ে, আমাদের পক্ষে একরূপ বিড়ম্বনা। যাঁহার এ সৌভাগ্য হইবে, তিনি বাঙ্গালীর ‘জাতীয় কবি’ হেমচন্দ্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া,—বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালী জাতির মুখ রক্ষা করুন,—এবং তৎসঙ্গে নিজেও কৃতার্থ ও ধন্য হউন।—তাহাতে হেমচন্দ্রেরও স্থায়ী স্মৃতি-সম্মান রক্ষিত হয়,—আর বাঙ্গালা সাহিত্যেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।—অনেক ছাত্র প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য, বঙ্গীয় কাব্য-গ্রন্থের অনুশীলন করিতে বাধ্য হইবে।—এ বিষয়ে ভদ্র মহোদয়গণ, বোধ হয় এক-মত হইবেন। যদি কাহারও মতানৈক্য থাকে, তবে তিনি অনায়াসে এই সভার মাঝে তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন ;—প্রবন্ধ-লেখক একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে মাত্র।

আমরা, ইহার অভাবে, আরও একটা বিষয় ভাবিয়া রাখিয়াছি। হেমচন্দ্রের ভাগ্যবশতই হউক, আর আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি নিবন্ধনই হউক,—যদি আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হয়,—বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তির উপোযোগী চাঁদা যদি আমাদের মধ্যে না উঠে, তবে নিদান পক্ষে, এই “সাহিত্য-সভা” হইতেই প্রতিবৎসর একটি “হেমচন্দ্র-পদক”—স্বর্ণেরই হউক আর রৌপ্যেরই হউক,– বাঙ্গালার নব্য-লেখকগণের মধ্যে প্রদত্ত হইতে পারে। অর্থাৎ যিনি উৎকৃষ্ট কবিতা-পুস্তক বা গদ্য-কাব্য লিখিয়া সাহিত্য-সভায় প্রেরণ করিবেন,—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিচার অনুসারে,—তিনিই সে পদক পুরস্কার পাইবেন। বোধ হয়, এই অতিমাত্র সামান্য স্মৃতি-চিহ্নটি অনায়াসে সমাধান হইতে পারিবে।

আর একটি কথা ;—সভ্যগণ যদি অভয় দেন, ত বলি। হেমচন্দ্রের শেষ-জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সেই প্রিয় কবিকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব স্বদেশ-ভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতির কথা ভাবিয়া, তাঁহার দুর্ভাগ্যবতী বিধবা পত্নীর অবস্থাটি, এ সময় একবার স্মরণ করুন। স্মরণ করুন যে, অলকার অতুল ঐশ্বর্য্য-চিত্রকর, বাঙ্গালী-গৌরব, মহাকবি হেমচন্দ্রের উন্মাদিনী ভার্য্যা,—আজ অন্যের সাহায্যাবলম্বনে বাধ্য হইয়া, দুর্ব্বহ দেহ-ভার বহন করিতেছেন! আপনারা ও এই সভা যদি সঙ্গতবোধ করেন, তবে এই সময়, সেই হিন্দু বিধবাকে, সান্ত্বনা সহানুভূতি-সূচক পত্রসহ, কিছু অর্থ-সাহায্যও পাঠাইয়া দিন।—ইহা আমার বিনীত প্রার্থনা।

হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবার সময় এখন আসে নাই। এত শীঘ্র কবির জীবন-চরিত লেখা সম্ভবেও না,—উচিতও নয়। কেননা, কবির জীবনে এমন অনেক ঘটনা থাকিতে পারে বা আছে, যাহা প্রকাশে, উপস্থিত সময়ে তাঁহার পারিপার্শ্বিক আর দশ-জনের ভাল-মন্দের কথাও বলিতে হয়। অপ্রিয় সত্য, উপস্থিত মুহূর্ত্তে, সকলের ভাল না লাগিতেও পারে। এ কারণেও বটে, আর সূক্ষ্ম হৃদয়-কথা সম্যক্‌ভাবে পর্য্যালোচনা করিবার সময়াভাবেও বটে, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমি আপনাদের এ সাধ পূর্ণ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। খিদিরপুরে বাসভবন হইলেও, মাতুলালয়ে হেমচন্দ্রের জন্ম। ১২৪৫ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার জন্ম হয়। হুগলী জেলার গুলিটা গ্রাম,—আপনাদের প্রিয়-কবির জন্মে পবিত্র হয়। হেমচন্দ্রের পৈত্রিক বাস, - ঐ হুগলী জেলারই অন্তর্গত—হরিপালের নিকট রাজবোলহাট গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম ৺কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৈলাসচন্দ্র একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে, দুর্লভ কবি-প্রতিভা লইয়া, বাঙ্গালী-গৌরব হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতেই হেমচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষা। একজন সদাশয় সাহেব, হেমচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখিয়া, দয়া করিয়া হেমচন্দ্রের প্রবেশিকা-পরীক্ষার ‘ফি’ দশটি টাকা দেন। সেই দশটি টাকা, তখন তাঁহার দশ মোহর বোধ হইয়াছিল। এই ভাবে, সেই সাহেবের অনুগ্রহে ও আরও দুই একজন মহানুভব ব্যক্তির কৃপায়, হেমচন্দ্র লেখা-পড়া শিখেন। যথাক্রমে হিন্দু কলেজে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে কবি ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। প্রতিদিন ৫।৬ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তিনি কলেজে আসিতেন। ইংরেজী ১৮৫৯ সালে বি-এ, এবং ১৮৬৬ সালে তিনি বি-এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কাজ—শিক্ষকতা। ট্রেণিং স্কুল নামে সে সময় কলিকাতায় একটি ইংরেজী

বিদ্যালয় ছিল। হেমবাবু কিছুদিন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। তারপর কিছুকাল মুন্‌সুফী করেন। পরে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দেন। এই ওকালতি হইতেই তাঁহার সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সূচনা হয়। একদিকে যেমন অজস্র অর্থ সমাগম হইতে লাগিল,—অন্যদিকে তেমনি পসার ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। ক্রমে নিজগুণে তিনি সরকারী উকীলের সম্মানিত পদ পান। মধ্যে একবার হাইকোর্টের জজ হইবার কথাও তাঁহার হইয়াছিল।—সেই হেমবাবু!—অদৃষ্টনেমীর নিষ্পেষণে, সর্ব্বস্ব হারাইয়া,—সর্ব্ববিধ পারিবারিক শোক-তাপ-জ্বালা পাইয়া, অন্ধ হইয়া, শেষ-জীবন যিনি দেশের কয়েকটি মহানুভব ব্যক্তির ও সদাশয় গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি-অন্নজলে দেহ ধারণ করিয়া গিয়াছেন!—সেই হেমবাবু! কেন, কি জন্য, বা কোন্ হেতু,—সব কথা বলিবার সময় এখন নয়। ৫।৭ বৎসরের মধ্যে, এই দুর্ভাগ্য পরিবার মধ্যে, যেন একটা মহাঝড় বহিয়া গেল। যেন কোন অদৃশ্য যাদুকর, যাদুমন্ত্রে, ফুৎকারে সব উড়াইয়া দিল! অদৃষ্টবাদী হিন্দু আমরা,—ইহাতে বিস্মিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। এমনই হইয়া থাকে। বিধাতার বিধানে বিশ্বাস না করিলে, ইহা বুঝানো দায়।

হেমচন্দ্রেরা তিন সহোদর ছিলেন। ‘যোগশ’-কাব্য-প্রণেতা সুকবি স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্রের নাম আপনারা শুনিয়াছেন ;—সেই ঈশানচন্দ্র আর ৺কাশীধামের সুযোগ্য চিকিৎসক, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র—কবির সহোদর ছিলেন। কীর্ত্তিমান্ এই দুই কনিষ্ঠ সহোদরই,—কবির পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। এই ভ্রাতৃশোক ব্যতাত, পুত্র-শোক, কন্যাশোক এবং আরও দুই একটি পারিবারিক শোক কবিকে সহিতে হইয়াছিল। শেষ,—সকল শোকের অতীত,—সকল দুঃখের চরম—পরানুগ্রহে তাঁহাকে দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল!—এই সকল ভাবিয়া মনে হয়,—হায়! কবি-জীবন কি? প্রতিভার পথে এত কষ্ট, এত হাহাকার! সেক্সপিয়র, মিল্টন, হোমর,—বাঙ্গালীর মাইকেল, হেম—সকলেরই এক দশা? অথবা, ভগবানের রহস্য কি বুঝিব,—বুঝি সাধ করিয়াই তিনি বড় আপনার জনকে এমনি করিয়াই ব্যথা দেন! যাহা হউক, এ দুঃখের অবসান হইয়াছে,—গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রভাতে, কবি ইহ জন্মের জ্বালা জুড়াইয়াছেন।

একটা বড় ক্ষোভের কথা আজ শুনিলাম। হেম বাবুর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ অনুকূলচন্দ্র আজ প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—“মহাশয়, ক্ষোভের কথা আর বলিব কি,—বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই, পাগলিনী মা আমার, যেন প্রকৃতি-দত্ত সহজ ও স্বাভাবিক জ্ঞান,—আবার ফিরিয়া পাইয়াছেন ;—তাই বাবার শোক, তাঁহার বুকে বড় বিষম বাজিয়াছে! তিনি যে আর বেশী দিন বাঁচেন, এমন মনে হয় না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—অতুলচন্দ্র—হৃদ্‌রোগে শয্যাশায়ী। আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। বাধ্য হইয়া—বাবার সেই বাহিরের ঘর—আপনাদের সেই নিভৃত কবি-কুঞ্জ,—এখন আমাদিগকে ভাড়া দিতে হইতেছে। একদল নাগপুরী সেই ঘর ভাড়া লইয়াছে। শোকে, মোহে, আবেগে, মা-আমার এক একবার ছুটিয়া সেই কক্ষে যান,—আর আমাদের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলেন,—কেন, তোরা এই ঘর ভাড়া দিলি?”—কথাটা শুনিয়া বড় বেদনা অনুভব করিয়াছি, তাই আপনাদিগকেও তাহা একটু শুনাইলাম। এখন আপনারা একবার ভাবুন, ইংলণ্ডে,—সেই ষ্টার্টফোর্ড অন্ আভানে—সেক্সপিয়রের জন্মস্থান ও সেই কবি-কক্ষ দেখিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য—রাজ্যেশ্বর সম্রাট অবধি তথায় গিয়া থাকেন;—আর আমাদের প্রিয় কবি,—বাঙ্গালার জাতীয় মহাকবি হেমচন্দ্রের সেই ‘নিভৃত কবি-কুঞ্জ’—তাঁহার আবাসবাটী,—আজ একদল নাগপুরী আসিয়',—তুচ্ছ ভাড়ার ছলে অধিকার করিয়া বসিল!—যদি সত্যই আমাদের কিছু করণীয় হয়, তবে এই সময়,—কবির দুর্ভাগ্যবতী উন্মাদিনী ভার্য্যা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই, যেন আমরা তাহা করিতে পারি।

এইবার হেমচন্দ্রের ‘কবি-প্রতিভা’ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

হেমচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয়,—তাঁহার দেশ-প্রসিদ্ধ ‘ভারত-সঙ্গীতে।’ এই হইতেই তাঁহার নাম দেশ-দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। ১৮৭২ সালে এডুকেশন গেজেটে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির তৎপূর্ব্বের রচনা—‘বীরবাহু।’ এবং তাহার তিন বৎসর আগেকার লেখা ‘চিন্তাতরঙ্গিণী।’ ‘চিন্তাতরঙ্গিণী’ কবির কোন বন্ধুর আত্ম-

হত্যা উপলক্ষে রচিত। কাব্যখানি কিছুদিনের জন্য এফ্-এ, ক্লাসের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল কাব্যে কবি-প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ হয় নাই।

অতঃপর কবি মহাকাব্যের আসরে নামিলেন। শুভ-ক্ষণেই তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। আশ্চর্য্য প্রতিভায়, অসীম ধৈর্য্যসহকারে, তিনি ‘বৃত্রসংহারের’ বিরাট পট অঙ্কিত করিলেন। এ পটের শোভা, শ্রী ও সৌন্দর্য্য নিবিষ্টমনে দেখিলে অবাক্ হইতে হয়;—ভক্তি-বিনয়-সম্ভ্রমে, অবনত মস্তকে, বার বার চিত্রকরের নিকট পরাভব মানিতে হয়।

বস্তুতঃ কবির ‘বৃত্রসংহার’ বাঙ্গালা সাহিত্যেয় উজ্জ্বল রত্ন,—‘জাতীয় সাহিত্যের’ অমূল্য ধন। এক মাইকেলের “মেঘনাদ বধ” ব্যতীত, এত বড় মহাকাব্য বাঙ্গলায় আজি পর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই। মাইকেল হেমচন্দ্রের গুরুস্থানীয় হইলেও,—এবং ‘বৃত্রসংহার’ ‘মেঘনাদ বধের’ আদর্শে রচিত হইলেও, সত্যের অনুরোধে বলিব,—‘জাতীয় মহা-কাব্যের’ হিসাবে,—স্বদেশানুরাগ ও চরিত্র-সৃষ্টির উৎকর্ষ তুলনায়,—‘মেঘনাদ বধ’ হইতেও ‘বৃত্র-সংহার’ বড়। পরন্তু এ কথা শতবার স্বীকার্য্য যে, ‘মেঘনাদের’ মূল আদ-র্শেই ‘বৃত্র-সংহার’ বিরচিত, এবং ‘মেঘনাদ’ না হইলে ‘বৃত্র সংহার’ হইত কি না সন্দেহ। কেন না, মাইকেল বঙ্গ-ভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক ও আদিগুরু, এবং ইংরেজী-শিক্ষিত বঙ্গসমাজে, মহাকাব্য প্রণয়নের প্রথম পথ-প্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে প্রাচীন কবিগণের বিরচিত মহাকাব্য থাকিলেও, তাহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব, চিন্তা, বা সৌন্দর্য্য ছিল না। এ হিসাবে, মাইকেল—শুধু হেমচন্দ্রের কেন, নব্যতন্ত্রের কবি মাত্রেরই গুরু স্থানীয়। যতকাল বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে,—মাই-কেল মধুসূদন দত্তের নাম বিলুপ্ত হইবে না।

কিন্তু সত্যের অনুরোধে, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া, আমরা এ কথাও বলিতে বাধ্য যে, সবটা জড়াইয়া,—ভাব, ভাষা, সৌন্দর্য্য, চরিত্র-চিত্র, কবিত্ব, নাটকত্ব প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ের সামঞ্জস্যে,—‘মেঘনাদ বধ’ হইতেও ‘বৃত্রসংহার’ বড়,—চরিত্র-সৃষ্টি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। পরন্তু ইহারও একটা কারণ আছে; সে কারণ—কাল ও সুযোগ। যে কালে মাইকেল মেঘনাদ রচনা করেন, সে কালে তাঁহার ‘আদর্শ’ তাঁহাকে অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া, দেশ বিদেশের সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল;—আর হেমচন্দ্র একরূপ বিনা আয়াসে, গৃহে বসিয়া, গৃহ-পাঠালয়েই সে ‘আদর্শ’ লাভ করেন——নব্যবঙ্গের প্রথম মহাকাব্য “মেঘনাদ বধের” কথাই আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি। পক্ষান্তরে, মেঘনাদে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, বৃত্রসংহারে তাহা নাই,—ইহার আদ্যন্ত মার্জ্জিত, সুসংযত ও সুপরিস্ফুট। হইবারই কথা। কেন না, প্রথম যে পথ দেখায়, পদে পদে তাহার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। হেমচন্দ্রের এ বিঘ্নভোগ বড় একটা করিতে হয় নাই। তাই, যেখানে যে চরিত্রটি যে ভাবে চিত্রিত করার প্রয়োজন, অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসে, একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া, তিনি সেই চরিত্রটি, সেই ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,—এতটুকুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন নাই। অবশ্য এজন্য কবিকে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন ও আত্মানুশীলন করিতে হইয়াছিল। সে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সংযম ও সাধনা যে কত,—ভাল করিয়া ‘বৃত্রসংহার’ না পড়িলে বুঝা যাইবে না।

মাইকেল ও হেমচন্দ্রের বর্ণনীয় বিষয়—মূলে এক,—দেবাসুরের সংগ্রাম,—অথবা ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয়। পরন্তু একজন শিক্ষা ও সংস্কারবশে, অসুরের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া দেবচরিত্রে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছেন;—আর জন উভয় সহানুভূতি সমান রাখিয়াও অতি সুন্দররূপে যথা-চরিত্রের যথারূপ পুষ্টি ও বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এ হিসাবে, মেঘনাদ অপেক্ষা বৃত্রসংহারের চরিত্রাঙ্কন ও নাটকত্বও অনেক অধিক। এবং ইহার রচনা-প্রণালীও অনেক উচ্চ। প্রতিভাবান্ কবি বা শক্তিশালী লেখক, সময় বিশেষে, যে ‘মূল আদর্শকেও’ ছাড়িয়া উঠিতে পারে,—হেমচন্দ্রের ‘বৃত্রসংহার’ তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। তবে নিছক কবিত্ব-হিসাবে, ভাষার ছটা ও বর্ণনা-ঝঙ্কারের তুলনায়, মেঘনাদের কোন কোন স্থান, বৃত্রসংহারের অনেক উর্দ্ধে আছে,—কোন কোন স্থান আবার বৃত্রসংহার হইতে নামি-য়াও পড়িয়াছে। সকল কথা সূক্ষ্মভাবে আলোচনার স্থান ইহা নহে;—মূল কথা এবং মোট কথা সংক্ষেপে, সূত্রা-কারে বলিলাম মাত্র। অপিচ উভয়েই মহাকবি,—উভ-

য়েই প্রতিভাবান্,—উভয়েই ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষ। পরন্তু গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ আরোপ করিয়া, পরবর্ত্তী কবি বলিয়া, যাঁহারা হেমচন্দ্রকে মাইকেলের আসন দিতে নারাজ তাঁহাদের বিচার, বোধ হয় নিরপেক্ষ নহে; আর যাঁহারা হেমচন্দ্রকে মহাকবি বলিতে কুণ্ঠিত হন,—তাঁহাদের কাব্যের ধারণা সম্বন্ধে,—আর কি বলিব? পরন্তু, আজি-কার কথা নহে,—পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, স্বয়ং বঙ্কিম-চন্দ্রও হেমচন্দ্রকে মহাকবি বলিয়া বরণ করিয়া গিয়াছেন, এবং মাইকেলের আসন তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আমরাও আজি অক-পট হৃদয়ে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছি। তৎসঙ্গে ইহাও বলিতেছি যে, হেমচন্দ্রের লেখায় প্রকৃতিগত যে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে,—যে স্বদেশানুরাগ, উদ্দীপনা, ও জ্বলন্ত পুরুষকার দীপ্যমান্ আছে,—তাহা মাইকেলই বল, আর এখনকার দিনে আর কোন মহারথই বল,—কাহারও মধ্যে নাই। এ অংশে হেমচন্দ্র বঙ্গে অদ্বিতীয়,—এবং নব্যবঙ্গের আদি গুরু। যতকাল বাঙ্গালা সাহি-ত্যের অস্তিত্ব থাকিবে, এই অংশে, হেমচন্দ্র সকলের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, পরবর্ত্তী বংশধরগণের নিকট হইতে, অধিকতর অনুরাগের সহিত পূজা পাইতে থাকিবেন;—ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

অপরাংশে, ভক্তিরসাশ্রিত কবিতায়ও হেমচন্দ্রের কম ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই। এক এক বার আমার মনে হয়, হেমচন্দ্রের কোন্ ঝঙ্কারটি অধিকতর মিষ্ট?—তাঁহার ইহ-জাগতিক উদ্দীপনা, না, তাঁহার অধ্যাত্ম-জগতের আত্মপ্রসাদ? তাঁহার ইহলোকের সুখ-সাধ, না পর-লোকের আত্মানন্দ ও আশা? মনে হয়, মিষ্ট কোন্‌টি—তাঁহার বৃত্রসংহার, না, দশমহাবিদ্যা?—‘ভারত-ভিক্ষা’ ‘ভারত-সঙ্গীত,’—না, গঙ্গার মাহাত্ম্য-বিষয়িণী ভক্তিরসময়ী রচনা? বস্তুত, কবি-হৃদয়ে একাধারে এই দুই শক্তি বড় সুন্দররূপে সংস্থিত;—এমনটি আর বড় কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।

একটু নমুনা দেখুনঃ—বৃত্রসংহারোদ্দেশে, দেব বৈশ্বানর, দেব-সেনাপতিকে বলিতেছেন,—

“অসুর উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর,
অসুর-পদাঙ্ক-রজভূষণ মস্তকে,—
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমর বীর্য্য, সমরের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দনুজ সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হইবে শেষ।”

বীর্য্যবহ্নিপূর্ণ জ্বালাময়ী উক্তি শুনিলেন,—আবার কাব্যান্তরে, কবির হৃদয়-তন্ত্রী কি সুরে বাজিতেছে শুনুন;—

ভাববিভোর নারদ, দশমহাবিদ্যায়, জগতের দশরূপ দেখিয়া, বা আদ্যাশক্তির দশ রূপের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া, মায়ার জীবকে সান্ত্বনা করিতেছেন;——

“জগৎ অশুভ নয়, কালেতে হইবে লয়,
জীবে দুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।
এই কথা বুঝে সার, আনন্দে নিনাদ তার
সত্য পথে রাখি মন, অনাদ্যের স্মরণে।
লিখি বুকে মোক্ষ নাম, পূরা জীব মনস্কাম,
“নিখিল নিস্তার পাবে” শিব কৈলা আপনি।
লক্ষ্য করি তারি পথ, চালা নিত্য মনোরথ,
জীব-জন্মে ভয় কিরে?—জগদম্বা জননী!”

এইরূপ অনেক স্থল হইতে অনেক কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া মনে হয়, হেমচন্দ্রের আদর্শ অতি উচ্চ এবং হৃদয় অতি বিশাল ও উন্মুক্ত-উদার ছিল। জীব-দুঃখে তিনি কাঁদিতে জানিতেন এবং সেই দুঃখ-বিমোচনের প্রকৃষ্ট পথ যে ভগবানে নির্ভর, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা—“চিত্ত-বিকাশের” প্রথম তিনটী কবিতায় ইহার পূর্ণ পরিচয় বিদ্যমান।

হেমচন্দ্রের এই ভক্তিভাব অতি স্বাভাবিক ছিল। তাই উত্তর জীবনে, সর্ব্ববিধ দুঃখ-কষ্ট-মনস্তাপের হস্তে পড়িয়াও, তাঁহার ভগবদ্বিশ্বাস ন্যূন হয় নাই,—বরং বৃদ্ধিই হইয়াছিল। তিনি যেন অন্তরের অন্তরে দৃঢ়রূপে বুঝিয়া ছিলেন, বিধাতার বিধানে নির্ভর না করিলে জীবের গত্যন্তর নাই;—কেননা, মূল অদৃষ্ট ও জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে জীবকে সকল ভোগ ভুগিতে হয়;—এমত স্থলে দৈব বা জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন আর উপায় নাই। কেননা, তাঁহাতেই নির্ভর জীবের চরম লক্ষ্য। কবি

এ সার তত্ত্ব যেন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই কাঁদিতে কাঁদিতে, পর-পর বলিতেছেন,—

"নিজ পুত্র কন্যা-মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না।
অপূর্ব্ব ভাবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
কি নিয়ে থাকিব ভবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভব-লীলা ঘুচেছে আমার;
বৃথা এবে এ জীবন, হর না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার।
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুখে কর পার—
বিভু কি দশা হ'বে আমার?"

পরন্তু, তখনই যেন আবার আপন ভ্রম বুঝিয়া বলিতেছেন,—

"কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে,
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে,
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?

"কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম,
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম,
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা,
কোথায় মথুরা কোথায় দ্বারকা?

"এস ভগবান, কর ধৈর্য্যদান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ,
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি।"

এইরূপ পূর্ণভাবে জীব, জগৎ ও জগদীশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, কবি ভক্তিবাদেরই প্রাধান্য দেখাইতেছেন;—ভগবানে নির্ভরই যে জীবের শেষগতি, তাহা বুঝাইতেছেন। প্রেমভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন,—

"জয় বিশ্বরূপ জয় অনাদি পুরুষ জয়,
জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্ড-তারণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন!
চরণে করিয়া নতি, বলিহে তার শ্রীপতি,
কর হে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।"

অন্যত্র, দশমহাবিদ্যায়, দেবর্ষি নারদের চিত্রে ইহা অপেক্ষাও উচ্চসুরে, কবি ভক্তি-গান গাওয়াইয়াছেন;—

"আনন্দ ধ্বনি করি, মুখে বলি হরি হরি,
নারদ ঋষি রত সুললিত নটনে।
প্রবেশিলা হেন কালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তালে,
বিচেত বিভুগানে ত্রিভুবন ভ্রমণে॥
কেবা হেন মতিমান্, কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে।
অনন্ত পরমাণু, বিকট বিদ্যুদ্‌ভানু,
উদ্ভব কোথা হতে, কি হইবে চরমে?
হর হরি ব্রহ্মন্, সচেতন জীবগণ,
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে?
মানব কিরূপ ধন, জড়েই কি বিশেষণ,
জড়সনে সঞ্চারে কিবা বিধি মননে?
সুখ কি জীবিত মানে? কিবা অথ নির্ব্বাণে?
কা হতে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমল বিধাতার,
মানস হতে কি এ মলিনতা রচনা?
ক্ষিতি অপ্ তেজঃ নভঃ ভিন্ন কি একি সব?
পঞ্চ কি আদি ভূত অগণন গণনা?
সেই তত্ত্ব নিরূপণ, করিবারে কোন্ জন,
সমর্থ দেবঋষি মানবের ভাবনা?
গাও বীণা হরি-গান, দুর্লভ যেই জ্ঞান,
নিষ্ফল মানি তারে পরিহর মানসে,
প্রকাশ মন-সুখে, হরি-নাম লিখি বুকে,
যে জ্ঞানে জীবলোকে প্রকটিত হরষে॥
জগত কি সুখধাম, মধুর কি বিভুনাম,
গাওরে প্রেমভরে মনোহর বাদনে।

ঝঙ্কার ঝঙ্কার, উল্লাসে বল আর,
আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন জীবনে!
ধরম ধরমপুর, আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে।
মোক্ষদ সার বাণী, শুনারে জাগায়ে প্রাণী,
সুস্বরে নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে॥
ত্রিগুণে যে গুণময়, যাঁ হ'তে এ সমুদয়,
উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে।
দিবানিশি নাহি তান্, সপ্তমে তুলি তান,
নারদ মনোমত—ধ্বনি বীণা বাজারে।"

এইরূপ ধর্ম্মভাবমূলক উচ্চাঙ্গের গীতি-কবিতা যিনি গাহিতে পারেন, তিনি ধন্য—তাঁহার কাব্য অমর। হেমচন্দ্র জাতীয় সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। অপিচ,—

"রে রতি, রে সতি, কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর, তাপস যত দিন
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥"

—দশমহাবিদ্যার এই যে শিব-বিলাপ,—ইহা অতি অপূর্ব্ব। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, হেমচন্দ্রের অধিক সুখ্যাতি করিব কোন্ বিষয়ে?—তাঁহার স্বদেশানুরাগ-পূর্ণ উদ্দীপনাময়ী কবিতার, না এইরূপ ভক্তিগানে?

এইবার কবির "বৃত্র-সংহার" সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাইকেলের মেঘনাদ ব্যতীত বৃত্র-সংহারের ন্যায় মহাকাব্য, বাঙ্গলায় এ পর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই। মহাকাব্যের যে সব লক্ষণ থাকা বিশেষ প্রয়োজন,—ছন্দঃ যতি অলঙ্কার রস হইতে আরম্ভ করিয়া, ভাব, ভাষা, কল্পনা, সৌন্দর্য্য, চরিত্র-চিত্র—সকলই ইহাতে পূর্ণভাবে প্রকটিত আছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল,—দেবলোক, দৈত্যলোক ও ঋষিলোক কত স্থানের কতবিধ চিত্র যে সুচিত্রিত হইয়াছে, দুই এক কথায় তাহা নির্ণীত হইবার নহে। কবির সৃষ্ট বিশ্বকর্ম্মার বিরাট্ কর্ম্মশালার ন্যায়—এই মহাকাব্যের দিগন্ত প্রসারিণী বর্ণনা;—কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টির কথা উল্লেখ করিব? আপনারা মুহূর্ত্তকালের জন্য দধীচির সেই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ,—দেবহিতের—তথা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সেই জীবনোৎসর্গের অপূর্ব্ব চিত্রটি স্মরণ করুন;—শচীর সেই মাতৃময়ী মূর্ত্তিটি কল্পনা-নয়নে অবলোকন করুন; স্বর্গভ্রষ্ট ইন্দ্রের সেই দুঃখ-দৈন্য ও ঘোর নির্য্যাতনের কথাগুলি একটু ভাবুন;—বুঝিবেন, কবি কি অসামান্য-শক্তি ও অলৌকিক প্রতিভায় আবিষ্ট হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন!

বিশেষ এই বৃত্রসংহারে আর একটি মহাগুণ আছে, তাহা—নাটকত্ব। এই নাটকত্বটি অতি অপূর্ব্ব ও উজ্জ্বল। যে চরিত্র যেমনটি ফুটিতে হয়, ফুটিয়াছে। বৃত্র, রুদ্রপীড়, ইন্দুবালা, ঐন্দ্রিলা—সকলই অতি চমৎকার হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আবার অধিক ফুটিয়াছে, ঐন্দ্রিলা। এই ঐন্দ্রিলা যে কিরূপ উৎকৃষ্ট নাটকের উপাদানে গঠিত, তাহা আদ্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে না পড়িলে বুঝা যাইবে না। পক্ষান্তরে ইন্দ্র, শচী, জয়ন্ত, শিব, পার্ব্বতী ও অন্যান্য দেবদেবীগণের চরিত্র-চিত্রও অতি মনোহর। "রসাত্মক বাক্যই কাব্য"—সাহিত্য-দর্পণকারের এই উক্তি যদি ঠিক হয়, তবে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কবিত্ব পরিস্ফুট। একটু আধটু নমুনা দেখিলেই বুঝিবেন।

প্রথম শচীর এই খেদোক্তিটি শুনুন;—

"সখিরে বাসব সম, আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীর-প্রসবিনী।
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ অন্ত,
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়,
তোমার প্রসূতি, হায়! দৈত্যের দাসত্বে যায়,
রক্ষ আসি পুত্র, তব মায়।"
এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ—
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা গিরি নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ॥"

বলুন দেখি, এই দুই ছত্রের মধ্যেই মাতা-পুত্রের কি প্রগাঢ় স্নেহ-সম্বন্ধ প্রকটিত হইয়াছে!

দেবগণের অনুযোগে যখন শিবের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তখনকার চিত্রটি কেমন দেখুন ঃ—

"এত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
অমরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—

পরশে শরীর তার? হা রে বৃত্রাসুর!
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি?"
বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজুট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।
গর্জ্জিলা তেমতি, যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্ত্যে গোমুখী গহ্বরে,
জ্বলিলা ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়—
বহ্নিময় হইল সেই শূন্যব্যাপী দেশ।
ধরিলা সংহার-মূর্ত্তি রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ,
তুলিলা বিশাল তুণ্ডে—দীপ্ত শ্বেত তনু,
অনল সমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।
ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানী-পশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান;
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী ঈশানে উচ্চ করিলা সম্ভাষ—
"সম্বর সম্বর, দেব, সংহার-ত্রিশূল,—
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টি বিনাশন,
সম্বরণ কর শীঘ্র সংহার মূরতি।"

—কি তেজস্বিনী ও মর্ম্মস্পর্শিনী বর্ণনা! ভাব, ভাষা ও চরিত্রোন্মেষের কি সুন্দর সম্মিলন! শিবচরিত্র কি ঠিক শিবচরিত্রোপযোগী হয় নাই? পৌরাণিক আদর্শ কি কিছুমাত্রও মলিন হইয়াছে?

এইবার বৃত্র-মহিষী ঐন্দ্রিলা-চরিত্রের একটু ছায়াপাত মাত্র দেখুন।

শিব-বরে বলীয়ান্ বৃত্র যখন বুঝিতে পারিল, শিব তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, তখন সেই অসুরশ্রেষ্ঠ যেন কিছু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। পতিকে তদবস্থায় দেখিয়া ঐন্দ্রিলা বলিতেছে,—

"কি দেখিলা—কোথা রুদ্র-ক্রোধ-হুতাশন?
কোথা বা বিষাণ শব্দ?—উন্মাদ কল্পনা!
কে কহিল তোমারে এ, হে দনুজেশ্বর,
হাস্যকর উপন্যাস—রোগীর প্রলাপ?
* * * *
আমি যদি দৈত্য-পতি তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ!—
ভয়, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত, পণ অসিদ্ধ থাকিতে!"
* * * *
"বামা তুমি"—বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন।
হেরিলা ঐন্দ্রিলা-মুখ, গর্জ্জিত, গম্ভীর,
দন্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন!
সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব।
লাবণ্য মণ্ডিত গণ্ড—দন্তের ছটায়
চিত্ত প্রতিবিম্ব যেন প্রজ্জ্বলিত এবে
সর্ব্ব অঙ্গে, অবয়বে, ললাটে গ্রীবায়!
যেন বা কি দৈববাণী, অন্যের অশ্রুত,
গোপনে শুনেছে বামা,—তাই সে প্রত্যয়
দৃঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস
করিছে দনুজ-বাক্যে দনুজ-মহিষী।
দেখিয়া দৈত্যেরা মনে দর্প উপজিল;
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল
জন্মিল প্রত্যয় হেন—তাঁহারি সে ভ্রম!
ঐন্দ্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হানিয়া,—
"বামা আমি" বলি দন্তে সম্ভাষি গম্ভীর,
দাঁড়াইলা মহাদর্পে শির উচ্চ করি,
ভুজঙ্গ ঘাতকে লক্ষি দংশিবার আগে
সঘন গর্জ্জিয়া যেন প্রসারয়ে ফণা!
কিম্বা যেন রাজহংসী পদ্মবন লুঠি
মৃণাল আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে,
চঞ্চুতে পঙ্কজ শোভা, পক্ষ সাপটিয়া
মধ্যহ্রদে স্থির হ'য়ে গ্রীবা উচ্চ করে।
"বামা আমি"—দনুজেন্দ্র রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট পতঙ্গ সদৃশ কিহে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।

শুন, ওহে দৈত্যনাথ, "বামা" সত্য আমি,
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোক-খ্যাত গন্ধর্ব্ব-দুহিতা;
সামান্য অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা;
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা, শুন হে দানব।
সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,
সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ
প্রলয় বিষাণ-শব্দ,—স্তব্ধ কেন তায়?
খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা।
ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্ব্বাণ
হবে না, জানিহ, পুন, ভাবনা কি তবে?
ভাবনা কার্য্যের আগে, সাধন এখন।
স্খলিত হিমানী-স্তূপ কম্পিত ভূধরে
ঘর্ঘর নিনাদি, চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা,
ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি,
কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন?
তেমতি জানিহ ইহা; নতুবা দৈত্যেশ,
দানবেন্দ্র নামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে
বাসনা যদ্যপি থাকে,—স্বর্গজয়ী নাম
ঘুচাইতে চাও যদি—শচী ফিরে দাও।
ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে
নিজে ভেটবাহী হ'য়ে নিঃশঙ্ক দানব!
নহে কহ আমি তার দাসী হ'য়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্র করে!"

—কি মর্ম্মভেদী শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি! কি ভীষণ তেজোদ্দীপ্তময়ী মূর্ত্তি!—রমণী গর্ব্বিতা ও ভীষণা হইলে এমনি হয়,—পুরুষও তাহার নিকট হার মানিয়া যায়। মনুষ্য-চরিত্রাভিজ্ঞ কবি তাই ঐন্দ্রিলা-চরিত্র এত ভীষণ ও ভয়াবহ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। এই ঐন্দ্রিলা-চরিত্র পড়িতে পড়িতে ব্রুটাস-পত্নী পোর্শিয়ার সেই তেজস্বিনী উক্তি মনে পড়ে। আর এক হিসাবে, লেডী ম্যাক্‌বেথ ও মার্গারেট (She-wolf of France)ও ইহার নিকট হারি মানে। এই এক স্থান মাত্র দেখাই-লাম। এমনি প্রায় সর্ব্ব স্থানে ঐন্দ্রিলা-চরিত্রের এই গর্ব্ব,—এই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত প্রদর্শিত হইয়াছে।

রুদ্রপীড়-নিধনে, ত্রিলোকবিজয়ী স্বামী বৃত্রের নিকট ঐন্দ্রিলার সেই প্রতিহিংসাজ্বালা-জর্জ্জরিত তেজোময়ী উক্তি স্মরণ করুন;—পুত্রবধূ সরলা ইন্দুবালা, শচীর সহচারিণী হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়,—সে দৃশ্য দর্শনে শচীর প্রতি ঐন্দ্রিলার সেই কঠোর ব্যঙ্গোক্তি ভাবিয়া দেখুন;—সকল স্থানেই ঐন্দ্রিলা, প্রদীপ্তা অসুর-মহিষীর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে!

আর ইন্দুবালা? কাব্য-কাননের এটি একটি অতি পবিত্র কুসুম। এমন কোমল, এমন পরদুঃখ-কাতর, এমন আত্মপর-ভেদজ্ঞান-হীন অপূর্ব্ব বালিকা-মূর্ত্তি, কৈ, আর কোথাও বড় একটা দেখি নাই। এমন সৃষ্টি কেবল প্রকৃতির বিশাল বুকে ও কবির মানস-পটেই শোভা পায়! এ কুহক-দুরিতপূর্ণ সংসারে, এমন চিত্র বড়ই দুর্ল্লভ। দৈত্যগৃহে এমন স্নেহময়ী, বিশ্বপ্রীতিপ্রাণা বধূকে আনিয়া, কবি তাঁহার সাধের কাব্য-আলেখ্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কাব্যের হিসাবে, ইন্দুবালা কবির অতি উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। এমন সার্ব্বজনীন সহানুভূতি,—শত্রুর প্রতিও আন্তরিক অকপট স্নেহ,—এমন বিশ্বব্যাপিনী করুণা,—পাত্রাপাত্রীর মধ্যে যিনি ফুটাইতে পারেন, তাঁহার শক্তি সাধারণ নহে।—হেম-চন্দ্রকে তাই আমরা বঙ্গের অসাধারণ কবি বলিয়া বরণ করি।

ইন্দ্রাণীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দৈত্য-কুলবধূ ইন্দুবালা ভাবিতেছে :—

"আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হ'বে শচীর, পতি কাছে নাই—
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম!"

—একি দৈত্যকুলবধূ মহাবীর রুদ্রপীড়ের ধর্ম্মপত্নী, না স্বর্গভ্রষ্টা কোন দেব-বালা? কৈ, স্বর্গেও ত কবি এমন অপরূপ আদর্শ-চরিত্রের অঙ্কন করেন নাই? কবির ভাষাতেই বলি,—

'মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে,
দানব-কুলের চারু কোমল নলিনী!'

দেবাসুরে ঘোর যুদ্ধ চলিয়াছে; ইন্দুবালা প্রতিক্ষণে কাতর অন্তরে ভাবিতেছে, তাহার স্বামী মহাবল রুদ্রপীড়ের হস্তে অসংখ্য দেবসৈন্য নিহত হইতেছে;—সহসা দনুজদলে হাহাকার উঠিল; কিন্তু পরদুঃখকাতরা ইন্দুবালা ভাবিল, এবারও তাহার স্বামী কোন দেবতাকে নির্য্যাতন করিয়াছে; তাই—

"জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি,
কে পড়িল রণস্থলে, কোন্ রামা হৃদিতলে,
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার,—
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে, সুখের সংসার?"

"চপলা অস্ফুট স্বরে রুদ্রপীড় নাম
উচ্চারিলা অকস্মাৎ; হৃদে যেন বজ্রাঘাত,
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে—
পড়িল দানব-বধূ ইন্দ্রজায়া-কোলে!

শুকাইলা ইন্দুবালা—নিদাঘের ফুল!
হায় রে সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি,
লুকাইল নিদ্রাকোলে—ফুটিবে না আর!
ছিন্ন যেন শচী-কোলে লাবণ্যের হার।"

অশ্রুজলে আপ্লুত হইতে হইতে এ স্বর্গীয় ছবি দেখিতে হয়!—এই ভাবে কবি তাঁহার মানস-প্রতিমার বিসর্জ্জন করিয়াছেন!

শেষ বৃত্রের নিধন। এই দৃশ্যটি এত সুন্দর ও মনোজ্ঞ যে, আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতে সাধ যায়। কিন্তু সময়াভাবে সে সাধ, কবির দুই একটি ঝঙ্কারেই মিটাইতে হইল;—

—"ডাকিল দম্ভোলি
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
হেরি ঘোর ঘন স্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি উচ্চে—"হা, দম্ভী বাসব
ভাবিলে রক্ষিতে সুতে বৃত্রের প্রহারে?
কর তবে এ শূল আঘাত সংবরণ
পিতা পুত্র দুই জনে।"—বেগে দিলা ছাড়ি।
ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদরিয়া কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে! হেনকালে (হায়,
বিধির বিধান-গতি কে পারে বুঝিতে,)
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমান মার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হইল নিমেষ ভিতরে!
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য কোলে!
হেরিয়া দনুজপতি কাতর হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
"হা শম্ভু, তুমিও বাম!"—দগ্ধ হতশ্বাসে
ছুটিলা উন্মত্ত প্রায় হুঙ্কারি ভীষণ,
ছিন্নমস্তা রাহু যেন! অগ্নি চক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্র ঘোর—দন্তে কড়নাদ!
প্রলয় ঝটিকা গতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্রকরে ভীম বজ্র—উচ্ছিন্ন করিতে
অস্ত্রবর। বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর! সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র; ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী,
ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে বাসবে আঘাতি,—
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ;
উজাড় স্বর্গের বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে!
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায়!
সে চীৎকারে—সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া প্রবল,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে!—সে প্রলয়ে
স্থির নহে এ তিন ভুবন! মহাকাল
শিব-দূত কৈলাস-দুয়ারে নন্দী দ্বারী

কাঁপিতে লাগিল ভয়ে! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোক ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!
কাঁপিল বৈকুণ্ঠ দ্বার! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়।"
এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্য্যোগে
ছিলা হতচেতপ্রায়,—বিশ্ব কোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি;—
না ভাবিলা, না জানিলা, ছাড়িলা কখন!
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্য পথে,
উনপঞ্চাশত বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিগ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল!
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে,—
যেথানে অসুরপতি বিশাল শরীর,—
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য, ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে,—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্য-ধরাধর যেন পড়িল ভূতলে!
বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি।
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়—
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে
মুদিল নয়নত্রয় দুর্জ্জয় দানব।
দহিল ঐন্দ্রিলা-চিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিলা বামা—উন্মাদিনী এবে!"

এই শেষ। ইহা কাব্য না মহাকাব্য,—না, এ দুয়ের কিছু নয়,—আপনারাই তাহার বিচার করুন। বঙ্গ সাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান কোথায়,—আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন। এবং সব স্থির করিয়া আপনারাই বলুন,—এ হেন শক্তিধর পুরুষের পুণ্য-স্মৃতির সম্মান-স্বরূপ আপনাদের কিছু করা উচিত কি না। মাননীয় সভাপতি মহাশয় অবশ্য শেষ-মীমাংসা করিবেন। যদি হেমচন্দ্রের জন্য কিছু করনীয় হয়, তবে এই সময়।—বিলম্বে বহু বিঘ্নও ঘটে, আর আমাদের উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা, মাসান্তের মধ্যেই বিলীন হইবে কিনা,—তাহাও ভাবিবার বিষয়। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাও আমাদের এই ভাবে অপসারিত হইয়াছে;—সেই জন্যই এই আশঙ্কা।

এখন, গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজার ন্যায়, কবির ভাষায়, কবির উদ্দেশে বলি,—

"গেলে চলি হেম, কাঁদায়ে অকালে
পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্ত গ্রহ প্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলে শেষ।
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন
জয়-মাল্য শিরে পরি,
অনাথ ক'টিরে কার কাছে বল
গেলে সমর্পণ করি।
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে
গউড়বাসীরা সবে,
অনাথ-পালক, তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে।
হবে কি সে দিন, এ গৌড়-মাঝে,
পূরিবে তোমার আশা?
বুঝিবে কি ধন, দিয়াছ ভাণ্ডারে
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা?*

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

* সাহিত্য-সভায় পঠিত।—৩রা শ্রাবণ, রবিবার, ১৩১০।

পৃথিবীর ইতিহাস।

দ্বীপ—পৃথিবীর যাবতীয় দ্বীপসংস্থান দুই ভাগে উল্লেখ করা যায়, (১) মহাপ্রদেশের উপকূলবর্ত্তী ; (২) সুদূর সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী। যে সকল দ্বীপ মহাপ্রদেশের উপকূলবর্ত্তী, তাহারা প্রায়ই কোন না কোন কারণে মহাপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। এই সকল দ্বীপকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(ক) যে সকল দ্বীপ মহাপ্রদেশ হইতে এত অল্প দিন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে যে, মহাপ্রদেশের সহিত তাহার উদ্ভিজ্জ বা জীবজগতের সাদৃশ্য এখনও তিরোহিত হয় নাই। যথা—ইংলণ্ড, টাস্‌মেনিয়া, জাপান প্রভৃতি। (খ) ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন ; ইহাতে মহাপ্রদেশের সহিত কোনও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত না হইলেও, ভূস্তর প্রভৃতিতে অতীত সংযোগের সাক্ষ্য বর্ত্তমান আছে। যথা—নবগিনি প্রভৃতি। (গ) যে সকল দ্বীপে তাহাদের উদ্ভিজ্জ ও জীবজগতে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় ও অন্য কোন সংযোগনিদর্শনই অধুনা অপ্রাপ্য। যথা—অষ্ট্রেলিয়া, মাডাগাস্কার, লঙ্কা ও নব জীলণ্ড।

দূর সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী দ্বীপ সকলে নিকটস্থ মহাপ্রদেশের সহিত কোন সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয় না। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে ইহারা কোথাও একক থাকে না, পুঞ্জিতাকারে একত্র অনেকে মিলিয়া থাকে। কখন কখন এই দ্বীপপুঞ্জ, ধনুকের মত বক্রাকার ধারণ করে, এবং বক্রাংশ প্রায়ই বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে ফিরান থাকে। এই সকল দ্বীপও তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (শ) প্রবাল দ্বীপ। (ষ) আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাসে সম্প্রতি গঠিত। (স) অজ্ঞেয় কালে আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাসে গঠিত। প্রবাল দ্বীপ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারউইন বহু অনুসন্ধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পাঠকের বিরক্তি ভয়ে লিখিত হইল না।

দ্বীপপ্রসঙ্গ হইতে সাগর সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বহু কথায় ইতিপূর্ব্বে প্রদীপের পৃষ্ঠা সম্পূরণ করিয়াছি।

মরুভূমি—সাগরের মত রহস্যাবৃত প্রদেশ ভূপৃষ্ঠে আর একটি আছে, তাহা মরুভূমি। মরুর উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক অনুমানই প্রচলিত ছিল। কেহ মনে করিতেন, সমুদ্র দ্বারা উর্ব্বর মৃত্তিকাস্তর ধৌত হইয়া বালুকার নিম্নস্তর যখন বাহির হইয়া পড়ে, সমুদ্র সরিয়া গেলে সেই বালুকাক্ষেত্র মরুভূমি নামে পরিচিত হয়, Humboldt ইহার মীমাংসা করিয়া বলেন যে পৃথিবী ও সূর্য্যের সংস্থান বশতঃ যে সকল স্থান অত্যুষ্ণ, সে সকল স্থানে বাষ্পবিহীন তপ্তবায়ু সর্ব্বদা চলিতে থাকে। ইহার উপর যদি ঐ প্রদেশ নদী বা গলিত-নির্ঝর-পর্ব্বতবিহীন হয়, তবে সেই স্থান ক্রমশ বালুময় ও অনুর্ব্বর হইয়া উঠে, বালুকাপ্রধান প্রস্তরের (Sand-stone) উপর জল বায়ুর প্রভাব ও উদ্ভিজ্জের ক্ষার হইতেও বালুকা সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং কালে তাহা পুঞ্জীকৃত অবস্থা হইতে বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে ও মরু সৃষ্টি করে ; কারণ বালুকার জননশক্তি একেবারে নাই। যে সকল প্রস্তর দিনে সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া রাত্রে হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মবশে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া যায় ; এবং কালক্রমে রেণু রেণু হইয়া মরুভূমি সৃষ্টির সহায়তা করে। মরুপ্রদেশে বাহ্যতঃ জলাভাব মনে হইলেও বালুকাস্তরের নিম্নে যথেষ্ট জল থাকে ; এমন কি মাটিতে কাণ পাতিয়া নিম্নে প্রবহমান জলস্রোত অনুভব করা যায়। কিন্তু বালুকা ভেদ করিয়া এই জল লাভ করা বড় কষ্টসাধ্য, কাজেই না থাকার সমান। বালুকার উপর বৃষ্টিপাত হইলেও তাহা শীঘ্র বালুকাস্তর ভেদ করিয়া নিম্নে চলিয়া যায়, সাহারা মরুভূমিতে ফরাশি গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি কূপ খনন করাইয়াছেন।

পর্ব্বত—পৃথিবীর আর এক রহস্য পর্ব্বত, পারস্য কবিগণ কল্পনা করিয়াছেন যে ভগবান্ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করিলে তাহা দোলায়মানা হইতে থাকে ; তখন তাহাকে স্থির রাখিবার জন্য কাগজ চাপার মত এই পর্ব্বত সকল ধরণী-পৃষ্ঠে চাপাইয়া দেওয়া হয়। সংস্কৃত সাহিত্যেও পর্ব্বতের অপর নাম “ধরাধর” বা “ধরণীধর”। ইহা অবশ্যই কবির কল্পনা। এক্ষণে দেখা যাউক বিজ্ঞান ইহার কি মীমাংসা করিয়াছেন। প্রাথমিক মত এই যে পৃথবীপৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হইয়া যখন জমিতে থাকে, তখন তরলাংশ যে সঙ্কোচন প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারই জোরে স্থলের স্থানে

স্থানে ফাঁপিয়া পর্ব্বত সৃষ্টি করে। ইহা কিছু অসম্ভব বোধ হইতে পারে ; কিন্তু পৃথিবীর বিপুল দেহের তুলনায় সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গও কটাহের দুগ্ধোপরিস্থিত সরের বুদ্বুদ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইবে। দ্বিতীয় মতানুসারে পৃথিবীর স্থানিক নিম্নাবতরণই পার্শ্বস্থ ভূমির উচ্চতার কারণ। কথাটা একই ; কেবল দুই জনে দুই দিক্ হইতে দেখিয়াছেন মাত্র। ১৮১৩ সালে Hall ও Fabre নামক দুই ব্যক্তি পরীক্ষা দ্বারা উভয় মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। Chaucourtois নামক এক ব্যক্তি যেরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা কৌতুকজনক বলিয়া এ স্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইল। তিনি একটা রবারের বেলুন বায়ুপূর্ণ করিয়া গলান মোমে ডুবাইয়া লয়েন। যখন বেলুনটি ঢাকিয়া মোমের আবরণ শুষ্ক হইল, তখন বেলুন হইতে কিঞ্চিৎ বায়ু নিঃসারিত করিয়া বেলুনকে সঙ্কুচিত করা হইল। ইহাতে মোমের স্তর ভূপৃষ্ঠের মত উচ্চাবচ আকার ধারণ করিল।

পর্ব্বতগঠনে পৃথিবীর সঙ্কোচনের ন্যায় মাধ্যাকর্ষণও সাহায্য করিয়া থাকে। পৃথিবী স্বপৃষ্ঠস্থ সমুদয় দ্রব্যকেই স্বীয় কেন্দ্রাভিসারে ঢাকিতেছে ; যাহারা দুর্ব্বল তাহারা তাহার ঐকান্তিক আগ্রহে কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হয়, যাহারা সবল তাহারা স্থানচ্যুত হয় না। ইহাতে ভূপৃষ্ঠ অসমতল হইয়া উঠে।

ভূমিকম্প—পৃথিবীর অসমতলতা সম্পাদনে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুদ্গম প্রভৃতি আকস্মিক দৈব ঘটনাও যথেষ্ট সহায়তা করে, ভূমিকম্প সকল দেশেই অল্প বিস্তর ঘটিয়া থাকে। এই কম্প সময়ে সময়ে এত অল্প হয় যে আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। D' Abbad নামক বৈজ্ঞানিক এই অননুভূত কম্পন বোধ করিবার জন্য এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। Humboldt উক্ত যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীর শান্তিশীলতা অপেক্ষা অস্থিরতাই অধিক। দিনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানই অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

ভূকম্পের গতি হয় ঊর্দ্ধাধঃভাবে নয় ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরালে সরল রেখায় তরঙ্গায়িত হয়। ঘূর্ণা গতি সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন ; কিন্তু ১৮১৮ সালের Catanea প্রদেশের প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পের পর কয়েকটি প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি একেবারে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং ১৮২২ সালে Valparaisoতে যে কম্পন হয় তাহাতে বাড়ীঘর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৯৭ সালে Quito প্রদেশের Riobamba নগরে যে ভীষণ ভূকম্পন হয় তাহাতে পাকাবাড়ী সকল অভগ্নাবস্থায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং এক গৃহের দ্রব্যাদি অন্য গৃহে চলিয়া গিয়াছিল ; ভিন্ন ভিন্ন শস্যের ক্ষেত্র সকল এক হইয়া সকল শস্য একত্র হইয়া গিয়াছিল, এবং স্থানে স্থানে অগাধ গহ্বর হইয়া গিয়াছিল। ১৮১৯ সালে সিন্ধু নদীর মোহানায় একটি দ্বীপ কম্পনের বেগে ডুবিয়া গিয়াছিল, এবং অন্যত্র একটা বাঁধের মত মৃত্তিকাস্তূপ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই মৃত্তিকাস্তূপ আজো “আল্লা বাঁধ” নামে পরিচিত হইতেছে। ১৭৬২ সালে চট্টগ্রামের কতকগুলি পর্ব্বত ভূগর্ভে অদৃশ্যভাবে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল ; চুঁচুড়া ও ভাটপাড়ার মধ্যে গঙ্গায় যে বৃহৎ ও উচ্চ চড়া বহুকাল ধরিয়া গঠিত হইয়াছিল তাহা ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে উহ্য হইয়া গিয়াছে, ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

কম্পনের গতিবেগ আজো ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই, কারণ ভূকম্পনের সময় ইহার গতি নির্দ্ধারণ করিবার কথা অল্প লোকেরই মনে থাকে, এবং থাকিলেও সেই প্রাণ-সংশয় কালে অল্প লোকেরই ইহাতে প্রবৃত্তি হয়। তবে Humboldt অনুমান করেন যে, মিনিটে ২২ হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত ভূকম্পনের তরঙ্গ চলিতে সক্ষম হয়। ১৮৫৮ সালে জর্ম্মাণি প্রদেশের ২২৮০০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া যে কম্পন হয়, Schmidt অনুমান করেন যে তাহার গতি মিনিটে ৬ মাইল ছিল। গতিবেগ ভূমির তারতম্যানুসারে হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। Mallet খনি খনন কালে লক্ষ্য করিয়াছেন যে আল্‌গা বালুকার ভিতর দিয়া কম্পন এক সেকেণ্ডে ২৫১ গজ, পাথরের ভিতর দিয়া ৩৯৮ গজ, ও শক্ত পাথরের ভিতর দিয়া ৫০৭ গজ গিয়া থাকে।

Mallet ও Van Seebach কম্পনের জনন-স্থান নির্দ্ধারণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন।

ভূমিকম্পের আগে, সঙ্গে বা পরে কখন কখন মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় এক গুরু গম্ভীর শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। এই শব্দ কখন কখন এক মাসকাল পর্য্যন্তও অবিরত

শোনা গিয়াছে। Pliny ও Pausanius বলেন যে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর বর্ষণ তৃপ্ত ধরণী গা ঝাড়া দিয়া উঠে; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

খুব সম্ভব পৃথিবীর আভ্যন্তরীন্ তাপ হইতেই তাহার কম্পন ঘটিয়া থাকে; এই মত বহু প্রাচীন। Aristotle এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বড় বড় ভূস্তর সকল বসিয়া পড়ে, তাহাতেই ভূমি কম্পিত হইয়া উঠে। Perrey বলেন যে তিনি বহু ভূমিকম্প পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে পূর্ণিমা, অমাবস্যা বা তৎসম কালেই অধিক ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে; বোধ হয় জোয়ার ভাঁটার মত ভূমিকম্পের সহিতও চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। Schmidtও পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে বাৎসরিক আবর্ত্তনে চন্দ্র যখন পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী থাকে তখনই অধিক ভূমিকম্প হয়, চন্দ্র দূরে থাকিলে কম হয়। Mallet বলেন যে জানুয়ারি মাসে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জুন মাসে সর্ব্বাপেক্ষা কম ভূমিকম্প হয়। জানুয়ারি মাসে পৃথিবী সূর্য্যের সন্নিহিত হয় এবং জুন মাসে পৃথিবী সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে সূর্য্যের প্রভাবেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। তবেই, সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েই ভূমিকম্পের কারণ হইতেছে। Falb বলেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ দ্রব ধাতুর জোয়ার ভাঁটাই ভূমিকম্পের কারণ (Perreyর মত) নহে; অপরন্তু দ্রব ধাতুর কাঠিন্য প্রাপ্তিতে যে সমস্ত বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে তাহা ও পৃথিবীর কঠিন স্তরের চাপ হইতেই ভূকম্প উৎপন্ন হয়। এই চাপ হইতেই আগ্নেয় গিরিরও উৎপত্তি। হিন্দু জ্যোতিষে ভূমিকম্পকে "অদ্ভুতবিশেষ" বলা হইয়াছে। ভূমিকম্পে ভবিষ্যৎ ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে, কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই (জ্যোতিস্তত্ত্বম্)।

বায়ুমণ্ডল—যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে আস্তোদরে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইতিহাস বড় কৌতুকাবহ ও জটিল। এ স্থলে সংক্ষেপে সরল কথায় বলিয়া আমি বিদায় হইব।

বায়ুর মধ্যে শতকরা ২১ ভাগ অম্লজান ও ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। অন্যান্য যে সমস্ত পদার্থ ইহাতে বর্ত্তমান আছে তাহার ভাগ এত অল্প যে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা ধর্ত্তব্য মনে করেন নাই। অম্লজান হইতে সমগ্র জীবজগৎ (জীব, উদ্ভিদ, অগ্নি প্রভৃতি) শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু পাছে কেবলমাত্র অম্লজান থাকিলে সমস্ত জগৎ একবার অগ্নিসংযুক্ত হইলে ভস্মাবশেষ হইয়া যায় এজন্য পরমেশ্বর তাহাতে নির্জীব নাইট্রোজেন প্রভূত পরিমাণে মিশাইয়া রাখিয়াছেন। কেবল মাত্র অম্লজানের ভিতর লোহ পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইতে পারে।

বায়ুমণ্ডলের গাঢ়তা সর্ব্বত্র সমতুল নহে; যত উপরে ইহার গাঢ়তা তত কম। সমুদ্রতল হইতে ২ মাইল উচ্চে ইহার গাঢ়তা সমুদ্রতলস্থ বায়ুর ৩/৫ অংশ; ৮ মাইল উপরে ১/৬; ১২ মাইলে ১/১৪; ১৬ মাইলে ১/৩৩; ২০ মাইলে ২/১০০০; ৩২ মাইলে ১/১০০০; ৪০ মাইলে ১/৬০০০ অংশ মাত্র।

বায়ুমণ্ডলের একটা ভার আছে। আমাদের চতুর্দ্দিকে বাতাস বিদ্যমান আছে বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি না। সামান্য উপায়ে ইহা বুঝা যাইতে পারে;—শরীরের কোন স্থানে একটি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ রাখিয়া তাহার উপর একটা গেলাস ঢাকা দিয়া শরীরের সঙ্গে চাপিয়া ধরিলে, গেলাসের মধ্যস্থিত বায়ুতে যে অম্লজান আছে তাহা পুড়িয়া গিয়া গেলাসের বায়ু বাহিরের বায়ু অপেক্ষা পাতলা ও হাল্কা হইবে; মধ্যের বায়ু যে জোরে গেলাসকে ঠেলিয়া রাখিবে, বাহিরের বায়ু তদপেক্ষা অধিক জোর করিবে। এক্ষণে ঐ গেলাস শরীর হইতে তুলিতে গেলে বিলক্ষণ জোরের আবশ্যক হইবে, গেলাসঢাকা স্থানে যদি একটু কাটা থাকে তবে সেই ক্ষতমুখ হইতে ফোয়ারার মত শোণিত বাহির হইবে। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি বর্গ ইঞ্চের উপর ১৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭১/২ সের চাপ পড়ে। আমরা সর্ব্ব শরীরে কি ভীষণ চাপ অজ্ঞাতসারে সহ্য করিতেছি, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। আমরা ৭০ হইতে ১০০ টন পর্য্যন্ত নিজ শরীরে বহন করি। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ওজন ৫ খর্ব্ব টন।

বায়ু সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নহে; এজন্য সূর্য্যালোক লম্বভাবে যখন ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তখনও তাহার আলোকের ১/৫

অংশ নষ্ট হয়। যখন সূর্য্যোদয় হয় তখন আমরা যে আলোক প্রাপ্ত হই, যদি বাতাস না থাকিত তবে আমরা তাহার ৬০ গুণ আলোক প্রাপ্ত হইতাম।

বাতাস আছে বলিয়া আমরা বহু নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য সকল দেখিয়া থাকি, যে উষার রূপে মুগ্ধ হইয়া বৈদিক ঋষিগণ তাহার গুণ গান করিয়া গিয়াছেন, বায়ু ব্যতিরেকে তাহার উদ্ভব অসম্ভব হইত*। বাতাস আছে বলিয়া গোধূলি হয়, আমরা আকাশ নীলবর্ণ দেখি, তারার মিটি মিটি চাহনি দেখিয়া তৃপ্ত হই, এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের অদ্ভুত রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হই। যদি বায়ু না থাকিত বা বায়ু একেবারে স্বচ্ছ হইত তবে যে সকল দ্রব্য সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বাঙ্গে না মাখিত তাহা মোটে আলোকিত হইত না; এক্ষণে বায়ুবাহিত ধূলিকণা প্রভৃতি অস্বচ্ছ পদার্থে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া গৃহাভ্যন্তর ও সমস্ত দ্রব্যাদিই উদ্ভাসিত করে। আমি "সাগর" প্রবন্ধে "জল ও আলোক" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, বায়ু ও আলোকের সম্বন্ধ অবিকল সেইরূপ।

বায়ুর জন্যই পথিক মরীচিকা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে, গ্রীষ্মাতিশয্যে বায়ুস্তর বিভিন্ন তাপসম্পন্ন হইয়া মুকুরের ন্যায় সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করে, ইহাতে বহু দ্রব্যের উল্টা প্রতিমূর্ত্তি নয়নগোচর হইয়া জলভ্রম ঘটে। কখন কখন আকাশেও পোতাদির উল্টা ছবি দেখা যায়। অমরকোষের টীকায় এতৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "গ্রীষ্মে মরুদেশসিকতাবার্ককরাঃ প্রতিফলিতাঃ দূরস্থানাং জলত্বেনাভান্তি তদ্বাচিকা মৃগতৃষ্ণেতি"; "উৎকট রবিরশ্মি জন্য ক্ষিতিবাষ্পজালং মরীচিকা; দূর শূন্যে যন্ময়ুখৈর্জলমিব দৃশ্যতে" ইতি ভরতঃ।

বায়ুতে জলবাষ্প সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। এক মন ৩৭ সের ওজনের একজন মানুষের শরীরে জলীয় ভাগ ১মন ১৮ সের, বাকী ১৯ সের কঠিন পদার্থ। বায়ুমণ্ডলে যদি জলীয় বাষ্প না থাকিত তাহা হইলে তাপসংযুক্ত হইয়া শরীরস্থ জল উড়িয়া যাইলে বাহির হইতে তাহা সম্পূরণ করিবার কেহ থাকিত না এবং তাহাতে মনুষ্যশরীর ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হইত।

এই জলীয় বাষ্প সরিৎসাগর হইতে সূর্য্যতাপে সমুদ্ভূত হয় ও বায়ু তাহা গ্রহণ করে। তাপের তারতম্যানুসারে বায়ু এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রবাহিত হয় ও সেই বাষ্পসকল বহন করিয়া দিগ্দেশে মেঘ ও বৃষ্টি সৃষ্টি করে।

বায়ুস্তরের তাপতারতম্য হেতু ঘূর্ণাবায়ুর উৎপত্তি; তাহার টানে বাড়ী ঘর, গাছ পাগর প্রভৃতি শূন্যে বহুদূর নীত হইতে দেখা যায়; নদীতে বা সমুদ্রে জলস্তম্ভ ও মরুভূমে বালুকাস্তম্ভ ঘূর্ণাবায়ুর টানেই উঠিয়া থাকে।

সংক্ষেপে পৃথিবীর মূল বিষয়গুলি বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই হইল না; বিপুলা পৃথিবীর কালও নিরবধি; যুগযুগান্ত ধরিয়া বলিলেও পরমেশ্বরের সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনা করিয়া শেষ করা সম্ভব নহে। কাজেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির যাহা সাধ্যায়ত্ত তাহা সম্পন্ন করিয়া বিদায় হইলাম।

সমাপ্ত।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পড়ে কি হে মনে?

নিদারুণ নিদাঘে যখন
মরুপ্রায় প্রতপ্ত জীবন;
মধ্যাহ্নের বিশুষ্ক ধরায়
অগ্নিরাশি ঢালিছে তপন;
শীতল নির্ঝর-তীরে বসি
স্নিগ্ধ-দেহ প্রিয়জন সনে,
চিরদিন পিপাসার্ত্ত মোরে
প্রিয়তম! পড়ে কি হে মনে?

গাঢ়তর নভস্তল যবে
নব নীল নীরদমালায়,
স্নিগ্ধকান্তি প্রকৃতির বক্ষ
পরিপূর্ণ ঘন বরষায়,
পিপাসার্ত্ত চাতকের মত
উর্দ্ধমুখ চাহি তোমা পানে,

* বিষুব রেখায় যে উষা বা গোধূলি দেখা যায় না, তাহার কারণ বাতাসের জলহীনতা, এবং সূর্য্যের লম্বভাবে অস্তগমন।

বিন্দুমাত্র বারি-ভিখারীরে
প্রিয়তম! পড়ে কি হে মনে?

শরতের শুভ্র চন্দ্রিকায়
ধৌত যবে শ্যাম ধরাতল,
রাকাচাঁদ আঁকা নিশীথিনী
পূর্ণতায় করে ঢল ঢল,
অন্ধতমো কারাগারে বাঁধা
আঁধারের ক্ষুদ্রতম জনে,
অমৃতের পিয়াসী চকোরে
প্রিয়তম! পড়ে কি হে মনে?

পত্রে পত্রে মুক্তাবিন্দু সম
ঝরে যবে হিমানীর বিন্দু,
কুয়াশায় আধ আধ ঢাকা
পূর্ণিমার পরিপূর্ণ ইন্দু,
অশ্রুবিন্দু ছল ছল আঁখি
কু আশায় প্রমত্ত জীবনে,
চিরদুঃখী জানিয়া অন্তরে
প্রিয়তম! পড়ে কি হে মনে?

শীতে যবে রম্য হর্ম্ম্যতলে
অবরোধি বাতায়নদ্বার,
সুকোমল উষ্ণ শয়নেতে
সুকুমার রাখ দেহভার,
বাহিরের তীক্ষ্ণ শীতবাতে
মৃতপ্রায় ক্লিষ্ট এই জনে,
পূর্ব্বতন পরিচিত ভাবি
প্রিয়তম! পড়ে কি হে মনে?

বসন্তের সায়াহ্নে যখন
সমীরণ শিহরিয়া কায়,
খেলা করে আশে পাশে তব
জাগাইয়া সুপ্ত যূথিকায়,
মধ্যাহ্নের তপনতাপিত
শ্রান্ত ক্লান্ত এই পান্থ জনে,
দীন বলি বারেকের তরে
প্রিয়তম! পড়ে কি হে মনে?

শ্রীদেবব্রত কবিরত্ন।

ভোজ্য, ভূষা ও ভাষা।

(প্রথম প্রস্তাব।)

আমাদের ভোজ্য দ্রব্য এবং বেশ ভূষার সহিত ভাষার কিরূপ সম্পর্ক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা অনতিবিস্তৃত ভাবে বুঝাইবার আকাঙ্খা করি। প্রবন্ধটি নূতন এবং কঠিন সুতরাং সম্যকরূপে ইহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি এবম্প্রকার মহা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করা প্রত্যেক সাহিত্য-সেবী ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। জননীস্বরূপিনী মাতৃভাষা আমাকে অভয় দিউন।

সমাজের হিত, দেশের হিত, আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ অথবা ধর্ম্মালোচনা করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রকার সাধু কার্য্যে ব্রতী হইলে সর্ব্ব প্রথমে প্রাণকে (জীবনকে) রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস স্বীকার করা প্রধান প্রয়োজন। মানুষ মর্ত্ত্যধাম হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলে তাহার আর কার্য্যকরী শক্তি থাকে না সুতরাং পরমায়ু প্রাপ্তির জন্য রেচক, পূরক, কুম্ভক ইত্যাদি যৌগিক সাধনার উদ্ভাবন হইয়াছে। প্রাণকে রক্ষা করিতে গেলে শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শরীরকে নীরোগ রাখার আবশ্যক হইলে ভোজ্য পদার্থ-পুঞ্জের প্রতি মনোনিবেশ করার প্রয়োজন। কেবল যে ভোজ্য পদার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই মানুষ পরমায়ু প্রাপ্ত হয়, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ভোজন যে এ বিষয়ে অন্যতম প্রধান উপাদান তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভোজ্য পদার্থের সহিত মানবের ভাষার অতীব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ইহা ধ্রুব সত্য। বহুল প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, মাতৃভাষার আলোচনায় মানবের আয়ু সম্বর্দ্ধিত হয়; সাহিত্যের আলোচনায় পরমানান্দ জন্মে; আনন্দসমাযুক্ত দীর্ঘ জীবন মোক্ষেচ্ছুদিগেরই পরম ধন। আমাদের ভোজ্য, ভূষা ও ভাষা এই তিনটি জিনিষ আমাদের দেশের সমাজের, ধর্ম্মের, জাতীয় জীবনের এবং প্রত্যেক নরনারীর উন্নতির প্রধান কারণ।

ভোজ্য ও ভূষার সহিত ভাষার সম্পর্ক বুঝিতে পারিলে আমরা আমাদের শরীর মন ও আত্মার উৎকর্ষের উপায় সহজে বুঝিতে সক্ষম হই।

শাস্ত্রকর্ত্তামহোদয়গন ভোজ্য পদার্থ সমূহকে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন; বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরাও এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সংস্কৃত, আরব্য, পারস্য, মিশর, য়িহুদী, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে ভোজনের সহিত মানবের দেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে যেমন আহার করে, তাহার শরীর ও মনোবৃত্তি ঠিক সেইরূপ প্রকৃতি প্রাপ্তহইয়া থাকে। প্রেমিক সাধক ও ভক্তেরা প্রায়ই নিরামিষাশী; তাঁহারা তামসিক আহার প্রায়ই ব্যবহার করেন না, সুতরাং তাঁহাদের সাধুজনোচিত মনোবৃত্তি অনুসারে তাঁহাদের ভাষাও মধুময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী, কোমলা, বিমলা এবং প্রেম ও ভক্তির অনুরূপা। বৈষ্ণবের ভাষা ও ভাব ঘোর তান্ত্রিক বা প্রবল শাক্তের ভাব ও ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; হিংস্রক শ্বাপদের শব্দ হইতে এই জন্য তৃণভোজী পশ্বাদির শব্দ অধিকতর কোমল এবং সুশ্রাব্য। নিরামিষাশী পক্ষী, আমিষভোজী বিহঙ্গ অপেক্ষা মধুরতর শব্দে তাহার আনন্দময় ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ। আমরা প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাইতেছি, মাংসাশী খৃষ্টান জাতির ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা কত মধুময়ী, কত সৌন্দর্য্যময়ী, কত কোমলা এবং কত অমলা!! মহামতি মহম্মদ মধ্য আসিয়ার সুপ্রসিদ্ধ "কোরিশ" (Coreish clan) নামক অতীব প্রাচীন জাতি হইতে আবির্ভূত হয়েন; কোরিশদিগের এক সম্প্রদায় প্রায়ই তামসিক আহারে প্রবৃত্ত হইতেন না; তুলনায় দেখা গিয়াছে সাত্বিক কোরিশেরা তামসিক কোরিশ অপেক্ষা তাঁহাদের মাতৃভাষায় ও স্বজাতীয় সাহিত্যের অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। কোরিশ জাতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া মহামতি মহম্মদ যখন নব মত ও নব ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হয়েন তখন তাঁহার সখা, সহচর, সহায়ক, শিষ্য এবং প্রশিষ্যদিগের মধ্যে আহার সম্বন্ধে তামসিক ভাব প্রবলরূপে দেখা দিয়াছিল; ক্রমে ক্রমে কোরিশ ভাষায় কোমলতা, মধুরতা ও প্রেমভাবব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়া তাহাদের ভাষাকে কঠিনা, কঠোরা এবং কল্লোলা করিয়া তুলিয়াছে। ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন, হিব্রু ভাষা হইতে আরব্য ভাষার উৎপত্তি; হিব্রু ভাষার প্রকৃত নাম ইব্রীয়, কেহ কেহ ইহাকে "আব্রীয়" বলিয়া উচ্চারণ করেন; এই আব্রীয় ভাষা কালক্রমে আরবী (আরব্য) নাম ধারণ করিয়া নূতনবিধ ভাষায় পরিণত হইয়াছে। যাহাদের চেষ্টা, যত্ন ও চিন্তায় এই নবীন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারা য়িহুদী জাতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং অধিকতরভাবে তামসিক আহার, তামসিক পরিচ্ছদ এবং তামসিক প্রকৃতির প্রশ্রয় দিয়াছিল, সুতরাং হিব্রু ভাষা হইতে আরব্য ভাষা অধিকতর কঠিন, কঠোর এবং মাধুর্য্যবিহীন। বাঙ্গালায় দেখুন, বাঙ্গালী বৈষ্ণবকুলচূড়ামণিদিগের প্রেমময়ী, মধুময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী, লালিত্যময়ী এবং আনন্দময়ী ভাষা অপেক্ষা আর কোনও বাঙ্গালী পণ্ডিতের ভাষা কি অধিকতর কোমলা এবং অধিকতর সরলা? বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি নিরামিষাশী ছিলেন। রঘুনাথ দাস জাতিতে কায়স্থ এবং শাক্ত; তিনি শক্তিপূজা পরিত্যাগ পুরঃসর যখন বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব পদে সমাসীন হইয়াছিলেন—যখন তিনি "প্রভুপাদ গোস্বামী" উপাধিতে ভূষিত হইয়া বৈষ্ণবকুলশেখরদিগের সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন—যখন তামসিক আহার ও তামসিক বেশভূষার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাত্বিক ভূষা এবং সাত্বিকসাধকের নিরামিষ আহারে আনন্দ উপভোগ করিতেন, তখন তিনি স্বয়ং কহিয়াছিলেন "আমি দেখিতেছি, সাত্বিক ভোজনে ও সাত্বিক ভূষায় আমার ভাষার এবং আমার মনের বৃত্তি সমূহ সম্যক পরিবর্ত্তিত হইয়াগিয়াছে।"

বৈষ্ণবের কৌপিনেতে ভগবানে দেখি।
বৈষ্ণবের ভোজনেতে প্রেমভাষা লিখি॥

বাঙ্গালার বৈষ্ণব লেখকদিগের গ্রন্থাদি এবং ভক্তি-

রসপ্রধান প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিবার সময়, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই কহিতেন "আমি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতিদিগের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের যতই পর্য্যালোচনা করিতেছি, ততই ভোজনের সহিত মানবের ভাষার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি।"

তির্য্যকজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বুঝিতে পারি, পক্ষিগণ আকারে যত বড় হয় ততই তাহার ভাষা কর্কশ হয়; কেবল তাহাই নহে, তাহার প্রকৃতিও তামসিক বলিয়া জানা যায়। তামসিক প্রকৃতিক বিহঙ্গমবর্গ আকারে প্রায়ই বৃহৎ এবং ভাষা বিষয়ে তাহারা ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন; ক্ষুদ্রাকার পক্ষিপুঞ্জ প্রায়ই সাত্বিক আহারে প্রাণ ধারণ করে, তাহারা দেখিতেও সুন্দর এবং তাহাদের ভাষাও মনোহারিণী। নিরামিষাশী পাখীর স্বর অধিকতর মধুর ও সুশ্রাব্য; উচ্চারণের শক্তিও তাহাদের অধিক। তৃণভোজী ও শস্যভোজী পক্ষীরা মৎস্য মাংসভোজী পাখী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন, ইহাদের বুদ্ধি এবং উচ্চারণ শক্তি আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্যতর। কাক, শকুনি, গৃধ, কুক্কুট প্রভৃতিতে তাহা নাই।

ক, খ, গ এই তিন ব্যক্তিকে একই স্থানে দাঁড় করাইয়া দিয়া যদি ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত করা যার, তাহা হইলে, এই তিন জন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহার্য্যভোজী না হইলে, একই প্রকার কথা তিন ব্যক্তির মুখে শুনা যাইতে পারে। কিন্তু ক যদি সাত্বিক, খ যদি রাজসিক এবং গ যদি তামসিক আহারভোজী হয় তাহা হইলে গালি দিবার সময় অথবা ক্রোধসমাযুক্ত ভাব প্রকাশ করিবার সময় ইহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, বাঙ্গালী বাবু যখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন তখন প্রায়ই হিন্দী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন অথবা ইংরাজির ছড়াছড়ি করিয়া থাকেন। যাঁহারা হিন্দি, উর্দ্দু বা ইংরাজি কিছুই জানেন না, তাঁহারাও অদ্ভুত হিন্দুস্থানী ভাষাকে অথবা দুই একটা শতদুষ্ট ইংরাজি শব্দকে উচ্চারণ করিয়া উত্তপ্ত মনের জ্বালা নির্ব্বাপিত করিয়া থাকেন। একটা ক্ষুদ্র বিড়ালে যে তেজ ও তীব্রতা দেখা যায়, একটা নিরামিষাশী বিপুলবপু মাতঙ্গে তাহা দেখা যায় না। গজেন্দ্রের গম্ভীর ও গর্ব্বিত গরজে মধুরতা আছে কিন্তু উগ্রতা নাই; মার্জ্জারের মর্ম্মভেদী চীৎকারে মাধুর্য্য না থাকিলেও যথেষ্ট তীব্রতা আছে। একজন নিরামিষাশী ব্যক্তির মার্জ্জার বা সারমেয়, এক জন কশাইয়ের বিড়াল বা কুকুর অপেক্ষা শতগুণে অধিকতর সাত্বিক, সুতরাং তুলনায় ইহাদের ভাষা অধিকতর কোমলা ও মধুময়ী। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, সাত্বিক আহারের সহিত মাতৃভাষার উন্নতির যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। কেবল আমিষ পরিত্যাগ করিলেই সাত্বিক ভোজন হয় অথবা সাত্বিক ভোজন অর্থে কেবল নিরামিষ বুঝায়, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। সাত্বিক আহার সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা পরে বলিব। এস্থলে স্থূল কথায় বলিয়া রাখি, যাঁহারা সাহিত্যসেবী এবং যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি কল্পে বদ্ধপরিকর তাঁহাদের মধ্যে আহারের একটা সুনিয়ম থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাঁহারা একেবারে সাহিত্যজীবী অথবা যাঁহারা অনবরত লেখনী পরিচালনা করেন তাঁহারা সাত্বিক আহার্য্য ভোজন করেন, আমার এই অনুরোধ। অনেক স্থলে দেখিয়াছি আমিষাশী অপেক্ষা নিরামিষাশীর ভাষা, ভাব, অনুকরণ, অনুবাদ, উদ্ভাবন, চিন্তাশীলতা, প্রতিভা প্রভৃতি, ঘোরতর তামসিক ভোজ্য-ভোজী পণ্ডিতের অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর।

আমি এক সময়ে স্বপ্নতত্বের আলোচনা করিয়াছিলাম। এই আলোচনায় আমার জীবনের অনেক বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল। আমি অনেক অখণ্ডনীয় প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের সময়ে অনেকে বিদেশীয় ভাষায় কথা কয়, কেহ বা তাহার মাতৃভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে, অনেকে বলিতে পারেন ইহা একটা স্বভাব বা অভ্যাস অথবা বিদেশীয় ভাষার বহু চর্চ্চা বা আকাঙ্ক্ষা-জনিত উচ্ছ্বাস। আমি তাহা বলি না। যাহারা সাত্বিক আহারপ্রিয়, প্রায়ই তাহারা (বিদেশীয় ভাষায় সম্যক প্রকারে অভিজ্ঞ হইলেও) মাতৃভাষায় চিন্তা করে, মাতৃভাষায় স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্ন কালে মাতৃভাষায় কথোপকথন করে। তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আমি স্বপ্নের সময়েও ইংরাজিতে কথা কহিতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। সাত্বিক ভোজ্য-প্রিয় বাঙ্গালীর হাড়ে হাড়ে বাঙ্গালা ভাষা জমিয়া যায়, তাহার হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে মাতৃভাষা দৃঢ় মূলসহকারে বদ্ধ হইয়া যায়, তামসিকের তাহা হয় না। তামসিক ভোজ্যভোজী ব্যক্তি পণ্ডিত হইলেও তাহার রচনায় ও চিন্তায় নূতনত্ব বা আদিমত্ব খুব কম থাকে। তামসিকের ভাষায় বীরত্ব বা তীব্রত্ব থাকিতে পারে, রসিকতা বা শ্লেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু স্বভাবতঃ তাহার ভাষায় লালিত্য, প্রশস্ততা, ঔদার্য্য, গম্ভীরতা, সরলতা ও আদিমত্ব খুব কম। বাঙ্গালী সন্তান নেপোলিয়ান বোনাপার্টির যুদ্ধের প্রকৃত বিবরণ তাহার ভাষায় সম্যকরূপে বর্ণনা করিতে পারে কি না সন্দেহ, কারণ বাঙ্গালা ভাষায় ইউরোপীয় জাতির রাজনৈতিক উগ্রতা অথবা স্বাধীন স্পৃহার চিত্র আঁকিবার সম্যক শক্তি এখনও হয় নাই। বাঙ্গালী রমণী বা বাঙ্গালী পুরুষ, ইউরোপীয়দিগের বিবাহের পূর্ব্বরাগ (কোর্টসিপ্ Courtship) তাহাদের ভাষায় বুঝাইতে পারে কিনা সন্দেহ, কারণ বঙ্গদেশে পূর্ব্বরাগের প্রথা নাই। খৃষ্টান পুরুষের "চন্দ্রোৎসব" (Honey moon), যৌন নির্ব্বাচন-প্রথা, প্রথম প্রণয়, দ্বিতীয় প্রণয়, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিচ্ছেদগাথা (Divorce) প্রভৃতি বর্ণনা করিতে বাঙ্গালী এখনও অসমর্থ, কারণ বাঙ্গালী-সমাজে এখনও এ সকল কথার ধারণা জন্মে নাই। একজন ব্রাহ্ম যাহা পারে, একজন হিন্দু তাহা পারে না; একজন হিন্দু যাহা পারে একজন ব্রাহ্ম তাহা পারে না; কারণ উভয়ের সামাজিক প্রথা অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। একজন মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা ভাষায় যাহা পাই, একজন হিন্দুর ভাষায় তাহা পাই না। হিন্দুর রচনায় যে গুলি দেখি, মুসলমানের রচনায় তাহা দেখি না। খৃষ্টীয় বাঙ্গালী সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারি। সুতরাং সমাজ এবং সামাজিক প্রথার সহিত ভাষার যেমন সম্বন্ধ, মনোবৃত্তির সহিত ভাষার সেইরূপ সম্পর্ক। মনোবৃত্তি শরীরের রস হইতে উৎপন্ন হয়; শরীর আহারের অধীন; সুতরাং আহার ও ভাষা পরস্পর সম্পর্কীভূত না হইয়া পারে না।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

অপূর্ব্ব ব্যাধি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—'পাশ করার সহিত অর্থোপার্জ্জনের সম্বন্ধ অতি অল্প। প্রায় ৬।৭ বৎসর হইল ডাক্তারি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা করিতেছি, কিন্তু কৈ, সাংসারিক অসচ্ছলতা ত, দূর হইল না, আমাদের যে দৈন্য দশা আজিও ত তাহাই আছে।'—দিনের পর দিন যায়, সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াই সত্য কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না, সময়ে সময়ে মন বড়ই খারাপ হইয়া যায় আর শুধু এই কথাই মনে হয় সকলই অদৃষ্ট।

একদিন বাসা হইতে কিছু দূরে একটি রোগী দেখিতে গিয়াছি, কেশ্‌টি কঠিন, ফিরিতে রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখি বাহিরের গৃহ মধ্যে একটি ৩০ কি ৩২ বৎসর বয়স্ক একটি সাদাসিদা সার্ট-পরিহিত দোহারা দেহবিশিষ্ট ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমি সেই গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে ভদ্রলোক কাষ্ঠাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমায় নমস্কার করিলেন। আমি প্রতিনমস্কার পূর্ব্বক বসিতে বলিলাম। আগন্তুক ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন,—"মহাশয় আমি প্রায় তিন কোয়াটারের উপর আসিয়াছি, আমার বসিবার সময় নাই, দেখ্‌চি আপনি বড় ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ী আস্‌চেন, আমাদের বড়ই বিপদ—যদি অনুগ্রহ করে একবার আমাদের বাড়ী আসেন।

আমি তখন বাস্তবিকই বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছি, কিন্তু লোকটীর কথা শ্রবণ করিয়া আমার কোনরূপ বিরক্তি বোধ হইল না, বরং নূতন লোকের বাটী হইতে ডাক আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দই হইল। আমি বলিলাম,—"এর আর অনুগ্রহ কি মহাশয়, এ ত আমাদের কর্ত্তব্য কাজ। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি, অসুখ কি?" বাবু।—"একটি গর্ভাবতী স্ত্রীলোক আজ বেলা প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটার সময় থেকে হঠাৎ কেবল মূর্চ্ছা যাচ্চেন।" আমি লোকটীকে বসিতে বলিলাম এবং বাটীর ভিতর হইতে হাত মুখ ধুইয়া শীঘ্র কিঞ্চিৎ জলযোগ শেষ করিয়া বহির্বাটীতে আসিলাম এবং আমার ব্যাগ ও ২।৩ টী ঔষধ লইয়া অপরিচিতের সহিত তাঁহার বাটিতে গেলাম।

আমায় যেখানে লইয়া গেলেন সে পাড়াটী বড়ই নির্জ্জন, অনেক দিন এই স্থানে আছি কিন্তু সচরাচর এখানে আসিবার প্রয়োজন হয় না। গাড়ী বাটীর দরজায় থামিবামাত্র একটি ভৃত্য আলোক দেখাইয়া আমাদিগকে একেবারে অন্দরমহলের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। আমি একবার বলিলাম,—"বাটীতে অগ্রে একবার খবর পাঠাবেন না?" তাহাতে আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"না, বাটীতে অপর স্ত্রীলোক কেহ নাই আপনি আসুন।" আমি উপরে উঠিয়াই একটি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। তিনি 'আসুন আসুন', বলিয়া আমায় রোগীর কক্ষে লইয়া গেলেন। আমি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একখানি মোটা বস্ত্র আবৃতা একটি রমণী শয্যার উপর শায়িতা রহিয়াছেন ও অপর একটি স্ত্রীলোক, সম্ভবতঃ দাসী শিয়রে বসিয়া একখানি তালবৃন্তের দ্বারা ধীরে ধীরে রোগীকে বাতাস করিতেছে; গৃহে অপর কেহ নাই। আমি শয্যার এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া বাবুটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এখন আর মূর্চ্ছা হইতেছে কি?"

"প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা আর মূর্চ্ছা হয় নাই, কিন্তু এখন বড় মাথার যন্ত্রণা হইতেছে বলচেন্।"

"ওঁর হিষ্টিরিয়া আছে কি, পূর্ব্বে কখনও ফিট্ হোতো?"

তিনি বলিলেন,—"কখনও হয় নাই এই প্রথম।"

আমি রোগীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—"আপনার হাতটা একবার বার করুন ত!" রোগী আবরণের ভিতর হইতে হস্ত বাহির করিলেন, আমি বেশ করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না, নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। বাবুটীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"কয় মাস pregnancy;" তিনি বলিলেন "দশ মাস পূর্ণ হইয়াছে।"

পূর্ব্বে আর সন্তানাদি হ'য়েছে কি?"

"একটি সন্তান হইয়াছিল সেটী ছয় বৎসরের হইয়া ৭।৮ মাস হইল মারা গিয়াছে।"

সত্য বলিতে কি রোগীকে দেখিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, এমন কি গর্ভাবস্থায় নাড়ীর অবস্থা যে প্রকার হওয়া উচিত আমি তাহার কিছুই দেখিলাম না। মনে চিন্তা করিতে করিতে বহির্বাটীতে আসিলাম। বাবুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! গর্ভস্থ সন্তানের কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই ত?"

আমি অন্যমনস্কের ভাবে বলিলাম,—"উপস্থিত কোন সম্ভাবনা দেখি না।"

তৎপরে আমি একখানি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া, যদ্যপি পুনরায় মূর্চ্ছা হয় এক দাগ মাত্র সেবন করাইতে বলিলাম, আর রোগীকে যেন উঠিতে না দেওয়া হয় বলিয়া দিলাম। বাবুটি এইবার আমার ভিজিটের চারিটি টাকা হস্তে প্রদান করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—"মহাশয়! আমি সংবাদ পাঠাইলে কাল একবার অনুগ্রহ ক'রে আস্‌বেন।"

আমি স্বীকৃত হইয়া এই নূতন রোগীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া রাত্রেই একবার আমাদের পুথি-পত্র উল্টাইলাম, তৎপরে আহারাদি করিয়া ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলাম। পরদিন সন্ধ্যার পরই পুনরায় তথায় যাইবার জন্য সংবাদ আসিল; অদ্য বাবুরা কেহ আসেন নাই, একটি ভৃত্য একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছে। আমি অবিলম্বেই তাহার সহিত গমন করিলাম।

তথায় পৌছিয়া শুনিলাম কল্য রাত্রে আর আদৌ মূর্চ্ছা হয় নাই, অদ্য সমস্ত দিনের মধ্যে বৈকাল বেলায় একবার মাত্র হইয়াছিল, চোখে মুখে সামান্য জল দেওয়াতেই মূর্চ্ছাপনোদন হইয়াছে। গত্য কল্য যে মাথার যাতনার কথা শুনিয়াছিলাম তাহা আজ সমস্ত দিনেই অল্প পরিমাণে ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে; রোগী অসহ্যপ্রায় হইয়াছে।

আমি ত্বরায় রোগীর নিকট নীত হইলাম। কি দেখিব তাহা ত জানি না; বিশেষ চিন্তিতচিত্তে শেষে একবার হাত দেখিলাম। নূতনত্ব কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না, কল্য যাহা দেখিয়াছি অদ্যও তাহাই। ব্যাধি কিছু নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, তাহাতে আবার

রোগী গর্ভিনী; যাহাতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে এইরূপ সামান্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া, মাথায় বাতাস করিতে ও মধ্যে মধ্যে বরফ দিতে বলিয়া আসিলাম।

অদ্য আর ভিজিট নগদ পাইলাম না, আসিবার সময় বলিয়া দিলেন,—"কাল সন্ধ্যার সময় গাড়ী পাঠাইব অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন।" আমি কেবল মাত্র বলিলাম —"দিবসে যদি আর ফিট্ হয় তবে একবার সেই সময় দেখিতে পাইলে সুবিধা হয়।" তৎক্ষণাৎ ছোট বাবু বলিলেন,—"যখন আসা প্রয়োজন মনে করিবেন তখনি আসিবেন, যদি কাল আর ফিট হয় আপনাকে সংবাদ দিব।" আমি বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার বিদ্যা বুদ্ধিতে বাহ্যিক কোন রোগই দেখিলাম না।

আরও তিন দিবস গত হইল, মূর্চ্ছা প্রতিদিনই দুই একবার হয়, কিন্তু আমি একদিনও স্বচক্ষে দেখিলাম না। সন্ধ্যা অতীত হইলেই প্রায় গাড়ী আইসে আমি গমন করি এবং কিছুক্ষণ থাকিয়া বাসায় ফিরিয়া আসি। মাথার যাতনার কিছুই উপশম হয় নাই। আমি মূর্চ্ছার জন্য অধিক ভীত নহি, উহা অনেক স্ত্রীলোকের অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রসবের পূর্ব্বে হইয়া থাকে, কিন্তু মাথার যাতনা কেন হইতেছে তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা হয় একদিন প্রাতে রোগীকে দেখি, কিন্তু তাহা তাঁহাদের বলিতে পারি না। আমার যতদূর ক্ষমতা যন্ত্রাদির সাহায্যে মাথা বুক পিঠ সব পরীক্ষা করিয়াছি; একবারও কোন দোষ লক্ষ্য করি নাই। ৬।৭ বৎসর চিকিৎসা করিতেছি এরূপ রোগীও কখন দেখি নাই এবং কখন এরূপ চিন্তিতও হই নাই। আমি আমার সকল পুস্তকাদি দেখিয়াও যখন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তখন কোন প্রধান চিকিৎসকের সহিত একবার যুক্তি লইবার ইচ্ছা জানাইলাম, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বড় মনোযোগ দেখিলাম না। এই কারণে এবং অন্য কয়েকটি কারণে আমার যেন কেমন একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল, মনে করিলাম আর দেখিতে যাইব না।

যে কয়েকটি কারণে আমার মনে সন্দেহ জন্মে তাহা এই। রোগীর এত অধিক যন্ত্রণা কিন্তু এক দিনও সে জন্য কাহাকেও বিশেষ চিন্তিত দেখি না, কেবল প্রতিদিন এই কথা জিজ্ঞাসা করেন,—"গর্ভস্থ শিশুর কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই ত?" রোগী ও একটি দাসী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোক বাটিতে কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না, আর অভিভাবকের মধ্যে ঐ দুইটি বাবু; জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিয়াছি উহারা রমণীর সহোদর। এই কয় দিবসে আমি যত দূর বুঝিয়াছি ইঁহারা ধনী ব্যক্তি, অথচ অপর একজন ডাক্তারকে আনিতে অনিচ্ছুক। আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহের কারণ, রমনীর নাড়ী দেখিবার সময় তাঁহার হস্তে কোন অলঙ্কার এমন কি সধবা স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রধান ভূষণ লৌহ পর্য্যন্ত দেখি নাই। পরিধেয় বসনও পাড় শূন্য, বেশ বিধবার ন্যায়। এই সকল দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। ভদ্র-পরিবার-ভুক্তা দুশ্চরিত্রা বিধবা নাড়ীর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টার কথা কখনও শুনি নাই। এই রমণী চরিত্রহীনা কি সৎচরিত্রা তাহা ঠিক করা আমার পক্ষে কঠিন হইল, অথচ এ কথা জিজ্ঞাসাই বা কাহাকে এবং কি প্রকারে করি। যাহা হউক আমি অনেক ভাবিয়া শেষে স্থির করিলাম আর দেখিতে যাইব না।

সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনের ন্যায় অদ্যও গাড়ী আসিল, আমি লোভ সংবরণ করিয়া ভৃত্যের দ্বারা বলিয়া দিলাম যে, আমার শরীর কিছু অসুস্থ আছে আজি যাইতে পারিব না। গাড়োয়ান ফিরিয়া গেল।

পরদিন প্রত্যুষে আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া সবে মাত্র রাস্তার ধারের সাজায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, দেখিলাম একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া আমার দরজায় লাগিল। সাজা হইতে দেখিলাম, সেই প্রথম দিন যে বাবুটি আসিয়াছিলেন তিনিই আসিয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি নিম্নতলে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয় খবর কি?"

"একবার অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাটী এখনি যাইতে হইবে।"

"কেন বলুন দেখি, কোন নূতন উপসর্গ হয় নাই ত?"

"কল্য রাত্রি দশটার পর হইতে ব্যথা ধরে, আর সেই সঙ্গে মূর্চ্ছাও আরম্ভ হয়; তারপর একটি ধাত্রীর দ্বারায় রাত্রি ৩॥০ টার সময় সন্তান প্রসব করান হয়। ছেলেটি সুস্থ আছে, কিন্তু প্রসূতি এখনও মূর্চ্ছিতাবস্থায় রহিয়াছেন। আপনি বিলম্ব করিবেন না একটু শীঘ্র আসুন।"

"দশটা থেকে এখন পর্য্যন্ত কি একবারও জ্ঞান সঞ্চার হয় নাই ?"

"মধ্যে মধ্যে অতি অল্প সময়ের জন্য জ্ঞান হইলেও পরক্ষণেই আবার মূর্চ্ছিতা হইতেছেন। আমরা বড়ই ভীত হইয়াছি।" আমি পূর্ব্বেই মনে করিয়াছিলাম আর তথায় যাইব না, বিশেষ অবস্থা শ্রবণ করিয়া যাইবার পক্ষে প্রতিকূল বাসনাই প্রবলতর হইল, কিন্তু ভদ্রলোকটীর অনুনয় ও কাতর বাক্যে একটু দুঃখ হইল, আমি আর কোন আপত্তি করিতে পারিলাম না, তাঁহার সহিত গমন করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন তাঁহাদের বাটিতে পৌঁছিলাম তখন সূর্য্যদেব সবে মাত্র উদিত হইবার উপক্রম করিতেছেন। আমায় একেবারে রোগীর নিকট লইয়া গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে স্থানে স্থানে আশু প্রসবের চিহ্ন সকল রহিয়াছে, রমণী আলুথালুভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন, আর একটি নবজাত সুস্থকায় শিশু অপরা রমণীর ক্রোড়ে রহিয়াছে।

ধাত্রী তথায় উপস্থিত ছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে প্রসব করান অন্যায় হয় নাই মনে হইল। আমি রোগীর গাত্রে হাত দিয়া দেখিলাম উত্তাপ স্বাভাবিক, কি আশ্চর্য্য নাড়ীও ঠিক স্বাভাবিক। প্রসবের পরই—বিশেষ উপস্থিত অবস্থায় এরূপ নাড়ী হইতে পারে না। যাহা হউক ঔষধ দিলাম, শুনিলাম দাঁত লাগিয়া গিয়াছে উহা উদরস্থ হইল না। আমি স্বয়ং দাঁত ছাড়াইয়া দিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর দুইবার ঔষধ মুখে দিলাম, কতক উদরে প্রবেশ করিল কতক পড়িয়া গেল। যাহা হউক প্রায় দুই ঘণ্টা পরে অল্প অল্প জ্ঞান হইল। তৎপরে রোগী বেশ সুস্থতা লাভ করিলে, বৈকালে পুনরায় যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া অদ্য সানন্দে ফিরিয়া আসিলাম।

বৈকালে আর লোকের প্রতীক্ষা না করিয়া একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে করিয়া তাঁহাদের বাটীতে গেলাম। প্রসূতিকে বেশ সুস্থ দেখিলাম, তথাপি আবশ্যক মনে করিয়া একটি ঔষধ লিখিয়া দিয়া আসিলাম। আজি রোগীর জন্য মন আর বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় নাই, কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় সন্দেহের কিছুই হ্রাস হইল না। প্রসব হইয়াছে সন্তান জীবিত, তথাপি রমণীর আকার অবয়ব দেখিয়া তিনি যে গত রজনীতে পুত্র প্রসব করিয়াছেন তাহা যেন আমার মনে হয় না।

বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও বাবুদের অনুরোধে আরও কয়েক দিবস তাঁহাদের বাটীতে যাইলাম। প্রসূতি ও পুত্র উভয়েই বেশ সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার অনর্থক আর প্রতিদিন যাইতে একটু লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। আমি একদিন আসিবার কালে বলিলাম,—"কাল আসিবার আর কোন আবশ্যক দেখি না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বাবুদ্বয় আমার অশেষ প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ না করিলে, আমরা রোগীকে কোনক্রমেই রক্ষা করিতে পারিতাম না, আপনার উপকার আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। অনুগ্রহ ক'রে আপনার কি প্রাপ্য বলুন।" আমার এত অধিক প্রশংসার কারণ কি বা আমার দ্বারা বিশেষ কি উপকার হইয়াছে তাহাও জানি না। আমি বলিলাম,—"সে কথা আমায় আর কি জিজ্ঞাসা করচেন্।" বড় বাবু বলিল,—"আপনি দুই দিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছেন এবং পরিশ্রম যথেষ্ট করিয়াছেন, কি পাইলে সন্তুষ্ট হন বলুন।"

আমি বিশেষ কোন উত্তর দিলাম না, বড় বাবু ছোট বাবুকে ইঙ্গিত করিবা মাত্র তিনি কয়েকখানি নোট্ লইয়া আসিলেন। বড়বাবু স্বহস্তে উহা আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে উপকার করিয়াছেন তাহার তুলনায় ইহা অতি সামান্য, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দুই শত টাকা সন্তোষ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন"।

আমি ইতিপূর্ব্বে একস্থানে একত্রে কখন দুই শত মুদ্রা পাই নাই। টাকা গ্রহণপূর্ব্বক বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় বড় বাবুটী বিনীতভাবে বলিলেন,—"মহাশয়! আমার একটা নিবেদন আছে, অনুগ্রহ করিয়া একখানি সার্টিফিকেট্ লিখে দিতে হইবে।"

"কিসের সার্টিফিকেট্?"

"এই আপনার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া প্রসব হইয়াছে ও রোগমুক্ত হইয়াছেন এই লিখে দিবেন, তাহা হইলেই হইবে।"

"সার্টিফিকেটের প্রয়োজন কি ?"

"পরে সামান্য প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে। আচ্ছা মহাশয় ঠিক ক'রে বলুন দেখি, এই রোগীকে চিকিৎসা করিতে আপনার মনে কোন সন্দেহ হয়েছে কি না ?"

আমার মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অদ্য সার্টিফিকেটের কথা শ্রবণ করিয়া আমার সন্দেহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি বলিলাম,—"আজ্ঞা না; সন্দেহ আর কি হবে ?"

"একটু নিশ্চয় হ'য়েছে। আপনার কোন চিন্তা নাই, যাঁকে আপনি প্রসব করালেন উঁনি বাস্তবিকই বিধবা। উঁনি অন্তঃসত্বা হইবার তিন মাস পরেই বিধবা হন।"

এই কথা শুনিয়া আমার মনের একটি বিষম সন্দেহ দূর হইল বটে, কিন্তু একটি নূতন সন্দেহ উপস্থিত হইল, সার্টিফিকেটের প্রয়োজন কি। যাহা হউক আরও কয়েকটী কথাবার্ত্তার পর নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলাম। তিনি উহা পাঠ করিয়াই বলিলেন,—"আপনার তত্বাবধানে প্রসব হইয়াছে এ কথা লিখিলেন না ?"

"আমি যথার্থ সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য বটে, কিন্তু আমার দ্বারা বা আমার তত্বাবধানে যাহা সম্পন্ন হয় নাই তাহা লিখিতে পারি না।"

"আপনি না হয় ঠিক সে সময়টীতে উপস্থিতই ছিলেন না কিন্তু 'কেশ্'-ত আপনার।"

'কেশ্' আমার হইলেও আমি ওরূপ লিখিতে পারিব না, আমায় অনুগ্রহ করিয়া বিদায় দিন।"

"মহাশয়! আপনি অকারণ চিন্তা করিতেছেন কেন ? আপনার সমক্ষে না হইলেও ধাত্রীর মুখে ত সব শুনিয়াছেন, আপনার লেখ্‌বার আপত্তি কি ?"

"মহাশয়! মাপ করিবেন—আমি উহা লিখিতে পারিব না।"

"আপনি লিখিতে বাধ্য। চিকিৎসা করিয়াছেন সার্টিফিকেট দিতে পারেন না ?"

আমি দেখিলাম বাক্‌বিতণ্ডার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবার উপক্রম হইতেছে, অথচ বেশ বুঝিতে পারিলাম যে সার্টিফিকেট না লইয়া ছাড়িবে না। একবার মনে হইল টাকা ফেরত দিয়া চলিয়া আসি, তাহা পারিলাম না। শেষে ভীত মনে আর একখানি লিখিয়া দিলাম। তখন বাবু ধীরস্বরে,—"মহাশয়, অসন্তুষ্ট হইবেন না, আপনার কোন বিপদাশঙ্কা নাই। আপনি পুরস্কার স্বরূপ আরও ২০০৲ শত টাকা লউন"—এই কথা বলিয়া আমায় টাকা দিতে অগ্রসর হইলেন। আমি উহা আর গ্রহণ না করিয়া শীঘ্র বাটী ত্যাগ করিয়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের অদৃষ্টের কথা কে বলিতে পারে ? উল্লিখিত ঘটনার পর প্রায় চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমার সৌভাগ্য-রবি অদৃষ্টাকাশের ঊর্দ্ধদেশে শোভিত। এই পরিবর্ত্তন আমার চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে নহে। ডাক্তারিতে আমার পেশার ইহজন্মে হইল না, আর হইবে বলিয়াও আশা নাই। তাহা না হয় তাহাতে আমি আর বিশেষ দুঃখিত নহি; এক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় আমার অর্থাভাব দূর হইয়াছে, সে দৈন্য দশা এখন আর নাই। এই পরিবর্ত্তনের কারণ একটি অচিন্তনীয় বিষয়সম্পত্তি প্রাপ্তি। আমি এই বিষয় প্রাপ্তির পরই মনে করিয়াছিলাম কোন একটি ব্যবসায় করিব; কিন্তু সে ইচ্ছা শীঘ্রই তিরোহিত হইল। উপস্থিত আমার কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই, কেবল ব্যক্তিবিশেষের বাটীতে প্রয়োজন হইলে কখনও কখনও চিকিৎসা করিয়া থাকি, নচেৎ উহা প্রায় বন্ধই হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘ বৎসর কয়টীর মধ্যে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের বর্ণিত বাবুদিগকে আর কখনও দেখিতে পাই নাই। তাঁহাদের বাটীতে চিকিৎসা করিবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার সে কথা মনে ছিল, সেই অপূর্ব্ব ব্যাধির কথা অনেক ভাবিয়াছিলাম, আমার সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুই

করিতে পারি নাই। এক এক সময় বড়ই ভয় হইত, কারণ আমি যে দিবস টাকা লইয়া তথা হইতে চলিয়া আসি, সন্ধান দ্বারা জানিয়াছিলাম তাহার পর দিবসেই তাঁহারা বাটীতে তালা বন্ধ করিয়া তথা হইতে চলিয়া যান। তাঁহাদের মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে, এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের সহিত স্মৃতির সম্বন্ধ নিকট, কালে আমার সকল স্মৃতিই বিস্মৃতিতে পরিণত হইল।

কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন বৈকালে একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া আলবোলার নল মুখে দিয়া একখানি "বেঙ্গলী" দেখিতেছি। সংবাদস্তম্ভে 'সিভিলিয়ানের মোকদ্দমা' শীর্ষক একটি সংবাদ পাঠ করিলাম; তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—"গত ২৩এ জুন শ্রীরামপুর আদালতে একটি মজার মোকদ্দমার শুনানি হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যবাটীর প্রসিদ্ধ ধনী পরলোকগত রমানাথ দে মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্র মিঃ এ, বি, দে পাঁচ বৎসরের পর বিলাত হইতে সিভিলিয়ান হইয়া সম্প্রতি বাটী আসিয়া, আপনাকে জ্যেষ্ঠতাতের বিষয়ের একমাত্র অধিকারী বলিয়া বিষয় প্রাপ্তির জন্য আদালতে নালিশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগ এইরূপ যে, ৺রমানাথ বাবুর বিধবা পুত্রবধূ যে শিশুকে আপনার গর্ভজাত পুত্র বলেন, উহা তাঁহার সন্তান নহে অপরের পুত্র, বিষয় হস্তগত করিবার মানসে উহাকে নিজ পুত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষীর শুনানি শেষ হইয়াছে, প্রতিবাদী ঐ পুত্রের প্রসবকালে যে ডাক্তার ও ধাত্রীর চিকিৎসাধীনে ছিলেন তাঁহাদের সার্টিফিকেট্ আদালতে দাখিল করিয়াছেন। বাদীপক্ষের প্রার্থনায় সরকারী ডাক্তারের দ্বারা উক্ত রমণী ও বালকটীকে পরীক্ষা করান হইয়াছে। তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ যে বালকটী উক্ত স্ত্রীলোকের হওয়াই সম্ভব। ৫ই জুলাই পুনরায় দিন পড়িয়াছে। বিচারফল জানিতে উৎসুক রহিলাম।"

মিঃ এ, বি, দে আমার এক জন বিশিষ্ট বন্ধু; তিনি আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠী, পূর্ণ নাম বাবু অনাথবন্ধু দে; বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত নাম ধারণ করিয়াছেন। বন্ধুবর বিলাতে থাকিয়া প্রথম প্রথম কয়েক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক দিন উভয়ের মধ্যেই আর পত্র-ব্যবহার হয় নাই; অদ্য সংবাদপত্র পাঠে জানিলাম সিভিলিয়ান হইয়া সম্প্রতি বাটী আসিয়াছেন। অনাথ বাবুকে শীঘ্র একখানি congratulation পত্র লেখা উচিত মনে করিয়া লিখিলাম এবং মোকদ্দমার বিষয় সবিশেষ জানিতে চাহিলাম।

যথা সময়ে পত্রের উত্তর আসিল। মোকদ্দমার বিষয়ও সকলি অবগত হইলাম। বুঝিলাম বিষয় প্রচুর, বন্ধুবর যে ইহাতে নিশ্চয় পরাজিত হইবেন তাহা আমার মনে হইল। আমি বন্ধুর মোকদ্দমার কথা ভাবিতেছি, হঠাৎ চারি বৎসর পূর্ব্বের সেই বিধবা রমণীকে চিকিৎসা করা, সেই সার্টিফিকেট দেওয়া প্রভৃতি কথা মনে পড়িল। ক্রমে চিন্তা করিতে করিতে আমার মনে হইতে লাগিল এই রমণী ও বালক তাঁহারা নয় ত? আমি কৌতূহল বশতঃ বন্ধুকে লিখিলাম,—"প্রতিবাদী আদালতে যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন, তাঁহার নাম কি? সন্ধান লইয়া শীঘ্র আমায় লিখিবে বিশেষ আবশ্যক আছে।" প্রতি উত্তরে সেই ডাক্তারের নামের স্থানে আমার নাম দেখিলাম। অনাথ বিস্মিত হইয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ইহা আমিই কি না। আমি যাহা ভাবিতেছিলাম তাহাই হইয়াছে। এবার কিন্তু আর কোন ভয় হইল না। আজি অনেক দিন পরে সেই অপূর্ব্ব ব্যাধিসংলিপ্ত সকল সন্দেহ বিনা আয়াসে মন হইতে অপসারিত হইল।

আমি পত্র পাইয়াই বন্ধুর বাটীতে গমন করিলাম। অনেক দিনের পর দেখা, বিশেষ বিলাত হইতে সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন; কথা কহিবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু প্রথমেই মোকদ্দমার কথা হইল। তাঁহার মুখে শুনিলাম রমানাথ বাবুর মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বেই তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন অতএব বিষয় অনাথেরই প্রাপ্য। রমানাথ বাবুর পুত্রবধূ স্বামীর মৃত্যুর পরই পিত্রালয়ে গমন করেন এবং তথায় যাইয়া আপনাকে গর্ব্ভবতী বলিয়া প্রকাশ করেন। তৎপরে দেড় বৎসরের পর একটি শিশুকে লইয়া বাটী ফিরিয়া আসেন। এখানকার অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস পুত্র তাঁহার নয়। অনাথ বাবু নিজে কিছুই জানেন না, লোকের মুখে শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

অর্থের জয় মুখ্য, কিন্তু পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হইয়া

থাকে। যদিও লোকের বিশ্বাস অনাথ বাবুর অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য, তথাপি অর্থলোভে অনেকেই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। আর ডাক্তার মহাশয়ের,—পুত্র ও জননীকে পরীক্ষা করিয়া অনুকূল সার্টিফিকেট্ দেওয়া আমি একটুমাত্রও আশ্চর্য্য মনে করি না।

অনাথ বাবুর নিকট শুনিলাম প্রতিবাদীর সহোদরেরাই এই মোকদ্দমার তদারক করিতেছেন। তাঁহারা কলিকাতার এক জন বড় ব্যারিষ্টার দিয়াছেন। বন্ধুবরও কলিকাতার কোন নামজাদা উকীলকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি একবার গোপনে প্রতিবাদীর সহোদরদিগকে দেখিবার ইচ্ছা জানাইলাম। অনাথবাবু আমার ইচ্ছামত গোপনে তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। এইবার সকল সন্দেহ মিটিল। সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়া যদ্যপি বন্ধুর কোনও উপকার করিতে পারি—করিব।

মোকদ্দমার দুই দিন মাত্র বাকি আছে, আমি আর বাটী গেলাম না। অনাথ বাবুর বিশেষ অনুরোধ ও যত্নে তাঁহার বাটীতেই রহিলাম।

উপসংহার।

অদ্য ৫ই জুলাই, প্রাতেই আহারাদি করিয়া আমরা শ্রীরামপুর যাইলাম। বেলা আন্দাজ ১২টা হইয়াছে, আদালত-গৃহ ক্রমশঃই জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় আমাদের প্রধান উকিল কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং এখানকার নিযুক্ত উকিলবর্গের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপক্ষদলের শ্বেতাঙ্গ ব্যারিষ্টারপ্রবর পূর্ব্বেই আসিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ণিত বাবুদ্বয় বিশেষ হর্ষ ও উৎসাহ সহকারে কাগজ পত্র হস্তে এদিক ওদিক করিতেছেন, উকিলদের নিকট যাতায়াত করিতেছেন এবং এক একবার সাক্ষীদের নিকট যাইয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিয়া তাহাদের আপ্যায়িত করিতেছেন। আমি তাঁহাদের বাটীতে চিকিৎসাকালে যে ভৃত্য ও সূতিকাগৃহে যে ধাত্রীকে দেখিয়াছিলাম তাহাদের মত দুই ব্যক্তিকে যেন সাক্ষীদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। আমি এরূপ সাবধানের সহিত সকলকে দেখিতেছি যে, তাঁহারা কেহ আমায় দেখিতে পাইতেছেন না।

দেখিলাম আদালতের সামান্য দর্শক হইতে সকল বিজ্ঞ উকিলগণের পর্য্যন্ত ধারণা যে মিঃ এ, বি, দের পরাজয় নিশ্চয়। একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিশেষ ধনী লোকের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যেরূপ হইয়া থাকে এই মোকদ্দমায়ও সেইরূপ হইয়াছে। সকলের মুখেই ঐ বিষয়ের কথা, সকলেই বিচার ফল জানিবার জন্য ব্যগ্র।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমাদের মোকদ্দমা উঠিল। উভয় পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টারে শূন্য চেয়ারগুলি অধিকৃত হইল। আদালতের বাকি অধিকাংশ উকিলও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ গরাদে ঠেস দিয়া, কেহ বা সাহেব ব্যারিষ্টারের কাছ ঘেঁসিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে বিচার-গৃহের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছেন।

প্রথমেই আমাদের পক্ষের উকিল আমাকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রদান করিতে প্রার্থনা করিলেন। বিপক্ষপক্ষের উকিল তাহাতে আপত্য করিলেন, কিন্তু তাহা টিকিল না। তৎপরে একে একে পূর্ব্ব দিবসের অবশিষ্ট সাক্ষীগণের এজাহার শেষ হইলে পর আমার ডাক হইল। আমি কাটগড়ার ভিতর প্রবেশ করিয়া যথারীতি 'সত্য বই মিথ্যা বলিব না'—ইত্যাদি শপথ করিলাম। এই সময় একবার আদালতগৃহের জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম; দেখিলাম বড় বাবুর সেই ঈষদ্পক্ক কেশ, গুম্ফ ও দাঁড়ি-বিশিষ্ট বদনকমল যেন হঠাৎ কালিমাময় হইয়া গিয়াছে। তিনি উকিলের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া যেন আমার কথাই কহিতেছেন মনে হইল।

এইবার আমার সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ হইল। আমার যতদূর মনে আসিল আমি সকল কথা সত্য বলিলাম, কোন কথা গোপন রাখিলাম না বা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলাম না। সে সময়ে আমার মনোমধ্যে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল তাহাও বলিলাম। আদালতের সেই বিস্তীর্ণ জনতা নিস্তব্ধ হইয়া আমার মুখপানে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিল। আমার প্রতি এইবার জেরা আরম্ভ হইল। বিচারপতি স্বয়ং আমায় জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"যদি তোমার সন্দেহ হইয়াছিল তবে তুমি সার্টিফিকেট্ দিয়াছিলে কেন ?"

আমি এইবার সামান্য মিথ্যা বলিলাম,—"আমায় প্রহারের ভয় দেখাইয়াছিল সেই কারণ আত্মরক্ষার্থে সার্টিফিকেট্ লিখিয়া দি।"

প্রশ্ন। পরে তুমি ইহার কোন প্রতিবিধান কর নাই কেন ?

উত্তর। আমি যে দিন উঁহাদের বাটী হইতে চলিয়া আসি, তাহার পর দিনই তাঁহারা কোথায় চলিয়া যান এতাবৎ তাহার আর কোন সন্ধান পাই নাই।

প্রশ্ন। ইঁহারা পর দিবসই তথা হইতে চলিয়া আসেন তাহা তুমি প্রমাণ করিতে পার ?

উত্তর। সম্ভবতঃ পারি।

প্রশ্ন। সম্ভবতঃ তুমি এ জন্য টাকা লইয়াছিলে ?

উত্তর। এ জন্য একটি পয়সাও লই নাই,পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমায় টাকা দিতে আসিয়াছিলেন আমি গ্রহণ করি নাই।

আমি টাকা লইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বিপক্ষপক্ষের ব্যারিষ্টার বিশেষ চেষ্টা করিলেন। জজ তাহা শুনিলেন না।

এইবার সেই ধাত্রীকে পুনর্ব্বার ডাকা হইল, কিন্তু তাহাকে আর আদালতের সীমার মধ্যে কেহ দেখিতে পাইল না। জজ সাহেব প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে 'রায়' দিলেন। সিভিলিয়ান মিঃ এ, বি, দের জয় হইল। সেই মানবমণ্ডলী এক অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আদালত-গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আমি বন্ধুবরের বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সত্ত্বেও অদ্য আর তাঁহার সহিত যাইতে পারিলাম না, শ্রীরামপুর হইতেই বাটী ফিরিলাম।

পর দিন প্রাতে 'বেঙ্গলী'তে এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত অবশিষ্ট কথা পুনরায় পাঠ করিলাম; দেখিলাম আমার নামটীও সেই সঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

সাগর কথা।

বহুবাজার নিবাসী ৺রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশীয় হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকগণের অগ্রণী। তিনি সর্ব্বপ্রথম এ দেশে হোমিওপ্যাথী প্রণালীমতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ইনি একদিন সুকিয়াষ্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে একটি রোগীর চিকিৎসায় আসিয়া ঐ প্রণালীমতে চিকিৎসার দ্বারা সেই রোগীকে আরোগ্য করেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময় সেই বাটীতে অবস্থিতি করিতেন।

এই অকিঞ্চিৎকর জলবিন্দুর শক্তি ও উপকারিতা দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদ্ধতির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। এই ঘটনার পরেই তিনি তাঁহার বিজ্ঞানানুরক্ত সুহৃদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাপদ্ধতির বিজ্ঞানসঙ্গত যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। ডাক্তার সরকার মহোদয় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের ইচ্ছাই ছিল না। জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের দারুণ পীড়ার সময় প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয় বন্ধুতে একত্রে এক গাড়ীতে যাতায়াতের সময়ে বহু তর্কবিতর্কের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতিরিক্ত পীড়নে বাধ্য হইয়া শ্রীযুক্ত সরকার মহোদয় এই অভিনব পদ্ধতির মূল তত্ত্ব ও ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া সুহৃদ-সমীপে অঙ্গীকার করেন।

সেই অঙ্গীকার ও তজ্জাত অনুসন্ধানের ফলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা প্রণালী আজ বাঙ্গালাদেশে বিশিষ্টরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে। ডাক্তার সরকার মহাশয় যখন তাঁহার অনুসন্ধানের ফল জ্ঞাপন করিয়া আপনার চিকিৎসা প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিলেন তখন পরদুঃখকাতর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনটি কারণে তাঁহার সুকোমল হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম কারণ এই যে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি বিনা ব্যয়ে ও অল্প ব্যয়ে ঔষধ পাইবে,

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দেশীয় চিকিৎসায় অনুপান-নিগ্রহ ও অ্যালোপাথীর সুতীব্র কটু কষায় ইত্যাদির আস্বাদন হইতে সবল, দুর্ব্বল ও মুমূর্ষু রোগী অব্যাহতি লাভ করিবে। তাঁহার আনন্দের তৃতীয় কারণ এই যে উপর্য্যুক্ত উভয় পদ্ধতির কঠোর শাসন হইতে সুকোমল শিশুকুল রক্ষা পাইবে।

এই ঘটনায় তাঁহার পরসুখপ্রিয় হৃদয়ের আনন্দ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি ডাক্তার সরকার মহোদয়ের পরীক্ষার ফল পরিজ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথীর জন্মস্থান আমেরিকায় এককালীন ৯০০৲ নয় শত টাকা প্রেরণ করিয়া উক্ত প্রণালী সম্বন্ধীয় সমগ্র গ্রন্থাবলী ও ঔষধ আনাইয়াছিলেন।

অধুনা লোকান্তরিত ৺ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রথম এই নয় শত টাকার অপব্যয় লইয়া সর্ব্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিদ্রূপ করিতেন, এবং সুযোগ ঘটিলে বিদ্রূপ তিরস্কারে পরিণত হইত। কিন্তু সুগভীর সাগরহৃদয় সহজে শুষ্ক বা ক্ষুব্ধ হইবার নহে। যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া একবার বুঝিতেন, তাহাতে মুক্তহস্তে আত্মোৎসর্গ করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। বহু অর্থব্যয় করিয়া অস্তাচলপ্রান্ত দেশ হইতে পুস্তকাদি আনাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঔষধাদির গুণাগুণও পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় এক দিন আপনার গৃহদ্বারে একটি কঠিন রোগাক্রান্ত ভিখারীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার মুখের একাংশ শ্লেষ্মাজনিত ক্ষতে একেবারে যায় যায় হইয়াছে। তাহার মুখের অবস্থা এরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহার দিকে তাকাইতেও ভয় হয়। এইরূপ এক বিপন্ন রোগীকে পাইয়া তাহার পীড়ার কারণ, সূত্রপাত, ও এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তির সমগ্র বিবরণ তাহার নিকট শুনিয়া তাহার চিকিৎসার ভার লইলেন, তাহাকে আপনার পছন্দ ও সুবিধামত স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসার পর সে ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিল। এইরূপ সাংঘাতিক পীড়ার চিকিৎসায় তাঁহার হাতে এই রোগীই সর্ব্বপ্রথম আরোগ্য লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে পরমুখে শ্রুত সত্য তাঁহার করায়ত্ত সম্পত্তিতে পরিণত হইল।

রোগীর ক্রমশঃ আরোগ্য লাভের অবস্থায় ইহার বিষয়ে কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। সহিষ্ণু চিকিৎসকের ন্যায় নীরবে তাহার চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা করিতেছেন, যখন রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া একদিন বন্ধুমণ্ডলী সমক্ষে উপস্থিত হইয়া ব্রজ বাবুকে বলিলেন--"এই লোকটার বিবরণ একবার শুনুন ত!" সে ব্যক্তি তাহার পীড়ার কারণ, সূচনা ও রোগভোগ এবং পরিশেষে সাগরসদনে কতদিনে কিরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে সমস্ত বিবৃত করিল। তখন এই নব্য চিকিৎসক মহাশয় সুখে—হাসি মুখে বলিলেন "বড় যে ঠাট্টা করিতে, ন-শ' টাকা জলে গেল। আমার পাগ্‌লামি চেগে উঠ্‌লে, খেয়াল চাপ্‌লে আমি অসম্ভবটা সম্ভব কর্‌তে চাই, এখন কি বল? সম্ভব হ'য়েছে ত? এই একটী রোগীকে বাঁচাইয়া নয় শত টাকা আদায় হইল কি?"

বিদ্যাসাগর মহাশয় হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করিয়া বহু লোকের উপকার সাধন করিয়াছেন, অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার খর্মাটাড়ের সাঁওতাল সুহৃদমণ্ডলী এই চিকিৎসাপ্রণালীর সমাদর করিতে শিখিয়াছিল! বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদাই বলিতেন "এটা হ'য়ে বড়ই ভাল হয়েছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে ঔষধ খাওয়াইতে আর লাঠালাঠি করিতে হয় না। ছোট ছোট বড়ি একবার জিহ্বাতে লাগাইয়া দিতে পারিলেই হইল, একটু বড় যারা তারা ঔষধ চেয়ে চেয়ে খায়, এ কি কম সুবিধা! ছেলে মেয়েগুলা বেঁচে গেছে।",

একবার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা সম্বন্ধে কথা পাড়িলে পর, কথায় কথায় বলিলেন "এই প্রণালী মতে চিকিৎসা করা বড়ই কঠিন কাজ। ডাক্তার হইলেই যে এই মতে উত্তম চিকিৎসা করিতে পারিবে আমার তাহা বোধ হয় না। আমার মতে ডাক্তার অপেক্ষা "Earnest quack"এর (অব্যবসায়ী ভদ্র লোকের) হাতে হোমিওপ্যাথী মতে ভাল চিকিৎসা হয়, আর সেরূপ লোকের হাতে অনেক অধিক স্থলে উত্তম ফল লাভ হইয়া থাকে।" এই উক্তির তাৎপর্য্য অবগত হইবার মানসে তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন "আনাড়ী ব্যক্তি

সংলোক হইলে রোগের লক্ষণ ও উপসর্গগুলি যেমন তন্ন তন্ন করিয়া পুস্তকান্তর্গত ঔষধবিষয়ক উপদেশের সঙ্গে মিলাইয়া ঔষধ দিবে, ডাক্তারেরা প্রায়ই সেরূপ করে না। তাই আনাড়ীর হাতে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা। আমি নিজেও ত একজন আনাড়ী কিন্তু আমার হাতে হোমিওপ্যাথী ঔষধের ফল বড় বেশী ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় সহোদর স্বর্গীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন অগ্রজের উৎসাহ ও প্ররোচনায় এই হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনিও জ্যেষ্ঠের ন্যায় সহৃদয় ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। সে কালে কলিকাতায় অত্যধিক কলেরা পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইত। বিদ্যাসাগর-সহোদর দীনবন্ধু অনেক সময় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ঔষধের বাক্সটী সঙ্গে লইয়া বিপন্ন ও অসহায় পীড়িতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেন। অনেক স্থলে কেবল মাত্র ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ও ঔষধ দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেন না। পথ্যেরও ব্যবস্থা করিতে হইত, তাই অনেক সময়ে সঙ্গে মিছরি, সাগুদানা, বেদানা ইত্যাদিও থাকিত। ইহাতেও অব্যাহতি ছিল না। কোথাও কোথাও রোগীর শেষ দশা উপস্থিত হইলে মুখে জল দিতেন, স্থানে স্থানে সৎকার পর্য্যন্তও সমাধা করিতে হইত। এই সকল বিষয়ে দীনবন্ধু, দীনবৎসল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকক্ষ ও সমাচারী ছিলেন। দীনবন্ধু সুবৃহৎ জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইয়াও কেবল সৌরকরোজ্জ্বল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ বলিয়াই লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামের লক্ষ্মণের ন্যায় দীনবন্ধু চিরদিন অগ্রজের পশ্চাতে থাকিয়া পরহিত সাধন করিয়া জীবন ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

রেঙ্গুনেই হউক কি হংকংএই হউক এক সাহেব অনেক দিন ধরিয়া হাঁপানী রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। সহসা একদিন চা সেবনের পর, তাঁহার হাঁপানীর গ্লানির মাত্রা হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল, অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, কএকটা তৈলপায়ী (আরসুলা পোকা) তাঁহার চা-পাত্রের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। চা প্রস্তুত করার সময়ে তাহারাও চায়ের সঙ্গে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সাহেব আর দু একবার তেলা পোকা সিদ্ধ জল পান করিয়া হাঁপানী রোগের যন্ত্রণা হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করিয়া, লোকহিতের জন্য তিনি তাঁহার প্রাপ্ত ঔষধের সংবাদ, সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দেন। সংবাদপত্রে এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বর্গীয় মহাপুরুষ তৎক্ষণাৎ হোমিওপ্যাথীপ্রক্রিয়া মতে হাঁপানীর ঔষধ ও তৎসহ ঔষধসেবনের মুদ্রিত ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করাইলেন। হাঁপানী পীড়াগ্রস্ত রোগী দলে দলে ঔষধ লইতে আসিত। আমরাও আমাদের কত বন্ধু বান্ধবের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে এই ঔষধ আনিয়াছি। তিনি বহু বহু স্থলে এই ঔষধের উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া সর্ব্বদাই এই ঔষধের প্রশংসা করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় প্রতিদিনই এই ঔষধ বিতরিত হইত। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি প্রচুর পরিমাণে এই ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া সুবৃহৎ কাচপাত্রে মজুত রাখিতেন। তাঁহার স্বভাবে লোকহিতসাধনসঙ্কল্প এরূপ সুন্দর আশ্রয় পাইয়াছিল যে, তাহা স্মরণ করিয়া আজ সেরূপ সহজস্বভাব ও সরল প্রকৃতির লোকাভাবে দীর্ঘদূরব্যাপী শূন্যতাই পরিলক্ষিত হয়। লোকের ত অভাব নাই, কিন্তু এমন করিয়া কোন ব্যক্তি মানুষের ক্লেশ নিবারণের উপায় পাইলে তাহার অবলম্বনে ব্যস্ত হয়? লোকহিতৈষণার এমন স্বভাবসুন্দর চিত্র সংসারে অতি অল্পই দেখা যায়, তাহা না হইলে, তাঁহার লোকান্তরগমনের পরেও তদীয় গৃহ হইতে এই ঔষধটী বিতরিত হইতে হইতে বন্ধ হইয়া যাইবে কেন। হায়, হায়! কত লোক যে এখনও এই ঔষধের জন্য তাঁহার চিরপরিচিত আবাসদ্বারে আসিয়া নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তাহার সংখ্যা হয় না। মানুষ সকলেই সত্য কিন্তু তাঁহার মত মানুষ সংসারে অতি দুর্লভ।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাদাগাসকারের সাকালাভা।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকায় মাদাগাসকার দ্বীপ অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় একশত ও প্রস্থ তিনশত মাইল। তীরভূমি সমতল ও ঢালু। এই দ্বীপের চতুষ্পার্শ্বে নিবিড় অরণ্যানি হিংস্রজন্তুর আবাসভূমি হইয়া স্থাবরজীবন অতিবাহিত করিতেছে। Lemurs নামক এক জাতীয় মর্কটের জন্য এই দ্বীপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের প্রধান অধিনায়ক এই বানরকুলের প্রায় ৪৮ প্রকারের সন্তান সন্ততি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিহায়সকুলও সময়ে সময়ে দর্শকের দর্শন-পথের পথিক হইয়া থাকে। আকৃতি অনুযায়ী ডিম্বও ইহারা প্রসব করিয়া থাকে—এক একটী ১২ ইঞ্চি লম্বা ও ৯ ইঞ্চি প্রস্থে।

মাদাগাসকারে নানা প্রকার জাতি বাস করে। আদিম জাতির নাম জানা দুরূহ, তবে এখনও স্থানে স্থানে প্রস্তর-স্তূপ, অর্দ্ধভগ্ন স্তম্ভ প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ ধরণীর মূক বক্ষে শায়িত থাকিয়া অতীতের মহামহিমামণ্ডিত গৌরব দীপ্তির জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমান অধিবাসীগণ নিগ্রো এবং আরাববংশসম্ভূত।

সাকালাভাগণ পশ্চিম তীরে বাস করে। তাহারা নিগ্রোদিগের ন্যায় মসীবর্ণ এবং বলিষ্ঠদেহী। তাহাদের মস্তকের কেশদাম সুদীর্ঘ এবং কোঁকড়ান, চক্ষু বিস্তীর্ণ এবং গভীর, নাসারন্ধ্র সুবৃহৎ। তীরবাসী অধিকাংশ সাকালাভাই ধীবরের কার্য্য করে, দূরবর্ত্তী অধিবাসীগণ চাস আবাদ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারা ধীবরদিগকে ধান্য, চাউল দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে মূল্যের পরিবর্ত্তে লবণ ও মৎস্য লইয়া থাকে। ইহারা সদা সর্ব্বদাই মদ খায়, চুরি ও মারামারি করে। প্রত্যেকেই প্রতিবেশীর ভয়ে শঙ্কিত থাকে। সকলের মনেই এই আশঙ্কা সর্ব্বদা জাগরূক থাকে যে, তাহার আত্মীয় স্বজন বোধ হয় ধনলোভে তাহাকে নিহত কিম্বা দাসরূপে বিক্রয় করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে।

তাহাদের এক প্রকার অদ্ভুত রকমের রণ-নৃত্য আছে। আক্রমণ, যুদ্ধ, অনুধাবন, যুদ্ধজয়ের পর হর্ষ প্রকাশ করার আদেশ সমস্তই অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, মুখে কিছুই বলিতে হয় না। তাহাদের বন্দুক লম্বা এবং উপরিভাগে কাঁসার কাঁটা মারা থাকে। নৃত্যকালে তাহারা সেই সকল বন্দুক এক হস্তে শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া অপর হস্ত দ্বারা ধারণ করে এবং অন্য হস্তে একখানি রুমাল ঘুরায়। আমরা নিম্নে একটি চিত্র প্রদান করিলাম, পাঠকগণ ইহা হইতেই তাহাদের নৃত্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন।

পূর্ব্বতীরবাসীগণ অপেক্ষাকৃত ফরসা এবং তাহাদের চুল শুকরের কুচির ন্যায় সোজা। তাহারা অধিকাংশই শান্ত এবং নম্র প্রকৃতির। বাসস্থান অনুসারে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যাহারা জঙ্গলে বাস করে তাহাদিগকে “জঙ্গলী লোক,” (People of the forest) বলে, যাহারা পরিস্কৃত ক্ষেত্রে বাস করে তাহাদিগকে “দেশের লোক” (People of the open land) বলে। এইরূপ People of the lakes প্রভৃতি আখ্যাও প্রচলিত আছে।

তীর হইতে দূরবর্ত্তী দেশ সমূহে হোভাস্ (Hovas) নামক এক প্রকার জাতি আছে। তাহারা রাজ-জাতি, দেশ শাসন করে কিন্তু সাকালাভারা তাহাদের কর্ত্তৃত্ব সহসা স্বীকার করিতে চায় না। এই রাজ-জাতির ধমনীতে মালয় (Malay) রক্ত প্রবাহিত আছে। তাহাদের কতক জাভা হইতেও আগমন করিয়াছে, অনেকে এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। তাহাদের রং ফরসা, এবং তাহারা খর্ব্বাকৃতি

ও কিছু স্থূলকায়; তাহাদের কেশ কোমল, কৃষ্ণবর্ণ ও সোজা; দাড়ি অল্প, চক্ষু উজ্জ্বল লোহিতাভ।

সাকালাভাগণ দীর্ঘে ছয় হস্ত এবং প্রস্থে দেড় হস্ত পরিমাণ বস্ত্র পরিধান করে। এইরূপ বস্ত্র স্ত্রীপুরুষ সকলেই পরিধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা কটিদেশে তিন চারি ভাঁজ জড়াইয়া শেষাংশ স্কন্ধদেশে রাখে। রাজকীয় রং—লাল। রাণী লাল রঙ্গের পোষাক পরিধান করেন এবং যখন তিনি ভ্রমণে বহির্গত হন,তখন লাল রঙ্গের একটী ছত্র তাঁহার শিরোপরি ধরা হয়। রাস্তায় কোন লোক সম্মুখে পড়িলে,—"রাণি,দীর্ঘজীবিণী হও" বলিয়া অভিবাদন করে।

অধিকাংশ স্ত্রীলোকই চুল বাঁধে না কারন তাহা সময়-সাপেক্ষ। অনবরত দুই তিন ঘণ্টা কাল পরিশ্রম করিলে এক জনের চুল বাঁধা শেষ হয়। তাহারা চুলের ২৪টী ভাগ করে, তাহার পর পরস্পর এক একটী পাকাইয়া একত্র করিয়া একটী গোলাকার ঝুঁটি করে। কেহ কেহ ঝুঁটি করে না, চব্বিশটী বেণী নিতম্ব দেশে ঝুলিতে থাকে।

চাউলই তাহাদের প্রধান খাদ্য। ঢেঁকির পরিবর্ত্তে কাষ্ঠের চাকা লাগান হাঁড়ির মধ্যে ধান রাখিয়া লম্বা কাষ্ঠ-দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া স্ত্রীলোকেরা চাউল প্রস্তুত করে। শাক সব্জি, গোমাংস, ছাগমাংস, শূকরমাংস প্রভৃতি তাহারা ভাতের সহিত আহার করে। দিবসে দুইবার তাহারা ভোজন করে, একবার দ্বিপ্রহরে আর একবার সন্ধ্যার সময়। ভাত তাহাদের বড় একটা সহ্য হয় না। যদি কেহ কোন দিন অধিক পরিমাণে আহার করে, তবে তাহার সে দিন উদর স্ফীত হয়। পুত্রের উদর পরীক্ষা করিবার জন্য, জননী ভোজনকালে পুত্রের উদরে একটী ফিতা ঢিল করিয়া বাঁধিয়া দেয়। আহার করিতে করিতে যাই ফিতা উদরসংলগ্ন হয়, অমনি তাহাকে আর আহার করিতে দেওয়া হয় না।

মাদাগাসকারবাসীদিগের নিকট পঙ্গপাল একটী উপাদেয় খাদ্য। যে সময় পঙ্গপালের ঝাঁক উপস্থিত হয়, তৎকালে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পঙ্গপাল পঙ্গপাল বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠে এবং ঝাঁকা লইয়া ধরিতে বহির্গত হয়।

তাহারা নস্য টানিতে বড় ভাল বাসে কিন্তু আমাদের দেশে নস্য যেমন নাসিকা দ্বারা টানিয়া লওয়া হয়,তাহাদের দেশে সেরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। তাহারা নস্য মুখে প্রদান করে। বাঁশ কাটিয়া তাহারা নস্যদানি প্রস্তুত করে।

আমাদের দেশে ঘরের বারান্দায় যেমন চাল লাগায়, তাহাদের ঘরই সেই রকম। তিনটী খুঁটির উপর এই চাল সংরক্ষিত। লাল বর্ণের মৃত্তিকাদ্বারা দেওয়াল দেওয়া হয় এবং ঘাস দ্বারা চাল প্রস্তুত করে। ঘরের প্রবেশদ্বার অতি সংকীর্ণ; সোজাভাবে প্রবেশ করিতে গেলে মস্তকে বিষম আঘাত পাইতে হয়। অপর বাড়ীর কেহ অন্য কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে অগ্রে বলিতে হয়—'আমি কি প্রবেশ করিতে পারি?' গৃহস্বামিনী—'আসিতে আজ্ঞা হউক, মহাশয়' বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইয়া একখানি মাদুরের উপর উপবেশন করিতে অনুরোধ করে। ইহারা অতিশয় সরল, অভ্যাগতের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে না। প্রকৃতির শিশু প্রাকৃতিক দৃশ্যেই বিভোর।

তাহাদের ঘরের মেজেতে চাটাই বিছান থাকে। রান্না ঘর এবং শয়ন ঘর একই বলিয়া তাহাদের ঘর সকল অতি অপরিষ্কার এবং কাল ঝুলে আবৃত। তাহাদের ঘর প্রায় ৩০।৪০ হস্ত লম্বা। একদিকে শয়ন করে, এক

দিকে রান্না হয়, এক দিকে গরু বাছুর থাকে, এক দিকে আহারীয় সামগ্রী—ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি থাকে। দরজার নিকট ধান ভাঙ্গিবার যন্ত্র থাকে। উপরে তাহার একটী ছবি দিলাম।

তাহারা শুভ এবং অশুভ দিন মানে। তাহাদের বিশ্বাস অশুভ দিনে সন্তান জন্মিলে, সে সন্তান জনক জননীর ক্লেশের কারণ হয়। এই নিমিত্ত অশুভ দিনে কাহারও সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে জলে ডুবাইয়া দেয়। আর একটি প্রথাও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অশুভ দিনে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে গো-পালের সম্মুখে ফেলিয়া রাখা হয়। যদি কোন গো-বৎসই সন্তানকে পদদলিত না করে, তবে সন্তান সুলক্ষণযুক্ত বলিয়া আনন্দ সহকারে তাহাকে তাহারা গৃহে লইয়া যায়। যদি পদদলিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে জননী তাহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া একটী নূতন হাঁড়ীর মধ্যে করিয়া মৃত্তিকাপ্রোথিত করে। এই সকল অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কোন সন্তান জীবিত থাকিলে জন্মের দিন হইতে সপ্তম দিবসে তাহাকে ঘরের বাহির করা হয়। তাহার পর তাহাকে ধেনুপালের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। যদি পুত্র-সন্তান হয়, তবে পিতা বলে,—'তোমার বহু গরু হউক, প্রভূত ধন হউক, অনেক সন্তানসন্ততি হউক।' বালকের আকৃতি অনুসারে তাহাদের নামকরণ হয়। কাহারও মুখ চেপ্টা হইলে তদনুযায়ী একটা নাম রাখা হয়, চক্ষু বৃহৎ হইলে, কি মস্তক ছোট হইলে সেই প্রকারের একটা নাম রাখে।

জননী সন্তানকে কাপড় দ্বারা পৃষ্ঠের সহিত বন্ধন করিয়া বহন করিয়া লইয়া যায়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটী স্ত্রীলোক মস্তকে একটী প্রকাণ্ড জলকুম্ভ লইয়া পৃষ্ঠে ছয় সাত বৎসরের একটী সন্তান বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছে। সন্তানসন্ততি সর্ব্বপ্রথম তাহাদের জনকজননীর নিকট হইতে 'নিয়ে যা' কথাটি শিক্ষা করে। অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গে আমাকেও লইয়া যাও। সন্তানগণ প্রায়ই জননীর পশ্চাতে শয়ন করে। স্ত্রীলোকেরা ধান ভাঙ্গে, খাদ্য প্রস্তুত করে, সূতা কাটে, মাদুর, টুপি, ধামা কাঠা প্রভৃতি প্রস্তুত করে এবং সময় সময় চাষ আবাদেরও সাহায্য করে।

মাদাগাসকারবাসীরা নৃত্য করিতে অতিশয় ভাল বাসে। আমোদ প্রমোদে স্ত্রীপুরুষ সকলেই যোগদান করে কিন্তু একত্রে নৃত্য করে না। তাহাদের নৃত্যের সময় পা বেশী নড়ে না, হাতেরই সঞ্চালন অধিক হয়।

অনেক বৎসর হইতে মাদাগাসকার রমণী দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। যিনি যখন রাণী হন, তিনি সিংহাসন প্রাপ্তির পরই নিজের বাসের জন্য নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। প্রাসাদ একটী ছোট পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত হয়। সাধারণ লোকদিগের ঘরের ন্যায়ই রাজ-প্রাসাদ, তবে ইহা কিছু বৃহৎ।

পূর্ব্বকালে নানারূপ প্রতিমা পূজিত হইত। নিম্নে একটীর প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। উৎসব উপলক্ষে এই

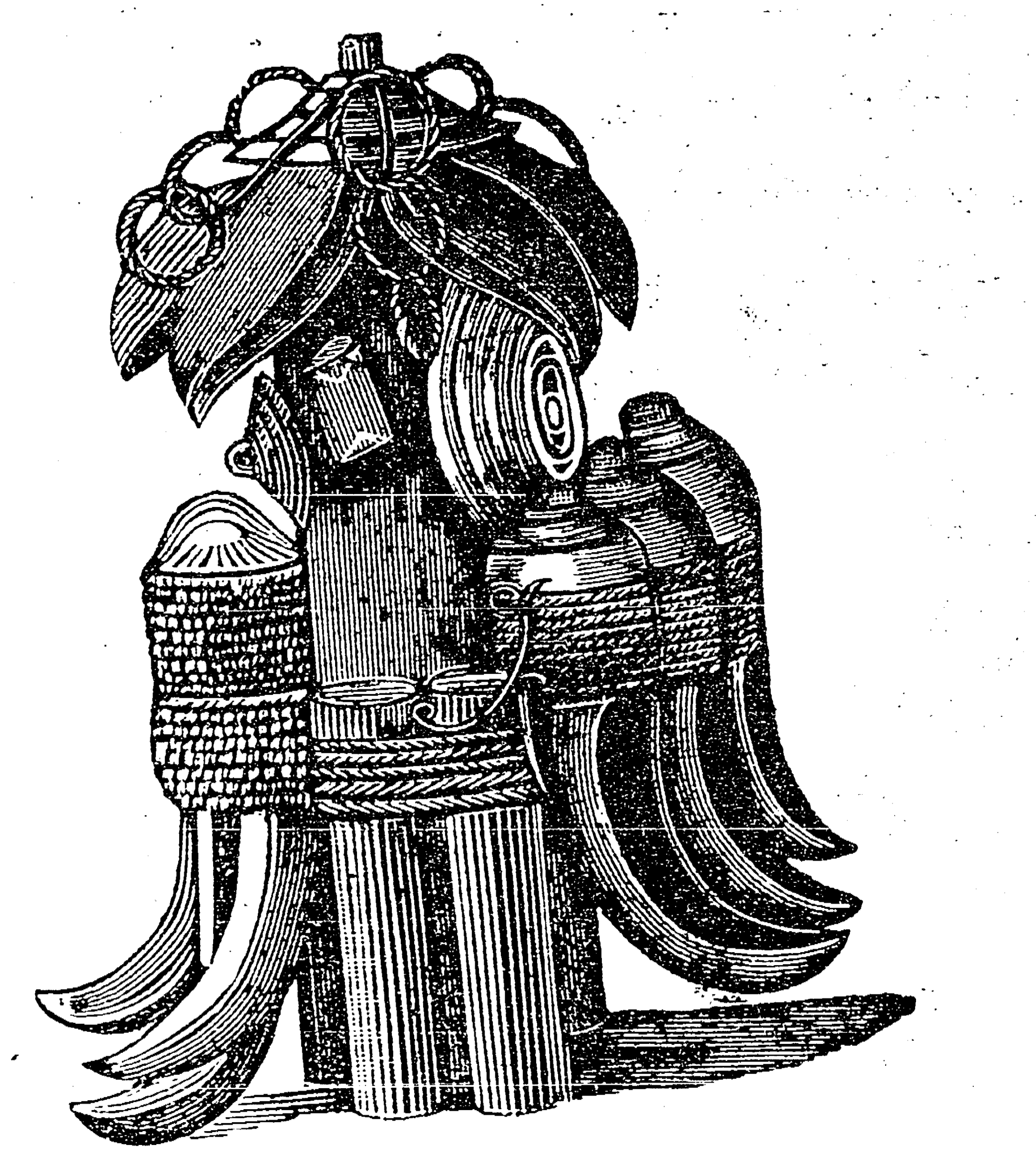

সকল মূর্ত্তি লোহিত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাজ পথে বাহির করা হয়। প্রতিমার পূর্ব্বে একদল প্রহরী পথের জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য দৌড়াইয়া যায়। এই সকল প্রতিমার প্রসন্নতার উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, তাহাদের এইরূপ ধারণা ও বিশ্বাস।

খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারকগণ কোন দেশেই ছাড়া নাই। সর্ব্বত্রই তাঁহারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে উপনীত হইয়াছেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এখানেও একদল ধর্ম্ম-প্রচারক প্রথম পদার্পণ করেন। তৎকালীন রাজা, তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক মহিষী রাণী হন। যে দিন তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন, সেই দিবস দুইটী প্রতিমা লোহিত বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনীত হয়। তিনি তাহার উপর করার্পণ করিয়া বলেন,—'আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করিয়াছি, আমাকে রক্ষা করিও।' খৃষ্ট যাজকগণের উপদেশামৃত পান করিয়া অনেক মাদাগাসকারবাসী উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। রাণী তাহাদিগের, কাহাকে বা কারাবদ্ধ করিয়া, কাহাকেও বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া, কাহাকেও বা জীবন্ত সমাধিস্থ করিয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া পাপের শাস্তি বিধান করেন। কিন্তু রাণীর কেবল মাত্র একটী সন্তান নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

তাঁহার পরবর্ত্তী রাণী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তিনি সমুদয় প্রতিমা দগ্ধ করিতে অনুজ্ঞা প্রচার করেন। এই আদেশ অনেকাংশে পালিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে তথায় ছোট বড় প্রায় একশতটী গির্জ্জা ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মের কি অতুল মহিমা!

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

নব বর্ষার প্রতি—

হিল্লোলে ভাসা'য়ে ধরা,
ধরিয়ে অপূর্ব্ব সাজ,
কোথা হ'তে এলে বল,
মোহিনী বরষা আজ!

জলদে ধরিয়ে হাতে,
বিজলীরে ল'য়ে কোলে,
দেখাতে মানবগণে,
এলে কি গো ধরাতলে?

উল্লাসে বেড়াও হেসে,
সুনীল দিগন্ত গায়,
সুন্দর সবুজ চেলি
বাতাসে উড়িয়া যায়!

শ্রী-অঙ্গে ঝরিছে মরি,
কত না মাধুরীরাশি,
তরল জ্যোছনা যেন,
অধরে উছলে হাসি!

গগনে গরজে মৃদু,
জলদ প্রফুল্ল মনে,
আনন্দ বিহ্বলা, মরি,
বসুধা, প্রকৃতি সনে!

ঝম্, ঝম্, টুপ্, টাপ্—
ইহাই শুনি'ছি শুধু,
পুলকে পূরিছে মন,
শ্রবণে বর্ষিছে মধু!

নিঝরতটিনী-কণ্ঠে
ঝরিছে মধুর গান,
আকুলা কল্পনা মম,
মোহিত বিবশ প্রাণ!

অঞ্চলে কেতকী ছটা,
কুন্তলে কদম্বমালা,—
কিবা সাজে সাজিয়াছে,
আ' মরি, বরষা বালা!

(তব) রূপের মাধুরী হেরি,
হৃদয় মোহিছে সুখে,
চাহিছে এ ক্ষুদ্র প্রাণ
মিশিতে তোমার বুকে।

জগৎ কারণ যিনি,—
এলে কি আদেশে তাঁর,
জুড়াইতে দগ্ধ মহী,
ঢালিয়া সুধার ধার?

তবে, ঢাল, ঢাল স্নেহ-সুধা,
জুড়াক্ তাপিত প্রাণী—
স্নিগ্ধ হোক্, নিদাঘের
মরুতপ্ত ধরাখানি।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা।

বঙ্গের খনিজ ঐশ্বর্য্য।

আহমদাবাদের শিল্পপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে বরোদাধিপতি শ্রীসয়াজি রাও গায়কবাড় যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন যে, জাতীয় ধনবৃদ্ধি না হইলে আমরা কোন দিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত বড় হইতে পারিব না। দেশীয় কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি ভিন্ন যে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে না চিন্তাশীল রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারকদের এই নির্ব্বিরোধ মতের উল্লেখ করিয়া যাহাতে দেশে উদ্যমশীলতা (Spirit of enterprise) বিকশিত হয়; যাহাতে সেই উদ্যমশীলতা বিকশিত হইবার পথের বাধা বিঘ্ন স্বরূপ হিন্দুধর্ম্মের অনঙ্গীভূত শতবিধ বদ্ধমূল, কণ্টকাকীর্ণ, কুসংস্কার ও লোকাচার বিনষ্ট হয়; যাহাতে আমাদের জাতি-প্রথা (caste system) তাহার বর্ত্তমান বোধাগম্য বিরুদ্ধমতাকীর্ণ ক্ষণভঙ্গুরতা হারাইয়া কিয়ৎ-পরিমাণে আঘাতসহনশীল হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেষ্টা করিতে প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীকে উপদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রচলিত জাতি-প্রথা যে বিরুদ্ধ মতের আকর, তাহা যে আমাদের উদ্যমশীলতা বিকাশের বিরোধী, তাহার সংহার না হউক সংস্কার যে একান্ত বাঞ্ছিত তদ্বিষয়ে বোধ হয় শিক্ষিতদিগের মধ্যে কোনরূপ অনৈক্যই থাকিতে পারে না। কিন্তু শত দোষদুষ্ট জাতি-প্রথাই আমাদের জাতীয় উদ্যমহীনতার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয় না। হইতে পারে জাতি-প্রথাতেও উদ্যম-হীনতার সূত্রপাত; কিন্তু মুমুক্ষু ও সংসারীর ধর্ম্মের সংমিশ্রণে যে খিঁচুড়ী-ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং যাহা এক্ষণে ভারতের সর্ব্বত্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের প্রত্যেক হৃদয়ে, সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রত্যেক স্তরে, অল্পাধিক পরিমাণে সহজসংস্কাররূপে (intuition) বিরাজিত তাহাও যে কিয়ৎ পরিমাণে ইহার মূলে নাই তাহাই বা কি প্রকারে বলা যায়? জাতি-প্রথাই আমাদের উদ্যমহীনতার একমাত্র কারণ হইলে যে দেশে উইল্‌সনের হোটেলে মনু-নিষিদ্ধ মাংসে উদর পূরণ করিয়াও সমাজে জোর করিয়া কুল-মর্য্যাদা আদায় করা যায়, সেই দেশেই, সেই ঘরের কোণেই যে শত বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে; তাহারই বা আমরা কি করিতেছি? গৃহকোণের কর্ত্তব্যই প্রথমে সম্পাদন করিতে হয়—"Think not of far off duties—But of duties which are near." সে সম্বন্ধে আমরা কি করিয়াছি এবং কি করিতে পারি তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচনার বিষয়।

ভারতবর্ষের খনিসমূহের প্রধান পরিদর্শক ১৯০১ সনের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, খনিজ ঐশ্বর্য্যে বঙ্গদেশ ভারতের প্রায় অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ। কোন্ প্রদেশে কোন্ কোন্ খনিজ পাওয়া যায় তাহার এইরূপ হিসাব দেওয়া হইয়াছে:—

নম্বর	খনিজ পদার্থ	প্রদেশ	ক্ষেত্রের নাম।
১	পাথুরিয়া কয়লা	আসাম	মাকুম।
২	"	ব্রহ্মদেশ	থিনগাড়ৌ।
৩	"	বঙ্গদেশ	রাণীগঞ্জ।
৪	"	"	ঝেরিয়া।
৫	"	"	গিরিডি।
৬	"	"	দালটনগঞ্জ।
৭	"	মধ্য ভারতবর্ষ	উমারিয়া।
৮	"	মধ্য প্রদেশ	মোপানি।
৯	"	"	ওয়ারোরা।
১০	"	হাইদ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য প্রদেশ)	সিঙ্গারেণী।
১১	"	রাজপুতনা	বিকানির।
১২	"	বেলুচিস্থান	খোস্ত।
১৩	"	পঞ্জাব	ডেনডট।
১৪	কোরাণ্ডাম	মান্দ্রাজ	নামাথাল।
১৫	স্বর্ণ	ব্রহ্মদেশ	উহ্‌স্।
১৬	"	বঙ্গদেশ	ছোটনাগপুর।
১৭	"	হাইদ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য প্রদেশ)	লিঙ্গাসুরগড়।
১৮	"	মহীশুর	কোলার।
১৯	"	মান্দ্রাজ	ওয়াইনাড।
২০	গ্রেফাইট	"	নামাকল।
২১	"	ট্র্যাভাঙ্কোর	——

নম্বর	খনিজ পদার্থ	প্রদেশ	ক্ষেত্রের নাম।
২২	লৌহ	বঙ্গদেশ	বরাকর।
২৩	„	„	কালীমাটি।
২৪	ম্যাগ্‌নেসাইট	মান্দ্রাজ	সালেম।
২৫	ম্যাঙ্গানিজ	„	ভিজগাপট্টনম্।
২৬	অভ্র	বঙ্গদেশ	হাজারিবাগ।
২৭	„	মান্দ্রাজ	নালোর।
২৮	পেট্রোলিয়াম	আসাম	———
২৯	„	উত্তর ব্রহ্মদেশ	ইয়ানানগিয়াং।
৩০	রুবি	„	মোগক।
৩১	লবণ	পঞ্জাব	ঝিলাম।
৩২	শ্লেট	বঙ্গদেশ	মুঙ্গের।
৩৩	„	পঞ্জাব	কাঙ্গরা।
৩৪	„	„	রেওয়ারী।
৩৫	টিন	ব্রহ্মদেশ	মারগুই।

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় ভারতবর্ষের খনিজ পদার্থের মধ্যে পাথুরিয়া কয়লা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র প্রভৃতিই প্রধান আর ইহার অনেকগুলিই যথেষ্ট পরিমাণে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান। নিম্নে যে হিসাব প্রদত্ত হইল তাহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন বঙ্গের খনিজ ঐশ্বর্য্য কিরূপ।

কয়লা।

১৯০১ সনে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও বেলুচিস্থানে ৩১৫টি কয়লার খনি ছিল তাহার মধ্যে ২৯২টি এক বঙ্গদেশে বাকি ২৩টি খনির মধ্যে ৫টি আসামে, ৭টি বেলুচিস্থানে, ১টি ব্রহ্মদেশে, ৮টি মধ্যপ্রদেশে এবং ২টি পঞ্জাবে। ঐ বৎসরে সর্ব্ব সমেত ৬৮,৪৯,২৪৯ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বঙ্গদেশে ৫,৭০৩,৮৭৬ টন বাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে; অর্থাৎ এক বঙ্গদেশ হইতেই সমস্ত কয়লার ৯/১০ অংশ উত্তোলিত হইয়াছে।

লৌহ।

১৯০১ সনে ৫৭,৮০০ টন লৌহ-প্রস্তর উত্তোলিত হইয়াছে; ইহার অধিকাংশই বঙ্গদেশের রাণীগঞ্জ ও পশ্বি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

স্বর্ণ।

স্বর্ণের খনি বঙ্গদেশে নূতন। ১৯০১ সনে পাহাড়দি কোম্পানি ছোটনাগপুরে স্বর্ণখনি আরম্ভ করিয়াছেন।

অভ্র।

১৯০১ সনে ভারতবর্ষে ৯৯৫ ৩/৪ টন অভ্র উত্তোলন করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশে ৭৬৮ টন।

শ্লেট।

৪০০২ টন শ্লেট ১৯০১ সনে উত্তোলিত হয় তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে ১২৩৭ টন!

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় বঙ্গদেশ খনিজ ঐশ্বর্য্যে কিরূপ ঐশ্বর্য্যবান। ইহা দেখিয়া প্রাণে কেমন একটা ক্ষীণ আশার আলোক দেখা দেয়; মনে হয়, আমাদের মাতৃভূমি যখন "সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা," আর তাহার উপর এত রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন তখন আমাদের এ হীনতা, দীনতা অচিরেই ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু যখন হিসাবটির অন্য দিক দেখি তখন সে আশার আলোক নিবিয়া যায়, মর্ম্মের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া একটী কাতর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশে মিশাইয়া যায়। দেখুন পাঠক হিসাবের অন্য দিক :—

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯০১ সনে ইংরেজ-পরিচালিত কয়লার খনিতে ৪২৫২০৯৩ টন কয়লা এবং দেশীয় লোকপরিচালিত খনিতে ১৪৫১৭৮৩ টন কয়লা উঠিয়াছে।

ইহার মধ্যে বেঙ্গল কোল কোম্পানি ও ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের কয়লার খনি হইতে সমস্ত উৎপন্নের প্রায় এক পঞ্চমাংশ কয়লা উঠিয়াছে।

অভ্র সম্বন্ধে কি বলিতেছেন শুনুন :—The mica bearing belt in Hazaribagh occupies a large area, which belongs largely to native zemindars. Government own the forest of Koderma. * *. The bulk of the private land has been leased to Messrs. F. F. Chrestien & Co. তাহার পর দেখুন :—The returns show an output of 768 tons for the year 1901; 628 tons were raised by one company.

এই 'one company' মানে ক্রেষ্টীন কোম্পানি।

ইহা দেখিয়া কি কোন আশা থাকে? যে দেশের বাণিজ্য পরদেশীয় মূলধনে পরিচালিত হয় সে দেশের উন্নতির আশা কি সুদূরপরাহত নহে? আমরা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া রাজদ্বারে ভিখারীর বেশে দাঁড়াইতে শিখিয়াছি; কিন্তু ভিখারীর ভাগ্যে অনেক সময়ে মুষ্টি লাভই হইয়া থাকে; আর এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে ত্রস্তপক্ষ দয়া করুণা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে,—সকলেই আপনা লইয়া ব্যস্ত কে কাহাকে ভিক্ষা দেয়? পরদেশীয় মূলধনের অবাধ স্রোত যতদিন না প্রতিহত হয় তত দিন আমাদের দেশের মঙ্গল নাই। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ভারতে বিলাতী মূলধন প্রবাহের পক্ষপাতী; লর্ড কর্জ্জন ত সেদিন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বিলাতী মূলধন এদেশে যত অধিক পরিমাণে আমদানি হয় এদেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। তবেই গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন সাহায্যের আশা নাই;—আর এই অবাধ বাণিজ্যের দিনে গবর্ণমেণ্টই বা কি সাহায্য করিতে পারেন? এখন আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল আমাদের দেশের জমিদারগণ। তাঁহারা যদি যথেষ্ট মূলধন নিয়োজিত করিয়া এই সকল খনির কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে ধীরে ধীরে বিদেশী মহাজনদিগকে হটিয়া যাইতে হইবে, কারণ শতবিধ সুবিধা তাঁহাদের দিকে :—জমি তাঁহাদের, শ্রমজীবিগণ তাঁহাদের প্রজা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ মূলধনের অভাবে এ সকল বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; কেহ কেহ অতি সাহসে বুক বাঁধিয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইলেও অল্প মূলধন বশতঃ বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন না। জমিদারগণ এই সকল কার্য্যে ব্রতী না হইয়া এক মহৎ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেছেন; জগদীশ্বর এই পতিত দেশের মঙ্গল কারণে তাঁহাদিগকে যে ক্ষমতা ও সুযোগ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা সে সকলের অপব্যবহার করিতেছেন। তাহা না হইলে অভ্র রিপোর্টে—which belongs largely to native zemindars পড়িয়াই The bulk of the private land has been leased to Messrs. F. F. Chrestian & Co. পড়িতে হইত না। অভ্রের জমি belongs largely to native zemindars, কিন্তু কয়লার জমি বোধ হয় belongs wholly to native zemindars, কিন্তু কয় জন দেশীয় জমিদার খনি-কার্য্যে মূলধন নিয়োজিত করিয়াছেন? সত্য বটে ছোটনাগপুর ও মানভূমের জমিদারদিগের এলাকাতেই কয়লা, অভ্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থ রহিয়াছে এবং ঐ সকল জমিদারগণের মধ্যে অনেকেরই আর্থিক ও মানসিক অবস্থা বড় উজ্জ্বল নহে,—অনেকেই ঋণগ্রস্ত এবং বিশেষ শিক্ষিত নহেন; আর সেই কারণেই তাঁহারা এই সকল অর্থ ও শিক্ষাসাপেক্ষ খনির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা অর্থ ও শ্রমসাপেক্ষ সর্ব্ববিধ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের কোষাগার পূর্ণ, যাঁহাদের বক্তৃতায় ও উপাধিলাভমূল চাঁদাস্বাক্ষরে উদ্যমশীলতা পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠে, বঙ্গের সেই সকল জমিদারগণের এই ঋণগ্রস্ত সুশিক্ষাবিহীন ভ্রাতৃগণের প্রতি কি কোন কর্ত্তব্য নাই? তাঁহারা যদি ইঁহাদের জমিতে মূলধন নিয়োগ করিয়া ব্যবসায়ে মনযোগ করেন তাহা হইলে তাঁহারাও লাভবান হইতে পারেন এবং ইঁহাদেরও ঋণভার অনেক লঘু হয়। ধনবৃদ্ধি করিতে হইলেই মূলধনের আবশ্যক। আমাদের দেশে যাহা কিছু মূলধন আছে তাহার অধিকাংশই জমিদারগণের নিকটে। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য কিছুতেই উন্নত হইবে না, রাজদ্বারে না দাঁড়াইয়া আমাদের দেশের শিক্ষিতগণ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া জমিদারগণের দ্বারে দাঁড়াইলে বোধ হয় অধিক ফললাভ হয়। বড়ই সুখের বিষয় যে মাননীয় মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কয়লা-খাদ অধিকারীদিগের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিয়া প্রাণে আশার স্রোত প্রবাহিত হয়। যখন অনেক রাজা মহারাজাকেই এই সকল ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেখিব তখন দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির অধিক বিলম্ব থাকিবে না, জননী জন্মভূমি সৃষ্টির প্রথম হইতে যে সকল অমূল্য রত্ন সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছেন তাহাও তখন ন্যায্য দায়াদগণের হস্তে পতিত হইবে।*

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা।

---

*অভ্র খনিতে এখনও যথেষ্ট সুবিধা আছে। এ সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছুক হইলে প্রদীপ-সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলেই জানিতে পারিবেন।

সপত্নী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর রত্নেশ্বর বাবু অন্তঃপুর মধ্যে আপনার শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। নিকটে প্রৌঢ়-বয়স্কা সুন্দরীশিরোমণি হেমলতা-জননী স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্টা। নিকটে কোন দাসী নাই। ঘর সুসজ্জিত এবং তাহার মধ্যস্থলে এক মনোহর আলোক বিলম্বিত। রত্নেশ্বর বাবু একখানি ইজি চেয়ারে পড়িয়া আপনার গুণবতী পত্নীর প্রতি চাহিয়া ছিলেন। এই রূপসী নারীকে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন কিন্তু হেমলতার প্রতি তাঁহার স্নেহ যেরূপ অমেয়, হেমলতার কথায় তিনি যেমন মরিতে বাঁচিতে পারেন, হেমলতার সন্তোষের নিমিত্ত তিনি যেমন অসাধ্য কর্ম্ম সাধনেও প্রস্তুত এবং হেমলতার আবদার রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, তেমন ভাব নিজের সম্বন্ধে, পত্নী বা জামাতা এ জগতে কাহারও জন্য তাঁহার হয় না। পত্নীকে তিনি বড়ই ভালবাসেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সহিত রত্নেশ্বর বাবুর মনান্তর ও মতান্তর সর্ব্বদাই ঘটে। পত্নীর কোন কার্য্যে দোষ দেখিলে তিনি বিরক্ত হন এবং কোন কোন স্থলে তাঁহাকে দুই একটা শক্ত কথাও শুনাইয়া দেন, পত্নী কোন প্রার্থনা করিলে রত্নেশ্বর তাহার বৈধতা বিচার করেন এবং অবৈধ বলিয়া মনে হইলে কর্কশভাবে প্রতিবাদ করেন; পত্নী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেই সাহস পান না। হেমলতার সম্বন্ধে এ সকল ব্যবস্থা নাই। তাঁহার সকল কার্য্যই ভাল। যে কার্য্য স্পষ্টতঃ গর্হিত, হেমলতা একটু মুখ ভার করিলে বা একটু নয়নের জল ফেলিলে তাহাও সাধুসম্মত সৎকার্য্য বলিয়া রত্নেশ্বর অনুমোদন করেন। রত্নেশ্বর বাবুর একমাত্র দুহিতা হেমলতা আজীবন অশেষ সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার একান্ত আয়ত্তাধীন। রত্নেশ্বর বাবুর প্রতাপে বাঘে বখরিতে এক ঘাটে জল খায়। তাঁহার ভয়ে পত্নী হইতে দূর জমিদারীর সামান্য প্রজাটী পর্য্যন্ত কম্পিত। কিন্তু সেই রত্নেশ্বরও হেমলতার নিকট একান্ত বাধ্য; এই স্থানে তাঁহার শাসন ও ক্ষমতা সকলই উড়িয়া যায়। হেমলতা চিরদিন অশেষ আদরে লালিত পালিত। মাতার অসীম স্নেহ, পিতার অমেয় আদর। কন্যা কেবলই আদর, সুখ, অব্যাঘাতে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলে তাঁহার বাসনার স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। হেমলতা বুঝিয়াছেন স্বামী তাঁহার একটা খেলনা জিনিষ। বিবিধ সামগ্রীই তাঁহার বিনোদনের জন্য পিতা সংগ্রহ করিয়া দেন। সেইরূপ প্রয়োজনে যথাসময়ে একটা স্বামীও সংগ্রহ কয়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাকাতুয়া আছে, ময়না আছে, হরিণ আছে, তেমনই নরেশ বাবুও আছেন। সুতরাং তিনি বিশ্বাস করেন, নরেশকে নিয়ত তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিতে হইবে এবং তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া চলিতে হইবে।

জননী বড়ই কোমলস্বভাবা। তিনি কখনই কন্যার এ ভাব ভালবাসেন না। কন্যাকে অন্তরালে অনেক হিত-কথা বলেন। বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। কন্যার বিশ্বাস জননী কিছুই বুঝেন না, কিছুই জানেন না, তাঁহার তেজ নাই, সাহস নাই। গৃহিণী কতদিন, কত সুযোগে কর্ত্তার নিকটও কন্যার সম্বন্ধে নানা কথা বলেন; কন্যাকে এরূপ প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে অতিশয় অনিষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কিন্তু কর্ত্তা সে সকল কথা কাণে ঠাঁই দেন না। তিনি গৃহিণীকে বুদ্ধিহীনা বলিয়া অথবা একটু রূঢ় কথা বলিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিয়া দেন। তথাপি সুযোগ পাইলে গৃহিণী মনের আশঙ্কায় কন্যাকে বা কর্ত্তাকে জানাইতে বিরত হন না।

অন্ততঃ দুই একটা কথা কর্ত্তার নিকট নিবেদন করিবার নিমিত্ত কর্ত্তার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। সুযোগ উপস্থিত হইল। কর্ত্তা ইজিচেয়ারে বসিয়া গৃহিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি কি খাও, কোন্ জলে স্নান কর, আমাকে বলিবে কি?"

গৃহিণী বলিলেন,—"কেন বল দেখি?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"তোমার রূপযৌবন বয়সে না কমিয়া ক্রমেই বাড়িয়া আসিতেছে কেন?"

গৃহিণী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আপনাকে আপনি দেখিতে পাওনা বুঝি? তোমার চক্ষু দুইটাকে জিজ্ঞাসা কর।"

তখন কর্ত্তা বলিলেন,—"এখানে কোন দাসী নাই; আমার গুড়গুড়ির নলটা পড়িয়া গিয়াছে—দয়া করিয়া তুলিয়া দিবে কি?"

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গুড়গুড়ির নল তুলিয়া লইলেন এবং কর্ত্তার হাতের নিকট ধরিয়া বলিলেন,—"যে দাসী জীবনে মরণে চরণে বিকাইয়া আছে, তাহার কাজ কি আর পছন্দ হয় না, তাই অন্য দাসীর খোঁজ করিতেছ?"

কর্ত্তা নল না ধরিয়া নল-ধারিণী সুন্দরীর মৃণালবিনিন্দিত ভুজলতা ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন। গৃহিণী একটু নত হইয়া পড়িলে কর্ত্তা তাঁহার বাম বাহুর দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিলেন। তাহার পর সেই শোভাময়ী কামিনীর বদনকমল বার বার চুম্বন করিয়া, আপনার বাহুপাশ হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন,—"নল লও, তামাক খাইবে না?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"না। যাহা খাইয়া কখনই ক্ষুধা মিটে না, তাহাই খাইলাম। তামাকে প্রয়োজন নাই।"

প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার এই প্রেমোল্লাস অসঙ্গত ও বিরক্তিকর মনে করিয়া অনেকে বলিতে পারেন, যাহাদের এত বড় যুবতী কন্যা, তাহাদের এরূপ রঙ্গরস সাজে কি গা? তাহারা এরূপ ব্যবহার করেই বা কেন, আর যে লিখিতে বসিয়াছে, সে এ সকল কথা লিখেই বা কেন? কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, যাঁহারা এইরূপ নিন্দাবাদ করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই যুবক-যুবতী। যাঁহারা যৌবনের মত্ততা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়দশায় পড়িয়াছেন, তাঁহারাও যুবক-যুবতীর কথায় সায় দিবেন কি? তাঁহারা ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন, যদি প্রণয়লীলার পুষ্টতা, সর্বাঙ্গীনতা, পূর্ণতা ও সজীবতা দেখিতে চাহ, একটু পরিণত বয়স্ক প্রণয়ীদের কাছেই তাহা দেখিতে পাইবে। ছোঁড়া ছুঁড়িরা প্রণয়ের জানেই বা কি, আর বুঝেই বা কি? আমরা পিঠে কুলা বাঁধিয়া এই শেষোক্ত মহাশয়দিগের রায়ে রায় দিতেছি।

গৃহিণী আবার পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া বসিলেন এবং একটু হাসি মিশাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"একটা কথা বলিব, একটু সুবিচার করিবে কি?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কবে তোমার কথার সুবিচার হয় না? কি বলিবে বল!"

গৃহিণী বলিলেন,—"নরেশ জামাই—পুত্রের অপেক্ষাও আদরের ধন। তাহাকে এমন করিয়া আটকাইয়া রাখা ভাল হইতেছে কি?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"সে যে ছাড়া পাইলে হয়তো আবার সে স্ত্রীর সহিত দেখা করিবে। তাহাতে হেমলতা অসুখী হয়। কি করি বল?"

গৃহিণী বলিলেন,—"যদিই কখন কখন সে স্ত্রীর সহিত দেখা করে, তাহাতে ক্ষতিই বা কি? সেও তো বিবাহিতা স্ত্রী, তাহাকে বঞ্চিত করিলে অধর্ম্ম হইবে না কি?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কেন অধর্ম্ম হইবে? আমরা তো সর্ত্ত করিয়া মেয়ে দিয়াছি। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সেই সময়ে হওয়া উচিত ছিল। এখন সে কথা অনাবশ্যক।"

গৃহিণী দেখিলেন, সেই পুরাণ সুর। যখন এ কথা উঠিয়াছে, তখনই রত্নেশ্বর বাবু এইরূপ উত্তর দিয়া আসিতেছেন। এ কথায় আর কোন ফল হইবে না বুঝিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"নরেশের শরীর বড় খারাপ হইতেছে। নিয়ত এক স্থানে আবদ্ধ থাকায় ক্ষুধা কমিয়া গিয়াছে, দেহও দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়িতেছে।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, সে সন্তুষ্ট নাই। যে ব্যক্তি পথের ভিখারীর পুত্র হইয়াও এত সুখসৌভাগ্য ভোগ করিতেছে, সে যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে বড় নিমকহারাম। আরও বুঝিতে হইবে যে, সে হেমলতাকে মোটেই ভালবাসে না। যদি ভালবাসা থাকিত তাহা হইলে নিয়ত তাহার সঙ্গে থাকিয়া সে নিশ্চয়ই পরম সুখী হইত। চৌদ্দ পুরুষ তপস্যা করিয়া যে বালিকার দাসত্ব করিতে পাইলে চরিতার্থ হইত, তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া যদি সে সন্তুষ্ট না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ নরাধম এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ভাল, আমি তাহার সহিত কথা কহিয়া এ বিষয়ের যথোচিত ব্যবস্থা করিব।"

গৃহিণী একটু অভিমানের স্বরে বলিলেন,—"তোমাকে যাহা বলিতে যাইব, তুমি তাহারই উল্টা করিবে। তবে আর কথায় কি কাজ?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কেন উল্টা করিব? তুমি সোজা কথা বুঝ না সে দোষ কি আমার?"

গৃহিণী বলিলেন,—"তোমার মেয়েকে নরেশ যদি না ভাল বাসে, সে দোষ তোমার মেয়ের না নরেশের? স্বামী দরিদ্রই হউক, আর নির্গুণই হউক স্ত্রী তাহার মন যোগাইয়া চলিতে বাধ্য। তোমার হেমলতা যদি নরেশকে ঘৃণা করে, তাহাকে মন্দ কথা বলে, তাহা হইলে সে ভাল বাসিতে পারে কি?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"সত্য বটে, হেমলতা একটু রাগী কাহারও মন যোগাইয়া সে চলিতে জানে না। নরেশের এ কথা বুঝিয়া চলা উচিত। নরেশ যদি পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত সুযোগ পাইলে দেখা করে, তাহা হইলে হেমলতা অবশ্যই তাহার সহিত কর্কশ ব্যবহার করিবে।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তুমি যাহাই ভাব, আমি জানি হেমলতারই অন্যায়। তোমাকে আমি আর কি বলিব? আমার কথার কিছু হয় না। তুমি হেমলতাকে একটু বুঝাইয়া দিও। আর জামাইকে একটাও অনাদরের কথা বলিও না। পরের ছেলে—কেবল মিষ্ট ব্যবহারেই বশ করিতে হয়।"

রত্নেশ্বর একটু বিরক্তভাবে বলিলেন,—"কি জ্বালা! কে তাহার সহিত তিক্ত ব্যবহার করে। সে আমার কথা না শুনিয়া আপনি গোল ঘটায়, আমি তাহার কি করিব? তা ভাল, আমি নরেশের সহিত কথা কহিয়া হেমলতাকে কিছু বলা যদি আবশ্যক বলিয়া বুঝি তাহাই বলিব। কেমন, তোমার মনের মত হইল তো? আর কি বলিবে?"

গৃহিণী বলিলেন,—"আর একটা কথা। লবঙ্গকে আর রাখা হইবে না।"

কর্ত্তা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কেন?"

গৃহিণী বলিলেন,—"লবঙ্গ নিয়ত হেমলতাকে কুমন্ত্রণা দেয়। ভাল হউক, মন্দ হউক সকল কাজেই সে উৎসাহ দেয়। আমি বেশ বুঝিয়াছি এই লবঙ্গের জন্য শেষে হেমলতাকে লইয়া আমাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি খুব ভুল বুঝিয়াছ। লবঙ্গ বুদ্ধিমতী। সে হেমলতাকে প্রাণের মত ভাল বাসে। যাহাতে হেমলতার ভাল হয়, ইহাই তাহার এক মাত্র চিন্তা। লবঙ্গ সঙ্গে না থাকিলে হেমলতা কষ্ট পাইবে। আমি কোনমতেই তাহাকে হেমলতার সঙ্গ-ছাড়া করিব না।"

গৃহিণী হতাশভাবে বলিলেন,—"তবে আর আমি কি বলিব? কিন্তু কাঙালের কথা বাসি হইলে মিষ্ট লাগে। দেখিও তুমি—পরিণামে এ জন্য কষ্ট পাইতে হইবে।"

এই সময়ে দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল,—"মা!"

গৃহিণী ব্যস্তভাবে উঠিয়া বলিলেন,—"কে হেমু? আইস, মা আইস!"

তখন বিষণ্ণবদনা হেমলতা ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রত্নেশ্বর বাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"একি মা, মুখ ভার কেন? কি হইয়াছে বল!"

তখন হেমলতা সংক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন,—"আমাকে অতিশয় অপমান করিয়াছে।"

কর্ত্তা ব্যাকুলভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে? নরেশ তোমার অপমান করিয়াছে?"

হেমলতা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "পাগলা মেয়ে! স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া বিবাদ হইলে, এমনই করিয়া বাপ মার কাছে জানাইতে হয় বুঝি? যাহা হইয়াছে এক সময়ে আমার কাছে বলিও। আমি যাহা ভাল হয় করিব।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কি হইয়াছে বল মা, আমি এখনই তাহার প্রতিকার করিব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"ছি ছি! তুমি কি বলিতেছ? মেয়ে জামাইয়ে ঝগড়া হইয়াছে, তাহার তুমি কি বুঝিবে? আর তাহার প্রতিবিধানই বা কি করিবে?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"অবশ্য একটা গুরুতর কাণ্ড হইয়াছে, নহিলে হেমলতা কখনই বলিতে আসিত না। কি হইয়াছে বল মা!"

গৃহিণী বলিলেন,—"না এখন বলিয়া কাজ নাই। ছি! এরূপ করিলে মেয়ে শেষে বেজায় বেহায়া হইয়া

পড়িবে। তোমার কোন কথা শুনিয়া কাজ নাই! আমি সব শুনিয়া তোমাকে জানাইব। আইস হেমলতা, ও ঘরে বসিয়া আমাকে সব কথা বলিবে চল।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"বল হেমলতা, কি হইয়াছে?"

গৃহিণী হাত ধরিয়া হেমলতাকে অপর ঘরে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হেমলতা যাইতে যাইতে বলিলেন,—"বলিয়াছে তোমার পিতা আমাকে কন্যা দান করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে।"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন,—"হাঁ বলিয়াছে! তুই কি শুনিতে কি শুনিয়াছিস্। সে এমন ছেলে নয়। আয় এখন।"

কর্ত্তা ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বটে! আর কি বলিয়াছে?"

হেমলতা বলিলেন,—"আর বলিয়াছে, আমাকে আর গ্রহণ করিবে না।"

গৃহিণী দেখিলেন! সর্ব্বনাশ যত দূর হইবার হইয়া গেল। কর্ত্তা তখন কম্পিতকলেবর হইয়া বাহিরে যাইবার জন্য দ্বার সমীপে আসিলেন। গৃহিণী ব্যস্ততা সহ আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন,—"যাও কোথা?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"সেই ছোট লোক বেটাকে বিধিমতে শাস্তি দিয়া আমি শান্ত হইব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"বেশ তো। আগে কি করা উচিত তাহা স্থির কর; তাহার পর যাহা হয় করিও।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"স্থির আবার কি করিব? সে চরিতার্থ হয় নাই? তাহার বাহান্ন পুরুষ চরিতার্থ হয় নাই? আমি তাহাকে কন্যা দিয়া চরিতার্থ হইয়াছি! কি স্পর্দ্ধা! আমার কন্যাকে সে গ্রহণ করিবে না; তাহাকে গ্রহণ করে কে, তাহার ঠিক নাই। সে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিবে না! তাহাকে দ্বারবান দিয়া জুতা খাওয়াইব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"যাহা হয় কালি প্রাতে করিও। এই রাত্রিতে একটা গণ্ডগোল ভাল নহে। লোকজন কি মনে করিবে?"

জোর করিয়া হাত ধরিয়া কর্ত্তাকে পুনরায় ইজিচেয়ারে বসাইয়া এবং একজন দাসীকে তামাক আনাইবার আদেশ দিয়া গৃহিণী বলিলেন,—"তুমি সকল দিক বিচার করিয়া কাজ করিও। তোমার মেয়ের যে বড় তেজ তাহা যে তুমি ভুলিয়া যাও।"

হেমলতা বলিলেন,—"আমার আবার কি তেজ? সে আমাকে যাহা খুসি বলিলেও বুঝি আমি কথা কহিব না?"

গৃহিণী বলিলেন,—"না। স্ত্রীলোকের চুপ করিয়া থাকাই ধর্ম্ম।"

হেমলতা বলিলেন,—"তুমি যদি আমার মত বড় জমিদারের মেয়ে হইতে, তাহা হইলে সব বুঝিতে পারিতে। তুমি সামান্য লোকের মেয়ে—এ তেজের মর্য্যাদা তুমি বুঝিবে কিরূপে?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"ঠিক কথা।"

গৃহিণী অতি কাতরভাবে বলিলেন,—"তুমিও মেয়ের কথায় সায় দিলে? মেয়ে আমার পিতার কথা তুলিয়া গালি দিল—তুমিও তাহাতে যোগ দিলে? কি আর বলিব? আমার পোড়া কপাল!"

গৃহিণীর অঞ্চলবস্ত্র শীঘ্রই তাঁহার নয়নে উঠিতে চাহিল। তিনি পতনোন্মুখ অশ্রুধারা বস্ত্রঘর্ষণে অপসারিত করিলেন। কর্ত্তাও যেন একটু লজ্জিত হইলেন। বলিলেন,—"কালি প্রাতেই যাহা হয় করিব।"

রাত্রিটা গোলমালে ভাবনাচিন্তায় কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে কর্ত্তা বাহিরে গিয়াই প্রথমে নরেশের সন্ধান করিলেন। নরেশ কোথায়ও নাই! অন্দরে নাই, বাহিরে নাই, বৈঠক খানায় নাই, বাগানে নাই। কোথায় তিনি! দ্বারবান্ জানে না, জমাদার জানে না, হেমলতা জানেন না গৃহিণী জানেন না। কোন বিপদ ঘটিল কি? না। অনেক সন্ধানের পর একজন প্রতিবাসী বলিল, সে শেষরাত্রিতে জামাইবাবুকে ষ্টেশনের দিকে যাইতে দেখিয়াছে। অতএব স্থির হইল, নরেশচন্দ্র এ সোণার পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

রত্নেশ্বর বাবু অনেক চিন্তা করিলেন। যেমন করিয়া হউক এ পক্ষীকে পুনরায় ধরিতে হইবে। কলিকাতায় সন্ধান করাই আবশ্যক। কলিকাতায় আরও কাজ আছে। সপরিবারে কলিকাতা গমনই ধার্য্য হইল।

রত্নেশ্বর বাবুর কলিকাতা গমনের ধূম পড়িয়া গেল। দাস-দাসী, সিপাহী বরকন্দাজ সকলেই জিনিষ গুছাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হেমলতা ও লবঙ্গ বড় আনন্দে দ্রব্যাদি ট্রাঙ্কজাত করিতে থাকিলেন। কর্ত্তার অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গৃহিণী গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তারযোগে কলিকাতায় প্রকাণ্ড বাটী স্থির হইল।

নিয়মিত দিনে যথাসময়ে কলিকাতায় যাত্রা করা হইল। হেমলতার বড় আনন্দ। থিয়েটার দেখা হইবে; ঘোড়ার নাচে যাওয়া হইবে, চিড়িয়াখানাতেও পদধূলি পড়িবে, যাদুঘরও বাদ পড়িবে না। আর নরেশচন্দ্র—তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ হইবে হারানিধি হস্তগত হইবে, এ উল্লাসে তাঁহার প্রাণ উৎফুল্লময় কি? পোড়াকপাল! সে আপনিই পেটেরদায়ে আসিয়া পায়ে ধরিবে—জ্বালাতন করিয়া মারিবে। তাহার তজ্জন্য আবার ভাবনা!

ক্রমশঃ—

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

বিলাপ।

সহিতে পারি না আর,
ফাটে প্রাণ শতধায়
দিবানিশি আঁখি-ধারে
হৃদয় গলিয়া যায়।
সে ক্ষুদ্র কুসুম মম,
অফুটন্ত নিরুপম,
অকালে তুলিয়া, কাল,
সাধিলে কি প্রয়োজন?
ভাসাইয়া নিলে তুমি
না ফুটিতে পূর্ণদলে,
না জানি রাখিলে কোথা
তোমার অনন্ত তলে।
আনিয়া দেখাও, সিন্ধু,
ক্রমে ক্রমে তার পরে,—
স্নেহমাখা মুখগুলি
দিয়াছি যা অকাতরে।
বজ্রের উপরে বজ্র
পড়িয়াছে নির্ঘোসিয়া,
অকাতরে সহিয়াছি
হৃদয় পাতিয়া দিয়া।
অপ্সরী-কুন্তল-চ্যুত
সে মন্দার অতুলন,
কোথা আজি নিলে, সিন্ধু,
করি বীচি-বিক্ষেপণ।
হে বিভো, করুণা করি
স্থান দাও পদতলে,
সহিতে পারি না আর
এ জ্বলন্ত চিতানলে। *

শ্রীপ্রমদাসুন্দরী দাসী।

চিত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

বর্ত্তমান সংখ্যায় গঙ্গার গ্রাম্য-স্নানঘাটের যে চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত বাবু যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর অঙ্কিত ছবির ফটো হইতে গৃহীত। যামিনী বাবু একজন প্রতিভাবান্ চিত্র-শিল্পী। তাঁহার অঙ্কিত অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। দুঃখের বিষয় সে নয়নমনোহর দৃশ্যের সৌন্দর্য্য প্রদীপের গ্রাহকগণকে উপভোগ করাইবার শক্তি আমাদের নাই। সাধারণতঃ এই সকল চিত্রের ফটো গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে ব্লক প্রস্তুত করিলে তবে আমরা মুদ্রিত করিতে পারি, কিন্তু ফটোতে মূল-চিত্রের সৌন্দর্য্য যথাযথ প্রতিফলিত হয় না বলিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি।

যামিনী বাবু তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের জন্য শিমলা, দারজিলিং, বোম্বাই, আহমদাবাদ প্রভৃতি স্থানের চিত্র-শিল্প প্রদর্শনীতে অনেক পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন, শিমলা ও দারজিলিংএ তাঁহার চিত্র অনেকবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিলাম না।

আমরা এস্থলে যামিনী বাবুর একখানি প্রতিকৃতি ও সেই সঙ্গে তিনি ষ্টুডিওতে যেরূপ ভাবে চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন তাহার দুইটী দৃশ্য সহ একখানি ছবি গ্রাহকগণকে উপহার প্রদান করিলাম।

ইনি বড়বাজারের সুবিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশসম্ভূত। ইঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলী। যামিনী বাবুর পিতা স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র গিরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের দৌহিত্র। যামিনী বাবু বাল্যকাল হইতেই চিত্র-শিল্পের বিশেষ অনুরাগী। সাত আট বৎসর অতীত হইল তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বে বিলাতের সাউথকেন্সিংটন কলাভবনের শিক্ষক মিঃপামার সাহেব আসিয়া বাস করেন। ইঁহার সহিত যামিনী বাবুর ঘটনাক্রমে পরিচয় হওয়ায় উক্ত সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যামিনী বাবু এত অল্পকাল মধ্যে ও এত অল্প বয়সে চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। উক্ত সাহেব বিলাত যাইয়াও পত্রাদি দ্বারা এখনও যামিনী বাবুকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার সহায়তা করেন। যামিনী বাবুর বয়স এখন সবে মাত্র ২৮ বৎসর। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন যেন তিনি দিন দিন চিত্র বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হন।

* কোন পুত্র-শোক-বিধুরা আত্মীয়ার শোক-বিহ্বলতা দর্শনে রচিত। প্র নং।

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

৬ষ্ঠ ভাগ। | ভাদ্র, ১৩১০। | ৫ম সংখ্যা।

কাল।

অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হই। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখিতে পাই সমস্তই ক্ষণিক। সংসারে স্থাবর জঙ্গম যে কোন পদার্থ আছে তাহারা সকলেই ধ্বংসশীল ও ক্ষণভঙ্গুর। আমরা ইদানীং যে সকল বস্তু দেখিতে পাইতেছি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহার অধিকাংশই ছিল না, আবার তখন যাহা যাহা বিদ্যমান ছিল এখন তাহার অনেক বস্তু বিলুপ্ত হইয়াছে। অধুনা যে সকল বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে সহস্র বৎসর পরে তাহারা কোথায় থাকিবে এবং আমরাই বা কোথায় থাকিব? সংসারস্রোতে এমন কত কোটী কোটী বস্তু ভাসিয়া যাইতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? কত শত দেশ, কত শত নদী এবং কত শত পর্ব্বত সংসারে কতিপয় বৎসরের জন্য অস্তিত্ব লাভ করিয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায় তাহার ইতিবৃত্ত কে রক্ষা করিতে পারে? আমাদের ন্যায় কত কোটী কোটী ক্ষুদ্র জীব এই অনাদি সংসারে জন্মলাভ করিয়াছিল তাহারা এখন কোথায়? জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই নিয়ত পরিভ্রমণশীল পরিবর্ত্তন-স্বভাব ও ক্ষণভঙ্গুর সংসারের বিষয় অনুধ্যান করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। আমরা এ স্থলে পাশ্চাত্য ভাবুকগণের কথা বলিতেছি না। যে সকল মনীষী আমাদের স্বদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার-প্রহেলিকা ভেদ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন সেই সকল সংযতেন্দ্রিয়, ধ্যানপরায়ণ ও সমাধিনিষ্ঠ ঋষিগণই আমাদের লক্ষ্য। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন জ্ঞান মিথ্যা, জ্ঞেয় মিথ্যা, জ্ঞাতাও মিথ্যা, সংসার অলীক ও জগৎ শূন্যতা মাত্র। তাঁহাদের মতে জগৎ একটী মহাস্বপ্ন। যাঁহারা এই স্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহারাও মিথ্যা, আর যাহা দেখিতেছেন তাহাও মিথ্যা। সংসার-রহস্যের ইহাই বোধ হয় সহজ ও প্রকৃত তত্ত্ব।

অপর কোন কোন মনীষী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা। ঘট, পট, মানুষ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি সংসারে যাহা কিছু উপলব্ধ হইতেছে তাহা সমস্তই অলীক। সকল মিথ্যা বস্তুর মধ্যে একটী সৎ পদার্থ আছেন, তিনি ব্রহ্ম। তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত ও নিত্য। সেই ব্রহ্মবস্তুই কেবল সৎ। অপর সমস্তই অসৎ। পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই সদ্‌বস্তুর মায়া মাত্র। ঘট, পট ইত্যাদি সমস্ত বস্তুই সেই ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র। আমিও তাঁহার প্রকাশ, বাহ্য জগৎও তাঁহারই প্রকাশ। তিনি আভ্যন্তর ও বাহ্য জগতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া ঘট, পট, আমি, তুমি ইত্যাদিরূপে প্রকাশমান হইতেছেন। এই ব্যক্ত জগৎ সেই ব্রহ্মেরই মায়া। যে মুহূর্ত্তে আমি বুঝিব সেই ব্রহ্ম ও আমি একই পদার্থ সেই মুহূর্ত্তে মায়ার ধ্বংস হইবে। সেই মুহূর্ত্তেই এই সংসার-প্রহেলিকা অবসান লাভ করিবে। আমি এত দিন যে সংসারকুহকে বিমুগ্ধ ছিলাম তাহা সেই মুহূর্ত্তে চরম ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তখনই "আমি" ও "তুমি" অর্থাৎ আত্মা ও বাহ্য জগতের ভেদ অন্তর্দ্ধান করিবে। সংসার-রহস্যের এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।

অপর এক শ্রেণীর ভাবুক আছেন তাঁহারা সংসারকেও মিথ্যা বলিতে চান না, আত্মাকেও অলীক বলেন না। তাঁহারা বলেন আত্মা বা আমি নিত্য বস্তু। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের নিয়ত প্রকাশ ও অপ্রকাশ ঘটিতেছে বটে, কিন্তু যিনি ঐ সমুদায়ের অনুভবিতা তিনি স্থির ও ধীর ভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। রূপের অপ্রকাশে উহার দ্রষ্টার অপ্রকাশ হয় না। শব্দ অন্তর্হিত হইলে শ্রোতার অন্তর্দ্ধান ঘটে না। অতএব বাহ্য বস্তুর বিয়োগে আত্মার বিধ্বংস ঘটে না। সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে, সর্ব্ববিধ অনিত্যতার মধ্যে, সকল প্রকার ক্ষণভঙ্গুরতার মধ্যে একটী বস্তু আছে যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য ও স্থির থাকে। তাহাই আত্মা।

বাহ্য জগতে দুইটী দ্রব্য ভিন্ন আর সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। যে দুইটী দ্রব্য অপরিবর্ত্তনীয় উহাদের নাম আকাশ ও কাল। যখনই আমরা কিছু কল্পনা করি, দেখিতে পাই অসীম আকাশ আর অনন্ত কাল। আকাশেরও অন্ত নাই, কালেরও অন্ত নাই। সকল বস্তুরই আশ্রয় কাল, সকলেই কালের আশ্রিত। কালের আদি বা অন্ত নাই। আমাদের অর্থাৎ আত্মারও আদি বা অন্ত নাই। কাল আত্মার নিত্য সহচর। ইঁহাদের উভয়েরই কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। কি জানি কোন্ শক্তির প্রভাবে আত্মা ও কাল উভয়েই নিয়ত অনন্তের অভিমুখে ধাবমান হইতেছেন। ইঁহারা উভয়েই অনন্তের পথিক। ইঁহাদের একের কার্য্য অপরে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। চরম গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া কাল আত্মার সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দিবেন কে বলিতে পারে?

কাল তোমার চরম লক্ষ্য কি যদি বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে আত্মার চরম লক্ষ্যও আমাদের জ্ঞানগোচর হইত। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ যদি জানিতাম তাহা হইলে আত্মার জন্মস্থানেরও কিছু পরিচয় পাইতাম। অহো ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তোমাকে বা আত্মাকে কাহাকেও সুন্দররূপে চিনিতে পারে নাই। দার্শনিকগণ বৃথা তর্ক করিয়াছেন কালের আশ্রয় আত্মা কি আত্মার আশ্রয় কাল। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন কাল আত্মার আশ্রিত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মার সহ প্রকৃতি অর্থাৎ বাহ্য জগতের সম্বন্ধ ঘটিলে যে নানাবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় কালজ্ঞান তাহাদের অন্যতম। তাঁহার মতে কাল জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। এই কালজ্ঞানের সহ অন্যান্য জ্ঞান বিজড়িত। অতীত কাল বিষয়ক জ্ঞানের নাম স্মরণ, বর্ত্তমান কাল বিষয়ক জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ ও ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের নাম প্রত্যাশা। কপিল বলেন পুরুষ অর্থাৎ আত্মা যখন মুক্তিলাভ করেন তখন এই কালজ্ঞানের ধ্বংস হয়। সংসার দশায় আত্মা কালের সহ বিজড়িত থাকেন বটে কিন্তু মুক্তাবস্থায় তিনি উহার অতীত হইয়া পড়েন। সাংখ্য দর্শনে কাল এইরূপে আত্মার অধীন ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ কিন্তু আত্মাকে কালের অধীন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন কাল একটী স্বতন্ত্র নিত্য দ্রব্য। ইনি বিভু, জন্য পদার্থের জনক ও জগতের আশ্রয়। কাল কার্য্য ও কারণভেদে দ্বিবিধ। কার্য্যরূপী কাল অনিত্য, সোপাধিক ও সাকার কিন্তু কারণরূপী কাল নিত্য নিরুপাধি ও নিরাকার। এই কারণরূপী কালই যথার্থ কাল, ইহাই পরম মহান্ বা বিভু। ইনিই বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন। আত্মার বন্ধন দশাই হউক আর মুক্তির অবস্থাই হউক কাল সর্ব্বাবস্থায় অবিকৃত থাকেন। আত্মা যখন পরম নির্ব্বাণ লাভ করেন তখন তাঁহার সংসারের উচ্ছেদ হয় বটে কিন্তু কালের উচ্ছেদ হয় না। বস্তুতঃ ন্যায় বৈশেষিক মতে কাল একটী নিত্য দ্রব্য, অন্য দ্রব্যের ধ্বংসে কালের ধ্বংশ হয় না।

যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ কালকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহারা এই সংসাররহস্যের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহাদের মতে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে কোন বিশেষ ভেদ নাই। স্পর্শজ্ঞান সমবেত চৈতন্যই জড়। বাহ্য জগৎ আমাদের জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। যদি আমাদের জ্ঞান থাকে তাহা হইলেই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি আর যদি আমাদের জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, অতএব জ্ঞানই বাহ্য জগতের কারণ। জ্ঞান ও বাহ্য জগৎ একই পদার্থ। সংসারে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে সমস্তই জ্ঞানের আকারবিশেষ। বিশ্বসংসার আর কিছুই নহে, উহা কেবল সাকার জ্ঞান। জ্ঞানের একটী আকারের নাম কাল। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই এই কালের আকারে আকারিত। আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, স্মরণ করি বা প্রত্যাশা করি সে সমস্তই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কালিক সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে দৃষ্ট হইবে সংসারে নূতনতর কিছুই জন্মিতেছে না। সংসারের পদার্থসমূহ সুসজ্জিত হইয়াই রহিয়াছে। উহারা কালরূপ আবরণে আচ্ছাদিত আছে বলিয়া আমরা অতীত ও অনাগত পদার্থসমূহ দেখিতে পাইতেছি না। যদি কালরূপ আচরণ না থাকিত তাহা হইলে বর্ত্তমান পদার্থসমূহকে যেরূপ সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতেছি, অতীত ও অনাগত পদার্থসমূহকে সেইরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। আমরা এক্ষণে বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষকে যুগপৎ দেখিতে পাইতেছি না; যাহা আজ বীজরূপে বিদ্যমান আছে, কিছু কাল অতীত না হইলে তাহা অঙ্কুররূপে পরিণত হইবে না, আবার আরও কিছুকাল অতিবাহিত না হইলে উহা বৃক্ষরূপ ধারণ করিবে না। যদি কালিক পরিচ্ছেদ না থাকিত তাহা হইলে বীজ অঙ্কুর ও বৃক্ষ একত্র দৃষ্ট হইত। বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষ একত্রই বিদ্যমান ছিল, কাল আসিয়া উহাদের মধ্যে ব্যবধান ঘটাইয়াছে। সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীর যে অবস্থা ঘটিবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা পূর্ব্বেই ঘটিয়া আছে, কালরূপ মহাসাগর আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া উহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সংসার কি? না ইহা জ্ঞানের প্রবাহ। এক প্রবাহের পর আর এক প্রবাহ, তদনন্তর আর এক প্রবাহ এইরূপ ক্রমে ক্রমে অনন্ত প্রবাহ আসিয়া আমাদিগকে নানা বৈচিত্র্য দেখাইতেছে। যদি কাল না থাকিত তাহা হইলে এই অনন্ত প্রবাহ আমাদের নিকট যুগপৎ উপস্থিত হইত। কালের সত্তা বশতই প্রবাহ সমূহের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য ঘটিতেছে। কাল স্বয়ংও একটী জ্ঞানপ্রবাহ মাত্র। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহা অপর জ্ঞানপ্রবাহসমূহের মধ্যে পরস্পর পৃথকৃত্ব সম্পাদন করিয়া দেয়। এই পৃথক্ প্রকাশমান জ্ঞানপ্রবাহ সমূহকেই যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ ক্ষণিক বিজ্ঞান নাম প্রদান করিয়াছেন। নির্ব্বাণ অবস্থায় এই ক্ষণিক বিজ্ঞানসমূহ আমাদের সমক্ষে যুগপৎ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ তখন ক্ষণিকত্ব, নিত্যত্ব, বর্ত্তমানত্ব, অতীত্ব ইত্যাদি জ্ঞানের ভেদ দূরীভূত হইবে। সেই ভেদরহিত, নিরাকার, পূর্ণ ও অনন্ত জ্ঞানই নির্ব্বাণ। দার্শনিকগণ কালের সম্বন্ধে এইরূপ নানা বিতর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। ঐ সমুদায়ের সম্যক্ আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষিগণও কালতত্ত্ব নিরূপণের নিমিত্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারাও কালের আদ্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়া উহার সম্বন্ধে নানা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

অথর্ব্ব বেদে লিখিত আছে কাল স্বীয় উদর হইতে অনন্ত জগতের সৃষ্টি সাধন করিয়া স্বয়ংই উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া অবস্থিত আছেন। তিনি প্রসবিতা হইয়াও উহাদের প্রসূত সন্তান। তিনিই বিশ্বের নিয়ন্তা, তাঁহার নিয়ামক কেহ নাই। অথর্ব্ব বেদে আরও লিখিত আছে ঃ—

কালো অশ্ব বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমারোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥১॥

কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্য।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বিপশ্যতি ॥৬॥
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্।
কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥৭॥

(অথর্ব্ব সংহিতা, ১৯ কাণ্ড, ৬৩ সূক্ত)॥

কাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ শকটের অশ্ব বহন করেন, ইনি সপ্তরশ্মি, সহস্রলোচন, অজর ও বহুলবীর্য্যবিশিষ্ট। কবিগণ ও সুধীগণ এই কালশকটেই আরোহণ করিয়া বেড়াইতেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই শকটের চক্র। কাল ভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন, কালে সূর্য্য তাপ প্রদান করিতেছেন, প্রাণিগণ কালে অবস্থিত আছে। কালে চক্ষুর দর্শনক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। কালেই মন, প্রাণ ও নাম সমাহিত আছে। কালের আগমনেই প্রজাগণ আনন্দ অনুভব করিতেছে।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে—

পরস্য ব্রহ্মণো রূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ।
ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথা পরম্॥

(১-২-১৪)॥

হে দ্বিজ পরব্রহ্মের প্রথম রূপ আত্মা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ ইহাঁর দ্বিতীয় রূপ, এবং কাল ইহাঁর তৃতীয় রূপ। মহর্ষি হারীত লিখিয়াছেনঃ—

কালস্তু ত্রিবিধো জ্ঞেয়োঽতীতোঽনাগত এব চ।
বর্ত্তমানস্তৃতীয়স্তু বক্ষ্যামি শৃণু লক্ষণম্॥
কালঃ কলয়তে লোকং কালঃ কলয়তে জগৎ।
কালঃ কলয়তে বিশ্বং তেন কালোঽভিধীয়তে॥
কালস্য বশগাঃ সর্ব্বে দেবর্ষিসিদ্ধ কিন্নরাঃ।
কালো হি ভগবান্ দেবঃ স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ॥
সর্গপালনসংহর্ত্তা স কালঃ সর্ব্বতঃ সমঃ।
কালেন কল্প্যতে বিশ্বং তেন কালোঽভিধীয়তে॥
কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ স্বপিতি জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥
কালে দেবা বিনশ্যন্তি কালে চাসুর পন্নগাঃ।
নরেন্দ্রাঃ সর্ব্বজীবাশ্চ কালে সর্ব্বং বিনশ্যতি॥

(তিথিতত্ত্বধৃতম্। ১ম প্রস্থান, ৪ অঃ)॥

কাল ত্রিবিধ—যথা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ইহার লক্ষণ বলিতেছি। কাল লোককে সংহার করে। কাল জগৎকে সংহার করে ও কাল বিশ্বকে সংহার করে; এই হেতু কালকে কাল বলে। দেব, ঋষি, কিন্নর সকলেই কালের বশীভূত, কালই ভগবান্ দেব, কালই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। কালই সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা। সর্ব্ব পদার্থে কালের সমভাব। কালকর্ত্তৃক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, এই হেতুও কালকে কাল বলে। কাল প্রাণিসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছে। কাল প্রজাগণকে সংহার করিতেছে, কাল কখনও নিদ্রিত এবং কখনও জাগরিত থাকে। কেহই কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। কালে দেবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হন, কালে অসুর ও পন্নগগণ ক্ষয় লাভ করে, নরেন্দ্র ও অন্যান্য জীব কালেই লয় প্রাপ্ত হয়। ঋষিগণ এইরূপ নানাভাবে কালের স্বরূপ বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কাল অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করা বা বর্ণন করা মানুষের সাধ্য নহে। যখন মন ও বাক্ কোন দুরবগাহ গম্ভীর পদার্থে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয় তখন আমরা ঐ পদার্থের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া থাকি। মন যাহা ভাবিতে সক্ষম হয় নাই, বাক্য যাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই, চক্ষুঃ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। এই চাক্ষুষ ব্যগ্রতা বশতই আমরা উহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করি। মন ও বাক্য দ্বারা কালের স্বরূপ অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াই বোধ হয় প্রাচীনগণ কালকে কখনও রুদ্র, কখনও শিব, কখনও মহাকালী, কখনও মহারৌদ্রী, কখনও বাসুকি এবং কখনও যমরূপে কল্পনা করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে যে রুদ্রের বর্ণনা আছে তিনি কাল ভিন্ন আর কেহ নহেন। তিথিতত্ত্বাদি গ্রন্থে লিখিত আছেঃ—

অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

আনাদি নিধন কালই রুদ্র। তিনিই সঙ্কর্ষণ। সর্ব্ব প্রাণীর সংহার সাধন করিয়া কালই রুদ্র নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ কালের ঘোর ভয়ঙ্কর রূপের নাম রুদ্র। ইনি ঝড়, বাতাস, ঝঞ্ঝাবাত, বিদ্যুৎ, অগ্নি ইত্যাদির অধীশ্বর।

কালেরই অন্য নাম মহাকাল বা শিব। ইনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লিঙ্গ বা বীজরূপে বিদ্যমান। ইঁহার কোন আকার নাই। অথচ নিখিল জগৎ ইঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই হেতু প্রাচীনেরা ইহাঁকে বিশ্ব সংসারের

লিঙ্গ বা উৎপাদক বীজরূপে কল্পনা করিয়াছেন। মহাকালের শক্তিই সর্ব্ব সংহারিণী মহাকালী। তাঁহারও কোন রূপ নাই। তিনিও বর্ণহীন। জীবজগতের ক্রমিক ক্ষয় সাধন করিয়াও অসংখ্য নরমুণ্ডমালা ধারণ করিয়া তিনি মহারৌদ্রী নামে পরিচিতা। বস্তুতঃ রুদ্র, মহাকাল, শিব, মহাকালী ও মহারৌদ্রী ইহাঁরা সকলেই অখণ্ডদণ্ডায়মান অনাদিনিধন কালেরই নামান্তর মাত্র।

এই কালই আবার অনন্ত নাগ বা বাসুকির রূপ ধারণ করিয়া ত্রিভুবন স্কন্ধে করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইহাঁর অনন্ত মুখ ও অনন্ত ফণা। ইহাঁর ফণার আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্য নাই। সর্ব্বলোকনাথ বিষ্ণু এই অনন্তরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।

এই কালই আবার পাপ ও পুণ্যের ও বিচারের নিমিত্ত যম নাম ধারণ করিয়াছেন। ইনি ধর্ম্মরাজ ও মহিষবাহন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যমরূপী কালের স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত আছেঃ—

বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বদেহিনাম্॥
বিশ্বং চ কলয়ত্যেব যঃ সর্ব্বায়ুশ্চ সন্ততম্।
অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্॥

(প্রকৃতি খণ্ড, ২৬ অঃ)।

যিনি দণ্ড দ্বারা পাপীগণকে বিশুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে দণ্ড ধারণ করেন, সেই দণ্ডধর ও সর্ব্বজীবের শাসনকর্ত্তা কালকে নমস্কার করি। যিনি বিশ্বকে সংহার করেন, ও যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের আয়ুঃক্ষয় করেন সেই অতীব অদম্য কালকে প্রণাম করি।

জ্যোতিষিগণ কালকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা,—জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়। অজ্ঞেয় কাল আর পরমেশ্বর ইহাঁরা একই পদার্থ। জ্ঞেয় কাল দুই প্রকার; যথা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল কালের অপর নাম মূর্ত্তকাল এবং সূক্ষ্মকালের অন্য নাম অমূর্ত্তকাল। স্থূল বা মূর্ত্তকাল অনুপল বিপল, পল, দণ্ড, দিন, মাস, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর, কল্প ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কাল স্বয়ং অদৃশ্য হইলেও তাঁহার মূর্ত্তি আছে। সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহ নক্ষত্রাদিই তাঁহার মূর্ত্তি। কাল কখনও প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন, কখনও তিনি অপ্রসন্ন হন। কালের শুভাশুভত্ব নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে জ্যোতিষিগণ গ্রহ নক্ষত্রাদির শুভ, অশুভ ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

অনেকে হিন্দু জাতিকে কালজ্ঞানবিহীন বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন। কোন্ ঘটনা কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, কোন্ রাজা কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কোন্ গ্রন্থ কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল ইত্যাদি কিছুই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন নাই। ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহা এক ঘোর অসুবিধা। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে হিন্দুগণ প্রকৃত প্রস্তাবে কালজ্ঞান বিহীন ছিলেন না। তাঁহারা এই অনাদি কালের কোন্ অংশটীকে আদি বলিয়া ধরিবেন কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ ছিলেন। সংসারে এমন্ কোন্ ঘটনা আছে যাহাকে আদিমতম বলিয়া ধরিতে পারা যায়। তাঁহারা জগতের ঘটনামালা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সমস্তই চঞ্চল, কোনটীই স্থির নহে। সমস্ত ঘটনাই যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কোনটীকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া ধরিবেন ভাবিয়া নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহকে অপেক্ষাকৃত স্থির মনে করিয়া উহাদের পরিভ্রমণ কালকেই অন্য ঘটনার কথঞ্চিৎ পরিমাপক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পৃথিবী সৃষ্ট হওয়ার পর সূর্য্য নভোমণ্ডলে কতবার পরিভ্রমণ করিয়াছেন, চন্দ্রাদি গ্রহ ও উপগ্রহগণ শূন্যমার্গে কতবার বিচরণ করিয়াছেন ইত্যাদি গণনা করিয়া তাঁহারা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইত্যাদি যুগ কাল নির্ণয় করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হইবার কত বৎসর পূর্ব্বে বা পরে কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছে ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহারা স্বীয় কালজ্ঞানের কতক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জগতের অন্যান্য জাতিও সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির উদয় ও অস্ত দ্বারা কালের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। ইহারই ফলে সৌরমাস চান্দ্রমাস নাক্ষত্রমাস ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত পরিমাণ অতি অকিঞ্চিৎকর। অসীম অপরিমেয় ও অনির্ব্বচনীয় কাল যথার্থতঃ কোন পরিমাণ দ্বারাই পরিমিত হইবার নহে।

আমি এস্থলে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী কালতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। কিন্তু যথার্থতঃ কালের স্বরূপ

নির্ণয় করা মানবের অসাধ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণের একটী প্রধান তর্কের বিষয় ছিল "কাল আত্মার অধীন কি আত্মা কালের অধীন।" দার্শনিকেরা এ প্রশ্নের যে মীমাংসাই করুন না কেন জগতের উন্নমশীল জাতিসমূহ সর্ব্বদা কালের উপর স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। যাহারা অলস এবং যাহাদের উৎসাহ নাই ও অধ্যবসায় নাই তাহারাই কেবল কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু যাঁহারা পরিশ্রমী অধ্যবসায়সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান্ তাঁহারা অনন্ত কাল মধ্যে স্বীয় উজ্জল চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছেন। কাল-সিকতা হইতে এই চিহ্ন সমূহ কোনক্রমেই অপনীত হইবে না *।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

তন্ময়।

ওগো,—আমার আঁখিতে মুছিয়া গিয়াছে,
জগতের যত দৃশ্য ;
সুধু—তোমারে করেছি হৃদয়ের রাণী—
আমি তব দীন শিষ্য !
আমি—তোমার ধেয়ানে রহিয়াছি যেন
দিবস রজনী মগ্ন ;
তাই—জগতের ডাকে হইতে চাহে না
এ মহা সাধনা ভগ্ন !
এই—পিপাসিত আঁখি তোমারি পানেতে
চাহিয়া র'য়েছে নিত্য !
চির—জনমের তরে তোমারি চরণে
ঢালিয়া দিয়াছি চিত্ত !
ওগো—তোমার হৃদয় হেরিয়াছি আমি,
দেবতা হইতে উচ্চ ;
তাই—তব সনে তুলনা করিতে,
এ জগৎ অতি তুচ্ছ !
যেন—জগতের যত রবি শশী তারা
হইয়া গিয়াছে লুপ্ত !
আর—মানব মানবী পশু পাখী সব
কি মহা কুহকে সুপ্ত !
তুমি—সে মহা নিশিথ তীব্র আঁধার
করিয়া দিয়াছ দীর্ণ,
সুধু—তোমারি আলোকে এ বিশ্ব জগৎ
আজিকে আলোকাকীর্ণ !
তাই—তোমার পানেতে চাহিয়া চাহিয়া,
হয়েছি পলকশূন্য !
সদা—তোমারি নয়নে চয়ন করিব,
জগতের যত পুণ্য !

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে সংপ্রতি নানা জন, নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। কেহ কেহ উহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুযায়ী করিতে চান। বাঙ্গলা যে একটী স্বতন্ত্র ভাষা এবং উহার যে পৃথক ধরণের ব্যাকরণ হওয়া উচিত, তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা "দিবাতে" পদ দেখিলে বিরক্ত হন। দিবা শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় অব্যয়, তাঁহারা বাঙ্গলাতেও উহাকে অব্যয় করিতে চান, দিবাতে না লিখিয়া দিবাভাগে লিখেন। পুরাতন পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনের খণ্ডবিশেষে ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল নামক প্রস্তাবে ব্যাকরণের নিতান্ত অনুগামীদিগকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্রূপের মাত্রা বাড়িয়া চলিতেছে। সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অল্প দিন হইল একটী মাতাল কেরাণী বঙ্গভাষাকে গালি দিয়া বলিয়াছিল যে, তিনটা শ, দুটা য, দুটা ইকার, দুটা উকার আমাদের বালকদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কেরাণীবাবুর বিশ্বাস, ইংরেজী ভাষার বানানে কোন দোষ নাই। আর একদল লোক আছেন, তাঁহারা একটু দীর্ঘ সমস্তপদ দেখিলেই চম্‌কিয়া উঠেন, নিতান্ত ইতর গ্রাম্যশব্দ বসাইয়া রচনা করিতে ভালবাসেন। "অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন" এই বাক্যকে সংস্কৃত ভাষার বাক্য বলিয়া বসেন। মনে করেন, উহা দেশের লোকে মোটেই বুঝে না। বাঙ্গলা ব্যাকরণ, সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ব্যাকরণের অনুযায়ী হইলে যে কি দোষ হয়, তাহা ত বুঝিতে পারা যায় না।

কোন একখানা বাঙ্গলা ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া আমরা দুচার কথা বলিতেছি।

অন্তঃস্থ, উষ্ম, অযোগবাহ ও স্পর্শবর্ণের লক্ষণ ব্যাকরণ হইতে পরিবর্জ্জন করা বিধেয়। বর্ণের উচ্চারণ স্থান প্রকরণটী পরিত্যাজ্য। তবে ড, ঢ ও য কোথায় ড়, ঢ় ও য় এর ন্যায় উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা নির্দ্দেশ করা উচিত। বাঙ্গলা ভাষায় যে কয়েকটী বর্ণ আছে, তাহাতে সমস্তশব্দ লিখিতে পারা যায় না, তাহার জন্য নূতন বর্ণের আবশ্যক। যে সকল বর্ণ আছে, তাহাতে চিহ্নবিশেষ সংযোগ করিলে প্রয়োজন সিদ্ধি হইতে পারে। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারত-বর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় নামক পুস্তকের প্রথমে বিদেশীয় শব্দ লেখনের জন্য এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

সন্ধি প্রকরণে অনেক অনাবশ্যক কথা আছে। পিতৃণ, বৃহট্‌ঠক্কুর, বিদ্বাঁল্লেখক, তড়্‌ঢক্কা, জগদ্‌নাথ প্রভৃতি পদ প্রাচীন কি নবীন কোন বাঙ্গলা গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গলায় বিম্বোষ্ঠ ভিন্ন বিম্বৌষ্ঠ পদ দেখি নাই। নিপাতনসিদ্ধ পদগুলি বালপাঠ্য ব্যাকরণে না থাকাই ভাল। প্রায়শ্চিত্ত, সীমন্ত, কুলটা প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি শিখাইতে চেষ্টা করিলে বালক পীড়ন হইবে মাত্র। লুপ্ত অকারের চিহ্নটী বাঙ্গলা হইতে বোধ হয় উঠিয়া গিয়াছে। সন্ধির কতকগুলি উদাহরণ সমস্ত ব্যাকরণেই একরূপ, নূতন নূতন উদাহরণ বসাইলে মন্দ হয় না। যেখানে সন্ধি না করিলে চলে, সেখানে সন্ধি করা কর্ত্তব্য নয়। এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহারা সংহিত অবস্থাতেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহাদিগকে রূঢ় শব্দের ন্যায় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ণত্ব বিধানে দুটী তিনটী সূত্র রাখিলেই চলিতে পারে। আম্রবন লিখিতে বাঙ্গলায় "ণ" ব্যবহৃত হয় না। ণত্ব ও ও ষত্ব বিধানে কোন্ কোন্ উপসর্গের পর কোন্ কোন্ ধাতুর ন ও স, ণ ও ষ হইবে, তাহা শিখাইতে গেলে বালকদিগকে কষ্টে ফেলান হয়।

বাক্যের অন্তর্গত এক একটী অর্থবোধক বর্ণকে পদ বলে। সূত্রটী মন্দ কি? পদের এই লক্ষণ স্বীকার করিলে পদকে বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয়, ক্রিয়া, সর্ব্বনাম এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আপত্তি হইতে পারে, অব্যয় শব্দটী বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়েরই অন্তর্গত হইতে পারে, হইলই বা। উহার যখন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিয়াছে তখন উহাকে এক জাতীয় শব্দ মনে করা যাইতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সুপ্‌তিঙন্ত শব্দকে পদ বলে, তদনুসারে পদসমুদায় ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হয়, বাঙ্গলা ব্যাকরণে এরূপ বিভাগ হয় না। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোন যোগ্যতর ব্যক্তি ধীরভাবে আলোচনা করিলে, সুখী হইব।

শব্দ-বিভক্তির একটী তালিকা করা উচিত, উহাদিগকে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া আদি বিভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজন নাই। কারণ একটী বিভক্তি অনেক কারকেই হয়। তৎপুরুষ সমাস বলিলেই চলিতে পারে, তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ প্রভৃতি নাম না করিলেও চলিতে পারে, নিতান্ত আবশ্যক হয়, কর্ম্মতৎপুরুষ, করণতৎপুরুষ নাম করিতে পারা যায়। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের ব্যাকরণে এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। অব্যয় প্রকরণ, সুবিবেচনার সহ লিখিত হওয়া উচিত। যাহা সংস্কৃত ভাষায় অব্যয়, তাহা যে বাঙ্গলা ভাষায় অব্যয় হয়, তাহা নহে। প্রাতর্ শব্দটী সংস্কৃত ভাষায় অব্যয়, বাঙ্গলায় প্রাতে গিয়াছিলাম, ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলায় বলিহারি যাই, বলিয়া, কারণ, হ্যাদে, তবে সে, যেন তেন প্রকারেণ, প্রভৃতি অব্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। বটে ক্রিয়াটী ক্রমশঃ অব্যয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ, কোন্ অব্যয়ের কোথায় প্রয়োগ হয়, বিশেষ রূপে তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। উপসর্গ প্রকরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। উহা লিখিবার সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের উপসর্গের অর্থ-বিচার নামক প্রবন্ধের ও রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয়ের তদ্‌বিষয়ক প্রবন্ধের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীত্য প্রকরণের অনেক সূত্র কমান যাইতে পারে। শূদ্রী,

---

* গীতা-সভায় পঠিত প্রবন্ধের মর্ম্মাংশ।

শূদ্রা ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়া প্রভৃতির প্রভেদ বাঙ্গলা ভাষায় দৃষ্ট হয় না। অবনী, শ্রেণী, রজনী প্রভৃতি শব্দের দ্বিবিধ আকার বাঙ্গলা ভাষায় নাই। পঙ্গু শব্দটীর স্ত্রীলিঙ্গে পঙ্গূ শব্দও দৃষ্ট হয় নাই। খাটি বাঙ্গলা শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয়। নিতান্ত নিরক্ষর স্ত্রীলোকও পণ্ডিতের স্ত্রীকে পণ্ডিত্‌নী ও ডাক্তারের স্ত্রীকে ডাক্তার্‌নী বলিয়া থাকে। গোলা, গুলি, ঘট, ঘটী, গড়, গড়ী প্রভৃতি শব্দের পার্থক্য বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। বোধ হয় ইহা বলিতে পারা যায় যে; ঘট ও গড় শব্দ ক্ষুদ্রার্থে ঘটী ও গাড়ী হয়, যেমন তেলিয়া গড়ী। যবনানী শব্দ লইয়া ঐতিহাসিক বিতণ্ডার অবতারণ করা, ব্যাকরণের উদ্দেশ্য বহির্ভূত। মক্ষিকা শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও স্ত্রীমক্ষিকা ও পুংমক্ষিকা শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ বুঝায়। বেগ ও খাঁ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বেগম ও খাতুন হয় ব্যাকরণে একথা থাকা ভাল।

সম্প্রদান কারক, দ্বিগুসমাস, চতুর্থী-তৎপুরুষ সমাস বাঙ্গলা ব্যাকরণ হইতে পরিবর্জ্জনীয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের বিশেষণও যে ক্রিয়ার বিশেষণ হয় প্রায় ব্যাকরণে তাহা লেখা নাই। কূলের সমীপে উপকূল উপকূল শব্দটীর এই ব্যাসবাক্য করা হয়। এই বাক্যে কি উপকূল শব্দটী অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন হয়? উপকূল শব্দে কূলের সমীপবর্ত্তী ভূভাগ কেন বুঝায়, কোন ব্যাকরণে তাহার উল্লেখ নাই। একখানি ব্যাকরণে আছে, বনের সমীপে উপবন। উপবন শব্দের এমন অর্থ ত দেখি নাই। প্রথমাতৎপুরুষ, শাকপার্থিবাদি তৎপুরুষ, ময়ূরব্যংসকতৎপুরুষ, সুপ্‌সুপা সমাস প্রভৃতি পণ্ডিত-ব্যবহৃত সমাসগুলির ভার সহিতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ অসমর্থ। বিশ্বামিত্র, বিশ্বাবসু অষ্টাবক্র প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি বালকদের পরে শিখিলেও চলিবে। যে যে পদে দ্বন্দ্ব সমাস হইবে, তাহার কোন্‌টী আগে, কোন্‌টী পরে বসিবে, সূত্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে তাহার ব্যবস্থা করা অসম্ভব, ব্যবহারই তাহার নিয়ামক। মাতা পিতা ও পিতা মাতা দুইই হয়। অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ বহুব্রীহির লক্ষণ করা অনাবশ্যক। ব্যতিহার প্রকরণ নামক একটী প্রকরণ থাকা আবশ্যক। ধরাধরি, মারামারি, পাশাপাশি, কাণাকাণি, দগদগি, ধকধকি প্রভৃতি উদাহরণ স্থলে গৃহীত হইতে পারে। ন্যূনাধিক্য বশতঃ এখানে ন্যূনতা ও আধিক্যবশতঃ এইরূপ অর্থ বুঝায়। তা প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে, ইহা বলিয়া দেওয়া উচিত। পুত্র ও কন্যাস্নেহে এই পদটীকে একটী সমস্তপদ মনে করা যাইতে পারে। প্রসজ্য প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস নঞের নাম না দিয়া নঞ্‌ অব্যয়ের প্রয়োগ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। নগণ্য ও অগণ্য এই উভয় শব্দেই নঞ্‌ অব্যয় আছে, কিন্তু নগণ্য ও অগণ্য একার্থক নয়। শব্দ বিভক্তি পরে থাকিলে অন্‌ ও ইন্‌ ভাগের ন এর লোপের বিধান করা উচিত নয়। বাঙ্গলায় পক্ষীদিগকে না লিখিয়া কেহ পক্ষিদিগকে লেখে না।

কোন্ কোন্ শব্দ কেবল ক্রিয়া বিশেষণে ব্যবহৃত হয়, তাহা এবং ক্রিয়ার বিশেষণে কোন্ কোন্ শব্দের দ্বিত্ব হয়, তাহা প্রদর্শন করা উচিত। ইংরেজী ব্যাকরণের অনুসারে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরুষ নামকরণ উচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের উত্তম মধ্যম ও প্রথম পুরুষ অপেক্ষা উহা বুঝিতে সুগম। ব্যাকরণে পুরুষের লক্ষণ করা হয় না, ইহা একটী ত্রুটী। ধাতু বিভক্তির প্রকরণ ও কাল প্রকরণটী সুন্দররূপে লিখিত হওয়া চাই। ব্যাকরণে এমন সকল উদাহরণ থাকা উচিত যাহাতে ভবিষ্যতে লোকের ঐতিহাসিক সংবাদ প্রাপ্তির সুবিধা হয়। দৃষ্টান্ত দিয়া উক্তির সমর্থন করিতেছি। লেখা গেল, (ক) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল। (খ) ১৩০৪ সালে প্রবল ভূমিকম্প হয়। (গ) জাপানের সম্রাটকে মিকাডো বলে। (ঘ) মাঞ্চুরিয়া লইয়া রুশের সহ জাপানের বিবাদ হইতে পারে। (ঙ) সেন্ধিয়াবংশে মাধোজির ন্যায় সতর্ক রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। (চ) রূপ অধিকারী টপ সঙ্গীতের স্রষ্টা। (ছ) এষণী শব্দে ফোড়া কাটিবার অস্ত্র বুঝায়। (জ) প্রচক্র শব্দ হইতে পেঁচ, তানক্ষম শব্দ হইতে টনক ও পল্যঙ্ক শব্দ হইতে পাল্‌কী শব্দ হইয়াছে। কারক-প্রকরণ, কালপ্রকরণ, বিশেষ্য বিশেষণ প্রকরণে রাম ভাত খাইল, যদু বৃক্ষে উঠিয়াছে প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে কৌশল পূর্ব্বক এমন শত শত বাক্য বসান যায়। মহাভাষ্যের "ইহ বয়ং পুষ্পমিত্রং যাজয়ামঃ," "অরুণ যবনঃ সাকেতান্‌" "অরুণদ্‌যবনঃ মাধ্যমিকান্‌" এই তিনটী বাক্য দ্বারা পাতঞ্জলির সময় নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপ কোন কালে হয়ত বাঙ্গালা ব্যাকরণের দুটা পাঁচটা কথা দ্বারা কত কাজই হইবে।

অনেকে সানুবন্ধকৃৎপ্রত্যয় দেখিলেই এ যে সংস্কৃত হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি করেন না। অল্প কয়েকটী ইৎফল লিখিলে সূত্রবাহুল্যের প্রয়োজন হয় না, বালকেরা অনায়াসে পদ সাধিতে পারে। একখানা ব্যাকরণে দেখিলাম, লিখিত আছে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর শতৃ ও আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে শান হয়, গণ পাঠকালে টুসংসৃষ্ট ধাতুর উত্তর অথু ও ডুসংসৃষ্ট ধাতুর উত্তর ত্রিমক প্রত্যয় হয়, এ সকল সূত্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে নির্ব্বাসিত হওয়া কর্ত্তব্য। যত শব্দ আছে সকলেরই যে প্রকৃতিপ্রত্যয় শিখাইতে হইবে এমন নয়। হুর্চ্ছ্‌ ধাতু হইতে মুহূর্ত্ত, মূর্চ্ছ্‌ ধাতু হইতে মূর্ত্তি ইহা নাই বা শিখিলাম। পরিত্রাণ শব্দটী বাঙ্গলায় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় না অথচ ত্রৈ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ত্রাণ পদও হয়, বাঙ্গলা ব্যাকরণে সে কথা কেন? গ্রাম্‌, স্থাস্নু, দন্দহূক, ইত্বর, পতয়ালু, অঘর প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় চলিত নাই, ব্যাকরণে উহার স্থান কেন? বাঙ্গলা কৃৎ ও বাঙ্গলা তদ্ধিত প্রকরণ সুবিবেচনার সহ লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। সুমিষ্ট সার্থক খাটি বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহারে রচনা যে কত মিষ্ট হয় তাহা যাঁহারা বৈষ্ণবদের পদাবলী ও শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়প্রণীত স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। তবে সেরূপ ব্যবহারের ক্ষমতা সকলের থাকে না। আনাড়ি লোকের হাতে গ্রাম্যতা দোষের সৃষ্টি হয়। নাম ধাতু প্রকরণটী বিস্তারিতরূপে লিখিত হওয়া উচিত। রীতিগুণদোষ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ ব্যাকরণে না দিয়া সাহিত্য পুস্তকের শেষভাগে দেওয়াই কর্ত্তব্য। কোন কোন ব্যাকরণে ঔণাদিক প্রত্যয় সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পাদ টীকায় মাতা, পিতা, দুহিতৃ শব্দ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত প্রকাশিত হইয়াছে। বালকেরা যখন ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন করিবে, তখন তৎসমস্ত শিখিলে চলিবে।

অতীতকাল বুঝাইতে কখন কখন ভবিষ্যতের প্রয়োগ হয়, যথা,—

কি আশ্চর্য্য পুরাকালে তত্ত্বহীন নর।
দেবতা বলিয়া বহু বন্দিবে তোমায়॥

ব্যাকরণে আরও কতিপয় উদাহরণ দিয়া ইহা দেখান কর্ত্তব্য। অনুভবকরা, গমনকরা প্রভৃতি যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং আনা, দেখা, খাওয়া প্রভৃতিও যে উহার ন্যায়, ব্যাকরণে তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত। ব্যাকরণে শীল শব্দটীর বড়ই ব্যবহার, কিন্তু শীল শব্দটীর অর্থ লেখা হয় না। তাচ্ছীল্যে ণিন্‌ প্রত্যয় হয় বালকেরা কি ইহা বুঝিতে পারে? তাহারা তাচ্ছীল্য শব্দের অর্থ অবহেলা বুঝিয়া থাকে। এইরূপ ভাব শব্দের অর্থও লেখা থাকে না, উহার অর্থও লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য।

বাক্যরচনা, বাক্যের সংযোজন ও বিশ্লেষণপ্রণালী বিস্তৃতরূপে লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই ব্যাকরণের সার অংশ। দুটা পাঁচটা ধাতুপ্রত্যয় না জানিলে ভাষাজ্ঞানের কোন বিঘ্ন হয় না। নূতন নূতন প্রত্যয় ও ধাতু, যাহা কেবল বাঙ্গলা ভাষার সম্পত্তি ব্যাকরণে তাহা লিখিত হইবে। সংস্কৃত শব্দের উত্তর ইন্‌ হয়, কিন্তু বাঙ্গলায় দরদী, মরমী পদও হয়। জজের কার্য্য জজিয়তী, খলিফার অধিকার খেলাফৎ, কাজির এলাকা কাজিয়ৎ প্রভৃতির উল্লেখ থাকা উচিত। লিঙ্গপ্রকরণে যেমন বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া হয়—লিখিত থাকে, তেমনি বেগ ও খাঁ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বেগম ও খাতুন্‌ হয় ইহাও লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। কপোলচল বাঙ্গলায় সম্বোধন পদের রূপভেদ হয় না, লিখিত ভাষায় হইয়া থাকে, কিন্তু সম্বোধনসূচক অব্যয় পরবর্ত্তী হইলে সাধু ভাষাতেও হয় না, যেমন—

সখা হে তোমার মিলন আশে।
রয়েছে জীবন এদেহবাসে॥

এখানে সখেহে হইল না। সত্যবটে যখন প্রথমতঃ বাঙ্গলায় গদ্য লিখিত হইতেছিল, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন অন্যের পরামর্শ লওয়া হয় নাই। তখন পরামর্শ দেওয়ার উপযুক্ত লোকও ছিল না। যখন ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা বাড়িতেছিল, তখন হইতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রভাব খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে,

ভাষায় স্বাধীনতা প্রবেশ করিয়াছে। এখন লোকে অপত্যনির্বিশেষে শব্দের অর্থ বুঝে উহা শুনিতেও ভাল লাগে। তবে স্থান বিশেষে দীর্ঘ সমাসযুক্ত পদও ভাল লাগে। বাঙ্গলা নূতন লেখকেরা দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার করেন না। বাঙ্গলা ব্যাকরণকে সর্ব্বতোভাবে যাঁহারা সংস্কৃতের ছায়া মাড়াইতে নিষেধ করেন, তাঁহাদের ভ্রম। ব্যাকরণকারেরা অতঃপর যেন এই পথে চলেন, এই পথে চলার এই লাভ ইহা বুঝাইয়া দেওয়াই ভাল। শাস্ত্রী মহাশয়ের বাল্মীকির জয় নামক গ্রন্থই সকলে পড়িবে, মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ যদি বাজারে বিক্রীত হয়, তবে তাহা কেহ পড়িবে কি না সন্দেহ।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কুকি জাতির বিবরণ। *

(৬)

এবার ত্রিপুরারাজ্যস্থিত কুকিগণের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা হইবে। ঐ রাজ্যের কুকিদিগের শিক্ষাবিধান পক্ষে স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি কুকি পল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপন এবং সরকারি ব্যয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, তাহাদের শিক্ষা লাভের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান ভূপতি, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের যৌবরাজ্য কালে তিনিও ইহাদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনিই ১২৮৭ ত্রিপুরাব্দে (১২৮৪ বাং) "পাইতু" কুকিদিগকে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে প্রথম যত্নবান হন। মহারাজ বাহাদুরের এই উজ্জ্বল কীর্ত্তিকাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া ত্রিপুরার ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে। তাঁহার রাজত্বসময়ে পার্ব্বত্য জাতির শিক্ষাবিধানপক্ষে দিন দিনই সুবন্দোবস্ত হইতেছে। ইহা সুখের এবং ভবিষ্যমঙ্গলের কথা বটে। লুসাই প্রদেশের কুকিদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। মণিপুর রাজ্যের কুকিগণও উত্তরোত্তর শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে। এই সকল অনুষ্ঠান দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, কুকিগণ তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী মগ জাতির ন্যায় শিক্ষা ও উন্নতি লাভ করিয়া, কালে জনসমাজে দাঁড়াইবার যোগ্য হইবে।

কুকিগণ অসভ্য বটে, কিন্তু তাহাদের একতা ও জাতীয় জীবন সভ্য সমাজেরও প্রার্থিত ধন। ইহাদিগকে বশীভূত করিতে যাইয়া, সেদিন বৃটিশসিংহকেও ক্লান্ত হইতে হইয়াছিল, সুতরাং, ইহাদের তেজ এবং বিক্রমের কথাও উপেক্ষণীয় নহে। অল্পকাল পূর্ব্বে একটী লুসাই যুবক আমাদিগকে যে কথা বলিয়াছিল, দ্বিভাষীর তরজমায় তাহা এইরূপ শুনিয়াছিঃ—"ইংরেজগণ 'ব্রিস্ লোডিং' বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমাদের 'মাজার লোডিং' বন্দুক ভিন্ন অন্য সম্বল ছিল না। ভাল অস্ত্র শস্ত্র থাকিলে আমরা কখনও এত সহজে পরাস্ত হইতাম না।" এই কথা বলিবার সময় তাহার বদনমণ্ডলে কষ্টের অথচ উত্তেজনার এক অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। সরলতা, সত্য ব্যবহার, সজাতিবাৎসল্য ইত্যাদি কুকিগণের স্বাভাবিক গুণ, এ সকল যত্ন করিয়া শিখিতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর সংস্পর্শে তাহাদের ঐ সকল গুণ উত্তরোত্তর লয়প্রাপ্ত হইতেছে। শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই যে এবম্বিধ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

ত্রিপুররাজচ্ছত্রের ছায়াতে যে সকল কুকিরাজ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমরা প্রতিশ্রুত আছি। নিম্নে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে :—

১। লালজাছৈয়া রাজাবাহাদুর ;—ইনি রাজা মুরছইলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে ইনি ত্রিপুরদরবার হইতে সনন্দ ও খেলাত পাইয়া "রাজাবাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। রাজাবাহাদুরের প্রতিকৃতি স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

* আমি দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায়, প্রবন্ধের এই অংশ বাহির করিতে অনুচিত বিলম্ব ঘটিল। সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। লেখক।

কুকিসমাজে রাজাবাহাদুরের বিস্তর সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। ত্রিপুরদরবারেও তিনি কম সম্মানিত ছিলেন না। অল্পদিন হইল রাজাবাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত লালছুক্ থামা পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজা স্বরূপে কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু ত্রিপুরদরবার হইতে অদ্যাপি সনন্দ ও খেলাত প্রাপ্ত হন নাই। রাজাবাহাদুর ভাল লেখা পড়া জানিতেন না ; এবং তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা নাই। রাজাবাহাদুরের পুত্র বাঙ্গলা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি পিতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত।

২। শ্রীযুক্ত রাজা বাণখাম্পুই ;—ইনি রাজাবাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সময় হইতেই ইনি রাজা স্বরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজবাহাদুরের শাসন কালে, (১৩০৭ ত্রিপুরাব্দের ২৫শে আশ্বিন তারিখে) ত্রিপুরদরবার হইতে খেলাত ও সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে, ত্রিপুররাজ্যের কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনিই অধিকতর শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত। বঙ্গভাষায় ইঁহার দখল আছে। এই ভাষায় কবিতারচনাপক্ষেও ইনি নিতান্ত অসমর্থ নহেন। বিগত ১৩০৬ ত্রিপুরাব্দের (১৩০৩ বাং) পৌষ মাসে, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পরলোকগমনজনিত শোকপ্রকাশের নিমিত্ত, কৈলাসহর সবডিবিসনে যে সভা আহূত হয়, সেই সভায় ইনি "দুঃখ গান" শীর্ষক স্বরচিত একটী কবিতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। রচনা অথবা ভাবের মাধুর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত ইহা প্রকাশ করা যাইতেছে না ; অরণ্যবাসী হিংস্র স্বভাবাপন্ন কুকির কর্কশ হৃদয়ে যে সুকোমল কবিতা লিখিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, তাহা দেখানই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কবিতাটী এই :—

"কে ভাঙ্গিল মোর, হেন ঘুমঘোর,
সুখের স্বপন নাশি,
শুনাইল কথা, বিষম বারতা,
কাণের নিকটে বসি !

*   *   *   *

"কাঁদাইয়া সবে, হায় হায় রবে,
কে হরিয়া নিল নৃপে ?
নিরদয় কালে, ভূপে ধরি কোলে,
ফেলাইল পরিতাপে !
"ওহে দয়াময়, প্রেমের আলয়,
প্রেমময় জগদীশ,
করি বহু নতি, চরণে মিনতি,
রাখ অনুরোধ শেষ—
"শান্তি সুখদাতা, জগতের পিতা,
শান্তিময় সনাতন,
অন্তিমে ভূপালে কর দয়াবলে
শান্তিসুধা বিতরণ !
"রাজকুলে জন্ম, খ্যাত 'রাজা' নাম,—
বাণ খাম্‌পুই দীন,
সুখ পরিহরি দুঃখ গান করি,
হইয়া ভূপতিহীন। *
"শ্রীবাণ খাম্পুই—কুকিরাজা।"

কয়েকটি শব্দ বুঝিতে না পারায়, কবিতার একটী শ্লোক ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যে অংশটুকু উদ্ধৃত হইল, কুকির উন্নত অবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট হইবে।

বাণ খাম্পুই রাজার হস্তাক্ষরও নিন্দনীয় নহে। তিনি বাঙ্গালীর ন্যায় পরিষ্কার অক্ষর লিখিয়া থাকেন এবং বর্ণবিন্যাস বিষয়েও অজ্ঞ নহেন।

১২৯৬ ত্রিপুরাব্দে (১২৯৩ বাং) রাজা বাণ-খাম্পুই ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা রাংলেনার মধ্যে † মনোমালিন্য ঘটিয়া উঠে। মৃত রাং বুং রাজার কন্যা (রাজা মুরছুঙ্গার ভগ্নি) শ্রীমতী লালমুড়িকে বিবাহ

* এই কবিতাটি নব্যভারত পত্রিকায়, মল্লিখিত "কুকির কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধে একবার প্রকাশিত হইয়াছে।

† আমরা পূর্ব্বে যে বংশাবলী দিয়াছি, তাহাতে রাজা মুরছই লালের পুত্র, রাজা লালজাছৈয়া বাহাদুর ও রাজা বাণখাম্পুইর নামের উল্লেখ করিয়াছি। রাজা রাংলেনা নামক দ্বিতীয় পুত্রের নাম তাহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। অনেক দিন হইল, রাজা রাংলেনা পরলোক গমন করিয়াছেন।

করিবার নিমিত্ত উভয়ে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। লাল-জাছৈয়া রাজাবাহাদুর ও ভাঙ্গা কুকি-সরদার প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি রাজা রাংলেনার পৃষ্ঠপোষক এবং রাজা জায়েঙ্গা ও লেন্থামা সরদার প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি রাজা বাণ খাম্পুইর পক্ষসমর্থনকারী হইলেন। উভয় পক্ষই বাহুবলের সাহায্যে লালমুড়িকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সকলে মনে করিল, আবার বুঝি সুন্দ, উপসুন্দের যুদ্ধ অভিনীত হয়; কিন্তু তিলোত্তমা তাহাতে রাজি হইলেন না। লালমুড়ি দেখি-লেন, তাঁহাকে লইয়া বিষম গোলমাল উপস্থিত; তিনি বুদ্ধিমতী, এবং বাঙ্গলা লেখাপড়া জানেন। এই সময়ে বাড়ীতে থাকিলে, নানাবিধ অশান্তি ও উপদ্রব ঘটিবে, একথা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসহরে মহারাজবাহাদুরের কর্ম্মচারীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এবং বলিলেন, "আমি আপন ইচ্ছায় কাহাকেও বিবাহ করিব না— মহারাজবাহাদুর যাহাকে বিবাহ করিতে আদেশ করেন, তাহাকেই বিবাহ করিব।" এই সংবাদ অবিলম্বে রাজ-ধানী আগরতলায় পৌঁছিল। তথা হইতে দেওয়ান শ্রীযুক্তবাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত কৈলাসহরে প্রেরিত হই-লেন। দুর্গাপ্রসাদবাবু দীর্ঘকাল কৈলাসহর অঞ্চলে রাজকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, সেইসূত্রে কুকিরাজগণ তাঁহার নিতান্ত বাধ্য ও অনুরক্ত। তিনি ব্যতীত ক্ষিপ্ত কুকিদিগকে শান্ত করিবার অন্যলোক ছিল না বলিয়াই তাঁহাকে পাঠান হইল।

দুর্গাপ্রসাদবাবু কৈলাসহরে যাইয়া, প্রথমতঃ লালমুড়ির মনোগত ভাব জানিবার নিমিত্ত যত্ন করিলেন। এবং স্পষ্টতঃ না হইলেও আভাসে বুঝিলেন, লালমুড়ি, রাংলেনা অপেক্ষা বাণ খাম্পুইর প্রতিই অধিকতর অনুরক্তা। অতঃপর তিনি উভয় ভ্রাতাকে পৃথক পৃথক ভাবে আনিয়া তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিলেন। উভয়েই বলিলেন, "লাল-মুড়িকে না পাইলে মরিতেও প্রস্তুত আছি।" দুর্গা-প্রসাদবাবু বড় কঠিন সমস্যায় পড়িলেন। কুকিগণ একগুঁয়ে এবং তাহাদের মনের গতি পরিবর্ত্তন করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার, একথা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। সুতরাং কি উপায় অবলম্বনে ইঁহাদিগকে শান্ত করিবেন, প্রথমতঃ তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি-লেন না।

এক দিন দুর্গাপ্রসাদবাবু রাজা রাংলেনাকে গোপনে বলিলেন, "লালমুড়ি বাণ খাম্পুইর প্রতি অনুরক্তা, সে তোমাকে পাইতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং এই বিবাহে তোমার সুখ-শান্তির আশা অতি বিরল। বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে রমণীতে অনুরক্ত, সেই রমণীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। তুমি লালমুড়িকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।" এইরূপ বিস্তর প্রবোধ দেওয়ার পর, রাজা রাংলেনা বলি-লেন," অন্য কোন কারণে না হউক, আপনার কথার মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত আমি লালমুড়িকে বিবাহ করিবার আশা পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তদ্দরুণ আমাকে কুকি-সমাজে নিতান্ত লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হইবে।" দুর্গাপ্রসাদবাবু বলিলেন, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, সমাজে যাহাতে তোমার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, আমি তাহার উপায় করিয়া দিব। ইহার পর রাজা রাংলেনা লালমুড়িকে বিবাহ করিবার সংকল্প পরি-ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। এতদুপলক্ষে যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিষয় বলিয়া দিয়া, দুর্গাপ্রসাদবাবু তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

ইহার পর সমস্ত কুকিরাজা, কুকিসরদার, এবং কৈলা-সহর অঞ্চলের প্রধান প্রধান বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগকে লইয়া দুর্গাপ্রসাদবাবু এক বিরাট সভা আহ্বান করিলেন এবং সেই সভায় প্রস্তাব করিলেন "রাজা রাংলেনা ও রাজা বাণ খাম্পুই এতদুভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি লালমুড়িকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবে, তাঁহাকে ত্রিপুর-দরবার হইতে জঙ্গবাহাদুর, উপাধিতে ভূষিত করা হইবে।" দেওয়ানবাবুর প্রস্তাব শেষ হওয়া মাত্র রাজা রাংলেনা সভাস্থলে দাঁড়াইয়া বলিল, "অকিঞ্চিৎকর রমণী অপেক্ষা রাজদত্ত উপাধিকে আমি অধিকতর মূল্যবান মনে করি। বিশেষতঃ লালমুড়িকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিলাষী, সুতরাং আমি লালমুড়িকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। দয়া করিয়া আমাকে রাজদত্ত উপাধিতে ভূষিত করা হউক।" বাণ খাম্পুই উপাধির জন্য লালায়িত নহেন, তিনি লালমুড়িকে চাহেন।

সুতরাং জ্যেষ্ঠভ্রাতা লালমুড়িকে পরিত্যাগ করিলেন দেখিয়া নিতান্ত সুখী হইলেন; পূর্ব্বকৃত অপরাধের নিমিত্ত ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; উভয় ভ্রাতায় প্রেমালিঙ্গন হইল। ব্যাপার দেখিয়া সভাস্থ ব্যক্তিবৃন্দ মুগ্ধ হইল এবং দুর্গাপ্রসাদ বাবুর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল।

এই বিবরণ ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের ২৪শে পৌষ তারিখের রিপোর্ট দ্বারা দুর্গাপ্রসাদবাবু, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের গোচর করিলেন। তদনুসারে ত্রিপুরদরবার হইতে ১২৯৭ ত্রিপুরাব্দে, রাজা রাংলেনাকে 'জঙ্গবাহাদুর' উপাধি ও খেলাত প্রদত্ত হয়। রাজমন্ত্রী রায় মোহিনী মোহন বর্দ্ধন বাহাদুর কৈলাসহরের দরবারে, উক্ত রাজাকে সনন্দ ও খেলাত প্রদান করিয়াছিলেন। সনন্দের প্রতি-লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের পদ্ম মোহর

স্বস্তি——

বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরত্ন, পরমস্ত বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী,

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, সবডিবিসন কৈলা-সহরের অন্তর্গত মৃত মরচাইলাল রাজার পুত্র শ্রীযুক্ত রাংলেনা রাজাকে "জঙ্গবাহাদুর" হুদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানি বহাল রাখিয়া জীবিত কালপর্য্যন্ত উক্ত খেদ-মৎ করিতে থাকুক। ইতি সন ১২৯৭ ত্রিপুরাব্দ; তারিখ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ।

এই ঘটনার পর রাজা বাণ খাম্পুই ও রাজা রাং-লেনার মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটে নাই। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লালজাছৈয়া রাজা বাহাদুরের সহিত বাণ খাম্পুইর মনোবিবাদ চিরদিন সমভাবে চলিয়াছিল, সুখের বিষয় এই যে, সে বিবাদের দ্বারা সাধারণের অশান্তিজনক কোনরূপ ঘটনা সম্পাদিত হয় নাই। বোধ হয়, কুকি-সমাজে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হওয়ার দরুণই এইরূপ মনোমালিন্য সত্ত্বেও শান্তি বিরাজিত রহিয়াছিল। ত্রিপুর-দরবারের তীব্র দৃষ্টিও ইহার অন্যতর কারণ।

রাজা বাণ খাম্পুই অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান! কুকি-গণের অর্থকরী বুদ্ধি মাত্রই নাই। কিন্তু বাণ খাম্পুইর সে বুদ্ধি বিলক্ষণরূপে জন্মিয়াছে। তিনি নানাবিধ বনজ বস্তুর বাণিজ্য করিয়া আপন অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কুকিরাজগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাগ্রে তালুক গ্রহণ করিয়া, আপন অধীনস্থ প্রজাদিগকে জুমের পরিবর্ত্তে হলকর্ষণ প্রথা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ লইয়া অন্য রাজাগণ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। রাজা বাণ খাম্পুইর চেষ্টা ও অধ্যবসায় দেখিলে আশা হয়, তিনি উত্তরোত্তর নিজের ও অধীনস্থ প্রজাবৃন্দের অবস্থা উন্নত করিতে পারিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজা মুরছুঙ্গা;—ইনি রাজা রাংবুংএর পুত্র এবং শ্রীমতী লালমুড়ির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি কিয়ৎ-কাল পূর্ব্ব হইতেই রাজাস্বরূপে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। ১৩০৮ ত্রিং সনের ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে ত্রিপুর-দরবার হইতে খেলাত ও সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি স্থূলবুদ্ধি এবং কিয়ৎ পরিমাণে জাতীয় ভাবাপন্ন। ইঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা নাই। ইনি বাঙ্গলা লেখাপড়া সামান্য রকম জানেন।

৪। শ্রীযুক্ত রাং বুং ঠমা বাহাদুর;—ইনি একজন কুকিসরদার। ১৩০৭ ত্রিং ২৫শে আশ্বিন তারিখে, ত্রিপুর-দরবার হইতে "বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি রাজা মুরছুঙ্গা অপেক্ষা চতুর। বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিতে পারেন, এবং সামান্য রকম লেখাপড়াও জানেন।

রাজা ও সরদারগণের ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে যাইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। সকল রাজারই এক একখানা প্রতিকৃতি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাজাবাহাদুর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, আমরা দুঃখিত আছি।

কুকি সমাজের সম্যক অবস্থা অবগত হওয়া নিতান্ত কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। কুকি-ভাষা না জানিলে এবং তাহাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস না করিলে, সকল কথা সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিয়া অবস্থা অবগত হওয়াও দুরূহ ব্যাপার। এক বিষয়ে তিন-জনকে প্রশ্ন করিলে তিন রকমের উত্তর প্রদান করিবে। কুকিগণ ইচ্ছা করিয়া এইরূপ করে না, ইহা তাহাদের

অনভিজ্ঞতার ফল। সুতরাং এরূপ স্থলে প্রকৃত অবস্থা বাছিয়া লওয়া বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় কুকি-সমাজের অনেক কথা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমরা তদ্দ্বারা বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করিতে গেলে, অনেক স্থলে কৈলাস বাবুর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। এজন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। যে সকল মহাশয় ব্যক্তি আমাদিগকে ছবি প্রদানে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের উপকারও ভুলিবার নহে।

এই প্রবন্ধ লিখিয়াই পরিতৃপ্ত হইলাম, এমন নহে। কুকির বিবরণ সংগ্রহ জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিব। এবং যদি কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, সময়মতে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

(সমাপ্ত।) শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

রোহিল্লার রঙ্গভূমি।

আসাম-"প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি" লোকলোচনের গোচর করার পর আর ভাবি নাই যে আবার প্রবাসান্তরের কঠোর যন্ত্রণা অচিরেই ভোগ করিতে হইবে। ধর্ম্মপুত্র বকরূপী পিতৃসন্নিধানে বলিয়াছিলেন—অপ্রবাস মানব-জীবনের সুখের অন্যতম উপাদান। সে হিসাবে এ হতভাগ্যের জীবন চিরদিনই প্রায় দুঃখময়। বাল্যকালে বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাহির হওয়া অবধি যেরূপ প্রবাস হইতে প্রবাসান্তরে ঘুরিতেছি, তাহাতে ধর্ম্মপুত্রকল্পিত সুখের ছবি আমার পক্ষে আকাশকুসুমবৎ। তাই বহুদিন প্রবাসজনিত অবস্থা-বিপর্য্যয়ের পর অত্যল্পকালস্থায়ী স্বদেশ-সুখের আবেগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম, আর বুঝি বিদেশের বিষম জ্বালা সহিতে হইবে না। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধে আবার আমি "যে তিমিরে, সে তিমিরে!"

আপাতযন্ত্রণাদায়ক প্রবাস কিছু অপ্রীতিকর হইলেও কিন্তু একেবারে লাভশূন্য নহে। কবি কহিয়াছেন—

"তীর্থানামবলোকনং পরিচয়ঃ সর্ব্বত্র বিত্তার্জ্জনং
নানাশ্চর্য্যনিরীক্ষণং চতুরতা বুদ্ধেঃ প্রশস্তা গিরঃ।
এতে সন্তি গুণাঃ প্রবাসবিষয়ে——"

প্রবাসের এসমস্ত গুণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। তবে, আমার ভাগ্যে, চতুরতা বা বুদ্ধির প্রশস্ততা গুণ ত দূরের কথা, নানা তীর্থাবলোকন বা আশ্চর্য্যনিরীক্ষণ লাভও ঘটিয়া উঠে নাই; কেবল জীবনযাত্রানির্ব্বাহকল্পে বিত্তার্জ্জন ও তন্নিবন্ধন স্থলবিশেষের ন্যূনাধিক পরিচয় লাভ হইয়াছে মাত্র। এইরূপে রোহিল্লার রঙ্গভূমি বরেলী ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের যে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়লাভ ঘটিয়াছে, বঙ্গীয় বন্ধুগণসমীপে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

গঙ্গার পূর্ব্বসীমান্তর্ব্বর্ত্তী বর্ত্তমান রোহিলখণ্ড প্রদেশ পুরাকালে কঠের নামে পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন সুসভ্য আর্য্যজাতি এই প্রদেশে বসতি করিতেন। কালসহকারে পার্শ্ববর্ত্তী আহির, ভীল ও ভড় নামক কতিপয় অরণ্যচারী ও পার্ব্বত্যজাতিকর্ত্তৃক তাঁহারা এস্থান হইতে বিতাড়িত হয়েন। তদবধি, মুসলমানশাসনের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত, উগ্র জঙ্গলে পরিণত হইয়া উল্লিখিত পার্ব্বত্য ও আরণ্য জাতিসমূহের আবাসস্থল ছিল। ইহারা কঠেরিয়া নামে পরিচিত হইয়া দস্যুতা ও নানারূপ পরপীড়নের দ্বারা জীবনাতিপাত করিত। প্রাচীন কঠের দেশ এইরূপে আর্য্যোপনিবেশ হইতে স্খলিত হইলেও, স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত প্রাচীন ইষ্টকাদি ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের ভগ্নাবশেষ এখন পর্য্যন্ত এই প্রদেশের অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট্ সাহাবুদ্দীনের সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ কুতবুদ্দীনকর্ত্তৃক বাণগড়বিজয়ের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু তদবধি, ১২৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহম্মদকর্ত্তৃক রামগঙ্গাভিমুখে যাত্রার পূর্ব্বে, এতদ্দেশে মুসলমানসমাগমের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে পরবর্ত্তী ভূপতি, বলবান্, কঠের সীমার অন্তর্গত কাম্বিল নামক স্থানে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপদ্রবপরায়ণ কঠেরিয়াগণকে সম্যক্‌রূপে পরাভূত করেন। পরন্তু, ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ পুনরায় কঠের দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সমগ্রভূমি মুসলমানশাসনের অধীন করেন। তদবধি, মোগলসাম্রাজ্যসংস্থাপনের পূর্ব্বে, স্থানীয় বিদ্রোহ ব্যতিরেকে, এ অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

রোহিলখণ্ডের রাজধানী প্রাচীন বরেলী সহর খৃষ্টীয় ১৫৩৭ অব্দে বাসুদেব ও বরেলদেব নামক দুইজন হিন্দু কর্ত্তৃক স্থাপিত এবং শেষোক্ত ব্যক্তির নামানুসারে বরেলী নামে অভিহিত হয়। পরন্তু, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে, রাজা মকরন্দ রায় চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কঠেরিয়াগণকে দূরীভূত করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন সহরের পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া বর্ত্তমান নূতন সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। মোগল সম্রাট্‌গণের সমৃদ্ধিসময়ে, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০৭ পর্য্যন্ত, একের পর অন্য শাসনকর্ত্তা অবিচ্ছিন্ন ভাবে এই প্রদেশে নির্ব্বিবাদে ও নিরুপদ্রবে আধিপত্য করেন। কিন্তু সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের পরলোকান্তে, সমগ্র শাসনযন্ত্র শিথিল হইয়া পড়িলে, বরেলীবাসী হিন্দুগণ মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার না করিয়া রাজকর বন্ধ করিল এবং সকলে স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপনের আকাঙ্খায় পরস্পর গৃহবিচ্ছেদ ও তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করিল। এই সুযোগে এক নবীন মুসলমানশক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটে।

এই নব শক্তির আধার বিখ্যাত রোহিল্লাগণের অভ্যুদয় ও অধিকারসূত্রেই প্রাচীন কঠের প্রদেশ রোহিলখণ্ড নামে পরিচিত হইয়া অদ্যাবধি তাঁহাদিগের অতীত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। রোহিল্লাগণ পাঠান বংশসম্ভূত; ইঁহাদিগের আদিবাস আফগানস্থান। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহ আলম এবং হুসেন খাঁ নামক এই বংশের দুই সহোদর মোগল সম্রাটের অধীনে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন। কালসহকারে সাহ আলমের পুত্র দাউদ খাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া মহারাষ্ট্র-সমরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করায় বর্ত্তমান বুদাওনের নিকটবর্ত্তী জনপদে সম্রাট্ কর্ত্তৃক জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন, এবং ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে তদীয় পোষ্যপুত্র আলি মহম্মদ খাঁ নবাব উপাধি লাভ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ স্থলে—এমন কি আলমোড়া পর্য্যন্ত সমগ্র কুমায়ুন প্রদেশে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। উজীর সফ্‌দার জঙ্গ এই সময়ে অযোধ্যার সুবাদার ছিলেন। রোহিল্লাদলপতি আলি মহম্মদের এইরূপ প্রতাপ দর্শনে বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া তিনি তদ্বিরুদ্ধে দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট্ মহম্মদ সাহের নিকটে অভিযোগ করেন. এবং সেই চক্রান্তে পড়িয়া, ১৭৪৬ অব্দে আলি মহম্মদকে স্বীয় অধিকৃত ভূভাগসমস্ত সম্রাটসরকারে পুনর্ন্যস্ত করিয়া দিল্লীতে ছয়মাস কাল বন্দী থাকিতে হয়। যাহা হউক, সেই সময়ে সুদক্ষ শাসনকর্ত্তার অসদ্ভাব বশতঃ আলি মহম্মদ খাঁ অচিরে মুক্তিলাভ করিয়া মোগলাধিকৃত সাহিণ্ড্ প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হয়েন এবং ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রোহিলখণ্ড রাজ্যে তাঁহার পূর্ব্বতন আধিপত্য পুনর্লাভ করেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ইহার পর বৎসরেই আলি মহম্মদের মৃত্যু ঘটে; বর্ত্তমান অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের অন্তর্গত আঁওলা নামক ষ্টেশনের অনতিদূরে অদ্যাবধি তাঁহার সমাধি-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তদীয় পরলোকান্তে তাঁহার পুত্রগণের অভিভাবক এবং তদানীন্তন রোহিল্লাগণের পরম বিশ্বাসভাজন হাফিজ রহমৎ খাঁ নামক এক ব্যক্তি রোহিলখণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট্ এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া ফরক্কাবাদের নবাবকে রহমতের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন; কিন্তু এই অকর্ম্মণ্য নবাব রণে পরাজিত ও রহমতের হস্তে নিহত হয়েন। এই অবসরে অযোধ্যার উজীর পূর্ব্বোক্ত সফ্‌দার জঙ্গ্ নবাবের ত্যক্ত সম্পত্তি সমস্ত অধিকার করিয়া বসেন। হাফিজ বাহুবলে এই সফ্‌দার জঙ্গকেও পরাভূত করিয়া অযোধ্যার কিয়দংশ অধিকার এবং পিলিভিৎ ও তরাই পর্য্যন্ত আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু উজীর অচিরে মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্য লাভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত আওঁলার নিকটবর্ত্তী বিসৌলী নামক স্থানে রোহিল্লাগণকে রণে পরাভূত করেন এবং চারিমাস কাল তাহাদিগকে পাহাড়ের পাদদেশে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। অতঃপর প্রবল শত্রু আহ্মদ সাহ দূরাণীর আক্রমণ বশতঃ উজীর হাফিজের সহিত সন্ধিসূত্রে জড়িত হইতে বাধ্য হয়েন এবং তদনুসারে হাফিজ পিলিভিতের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন।

আপাতসুবিধাজনক এইরূপ সন্ধিসূত্রে জড়িত হইলেও এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কখনই আন্তরিক প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই,—সুযোগ উপস্থিত হইলেই পরস্পর প্রতিপক্ষতা সাধনে কেহই পশ্চাৎপদ হইতেন না।

কালক্রমে, সফ্‌দার জঙ্গের পুত্র সুজা-উদ্দৌলা অযোধ্যার উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে রোহিল্লাদলপতি হাফিজ পুনরায় তদ্বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করেন, কিন্তু এই চতুর উজীর পাঁচলক্ষ মুদ্রা দানে সেই সৈন্যগণকে অচিরে স্বদলভুক্ত করিয়া লয়েন। আহ্মদ সাহ এই সময়ে দ্বিনদ (Doab) প্রদেশাভিমুখে প্রবেশলাভের উদ্যোগ করিতেছিলেন, ওদিকে বক্‌সারের যুদ্ধে সুজা-উদ্দৌলা ব্রিটিশ শক্তির সংঘর্ষে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রোহিল্লাবীর রহমৎ এই সুযোগে ইটাওয়ায় আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক আপন অধিকৃত ভূভাগ সুদৃঢ় করিতে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে,রোহিল্লার সৌভাগ্যলক্ষ্মী অধিক কাল স্থায়ী হইলেন না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনরায় রোহিলখণ্ড আক্রমণ করায় হাফিজপ্রমুখ রোহিল্লাগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া উজীর সুজা-উদ্দৌলার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়েন। চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন এবং ঐ টাকার জন্য সুজা-উদ্দৌলা রোহিল্লাগণের প্রতিভূত্ব স্বীকার করেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও রোহিল্লাগণ সে টাকা পরিশোধ করিতে অশক্ত হওয়ায়, সুচতুর সুজা পিতৃশত্রু রোহিল্লাগণের উচ্ছেদ সাধনের সুন্দর সুযোগ লাভ করিয়া, ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌প্রদত্ত ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে, রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সাহজেহানপুর জেলার অন্তর্গত মিরাণপুর-কট্‌রা নামক স্থানে তুমুল সংগ্রামের পর ঐ প্রদেশ আপন করতলস্থ করিয়া লয়েন। সাম্রাজ্য বিস্তারে কৃতসংকল্প ও অর্থলালসাপরায়ণ ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কিরূপ চক্রান্তে মোগল সম্রাটের ‘সনদ’ অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্ববৈরী সুজার সহিত বারাণসীর সন্ধিসূত্রে মিত্রতা স্থাপন করেন, এবং সেই বলে বলীয়ান্ সুজা-উদ্দৌলাকর্ত্তৃক রোহিল্লার সহিত রণরঙ্গে কিরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার ও অবিচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নহে। হেষ্টিংসের গুণমুগ্ধ চরিতাখ্যায়কেরা মিল, বার্ক্ বা মেকলের বর্ণনায় অতিরঞ্জনের দোষারোপ করিলেও এই অত্যাচারের কথা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই যুদ্ধে রোহিল্লামাত্রই নৃশংসভাবে নিহত বা নিষ্কৃতিলাভের আশায় নির্ব্বাসিত হয়, লক্ষাধিক লোক আপনাপন আলয় ছাড়িয়া বিজন অরণ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হয় এবং তাহাদিগের গ্রাম ভস্মীভূত, পুত্র কন্যা নিহত ও রমণীর সতীত্ব বিনষ্ট হয়—এইরূপ লোমহর্ষণ কাহিনী পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস না করিলেও, তাঁহারা উহা আদৌ অমূলক বলিতে সাহস করেন নাই।*

হাফিজরহমৎ খাঁ এই যুদ্ধে নিহত হয়েন; কিন্তু প্রাগুক্ত আলিমহম্মদ খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ফয়জুল্লা পলায়নপর হইয়া কোন গতিকে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং তাঁহার অনুসঙ্গী ও হতাবশিষ্ট রোহিল্লাগণের দলপতি হইয়া নানারূপ প্রস্তাবের পর, সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক বার্ষিক পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা আয়ের নয়টী মাত্র পরগণা রাখিয়া রোহিলখণ্ডের অবশিষ্ট সমগ্র অংশ অযোধ্যাধিপতি ঐ উজীর সাহেবকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়েন। বর্ত্তমান রামপুর রাজ্য উল্লিখিত নয়টী পরগণার অন্যতম। আলিমহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে তদীয় ত্যক্ত সম্পত্তির বিভাগসূত্রে রামপুরের জায়গির কনিষ্ঠ ফয়জুল্লার অংশে পতিত হয়; একারণ এই অংশের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা পক্ষে স্বতঃই তাঁহার আগ্রহ জন্মে, এবং তিনি প্রথমতঃ সৈন্যসরবরাহকল্পে উজীরের অধীনত্ব স্বীকার করিয়া ও পশ্চাৎ তাঁহাকে সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি লক্ষ মুদ্রা নগদ দিয়া আপন অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন। এই ফয়জুল্লার বংশধরগণই রামপুর রাজ্যের নবাব বলিয়া অদ্যাবধি পরিচিত। সিপাহি বিদ্রোহকালে ইংরেজপক্ষে অবিচলিত আনুগত্য ও সহায়তা প্রকাশের পুরস্কারস্বরূপ বর্ত্তমান নবাব সাহেবের প্রপিতামহ মহম্মদ ইয়াসুফ্ আলি খাঁ ইংরাজ সরকার হইতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে, প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন এবং তদবধি বংশপরম্পরাক্রমে এই নবাব-সংসার ইংরাজরাজের নিকট যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন।

* "That the conquest of Rohilkhand was stained by some of the cruelty and injustice * * * may be granted as a thing of course. * * * Some villages may have been plundered and burned, some blood shed in pure wantonness, some tracts of country laid waste. * * * The 'Extermination' of the Rohilla's * * * meant only the expulsion of a few Pathan chiefs with 18,oco of their people from the lands which they or their immediate predecessors had wen by the sword".

—Capt. Traffer's *Warren Hastings.* (Rulers of India Series.)

বরেলদেবপ্রতিষ্ঠিত বরেলী সহরই অর্দ্ধশতাব্দকাল যাবৎ রোহিল্লাগণের রাজধানী ছিল। উজীর সুজা-উদ্দৌলা উল্লিখিত উপায়ে রোহিলখণ্ড অধিকার করিলে সাআদৎ আলি নামক এক ব্যক্তি তাঁহার অধীনে বরেলীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন এবং তদবধি এই প্রদেশ অযোধ্যার উজীরেরই অধিকারভুক্ত থাকে। পরে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, তদানীন্তন উজীরকর্ত্তৃক রাজস্ব বিনিময়ে উহা ইংরাজহস্তে ন্যস্ত হয়। ১৮০৫ অব্দে আমির খাঁ নামক জনৈক রোহিল্লা রোহিলখণ্ড আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া অচিরেই বিতাড়িত হয়। অতঃপর, ক্রমান্বয়ে, ১৮১৬, ১৮৩৭ এবং ১৮৪২ অব্দে অত্রত্য হিন্দুমুসলমানের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রাধান্য লইয়া সময়ে সময়ে বিগ্রহ উপস্থিত হয়, কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সুবিখ্যাত সিপাহিবিদ্রোহের পূর্ব্বে ইংরাজশাসন কিছুতেই বিপর্য্যস্ত হয় নাই। এই দারুণ বিপ্লবকালে বরেলীই বিদ্রোহীদলের সঙ্গমস্থল হইয়াছিল। ৩১এ মে তারিখে অত্রত্য সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং পূর্ব্বোক্ত রোহিল্লা বীর রহমৎ খাঁর পৌত্র খাঁ বাহাদুর খাঁ রোহিলখণ্ডের নবাব নাজিম বলিয়া ঘোষিত হয়েন। তন্নিবন্ধন তৎকালীন বরেলীবাসী প্রায় সকল ইংরেজই নৈনিতালে পলায়ন করেন; ইঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহী সেনা উপর্য্যুপরি চারিবার নৈনিতাল যাত্রা করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় না। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয়ের পতনসংবাদ পৌঁছিলে বুলন্দসহরের ওয়ালিদাদ খাঁ, ফতেগড় ও নজিবাবাদের নবাব, ফিরোজ সাহ, নানা সাহেব প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্রোহীদলপতিগণ একে একে স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়নপর হইয়া বরেলী সহর আশ্রয় করেন। কিন্তু ইঁহাদিগকে অধিককাল এ স্থানে থাকিতে হয় নাই;—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে ইংরাজ সৈন্য বরেলীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় দুই দিনের মধ্যেই খাঁ বাহাদুর ও অন্যান্য বিদ্রোহীবর্গ অযোধ্যায় পলায়ন করেন এবং ইংরাজগণ অবাধে বরেলী অধিকার করিয়া বসেন।

তদবধি, সময়ে সময়ে হিন্দুমুসলমানের ধর্ম্মঘটিত পরস্পর গণ্ডগোল ভিন্ন, রোহিলখণ্ড শাসনে ইংরাজরাজকে বিশেষ কোন উপদ্রব ভোগ করিতে হয় নাই। ১৮৭১ অব্দে হিন্দুর শ্রীরামনবমী এবং মুসলমানের মহরম উৎসব একই সময়ে যুগপৎ সংঘটিত হওয়ায় ঐ দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষবহ্নি কিছু প্রবল হইয়া উঠে, এবং বিদ্রোহ নিবারণ কল্পে বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের উৎসবে বিঘ্নোৎপাদন ও সহরের নানাস্থানে নানারূপ অত্যাচার করে। এই বিদ্রোহে বিস্তর লোক হত ও আহত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, ইদানীং বরেলীবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট সখ্য ও সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছে;—এমন কি, হিন্দুর উৎসবে সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ এবং মুসলমানের উৎসবে সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ যোগদান পূর্ব্বক রাজপথের শান্তিরক্ষা ও আহার্য্য-পানীয় দানে পরস্পর সম্বর্দ্ধনা দ্বারা প্রীতিচিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অত্রত্য হিন্দু-মুসলমানের অধুনাতন সখ্যভাব আদর্শ স্বরূপ সর্ব্বত্র অনুকরণযোগ্য এবং এই উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা ও সমীহিত সাধনা-বলে দেশের অশেষ সুমঙ্গলের সম্ভাবনা।

ইংরাজ-শাসনের সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের জন্য এক রোহিলখণ্ড ক্রমশঃ বহুধা বিভক্ত হইয়া, একই কমিশনারের অধীনে, বরেলী, মোরাদাবাদ, সাহজেহানপুর, বুদাওন, বিজনৌর ও পিলিভিৎ—এই ছয় জেলায় পরিণত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত মিত্ররাজ্য রামপুরও ইহার সীমাভুক্ত। এতন্মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় এখন পর্য্যন্ত বরেলীরই গৌরব অধিক এবং তদন্তর্গত বরেলী সহরই সমগ্র রোহিলখণ্ডের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। রোহিল্লার এই রঙ্গভূমে প্রকৃতির লীলারও অসদ্ভাব নাই। নাতি ক্ষুদ্র, নাতিবৃহৎ নানা স্রোতস্বিনী নগরাজ হিমালয়ের পাদমূল বিধৌত করিয়া বরেলী জেলার বহুদিকে প্রবাহিতা, তন্মধ্যে পূতসলিলা গঙ্গার সহিত সম্মিলিতা রামগঙ্গা সর্ব্বপ্রধানা। এই সঙ্গমের প্রায় ৫০ ক্রোশ ঊর্দ্ধে, রামগঙ্গাতীরে, বরেলী সহর অবস্থিত। স্বল্পসলিলা স্রোতস্বিনীকুলের সংখ্যাধিক্য বশতঃ অত্রত্য ভূভাগ বিলক্ষণ উর্ব্বরা; অনাবৃষ্টিকালেও ইহার শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা কৃষকের আশা চরিতার্থ ও

হর্ষবর্দ্ধন করে এবং তন্নিবন্ধন, অন্য স্থানের তুলনায়, দুর্ভিক্ষের কঠোরতা এখানে অল্পই প্রতাপ বিস্তার করিতে পারে। জেলার সর্ব্বত্র গ্রামসমূহ আম্র শিশু প্রভৃতি বিটপীবৃন্দে পরিবেষ্টিত, পরন্ত নানাস্থান নিবিড় নিকুঞ্জে ও সুন্দর বংশবিতানে সুশোভিত।

এতদ্দেশে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন অধুনা অতি অল্পই নয়নগোচর হয়। বরেলী জেলার স্থানে স্থানে আদিম আর্য্যোপনিবেশকালীন অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রামনগরের ধ্বংসাব-

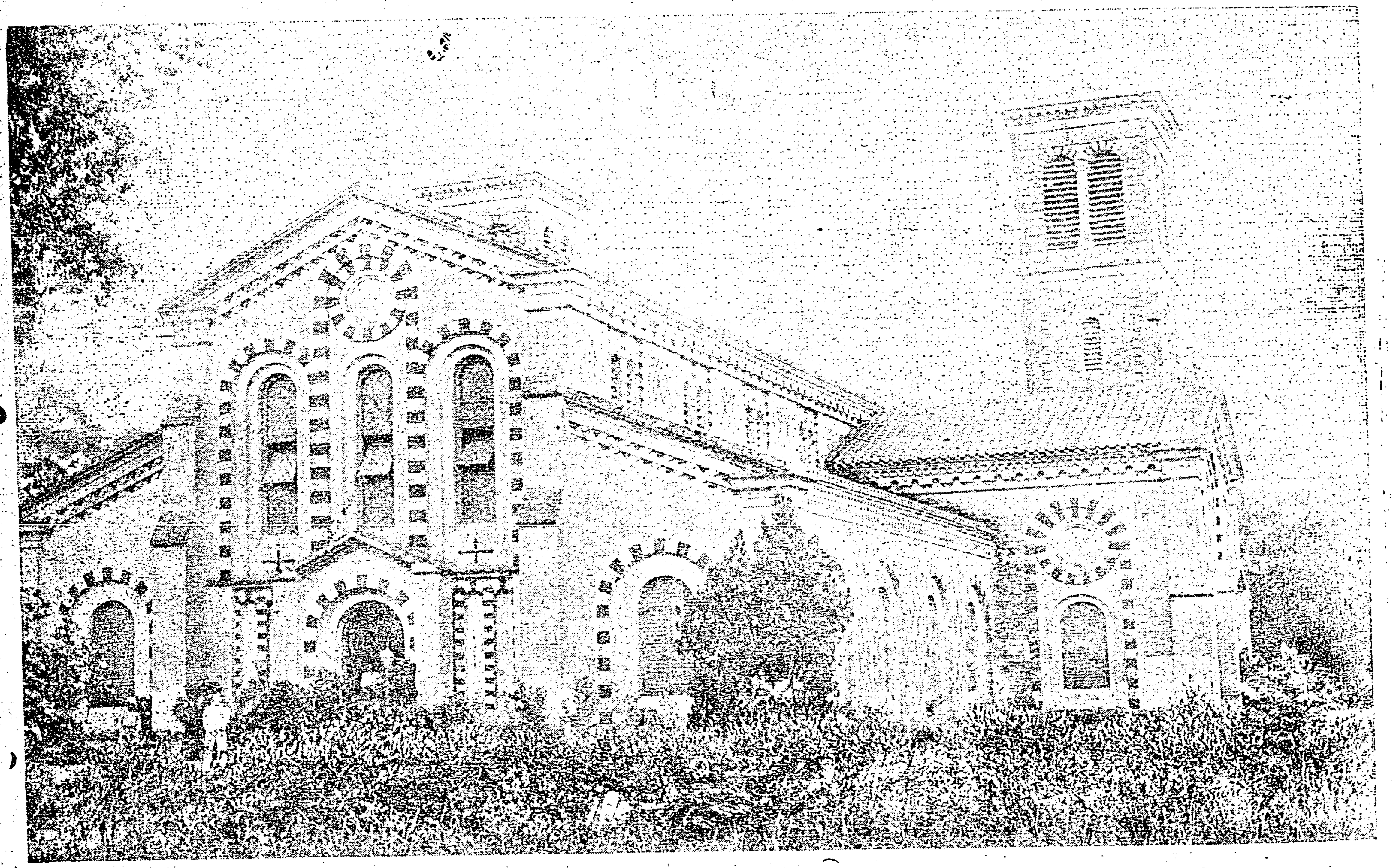

বরেলীর আমেরিকান গির্জ্জা।

শেষই উল্লেখযোগ্য;—জেনারেল কানিঙ্‌হাম ইহা সুবিখ্যাত পঞ্চালদেশের রাজধানী 'অহিছত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন বরেলী সহরে পূর্ব্বোক্ত বরেলদেব ও মকরন্দ রায় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি তাঁহাদিগের অতীত কীর্ত্তির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। পরন্ত মকরন্দরায়ের আর এক কীর্ত্তি তৎপ্রতিষ্ঠিত জুম্মা মস্‌জিদে প্রতীয়মান হয়। তিনি স্বয়ং হিন্দু হইয়াও তদীয় মুসলমান প্রজাবর্গের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনোদ্দেশে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে এই ধর্ম্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সহরের মধ্যে ইহা অপেক্ষাও আর এক প্রাচীন মস্‌জিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা মির্জ্জা মস্‌জিদ্ নামে পরিচিত এবং শুনা যায়, খৃষ্টীয় ১৬০০ অব্দে মির্জ্জা আইন-উল্-মূল্‌ক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নূতন সহরে অধুনাতন অট্টালিকাসমূহের মধ্যে রামপুরের রাজপ্রাসাদ রেলওয়ের ষ্টেশন, সহরপ্রান্তে কারাভবন (Central Jail) এবং সহরমধ্যে সাধারণের কুৎরখানা (Town Hall) ও আমেরিকান মিশনরী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরই প্রধান; তদ্ভিন্ন গোরাঙ্গদিগের গির্জ্জাগৃহও নিতান্ত নগণ্য নহে। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণেরও অবস্থানুযায়ী অনেক উচ্চচূড় অট্টালিকা আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বায়ুনির্গমের বা সূর্য্যরশ্মি প্রবেশের পথশূন্য—ক্বচিৎ কোন ক্ষুদ্র গবাক্ষ বাতায়নের কার্য্য সম্পন্ন করে মাত্র। অবগুণ্ঠিতা পুরনারীগণ অনেকস্থলে নিঃসঙ্কোচে রাজপথে মুক্তবায়ু সেবন করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্তঃপুরপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে আর তাঁহাদিগের বায়ু বা আলোক উপভোগ করিবার অধিকার থাকে না। অবরোধ প্রথার অতিরিক্ত কঠোরতা প্রযুক্তই হউক,

বা বাহ্য উপদ্রব হইতে আত্মসংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা বশতঃই হউক, অত্রত্য সৌধাবলী যতই সিন্দুকাকৃতি হয় ততই তাহার মর্য্যাদা কল্পিত হইয়া থাকে।

সাধারণহিতকর মন্দিরের মধ্যে বরেলী কলেজ ও অত্রত্য বাতুলাশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে কালবিপর্য্যয়ে, কলেজের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যথোপযোগী অর্থস স্থানাভাবে উহার অস্তিত্ব অচিরে বিলুপ্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। বাহ্য সৌষ্ঠবে বাতুলাশ্রম বুদ্ধিমানের বিলাসকানন বলিয়া বোধ হয়,

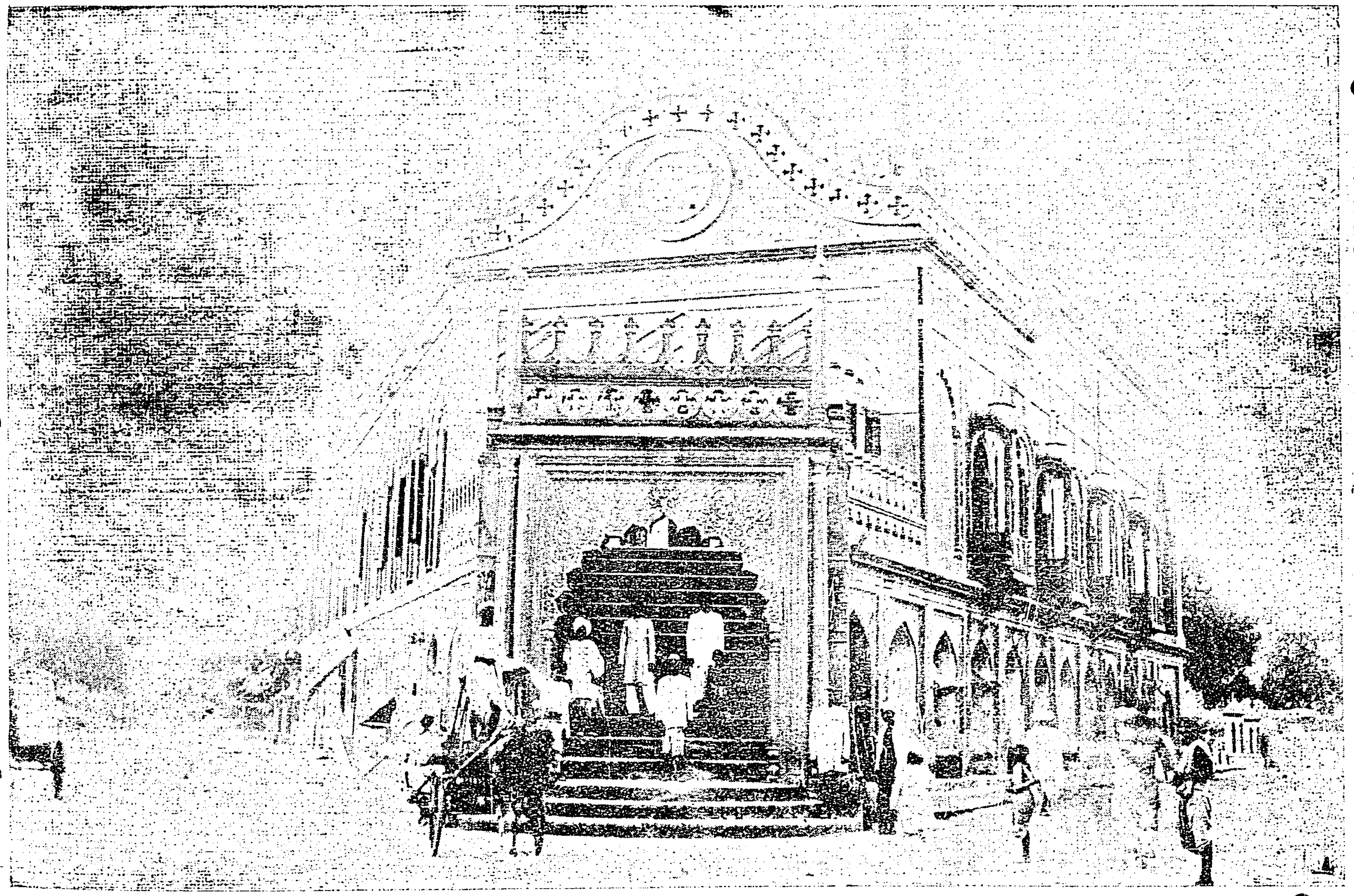

টাউনহল।

কিন্তু অভ্যন্তরে অশেষবিধ উন্মাদের আবাসভূমি ও উদ্দাম রঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়;—কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বলিতেছে, কেহ বিকট চীৎকার করিতেছে, কেহ তাণ্ডব নৃত্যে ঘোর বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে, আবার কেহ দারুণ মর্ম্মপীড়ায় ম্রিয়মাণ হইয়া নীরবে পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই দ্বারা বাতুলাশ্রমের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ কিন্তু ঘোর উন্মাদ—নিতান্ত নগ্নাবস্থায় বিকট দৃষ্টিতে দর্শকের আতঙ্ক উদ্দীপন করে। এইরূপ নগ্নোন্মাদের মধ্যে আমরা একটীর কিছু বিশেষত্ব দেখিয়াছি—তাহার মনুষ্যবোধগম্য বাক্‌শক্তি নাই, হস্তপদের অঙ্গুলির গঠন পশুর ন্যায়, এবং পশুপ্রকৃতিসুলভ আহার্য্যে রুচি; সে প্রথমে আঘ্রাণ ব্যতিরেকে কোন দ্রব্যই ভক্ষণ করে না, অথচ ঘ্রাণের দ্বারা রুচিকর বোধ হইলে বৃক্ষপত্র পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে চর্ব্বণ পূর্ব্বক গলাধঃ করে। শুনিয়াছি, শৈশবাবস্থায় সে পশুর গহ্বরে পশুকর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিল, পরে কোন মৃগয়াশীল সাহেবের নয়নগোচর হওয়ায় তাঁহারই যত্নে, প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের প্রত্যাশায়, এই বাতুলাশ্রমবাসী হইয়াছে। দুঃখের বিষয় তৎপক্ষে অদ্যাবধি তাহার কোন উন্নতিই ঘটে নাই।

বরেলী সহর দুইভাগে বিভক্ত—সিভিল ও মিলিটারী। মিলিটারী মহল্লায় কালা ও গোরা, অশ্বারোহী ও পদাতিক সাধারণ ও তোপসঞ্চালক, সকল সম্প্রদায়ের জন্যই সেনানিবাস (cantonments) আছে। তদ্ভিন্ন শীতকালে সিভিল-মিলিটারীর সঙ্গমসীমার সমীপবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ

ক্ষেত্রে শিবির মধ্যে বহু গোরা সৈন্যের সমাগম হয়; শীতাবসানে ইহারা আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে আপনাপন আড্ডায় চলিয়া যায়। ক্যান্টন্‌মেণ্টের কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া থাকা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছু কষ্টসাধ্য, উহার সীমাও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, বিশেষতঃ আমরা স্বয়ং সিভিল—সুতরাং উহার সূক্ষ্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র। সিভিল সীমায় মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা বড় মন্দ নহে,—তবে উপযুক্ত জলাভাবে পথের ধূলায় পথিকের অঙ্গ ধূসরিত হইয়া যায়, আর আলোকের অল্পতা নিবন্ধন রাত্রিকালে পথে বাহির হওয়া অনেক স্থলে অসম্ভব হইয়া উঠে। পূর্ব্বে পথের মধ্যে পয়প্রণালী থাকায় অসতর্ক পথিককে অনেক সময়ে পঙ্কসিক্ত হইতে হইত, অধুনা সে যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে ঘুচিয়াছে। সহরের মধ্যে একাধিক সরকারী উদ্যান বর্ত্তমান তন্মধ্যে একটী স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরীর 'জুবিলী' উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তন্নামানুসারে আখ্যাত। মর্য্যাদায় এরূপ মহৎ হইলেও রমণীয়তায় ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; ফলতঃ ক্যান্টন্‌মেণ্ট সীমার সমীপবর্ত্তী সাহেবদিগের প্রমোদ-উদ্যান ভিন্ন অপরগুলির এখনও অতি হীনাবস্থা। বাণিজ্যঅধ্যায়ে বরেলীর অবস্থা বড় মন্দ নহে—রবিশস্য, তুলা, শর্করা প্রভৃতি দ্রব্য এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং বরেলীর গঞ্জ হইতে রেলযোগে তাহা নানাস্থানে নীত হয়; গৃহসজ্জোপযোগী কাষ্ঠনির্ম্মিত ও বংশরচিত নানা সুন্দর সামগ্রীও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে ও অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এবং স্থানান্তরে তাহার রপ্তানির ভাগও নিতান্ত অল্প নহে।

বরেলীবাসী বাঙ্গালীজীবনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। যুক্ত প্রদেশের নানাস্থানে এক একটা বাঙ্গালী মহল্লা থাকে, এখানে সেরূপ নাই;—কেহ সদরে (cantonment), কেহ সহরে (city), কেহ রেলে, কেহ জেলে, * কেহ এ পাড়ায়, কেহ ও পাড়ায়, কেহ স্বদেশী মহলে, কেহ স্বদেশী বিদেশীর সন্নিস্থলে বাস করেন; সুতরাং, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও, ইঁহাদিগের পরস্পর সাক্ষাতের সম্পর্ক অতি অল্প। অনেকে আবার স্ব স্ব বৃত্তি লইয়াই বিব্রত, কেহ বা আপন পদগৌরবে গৌরবান্বিত—তাহাতে সম্মিলনের পথ অনেকস্থলে স্বতঃই রুদ্ধ; তদ্ভিন্ন পরস্পর প্রাণের আকর্ষণ ও সহানুভূতিও বিরল। স্থলবিশেষে বাঙ্গালা বুলিও বিকৃত ও কষ্টসাধ্য, এজন্য কুচিৎ কার্য্যসূত্রে মিলিত হইলেও সহজে সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে না। প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যানুশীলনপ্রসঙ্গে সুযোগ্য 'প্রবাসী' অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বরেলীর কথা কৈ বড় কিছু শুনি নাই; তবে এখানকার কেহ কেহ বর্ণশুদ্ধিসহকারে আপন নামটী পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে অশক্ত, এ তথ্য আমরা জ্ঞাত আছি। বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন ও তৎসূত্রে অন্ততঃ বাঙ্গালীগণের মধ্যে পরস্পর প্রীতি সংস্থাপন করিবার উদ্দেশে কতিপয় নিষ্কর্ম্মা লোক একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; গ্রন্থাদি সঙ্কলনের নিমিত্ত অর্থসাহায্যভিক্ষায় ইঁহারা স্থানীয় বাঙ্গালীমাত্রেরই দ্বারে একাধিকবার দ্বারস্থ হইতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই; তাহার পুরস্কারস্বরূপ, কয়েকজন উদারচরিত্র মহানুভবের চক্রান্তে, তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য সভাস্থলে স্বার্থান্ধ প্রতারক বলিয়া সুখ্যাতি লাভ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার পরে এরূপ দুঃসাহসিক চেষ্টাও তাহার বিচিত্র পরিণাম আর কখন ঘটিয়াছিল কি না আমরা জ্ঞাত নহি। যাহা হউক, মাতৃভাষার মর্য্যাদারক্ষা ও পরস্পর মনের মিল সাধনকল্পে বরেলীবাসী বাঙ্গালীর অনুরাগের নিদর্শন এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেই যথেষ্টভাবে পাওয়া যাইতে পারে। আর এক কথা। উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও অতীত কালে কোন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; অধুনাতন বাঙ্গালীগণের ঔদাস্য প্রযুক্ত সে মন্দিরের অবস্থা নিতান্তই মলিন হইয়াছে,—মাত্র জনৈক স্থানীয় ব্রাহ্মণের সেবার উপর নির্ভর করিয়া উহা কোনমতে এখনও মস্তকোত্তোলন করিয়া আছে। বরেলীবাসী বাঙ্গালীর স্বধর্ম্মানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের ইহাও এক সুন্দর নিদর্শন।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

* Railway Station ও Central Jail-এর কর্ম্মচারীগণকে স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী সরকারি বাসায় থাকিতে হয়। তাঁহারা সহরের লোকের সহিত মিশিবার বড় সুযোগ পান না।

ভোজ্য, ভূষা ও ভাষা।

২য় প্রস্তাব।

অনেকে বলিতে পারেন, মাংস প্রভৃতি তামসিক দ্রব্যাদি ভোজনে শরীরে বলসঞ্চার হয় এবং সেই বল দ্বারা মন ও মনোবৃত্তি সতেজ হইয়া থাকে। কথাটী শুনিতে ভাল কিন্তু সকল সময়ে (বোধ হয় অনেক সময়ে) ইহা ঠিক নহে। শরীর ক্ষীণ হইলেও মনোবৃত্তিসমূহ বা মস্তিষ্ক ক্ষীণ হয় না, বরং জগতের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ এবং বিশেষতঃ সাহিত্যজীবিগণ প্রায়ই স্থূলাকার নহেন। ঋষিরা বনের ফলমূল খাইয়া, ক্ষীণ শরীরে এবং সাত্ত্বিক ভাবে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং যাহা চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কয়টা তামসিক পদার্থভোজী পণ্ডিতে অথবা কয়টা মাংসভোজী বিপুলবপু মানবে সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছে? বিদেশীয় শাসনে বাঙ্গালী যখন উৎপীড়িত হইয়াছে, হিন্দুস্বাধীনতার পতনের ইতিহাস পড়িয়া বাঙ্গালীর দেহস্থিত শোণিত যখন তীব্রবেগে ছুটিয়াছে, তখন বাঙ্গালীর লেখনীর অগ্রভাগ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দুই একবার বীরোচিত ভাষা নিঃসৃত হইয়াছিল; দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

১। স্বাধীনতাহীনতায়
কে বাঁচিতে চায় রে?
দিনেকের স্বাধীনতা
স্বর্গসুখ তায় রে।
(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

২। অসভ্য তাতার, অসভ্য জাপান।
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।
ভারত সুধুই ঘুমায়ে রয়॥
* * * * *
বাজ্‌রে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে।
সবাই জাগ্রত এই বিপুল ভবে॥
ভারত সুধুই ঘুমায়ে রয়॥
(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

কিন্তু কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের মেঘনাদবধ কাব্যে অথবা "বীরাঙ্গনায়" যে অগ্নি আছে, তাহা তাঁহার নিজের মনোবৃক্ষের হুতাশন নহে।

পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে;
কার হেন সাধ্য সে যে রোধে তার গতি?

অথবা

"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।"

প্রভৃতি মাইকেলের নিজের নহে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সেই চিরস্মরণীয়

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং।"

নামক বৈশ্বানরময় মহাবীরবাক্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিজের! মাইকেলের "পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি" কবিতার ভাব তাঁহার নিজের নহে, ভাষাও তাঁহার নহে; প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে প্রেমের উচ্ছ্বাস বর্ণনায় ঠিক ঐ ভাষা বর্ত্তমান আছে। যাহাই হউক, প্রকৃত কথা এই যে, তামসিকের ভাষা ও ভাব প্রায়ই আদিসত্বশূন্য, সাত্ত্বিকের চিন্তা, ভাব, ভাষা ও উচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ নূতন এবং "নিতুই নব" নব সাজে সজ্জিত, সুতরাং তামসিকের ভাষার প্রভাব অপেক্ষা ইহার প্রভাব অধিক দূরব্যাপী এবং অধিক কালস্থায়ী। মাংসের তেজ সাময়িক; ফলমূলের তেজ চিরস্থায়ী। শাক্ত বা তান্ত্রিকের চিন্তায় যে সারত্ব দেখা যায়, সাত্ত্বিকাহারী বৈষ্ণবের চিন্তায় তদপেক্ষা অধিকতর সারত্ব থাকে।

পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, মানুষের হাতের লেখার সহিত (অক্ষরের সহিত) আহারের সম্পর্ক আছে। বহু সংখ্যক চিঠি, হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি, মুদ্রাযন্ত্রের পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি মিলাইয়া দেখিয়াছি, নিরামিষাশীর অক্ষর ও হাতের লেখার ধরণ হইতে আমিষাশীর অক্ষর ও হাতের লেখার ধরণে বিভিন্ন। নিরামিষাশিগণ প্রায়ই বড় বড় অক্ষরে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে লিখিতে পারেন; আমিষাশীদিগের অক্ষরগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র এবং অপরিস্ফুট। নিরামিষাশী যত শীঘ্র শীঘ্র (জলদ্) লিখিতে পারে, আমিষাশী তত শীঘ্র পারে না। উচ্চারণে, কথোপকথনে এবং বক্তৃতাতেও প্রায় তাহাই দেখিয়াছি। তবে

অভ্যাসের কথা স্বতন্ত্র, সে কথা গণনীয় নহে। বেশান্ত (Annie Besant) নাম্নী প্রসিদ্ধা বক্ত্রী (speaker) যখন তামসিক আহার করিতেন, তখন তাঁহার লেখনী হইতে এক মিনিটে সাত শত অক্ষরের অধিক নিঃসৃত হইত না, এখন সেই নিরামিষাশিনী বেশান্তের লেখনী হইতে ষোলশত শব্দ নিঃসৃত হয়। তামসিক আহার কালে ঐ প্রসিদ্ধা রমণীর মুখ হইতে ১০৯টী শব্দ বাহির হইতে পারিত, এখন সাত্বিকপ্রিয়া বেশান্তের দিগন্ত-মুগ্ধকারিণী বক্তৃতার সময়ে তাঁহার মুখ হইতে প্রতি মিনিটে গড়ে ২১৭ শব্দ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

আর এক কথা। ঋতু অনুসারে আহারের নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিলে মানুষের চিন্তাশক্তি, উচ্চারণশক্তি এবং ভাব ও ভাষার লঘুতা জন্মিয়া থাকে। সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যজীবিদিগের পক্ষে গ্রীষ্ম ও বসন্ত এই দুই ঋতু সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততম। উজ্জল প্রভাত (Bright morning,) প্রখর রৌদ্র, পর্ব্বত বা বনের বায়ু এবং উত্তাপ এইগুলি সাহিত্যসারথী (Literary men) দিগের পক্ষে খুব হিতকারী। অত্যন্ত শীতে এবং বর্ষায় সাহিত্যসেবীদিগের চিন্তাশক্তি, অনুকরণ ও অনুবাদশক্তি, উদ্ভাবন ও উদ্গমশক্তি প্রভৃতি কমিয়া যায়। সাহিত্যপ্রিয় লোকের শরীর হইতে যত স্বেদ নিঃসৃত হয় ততই ভাল। প্রবল শীতে ও নিরানন্দময় মলিন বর্ষায় (Gloomy weathers) সাহিত্যসেবীর মনোবৃত্তিসমূহ স্ফুরিত হয় না। এই অভাব পূরণ জন্য সাহিত্যজীবিদিগের পক্ষে ভোজ্য পদার্থসম্বন্ধীয় কতকগুলি উৎকৃষ্ট বিধি নির্দ্দিষ্ট থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

যাঁহারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন জন্য অমিত ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভবিষ্য বংশীয়দিগের সভক্তি নমস্কারের যোগ্য হইতেছেন, যাঁহারা সাহিত্যের চর্চ্চায় বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া মর্ত্ত্যজীবনের বহু বর্ষ অতিবাহন করিতে ইচ্ছা করেন অথবা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনাই যাঁহাদের জীবনের প্রধান কিম্বা অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে আমি বিনীত ভাবে "ঋতু হরিতকী" ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। প্রতিদিন অন্ততঃ একটিও হরিতকী ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। লবণ, মধু, গুড় প্রভৃতি অনুপান সহযোগে ঋতু হরিতকী ব্যবহার করিতে হয়। হরিতকী ব্যবহার করিলে চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনশক্তি, অনুবাদ ও অনুকরণশক্তি, স্মরণশক্তি, সাত্বিকভাব, ভাষার তেজ, উচ্চারণের পরিষ্কারতা, মনোবৃত্তির স্ফুরণ এবং রচনা করিবার প্রবৃত্তি বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীদিগের পক্ষে তামাকু সেবন অনেক সময়ে হিতকর, কিন্তু যাঁহারা তাম্রকূটের বিরোধী অথবা ধূমপানে অনভ্যস্ত তাঁহাদিগকে আমি তামাক খাইতে নিষেধ করি, তাঁহারা তামাকুর পরিবর্ত্তে যদি প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি ব্যবহার করেন (মুখ মধ্যে দারুচিনি চর্ব্বণ করেন) তাহা হইলে অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। সাহিত্যসেবীর পক্ষে চা, কাফি, কোকেন ও সকোলেট্ খুব খারাপ। যাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা তিক্ত দ্রব্য (নিম্বপত্র, নিম্বফল, হেলেঞ্চা বা হিঞ্চে শাক, চিরেতা, গোলঞ্চ, পাটশাক প্রভৃতি) ব্যবহার করিলে বিশিষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। সাহিত্যসেবী-দিগের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তিক্ত দ্রব্য সেবন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সাহিত্যপ্রিয় মনুষ্যের পক্ষে কেরোসিন তৈল, গর্জ্জন তৈল, মসিনার তৈল, গর্দ্দভীদুগ্ধ, কচ্ছপমাংস, অত্যুচ্চ বৃক্ষের ফল, খালের জল, অঙ্গারসিদ্ধ গরম জল, রাত্রির শিশির, গাজর, সালগম বিলাতী বেগুন, রসুন, মটরের ডাউল, হরিতালভস্ম এবং (অন্ততঃ) এক বৎসরের অনধিক পুরাতন চাউল ব্যবহার করা একেবারে নিষিদ্ধ। পাঠক মহাশয়ের যেন স্মরণ থাকে, আমি যাহা লিখিতেছি তাহা কেবল বাঙ্গালী সাহিত্যজীবিদিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহাও বলা কর্ত্তব্য, সাহিত্যিক পুরুষের পক্ষে (শাস্ত্রমতে) স্ত্রীসহবাস পরিমিত ভাবেই প্রশস্ত। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে, মানুষ যদি সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে করিতে আহার ও বিহারের নিয়মগুলি মনোযোগসহকারে পালন করে তাহা হইলে সে মহাযোগীরূপে পরিণত হইতে পারে। প্রতিদিন সায়াহ্নে পরিব্রাজণ করা সাহিত্যিকের পক্ষে মহোপকারী। সকল দিবস স্নান না করিলেও সাহিত্যসেবীর অনুপকার হয় না। ইহা কেবল অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাহিত্যজীবীর পক্ষে প্রতিদিন স্নান করা অপেক্ষা

প্রতিসপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার স্নান করা ভাল। সতত শীতল জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর আমি সাহিত্যসেবীদিগের জন্য সাধারণতঃ যে আহারের ব্যবস্থা লিখিতেছি, তাহা প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সম্মত ও সঙ্গত। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়াও এই ব্যবস্থার সারত্বের কথা বুঝান যাইতে পারে। ব্যবস্থাটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভোজ্য পদার্থের তালিকা।

(দুই বেলার আহার।)

প্রভাতে গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পরে দেড় পোয়া দুগ্ধ (অথবা) ২ তোলা গব্যঘৃত (মিশ্রীসহ) (কিম্বা) ২ তোলা মাখন (শুভ্র গুড় সহ) তদনন্তর ১০টা কিম্বা ১১টার সময়ে—মোটা চাউলের অন্ন। * ডাউলের পরিমাণ অধিক হওয়া আবশ্যক। (আমিষাশীর পক্ষে) মাংস অপেক্ষা মৎস্য ও ডিম্বের পরিমাণ অধিক আবশ্যক। ভাজা দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ। আলু কম পরিমাণে ব্যবহার্য্য। অম্বল অবশ্যব্যবহার্য্য। লবণের ভাগ অধিক হওয়া আবশ্যক। দুগ্ধ ও ঘৃত থাকা চাই।

রাত্রির আহারের পরে ফল সেবন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাম্বূলের ব্যবহার যত কম হয় ততই ভাল, একেবারে বন্ধ করিলে ক্ষতি নাই। আতা, আনারস, আম্র ও জাম এই গুলি সাহিত্যসেবীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। যে সকল তরকারীর বা যে সকল ফলের নামের প্রথমে "ক" আছে তাহা সাহিত্যজীবিগণ যদি কম পরিমাণে ব্যবহার করেন তাহা হইলে অধিকতর সুস্থ থাকিতে পারেন; কাঁঠাল, কদলী, কুষ্মাণ্ড, কেতকী, কিস্‌মিশ্ প্রভৃতির অল্প ব্যবহারই ভাল, অধিক ব্যবহার অনুপকারী। সাহিত্যসেবীর পক্ষে স্বল্প পরিমাণে দিবা নিদ্রা প্রশস্ত। বরফ ব্যবহার ভাল নহে; স্নানের সময় অধিক পরিমাণে তৈল ব্যবহার করা খুব ভাল। দিবসে অন্ততঃ ৫।৬ বার শীতল জলে চক্ষু ধৌত করা নিতান্ত আবশ্যক।

অতঃপর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। রেশম, পশম, বা পাট অপেক্ষা সাধারণ তুলাজাত পোষাক, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। পরিচ্ছদ খুব টাইট্ না হইয়া ঢিলা (slack) হওয়া ভাল। সমস্ত শরীর আবৃত রাখায় উপকার আছে, মাথা খোলা থাকাই বিধেয়। জাতীয় পরিচ্ছদ জাতীয় ভাবের উদ্দীপক এবং জাতীয় ভাষার উন্নতি পক্ষে সহায়ক। শুভ্র রং সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সাহিত্যজীবীর প্রধান ব্রত হওয়া উচিত; গৈরিক বসন এবং দীর্ঘ কেশ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

রাঘব-বিজয় কাব্য।*

(সমালোচনা)

বঙ্গ-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইবার সময়ে তাহার বিরুদ্ধে নানা কথা উত্থাপিত হইয়াছিল। মধুসূদনের অতুল প্রতিভা সে সকল প্রতিকূল সমালোচনা অতিক্রম করিয়া, অমিত্রাক্ষরের বিজয়ঘোষণায় কৃতকার্য্য হয়; ছন্দ জয়যুক্ত হইলেও, সে ছন্দে কাব্যরচনা করিয়া আর কেহ মধুসূদনের ন্যায় জয়যুক্ত হইতে পারেন নাই। তাহার মূল কারণ, মধুসূদনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি-কৌশল। সে কৌশল সহসা অনুকরণ করা অসম্ভব। তজ্জন্য অন্য লোকে ছন্দের অনুকরণে কৃতকার্য্য হইয়াও কাব্য-রচনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাই বঙ্গ-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা এখনও নিতান্ত অল্প। শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় অমিত্রাক্ষরে কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে অমিত্রাক্ষরের প্রভাববিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল না হইলেও, প্রশংসার্হ। তাঁহার "রাঘব-বিজয়" নামক অভিনব কাব্যগ্রন্থ চতুর্দ্দশ সর্গে পরিসমাপ্ত রাবণবধের আখ্যায়িকা। সুতরাং মধুসূদনের মত

* সাহিত্যসেবী মহাশয়দিগের ইহা যেন সতত স্মরণ থাকে যে, চাউল যত মোটা হয় তাহার সারত্বও তত অধিক হয়।—লেখক।

* শ্রীশশধর রায় বিরচিত। মূল্য এক টাকা।

শশধরও রামায়ণ বর্ণিত লঙ্কাকাণ্ডোক্ত মহাসমরকাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন।

মধুসূদন যেভাবে "অমৃত ভাষিণীর" নিকট বর ভিক্ষা করিয়া মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনা করিয়াছিলেন, শশধরও প্রায় সেই ভাবে, সেই "মধুর ঝঙ্কারে" দেবীর নিকট বর ভিক্ষা করিয়া, রাঘববিজয় কাব্যের সূচনা করিয়াছেন। মধুসূদন মধুচক্র রচনা করিবেন বলিয়া যে আশার আভাস প্রকাশিত করেন, তাহা সফল হইয়াছে। শশধরও প্রার্থনাশীল ভক্ত সাধকের বিনয়নম্র কোমলকণ্ঠে গাহিয়াছেন ;—

"——নব নব রসে প্লাবিত করিয়া
দেও এ দাসের হিয়া। বাহে সুধাধারা
সম, পারি বরসিতে এ সুধা-সঙ্গীত-
স্রোত অবনী-মাঝারে।"

এই উদ্বোধন-শ্লোক আবার আশার সমাচার বহন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছে। সুতরাং রাঘববিজয় কাব্য পাঠ করিবার জন্য কৌতূহল প্রবল হইবার কথা। কবি বীণাপাণির চিরসহচরী কল্পনা ও প্রতিভাকেও সাদরে আহ্বান করিয়া গাহিয়াছেন ;—

"——উরি এ প্রদেশে, বসি
তিনে এক হ'য়ে, গাও এ মহাসঙ্গীত ;
বিধিবিষ্ণুমহেশ্বর সমস্বরে যথা
গাহিলা ওঙ্কার ধ্বনি অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে,
সৃষ্টির আদিতে ভাসি কারণ-সাগরে।"

ব্রাহ্মণকবির কণ্ঠনিঃসৃত এই ধীরোদাত্ত পবিত্র স্বর কবিপ্রতিভার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহাতে রাঘববিজয় কাব্য আদ্যন্ত পাঠ করিবার কৌতূহল অবশ্যই বর্দ্ধিত হইবে।

মধুসূদন মেঘনাদবধেই কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। শশধর মেঘনাদবধ হইতে কাব্যারম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে সংক্ষেপে মেঘনাদবধ-কাহিনীর উল্লেখ করিতে হইয়াছে। এই কাহিনী মূল রামায়ণে যে ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে সেভাব প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। মধুসূদনের প্রতিভা মূল কাহিনীকে রূপান্তরিত করিয়া কাব্যরচনা করায়, তাহাই বাঙ্গালীর কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। সে কাহিনী—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তাহাতে লক্ষ্মণচরিত্র কালিমালিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। শশধর কবিগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, মেঘনাদবধের প্রকৃত কাহিনী লইয়া কাব্য-সূচনা করিয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণচরিত্র কলঙ্কমুক্ত হইয়াছে। সুপরিচিত আদর্শ সাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হইলে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের হৃদয় ব্যথিত হইয়া থাকে। বঙ্গসাহিত্যে সেরূপ মর্ম্মব্যথার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাঘববিজয় কাব্যের প্রথম দৃশ্য—রাঘব-শিবিরে। সে শিবির-দ্বারে দাঁড়াইয়া "রাঘবেন্দ্র বলী" লক্ষ্মণের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে,—

"সুমিত্রানন্দন, অঞ্জনানন্দন সহ
বিভীষণে ল'য়ে, আসি প্রণমিলা সৌম্য
রাঘবের পদে। বদনে সুহাসি মাখা,
অনল লোচনে, সুসজ্জিত বীরসাজে
সৌমিত্রি-কেশরী ; মাঙ্গলিক চূড়া শিরে
বিজয় পতাকাসম দুলিছে পবনে,
ঘোষিয়া বিজয়বার্ত্তা। অস্ত্রের ঝঙ্কার
মাঝে প্রণমিলা বিপুলাংস রঘুবংশ
অবতংস অগ্রজের পদে।"

রাঘব একবার মিত্র বিভীষণকে, একবার কুমার লক্ষ্মণকে রণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উভয়েই নীরব। অঞ্জনানন্দন সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রণবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। মূল রামায়ণে বিভীষণ এই কার্য্য সাধন করিয়াছেন। সে কালের সাহিত্যরুচি তাহাতে কোন দোষ দর্শন করে নাই। একালের কবির সে সাহসের অভাব। লক্ষ্মণ নিজমুখে নিজের বীরত্ব বর্ণনা করিলে ভাল দেখাইবে না, বিভীষণও আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের নিধন-ব্যাপার বর্ণনা করিলে অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে,—বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কায় কবি অঞ্জনানন্দনের শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাহা হউক, অঞ্জনানন্দন অতি উচ্চশ্রেণীর অভিনেতার মত হাব ভাব অঙ্গভঙ্গীর সহিত এই মহাসমর-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের ভগ্নদূতের সমরবর্ণনার পার্শ্বে রাঘববিজয় কাব্যের প্রথম সর্গের অঞ্জনানন্দনের সমরবর্ণনা স্থানলাভের যোগ্য বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে স্বীকৃত হইতে পারে।

কবি অধিকাংশস্থলে বাল্মীকির অনুসরণ করিলেও,

মহীরাবণকাহিনী গ্রহণ করিয়া কৃত্তিবাসেরও কীর্ত্তি স্বীকার করিয়াছেন। রাম ও রাবণ চরিত্র চিত্রিত করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মহীরাবণকাহিনী গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে কবি পাতাল বর্ণনার অবসর পাইয়া প্রশংসাযোগ্য রচনা-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"সজ্জিত প্রথমস্তরে বালুময় ক্ষিতি,
কোথা চূর্ণ, কোথা পূর্ণ, কোথা কর্দ্দমিত,
গাঢ় কৃষ্ণ, কঠিন, পিচ্ছিল।"

স্তরে স্তরে ভূপঞ্জরের বিবিধ বিচিত্র আভ্যন্তরিক চিত্র সুকৌশলবিন্যস্ত ;—আধুনিক ভূতত্ত্বের কথা হইলেও, কাব্যসৌন্দর্য্যের আধার।

"————————কোন স্থলে
রহিয়াছে পড়ি, অবিজ্ঞাত জীবদেহ,
চূর্ণ কঙ্কালের ; কোথাও আবার, ক্ষুদ্র
শম্বুকের অস্থি, শঙ্খ সুচিত্রিত, অতি
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম, পুঞ্জ পুঞ্জ কীটদেহ
রয়েছে পড়িয়া ; অথবা কালের অঙ্কে
অঙ্কিত করিতে নিজ ক্ষুদ্র ইতিহাস,
নিজমূর্ত্তি আঁকিয়াছে প্রস্তরের দেহে।"

বঙ্গসাহিত্যে রাম ও রাবণের চিত্র বহুবার অঙ্কিত হইয়াছে। সকল চিত্রই একভাবে চিত্রিত। রাবণ গর্ব্বোদ্ধত ; রাম বিরহবিধুর—নিয়ত নয়নজলে অভিষিক্ত, শিশিরস্নাত দূর্ব্বাদলের মত শ্যামসুন্দর সুকুমার কোমলতার আধার। রাঘব-বিজয়ের রাম "বিপুলাংস রঘুবংশ-অবতংস",—ধীরোদ্ধত ক্ষত্রিয় বীর,—অযোধ্যার রামভদ্র বলিয়া চিনিবার চেষ্টা করিলে চিনিয়া লওয়া যায়। রাবণও ধীরোদ্ধত মহাবীর ;—কিন্তু পুনঃ পুনঃ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সে ধীরতা যেন কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ; তাই অধীর উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র বর্ত্তমান।

রাবণ সুবিখ্যাত, সুশিক্ষিত, সুদীক্ষিত ভক্ত। চরিত্র-স্খলনের দুর্ব্বলতা না থাকিলে, সে চরিত্র পূজনীয় হইতে পারিত। চরিত্রস্খলন দোষে এমন চরিত্রেও কেমন অধোগতি প্রাপ্ত হয়, রাবণ যেন তাহারই প্রতিকৃতিরূপে চিত্রিত। চিরদিন এমন ছিল না। রাবণের সভাগৃহের ভিত্তি-চিত্রের বর্ণনাচ্ছলে কবি পূর্ব্বকথার অবতারণা করিয়াছেন। তাহা নিতান্ত মর্ম্মস্পর্শী।

"————চারি ভিতে কি বিচিত্র
লেখা, জাগাইছে পূর্ব্বস্মৃতি দর্শকের
মনে। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতে রণ; মুহুর্ম্মুহু
বিশিখ প্রহারে জর্জ্জরিত দেবব্যূহ
পলাইছে রড়ে।"

এসকল "রম্ভাবতী-হরণের" পূর্ব্বকালবর্ত্তী সৌভাগ্য-কাহিনী। তখনও চরিত্রস্খলিত হয় নাই; শিক্ষা দীক্ষা অতল সলিলে ডুবিয়া পড়ে নাই। তখনকার সেই এক দিন। সে দিন,—

"———— কোথাও বা রক্ষসেনা
রাজসন্নিধানে বাঁধিয়া আনিছে দর্পে
পবন, বরুণ, অগ্নি, দিক্‌পাল যত।"

সে দিন স্বয়ং রাবণও বিশ্বসংসারে অপরাজিত বিক্রমে অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শনে সিদ্ধহস্ত। সে দিন সকলে সভয়ে চাহিয়া দেখিয়াছে,—

"উড়িয়া বিমানপথে মায়াময় রথে,
দুর্জ্জয় লঙ্কেশ ধরি গ্রহতারাবলী,
নক্ষত্র, ভয়াল উল্কা, ছুড়িয়া ফেলিছে
চূর্ণ চূর্ণ করি ভূমিতলে।"

সে বাহুবল, সে শাসনকৌশল, সে অপ্রতিহত দিগ্বিজয়-ব্যাপার লঙ্কাপুরীকে কিরূপ সুখৈশ্বর্য্যে অলংকৃত করিয়াছিল, ভিত্তিগাত্রে তাহার চিত্রপট এখনও সমুজ্জ্বল।

"কোথা সুনীল-সফেন-সিন্ধু-পরিবৃতা
পুরী, নিজবক্ষ খুলি, আলেখ্য-ছলনে,
দেখাইছে কত পথ, কত ঘাট, স্বর্ণ-
বিমণ্ডিত। কত স্বচ্ছ সরসী সুরঙ্গে
নাচিতেছে লহরে লহর তুলি' চির
সোহাগিনী।"

সে দিন লঙ্কেশ্বরের বাহুবলের সঙ্গে সাধনবল মিলিত হইয়া লঙ্কাপুরীকে নানা সাত্ত্বিক শোভায় সুশোভিত করিয়াছিল। এখনও ভিত্তিচিত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"————স্বর্ণ সৌধশ্রেণী অভ্রভেদী,
পবিত্র মন্দির শত শত,—শিবলিঙ্গ
যথা, শঙ্খ-ঘণ্টা-ঝঞ্ঝারোলে, ধূপ-দীপ-
বিল্বপত্রে, ভক্তিভরে সতত পূজিত,

স্ুরম্য উদ্যান কত, প্রমোদ কানন,
শোভাময়ী লীলাময়ী করিয়াছে চির
স্ুবিখ্যাত লঙ্কাপুরী। সেই চিত্র কোন
ভিতে চিত্তমুগ্ধকর।”

ভিত্তিচিত্রের এই বর্ণনা-কৌশলে কবির কল্পণা ও প্রতিভা তুল্যভাবে জয়যুক্ত হইয়াছে। ইহাতে রাবণচরিত্র বিষদরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে,— খণ্ডকাব্যের খণ্ড খণ্ড বিবিধ চিত্রে বিবিধ কথা অভিব্যক্ত। মহাকাব্যের সমস্ত চিত্রের ভিতর দিয়া কেবল এক কথাই অভিব্যক্ত। প্রতি চিত্র যেন সেই এক কথার ক্রমবিকাশের সহায়। রাঘববিজয় একখানি মহাকাব্য। ইহার মহাকাব্য কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য কবি রাবণের চিতাভস্মের উপর চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লিখিয়া দিয়াছেন ঃ——

“—— —— —— ——শাস্ত্র অধ্যয়ন,
সুগ্রন্থ-দর্শন, যাগযজ্ঞ, তপোবল,
অদম্য বাহুবিক্রম, ত্রিভুবনজয়,—
চরিত্রবিহীন জনে বৃথা সে সকলি।
অসংযমী শান্তি ভবে নাহি পায় কভু।”

এই মহাবাক্যই রাঘববিজয় মহাকাব্যের প্রাণ। ইহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার আশায়, কবি কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদের এক দার্শনিক তর্ক গ্রন্থমধ্যে স্থান দান করিয়াছেন। সে দার্শনিক মত কেহ স্বীকার না করিলেও, তাহা কবির প্রয়োজনসিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। রাবণের অসংযত চিত্ত তাঁহার জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল; সদ্‌গুণাবলী শিক্ষা ও সংসর্গের প্রলেপ মাত্র। তাহা চরিত্রকে ক্ষণকাল সংযত করিলেও, সদাকাল সংযত রাখিতে পারে না; সময়ে শিক্ষা ভাসিয়া যায়, কর্ম্মফলই প্রবল হয়। এই দার্শনিক মত সংস্থাপন কামনায় কবি রাবণমাতা নিকষা ও রাবণবনিতা মন্দোদরীকে কর্ম্মফল ও শিক্ষারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মন্দোদরী রাবণকে নিয়ত সংযমের পথে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেন, সে চেষ্টা ক্ষণকাল সফল না হইতেই, নিকষা আসিয়া রাবণের জন্মগত রাক্ষসপ্রবৃত্তি উত্তেজনা করিয়া দিতেন। মন্দোদরীর পরাজয় ও নিকষার জয় রাবণবধের মূল। অসংযমী কদাচ শান্তি পাইবে না বলিয়াই পদে পদে নিকষার জয় হইয়াছে।

এই মহাকাব্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় করুণ রসের অন্তর্গত। চরিত্রস্খলনের ইতিহাস করুণরসেরই উদ্রেক করিয়া থাকে তাহার সঙ্গে হাস্যরসের সংশ্রব নাই। তজ্জন্য কবি হাস্যরস পরিহার করিয়া অন্যান্য রসের অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে করুণ রসই চিত্তস্পর্শ করিয়াছে; অন্যান্য রসের অবতারণা সেরূপ সফল হয় নাই। ইহাকে কাব্যগত দোষ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। মেঘনাদ নিহত হইবার পর লঙ্কার দশা কি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

“লঙ্কা অভাগিণী অনন্ত গগণপটে
রয়েছে চাহিয়া, যেমতি মুমূর্ষু রোগী
চাহেরে বিবশে, সংজ্ঞাহীন। কিম্বা যথা
মেঘাবৃত হ’লে কভু গগনমণ্ডল
সশঙ্ক নক্ষত্র এক চাহে সে আঁধারে।

এরূপ অবস্থায় রাক্ষসপক্ষে যাহা কিছু বীরদর্প প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে বীররসের তীব্র তেজ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। রামপক্ষেও রাবণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া রণোন্মাদ নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। অতঃপর যুদ্ধকলহ কেবল অকারণ শোণিতক্ষয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। পাত্রমিত্র ও নাগরিকগণ মহারাণী মন্দোদরীর ন্যায় শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অসংযতচিত্ত রাবণ শান্তির অনধিকারী বলিয়াই এখনও রণতরঙ্গে লঙ্কাপুরী আন্দোলিত। কিন্তু সে তরঙ্গে আর পূর্ব্বের ন্যায় উচ্ছ্বাস ছিল না। কখন কখন তাহা পূর্ব্ববৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিত; আবার পরক্ষণেই কাতরকণ্ঠে মর্ম্মে মর্ম্মে ক্রন্দন করিয়া হৃদয়ভারলাঘব করিত। সুতরাং বীররসের আতিশয্যে এ কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইত না।

চরিত্রচিত্রাঙ্কনে অধিকাংশ স্থলেই কবির চেষ্টা সফল হইয়াছে। নিকষার শোণিতপিপাসা কিছুতেই শান্তিলাভ করে নাই; সে চরিত্র রাক্ষসজননীর মতই চিত্রিত হইয়াছে। সরমা একবার মাত্র দর্শন দিয়াছেন; কবি তাঁহার চরিত্রচিত্রাঙ্কনের অধিক সুযোগ না পাইয়া, একটী বিশেষণপদে সংক্ষেপে কহিয়াছেন

“মরুভূমে ক্ষীরতরুসম।”

সীতার চিত্র যেন কাব্যফলকের নিভৃত অংশে স্থাপিত হইয়াছে; তাহার সকল অঙ্গরাগ পরিস্ফুট হয় নাই, কবিলেখনী সুকৌশলে সে চিত্রের উপর দিয়া বিষাদের বিমর্ষ আবরণ বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। সকলের সম্মুখে, উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বরী মহারাণী মন্দোদরী,—যেন মূর্ত্তিমতী রক্ষপুরলক্ষ্মীরূপে দণ্ডায়মানা। রাবণবধের পর সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সুদীর্ঘ বিলাপে আর্ত্তনাদ করিবার সময় বিভীষণের প্রতি ভর্ৎসনা বাক্য প্রয়োগে এই চরিত্রের গাম্ভীর্য্য কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ না হইলে, কাব্যসুন্দরীগণের মধ্যে মন্দোদরী অতি উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিতেন। মন্দোদরীর ন্যায় বিভীষণের চরিত্রও একবার চপলতাদোষে একস্থানে একটু বিকৃত হইয়াছে।

রাঘববিজয় কাব্য যে ভাষায় এবং যে ছন্দে আদ্যন্ত বিরচিত, তাহাতে সমগ্র গ্রন্থ সর্ব্বত্র সুখপাঠ্য হইবার পক্ষে স্বভাবতই অনেক বাধা বিঘ্ন বর্ত্তমান। পদচ্ছেদে, যতিসংস্থাপনে, শব্দনির্ব্বাচনে সকলস্থান দোষশূন্য হয় নাই। কিন্তু যেখানে এই সকল দোষ প্রবেশ করে নাই, রচনা সেখানে অনাবিল নদীস্রোতের ন্যায় অবিরল রসধারা প্রবাহিত করিয়াছে। উপমাদি অলঙ্কারে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত; কোন কোন স্থলে উপর্য্যুপরি দুই তিনটী উপমার সমাবেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

“—————— ——এত
কহি নিরবিলা মনের আবেগে রুদ্ধ-
স্বর নৈকষেয়। যেমতি টুটিলে চর্ম্ম
নীরব পটহ অকস্মাৎ। কিংবা যথা
মেঘরাজ, অশনি-পীড়নে, চীৎকারি
গভীর নাদে, নীরব অমনি; অথবা
যথা, প্রভঞ্জনবেগে মুখরিত দরী-
মুখ, স্তব্ধ অকস্মাৎ, যবে শিলাখণ্ড
কোনো, গুরুভার-বশে খসি উচ্চ শৃঙ্গ
হ’তে পরে সে গহ্বরে।”

কোন কোন স্থলে একই উপমা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়া কবির অনবধানতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এরূপ অনবধানতা অন্যান্য বিষয়েও লক্ষিত হইয়াছে। কাব্যসমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য— —কাব্যসংস্কার। অনবধানতা অনেকস্থলে কবিকে অনেক দোষ দোষ বলিয়া দেখিতে দেয় নাই। সমালোচনায় তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। কাব্যারম্ভেই এই অনবধানতার আরম্ভ।

“কহলো অন্তর্য্যামিণি বাণি * *
* * * * * * * * * *
কেমনে বা মন্ত্রবিৎ সাগ্নিকের প্রায়,
আপনার রোষবহ্নি জ্বালি ভয়ঙ্কর,
আপনি হইলা দগ্ধ সে ঘোর দাহনে।”

এখানে রাবণের সহিত সাগ্নিকের আচরণ বা মৃত্যুর তুলনা যথাপ্রযুক্ত হয় নাই। সাগ্নিক রোষবশতঃ অগ্নিসঞ্চয় করেন না; তাঁহার স্বহস্তসঞ্চিত অগ্নিও তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয় না।

যাঁহারা বঙ্গভাষায় কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা অনেকেই নানাবিষয়ে নিরঙ্কুশ হইতে চেষ্টা করেন। সে সংক্রামকব্যাধি শশধরকেও গ্রাস করিয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে নিতান্ত বাধ্য হইয়া ক্কচিৎ দুই এক স্থলে কবিকুল নিরঙ্কুশ হইতেন। যেখানে দোষপরিহারের উপায় আছে, সেখানে দোষের ব্যবহার করা অনবধানতা ভিন্ন কি বলিব? আধুনিক কবিকুলের এই অনবধানতা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; নূতন শব্দসৃষ্টি, প্রচলিত পরিচিত শব্দের অর্থবিপর্য্যয়সাধন, ব্যাকরণলঙ্ঘন ইত্যাদি নানা অনবধানতায় আধুনিক কাব্য দুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

শশধর বাবু “অটবীমানবচূড়া” বলিয়া হনুমানের নামকরণ করিয়াছেন। মনুর অপত্যগণ ইহাতে বিস্মিত না হইলেও, বিরক্ত হইতে পারেন।

“——কত যে পড়িল
রক্ষ, নাগদল কত, কর্দ্দমিত রণ-
স্থল করিয়া পঙ্কিল।”

এখানে “পঙ্কিল” শব্দের এক নূতন অর্থ সৃষ্টি করা হইয়াছে। পঙ্কশব্দ “ঈষদূনার্থে” পঙ্কিলরূপ ধারণ করে; তাহাকে “পঙ্কময়” বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

“——কোলাহল বিশ্ব
নাশী যেন, রাক্ষসের শ্রুতিমূলে পশি
অকস্মাৎ, চমকিল রক্ষোবরে।”

এখানে “চম্‌কাইয়া দিল” এইরূপ অর্থে “চমকিল” শব্দের ব্যবহার অর্থবোধের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে।

নীতিবান, সর্ব্বসহা, দ্বিধাখণ্ড প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত হইতে গৃহীত; সুতরাং তাহাদের অপব্যবহার অসঙ্গত। নীতিমান, সর্ব্বংসহা, দ্বিখণ্ডিত বা দ্বিধাখণ্ডিত বলিলে দোষ ঘটিত না। প্রকারে ধা প্রত্যয়যোগে দ্বি শব্দের দ্বিধা রূপ হইলে তাহা ক্রিয়াবিশেষণ হয়, তাহার সহিত খণ্ড শব্দের মিলন অসঙ্গত। দণ্ডেক, জনেক, মুহূর্ত্তেক, দিশি ইত্যাদি বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত হইলেও, মহাকাব্যে আসনলাভের যোগ্য হয় নাই। সনাথিনী শব্দ নিতান্তই অধিনীর ন্যায় অশুদ্ধ, সুতরাং হাস্যাস্পদ। মধুসূদনের মহাকাব্যে “কলম্বকুল” অম্বর প্রদেশে উড়িত। প্রাণীবাচক শব্দ কুলশব্দ যোগে বহুবচনান্ত হয়; তাহা বিস্মৃত হইয়া মধুসূদন কলম্বকুলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; শশধরের “কলম্বরাশি” সেরূপ না হইলেও প্রশংসার্হ হয় নাই।

(১) “দশানন-শরজালে পড়িল নিমেষে
নর-ঋক্ষ-প্লবঙ্গম অসংখ্য সমরে।”
(২) “কোদণ্ড টঙ্কারি ঘন এড়িলা রাঘব
শরস্রোতঃ, কণ্টকিত করি নভোস্থলী।”
(৩) “অবিরল জ্যা-নির্ঘোষে বধির শ্রবণ।”
(৪) “স্বর্ণ সৌধচূড়াবলী মড়
মড় রবে, পড়িল ছাইয়া পুরী”
(৫) “গভীর মর্ম্মর রব সাগরের মুখে।”

ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এ সকল অনবধানতার দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। যিনি এত বড় মহাকাব্য রচনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি একটু সাবধানে লেখনীচালনা করিলে, এ সকল প্রমাদ ঘটিত না। (১) লঙ্কাসমরে রাম লক্ষ্মণ ভিন্ন অন্য নর না থাকায়, প্রতি যুদ্ধে অসংখ্য “নরঋক্ষ প্লবঙ্গম” পতিত হওয়া অসম্ভব কথা। (২) শরস্রোতে নভস্থলী প্লাবিত হইতে পারে, “কণ্টকিত” হওয়া সহজে বোধগম্য হয় না। (৩) অবিরল শব্দ স্থানসূচক, অবিরাম শব্দ কালসূচক। জ্যা-নির্ঘোষে কালের সংস্রব; স্থানের সংস্রব নাই। এখানে অবিরাম শব্দ বাঁচিয়া থাকিতে, তাহার কার্য্যে অবিরল শব্দকে নিযুক্ত করা অসঙ্গত। (৪) স্বর্ণ সৌধচূড়াবলী হয় স্বর্ণ সৌধের চূড়া, নতুবা সৌধের স্বর্ণ চূড়া;—উভয় অর্থেই তাহা স্বর্ণনির্ম্মিত। তাহা বংশ বা কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িবে কেন? (৫) সাগরের মর্ম্মর রব অপ্রসিদ্ধ। এই সকল অনবধানতার ন্যায় অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগের চেষ্টাও দোষ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। একস্থলে সেরূপ দোষে একটী ছত্রের অর্থগ্রহণ করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়।

“কর্কটী স্ফুটিত যথা অর্ককরাঘাতে।”

রাঘববিজয় কাব্যে যে রচনাশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, ত্রিদিববিজয় কাব্যে তাহার পূর্ব্বসূচনা লক্ষ্য করিয়া, বঙ্গসাহিত্য শশধর বাবুকে কবিসমাদর প্রদর্শন করিয়াছে। ত্রিদিববিজয়ের সমালোচনায় নব্যভারতসম্পাদক মুক্ত-কণ্ঠে রচনাকৌশলের যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, রাঘব-বিজয়কাব্যে সে প্রশংসা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যের কবিকুঞ্জে এখন রসবিশেষের প্রাবল্য উপস্থিত হইয়া, অধিকাংশ কবিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় নিযুক্ত করিয়াছে। সে সকল কবিতা গীতিকাব্য নামে পরিচিত। তাহাতে ভাব আছে, রস আছে, ঝঙ্কার আছে, অলঙ্কার-বাহুল্য আছে; কিন্তু গাম্ভীর্য্যের অভাবে তাহা নিয়ত তরল তরঙ্গে পাঠকচিত্ত আন্দোলিত করিতেছে। কেহ কেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার এই রচনারুচি পরিবর্ত্তিত করিবার আশায়, সেই ছন্দে, সেই তালে, সেই সুরে, অন্যান্য রসের অবতারণা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র কবিতায় রসের অবতারণা সফল হইলেও, চরিত্রচিত্রাঙ্কনের অবসর নিতান্ত অল্প। তাহা কবিতামাত্র,—কাব্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা হইতে বহুদূরে পড়িয়া রহিতেছে। সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাই কাব্য নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং কাব্যে আখ্যায়িকা রচনার চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে নিরস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শশধর বাবু তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া আবার সেকালের পুরাতন কাহিনী ও পুরাতন সৌন্দর্য্য নবীন সাহিত্যসমাজে উপনীত করিতেছেন। কিন্তু কালধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রবল। তজ্জন্য শশধরবাবুর কাব্য-কাহিনী পুরাতন হইলেও, তন্মধ্যে নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন চরিত্রাদর্শের অভাব নাই। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালা কাব্য জন্মগ্রহণ করিতেছে না; যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই বর্ণ-শঙ্কর। কোন কাব্যে বিলাতী পাত্রপাত্রী দেশীয় ধুতিচাদরে সুসজ্জিত, কোন কাব্যে দেশীয় পাত্রপাত্রী বিলাতী হ্যাট কোটে অলংকৃত। তজ্জন্য প্রকৃত নৈসর্গিক

সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বিদেশীয় কাব্যোক্ত কাল্পনিক সৌন্দর্য্যই বঙ্গসাহিত্যে সমধিক সমাদর লাভ করিতেছে। এখনকার কবিকুঞ্জকাননে বসন্তে তুষার পতিত হয়; পুষ্পোদ্গম অপেক্ষা পাতাবাহারের বাহুল্য ঘটিয়া থাকে; পুরাতন কোকিল ও ভ্রমর হাজির থাকিলেও, বিলাতী প্রথায় কর্ত্তব্যপালন করে। সে কালের কাব্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এরূপ ধীরে ধীরে বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। এ সময়ে কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া শশধর বাবুও অনেকস্থলে বিলাতী আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। “অশ্বপদ লৌহসম” ব্যূহ রচনায় কোন সামরিক কৃতিত্ব আছে কি না, তাহা খাঁটি বাঙ্গালীর অজ্ঞাত; সুতরাং এরূপ বর্ণনা সকলের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। ইহার প্রত্যেক শব্দ বাঙ্গালা হইলেও, কথা ও তাহার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ বিলাতী।

পাশ্চাত্য প্রভাব প্রথমে চিন্তা ও পরে রচনাকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করিয়া থাকে। তজ্জন্য আধুনিক কাব্য হইতে পাশ্চাত্য প্রভাব সর্ব্বোতোভাবে দূর করা অসম্ভব। তথাপি রাঘববিজয় কাব্যের অধিকাংশ রচনা দেশীয় প্রভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। শশধর বাবুর কাব্যরচনার আরম্ভেই যে প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সুপরিচালিত হইলে, সুধাধারা প্রবাহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতী, কল্পনা ও প্রতিভা “তিনে এক হইয়া” কবির প্রার্থনা পূর্ণ করুন্।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রার্থনা।

পিতঃ!
কিবা আছে কহিবার আসিয়াছি শতবার
শত কথা ল’য়ে,
কব’না কোনও কথা আজ শুধু মর্ম্মব্যথা
আনিয়াছি ব’য়ে।
যা’কিছু করেছি আমি হে প্রভু নিখিলস্বামী!
জান তুমি সব,
দেহ জ্বালি হৃদিতলে অনুতাপ দাবানলে
চির-অভিনব।
পুড়ে যাক দেহ মন, প্রবৃত্তির প্রিয়ধন
রম্য ক্রীড়া ভূমি,
শক্তির জীবন শেষ হোক আজি, হৃদয়েশ!
কৃপা কর তুমি।
মোহ পাপে জর জর, প্রতি পলে মর মর
চির-মৃত্যু দাও,
ভস্মে পরিণত করি ওগো দয়াময় হরি!
বিপদ ঘুচাও।
বাঁচিলে করিব পাপ আর তা’তে মনস্তাপ
নাহি যদি আসে,
পুষিব গো মিছে কেন জীবনের আশা হেন
হৃদয়ের পাশে!
হয় চির-অগ্নি জ্বালি সু বিশুদ্ধ কর খালি
চির দিন তরে
নহিলে চাহিনা প্রাণ তব অযাচিত দান
অকর্ম্মার পরে!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

সপত্নী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিপুরের জমিদার, আমাদিগের সুপরিচিত রত্নেশ্বর বাবুর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় বাস করেন। চোরবাগানে এক নিন্দিত পল্লীর মধ্যে তাঁহার বাস। পাছে সুরুচিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান মহাত্মারা বিরক্ত হন, এই ভয়ে নিরতিশয় সঙ্কোচ সহকারে বলিতে হইতেছে যে, কার্ত্তিকবাবু একাকী থাকেন না; তাঁহার সঙ্গে তাঁহার উপপত্নী কিরণবালাও থাকেন।

বড় নিন্দনীয় ও কুৎসিত বিষয়ের অবতারণা করিতে হইল; কিন্তু এ সংসারে পুণ্যের অপেক্ষা পাপের আধিক্য, ন্যায়ের অপেক্ষা অন্যায়ের প্রাচুর্য্য এবং চরিত্রবানের অপেক্ষা চরিত্রহীনেরই প্রাধান্য। ঘটনার পূর্ণচিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক উভয়েরই প্রয়োজন উপস্থিত হয়। লোক নির্ব্বাচন করিয়া ঘটনার সমাবেশ করিতে হইলে, আখ্যান অপূর্ণ হয়। আমরা কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে লইব? দুষ্কর্ম্মান্বিতের চরিত্র সম্মুখে আসিলেই যে সর্ব্বনাশ হয়, এরূপ আমরা মনে করি না; বরং অনেক সময় পাপীর চিত্র অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়া, আমরা উপলব্ধি করি। অন্ধকার আছে বলিয়াই, আলোক পরিস্ফুট হয়। পাপ পাশাপাশি চলে বলিয়া, পুণ্যের মাহাত্ম্য আমরা প্রণিধান করি। অসত্যের সহিত সংঘর্ষ হয় বলিয়া, আমরা সত্যের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারি।

অতএব পাপের চিত্রদর্শনে পাপ হয়, অথবা হৃদয়ে দুর্নীতির উদ্রেক হয়, অথবা সুরুচির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, এরূপ আমরা মনে করি না। যাঁহাদিগের সঙ্কল্প শিথিলমূল, যাঁহাদিগের শিক্ষা ভিত্তিহীন, যাঁহাদিগের জ্ঞান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, যাঁহাদিগের দৃঢ়তা কেবল দুর্ব্বলতার নামান্তর, তাঁহারা হয়ত গ্রন্থাদিতে কোন কুচিত্র দেখিলে, কোন কিন্নরকণ্ঠী বিলাসিনীর সঙ্গীতালাপ শ্রবণ করিলে অথবা পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকার বাতায়নে কোন বারনারীর বদনমণ্ডল দর্শন করিলে, সুরুচিসম্মত ন্যায়মার্গ পরিত্যাগ করিয়া পাপের স্রোতে গা ভাসাইতে ভাসাইতে, অধঃপাতে যাইতে পারেন। তাদৃশ দুর্ব্বলচিত্ত হীনস্বভাব জ্ঞানহীন, মহাপুরুষগণকে সুরুচির লৌহপেটিকায় নিবদ্ধ করিয়া রাখাই সঙ্গত। কর্ম্মময় সংসারক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া, তাঁহাদিগকে লোকলোচনের অন্তরালে রক্ষা করাই সৎপরামর্শ।

পাপীর চিত্রাঙ্কন সময়ে সময়ে আবশ্যক হয় বলিয়া, কদাপি তাহা লালসাবর্দ্ধক ও মোহময়ভাবে অঙ্কিত করা বিধেয় নহে। যে চিত্রদর্শনে হৃদয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করে, চিত্তকে সৎপথের পরিপন্থি হইতে উপদেশ দেয় মনকে নিন্দিত আসক্তির কল্পনায় প্রমত্ত করে, তাহা নিশ্চয়ই ঘৃণার্হ ও পরিবর্জ্জনীয়। যে পাপের চিত্রদর্শনে অন্তরে অধর্ম্মের প্রতি স্থায়ী বিদ্বেষভাব অঙ্কিত হয়, এবং সাধুগণসেবিত সৎপন্থাপরিভ্রষ্ট হইতে কদাপি প্রবৃত্তি না হয়, তাহা সুরুচির বিরোধী হইলেও চিরসমাদৃত ও পরম স্পৃহনীয়। কবিগুরু সেক্সপিয়র "মেক্বেথ" নাটকে অতিথিও প্রভুহত্যার লোমহর্ষণ পাপচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উক্ত মহাকবি "হ্যামলেট" নাটকে পতিপ্রাণহন্ত্রী ব্যভিচারিণী রাজমহিষীর আলেখ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

নাম করিয়া দেখাইতে হইলে বোধ হয়, এক গ্রন্থের প্রয়োজন হইবে। আমাদের রামায়ণ মহাভারতে পাপচিত্রের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেই সকল প্রতিকৃতি দর্শনে অধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি লোকের বিজাতীয় বিদ্বেষভাব জন্মিয়া থাকে। পাপকে বীভৎস ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

যাঁহারা চিত্রশিল্পের অনুরাগী, তাঁহারা জানিলেও জানিতে পারেন, চিত্রবিদ্যার চরমোৎকর্ষস্থল ইটালী দেশে ডোমিনিক বেসিয়ানো নামে এক সুবিখ্যাত শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল; সেই মহাশয়, "যুম্যান্ টেকেন ইন্ এডেল্টারি" নামে এক ব্যাভিচারিণী-নারীর চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছিলেন। লেখনী অতি কষ্টেও যে ভাব ব্যক্ত করিতে পারিত না, শিল্পীর তুলিকা অতি

সুন্দররূপে তাহা দেখাইয়াছে। সেই নারীর তদানীন্তন অবস্থার আলেখ্য দেখিলে হৃৎকম্প হয়, এবং শরীর শিহরিয়া উঠে। চিত্র যেরূপই হউক, তাহা মনুষ্যমনে কোন্ ভাবে আঘাত করিবে, তাহাই বিচার করিয়া দেখা উচিত।

কবি বলিয়াছেন,—"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পে'লেও পাইতে পার লুকান রতন।" বাস্তবিক অতি হেয় ও ঘৃণাজনক পদার্থের মধ্যেও সময়ে সময়ে অতি সারবান ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিহিত থাকে। পঙ্কিল তড়াগে পরম শোভাময় শতদলের উৎপত্তি হয়, তিমিরাবৃত পূতিগন্ধপূর্ণ খনিমধ্যে মণি-মাণিক্যের উদ্ভব হয়, বিলাসিনী নরনারীর গর্ভে জগৎপ্রসিদ্ধা শকুন্তলার জন্ম হইয়াছিল। এ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন মন্দ কিছুই নাই। কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে পাপ হয়। ন্যায়ময় ভগবান সকল পদার্থেই উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সন্নিবেশ করিয়াছেন। নিপাতকারী সর্পের গরলও কখন কখন জীবন রক্ষার সহায় হয়।

পাপচিত্র লোক শিক্ষার অনেক স্থলে প্রকৃষ্ট সহায়। যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়া বা আলেখ্য দর্শন করিয়া মনুষ্য সাবধানে চলিতে শিক্ষা করে, এবং ভাবি পরিণাম স্মরণ করিয়া আপনার পথ ঠিক করিয়া লয়, তৎসমস্ত বড়ই প্রয়োজনীয় ও হিতকর। পাপের চিত্র আসিতেছে দেখিয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন ও বেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং উপহাসের পাত্র।

অতি শৈশবেই কার্ত্তিক পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন, তখনও রত্নেশ্বর বাবুর দুহিতা হেমলতার জন্ম হয় নাই। রত্নেশ্বর বাবুর পত্নী গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় যত্নে কার্ত্তিককে লালন পালন করেন। কর্ত্তা বুঝিয়াছিলেন, এই সন্তান হয়ত কালে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। গৃহিনী বুঝিয়াছিলেন, মরনান্তে এই সন্তান হইতে তাঁহাদের জলপিণ্ড প্রাপ্তির উপায় হইবে।

বালক বড়ই দুরন্ত ও অনাবিষ্ট; লেখাপড়ায় কার্ত্তিকের কোন মতেই অনুরাগ জন্মিল না। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে ও স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে কার্ত্তিকের ভাল লাগিল। কুসঙ্গী আসিয়া ঘেড়িয়া ফেলিল। যখন কার্ত্তিকের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ, তখন হইতেই সুরাপানে তিনি অভ্যস্ত হইলেন, এই সময়ে হেমলতার জন্ম হইল।

কার্ত্তিকের প্রতি রত্নেশ্বর বাবুর আদর ও যত্ন কোন দিনই বেশী ছিল না। যাহা ছিল, হেমলতার জন্মের পর তাহাও কমিয়া গেল। দুর্ব্বৃত্ত বালক, পিতৃব্যের শাসন ও তত্ত্বাবধান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া খুব বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। অর্থের প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হইতে লাগিল, অভিভাবক রত্নেশ্বর বাবু একটী পয়সাও দিতে কাটকবুল। খুড়ীমা, লুকাইয়া টাকা কড়ি দেন বটে, কিন্তু তাহাতে আর চলে না। খুড়া ভাইপোয় অবশেষে মনান্তর দাঁড়াইল। খুড়ার টানাটানি, ভাইপোর বাড়াবাড়ি। কাজেই একটা নিষ্পত্তির প্রয়োজন হইল।

স্থির হইল যে নগদ দশহাজার টাকা এবং যাবজ্জীবন মাসিক দুই শত টাকা হিসাবে লইয়া, কার্ত্তিক বাবু পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির উপর সমস্ত দাবী দাওয়া পরিত্যাগ করিবেন। ষোল আনা সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালীক হইয়া রত্নেশ্বর মনে মনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। একটী পয়সার নিমিত্ত খুড়া খুড়ীর নিকট ভিক্ষার্থীরূপে দণ্ডায়মান হইবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া কার্ত্তিক পরমানন্দিত হইলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই রীতিমত লেখাপড়া শেষ হইয়া গেল। দশ হাজার টাকা বুঝিয়া লইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র জন্মভবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার খুড়ীমাতা একটু অশ্রুপাত করিলেন। ত্বরায় ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন, যখন যেথানে থাকেন, সেথান হইতে পত্র লিখিবার জন্য মাথার দিব্য দিলেন। হেমলতার বয়স তখন ছয় বৎসর। কার্ত্তিক তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাহার নিকট বিদায় লইবার সময় কার্ত্তিকের হৃদয় একটু আলোড়িত হইল।

গৃহত্যাগ করিয়া কার্ত্তিক নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। তিনি কুসঙ্গে মিশিয়া কুপথেই চলিতে লাগিলেন। পশ্চিমের অনেক স্থানে তিনি বেড়াইলেন। তাঁহার রূপের সীমা ছিল না। পুরুষের এরূপ পুরুষোচিত শ্রী বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। দেহের বর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন পরিপাটী, আকার প্রকার সকলই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার কার্ত্তিক নাম সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার দোষ যথেষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু গুণও যে ছিল না

এমন নহে। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, শরীরে অসুরের ন্যায় বল ছিল, এবং পরোপকারসাধনে উৎসাহ ছিল। সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, দেখিলে তিনি শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়া, প্রথমোক্তকে উৎপীড়িত করিতেন। কেহ কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করিতেছে দেখিলে তিনি অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন।

এই সকল কারণে, তিনি যেখানে যাইতেন, অল্পকালেই সেখানে পরিচিত হইয়া উঠিতেন। পশ্চিমের নানা স্থানে তাঁহার অনেক বন্ধু হইল। তিন চারি বৎসর এইরূপে দেশে দেশে ঘুরিয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন। যখন কলিকাতায় আসিলেন, বলা বাহুল্য তখন পিতৃব্যপ্রদত্ত দশ হাজার টাকার একটী পয়সাও তাঁহার হাতে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার ন্যায় বহু বিবিধ শ্রেণীর লোকপূর্ণ মহানগরে, কার্ত্তিকের মত উচ্ছৃঙ্খল লোকের অনেক সঙ্গী জুটিতে বিলম্ব হইল না। অতি অল্প কালের মধ্যেই কার্ত্তিক অনেকের পরিচিত হইলেন। নানারূপ গণ্ডগোলে দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু হাতী সহসা বাঁধা পড়িল। দুরন্ত শার্দ্দুল অজ্ঞাতসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। যে এত কাল পর্য্যন্ত কখন কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে চালাইবার নিমিত্ত অলৌকিক শক্তিশালিনী এক যাদুকরী রঙ্গভূমিতে দেখা দিল। কিরণবালার সহিত দুর্দ্দান্ত সুরাপায়ী ও যথেচ্ছচারী কার্ত্তিকের পরিচয় হইল। তাঁহার জীবনপ্রবাহের গতি এখন হইতে ভিন্ন পথে চলিতে লাগিল।

কিরণবালা তখন অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী। সে সুন্দরী বটে কিন্তু তাহার রূপে বিশেষ কোন অসাধারণত্ব বা চমৎকারীত্ব নাই। সে অতি কৃশকায়া, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, মৃদুভাষিনী এবং বুদ্ধিমতী। কোন্ মন্ত্রে সে কার্ত্তিককে বশ করিল, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু তিনি যে অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে তাহার ইচ্ছাধীন হইয়া পড়িলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই নারীকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া, কার্ত্তিককে গৃহস্থালী পাতিতে হইল। তিন বৎসর হইল তাঁহারা চোরবাগানে বাস করিতেছেন। কার্ত্তিক এখনও সুরাপান করেন বটে, কিন্তু কিরণের বিনা অনুমতিতে যখন তখন খাওয়া আর চলে না। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুগণ তাঁহার বাটীতে আইসেন বটে; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহিত হো হো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইতে পান না। দুই শত টাকা মাসিক আয়ে কার্ত্তিকের দশ দিনও চলিত না, এখন সেই টাকায় স্বচ্ছল ভাবে মাস কাটিয়া কিছু কিছু বাঁচিয়া যায়। সর্ব্ব বিষয়ে আপনার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া কার্ত্তিক এখন সুখী হইয়াছেন। ভালবাসার মদিরায় তাঁহার প্রাণে অনন্ত সুখের উৎস ফুটাইয়া দিয়াছে। এক স্থানের প্রণয়ের চির সঞ্চিত রত্ন ভাণ্ডার উৎসর্গ করিয়া, তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। যাহা কখন তিনি পান নাই ও ভোগ করেন নাই এখন পূর্ণ মাত্রায় তাহার অধিকারী হইয়াছেন।

বেলা তিনটা। শীতকাল চোরবাগানের বাজারে একটি সুসজ্জিত কক্ষে, কার্ত্তিক একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার পরিধানে সূক্ষ্ম কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে একটি লংক্লথের সার্ট, পায়ে এক জোড়া কাল মোজা, একখানি সুচিক্কণ আলোয়ানে দেহের ভূরিভাগ আচ্ছাদিত। একটি তাকিয়ায় বাম বাহুতে ভর দিয়া তিনি বসিয়া আছেন, আর একটি তাকিয়ার উপর তাঁহার দক্ষিণ চরণ ন্যস্ত রহিয়াছে, সম্মুখে একটি গড়গড়ায় তামাকু তৈয়ার রহিয়াছে, কার্ত্তিক তাহা টানিতেছেন না, পার্শ্বে একখানি রেকাবে কতকগুলি পানের খিলি রহিয়াছে কার্ত্তিক তাহারও সম্মান করিতেছেন না।

কার্ত্তিক যেন একটু চিন্তাকুল। শোনিত সম্পর্কে এ সংসারে যাহারা আপনার লোক, বহুদিন হইতে তাহাদের সহিত আর কোন সম্বন্ধ নাই। মাসে মাসে নিয়মিতরূপে টাকা আসে বটে; কিন্তু তাহার সহিত কোন সংবাদ থাকে না। খুড়া মহাশয় বড়ই অহঙ্কৃত, সার্থপর এবং কটুভাষী লোক, তথাপি তিনি খুড়া, তাঁহার খোঁজ খবর না লওয়া, কার্ত্তিক অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন। আর খুড়ী মা—সেই ঠাণ্ডা স্নেহময়ী ঠিক মায়ের মত খুড়ী মা! কত করিয়া তিনি, পত্র লিখিতে বলিয়াছিলেন, একবার দেখা করিতে বলিয়াছিলেন, এতদিনে কিছুই করা হয় নাই। এ কার্য্য পাপ বলিয়া কার্ত্তিকের মনে হইতেছে। আর সেই আদরের সোহাগের সোণার পুতুলি হেমলতা? দাদা বলিয়া, সে তাহার সঙ্গে কতই খেলা করিত। তাহাকে ভুলিয়া থাকা বড়ই হৃদয়হীনের কার্য্য বলিয়া কার্ত্তিকের মনে হইতেছে। এতদিনে নিশ্চয়ই হেমলতার বিবাহ হইয়াছে। কোথায় বিবাহ হইয়াছে, সে সুখী হইয়াছে কি না, কিছুই তিনি জানেন না। রকম দেখিয়া অনেকে বলিত, কার্ত্তিকও বুঝিতেন, সে তাহার খুড়া মহাশয়ের ধারা পাইবে; জননীর মত তাহার প্রকৃতি হইবে না। বোধ হয় এতদিনে তাহার সন্তানাদি হইয়া থাকিবে। কার্ত্তিক সেই সন্তানাদির নাম! একবার তাহাদের চক্ষুর দেখাও তিনি দেখিলেন না! কার্ত্তিক ভাবিতেছেন, হরিপুর যাইব কি? যাওয়া উচিৎ। কিন্তু খুড়া মহাশয়ের মুখ মনে হইলে, যাইতে ইচ্ছা হয় না; ভয় হয়। তথাপি যাওয়া উচিৎ। কিরুকে ফেলিয়া যাই কিরূপে। একমুহূর্ত্ত যে কাছে না থাকিলে কষ্ট হয়, তাহাকে ফেলিয়া, দশ দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে পারিব না।

কার্ত্তিকের চিত্তে আত্মীয়গণের নিমিত্ত অনুরাগ, সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে ব্যক্তি কাহাকেও ভালবাসিতে শিখে, সে সকলকেই ভাল বাসিতে পারে। প্রেমের অমৃতবিন্দু হৃদয়ে সঞ্চিত হইলে, ক্রমে অমিতপরিমাণে বাড়িতে পারে, এবং সেই স্থান হইতে সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া বসুন্ধরা প্লাবিত করিতে পারে। প্রেমের কলঙ্ককালিমা গায়ে মাখিয়া, ধরাতলে অনেকেই ধন্য হইয়াছেন। এই প্রেমের দায়ে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ, কৌপীনকরঙ্কধারী সন্ন্যাসী হইয়াছেন; এই প্রেমের কলঙ্কসাগরে ডুবিয়া শ্রীকৃষ্ণশ্রীরাধিকা পরম পূজনীয় হইয়াছেন, এই কলঙ্কের পসরা মাথায় বহিয়া সাধুশিরোমণি বিল্বমঙ্গল এবং চিন্তামণি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এই কলঙ্কসাগরে গা ভাসাইয়া অনেক মহাজন ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই প্রেম স্বর্গের সম্পত্তি। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ মানব ইহার কণিকা মাত্র লাভ করে। যে পায়, সে অনন্ত সুখ ভোগ করে এবং জগতে আনন্দ বিলাইতে থাকে।

বারান্দায় পাঁই জোড়ের মধুর নিক্কণ। ঘুমের ভান করিয়া কার্ত্তিক বালিসে মাথা দিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। ধীরে ধীরে মুখড় ও অধীর মুঞ্জিরের ধ্বনি উৎপাদন করিতে করিতে কিরণবালা, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার অঙ্গে অধিক অলঙ্কার নাই। যাহা আছে তাহাতে তাহাকে বেশ মানাইয়াছে। সে আসিয়া দেখিল, কার্ত্তিক চোক্ বুজিয়া পড়িয়া আছেন। বলিল,—"ঘুমাইতেছ বুঝি! এমন আজ্ঞাকারী ঘুম কখন দেখি নাই।"

সে নিকটস্থ হইয়া অঞ্চলবস্ত্রের প্রান্তভাগ পাকাইয়া কার্ত্তিকের নাকে দিতে গেল। কার্ত্তিক "আঃ আঃ" করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিরণ বলিল,—"তুমি কখন ঘুমাও নাই। আমার আসিতে একটু দেরি হইয়াছে, তাই বুঝি দুষ্টামি করিতেছ।"

কিরণ সেই সূক্ষ্ম বস্ত্রাগ্র কার্ত্তিকের কাণে প্রবেশ করাইয়া দিল, অগত্যা কার্ত্তিককে নয়ন মেলিতে হইল। এবং হাঁসিয়া ফেলিতে হইল! বলিলেন,—"ঘুমের কথা তুলিয়াছ, আজি হইতে রাত্রিতে আর মোটেই ঘুমান হইবে না।"

কিরণ বলিল,—"কেন?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"কাল্‌রাত্রে আমাকে ফেলিয়া, তুমি কোথায় গিয়াছিলে, বল দেখি?"

হাসিতে হাসিতে কিরণ বলিল,—"জহর বাবুর বৈঠকখানায়।"

"আঃ ঠাট্টা রাখ! আসল কথাটা কি বল?"

কিরণ বলিল,—"ঠিক বলিতেছি, মণিবাবুর বাগানে।"

"মিছা কথা কেন বলিতেছ, ঠিক কথা বল না?

কিরণ বলিল,—"আর লুকাইব না ঠিক বলিতেছি, হরিশ বাবুর বজরায়।"

তখন কার্ত্তিক বলিল,—"তবু মিথ্যা কথা। কিল খাইবার জন্য পিঠ সুরসুর করিতেছে বুঝি?"

মুখ গম্ভীর করিয়া কিরণ বলিল,—"মা'র খাইতে হইবে, কাজেই সত্য কথা এবার বলিতেই হইতেছে।" "গোপালবাবু কোন মতেই ছাড়িলেন না। কাজেই তাঁহার সহিত থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম।"

তখন কার্ত্তিক উঠিয়া আদরের সহিত কিরণের পিঠে দুইটী কিল্ মারিলেন। বলিলেন,—"ক্রমেই তোমার

দুষ্টামি বাড়িতেছে। এইবার আমিও দুষ্টামি শিখিব। তোমাকে জব্দ করিতে পারি কিনা দেখিব।”

সিঁড়িতে ধপাস ধপাস করিয়া জুতার শব্দ হইতে লাগিল। কার্ত্তিক বলিলেন,—“নিশ্চয়ই মাণিকলাল। এমন মিঠা পায়ের আওয়াজ আর কাহার। মাটির গায়ে ঠেকিতেছে কি না সন্দেহ।”

তখন নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে মাণিকলাল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কেশরাশি অবিন্যস্ত, বদন চিন্তাযুক্ত, এবং ভাবভঙ্গি ব্যস্ততাপূর্ণ। আসন গ্রহণ করার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, “পেঁচো কোথায়? সে বেটাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছি না, তোমাদের এখানে নাই?”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“না। বড় সখের জিনিষ ভাবিয়া কিরু তাহাকে কোন গ্লাস্‌কেসে তুলিয়া রাখেন নাই, বড় দামি জিনিষ ভাবিয়া কোন বাক্সের মধ্যেই তাহাকে রাখা হয় নাই, ইচ্ছা হয় চাবি লইয়া খুলিয়া দেখিতে পার। ব’স! হইয়াছে কি? এত ব্যাস্ত কেন?”

মাণিকলাল বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—“পেঁচো বেটা আমার মাথা খাইয়াছে। তাহাকে যেমন বিশ্বাস করিতাম, সে আমার তেমনি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না।”

কিরণ বলিল,—“কি করিয়াছে সে?”

মাণিক বলিল,—“যাহা হইয়াছে, তাহা তোমাদের কাছে আগে বলা উচিত ছিল; যখন আগে বলা হয় নাই, তখন আর বলিবার দরকার দেখিতেছি না।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“বুঝিয়াছি, একটা বেজায় বেয়াদবি করিয়া ফেলিয়াছ! আগে বলিতে সাহস কর নাই, এখনও বলিতে সাহস হইতেছে না।”

মাণিকলাল বলিল,—“এক রকম ঠিক কথাই বলিতেছ; একটা বেহদ্দ বেয়াদবি করিয়াছি; সময় পাইলে তাই তোমাদের জানাইতাম এখন আর জানাইয়া কোন লাভ নাই।”

কিরণ বলিল,—“লাভ হিসাব করিয়াই কি সকল কাজ করিতে হয়? না হয় লাভ না হইবে, বল না কাণ্ডটা কি?”

মাণিক বলিল,—“একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ হাতে আসিয়াছিল, পেঁচোর হেঁপাজাতে তাহাকে মাথাঘষার গলির বাড়ীতে রাখাইয়াছিলাম; জিনিসটা ভদ্রলোকের পাতে চলে কি না, তাহাও আমি দেখি নাই; এখন দেখিতেছি, পেঁচোও নাই, সে মেয়ে মানুষও নাই।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“ভালই হইয়াছে। কোন গৃহস্থের মেয়ে কোন কারণে আসিয়া পড়িয়াছিল, তোমার দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ হয় নাই; তোমার ঘাড়েও সে পড়ে নাই, ইহাও তো পরম মঙ্গলের কথা; ভগবান যাহা করেন সকলই ভাল। তবে এ জন্য আপসোস্ কেন করিতেছ ভাই?”

মাণিক বলিল,—“ঠিক বলিয়াছ; তবে কথাটা কি জান, মানুষটা আসিয়াছিল আমার কাছে; আমার সহিত একটা মুখের আলাপও হইল না। কোথায় বেহাত হইয়া গেল।”

কিরণ বলিল,—“ক্ষতি কি? হাটে-বাজারে অভাব তো কিছুরই নাই?”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“যদি বেহাত হইয়া থাকে তাহার জন্য তুমি ভাবিয়া মর কেন?”

মাণিক বলিল,—“আমি এখন মানুষটার কি হইল, সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গেল এই ভাবনাই ভাবিতেছি। পেঁচোকে দেখিতে পাইলে একটা সন্ধান পাওয়া যাইত।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“পেঁচো হয় তো কিছু টাকা খাইয়া রামের ধন শ্যামকে দিয়াছে; না বুঝিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিতে বসিয়াছিলে, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। ও কথা যাইতে দেও।”

মাণিক বলিল,—“নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আর কাহারও হাতে গিয়া পড়িয়াছে জানিলে ঠাণ্ডা হইতে পারি; পেঁচোর সন্ধান করিতেই হইবে। তোমরা ব’স, আমি এখন যাই।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“মর গে, চুলোয় যাও।”

মাণিকলাল চলিয়া গেল, কলিকাতায় আসিয়া কার্ত্তিকের যে সকল বন্ধু-বান্ধব জুটিয়াছেন, এই মাণিকলালদে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। মাণিকলাল ধনীর সন্তান, যুবা পুরুষ রূপবান্, কার্ত্তিকের ন্যায় নিতান্ত মূর্খ নহে; কিন্তু চরিত্রহীন ও ইন্দ্রিয়াশক্ত। মণিকলাল প্রতিদিন

কার্ত্তিকের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারে না; কার্ত্তিককে সহোদর ভাইয়ের মত ভালবাসে, তাহার বিষয় কর্ম্ম সংক্রান্ত কোন ব্যাপারই কার্ত্তিকের পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। পারিবারিক সকল কথাই সে কার্ত্তিককে জানায়; মাণিকলাল অপব্যয়ী, এবং তজ্জন্য ঋণগ্রস্ত, সম্প্রতি দশ হাজার টাকা ঋণ না করিলে তাহার চলিতেছে না। কার্ত্তিকের উপর অর্থ সংগ্রহের ভার দিয়া মাণিকলাল নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যেরূপ ভাবনা করা যায়, অনেক সময় তাহারই অনুকূল ঘটনা আসিয়া সহসা উপস্থিত হয়। কবি বলিয়াছেন,—“আগতপ্রায় ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই ছায়াপাত করে।” বাস্তবিক মনোমধ্যে যখন যেরূপ প্রগাঢ় চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন সেইরূপ ঘটনাপুঞ্জ মিলিত হইয়া চিন্তার সহায়তা করে। “যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” এই মহাজন বাক্যের সত্যতা অনেক সময় উপলব্ধি হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক বাবু শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পিতৃব্য রত্নেশ্বর বাবু সপরিবারে কলিকাতা আসিয়াছেন, এবং বহুবাজারে বাসা করিয়াছেন। মনে বড় আহ্লাদ হইল, আবার খুড়িমার চরণে প্রণাম করিবার সহজ উপায় হইল, হেমলতাকে বহুদিন পরে আবার দেখিবার সুযোগ হইল। অদ্যই দেখা করিতে যাইতে হইবে। খুড়ামহাশয় হয় তো ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া সুখী হইবেন না। কার্ত্তিক ভাবিলেন, না হন, না হইবেন, তথাপি দেখা করিতে যাইতেই হইবে। কার্ত্তিক তাঁহার কোন ক্ষতি করেন নাই, তিনি যে বিষয়ের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, কার্ত্তিক স্বেচ্ছাক্রমে তাহাতেই সম্মত হইয়াছেন।

সেই জন্য তিনি কখনও একটিও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই, এখনও করিতেছেন না। তবে রত্নেশ্বর বাবু অসুখী হইবেন কেন?

সেই দিন বৈকালে কিরণ বার বার বিরক্ত করিয়া কার্ত্তিককে বহুবাজার পাঠাইয়া দিল। কার্ত্তিক দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ড বাটীতে বহু দাস-দাসী দ্বারবানাদি লইয়া, তিন দিন পূর্ব্বে রত্নেশ্বর বাবু শুভাগমন করিয়াছেন। নবাগমনের বিশৃঙ্খলা এখনও অপগত হয় নাই। এখনও বারান্দার একদিকে একটি প্রকাণ্ড সতরঞ্চির মোট রহিয়াছে, এখনও উঠানের এক পার্শ্বে দুইটি দেবদারু কাষ্ঠের বাক্স পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও অন্যদিকের বারান্দায় তিনটা ষ্টিল ট্রাঙ্ক, এখনও পার্শ্বের ঘরে কতকগুলি বিছানা বালিশ স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। খুড়া মহাশয়ের সম্মুখীন হইতে কার্ত্তিকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল; তথাপি তিনি দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে রত্নেশ্বর বাবুর অধিকৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বহুদিন পরে খুড়া ভাইপোর মিলন হইল। কার্ত্তিক বিনীত নম্রভাবে পিতৃব্য-চরণে প্রণাম করিলেন, রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন,—“কে হে! কার্ত্তিক যে! এতদিন কোথায় ছিলে? আছ ত ভাল?”

কার্ত্তিক সবিনয়ে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, রত্নেশ্বর বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তখন তিনি খুড়ীমার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। রত্নেশ্বর বাবু তাঁহাকে অন্তঃপুরে গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

খুড়ীমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কার্ত্তিকের প্রাণ বড়ই শীতল হইল। সেই খুড়ীমা, সেই স্নেহময়ী খুড়ীমা এতদিন পরে যেন স্নেহের মাত্রা অনেক বাড়াইয়াছেন। কার্ত্তিককে দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুখের দুঃখের কত কথাই তিনি বলিতে লাগিলেন। এ কয়বৎসর মধ্যে কার্ত্তিকের জীবন যে ভাবে কাটিয়াছে তাহাও বলিতে হইল; কিন্তু পনর আনা কথা তাঁহাকে চাপিয়া চলিতে হইল। সকলি পাপের কথা, লজ্জার প্রসঙ্গ, খুড়ীমার নিকট তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বর্ত্তমান অবস্থা ও অবস্থানাদি সম্বন্ধে কার্ত্তিক সুস্পষ্টরূপে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। চোরবাগানে তিনি থাকেন, একথাটুকু বলিতেই হইল।

এদিকের অনেক কথা কার্ত্তিক শুনিতে পাইলেন। নরেশ বাবু সংক্রান্ত সকল কথা কার্ত্তিক শুনিলেন। তাঁহার সহিত রত্নেশ্বর বাবু ও হেমলতা ভাল ব্যবহার করেন নাই,

ইহা কার্ত্তিক বুঝিলেন। পলাতক নরেশ বাবুকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিতে ও তাঁহাকে মুঠোর মধ্যে পুড়িয়া রাখিতে, রত্নেশ্বর বাবুর ইচ্ছা হইয়াছে। স্বামীকে জব্দ করিতে এবং মজা দেখিতে, হেমলতার সঙ্কল্প হইয়াছে; প্রধানতঃ এ সকল বাসনাসিদ্ধির নিমিত্ত রত্নেশ্বর বাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন,—আরও ছোটখাট অল্প বিস্তর অনেক কাজ আছে।

কার্ত্তিক বুঝিলেন পূর্ব্বপত্নীর সহিত সকল সম্বন্ধ ছাড়াইয়া ধৃষ্টতা ও সাহসের জন্য যথোচিত দণ্ডদিয়া নরেশকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া রাখাই খুড়ার অভিপ্রায়। স্বামী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পায়ে ধরিবে। ক্রীতদাসের ন্যায় অধীন হইয়া থাকিবে, কোন কার্য্যে কথা কহিবে না বা কোন কার্য্যে বিচার করিবে না, ইহাই হেমলতার অভিপ্রায়। কিন্তু খুড়িমার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত জামাতা সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে, পাপ হইবে, এবং তাহাতে অকল্যাণ ঘটিবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি মনে করেন জামাতার পূর্ব্ব পত্নীকে কন্যার ন্যায় যত্নে এই সংসারে আনিয়া রাখা উচিত এবং যাহাতে তাঁহার চক্ষে জল না পড়ে বা তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস না ফেলেন, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু বাঘের ন্যায় কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট গৃহিনীর মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সাহসে কুলায় না।

হেমলতার সহিত কার্ত্তিকের সাক্ষাৎ হইল। হেমলতা সহজেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। প্রাণভরিয়া আনন্দের সহিত হেমলতা কথা কহিলেন না। পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া, পূর্ব্ববৎ আনন্দ আনয়ন করিবার নিমিত্ত কার্ত্তিক অনেক চেষ্টা করিলেন, সকলি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গাঢ়তা জন্মিল না। সবিস্ময়ে কার্ত্তিক দেখিলেন, স্বামী চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া, হেমলতার বিশেষ উদ্বেগ বা ব্যাকুলতা নাই। তিনি স্বাধীনা; স্বাধীনভাবে কলিকাতায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে তাঁহার অভিলাষ; থিয়েটার দেখা; ঘোড়ার নাচে যাওয়া, গড়ের মাঠে বেড়ান, হাওড়ার পুলের উপর ভ্রমণ, ইত্যাকার বহুবিধ পরামর্শেই তিনি ব্যস্ত। দাদার বাসায় একদিন বেড়াইতে যাইবার নিমিত্ত ভগ্নী বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সে বাসায় ভগ্নীকে লইয়া যাইতে দাদার সাধ্য নাই, কাজেই দাদা, তা না না করিয়া গোল মালে কথাটা চাপিয়া রাখিলেন।

লবঙ্গের সহিত কার্ত্তিকের দেখা হইল। তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, সে যেমনটী ছিল তেমনিটীই আছে। বুঝিতে পারিলেন লবঙ্গের সহিত হেমলতার আত্মীয়তা বড়ই প্রগাঢ় হইয়াছে। উভয়ে যেন একপ্রাণ,—একমন।

খুড়িমার আগ্রহে কার্ত্তিককে জলযোগ করিতে হইল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তুই ঘণ্টা পরে কার্ত্তিক বাবু বাহিরে আসিলেন। কর্ত্তাকে আবার প্রণাম করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। কি সৌভাগ্য! খুড়ামহাশয় ভাইপোকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কলিকাতায় তুমি অনেক দিন আছ কার্ত্তিক। বোধ হয় অনেক লোকের সঙ্গে চেনা শুনা হইয়াছে। শিম্‌লায় না কোথায়, সুরেশ ডাক্তার নামে কে একটা হতভাগা আছে?"

কার্ত্তিক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আছেন বটে? শিম্‌লায় একজন সুরেশ ডাক্তার আছেন। তাঁহাকে কি দরকার আছে?"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"নরেশ নামে এক পাজি ছেলের সহিত হেমলতার বিবাহ দিয়াছি, অতি হতভাগা হাঘরের ছেলে; নিমকহারাম বেটা পলাইয়াছে। শুনিয়াছি সুরেশ ডাক্তারের সহিত তাঁহার খুব আত্মীয়তা। সেখানে খোঁজ করিলে নরেশের সন্ধান হইতে পারে।"

কার্ত্তিক বলিল,—"যে আজ্ঞা! আমি কালই সে সন্ধান করিব।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তুমি বোধ হয় নরেশকে কখন দেখ নাই। তাহাকে চিনিতে তোমার অসুবিধা হইবে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আজ্ঞে না। আলাপ না থাকিলেও আমি খোঁজ করিয়া সন্ধান সকল করিতে পারিব।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তবে চেষ্টা করিও।"

যে আজ্ঞা বলিয়া কার্ত্তিক প্রস্থান করিলেন। তিনি আজ ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার খুড়া মহাশয় তাঁহার সহিত ডাকিয়া কথা কহিয়াছেন, এবং ছোট হোক বড় হোক একটা কাজের ভার দিয়াছেন।

বড় অপ্রসন্ন মনে কার্ত্তিক পিতৃব্যের ভবন পরিত্যাগ করিলেন। নরেশের প্রতি, রত্নেশ্বর বাবুর ভাব তাঁহার

ভাল লাগিল না। হেমলতার স্বাধীনতা স্বামীর জন্য চিন্তা, বিহীনতা অবিরত বিবিধ আমোদ-ভোগের ব্যবস্থা, কার্ত্তিকের পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর হইল। লবঙ্গের সহিত হেমলতার প্রগাঢ় প্রণয় তিনি বড় কুলক্ষণ বলিয়া, মনে করিলেন। খুড়ীমাতার সকল বিষয়ে ক্ষমতার একান্ত অভাব তাঁহার অন্তরে সাতিশয় ক্লেশ উৎপাদন করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ সকল অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যায় না কি? যখন গৃহত্যাগ করিয়াছি, তখন বালক ছিলাম, বুদ্ধি ও ভরসা কম ছিল, এখন মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা না করিলে আমার পাপ হইবে না কি? খুড়া-মহাশয় ধরিয়া প্রহার করিলেও আমি নির্লিপ্তভাবে আর থাকিব না। স্বতঃপরতঃ আপনার লোকদের হিত চেষ্টা আমাকে করিতেই হইবে। ক্রমশঃ—

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

কবিতা গুচ্ছ।

শারদ সন্ধ্যায়।

অনন্তের কোলে পুনঃ একটী বরষ,
বিস্মৃতি—সাগর মাঝে যায় মিশাইয়া,
হাতে ল'য়ে সাজি ভরা নূতন হরষ,
আবার শরৎ আসে হাসিয়া হাসিয়া॥
চঞ্চল প্রবাসী চিত ছুটে ছুটে যায়,
দূর গ্রাম প্রান্তে সেই ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গনে—।
সায়াহ্নের সুশীতল মধুর মলয়,
অতীতের সুখস্মৃতি টেনে আনে প্রাণে॥
স্নেহময় জনকের মধুর বচন
হাসিভরা কচি মুখ ভাই ভগিনীর
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ সম্ভাষণ
প্রেমফুল্ল আঁখি দুটী প্রাণ প্রেয়সীর
মনে পড়ে—তাই ওগো প্রাণ ছুটে যায়—
আকুল উচ্ছ্বাসে আজি শারদ সন্ধ্যায়।

শ্রী প্রমথ নাথ সান্যাল—

সম্বল।

পেয়েছিনু এ জীবনে যে কয়টি দিন,
হাসি মাখা শৈশবের বেদনা বিহীন;—
হয়ে রবে চিরকাল তাহাই কেবল,
অশ্রুসিক্ত জীবনের সুখের সম্বল!

শূন্য গৃহ।

এত দিন সখা মোর এই ক্ষুদ্র ঘরে
প্রপূরিতছিল যার মধু কল স্বরে,
সেত আজ চলে গেছে নাহি আর কেহ,
শূন্য মোর বসুন্ধরা, শূন্য মোর গেহ॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মন্দার কলি।

মন্দার কুসুম-কলি মরত মাঝারে ভুলি
এসেছিল নিরজনে সাঁঝের সময়
শত আশা বুকে ধরে, সোহাগ আদর ক'রে
দিয়াছিল তরু তারে যতনে আশ্রয়।
শিশির মুকুতা-ভাতি বরষি সারাটী রাতি,
তুষেছিল স্নিগ্ধতায় ক্ষুদ্র হিয়া তার;
মৃদুল পবন ধীরি বহি কত ঝিরি ঝিরি
এনেছিল তার তরে মাধুরীর ভার;
শারদ জ্যোছনা-বীথি তরঙ্গি শ্যামার গীতি,
ঘোষেছিল স্তব্ধ বিশ্বে আগমন কথা;
তটিনীর কুল কুল —হরষে নাহিক তুল—
বলেছিল মরমের অস্ফুট বারতা।
নীরব ধরায় চুপে সারা নিশি এইরূপে
বহে গেল পুলকের উদ্দীপন-ধারা,
প্রভাতে তরুণ রবি প্রকৃতির দীপ্ত ছবি
উঠিল গগনে যেন গর্ব্বে মাতোয়ারা।
শুকাল মন্দার-কলি, সুষমা গেল গো চলি,
রহিল পড়িয়া সুধু শুষ্ক বৃন্ত তার;
কোমল নির্ম্মাণ যার কাঠিন্য সহে না তার;
পড়িল কি মূর্চ্ছি তাই আতপে মন্দার?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চৌধুরী।

নিয়তি।

কেন মন! হইতেছ এতই বিকল,
উদাস—আপনাহারা বিরহীর মত,
ভাবিতেছ এ জীবন হ'লরে বিফল,
সৌভাগ্য-ভাস্কর তব চির অস্তগত!
বৃথা এ সাধনা মন! সকলি নিয়তি,
নিয়তির কর্ম্ম-সূত্রে বাঁধা এ জীবন,
কি সাধ্য মানব-শক্তি রোধে তার গতি?
নিয়তি-শাসনে জীব চলে অনুক্ষণ!
কিবা এক সুনিয়ম—বিধাতৃ-বিধান—
পূর্ব্ব জন্ম-কর্ম্মাধীন নিয়তি আবার;
যেরূপ ক'রেছ তুমি কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
এ জীবনে ফল-ভোগ-তেমনি তোমার।
হতাশ হ'ওনা প্রাণে; কে বলিতে পারে
দুঃখ-নিশা অবসানে কি হবে তোমার?
বিধির বিধান মানি চল ধীরে ধীরে,
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হ'ওনারে আর।
আরো বলি মূঢ় মন! ক'রনারে জ্ঞান
নিশার স্বপন এই জীবন কেবল;
সুখে, দুঃখে কর সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান,
ভবিষ্য জীবনে শুধু ইহাই সম্বল।

শ্রীহেমকুমার চৌধুরী।

নীরব প্রণয়।

নিরালা হৃদয়তলে নীরব প্রণয়
পাতাঢাকা ফুল মত নীরবে ঘুমায়।
আছে তার সৌরভ গৌরব, তবু তার
লাজভরা প্রাণটুকু আড়ালে পাতার
ভয়ে জড়সড়; পাছে, কেহ আঁখিপুটে
প্রাণের সৌরভটুকু সব লয় লুটে।
অলি কোথা, অলি কোথা, উকি মারি দেখে,
এলে অলি তাড়াতাড়ি মুখটুকু ঢাকে।
অলি যদি কাছ দিয়া গুঞ্জরিয়া যায়
রুদ্ধশ্বাসে ঢাকি বাসে লুকায়ে তাকায়
বুঝি পড়ে ধরা; কতমত ছল করি
হাসে হাসি; ফেলে অশ্রু শিশিরের বারি।
মনে লয়ে অগাধ প্রণয় নিরাশ্বাসে
একদিন ঝরে যায় উষার বাতাসে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিগাথীরিয়ম — "মিগাথীরিয়ম শব্দের অর্থ ভয়ঙ্কর জন্তু। এই জন্তু হাতীর সমান বড় হইত। ...... ইহার পিছনের পা, লেজ এবং কোমরের হাড় হাতীর হাড়ের চাইতেও বড় আর মজবুত। ...... এই জন্তুর একটি কঙ্কাল যাদুঘরে আছে।"

'সেকালের কথা' শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত।

FANCY PRESS, GUPTA & Co, CALCUTTA.

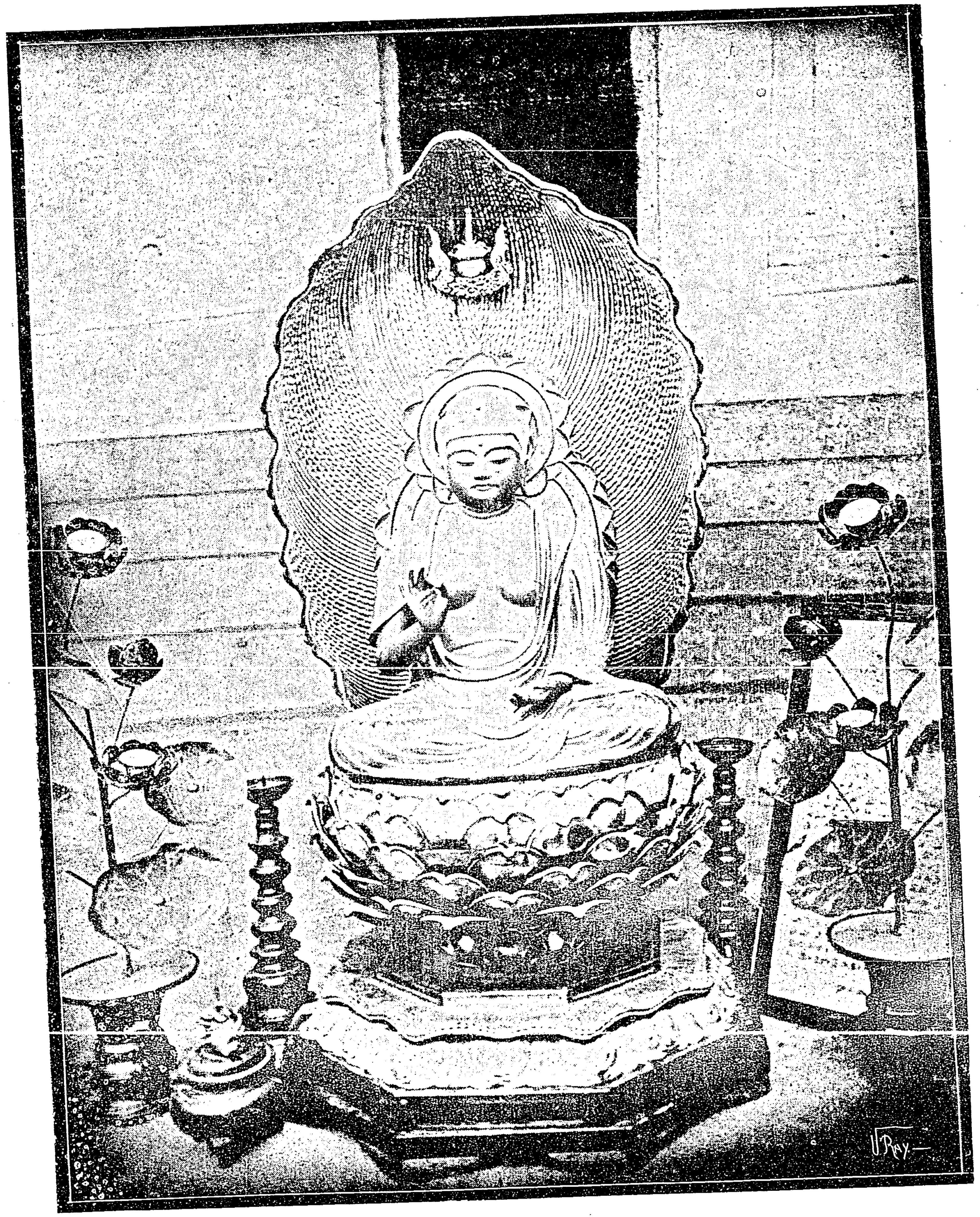

চন্দনকাষ্ঠময় বুদ্ধমূর্ত্তি।

জাপান সম্রাট কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল-সহযোগে বুদ্ধগয়ায় স্থাপন জন্য প্রেরিত।

৬ষ্ঠ ভাগ। আশ্বিন, ১৩১০। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সপত্নী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালিতলার মোড়ে ট্রামগাড়ির অপেক্ষায়, কার্ত্তিক ও মাণিকলাল দাঁড়াইয়া আছেন, ট্রাম আসিতেছে না। কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহার পর?"

মাণিকলাল বলিল,—"তাহার পর এ পর্য্যন্ত পেঁচোর আর সন্ধান নাই, অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন খোঁজই পাই নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"যাহাই বল ভাই! কাজটি যে বড় অন্যায় হইল তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের মেয়ে, তাহার প্রতি কুভাব মনে করাই ভয়ানক পাপ। তাহার পর তাহাকে আনিয়া তাহার আর খোঁজ খবর না লওয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে।"

মাণিকলাল বলিল,—"তোমার ভুল হইতেছে ভাই! আমি সে ব্রাহ্মণকন্যাকে পূর্ব্বেও দেখি নাই, পরেও দেখি নাই, তবে আনাইবার সম্বন্ধে কিছু দোষ আমার থাকিতে পারে। পূরা দোষ আমার উপর দিতে পার না।"

"কেন?"

"একটা স্ত্রীলোক, তাহার নামও আমি জানি না, আগে আর তাহাকে কখন দেখিও নাই—ভদ্রঘরের মত প্রবীণা স্ত্রীলোক আমাকে বলে, একটী সুন্দরী যুবতী ঘরের বাহির হইয়া আসিতেছে। স্বামী লয় না, কষ্টের একশেষ, আর একদিনও ঘরে থাকিতে পাড়িতেছে না। একজন ভাল লোকের হাতে পড়িলেই ভাল হয়। বড় ভাল মানুষ মেয়ে, কোন্ ইতরের হাতে পড়িয়া কষ্ট পাইবে? শুনিয়াছি, আপনি মহৎ লোক, আপনি দয়া করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিবেন কি?"

'ডি' অক্ষরাঙ্কিত একখানি ট্রামকার চলিয়া গেল।

উভয় বন্ধুই অন্যমনস্ক সুতরাং তাহাতে উঠা হইল না। কার্ত্তিক বলিলেন,—"তার পর ?"

মাণিকলাল বলিল,—"পাপ বল, দুষ্কর্ম্ম বল, সকলই এইখানে ঘটিয়াছে। আমি সে যুবতীকে হস্তগত করিতে সম্মত হইয়াছিলাম, ইহাতেই যে আমার গুরুতর পাপ হইয়াছে, তাহার কোন ভুল নাই। আমি পেঁচোকে সে প্রবীণা স্ত্রীলোকের সহিত জুটাইয়া দিয়াছিলাম। মাথাঘসার গলির ভাঙ্গা বাড়ীতে রাখিতে বলিয়াছিলাম, যাহাতে গোপনে কাজ মিটে, তাহা করিতে বলিয়াছিলাম—কারও হাতে একটী টাকা পয়সাও দিই নাই, নিজে উদ্যোগী হইয়া কোন কর্ম্ম করি নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তাহাত বুঝিলাম। তাহার পর কি হইল ?"

মাণিকলাল বলিল,—"রাত্রি প্রায় দশটার সময় সেই প্রবীণা স্ত্রীলোকটা আমাকে বলিয়া আসিল, সব ঠিক হইয়াছে। শিকার, ভাঙ্গা বাড়ীর পিঁজরায় পড়িয়াছে—কেবল আমার যাওয়ার অপেক্ষা। স্ত্রীলোকটা বিদায় হইল, আমি তাহাকে একটী পয়সাও পুরস্কার দিই নাই, সেও কিছু চাহে নাই।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—"তার পর ?"

মাণিকলাল বলিল,—"সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে রাত্রে আমি এ সম্বন্ধে আর কোনই সন্ধান লইলাম না ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, এই বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ব্রাহ্মণের মেয়ে, এ আগুণে সহজে আমি হাত দিতে চাহি না।"

"বুঝিলাম তুমি খুব সতী।"

মাণিকলাল বলিল,—"আমি সতী নহি ঘোর পাপী, কিন্তু এই মা কালীর সম্মুখে তুমি ব্রাহ্মণ তোমার কাছে বলিতেছি, এমন পাপ, জীবনে আমার কখন করিতে মতিও হয় নাই। সে যাহা হউক মেয়েটা গেল কোথায় ? এক একবার মনে হইতেছে, পেঁচোই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া কোথায় তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, আবার মনে হইতেছে যে, কোথাও বেশী টাকা খাইয়া, আর কাহারও হাতে তুলিয়া দিয়াছে আবার এমনও মনে হইতেছে যে, সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। সেই মাগীর একটা খেলা মাত্র কেহই আইসে নাই, কিছুই হয় নাই।"

আর একখানা ট্রাম চলিয়া গেল। কার্ত্তিক বলিলেন —"বেশ লোক ত, আমরা! আবার গাড়ী চলিয়া গেল কোনই হুঁস নাই।"

মাণিক বলিল,—"যাইতে দাও ফের আসিবে; কিন্তু পেঁচো যে গেল সে আর আসিল না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"দেখ ভাই মাণিকলাল! এ বিষয়ে তোমার অপরাধ বেশী না হইলেও, তুমি যে ইহার নিমিত্ত কারণ, তাহার ভুল নাই। ব্রাহ্মণকন্যার কি হইল, তাঁহার সন্ধান করিতে তুমি বাধ্য। পেঁচোর সন্ধান হইলেই সব সন্ধান হইবে। সকল কর্ম্ম ফেলিয়া পেঁচোর খোজ করা, তোমার আবশ্যক। আমরা তোমাকে বন্ধু বলিয়া ভালবাসি, সেই ভালবাসা যদি তুমি বজায় রাখিতে চাহ, তাহা হইলে, যেমন করিয়া পার পেঁচোর খোজ তোমাকে করিতেই হইবে।'

মাণিকলাল বলিল,—"তাহা আমি করিবই করিব।"

গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া, উভয়ে রাস্তার অপর পাড়ে গমন করিলেন। মাণিকলাল হাত বাড়াইয়া "বাঁধো বাঁধো" শব্দে চীৎকার করিলেন। গাড়ী থামিল. উভয়ে উঠিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশে বসিলেন ঘং ঘং শব্দে ইলেক্‌ট্রিক রেল বাজিল, ঘর্ ঘর্ শব্দে ব্রেক্ খুলিল, সোঁ সোঁ শব্দে গাড়ী চলিল, কণ্ডক্‌টার আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল, মাণিকলাল তাহার হাতে একটি সিকি দিয়া বলিল দুইখানি। টুং টুং শব্দে টিকিট পঞ্চ হইল; চারিটি পয়সা ও দুই খানি টিকিট, মাণিকলালের হস্তগত হইল।

"গোলদীঘি পর্য্যন্ত যাওয়ার পর উভয়েই স্বভয়ে দেখিলেন,—মৃজাপুর ষ্ট্রীট দিয়া একখানি অত্যুত্তম সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ট্রাম আসিবার পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীট পার হইবার নিমিত্ত অশ্বদ্বয়কে কষাঘাত করিল, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! ট্রামের সহিত সংঘর্ষণ অপ্রতিবিধেয়। গাড়ীর দ্বার রুদ্ধ; সুতরাং অভ্যন্তরে স্ত্রীলোক আছেন বলিয়া বোধ হইল। কোচ্ বক্সে কোচমান এবং একজন উৎকৃষ্ট পোষাকধারী দ্বারবান বসিয়া আছে।

কার্ত্তিক ও মাণিকলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের মুখ হইতে "হায় হায়" শব্দ বাহির হইল। ড্রাইভার পূর্ব্ব হইতেই ব্রেক কষিতেছিল, কিন্তু

সকল চেষ্টা বৃথা হইল। গাড়ী পার হয় হয় হইয়াও হইতে পারিল না। বিষম জোরে ধাক্কা লাগিয়া গেল। গাড়ী কাত্ হইয়া পড়িল, ট্রাম থামিয়া গেল। দ্বারবান ও কোচম্যান ছিটকাইয়া পড়িল, গাড়ীর ভিতর হইতে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ উঠিল। আরো বিপদ ঘোড়া দুইটা লাফাইতে লাগিল, লাথি ছুড়িতে থাকিল এবং গাড়ী টানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ছেচড়াইয়া একটু লইয়া গেল।

ধাক্কা লাগিবার পূর্ব্বেই কার্ত্তিক ও মাণিকলাল ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন, বেগে তাঁহারা পতিত গাড়ীর নিকটে আসিলেন। কোচম্যান ও দ্বারবানকে সাবধানে তুলিলেন, দেখিলেন তাহাদের দুই একটা চোট্ লাগিয়াছে মাত্র, বিশেষ ক্ষতি কিছু হয় নাই।

মাণিকলাল বলিলেন,—"তোমরা যাও, যত শীঘ্র পার ঘোড়ার জোত্ খুলিয়া ফেল। এদিকের যাহা হয় আমরা করিতেছি।"

দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। দুই একজন দক্ষ লোকের সাহায্যে কোচম্যান জোত্ খুলিয়া ফেলিল। মাণিকলাল ও কার্ত্তিক গাড়ীর নিকটে আসিলেন বাহির হইতে গাড়ীর দরজা টানিয়া ফাঁক করা হইল, দেখা গেল ভিতরে দুইজন স্ত্রীলোক, তাঁহারা অপরদিকের কপাটের উপর সোজা হইয়া বসিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এক লম্ফে কার্ত্তিক গাড়ীর উপরে উঠিয়া পড়িলেন,—"মা সব কোন ভয় নাই। আমার হাত ধর আমি টানিয়া তুলিতেছি। বাহিরে আসিলে যাহা হয় ব্যবস্থা হইবে।"

কার্ত্তিক ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। বিপুল শক্তিসহকারে এক প্রৌঢ়া বিধবাকে, তিনি টানিয়া তুলিলেন—সবিস্ময়ে মাণিকলাল দেখিল এই ত সেই! কার্ত্তিক দেখিলেন, কি ভয়ানক! এ যে, লবঙ্গ! জিজ্ঞাসিলেন, "লবঙ্গ ভিতরে আর কে আছে ?"

লবঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"দিদি বাবু।"

তখন কার্ত্তিক বলিলেন,—"মাণিকলাল তুমি ইহাকে নামাইয়া লও ভাই; আমি আর এক জনকে তুলিবার চেষ্টা করি।"

মাণিকলালের সাহায্যে লবঙ্গ নামিতে পারিল। কার্ত্তিক হেমলতাকে উঠাইয়া আসিলেন। সন্তর্পণে তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামান হইল। স্ত্রীলোকদ্বয়কে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কোণের নিকট দাঁড় করান হইল। কার্ত্তিকের আদেশে দ্বারবান আর একখানি ঠিকা গাড়ী ডাকিতে লাগিল। নিয়মানুসারে ইন্‌স্পেক্টার পতিত গাড়ীর ও ট্রামের নম্বরাদি লিখিতে লাগিল নম্বর লেখালেখি হইলে ট্রাম চলিয়া গেল। সে গাড়ীতে কার্ত্তিক ও মাণিকের যাওয়া হইল না। কার্ত্তিক লবঙ্গকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমরা কোথায় যাইতেছিলে ? আপনার লোক কেহ সঙ্গে নাই এরূপে হেমলতাকে আনিয়াছিলে কেন ? যেখানে যাইতেছিলে, সেখানে আজি আর গিয়া কাজ নাই এখন বাসায় যাও। আমরা দুজনে এখনি সেখানে যাইতেছি।"

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে হেমলতা বার বার মাণিকলালকে দেখিতে লাগিলেন। ঠিকা গাড়ী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। লবঙ্গ ও হেমলতা গাড়ীতে উঠিলেন, কার্ত্তিক দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, দ্বারবান উপরে উঠিল, কার্ত্তিক তাহাকে বলিয়া দিলেন, বরাবর বাসায় গাড়ী লইয়া যাও আর কোথাও যাইবার দরকার নাই। সঙ্কেত পাইয়া অশ্ব ছুটিতে আরম্ভ করিল, গাড়ী চলিয়া গেল।

অনেক লোকে ধরাধরি করিয়া পতিত গাড়ী সোজা করিয়া তুলিল। কার্ত্তিক ও মাণিকলাল দেখিলেন,—"গাড়ী বিশেষ জখম হয় নাই, একটি পেনেল্ ফাটিয়া গিয়াছে, একখানি চাকার এক জায়গা একটু জখম হইয়াছে। কার্ত্তিক পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া কোচ্‌ম্যানকে দিলেন, এবং বলিলেন তোমারই বেকুবিতে আজ সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছিল, ভগবানের অনুগ্রহে আজ অনেকে বাঁচিয়াছে, তুমি বড় গোঁয়ার গাড়োয়ান, এরূপ কাজ আর কখন করিও না।"

অনেক লোক তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিল। ভাড়াটিয়া গাড়ীর কোচ্‌ম্যানকুল ভয়ানক কলহপ্রিয় ও কটুভাষী হইলেও, এক্ষেত্রে দয়া করিয়া এ ব্যক্তি কোন বাদানুবাদ করিল না। গাড়ীতে আবার ঘোড়া জোতা হইল।

কার্ত্তিক ও মাণিকলাল সে স্থান ত্যাগ করিলেন, ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক ও মাণিকলাল পদব্রজে বহুবাজার অভিমুখে চলিলেন, কিঞ্চিৎ দূরমাত্র গমন করার পর মাণিকলাল বলিল,—“বুঝিতেছি ভাই! এই দুই স্ত্রীলোক তোমার খুব চেনা, কে ইঁহারা?”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“যিনি সধবা অল্প বয়স্কা, তিনি আমার ভগ্নী হেমলতা। আর যে আধা বয়সী বিধবা, সে খুড়া মহাশয়ের বাড়ীর একজন চাকৃরাণী, তাহার নাম লবঙ্গ।”

মাণিকলাল নীরব। কার্ত্তিক বলিলেন,—“চুপ করিলে যে?”

মাণিকলাল সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল,—“বড় ভয়ানক কথা, তোমাকে বলা উচিত কিনা ভাবিতেছি।”

একটু রাগতস্বরে কার্ত্তিক বলিলেন,—“আমার নিকট গোপন করিবার কথা তোমার আছে! ইহা আজ প্রথম শুনিলাম। তোমার সহিত অনেক দিনের আত্মীয়তা, একজনের পেটের কথা, আর একজনকে না জানাইলে চলিত না, এখন দেখিতেছি, কোন কোন কথার লুকাইবার ইচ্ছা হইতেছে। ভাল তাহাই হউক।”

মাণিকলাল বলিল,—“পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া বড় ভয় হইতেছে, তথাপি আমি অকপটে সকল কথা বলিব। বল তুমি রাগ করিবে না?”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“তুমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াও আমার ক্ষমা পাইয়াছ, আর একটা কথার জন্য রাগ করিব কেন? তোমার কথা নিতান্ত বিরক্তিকর হইলেও রাগ করিব না।”

মাণিকলাল আবার সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর কার্ত্তিকের খুব নিকটে সরিয়া আসিল, তাহার পর অতি মৃদুস্বরে বলিল,—“তোমাদের এই লবঙ্গ সর্ব্বনাশের মূল, এই আমার সহিত দেখা করিয়া বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছিল, এই সে ব্রাহ্মণের মেয়েকে উত্তরপাড়া হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, এই তাঁহাকে সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে রাখিয়া আমার নিকট রাত্রি দশটার সময় খবর দিয়াছিল।”

কার্ত্তিক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন, “বল কি! তুমি ঠিক চিনিয়াছ ত?”

মাণিকলাল বলিল,—“তাহার কোনই ভুল নাই, কেবল যে আমি চিনিয়াছি, এমন নহে; লবঙ্গও আমাকে বেশ চিনিয়াছে, সুযোগ পাইলে সে নিশ্চয়ই আমার সহিত কথা কহিবে।”

কার্ত্তিক অতিশয় চিন্তামগ্ন হইয়া নীরব রহিলেন।

মাণিকলাল বলিল,—“তুমি চুপ করিলে যে?”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“আমি ভাবিতেছি, এ কার্য্যে লবঙ্গের স্বার্থ কি, তোমার নিকট সে কিছু লয় নাই। সে ব্রাহ্মণকন্যার যেরূপ দুরবস্থার কথা বলিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই সেখান হইতেও কিছু পায় নাই। বড় মানুষের বাড়ী চাকৃরী করে, সাধারণ চাকৃরাণী অপেক্ষা ইহার মান বেশী, অভাব ও অপ্রতুল ইহার বড় নাই। তবে এরূপ ইতর কার্য্য সে করিতে গেল কেন?”

মাণিকলাল বলিল,—“ভাবিবার কথা বটে, কিন্তু এমনও ত হইতে পারে—অপর কাহারও অনুরোধে অন্যের স্বার্থের জন্য সে এ কাজ করিয়াছে।”

কার্ত্তিক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“অসম্ভব নহে। তোমার এই অনুমান আমাকে একটা ভয়ানক আশঙ্কায় ফেলিয়া দিল। আমি শুনিয়াছি, আমার ভগ্নীপতির আর এক স্ত্রী আছেন। এই উপলক্ষে আমার ভগ্নীপতির সহিত, আমার ভগ্নী ও খুড়া মহাশয় ভয়ানক মনান্তর ঘটাইয়াছেন। হেমলতার পথের কণ্টক দূর করিবার জন্য আমার ভগ্নীপতিকে অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত করিবার জন্য, তাঁহার সেই স্ত্রীকে কৌশলে কুপথে আনাও আশ্চর্য্য নহে।”

মাণিকলাল বলিল,—“ঠিক তাই। বড় উত্তম অনুমান করিয়াছ।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“এ অনুমানের আরও একটু কারণ আছে। আমার ভগ্নীপতি নরেশ বাবু এখন কলিকাতাতেই আছেন। আজ প্রাতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছি; তাঁহাকে বড় চিন্তাকুল অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ দেখিয়াছি। হেমলতা ও খুড়ামহাশয়, তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সহিত

মনান্তরে তাঁহার অসুখী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যের নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে।”

মাণিক বলিল, “যাহা বুঝিয়াছ, তাহার আর কোন ভুল নাই। কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে! জানি না সে ব্রাহ্মণকন্যা এখনও বাঁচিয়া আছেন কি না। অথবা মৃত্যুর অপেক্ষাও দুর্দ্দশা ধর্ম্মহানি, তাহাও তাঁহার ঘটিয়াছে কি না? কাল প্রাতে আমি প্রাণপণে তাঁহার সন্ধানে নিযুক্ত হইব।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“আমিও কাল প্রত্যূষে নরেশ বাবুর সহিত দেখা করিয়া কথাটী ঠিক করিয়া লইব, তাহার পর বিধিমতে এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কি ভয়ানক লোক এই মাগীটা ভাই?”

মাণিক বলিল,—“এইরূপ কুলোকের সহিত তোমার ভগ্নী যে একা কলিকাতা সহরে বেড়াইয়া বেড়ান, ইহা বড়ই ভয়ানক কথা! আমার ত ভয় হয় শীঘ্র একটা ভয়ানক দুর্নাম রটিয়া যাইবে।”

রত্নেশ্বর বাবুর বাসার দ্বারে আসিয়া, বন্ধুদ্বয় কথাবার্ত্তা বন্ধ করিলেন। কর্ত্তা তখন অন্দরে আছেন শুনিয়া মাণিকলালকে, বাহিরের এক বৈঠকখানায় বসাইয়া, কার্ত্তিক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একাকী বসিয়া থাকা বড়ই বিরক্তিকর বিশেষতঃ তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, মাণিকলাল বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্মুখে জনাকীর্ণ রাজপথ এবং পার্শ্বে মনোহর ওয়েলিংটন স্কোয়ার। যে বিদ্যুৎ গগনে বিচরণ করিয়া, লোকের নয়ন ঝলসায়িত, যাহা একবার দেখা দিয়া, তখনি লুকাইত বলিয়া, চঞ্চলা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা দিব্যলোকের শ্রেষ্ঠ গৌরবরূপে পরিচিত, সেই চপলা সৌদামিনী এখন মানবের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ে নির্দ্ধারিত স্থানে, স্থিরালোক বিকীর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাড়িতালোক প্রদীপ্ত এবং তাড়িতবাহিত শকট দ্রুতবেগে অনবরত যাতায়াত করিতেছে।

অগণ্যপ্রায় ফিটান, চেরীয়ট, বেরুস, লেণ্ড, ব্রুহেম, বগি, ডগকার্ট ও বিবিধ প্রকার ভাড়াটিয়া গাড়ী সমস্ত পথ অধিকার করিয়া, উভয়দিকে ধাবিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে টুন্ টুন্ শব্দ করিতে করিতে বাইছিকিল দৌড়িতেছে। শকট সমূহের চালক ও সহিসগণ হৈ হৈ শব্দে চীৎকার করিতেছে। বিবিধ দ্রব্যের ফেরিওয়ালারা নানারূপ স্বরে ক্রেতা অন্বেষণ করিতেছে, উৎসাহ, সজীবিতা ও কর্ম্মময়তা প্রত্যক্ষভাবে যেন ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে, দূর হইতে আলোক জ্বালিতে আরম্ভ করিয়াছে, দেখিতে দেখিতে সকল পথের আলোক জ্বালা হইল; সকল গাড়িতেই অত্যুজ্জ্বল আলোক জ্বলিল, প্রায় সকল দোকান হইতেই নানাবিধ আলোক প্রকাশ পাইল, তখন নক্ষত্রনিকরপরিবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায়, মণিমাণিক্যমণ্ডিতা মহারাণীর ন্যায়, সহস্র নয়নালঙ্কৃত পুরন্দরের ন্যায় কলিকাতা মহানগরীর অবক্তব্য শোভা হইল।

মাণিকলাল অন্যমনস্কভাবে রাজপথের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। ভৃত্য বৈঠকখানা ঘরে আলোক দিয়া গিয়াছে, তিনি তাহাও জানিতে পারেন নাই। সহসা পশ্চাৎদিকে কক্ষমধ্য হইতে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, “বাবু মহাশয় ভাল আছেন ত?”

সঙ্গে সঙ্গে মাণিকলাল ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল,—তাঁহার সম্মুখে সেই দূতী লবঙ্গলতা।

লবঙ্গ আবার বলিল,—“প্রণাম হই, ঘরের মধ্যে আসুন। এখানে এখন আর কেহ আসিবে না।”

মাণিকলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বলিল, “সেই দেখা, আর এই দেখা। তোমাকে যে কত খুঁজিয়াছি, আর বলিতে পারি না, ভাল আছ তো?”

লবঙ্গ বলিল,—“আপনাদের ভালতেই আমাদের ভাল, আপনি নূতন রাণীর সঙ্গে খুব রঙ্গেই আছেন বোধ হয়।”

মাণিকলাল দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—“এত কষ্ট দিবে যদি মনে ছিল, তবে এত সুখের আশায় মাতাইয়াছিলে কেন? মুখের আহার আনিয়া দিয়া, আবার কাড়িয়া লইলে কেন? একবার চোখের দেখা দেখিবার আগেই, সে সোণার চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিলে কেন? ছিছি এই কি তোমার ধর্ম্ম!”

লবঙ্গ বলিল,—“কি রহস্য করিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কোণের কুলবধূ আনিয়া আপনার হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছি, তাহা না মানিয়া এখন আমার ঘাড়ে ঝোঁক চাপাইতেছেন কেন? পাছে কিছু বক্‌সিস্ চাহি ভাবিয়া সুর ফিরাইতেছেন নাকি?”

মাণিকলাল বলিল,—"তুমি যে বক্‌সিস চাহ তাহাই দিব, সত্য করিয়া বল তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ? আমি সে ভাঙ্গা বাড়ীর প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি, কোথাও কেহ নাই, আমার সহিত এরূপ তামাসা করিয়া কি লাভ হইল?"

তখন বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে, লবঙ্গ বলিল,—"সে কি গা! তামাসার কথা কি বলিতেছ? আমি নিজে তাহাকে ঘরের মধ্যে পূরিয়া তোমার নিকট খবর দিয়াছি, তোমার লোকটা, সেখানে বসিয়াছিল, তবে সে ছুঁড়ী গেল কোথায়?"

মাণিকলাল বলিল,—"সকলি তুমি জান, তোমাকে হাজার টাকা দিব, দোহাই তোমার, বলিয়া দাও এখন সে কোথায় আছে।"

তখন লবঙ্গ বুঝিল, সত্যই একটা ভয়ানক বিভ্রাট ঘটিয়াছে, মাণিকলালের সেই লোকটাই এইরূপ ঘটাইয়াছে বলিয়া, তাহার বিশ্বাস হইল। সে বলিল,—"দোহাই ধর্ম্মের আমি ইহার কিছুই জানি না। সেই রাত্রিতেই আমি হরিপুরে চলিয়া গিয়াছিলাম। চারি দিন হইল মনিবদিগের সহিত আবার কলিকাতায় আসিয়াছি; আমি আর কোন সন্ধান জানি না। জানিবার কোন উপায়ও আমার ছিল না।"

মাণিকলাল বলিল,—"মানিয়া লইলাম তুমি আর কোন সন্ধান রাখ নাই, এখন কলিকাতায় আসিয়াছ, আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া টাকা দিব, তুমি তাহার সন্ধান করিয়া দাও, না হয় আমাকেও সন্ধানের উপায় বলিয়া দাও, আমিও চেষ্টা করি।"

লবঙ্গ বলিল,—"প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সন্ধানের ত্রুটি করিব না, আপনি কি উপায় জানিতে চাহেন বলুন।"

মাণিকলাল বলিল,—"তাহার নাম, তাহার বাপের নাম, বাসস্থান ইত্যাদি বলিয়া দিলে, আমি অনেক সন্ধান করিতে পারি।"

লবঙ্গ বুঝিয়া দেখিল, চোরের উপর বাটপাড়ি হইয়াছে, তাহার অপরাধ যে সহজেই ধরা পড়িবে সন্দেহ নাই।

জামাই বাবু উত্তরপাড়া গিয়া অবশ্যই জানিয়াছেন, আমি কুমুদিনীকে স্বামীর কাছে লইয়া যাইতেছি বলিয়া ভুলাইয়া আনিয়াছি। জামাই বাবু এখানে আসিয়া আমাকে ধরিতে পারিবে না, তবে যদি আমার নামে আদালতে নালিশ করে, তখন অনেক জবাব বাহির করা যাইবে। বাবুর টাকার সীমা নাই দিদি বাবুরও ভালবাসার শেষ নাই, সে সামান্য গরীব লোক, কত দিন আমার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চালাইবে? সাক্ষীর প্রমাণই বা কোথায় পাইবে? আবার বাবু তাহাকে হাতে পাইলে গারদে পূরিয়া রাখিবে তখন তাহাকে আমারই অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এই মাণিক বাবু লোকটার সহিত এত শীঘ্র দেখা না হইলে ভাল হইত। এ যদি নরেশের সহিত মিশে, তাহা হইলে প্রমাণটা একটু পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইবে—সে ভয় মিথ্যা। কোথায় নরেশ, আর কোথায় মাণিকলাল। দুই জনের আলাপ পরিচয়ের কোন সম্ভাবনা নাই; তবে এ আবার কার্ত্তিকের বন্ধু। কার্ত্তিক বড় ধূর্ত্ত তাহার সহিত নরেশের এখনও পরিচয় নাই কালে হইতেও পারে, তখন একটা গোল উঠিলেও উঠিতে পারে।

সে অনেক দূরের কথা। আপাততঃ মাণিককে আমি যে ফাঁদে ফেলিতেছি, তাহাতে চিরকাল আমার গোলাম হইয়া থাকিবে। নরেশকে পরম শত্রু জানিয়া নিকাশ করিবার ফিকিরে ফিরিবে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লবঙ্গ বলিল,—"সে যখন হাত ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলিব না। মাণিক বাবু যদি আমার টুঁটি কাটিয়া ফেল তাহা হইলেও তাহার কোন সন্ধান আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না, সে একটা সামান্য মেয়ে মানুষ, গরীব দুঃখীর মেয়ে, সে হাত ছাড়া হইয়াছে বলিয়া এত দুঃখ কেন? আমি তোমাকে এবার সত্যসত্যই সোণার চাঁদ ধরিয়া দিব।"

মাণিকলাল বলিল,—"তুমি গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লও তোমাকে কোনমতেই বিশ্বাস নাই, তোমার কথায় আমি আর কখন ভিজিব না।"

লবঙ্গ বলিল,—"আমার কোনই দোষ নাই; আমি ঠিক কাজই করিয়াছিলাম, আপনার লোকেই আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এবার আর কোন গোলের কথা নাই, কেন না, এপক্ষ আপনার জন্য পাগল।"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল,—"বল কি! দেখা নাই শুনা নাই, কেবল নাম শুনিয়াই পাগল না কি?"

লবঙ্গ বলিল,—"অনেক ভাবিতে ভাবিতে লোকে পাগল হয়। অনেক বুঝিয়াই সে মজিয়াছে।"

মাণিক বলিল,—"আমিও তোমার কথায় মজিতেছি, এখন একবার দেখা সাক্ষাতের উপায় কি? কোথায় আসিতে হইবে কোথায় অপেক্ষা করিয়া থাকিব।"

লবঙ্গ বলিল,—"অত উতলা হইবেন না, কোথাও আপনাকে আসিতে হইবে না, কোথাও অপেক্ষা করিতে হইবে না, সকল সুব্যবস্থাই আমি করিব। একবার দেখিলেই আপনি দিশাহারা হইবেন, রূপে গুণে ধনে মানে এমন আর কোথাও কেহ দেখে নাই।"

মাণিক বলিল,—"তুমি আমাকে এখনি পাগল করিয়া দিলে, কখন দেখা পাইব?"

লবঙ্গ বলিল,—"কখন দেখা পাইবেন, তাহা কাল বলিব, আপনার সেই স্থান ত?"

মাণিক বলিল,—"হাঁ দোহাই তোমার ভুলিও না যেন! বল না কেন কাল আবার আমি আসি?"

লবঙ্গ বলিল,—"না! আসিতে হইবে না, আসিয়া কাজ নাই, আমি ভুলিব না, নিজে গিয়া আপনার সহিত দেখা করিব।"

মাণিক বলিল,—"তোমার দয়ার সীমা নাই। এত দয়া যদি করিবে, তবে আপাতত একটু দয়া করিয়া, সুন্দরীর নামটী বলিয়া দাও।"

লবঙ্গ বলিল,—"এখন কিছু বলিব না, প্রকাশ হইলে সর্ব্বনাশ হইবে।"

মাণিক বলিল,—"আমি কি কাঁচা ছেলে যে, নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিব। যে সুখের আশায় পাগল হইতেছি, তাহাই ছিঁড়িয়া ফেলিব? নামটী আমাকে বলিয়া দাও মিলনের অর্দ্ধেক আনন্দ নামেই পাইব, আমাকে প্রাণে মারিও না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি না যাও, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নামটী ধ্যান করিতে করিতে আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে দাও। যদি নামটী তোমার বলিতে বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে বেশী বিশ্বাসের কাজ তুমি ঘটাইবে না; আবার আমাকে কোন বৃথা লোভে ফেলিয়া কাঁদাইয়া মারিবে, যাহাকে একটী নাম বলিতেও তোমার বিশ্বাস হয় না; তাহার সহিত আর তামাসায় কাজ কি? আমি এখন যাই।"

লবঙ্গ বলিল,—"দাঁড়ান দুঃখ করিবেন না, নাম বলিতেছি, কিন্তু খুব সাবধান। কার্ত্তিক বাবু কি অন্য কেহ যেন একটী অক্ষরও জানিতে না পারে।"

মাণিকলাল বলিল,—"রাধা কৃষ্ণ!"

তখন লবঙ্গ চারিদিকে সাবধানে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর মাণিকলালের অতি নিকটে আসিল।

বাহির হইতে কার্ত্তিক বাবু ডাকিলেন,—"মাণিক বাবু, এস ভাই!"

লবঙ্গ বেগে অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল। যাহা বলিতেছিল তাহা আর বলা হইল না। নাম জানিবার কৌতূহল মিটিতে মিটিতে মিটিল না। অগত্যা মাণিকলাল ধীরে ধীরে আসিয়া কার্ত্তিকের সহিত মিলিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মাণিকলালকে বাহিরের বৈঠকখানায় বসাইয়া কার্ত্তিক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে এক ঘরে সকলেই উপস্থিত; রত্নেশ্বর বাবু, তাঁহার গৃহিণী, হেমলতা এবং লবঙ্গ সকলকেই একস্থানে দেখিতে পাইয়া কার্ত্তিক ভাবিলেন ভালই হইল।

পথে হেমলতার যে দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল, তাহারই তখন বর্ণনা চলিতেছে, তদুপলক্ষে কার্ত্তিক যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন হেমলতা ও লবঙ্গ তাহা বার বার ব্যক্ত করিতেছে, পরম স্নেহের ধন হেমলতা যে নির্ব্বিঘ্নে বাটীতে ফিরিয়াছেন, আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে তিনি যে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার পিতা-মাতা শত প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই কার্ত্তিকেরও একটু প্রসংশা হইতেছে।

কর্ত্তা বলিতেছেন,—"কার্ত্তিক এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে, স্বভাব চরিত্র যদি ভদ্রলোকের মত হইত তাহা হইলে, সে ভাল লোক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত। না হউক এখন যে ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে আছে, ইহাই পরম লাভ।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কার্ত্তিক চিরদিনই ভাল ছেলে; ছেলে বয়সে বুদ্ধিমান ছেলেরা একটু দুরন্ত হইয়াই থাকে, এখন ত কার্ত্তিক সোণার চাঁদ, তাহার কথা বার্ত্তা যেমন ধীর, স্বভাবও তেমনই নরম। সকল কাজেই কার্ত্তিকের পরামর্শ লওয়া আমাদের উচিত; ঘরের ছেলেকে এমন পর করিয়া রাখা আর ভাল নহে।"

হেমলতা বলিলেন,—"দাদার সহিত আর একটী ভদ্রলোক ছিলেন তাঁহার মত লোক আমি ত আর কোথাও দেখি নাই। রূপে, গুণে, কথায় তিনি যেন একটী দেবতা। বাবা, তাঁহার সহিত তোমার আলাপ হইলে বড় সুখী হইবে।"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে কার্ত্তিক সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দর্শনমাত্র হেমলতা বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে দাদা আসিয়াছ। তুমি একলা আসিলে যে? তোমার সঙ্গের সে বাবুটীকে কোথায় ফেলিয়া আসিলে?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছি, তোমরা সকলেই এক জায়গায় আছ, ভালই হইয়াছে।"

হেমলতা ও লবঙ্গ বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন, দেখিয়া কার্ত্তিক আবার বলিলেন,—"হেমলতা কোথায় যাইতেছ? তোমাকে দুই একটী কথা বলিবার দরকার ছিল।"

হেমলতা বলিলেন,—"এখনি আসিতেছি।"

লবঙ্গ ও হেমলতা কক্ষান্তরে গমন করিলেন, সেখানে হেমলতা বলিলেন,—"আসিয়াছেন! দিদি, বাবুটী আসিয়াছেন, গাড়ীতে যাহা যাহা বলিয়াছি সে সকল কথা তোমার ঠিক মনে আছে ত?"

লবঙ্গ বলিল,—"দরকারি কথা লবঙ্গ কখনও ভোলে না।"

হেমলতা বলিলেন,—"এইবার বুঝিব তোমার ক্ষমতা!"

লবঙ্গ বলিলেন,—"দুই কথায় জালে ফেলিতে পারিব তাহার আর ভুল নাই। গোবর গণেশ নরেশের মুখে ছাই।"

মুখে কাপড় দিয়া হেমলতা হাসিতে লাগিল।

লবঙ্গ বলিল,—"শুভ কর্ম্মের আর বিলম্বে কাজ নাই,—আমি তবে যাই।"

লবঙ্গ প্রস্থান করিল। হেমলতা পুনবার পূর্ব্ব কথিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তখন কার্ত্তিক বলিতেছেন,—"খুড়া মহাশয়, আমি আপনার জুতার যোগ্য লোকও নহি। ধনে, মানে, বুদ্ধিতে আপনি অদ্বিতীয়; আপনার সহিত কোন প্রকার বাদানুবাদ করিলে, লোকে আমাকে পাগল বলিবে। তবে আমি আপনার অধম-সন্তান, আপনার হিতাহিতের সহিত আমারও সম্পর্ক আছে, যেখানে যে ভাবে থাকি না কেন, আমি আপনার দাসই আছি; আপনি কৃপা করিয়া অভয় দিলে এ সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিতে পারি।"

গৃহিণীর মুখে কার্ত্তিকের সম্বন্ধে অনুকূল কথা পূর্ব্বে শুনিয়া এবং অধুনা তাঁহার বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন,—"বলিবে বৈ কি? তোমরা এখন উপযুক্ত হইয়াছ, তোমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করাই এখন আমার উচিত।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই মনে হয়, নরেশের সহিত ভাল ব্যবহার হয় নাই; তিনি জামাতা; পরম রূপবান, বিদ্বান এবং বড় কুলীনের ছেলে, তাঁহাকে আদর না করিলে দোষের কাজ হয়।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তাঁহাকে কোন দিন কেহই অনাদর করে নাই; সে যে আমার কৃপায় সকল সুখ ভোগ করিবে অথচ মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত আলাপ পরিচয় করিবে ইহা কখন সহ্য করা যায় না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আপনি বিজ্ঞ। সামান্য দোষ আপনি ক্ষমা না করিলে চলিবে কেন? বুঝিয়া দেখুন এক স্ত্রী আছে জানিয়াই তাঁহাকে আপনি জামাতা করিয়াছেন, এত কালের মধ্যে দৈবাৎ একবার পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে, ইহাতে গুরুতর রাগের কারণ কিছুই হয় নাই। মধ্যে মধ্যে সেই স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নরেশকে অনুরোধ করাই আপনার মত বিজ্ঞ লোকের উচিত। আপনি রাজ-রাজেশ্বর। চাহি কি সেই পূর্ব্ব স্ত্রীকে হরিপুরে নিজ বাটীতে না হউক স্বতন্ত্র এক বাটীতে রাখিয়া নরেশের সহিত সতত তাঁহার দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে, আপনার মহত্ত্ব ঘোষিত হইত।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন,—"হতভাগা যদি বলিত যে অন্যায় কাজ হইয়াছে, আর এমন কর্ম্ম কখন করিব না, তাহা হইলে কোন গোল হইত না; তাহা না করিয়া সে বেটা অনেক তর্ক করিল; এবং বুঝাইল যে, তাহার কাজ বড় অন্যায় হয় নাই। সে যাহাই হউক সে লুকাইয়া পলাইল কেন?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সে জামাতা—তাহাকে কএদীর ন্যায় আটকাইয়া রাখিলে থাকিতে পারিবে কেন? বিশেষ হেমলতা তাঁহার সহিত অনেক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে।"

পার্শ্ব হইতে হেমলতা ফোঁস করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আমি কি করিয়াছি? আমার নামে সে কি ঠকামি করিয়াছে?"

কার্ত্তিক বলিতে লাগিলেন,—"তুমি তাঁহাকে অন্নদাস বলিয়াছ, ইতর বলিয়াছ, আরও অনেক অপমানের ব্যবহার করিয়াছ।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"মন্দ কি বলিয়াছে; সে আপনার অবস্থা ভুলিয়া যদি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে হেমলতা কেন তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া অপমান না করিবে?"

কার্ত্তিক ভাবিলেন কি সর্ব্বনাশ! ঘোরতর অন্যায় করিয়া শাসনের পরিবর্ত্তে পিতার এই উৎসাহ! ইহার ফল অতি ভয়ানক হইবে। আমি কিছুতেই রাগ করিব না। যে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য ইচ্ছা করিয়াছি তাহার চেষ্টা করিতেই হইবে। বলিলেন,—"তবে আর আমাকে নরেশের সন্ধান করিতে বলিলেন কেন?"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"তাহার সন্ধান পাইলে বরকন্দাজ দিয়া ধরিয়া আনাইব, এবং দাস-দাসী দিয়া ঝাঁটা খাওয়াইব। আমার দুইটা শাসন বাক্য সে অত্যাচার বলিয়া মনে করে, হেমলতার দুইটী উচিত কথা সে অপমান বলিয়া বোধ করে, অত্যাচার অপমান কাহাকে বলে, তাহা তাহাকে শিখাইতে হইবে।"

কার্ত্তিক ভাবিলেন এ কথার এই স্থানেই উপসংহার হওয়া উচিত। বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, কলিকাতা সহরে বিপদ পদে পদে। হেমলতা যে ঐ লবঙ্গ মাগীর সহিত গাড়ীতে করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায় এ কাজটা দেখিতে শুনিতে ভাল নয়।"

রত্নেশ্বর বলিলের,—"কেন? হেমলতা অতি ধর্ম্মশীলা, বুদ্ধিমতী। আর লবঙ্গ অতিশয় বিশ্বাসী পাকা লোক; উপযুক্ত দরওয়ান সঙ্গে লইয়া যদি হেমলতা যে কয় দিন কলিকাতায় আছে, সে কয় দিন পাঁচ রকম দেখিয়া লয়, তাহাতে দোষ কি?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমি মূর্খলোক, সকল কথা ভাল বুঝিতে পারি না; তবে ইহা আমার বোধ হয় যে, এ কার্য্য ভাল হইতেছে না, শীঘ্রই এ জন্য ভয়ানক নিন্দা উঠিবে।"

রত্নেশ্বর রাগত স্বরে বলিলেন,—"নিন্দা! আমার মেয়ের নিন্দা করে এমন লোক এ দেশে কে আছে?"

কার্ত্তিক বুঝিলেন—তাঁহার পিতৃব্যের অহম্মুখতা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, বলিলেন,—"নিন্দাই যদি না হয়, অন্য অনিষ্টও অনেক হইতে পারে।"

রত্নেশ্বর কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মা হেমলতা, এবার যখন যেখানে যাইবে দুইজন দরওয়ান সঙ্গে লইবে; আর আমি কাল প্রাতেই যত দিন এখানে থাকিব তত দিনের জন্য আড়গোড়ার ভাল যুড়ি ঠিক করিয়া দিব, তাহার কোচ্‌ম্যান সহিস খুব পাকা লোক, সে গাড়ীতে চলা ফেরা করিলে কোন বিপদ হইবে না। যেখানে যাইবে মা সেখান হইতে একটু শীঘ্র ফিরিও। তুমি যতক্ষণ বাড়ী না থাক, ততক্ষণ সকলই অন্ধকার বোধ হয়।"

কার্ত্তিক মনে করিলেন, বেশ। সর্ব্বনাশ তো শিয়রে, তথাপি আর একটা কথা বলি, বলিলেন,—"লবঙ্গ বড় ভাল লোক নয়। উহার সহিত হেমলতার যাওয়া আসা ভাল নয়।"

রত্নেশ্বর বলিলেন,—"লবঙ্গের মত বিশ্বাসী লোক আর কে আছে? বিশেষ সে হেমলতাকে বড় ভালবাসে, কোথাও যাইতে আসিতে হইলে সে-ই সঙ্গে থাকা উচিত।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আপনি যাহাই বলুন আমার বিশ্বাস এই লবঙ্গের জন্য শীঘ্রই আমাদিগের ঘোরতর বিপদে পড়িতে হইবে।"

রত্নেশ্বর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি বড় ছেলে মানুষ, ভাবিয়াছিলাম এতদ্দিনে তোমার বুদ্ধি কিছু পাকিয়াছে, কিছু না! তখনও যা এখনও তাই রহিয়াছে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"এখন আসি তবে। বাহিরে একটী বন্ধু,অনেকক্ষণ একা বসিয়া রহিয়াছেন,কাল্ আবার আসিব।"

কার্ত্তিক প্রস্থান করিলেন।

হেমলতা মনে মনে বলিলেন,—"বেশ হইয়াছে। আমার কাজের উপর যেমন কথা কহিতে আসিয়াছিল, তেমনি সকল কথাতেই গালি খাইয়াছে।"

বাহিরে আসিয়া কার্ত্তিক মাণিকলালকে ডাকিয়া লইলেন, একখানি সেকেণ্ড্ক্লাশ গাড়ী ভাড়া করিয়া উভয়ে চোরবাগানের বাসায় চলিলেন। মাণিকলাল গাড়ীর মধ্যে বসিয়া লবঙ্গের সমস্ত কথা অকপটে কার্ত্তিককে জানাইলেন।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"এরূপ যে ঘটিবে, তাহা লক্ষণে বুঝিয়াছি। কি করিবে, মনে করিতেছ?"

মাণিকলাল বলিল,—"যাহা তুমি বলিবে"।

বাসার দরজায় গাড়ী লাগিল। ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তাঁহারা উপরে উঠিলেন। সিঁড়ির উপরে কিরণবালা দাঁড়াইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি কার্ত্তিকের হাত হইতে ছড়ি লইল,বলিল,—"ভগ্নী কলিকাতায় আসায় আজ কাল কিছু বেশী বেশী বাহিরে যাওয়া হইতেছে। কিছু খাওয়া দাওয়া হইয়াছে কি, মাণিক বাবু?

মাণিক বলিল,—"একটা পানও জোটে নাই।

বারান্দায় একখানা বেঞ্চ পড়িয়াছিল, তাহাতে বন্ধুদ্বয়কে বসিতে বলিয়া কিরণ এক ঘটি জল ও একখানি তোয়ালিয়া আনিল, তাহার পর কার্ত্তিককে চটিজুতা আনিয়া দিয়া তাঁহার পায়ের জুতা লইয়া গেল। বলিয়া গেল,—"তোমরা মুখ ধুইয়া ভিতরে আইস, আমি জল খাবার আনিতেছি। মুখে জল দিয়া কার্ত্তিক ও মাণিকলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দুইখানি প্লেটে লুচি-মোহন-ভোগ কিরণবালা উভয়ের সম্মুখে ধরিয়া দিল। জল খাওয়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে ভৃত্যকে ডাকিয়া দুই কলিকা তামাকু দিতে বলিল। ভোজন শেষ হইলে, সে ছিলিম্টী ধরিল এবং হাতে জল ঢালিয়া দিল। তাহার পর তাহাদের সম্মুখে পানের ডিবা স্থাপন করিল; তামাকু আসিল।"

তখন কার্ত্তিক বলিলেন,—"আজ মেজাজ্ নানা কারণে বড় খারাপ আছে, সকল কথা তোমাকে জানাইতে হইবে; তোমার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে হইবে, অনেক দিন কোন আবদার করি নাই, আজ যদি একটু ভিক্ষা চাহি, তাহা হইলে বিমুখ হইতে হইবে কি? সুন্দরি, সোণামুখি, পটোলচোকি, চাঁদবদনি, হৃদয়-মণি, একবার দয়া করিয়া বোতল বাহির করিবে কি?"

মাণিকলাল বলিল,—"কি কথাই বলিয়াছ! বেঁচে থাক কার্ত্তিক! তোমার ঐ গুণেই মরিয়া আছি। বিবি-সাহেব ধর্ম্ম অবতার তোমার এক কার্ত্তিক একশ হইবে। একটু হুকুম হোক!"

কিরণবালা বলিল,—"সোজা কথা বলিলেই হয় একটু মদ চাই। সে উঠিয়া গ্লাস্-কেসের মধ্য হইতে একটা কর্ক খোলা "বী-হাইভ" বাহির করিল, এবং দুইটী বড় গ্লাসে আন্দাজ দুই আউন্স করিয়া ঢালিল এবং জল মিশাইয়া উভয়ের নিকট দিল।"

কার্ত্তিক এক এক ঢোক সুরা উদরস্থ করিতে করিতে কুমুদিনী, হেমলতা, লবঙ্গ এবং নরেশ সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কিরণকে জানাইতে লাগিলেন, যেখানে যেখানে তাঁহার ফাঁক পড়িতে লাগিল মাণিকলাল সেস্থান গুছাইয়া দিলেন।

সমস্ত কথা শুনিয়া কিরণ বলিল,—"তোমাদের ভাবনার কথা দুইজন,—এক কুমুদিনী আর হেমলতা। তোমরা যতই মন্ত্রণা কর আমি দুজনেরই পরিণাম কি হইবে তাহা বলিয়া দিতে পারি।"

কার্ত্তিক কহিলেন,—"বৃহস্পতি মহাশয়ের জয় জয়কার হউক। বুদ্ধির দিয়াসলাই জ্বালাইয়া মনের অন্ধকার ঘুচাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক।"

কিরণ বলিল,—"কুমুদিনী কোথাও যান নাই। কলিকাতাতেই আছেন। তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবার তত আশঙ্কা নাই, বেশী চেষ্টা না করিলেও সহজেই তাহার সন্ধান হইবে। মাণিকলাল বাবুর চেষ্টাতেই কার্য্য হইবে।" আর হেমলতার গতিক বড় ভাল বুঝিতেছি না। তিনি একেবারে ডুবিবেন। আপাততঃ মাণিকলাল বাবু চেষ্টা করিলে কিছুদিন তিনি ভাসিয়া থাকিতে পারেন।"

মাণিক বলিল,—"তোমার এ হেঁয়ালির এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না ভাই! তুমি সকল ঝোঁকই আমার

ঘাড়ে চাপাইতেছ। সকল কথা বুঝিয়া লইতে হইলে অনেক সময় যাইবে; আজ আর বসিতে পারি না এখন যাই। কাল প্রাতে আসিব, যে পথে কাজ করিতে বলিবে, এ গোলাম তাহাই করিবে।"

মাণিকলাল উঠিয়া পড়িলেন।

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ বাঁকাশ্যামের বিশ্রাম কোন্ কুঞ্জে?"

মাণিক বলিল,—"হরিমতিই ভরসা। বিধাতা আজি কালি সেখানেই ভাত জল মাপাইয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় তাহাও আর চলে না।"

কিরণ জিজ্ঞাসিল,—"কেন? সে বাজারে শতমুখী সস্তা নাকি?"

মাণিক বলিল,—"শতমুখীতে আপত্তি নাই, কিন্তু কিছুই আর ভাল লাগে না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বৈরাগ্য মহাপুষেরই হয়।"

মাণিক প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

সৌর-জগৎ।

আমরা পৃথিবীর জীব; ভূরহস্য জানিবার কৌতূহল যেমন আমাদের স্বাভাবিক, আমাদের ধরিত্রী পৃথিবী যে বৃহৎ সৌরপরিবারভুক্ত, সেই সৌরজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার কৌতূহলও তেমনি আমাদের স্বভাবজ। বৈদিক গাথায় সূর্য্য-মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে; পুরাণে নবগ্রহস্তোত্র রচিত হইয়াছে; আবহমান কাল কত মনস্বী ব্যক্তি বিশ্ব-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য স্বকীয় জীবন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই একদিন না একদিন তারকাখচিত নীলাকাশ দেখিয়া উহার রহস্য অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন,কৌতূহলী পাঠকের জন্য পণ্ডিতগণের গবেষণালব্ধ জ্ঞান আমি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি মাত্র।

আমাদের বিশ্বজগতের সূর্য্য যেন বাড়ীর কর্ত্তাপুরুষ; অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহগণ স্বগণ পরিজন। এজন্য সূর্য্য-সংবাদ সর্ব্বাগ্রে বর্ণিত হওয়া উচিত।

প্রাচীন লোকদিগের দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে অনুমিত হইত যে,সূর্য্যই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে এবং "ভূরচলা স্বভাবতঃ" *। সর্ব্বপ্রথম কোপরনিকস, তৎপরে গ্যালিলিও উহার বিপরীত মত প্রচার করিয়া বলেন যে,'গতিশীল যানাদি হইতে পরিদৃশ্যমান নিসর্গসম্পৎ যেমন গতিশীল দেখায়, সেইরূপ, জঙ্গম জগৎ হইতে স্থাবর সূর্য্যকেও গতিশীল দেখায়, এবং জগৎকে আমরা বাস্তবিক 'জগৎ' বলিয়া বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক, সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।' ইহার পর আবার পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে,সূর্য্যও নিজের অক্ষদণ্ডকে (axis) আবেষ্টন করিয়া ভ্রাম্যমান সমগ্র বিশ্ব-পরিবারকে সঙ্গে লইয়া অনন্তাকাশে 'পাড়ি' দিয়াছে।

সূর্য্যের আকার ধরিতে গেলে ঠিক গোল, অর্থাৎ পৃথিবীর মত (spheroid) বৃত্তাভাস নহে। সূর্য্য নিজের অক্ষদণ্ডে আমাদের ২৫ দিন পরিমাণ সময়ে একবার আবর্ত্তিত হয়; এই সামান্য গতিবেগে তাহার উদরের যে যৎকিঞ্চিৎ স্ফীতি হইয়াছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু সূর্য্যের গোলাকার শরীর হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় অত্যুচ্চ ও বিশাল শিখা সমূহ উদ্গত হয়; এই সকল শিখা গ্রহণ সময়ে দেখা যায়। এই সকল শিখার জন্য সূর্য্যের আকার একটি গোল করাতের মত দেখায়।

সূর্য্যের ব্যাসের দৈর্ঘ্য ৮৬৬০০০ মাইল। সূর্য্য বৃহস্পতি গ্রহ অপেক্ষা ১০৪৭·১৭ গুণ ওজনে ভারি; বৃহস্পতি গ্রহগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিপুলকলেবর। ১৩ লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের আকারের সমান হইতে পারে। সূর্য্যকলেবর কঠিন নহে; সম্ভবতঃ সূর্য্য বাষ্পীয় অবস্থা হইতে কাঠিন্য প্রাপ্তির মধ্যদশায় উপনীত হইয়াছে। জলের সহিত তুলনায় তাহার গাঢ়ত্ব ১·৪ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সূর্য্য বিশ্বসংসারের সকল পরিবারের শাসনকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উগ্রস্বভাব; আমরা পৃথিবীতে যে তাপ প্রাপ্ত হই, তাহা সূর্য্যের নিজস্ব তাপের ২৫ ভাগের একভাগ মাত্র।

* "সিদ্ধান্ত শিরোমণি।"

দ্রব প্লাটিনাম (Platinum) ধাতু অপেক্ষাও সূর্য্যের তাপ অধিক *। সূর্য্য ক্রমশঃ কাঠিন্য প্রাপ্ত হইতেছে ; ইহাতে তাহার দেহের সঙ্কোচন হেতু তাহার তাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ; কিন্তু কঠিন দ্রব্যের সত্বর তাপমোচন (radiation) আবার স্বাভাবিক বলিয়া আমরা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কখনও সূর্য্যের তাপবৃদ্ধির পরিচয় পাই নাই। সূর্য্যবক্ষে ঝটিকাসংক্ষোভ ও উল্কাপাত নিবন্ধনও তাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। এগার বৎসর অন্তর এই ঝটিকা খুব প্রবল হয় ; সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রে সূর্য্যের তাপ ও অবস্থা বৈষম্যের জন্য নানাবিধ উৎপাত ঘটিয়া থাকে, এই সময়ে সূর্য্যের ফটোচিত্রে আমরা যে কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখি, তাহা ঝটিকাকৃত বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর চিহ্ন ; ঐ গহ্বর এক একটি এত বৃহৎ যে, সমস্ত গ্রহগুলি একত্রে নির্ব্বিবাদে তন্মধ্যে বাস করিতে পারে। সূর্য্যের প্রত্যেক বর্গফুট পরিমাণ স্থান হইতে প্রত্যহ যে তাপ উদ্গীরিত হয় তাহা ৪৩২ ১/২ মণ (১৬ টন) কয়লার আগুণের তাপের সমান। ৪৩ ১/২ ফুট মোটা বরফের চাদর দিয়া যদি সূর্য্যকলেবর আবৃত করিয়া দেওয়া যায়,তবে ঐ বরফস্তুপ গলিয়া বাষ্পে পরিণত হইতে এক মিনিট সময়ও লাগে না।

সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগণ অবিশ্রাম ভ্রমণ করিতেছে। গ্রহগণের পথ ঠিক বৃত্তাকার নহে, উহাকে বৃত্তাভাস (elliptical) বলা যাইতে পারে। ঐ বৃত্তাভাসের কেন্দ্র দুইটি ; তাহার এক কেন্দ্রে সূর্য্য অবস্থিত থাকিবেই। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে সকল গ্রহকক্ষের একটিকেন্দ্র এক অর্থাৎ সূর্য্য। এই জন্য সমগ্র গ্রহ উপগ্রহ মিলিয়া যে বৃহৎ পরিবার গঠিত হইয়াছে তাহাকে সৌর জগৎ বলা হয়।

বিশ্বজগতে এক আমাদের সূর্য্যই সূর্য্য নহে ; যাহা আমরা নক্ষত্ররূপে নৈশ নীলাকাশে দীপ্যমান দেখি তাহাও বাস্তবিক এক একটী সূর্য্য। তাহাদিগকেও বহু গ্রহ উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। তাহারা আমাদের সৌরজগৎ সীমা হইতে এতদূরে অবস্থিত রহিয়াছে যে, ইহার উপর উহাদের মাধ্যাকর্ষণ কোন ক্ষমতা পরিচালন করিতে অক্ষম। আমাদের সৌরজগৎ আকাশের ৫৫৬ কোটী মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তৎপরে অন্য সৌরজগতের রাজ্যসীমা আরম্ভ। আমাদের সৌরজগতে ৮টী গ্রহ, ২০ টীর অধিক উপগ্রহ, ৪০০।৫০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ অবিশ্রাম সুনিয়মে ঘুরিতেছে।

* ধাতুর মধ্যে প্লাটিনাম সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। প্রচণ্ড বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করিলেও platinum শীঘ্র গলান যায় না।

গ্রহ।

গ্রহগণের মধ্যে পৃথিবীই সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের পরিচিত। পৃথিবী নিজের অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে এক এক অহোরাত্রে একবার করিয়া আবর্ত্তিত হইতে হইতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই গতির পরিমাণ এক সেকেণ্ডে ১৮ মাইল। পৃথিবীর সর্ব্বসমেত তিনটী গতি—(১) নিজ অক্ষদণ্ডে আবর্ত্তন ; (২) নিজে আবর্ত্তিত হইতে হইতে সূর্য্য-প্রদক্ষিণ ; (৩) সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মহা শূন্যে যাত্রা। পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯ কোটী ২৯ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত (mean distance) ; পৃথিবীর পথ ঠিক বৃত্তাকার ধরিয়া লইলে,তাহার ব্যাস হইবে ১৮ কোটী ৫৮লক্ষ মাইল ও পরিধি ৫৮ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল। পৃথিবীর অন্যান্য বিবরণ বিশদ ভাবে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে (প্রদীপ ২।৩ ৪ সংখ্যা)।

সূর্য্যের ঘনিষ্ঠতম গ্রহ বুধ। এই জন্য সে সূর্য্যকে ৮৮ দিনেই একবার প্রদক্ষিণ করিতে পারে (পৃথিবীর ৩৬৫ দিন লাগে)। বুধ সূর্য্যের নিকটতম হইলেও উভয়ের ব্যবধান গড়ে * ৩ কোটী ৬০ লক্ষ মাইল। বুধ প্রতি সেকেণ্ডে ২৩ হইতে ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করে।

ব্যাসভাষিত নবগ্রহ স্তোত্রে বুধকে "শশিনঃ সুতঃ" বলা হইয়াছে ; এতৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কোন মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বুধ চন্দ্রশরীরের বিচ্ছিন্নাংশ বোধ হয় নহে ; কারণ তাহা হইলে বুধ চন্দ্র উপ-গ্রহের প্র-গ্রহ রূপে বিরাজ করিতে বাধ্য হইত। বুধ-গ্রহ খৃষ্ট জন্মের ২৬৫ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দু ও আরবদিগের পরিচিত ছিল। সংস্কৃতে পণ্ডিতের অপর নাম 'বুধ', বুধগ্রহের জীব কি খুব বুদ্ধিমান ?

বুধের পর শুক্র কক্ষ ; শুক্র ২২৫ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ইহা সূর্য্য হইতে পৌনে সাতকোটি মাইল দূরে। সেকেণ্ডে ২২ মাইল পথ অতিক্রম করে। শুক্রের পর পৃথিবী কক্ষ।

* গ্রহগণ বৃত্তাভাসে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে ; সূর্য্য সেই বৃত্তাভাসের এক কেন্দ্রে অবস্থিত এজন্য গ্রহ কখন সূর্য্যের অতি নিকটে কখন অতি দূরে গমন করে ; তজ্জন্য গ্রহ সকলের সূর্য্য হইতে ব্যবধান গড়ে লিখিত হইল। গ্রহগণের দূরান্তিক গতি হইতে গতিবেগেরও তারতম্য ঘটে। বিশদ বিবরণ চন্দ্রপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

পৃথিবী কক্ষের পরে মঙ্গল-কক্ষ। মঙ্গল সেকেণ্ডে ১৫ মাইল পথ চলিয়া ৬৮৭ দিনে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গলকে হিন্দুগণ "ধরণীগর্ভসম্ভূত" বলিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহাতে পৃথিবীর সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়াছেন। একদিকে শুক্র, অপরদিকে মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর প্রতিবেশী। শুক্রের উদয়াস্তের গোলযোগ হেতু তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু মঙ্গলে নগনদী ও বায়ুর অস্তিত্ব প্রচারিত হইয়াছে। পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলেরও মেরুপ্রদেশ নাকি তুষারাচ্ছন্ন ; সেখানকার আকাশেও মেঘ জমে, বৃষ্টি হয়। মঙ্গলের জীব নাকি মানুষ অপেক্ষা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ; তাহারা বড় বড় খাল কাটিয়া গমনাগমন ও কৃষির সুবিধা করিয়াছে ; সেরূপ প্রকাণ্ড খাল কাটা মানুষের অসাধ্য। মঙ্গল ও পৃথিবীর জীবের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের চেষ্টা উভয় গ্রহেই বহুদিন হইতে হইতেছে। মঙ্গলে কখন কখন অত্যুজ্জ্বল আলোক প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখা গিয়াছে। বহু পণ্ডিত অনুমান করেন যে, উহা পৃথিবীকে জ্ঞাত কারণ জ্বালিত হইয়াছিল। আমাদের সম্রাটের অভিষেক সময়ে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র একসঙ্গে অগ্নি (Bonfire) জ্বালিত হইয়াছিল, উদ্দেশ্য মুখ্যত আমোদ করা, গৌণত মঙ্গলগ্রহকে পৃথিবীর সংবাদ দেওয়া। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি (প্রবাসীতে) এ সকলের বিপরীত মত প্রচার করিয়াছেন। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"।

মঙ্গল আকারে পৃথিবীর অর্দ্ধেকের কিছু বড় হইবে, ব্যাস ৪২০০ মাইল মাত্র। সেখানে মাধ্যাকর্ষণ অতি ক্ষীণ। মঙ্গল সূর্য্য হইতে ১৪ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত।

মঙ্গলের পর ২৬০টী অতি ক্ষুদ্র গ্রহের স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারা সূর্য্য হইতে ২০ হইতে ৩০ কোটি মাইল দূরে থাকিয়া ভ্রমণ করিতেছে।

তৎপরে বৃহস্পতি কক্ষ। বৃহস্পতি ১২ বৎসরে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। ১০ ঘণ্টায় একবার নিজের অক্ষদণ্ডে আবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ তাহার অহোরাত্র পৃথিবীর ১০ ঘণ্টার সমান। কিন্তু বৃহস্পতির আকার পৃথিবীর আকারের ১২০০ গুণ বড়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ। বিপুল কলেবর লইয়া দ্রুত আবর্ত্তনে (সেকেণ্ডে ৮ মাইল) উহার উদরদেশ বিকট ভাবে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য সেখানে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি centrifugal force বড় প্রবল বলিয়া সেখানে দ্রব্যের ওজন পৃথিবী অপেক্ষা কম। বৃহস্পতি স্বয়ং কিন্তু ওজনে পৃথিবী অপেক্ষা ৩১৬ গুণ ভারি। শব্দরত্নাবলীতে বৃহস্পতিকে "গ্রহরাজ" বলা হইয়াছে। বৃহস্পতি পুরাণে "দেবগুরু" হইয়াছেন। বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে ৪৮ কোটি মাইল দূর অবস্থিত।

বৃহস্পতির পর শনি কক্ষ। শনি ২৯ বৎসরে একবার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে। শনির আকার বড় বিচিত্র ; বিস্তৃত বিবরণ পরে বক্তব্য। শনি ও সূর্য্যের মধ্যে ব্যবধান ১২৮ কোটি মাইল (কাহারও মতে ৮৮ কোটি মাইল)। সে সেকেণ্ডে ৬ মাইল চলে। ইহার আকার পৃথিবীর আকারের ৭৫০ গুণ।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গ্রহ-সংস্থানাদি।

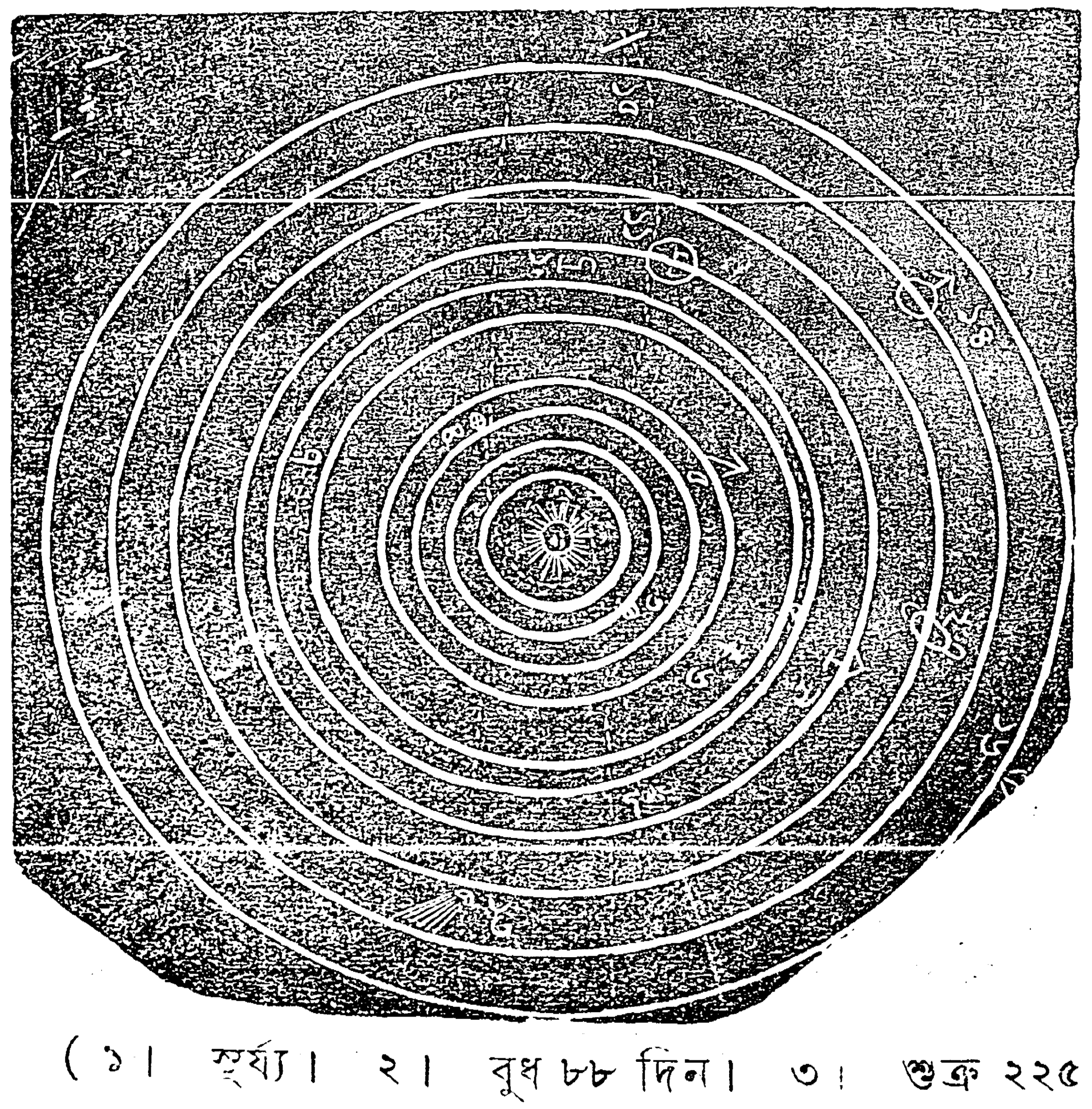

(১। সূর্য্য। ২। বুধ ৮৮ দিন। ৩। শুক্র ২২৫ দিন। ৪। পৃথিবী ৩৬৫ দিন। মঙ্গল ৬৮৭ দিন। ৬। ভেষ্টা। ৭। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গ্রহের কক্ষ। ৮। জুনো। ৯। প্যালাস। ১০। সিরিস। ১১। বৃহস্পতি ১২ বৎসর। ১২। শনি ২৯ বৎসর। ১৩। ধূমকেতু। ১৪। উরেনাস ৮৪ বৎসর। ১৫। উল্কাবলয়। ১৬ নেপচুন :৬৫ বৎসর।)

[সমগ্র সৌর-জগতের ক্ষেত্রের ব্যাস ৫৫৬০০০০০০০ মাইল। ভেষ্টা, জুনো, সিরিস ও প্যালাস অতিক্ষুদ্র গ্রহ-দিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। প্রত্যেক গ্রহের নিকটে যে সমস্ত বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হইল উহারা ঐ ঐ সন্নিহিত গ্রহের চন্দ্র বা উপগ্রহ।]

শনির পর উরেনাস। উহা ৮৪ বৎসরে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। উরেনাস হর্শেল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। কেহ কেহ উহাকে হিন্দু জ্যোতিষের রাহুর সহিত অভিন্ন মনে করেন। উহার ব্যাস-দৈর্ঘ্য ৩১৭০০ মাইল। আকার পৃথিবীর আকারের ৬৪ গুণ। ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ। সূর্য্য ও ইহার মধ্যে ব্যবধান ১৭৮ কোটি মাইল।

তৎপরে নেপচুন ১৬৫ বৎসরে সেকেণ্ডে ৪ মাইল চলিয়া একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। নেপচুনকে অনেকে হিন্দু জ্যোতিষের কেতু বলিয়া অনুমান করেন। নেপচুন সূর্য্য হইতে সকল গ্রহ অপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত (২৭৮ কোটি মাইল দূরে)। নেপচুন পৃথিবীর ১০০ গুণ। পূর্ব্বপৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্র দর্শনে গ্রহ সকলের সংস্থানাদি স্পষ্ট হওয়া সম্ভব।

বিষ্ণু পুরাণে (২।৭) গ্রহাদির সংস্থানাদিও যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

পৌরাণিক গ্রহসংস্থানাদি।

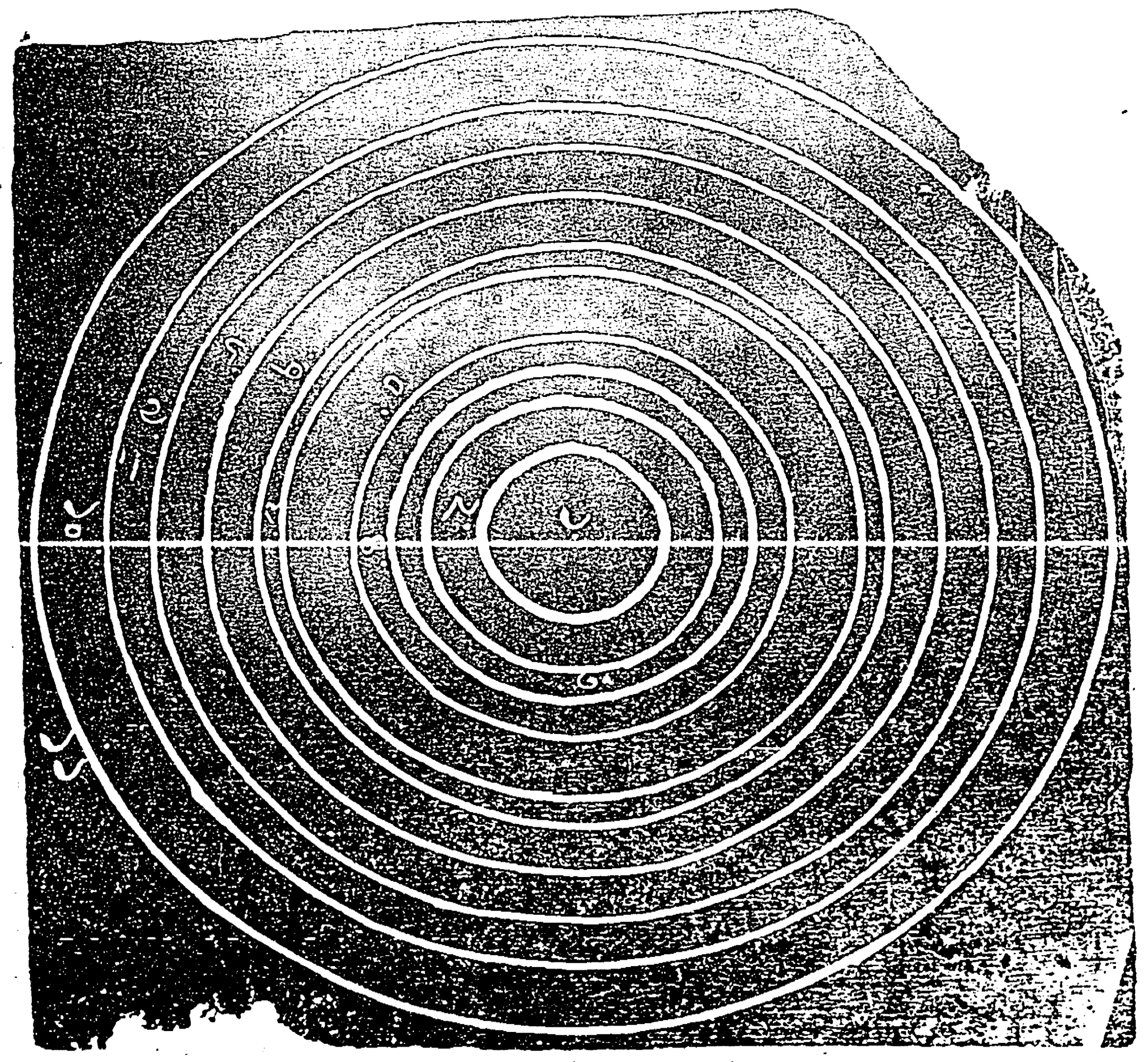

(১। পৃথিবী। ২। সূর্য্য ৩৬৫ দিন। ৩। চন্দ্র ২৭ দিন। ৪। নক্ষত্রমণ্ডল। ৫। বুধ ২১৬ দিন। ৬। শুক্র ৩৩৬ দিন। ৭। মঙ্গল ৫৪০ দিন। ৮। বৃহস্পতি ১২ বৎসর। ৯। শনি ৩০ বৎসর। ১০। রাহু ১৮ বৎসর। ১১। কেতু ১৮ বৎসর।)

[সমগ্র সৌর-জগৎ ক্ষেত্রের পরিমাণ (নভসঃ কক্ষা) ১৮৭১২০৬৯২০০০০:০০০ যোজন পরিমাণ (সিদ্ধান্ত শিরোমণি, গোলাধ্যায়।]

"ভূমে র্যোজন লক্ষে তু সৌরং মৈত্রেয় মণ্ডলম্।
লক্ষে দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্॥
পূর্ণে শত সহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাৎ প্রকাশতে॥
দ্বিলক্ষে চোত্তরে ব্রহ্মন্ বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ।
তাবৎ প্রমাণ ভাগেতু বুধস্যাপ্যুশনা স্থিতঃ॥
অঙ্গারকোহপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ।
লক্ষদ্বয়ে তু ভৌমস্য স্থিতঃ দেব পুরোহিতঃ॥
সৌর বৃহস্পতেশ্চোর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সমবস্থিতঃ॥"

হিন্দু জ্যোতিষে জগতের কেন্দ্র পৃথিবীকেই ধরা হইত, তাহাকেই অন্যান্য সকলে পরিক্রমণ করিতেছে ইহাই তখনকার বিশ্বাস ছিল। ভূভ্রম স্বীকৃত হইত না। এস্থলেও তদ্বৎ বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবী কেন্দ্ররূপে স্থির, তাহা হইতে লক্ষ যোজন দূরে সূর্য্যমণ্ডল; সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন দূরে চন্দ্রকক্ষ; চন্দ্রমণ্ডল হইতে শত সহস্র যোজন দূরে নক্ষত্রমণ্ডল; তাহা হইতে দ্বিলক্ষ যোজন দূরে বুধ; সেই প্রমাণ (অর্থাৎ দুই লক্ষ যোজন) দূরে শুক্র; শুক্র হইতে ঐ প্রমাণ দূরে মঙ্গল; মঙ্গল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন দূরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে দ্বিলক্ষ যোজন দূরে শনি।

বিষ্ণুপুরাণে গ্রহচক্রের পরিমাণাদিও লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। সিদ্ধান্তমঞ্জরী, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ও জ্যোতিস্তত্ত্বে গ্রহদিগের অস্তোদয় প্রভৃতি বহুবিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসভাষিত নবগ্রহ স্তোত্রে মঙ্গল লোহিতাঙ্গ, বুধ প্রিয়ঙ্গু কলিকাশ্যাম, বৃহস্পতি কনকসন্নিভ, শুক্র হিম-কুন্দমৃণালাভ, শনি নীলাঞ্জনচয়প্রখ্য, কেতু পলালধূমসঙ্কাশ, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ Spectroscope ধৃত উহাদের আলোকরশ্মিতে (Spectrum) কোন্ বর্ণ প্রধান দেখিয়াছেন তাহা আমি জ্ঞাত হইতে পারি নাই। বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে মঙ্গলকে অঙ্গারক ও ভৌম বলা হইয়াছে; শনিকে সৌরি বলা হইয়াছে।

নবগ্রহস্তোত্রেও মঙ্গলকে ধরণী-গর্ভ-সম্ভূত, বুধকে শশীর পুত্র, শনিকে রবিপুত্র, রাহুকে সিংহিকার পুত্র, কেতুকে রুদ্রাত্মজ বলা হইয়াছে। এ সকল যে আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শনিকে রবিপুত্র করা হইয়াছে। একা শনি কেন, সকল গ্রহই রবিশরীর বিচ্যুত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। রাহু কেতুর জন্ম কথা ত' সম্পূর্ণ কবিকল্পনাই বোধ হয়।

হিন্দু জ্যোতিষে গ্রহগণের গতি সম্বন্ধেও লিখিত হইয়াছে—"তেষামষ্টধা গতির্যথা—বক্রা, অতিবক্রা, কুটিলা, মন্দা, মন্দতরা, সমা, শীঘ্রা, শীঘ্রতরা।" এই গতি আধুনিক বিজ্ঞানের Least (মন্দা, মন্দতরা) mean (সমা), greatest (শীঘ্রা, শীঘ্রতরা) প্রভৃতির সহিত সমার্থক। বক্রা, অতিবক্রা, কুটিলা গতিদ্বারা গ্রহগণের elliptical motion বুঝান যায় বোধ হয়।

যে গ্রহ সূর্য্য হইতে যত দূরবর্ত্তী তাহার গতি ততই ধীর হইয়া থাকে। এক সেকেণ্ডে বুধ ৩১ মাইল, শুক্র ২২ মাইল, পৃথিবী ১৮ মাইল, মঙ্গল ১৫ মাইল, বৃহস্পতি ৮ মাইল, শনি ৬ মাইল, উরেনাসের গতি অজ্ঞাত, নেপচুন এক সেকেণ্ডে ৪ মাইল মাত্র পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সূর্য্যের ঘনিষ্ঠতম বুধ সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ও দূরস্থ নেপচুন অতিশয় অলসধর্ম্মা।

আবার, সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহগণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি, দূরস্থগণ অতিকায়। বুধ, শুক্র, মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র; বৃহস্পতি ত' গ্রহরাজ; শুক্র সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল; মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর অনুরূপ গ্রহ। অপর কোন গ্রহে জীবের অস্তিত্বনিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগুলির এখনও শৈশবাবস্থা, বোধ হয় এখনও উহারা তরল বলিয়া জীবনিবাসের উপযোগী হয় নাই। পৃথিবীও ত' এককালে তরল অগ্নিময় ছিল, পরে জীবজননী হইয়াছে। চন্দ্রও পৃথিবীর মত একদিন জীবরাজ্য হইয়াছিল বোধ হয়, এক্ষণে আবার জীবশূন্য হইয়াছে, এক্ষণে চন্দ্রের বৃদ্ধাবস্থা। পৃথিবীও কালে এইরূপ হইতে পারে; তখন অন্যান্য গ্রহগণ জীবনিবাসের উপযোগী হইয়া উঠিবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ সকলের ব্যাস ৫০০ মাইল হইতে ১০।২০ মাইল পর্য্যন্তও আছে। ইহা অপেক্ষাও বহু ক্ষুদ্র গ্রহ দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে।

উপগ্রহ।

পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্র প্রভৃতি উপগ্রহগণও সেইরূপ গ্রহগণকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। আমাদের জগতে এ পর্য্যন্ত ২১টি চন্দ্র বা উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর একটি, মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতির ৫টি, শনির ৮টি, উরেনসের ৪টি, এবং নেপচুনের ১টি চন্দ্র স্থির হইয়াছে।

পরবর্ত্তী তালিকা হইতে গ্রহাদির বিষয় জানা সহজ হইবে।

গ্রহগণের নাম	সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব লক্ষ মাইল হিসাবে। গড় দূরত্ব (mean)	অল্প দূরত্ব	অধিক দূরত্ব	বাৎসরিক দিনের সংখ্যা	অক্ষদণ্ডে আবর্ত্তন (axial rotation)	ব্যাস-দৈর্ঘ্য (mean diameter) মাইল হিসাবে	জলের তুলনায় গ্রহের ঘনত্ব	গ্রহের উপগ্রহসংখ্যা
বুধ	৩৬০·০	২৮০·৬	৪৩০·৩	৮৭·৯৬৯	সন্দেহ	৩০৩০	৬·৮৫ (?)	
শুক্র	৬৭০·২	৬৬০·৬	৬৭০·৫	২২৪·৭০	সন্দেহ	৭৭০০	৪·৮৫	
পৃথিবী	৯২০·৯	৯১০·১	৯৪০·৬	৩৬৫·২৬		৭৯১৮	৫·৫৮	১
মঙ্গল	১৪১০	১২৮০	১৫৫০	৬৮৬·৯৮		৪২৩০	৪·০১	২
বৃহস্পতি	৪৮৩০	৪৫৯০	৫০৫০	৪৩৩২·৬		৮৬৫০০	১·৩৮	৫
শনি	৮৮৬০	৮৩৪০	৯৩৬০	১০৭৫৯		৭১০০০	০·৭২	৮
উরেনাস	১৭৮২০	১৮৬০০	১৮৬০০	৩০৬৮৭	অজ্ঞাত	৩১৯০০	১·২২	৪
নেপচুন	২৭৯২০	২৮১০০	২৮১০০	৬০১২৭	অজ্ঞাত	৩৪৮০০	১·১১	১

পৃথিবীর চন্দ্র পৃথিবীকে ২৭·৩২২ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রও পৃথিবীর ন্যায় নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু আমরা আবহমান কাল হইতে চন্দ্রের এক পৃষ্ঠই দেখিয়া থাকি, তাহার অপর পৃষ্ঠ কখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। ইহার কারণ বড় কৌতুকাবহ, আপনার অক্ষদণ্ডে একবার আবর্ত্তিত হইতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, চন্দ্র সেই সময়ের মধ্যেই পৃথিবীকেও একবার পরিবেষ্টন করিয়া আসে। চন্দ্র নিজ অক্ষদণ্ডে বরাবর ঠিক সমান বেগে (uniform motion) আবর্ত্তিত হয়, কিন্তু নিজ কক্ষে ঠিক একই গতিতে ভ্রমণ করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না। চন্দ্রের গন্তব্য পথও (কক্ষ) অন্যান্য গ্রহকক্ষের ন্যায় একটি বৃত্তাভাস; সেই বৃত্তাভাসের খোঁদাল দিকটা (concave side) সর্ব্বদাই সূর্য্যের দিকে থাকে। * তাহা হইলে সূর্য্য চন্দ্রকক্ষেরও এক কেন্দ্রে অবস্থিত বুঝা যাইতেছে। কোন গ্রহ বা উপগ্রহ যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন

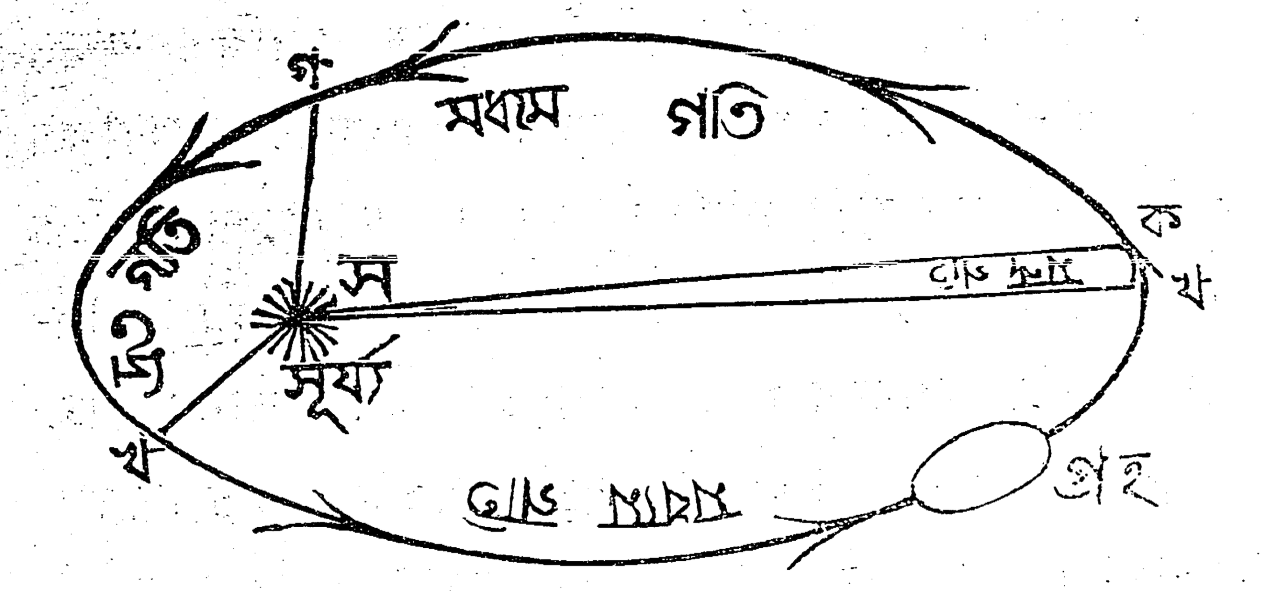

তাহার বেগ বৃদ্ধি ও দূরে গেলে বেগের হ্রাস হইয়া থাকে। † ইহার ফলে আমরা চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের কিয়দংশ একবার দ্রুতগতির স্থানে ও আর একবার মন্দ গতির স্থানে চন্দ্র উপস্থিত হইলে দেখিতে পাই। চন্দ্র যে গতিতে নিজের অক্ষদণ্ডে আবর্ত্তন করে দ্রুত ও মন্দ গতির স্থানে চন্দ্র সে গতিতে ভ্রমণ করিতে পারে না; এই গতিবৈষম্য হেতু তাহার অপর পৃষ্ঠের কিয়দংশ দেখা যায়। কিন্তু উহা এত অকিঞ্চিৎকর যে তাহা হইতে অপর পৃষ্ঠের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী; অর্থাৎ উভয়ের ব্যবধান পৃথিবীর বিষুব-ব্যাসার্দ্ধের (equatorial Semi-diameter or radius) ৫৯ গুণ। চন্দ্রের ব্যাস ২১৬০ মাইল (পৃথিবীর mean-diameter ৭৯১৮ মাইল)। চন্দ্রপৃষ্ঠ যে পর্ব্বতমরুকঙ্করময় তাহা অনেকের নিকট নূতন সংবাদ নহে; আরো চন্দ্র যে সূর্য্যালোকে দীপ্তিমান তাহাও আমাদের দেশে কালিদাসাদির কাল হইতেই পরিজ্ঞাত আছে। ছয় লক্ষ পূর্ণচন্দ্রের আলোক এক সূর্য্যের আলোকের সমকক্ষ হইতে পারে। চন্দ্রেও রাত্রি দিন পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু একটী চান্দ্র দিন ২৯টী পার্থিব দিনের সমতুল্য ও এক চান্দ্র রাত্রি ২৯টী পার্থিব রাত্রির সমান। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতি সামান্য, কারণ চন্দ্র পৃথিবীর আকারের ১/৮০ অংশ মাত্র। জলের তুলনায় চন্দ্রের গাঢ়ত্ব ৩·৫ (৩ ১/২) মাত্র।

আমরা চন্দ্রের আকার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতে দেখি; তাহার কারণ, সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের সংস্থান পারম্পর্য্য। শুক্লা প্রতিপদে সূর্য্যাস্তের পরক্ষণেই দিগ্বলয়ের ধারে চন্দ্রের এক কলা মাত্র প্রকাশ পায় ও অল্পক্ষণ পরেই উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রতিদিন কলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের স্থিতিকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমশ পশ্চিম দিগ্বলয় হইতে উচ্চস্থানে উদিত হইতে থাকে। সপ্তাহ পরে ইহা মধ্যগগনে উদিত হয় ও অর্দ্ধবৃত্তাকার ধারণ করে। যখন চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন উহা সূর্য্যাস্তের সমকালে সূর্য্যের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিগ্বলয়ের ধারে উদিত হয় ও সূর্য্যোদয়কালে পশ্চিম দিগ্বলয়ের নিম্নে অস্ত যায়। তৎপরে আবার তাহার তনুক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে এই সময় তাহার উদয় কাল ক্রমশঃ সূর্য্যোদয়ের নিকটবর্ত্তী

* ইহা প্রত্যক্ষতঃ অসম্ভব বোধ হইতে পারে। চন্দ্র পৃথিবীকে আবেষ্টন করিতেছে ও পৃথিবী সূর্য্যকে আবেষ্টন করিতেছে। তত্রাচ চন্দ্রের কক্ষের খোঁদাল দিক সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে থাকিবে, কখনও সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না, ইহাই বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রমাণ গণিত-নির্ভর বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

† এই গতি সর্ব্বত্র অসমান হইলেও উহারও একটা নিয়ম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কেপ্লার আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রহগণ সর্ব্বত্র এক সময়ে সম পরিমাণ ক্ষেত্র অতিক্রম করে (equal area in equal time); চিত্রাঙ্কিত কক্ষের কখস ক্ষেত্রে গঘস ক্ষেত্রের সমান। গ্রহ খ হইতে ক স্থানে আসিতে যে সময় লইবে, সেই সময় টুকুতেই তাহাকে গ হইতে ঘ স্থানে আসিতে হইবে। কাজেই গ্রহ বেচারাকে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া খুব দ্রুত চলিতে বাধ্য হইতে হয়। ক্ষেত্রদ্বয় সমান হইলেও ক্ষেত্রাংশ গঘ অপেক্ষা কখ অনেক ছোট। অসমান পথ একই সময়ে চলিতে হইলে দ্রুত ও মন্দগতি হইতেই হইবে।

হইতে থাকে ও দিনমানেও চন্দ্রের ধূসর কলেবর নয়নগোচর হয়; অবশেষে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র প্রকাশ পায় বলিয়া নয়নগোচর হয় না, ইহাই অমাবস্যা। চন্দ্রকলার গোল পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদাই সূর্য্যের দিকে ও খোঁদাল দিক সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে। ইহার কারণ সন্নিহিত ১নং চিত্র হইতে স্পষ্ট হওয়া

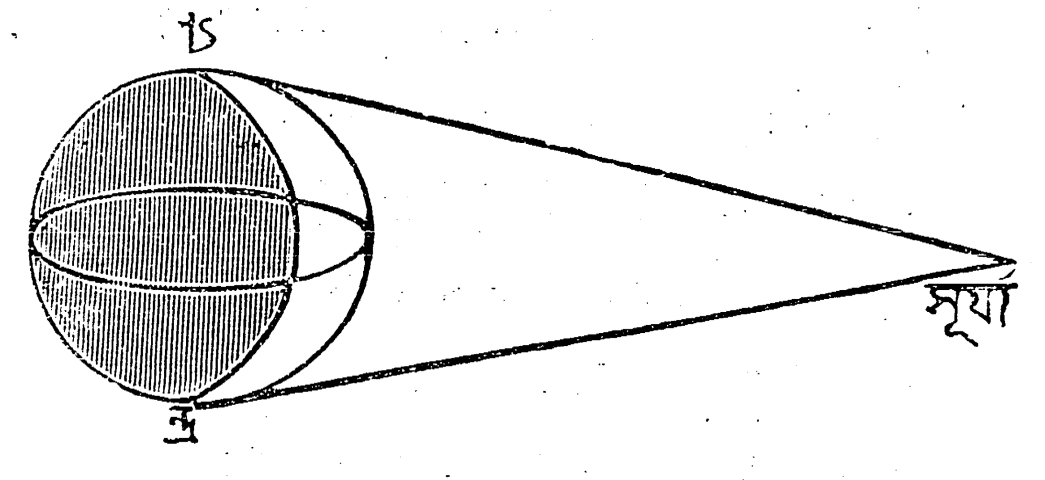

১ নং চিত্র।

সম্ভব। একটা প্রদীপের নিকট একটা বড় ফুটবল বা অন্য কোন গোলাকার বস্তু ধরিলেও দেখা যাইবে যে চিত্রের শুভ্রাংশের মত হইয়াই ফুটবলেও আলোক পাত হইয়াছে। শুক্ল পক্ষে খোঁদাল দিক পূর্ব্বমুখে ও কৃষ্ণপক্ষে পশ্চিমমুখে থাকে। মনে করুন কগ খঘ (২ নং চিত্র) বৃত্তই চন্দ্র।

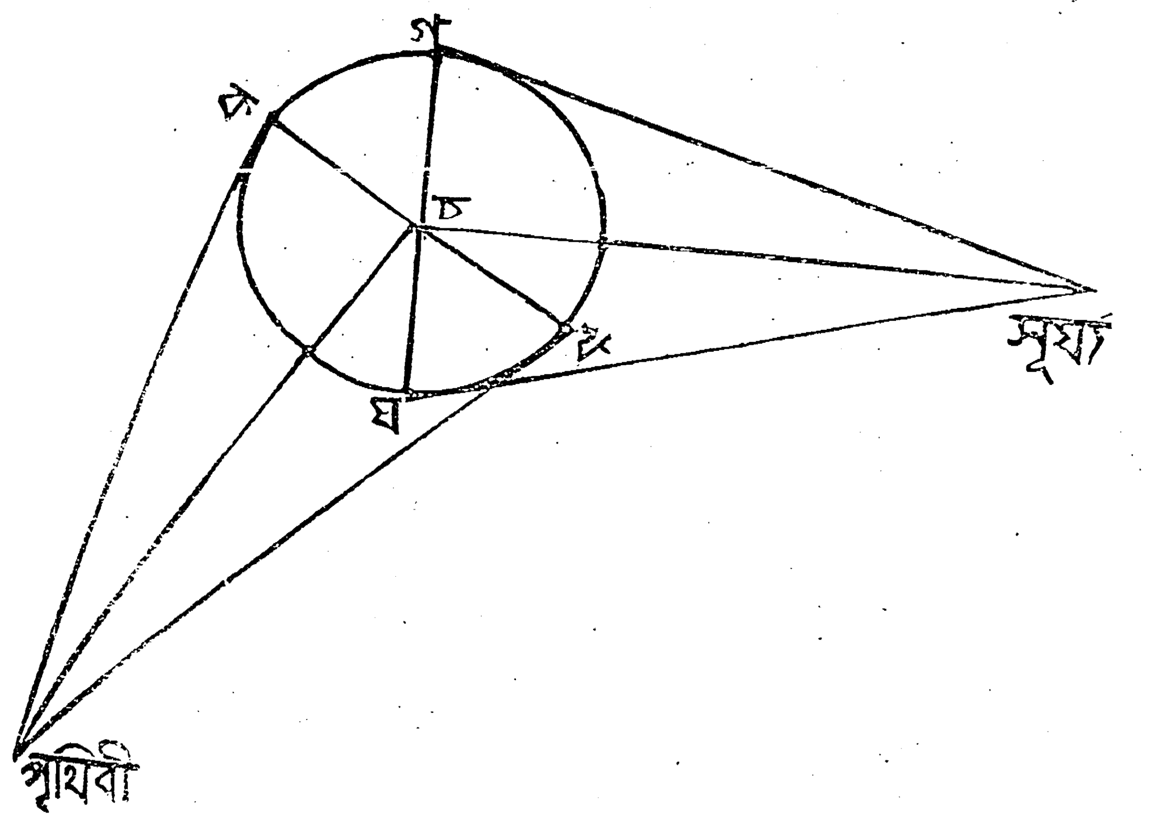

২ নং চিত্র।

পৃথিবী হইতে উহার অর্দ্ধাংশ কঘখ দেখা যাইবে; সূর্য্যালোকে গখঘ অপরার্দ্ধ আলোকিত হইবে। তাহা হইলে পৃথিবী হইতে ঘচখ অংশ মাত্র আলোকিত দেখা যাইবে। এই অংশ নিরেট বৃত্তের (solid circle) একটী অংশ বলিয়া দেখিতে কমলা লেবুর একটী কোয়ার মত হইবে; কিংবা একটা পেয়ারা কাটিয়া সমান আট ভাগ করিলে যেরূপ দেখায় তদ্বৎ দেখাইবে। সেই পেয়ারা খণ্ড দূরে কোন সমতলের উপর যদি চেপ্টা হইয়া লাগিয়া যায় তাহা হইলে তাহার এক দিক কটাহ পৃষ্ঠের মত অপর দিক কটাহ মধ্যের মত দেখাইবে সন্দেহ নাই। এই জন্যই চন্দ্রকলার পৃষ্ঠদেশ বৃত্তাংশ ও উদরদেশ বৃত্তভাগাংশবৎ (Segment of a circle and an ellipse) প্রতীয়মান হয়।

চন্দ্র ও পৃথিবী সৌরজগৎ ক্ষেত্রে এক সমতলে থাকিয়া পর্য্যটন করে না। যদি তাহা করিত তাহা হইলে চন্দ্র ও সূর্য্যের মাঝখানে পৃথিবী পড়িলে প্রায়ই গ্রহণ বা অমাবস্যা উপস্থিত হইত। এজন্য পৃথিবীর কক্ষক্ষেত্র হইতে চন্দ্রের কক্ষক্ষেত্র ৫° ডিগ্রি বক্র। যে স্থানে চন্দ্রকক্ষ ও ধরাকক্ষ পরস্পর কাটিয়াছে তাহার নিকটে চন্দ্র বা সূর্য্য একটা নির্দ্দিষ্ট দূরে অবস্থিত থাকিলে গ্রহণ সংঘটিত হইয়া থাকে। ঐ উভয় কক্ষের সাক্ষাৎ স্থানকে ইংরাজিতে node কহে। গ্রহণ যে পৃথিবীর ছায়াতেই সংঘটিত হয়, ইহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন সন্দেহ নাই।

মঙ্গলের চন্দ্র দুইটী অতি ক্ষুদ্র উহাদের ব্যাস ১০ মাইলের অধিক হইবে না। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ গত বর্ষের প্রদীপে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত লিখিত "মঙ্গলের গৃহে বিধি বৈচিত্র" প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে বলিয়া এস্থলে আর লিখিত হইল না।

বৃহস্পতি যেমন গ্রহরাজ তাহার চন্দ্রটীও তেমনি বৃহত্তম। উহার ব্যাস ৫৫৫০ মাইল। শনির একটী সহচর ও প্রায় ইহার সমকক্ষ। ইহারা বুধগ্রহ অপেক্ষাও বৃহৎ কলেবর।

শনি গ্রহের ৮টি চন্দ্র ব্যতীত একটী অদ্ভুতবলয় তাহাকে বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তিত হয়। ঐ বলয় বোধ হয় ছোট বড় ৩টী বলয়ের সমষ্টি, কোনটী অধিক চৌড়া কোনটি অধিক সূক্ষ্ম। আটটি চন্দ্র আবার একটী অদ্ভুত বলয়, শনির অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শনি যাহার অদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করেন তাহাকে কখনও সুপ্রসন্ন হইতে দেখা যায় না।

শনির বলয় অথবা চক্রের ব্যাস ১লক্ষ ৭২ হাজার ৮ শত মাইল। উহার পরিসর ৪২৩০০ মাইল; শনির পৃষ্ঠ হইতে উহার দূরত্ব ৬ হাজার মাইল। উহার বেধ ৫০ মাইলের অনধিক। এই বলয়ত্রয় তিনটী অখণ্ড পদার্থ নহে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহ দলবদ্ধ হইয়া শনিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; তাহাদের ক্ষুদ্রত্ব ও দূরত্ব হেতু

তাহাদিগকে অখণ্ড চক্রবৎ দেখায়। এই শত সহস্র ক্ষুদ্র ও ৮টি বৃহৎ চন্দ্র লইয়া শনির আকাশ না জানি কত সুন্দর ও বৈচিত্রময় হইয়া আছে!

(ক্রমশঃ।)

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্জ্জুনের দৃঢ়তা।

রত্ন-দীপ্ত-কক্ষ তলে, বৈজয়ন্তপুরে,
বিচিত্র আসনে বসি, বীর ধনঞ্জয়
কুমার কল্পিত কান্তি; মণিময় চূড়ে
ঝলিছে চঞ্চল আলো, কর্ণকুবলয়
কুণ্ডলে মণ্ডিত চারু, ললাটে লম্বিত
সুদীর্ঘ পৌণ্ড্রক-রেখা—স্থির, সুগম্ভীর,
সরল, সুন্দর, শান্ত—যেন বিরাজিত
দ্বিতীয় দেবেন্দ্র মূর্ত্তি আনন্দ মন্দিরে।

বিগত প্রথম যাম, স্নিগ্ধ নিশিথিনী!
শব্দহীন-স্তব্ধতায় মগ্ন স্বর্গপুর!
সহসা মন্দির দ্বারে রণিল কিঙ্কিণী,
ধ্বনিল কঙ্কণ সহ মুখর নূপুর।
বিস্মিত অর্জ্জুন চাহি, সস্মিত নয়নে
হেরিলেন,—রত্নদীপ্ত দীপ শিখা রাশি
ম্লানিয়া, মঞ্জুল রাগে, কুঞ্জর গমনে,
আলোক-লাবণ্যময়ী-অপূর্ব্বা উর্ব্বশী
পশিল মন্দির মাঝে,—যথা রশ্মি রেখা
নাশিয়া শশীর আলো, অমল আভায়—
উদয় অর্গল খুলি, ধীরে দেয় দেখা
বিশ্ব মন্দিরের দ্বারে—আসন্ন উষায়।

চকিতে বিদ্যুত-ক্ষিপ্র-কটাক্ষ কঠোর
হানিয়া, পার্থের পাশে দাঁড়াইল আসি;—
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মুনি মন-চোর
মূর্ত্তিখানি,—প্রসারিয়া রিক্ত রূপরাশি!
সসম্ভ্রমে তেয়াগিয়া স্বর্ণ সিংহাসন,
কহিলেন, নতশিরে, কুন্তীর কুমার;—
"কি হেতু জননি তব হেথা আগমন?
কি কার্য্য সাধিবে ভৃত্য? কহ মা আমার!"

"একি পরিহাস পার্থ, একি সম্বোধন?
জননী? জননী নহি—প্রেম ভিখারিণী
রমণী তোমার আমি। কুন্তীর নন্দন
তুমি, আমি ত্রিদিবের বারবিলাসিনী;
ইন্দ্রের আদেশ ক্রমে, আসিয়াছি হেথা,
তুষিতে হৃদয় তব, আজিকার নিশা
যাপিব তোমার সাথে। মম চিত্ত ব্যথা
ঘুচাও হৃদয় সখে! হারায়েছি দিশা,
হেরিয়া তোমার ঐ অপূর্ব্ব মূরতি
উদ্দাম যৌবনাক্রান্ত। ইন্দ্রের সভায়
মুহুর্ম্মুহু অসঙ্গত সঙ্গীত স্ফূরতি,
পদে পদে চিরাভ্যস্ত নৃত্যে অন্তরায়,
ঘটেছিল তাই। সখে! মন্মথ শাসনে
সন্তপ্ত অন্তর জ্বালা ঘুচাও ত্বরিতে;
প্রীতি-পরিপ্লুত ক্ষিপ্র প্রেম আলিঙ্গনে।"
এতেক বলিয়া, চিত্ত চঞ্চলা চকিতে
প্রসারিল বাহু যুগ পার্থের উদ্দেশে;
লবঙ্গ বল্লরী যথা বন্ধন প্রয়াসী
উন্নত তমাল বরে! নয়ন নিমেষে
পশ্চাতে সরিয়া পার্থ, কহিল উচ্ছ্বাসি;
"একি অনুচিত বাঞ্ছা জননী তোমার!
শুনেছি তোমার গর্ব্ভে হয়েছে বর্দ্ধিত,
অতিপূর্ব্ব পিতামহ কুরু পাণ্ডবের,
সুচির-যৌবনা তুমি, রয়েছ জীবিত
এতকাল, মাতাইতে অমর মণ্ডলী!
পিতামহী জননী সমান, অসম্ভব,
পারিব না ধর্ম্ম শিরে দিয়া জলাঞ্জলি,
পাঠাইতে প্রেতপুরে সমগ্র পাণ্ডব।
অতএব, ক্ষমা করি অধম সন্তানে,
চলে যাও দয়াময়ী আপনার স্থানে।"

"এ কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মম্ভরী ময়
গর্ব্বিত বচন-বাণ নির্দ্দয় সমান
নিক্ষেপিছ, প্রেমাধিনী রমণী হৃদয়
বিদ্ধ করি! ধনঞ্জয়! বহু পুণ্যবান
নরপতি, কুরুবংশে লভিয়া জনম,
শুভ্র সুকৃতির ফলে স্বর্গাগত আজি,
তাঁহারা কেমনে তবে ত্যজিয়া ধরম,
আমার পঙ্কিল (?) প্রেমে হইয়াছে রাজি?
নহে পরিহার যোগ্য এরূপ যৌবন,
শুধু দেবতার ভোগ্য,—মর্ত্ত্যের মানবে
যাচিয়া দিতেছি তাহা। তথাপি এমন
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিছ গৌরবে?"

"শ্রবণ বধির হউক"—কর্ণ চাপি করে
কহিলেন ধনঞ্জয়; "শুনিব না আর
হেন পাপময় বাণী! শ্রবণ বিবরে
পশিয়া, পঙ্কিল স্রোতে, করিছে আঘাত
অন্তরের বেলাভূমে! একি স্বর্গপুরী
চির পবিত্রতা পূর্ণ? কিংবা স্বপ্ন ঘোরে
হেরিতেছি বিসদৃশ—নেত্র দাহ করি
নরকের অভিনয়! রক্ষা কর মোরে
দয়াময় দীন বন্ধো! এ ঘোর নরকে
মজিবে পাণ্ডবকুল—মজিব আপনি!
তুমি সাক্ষী অনন্তের, হে হৃদয় সখে!
নিতান্ত নির্দ্দোষী আমি, তথাপি এখনি
উর্ব্বশীর অভিশাপে হ'ব ভস্মসাৎ!
এইবার রক্ষা কর ওহে দীননাথ।"

"চাহ না আমার প্রেম? হে দাম্ভিক নর!
এতই ঘৃণিত এ কি? যুগ যুগান্তরে
দেবতার অভীপ্সিত যাহার অন্তর,
মানব হইয়া আজি ঘৃণ্য পদভরে
অবাধে দলিলে তাহা! আজি উর্ব্বশীর
অনন্ত-রূপ-যৌবন দীন হীনা বেশে
মাগিছে প্রণয় ভিক্ষা; নর প্রণয়ীর
পদ পাশে, হে অর্জ্জুন, তথাপি কি শেষে
রিক্ত হৃদে ফিরে যেতে শূন্য গৃহ মুখে?
স্বেচ্ছাকৃত পূরালে না মোর অভিলাষ
মম শাপে, নপুংসক হ'য়ে, চিরদুখে
রমণী সমাজে তুমি করিবে হে বাস।"
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইল উর্ব্বশী;
উল্কা যথা—দ্রুতবেগে কক্ষ হ'তে খসি!

রামপ্রসাদ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

পদাবলী—কালী কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন।

জ্যৈষ্ঠের "প্রদীপে" আমরা "কবিরঞ্জন" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে কবিরঞ্জনের সাধু-জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি; সাধুসঙ্গও যেমন পুণ্যময়—সাধুর জীবনী সমালোচনাও তেমনি পুণ্যময়। রামপ্রসাদ যে কেবল শ্যামা-মায়ের রাঙ্গাপদভক্ত সাধু ছিলেন তাহা নহে, তিনি ভাবুক ও কবি ছিলেন—সংসারচিত্রাঙ্কনেও তাঁহার যথেষ্ট গুণপণা ছিল। আমরা আজ সংক্ষেপে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমাদিগের দুর্ভাগ্য যে কবিরঞ্জনের অমর লেখনী প্রসূত সামান্য কয়েকখানিমাত্র চিত্র আমরা পাইয়াছি।

(১) কবিরঞ্জন—অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর।

(২) শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তনং—অর্থাৎ "ভবজলধি নিমগ্ন রুগ্নজনগন বিমোচন করণ কারণ ভুবনপর্ণলিকা কালিকার গোষ্ঠাদি লীলা বর্ণন।"

(৩) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।

(৪) পদাবলী।

রামপ্রসাদ তাঁহার অমূল্য পদাবলীর জন্যই বঙ্গবাসীর চিরপরিচিত ও পূজনীয়। বর্ণনাচাতুর্য্যে, ঝঙ্কারে, পদলালিত্যে, শব্দমন্ত্রে ভারতের বিদ্যাসুন্দর কবিরঞ্জন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ভারতের বিদ্যাসুন্দর মধ্যাহ্ন তপন হইলে "কবিরঞ্জন" পূর্ণিমার চন্দ্র। কবিরঞ্জনের

জন্য কেহ কবিরঞ্জনকে চেনে না—তাঁহার ভক্তিসঙ্গীত বা পদাবলীর জন্যই তিনি পরিচিত। সে কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহারই শক্তি-সঙ্গীত গাহিয়া শক্তি-ভক্ত শাক্তগণ আপন আপন হৃদয়ের ভক্তি মায়ের রাঙ্গাচরণে উপহার দিয়া আসিতেছেন। যে গানের সুরে একদিন বঙ্গদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল—আজিও সাধকের সাধা বীণায় সেই সুর বাঁধা হইয়া রহিয়াছে। যেমন মান ভঞ্জনের যুগে রাখাল মাঠে ধেনু ছাড়িয়া দিয়া বেণু বাজাইয়া "রাধে গো রাধে গো" বলিয়া রাগিণী ধরিত—যুবক মানময়ী পত্নীর চিবুক ধরিয়া মানভঞ্জনের ভাবে মাখা ঈশ্বর গুপ্তের ঃ—

"মানময়ী তোলো মুখ কহিছে খঞ্জন ;
দেখিব কেমন তোর নয়ন রঞ্জন।
এখনি করিব সব বিবাদ ভঞ্জন,
কালো কোরে রাখিয়াছ মাখিয়া অঞ্জন।"

প্রভৃতি গাহিয়া মানভঞ্জন করিত, বঙ্গের তখন সেই এক যুগ গিয়াছে। তখন চারিদিকেই "পূর্ব্বরাগ" চারিদিকে "মানভঞ্জন" তেমনি রামপ্রসাদের সময়েও বঙ্গে এক নব ভাবের নব তরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইত। তখন মান মাথুর ছিল না, পূর্ব্বরাগ ছিল না, বিরহ ছিল না—সে যুগে ছিল শ্যামা কীর্ত্তন। তখন বালক যুবক বৃদ্ধ তন্ময় চিত্তে ভক্তমুখে শক্তি-সঙ্গীত শুনিত ; রামপ্রসাদ সেই গীত-সুধার আধার ছিলেন। অধুনা মান মাথুর ভাসিয়া গিয়াছে কিন্তু রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত বিলুপ্ত হয় নাই।

রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের আদরের ছেলে—স্নেহের সন্তান ; তাই শিশু যেমন জননীর উপর অভিমান করে—জননীর স্নেহাঞ্চল ধরিয়া শত আবদার করে, রামপ্রসাদও তেমনি করিতেন। তাহাতে কি প্রসাদ-জননী কখনও কোপান্বিতা হইতে পারেন? জননীর অতুল স্নেহের মাধুর্য্য যে জানে সে একথা কহিবে না। মাতৃস্নেহের বিশাল পক্ষপুটান্তরালে থাকিয়াই ত সন্তান আবদার করে, অভিমান করে, কাঁদে, হাসে—শিশুর অসীম নির্ভর যে জননীর স্নেহ। রামপ্রসাদ সেই অসীম নির্ভরের উপর আপন স্বত্বা স্থাপিত করিয়া শিশুর মত কাঁদিয়াছেন, শিশুর মত অভিমান করিয়াছেন—সেই কাতর ক্রন্দন, সেই স্নেহের অভিমান প্রভৃতি আজ আমরা প্রসাদ পদাবলী স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি। রামপ্রসাদের সেই অভিমান রুক্ষ নহে—ভক্তের পূতাশ্রুসিক্ত উহা ভক্তাধীনের প্রতি ভক্ত হৃদয়ের করুণ নিবেদন—"উহা নিগৃহীত বালকের স্নেহের স্বত্বা স্থাপন।"

"শিশু যেমন মায়ের কাছে মার খাইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিয়া মায়ের কোলে যাইতে চায়, রামপ্রসাদও সেইরূপ সংসারের দুঃখ কষ্ট সমস্ত মায়ের দান জানিয়াও 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নির্ভরমিষ্ট সকরুণ গীতিমালা অত্যধিক হৃদয়াবেগে চির পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।" *

রামপ্রসাদ জ্ঞাননয়নে কালীমূর্ত্তি, দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূত হৃদয়ের শোণিত—রাঙ্গাচরণ স্পর্শে পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল, রামপ্রসাদের জগৎ শ্যামাময় হইয়াছিল—প্রতি পত্রমর্ম্মরে তিনি মায়ের আহ্বান শুনিতেন—প্রতি ভ্রমরগুঞ্জনে কোকিলকূজনে তাঁহার অন্তরের অন্তরে ধ্বনিত হইত 'মা' 'মা' "মা"—শিশির-সিক্ত প্রভাত-কুসুমে প্রসাদ-জননীর চরণকমল দেখিতে পাইতেন—তাই তাঁহার পদাবলী এত সুন্দর অথচ সরল, এত ভক্তি ভরা।

"কালীমূর্ত্তি যে ভাবে তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ হইত, তাহা মহামহিম, গূঢ় রহস্যে ব্যক্ত—অতি সুন্দর ; তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি শব্দ ও উপমার জন্য লালায়িত হইয়াছেন ; অপ্রস্ফুট সৌন্দর্য্যাবলী জড়িত হইয়া সেই মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে,—

চলিয়ে চলিয়ে কে আসে দ্রুতগতি
দলে দানবদলে ধরি করতলে গজ গরাসে।
কেরে—কালীর শরীরে, রুধিরে শোভিছে
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে॥

প্রভৃতি গান ভক্তের কণ্ঠে শুনিলে মানসপটে মাধুর্য্য-মিশ্র এক ভৈরব ছবি অঙ্কিত হয়।" †

রামপ্রসাদ যে কতগুলি গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা ঠিক নির্ণীত হইয়াছে কি না জানি না ; কেহ কেহ বলেন, রামপ্রসাদ এক লক্ষ পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় নিম্নলিখিত সঙ্গীতটীকে তাহারই প্রমাণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

"জানিলাম বিষম বড় শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
ফুকারে ফরেদী দাদী না হয় সঞ্চার রে॥
* * * * *
লাক উকিল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,
মাগো তোমায় তারা ডাকে, আমি ডাকি
কান নাই বুঝি মার রে।
* * * * "

গ্রন্থ রচনাপেক্ষা যে পদাবলী রচনাতেই রামপ্রসাদের জীবন অধিক ব্যয়িত হইয়াছে তাহার আর ভুল নাই। গীত দ্বারা শক্তি মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার জন্য তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল। সেই অনুরাগের পরিচয় আমরা কবির বিদ্যাসুন্দরেও পাই ঃ—

"বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত॥"

যাহা হউক তাই বলিয়া যে রামপ্রসাদ এক লক্ষ পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহা সহসা মনে স্থান দিতে পারা যায় না। আবার ইহাও কতকাংশে সত্য যে তাঁহার মত ভক্ত এক লক্ষ গীত রচনা না করিয়াই তাঁহার উপাস্য দেবীর সমক্ষে কেমন করিয়া বলিবেন—"লাক উকিল করেছি খাড়া" ; আমরা বলি "লাক" অর্থে এখানে 'বহু' এক লক্ষ নহে।

কবিরঞ্জন ভারতচন্দ্রের মত কবিতা ব্যবসায়ী ছিলেন না ; তিনি কবিতা রচনা হইতে শ্যামারাধনাতেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। যাহাও রচিত হইত তাহাও যে রীতিমত পত্রস্থ হইত ইহাও বোধ হয় না। কারণ তাঁহার মানসিক অবস্থা অন্যরূপ ছিল। সুতরাং প্রসাদ যখন গাহিয়া ছিলেন "লাক উকিল করেছি খাড়া" তখন তাঁহার মনে ছিল যে তিনি অনেক পদ রচনা করিয়াছেন—সংখ্যার দিকে দৃষ্টি ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। 'বহু' এই অর্থ বুঝাইতে হইলে আমরাও বলিয়া থাকি "লাক লাক" বা 'হাজার হাজার'—তখন সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখি না।

প্রসাদের এক একটী গান ক্ষুদ্র নহে—বরং অতিশয় দীর্ঘ। সুতরাং প্রত্যহ এরূপ দীর্ঘ গীত তিনটী করিয়া রচনা করিলেও এক লক্ষ গান রচনা করিতে বহু বৎসর আবশ্যক। শ্যামাবিষয়ক পদাবলী ভিন্ন প্রসাদ আরও যে সকল পদ বা কবিতা বা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহার সহিত শ্যামাসঙ্গীত সংযুক্ত হইলে তিনি যে কিরূপে "লাক উকিল" খাড়া করিবার সময় সংকুলান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে তাঁহার অন্য রচনা হইতে পদাবলীর সংখ্যাই অধিক। আমরা সেই সকল অমূল্য ভক্তি-সঙ্গীতের সামান্য মাত্র পাইয়াছি। ইহা আমাদিগের নিতান্তই দুর্ভাগ্য। রামপ্রসাদের পরেও অনেকে শ্যামা বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তেমন আর হয় নাই। তাঁহার মত ভক্তি, একান্ত ধ্যান নিষ্ঠা ও সারল্য এবং কবিত্ব পাইলে তবে তদ্রূপ গীত রচিত হইতে পারে—"যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

কবিতায় রূপক বর্ণনাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—তাহাতেই অধিক পাণ্ডিত্য আবশ্যক। কবিরঞ্জনের সে পাণ্ডিত্য ছিল তিনি রূপক বর্ণনায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। আমরা একটী উদাহরণ দিতেছি ;—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরু তলের চারিফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায়—তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধরে রবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম—দুটো অজা তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি॥
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে হতে বুঝাইবি॥
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি।
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন্ মন হবি॥

প্রসাদ পদাবলী অন্বেষণ করিলে এরূপ গান দুর্লভ নহে বরং অত্যন্ত সুলভ। ভাষার উপরেও কবিরঞ্জনের অধিকার কম ছিল না। তাঁহার হস্তে লেখনী প্রিয়-সহচরীর ন্যায় কার্য্য করিত ; আমার জনৈক বন্ধু একদিন স্বর্গীয় দীনবন্ধু বাবুর কথা বলিতে বলিতে বলিয়াছিলেন, 'দীনবন্ধুর হস্তে লেখনী যেন ভেল্কীওয়ালার হস্তে

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। † বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

আত্মারাম সরকারের অস্থি খণ্ড'। বন্ধুবরের উক্তি রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইতে পারে। কি সরল কি জটিল উভয়বিধ রচনাতেই রামপ্রসাদ সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রামপ্রসাদ যে কেবল একজন সাধক ও কবি ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন দার্শনিক কবি ছিলেন; তাঁহার দার্শনিকত্ব প্রায় সকল ভক্তি-সঙ্গীতেই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পাপ পুণ্য, জন্ম মৃত্যু, লোকান্তর-বাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রসাদের অভিমত তাঁহার নিম্নলিখিত গানেই পূর্ণ প্রকটিত। প্রসাদগীতাবলী অনুসন্ধান করিলে এমন গীতের অভাব হয় না।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্যগণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে॥

পঞ্চভূতে দেহ, পঞ্চভূতের জন্য—দেহান্তে ভূত ভূতে মিশাইবে—জলবুদ্বুদ অনন্ত জলরাশি মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে—জলের প্রতিবিম্ব জলে লয়প্রাপ্ত হইবে। প্রসাদ তাই সরল ভাষায় জটিল দার্শনিকতত্ত্ব শিখাইয়াছেন ঃ—

"যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে।"

রামপ্রসাদের ভক্তিগীতি অনন্ত রত্নরাশি—সেই সমুজ্জ্বল রত্ন সম্ভারে বঙ্গভাষা অলঙ্কৃতা।

প্রসাদের কালী-কীর্ত্তনও তাঁহার সাধন সঙ্গীতের তুল্য। কালী-কীর্ত্তনকে একখানি গীতিকাব্য বলা যাইতে পারে।

হীরকখণ্ড বহুমূল্য কিন্তু আকারে কত ক্ষুদ্র; প্রসাদের কালী-কীর্ত্তনও তেমনি আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু অমূল্য। কালী কীর্ত্তনে কবি দৈবশক্তি সহায় করিয়া স্বীয় উপাস্য দেবীর স্তুতিবাদ গাহিয়াছেন। তাই তাঁহার ভক্তহৃদয়ের সকল ভাব প্রস্ফুটিত স্থলকমলবৎ কীর্ত্তনের অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রসাদ সাধক—প্রসাদ ভক্ত—প্রসাদ কবি। তাঁহার ভক্ত হৃদয়ে ভাবের লহর উঠিয়াছে—সেই ভাব তরঙ্গের শৃঙ্গে শৃঙ্গে তিনি শ্যামা মায়ের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্যামা কখন বালিকা—সুন্দরী সরলা স্নেহময়ী; কখন বা তিনি যুবতী, দেব বাঞ্ছিতা, মহাদেব-প্রেমবিহ্বলা, যেন প্রভাত-শিশির-স্নাত নন্দনের প্রথম পারিজাত; কখন বা আবার শ্যামা জননী—জগদ্ধাত্রী, পুত্রবৎসলা।

গৌরীর বাল্যলীলা বর্ণনায় কবি রামপ্রসাদ শিশু চরিত্রের একখানি অবিকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উমার ক্রন্দনে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া গিরিরাণী গাহিতেছেন ঃ——

"গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা, কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।"

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে—চন্দ্রের রজতরশ্মিস্রোতে জগত ভাসিয়া যাইতেছে, বালিকা উমা ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন, 'আমি চাঁদ ধরিব।' যাঁহার পদনখরে লক্ষ লক্ষ পূর্ণিমার চন্দ্র বিরাজ করিতেছে, তিনিই কাঁদিয়া কহিতেছেন, "আমি চাঁদ ধরিব"। 'আকাশের চাঁদ কি ফাঁদে ধরা পড়ে?' উমা তাহা শুনিলেন না—বালিকা চাঁদ ধরিবেই ধরিবে।

অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী;
বলে, উমা ধরে দে উহারে॥
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?

উমার ব্যাকুলতা দেখিয়া গিরিরাণী যতই কাতরা হইতেছেন, উমা ততই চাঁদ ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন। জননী শতবার কহিতেছেন 'চাঁদ কি ধরা যায়?' তিনি শতবার স্নেহভরে ক্ষীর সর দিয়া বালিকাকে ভুলাইতে চাহিতেছেন, স্তনপান করাইয়া শান্ত করিতে চাহিতেছেন কিন্তু কিছুতেই উমা শান্ত হইতেছেন না। বালিকা তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দিয়া জননীর করধারণ পূর্ব্বক—

"আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।"

গিরিরাণী বুঝিয়াছেন উমা চাঁদ ধরিবার জন্য তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন—জননীর স্নেহপুত্তলি সেই ক্ষুদ্র বালিকা কিছুতেই বুঝিতেছেন না যে চাঁদ ধরা যায় না। তত্রাচ জননী যখন স্নেহপূর্ণ বচনে পুনরায় কহিলেন "চাঁদ কিরে ধরা যায়," তখন বালিকা উমার বড় ক্রোধ হইল, অভিমান হইল; তিনি বালিকার ন্যায় আপন ভূষণ খুলিয়া জননীর দেহের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—প্রসাদের বালিকা চরিত্র চিত্র সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

"আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।"

এই একছত্র "ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে" ইহা হইতেই শিশুচরিত্র চিত্রে রামপ্রসাদের অসীম ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চাঁদ পাইলেন না বলিয়া উমার অভিমান শতভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল তখন,

"উঠে ব'সে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরিরে লইয়া কোলে করে॥
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥"

এই বর্ণনাটী কি সুন্দর—কি কবিত্বপূর্ণ! গিরিরাজ জানিতেন উমার কথা না শুনিলে তাঁহাকে কিছুতেই শান্ত করা যাইবে না; তিনি অমনি একখানি স্বচ্ছ মুকুর লইয়া সেই আবদেরে মেয়ের সম্মুখে ধরিলেন—কন্যার কোটী শশধর বিনিন্দিত মুখ মুকুরে প্রতিফলিত হইল, উমা চন্দ্র পাইয়া পুলকিতা হইলেন আমরা কবি রামপ্রসাদের বর্ণনা চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইলাম।

আবার দেখুন শিশু চরিত্রের চিত্র! উমা যাহা চাহিলেন তাহা পাইলেন—চন্দ্র পাইয়া শান্ত উমা পিতার ক্রোড়ে বসিয়া কত আদরের কথা—কত সোহাগের কথা শুনিতে শুনিতে অমনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন—চন্দ্র ভুলিলেন—চন্দ্রের জন্য রোদন ভুলিলেন সকল ভুলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পিতার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন, পিতা ঘুমন্ত বালিকাকে ধীরে ধীরে পালঙ্কের উপর স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন—

কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে।"

আমরা কবি রামপ্রসাদ লিখিত যে চিত্র দেখাইলাম সেই একই চিত্রে শিশুর চিত্র ও জননীর বাৎসল্য একাধারে চিত্রিত—পাঠক দেখিলেন সে চিত্র কেমন স্বভাব সুন্দর—কত স্বাভাবিক!

উমা দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন, বালিকা এখন আর বালিকা নাই—আর সে চন্দ্র ধরিবার জন্য অভিমান নাই—সে আবদার নাই—সে ভূষণ নিক্ষেপ করিয়া প্রহার নাই; এখন উমার জীবন একটী নবভাবে বিভোর—উমা এখন হর-মোহিনী, উমা অনশনে ব্রত করিতেছেন—নানা ফুল তুলিয়া অন্তরে অন্তরে শঙ্করের পূজা করিতেছেন। কিন্তু মেনকা রমণী—মেনকা জননী—মেনকা স্নেহময়ী। তাঁহার প্রাণে কন্যার এ কঠোর ব্রতাবলম্বন সহিতেছে না, তাই তিনি কাঁদিয়া আকুল—

"কি কর কি কর মা এটা।
এ নব বয়সে, কুমারী, এদেশে
এমন কঠোর কেটা?
গৌরীর আমার ননীর পুতলীতনু, উপরে প্রচণ্ড ভানু,
কিরণে উনয় নবনীত।
মরি মরি সুকুমারী নবীন কিশোরী গৌরী,
বাছা, কেন করগো মা এমন অনীত!"
ইত্যাদি

এ চিত্রেও জননী চরিত্র প্রস্ফুটিত। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেনকা কহিতেছেন।

"একাসনে অনাহারে, আরাধনা কর কার?
এ কঠোর তপে কিবা ফল?
মরমে পরম ব্যথা, না রাখে মায়ের কথা,
ছাড় এ কঠোর, গৃহে চল॥"

মা হ'য়ে মা মায়ের হৃদয়ে আর ব্যথা দিতে পারিলেন না, জননীর কাতর আহ্বানে ব্রতভঙ্গ হইল, যুবতী উমা জননীর হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। আহা! সে বর্ণনাটী কত মধুর—

"দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর,
করহুঁ করহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি, হাসিত বদন বেরি বেরি,

চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোলনা॥
ঝুনুর ঝুনুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থল কমল নিন্দি, নখ হিমকর গঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহারে, মেরু বিচক হিমকরাকার,
বিবুধ তটিনী বিষদনীর, ছলে তনূ রঞ্জনা॥
কষিত বালক বিমল কান্তি, মনহিতাপ করত শান্তি,
তন্নতিরপিত নয়ন সুখ, কল্মষ খণিকর ভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবি তনয় শঙ্কা, মদন মথন অঙ্গনা।"

কালী কীর্ত্তনে এরূপ সুন্দর লিপিচাতুর্য্যের অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। জননী সর্ব্বদাই সন্তানের জন্য উন্মাদিনী—গাছের পাতাটী নড়িলে তাঁহার বুকের ভিতর আঘাত লাগে 'বুঝি বাছার আমার কি হইল'—জননী পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তিল মাত্র অদর্শনে ব্যাকুলা হন 'বাছা আমার কোথায় আছে, কি করিতেছে, কেমন আছে'। যিনি এত স্নেহময়ী সন্তান-মঙ্গল-তৎপরা তিনি যদি একদিন স্বপ্নে সন্তানের অমঙ্গল দেখেন তাহা হইলে যে আত্মহারা হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি? একদিন নিদ্রাবশে রাণী স্বপ্ন দেখিতেছেন—

"গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে ধেয়েছে মুখে চাঁদে॥
শুনেছি পুরাণে বহু, মুখ খানা বটে রাহু,
শরীরের সংজ্ঞা তার কেতু॥
এ রাহুর জটা মাথে, দারুণ ত্রিশূল হাতে,
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু॥"

উমা-জননী কাঁদিয়া আকুল, স্থির হইল শিবস্বস্ত্যয়ন করাই বিধেয় তাহা হইলেই সকল অমঙ্গল কাটিয়া যাইবে।

"রাহু গ্রাস করে যে শশীরে
সেই শশী রাহুর শিরে।
কোথা গেলে গিরিবর
শিব স্বস্ত্যয়ন কর,
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করাও,
জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ তাহে জানি॥"

তখন গৌরী স্নান করিয়া সিংহাসনে বসিলেন, সকলে মিলিয়া উমার বেশবিন্যাসে ব্যস্ত হইলেন; হিমগিরি সুন্দরী বসনাঞ্চলে নয়ন মুছিতে মুছিতে মনোমত ভূষণে গৌরীর গৌর দেহ সজ্জিত করিতে লাগিলেন—

"সুচারু বকুল মালে, কবরী বান্ধিল ভালে,
হরি চন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিঁন্দূর বিন্দু রবিকরে যেন ইন্দু,
হেরি হেরি নিমেষ তেজিল।
দোসর মুকুতা হার, কোন সহচরী আর,
গেঁথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন, চাঁদবেড়া তারা যেন,
উদয় কোরেছে মেঘের কোলে॥"

পাঠক দেখিলেন কবির লীলাময়ী লেখনী কি সুন্দর চিত্রই অঙ্কন করিতেছে। গৌরীর মুখচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে মুকুতারূপ নক্ষত্র সজ্জিত—নক্ষত্র হার দুলিতেছে—দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। কপোলে চাঁচর চিকুর—সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ রাশির পার্শ্বে যেন "তারা ঘেরা" চন্দ্রোদয় হইয়াছে। পাঠক দেখুন সেই অনিন্দ্য সুন্দরীর মোহিনী ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হউন—

"তারার কপালে তারা,
তার পতি যেন তারা ঘেরা,
তারায় তারা সাজে ভালো।
বদন সুধাংশু হেন, তাহে তারা মুক্তা ঘন
কেশরূপ ঘন করে আলো।
হাসিয়া বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ ছলে,
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া ধায়, দন্ত শ্রেণী দেখা যায়,
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী।"

কালী-কীর্ত্তন হইতে আরও দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। কবি ভগবতীর মুখচন্দ্র বর্ণনা করিতেছেন—

"শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইল চাঁদে।
সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে॥

*　　　*　　　*

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, যে চন্দ্রের প্রথম কলা অগ্নি, দ্বিতীয় কলা রবি, তৃতীয় কলা বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধীপ, পঞ্চম বষট্কার, ষষ্ঠ বাসব, সপ্তম ঋষি

সকল, অষ্টম অজএক্পাদ্, নবম যম, দশম বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, চতুর্দ্দশ পশু-পতি, পঞ্চদশ কলা প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। চন্দ্রের সমুদয় কলা পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখা যায় না।

কবি গৌরীর মুখচন্দ্রের বর্ণনায় বলিতেছেন,—

"ভুবন বিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার।
পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার।
এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম।
বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম॥
বাসনা হইল সুধা সঞ্চয় কারনে।
চাঁদ পাত্র বদলিয়া রাখিল বদনে॥
পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল।
দশ খণ্ড হোয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল॥"

আবার অন্যত্র আছে ঃ—

"চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা।
চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা।
কেন চাঁদ কমলে হইল শাত্রবতা?
চাঁদ বলে, ইহা সয় কি? আমার শোভা যার মুখে যায়,
ছি রে কমল তাই হইতে চায়॥
এতবলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে।
অভিমানে কমল সলিল মাঝে ভাসে॥

*　　　*　　　*

বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহু।
করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু॥
নিরখি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ।
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ॥

*　　　*　　　*

দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ।
করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ॥"

একস্থানে কবি ভগবতীর শিব বিরহ বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

"করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে॥
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্ক ধর।
ত্রিপুরাসুর গর্ব্ব বিনাশ কর॥
জয় বেদ বিদাম্বর ভূতপতে।
জয় বিশ্ব বিনাশক বিশ্বপতে॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু।
পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু॥
কমণীয় কলেবর পঞ্চমুখে।
মম চারু নাম বলি গান সুখে॥" ইত্যাদি

কালী-কীর্ত্তন যে কবে রচিত হইয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে কীর্ত্তনের এক স্থানে আছে ঃ—

"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন,
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিসা শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। কবি তাঁহারই আদেশে বা অনুরোধে কালী-কীর্ত্তন রচিয়া থাকিবেন। আমরা ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলে দেখিতে পাই ঃ—

'ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥
ভূপতির পিসার জামাই তিন জন।
কৃষ্ণানন্দ মুখুর্য্যা পরম যশোধন॥
মুখুর্য্যা আনন্দিরাম কুলের সাগর।
মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলা ধর॥'' *

কালী-কীর্ত্তনে রামপ্রসাদের শ্যামা কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা পাগলা ভোলার পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতেছেন, কখন বা মহাদেব বিরহে দর-বিগলিতধার নেত্রে বিরহব্যথিত হৃদয়ে কাতরোক্তি করিতেছেন। আবার দেখিতে পাই—রামপ্রসাদের শ্যামা "একাম্রকাননে" কানুর মত বেণু বাজাইয়া ধেনু চরাইতে যাইতেছেন। তাঁহার সেই রাঙ্গা পাদপদ্ম দুখানি ভূমি স্পর্শ করিতেছে; প্রতি পাদবিক্ষেপে যেন গন্ধ কুসুম ফুটিয়া উঠিতেছে। কবি মানসনয়নে এ সকলই দেখিতেছেন; সেই কোমল পদের কোমল আঘাতে যেন ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে ধূলিপটল উত্থিত হইয়া গগনাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, ধেনুগণের ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত রেণু ভানু ঢাকিয়া ফেলিতেছে—কবির হৃদয়ে এ সকল চিত্র সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছিল, তিনি লেখনী সাহায্যে আমাদিগের জন্য সেই সকল মোহিনী ছবি চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

---

* রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন।

রামপ্রসাদের শ্যামা শ্যামে প্রভেদ ছিল না। তাঁহার শ্যামা বাঁশরী হস্তে ধেনু চরাইতে যাইতেন, রাসলীলায় মত্ত হইতেন। তাই আমরা কালী-কীর্ত্তনে ভগবতীর বাল্যলীলা, তারপর গোষ্ঠলীলা এবং তারপর রাসলীলা দেখিতে পাই। রাসলীলার সমুদয় অংশ পাওয়া যায় না। আমি তাহার সামান্যমাত্রই দেখিয়াছি। যতটুকু দেখিয়াছি, তাহার মুখবন্ধ এইরূপ ঃ—

“জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী।
ঝলমল তনুরুচি স্থিরা সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখ চাঁদে।
শশঙ্ক শশাঙ্ক কেশ রাহু ভ্রমে কাঁদে॥ ইত্যাদি।

কবির কৃষ্ণ-কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না, কারণ আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের কেবল একটি কবিতাই পাইয়াছি। রচনা দেখিয়া মনে হয় কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রশংসার যোগ্য ছিল।

কালীকীর্ত্তনে অশ্লীলতার নাম গন্ধ মাত্র নাই—যেমন বর্ণনা তেমনি ভাষা, তেমনি ভাব। কবিরঞ্জন কালীকীর্ত্তন গাহিয়া অমর হইয়াছেন। গ্রন্থখানি সুন্দর হইলেও ইহার রচনা প্রণালীর কিছু দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। কীর্ত্তনের অনেক স্থলেই ছন্দের একতা বা পরিমাণের সমতা দৃষ্ট হয় না—মিল ও অনেক স্থানে ভাল হয় নাই। শ্যামাপাদপদ্মধ্যান নিমগ্ন সাধক কবি আত্মহারা হইয়া তাঁহার উন্মাদ হৃদয়ের ভাবশিখা উন্মাদের মত গ্রথিত করিয়াছেন। তাই ছন্দের দিকে, বিরামের দিকে, মিলের দিকে, দৃষ্টি করেন নাই, যে কথা যেমন মনে হইয়াছে অমনি তাহা লিখিয়া গিয়াছেন—যে ফুল সম্মুখে পাইয়াছেন তাহাই গাঁথিয়া গিয়াছেন। গন্ধের দিকে রঙ্গের দিকে, শোভার দিকে দৃষ্টি করেন নাই। ভক্তি কথা ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া সাজিয়া গুজিয়া লোক লোচনান্তর্গত হইবার অবসর পায় নাই। ভাবে যখন হৃদয় পূর্ণ হয় তখন ভাষার উৎসমুখে ভাবরাশি পার্ব্বত্য তরঙ্গিণীর অপ্রতিহত বেগে বহির্গত হইয়া পড়ে—সে মহাশক্তির সম্মুখে বাধাবন্ধ ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া যায়, তাই ইংরাজ কবি সেক্ষপীয়রের জন্য স্বতন্ত্র ব্যাকরণ, স্বতন্ত্র অভিধান।

রামপ্রসাদের যুগে রুচি যেরূপ বিকৃত ছিল, তাহাতে কালীকীর্ত্তন বা কৃষ্ণকীর্ত্তন বা প্রসাদ পদাবলীর ন্যায় সুরুচিপূর্ণ সুন্দর রচনা বড়ই দুলভ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমরা প্রসাদের সুন্দর রচনা পাই নাই—আমাদিগের দুরদৃষ্ট যে আমরা অনেক কাচ পাইয়াছি—কাঞ্চন হারাইয়াছি।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

আসামের নাগা জাতি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহের মধ্যে যে সকল অসভ্য জাতিগণ বাস করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কুকী, খাসিয়া, ঝান্তি, লুসাই, নাগা, গারো, মিষমী মিরি প্রভৃতি জাতিগণ অধিক প্রসিদ্ধ। জগতের যাবতীয় সুসভ্য জাতিসকলের ইতিহাস পাঠে তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, আহার বিহার ও পরিচ্ছদাদির বিষয় অবগত হইলে মনে যেরূপ একপ্রকার আনন্দ অনুভব হয়, সেইরূপ এই সকল এবং অন্যান্য ঈদৃশ অসভ্য, বর্ব্বর জাতির জীবন অতিবাহিত করিবার প্রণালীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও মনে যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল বর্ব্বরস্বভাবাপন্ন মানব সম্প্রদায়ের চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের হিংসা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি নীচপ্রবৃত্তির সহিত একতা, অধ্যবসায়, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া সময়ে সময়ে চমৎকৃত হইতে হয়।

পূর্ব্বভারতের যে সকল জাতি সাধারণতঃ নাগা বলিয়া পরিচিত তাহারা আসাম উপত্যকার ঊর্দ্ধাংশের পার্ব্বত্য জেলা সমূহে ও ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণভাগে বসবাস করিয়া থাকে। সমগ্র নাগা সম্প্রদায় প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন নাগা-দলপতির অধীন; কিন্তু ইহাদের বিষয় অতি অল্পই জানা যায়। ওয়েন (John Owen) সাহেব তাঁহার গ্রন্থে আসাম সংশ্লিষ্ট যে সকল নাগাদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদেরই বিষয় আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলিব।

গ্রন্থকার বিবেচনা করেন, ‘নাগা’ নামটি সংস্কৃত নাগ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া নিকটবর্ত্তী সমতল ভূমির অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। এই জাতির উৎপত্তি কবে এবং কিরূপে হইল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। আকার, অবয়ব, স্বভাব, ভাষা ইত্যাদি দেখিয়া স্বভাবত মনে হয়, এশিয়ার কোন অংশ হইতে ইহারা আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; কারণ সকল বিষয়েই ইহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জাতি সমুদায় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। কেহ কেহ কল্পনা করেন, ত্রয়োদশ

নাগারমণিগণ।

বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চীনের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে যে সকল আদিম লোকগণ পলায়ন করে, তাহারাই বর্ত্তমান নাগাগণের পূর্ব্বপুরুষ।

আসামবাসী নাগাগণের মধ্যে, নাম—‘সাঙ্গিয়াস’ বা ‘কাঙ্গজাঙ্গিয়াস,’ ‘বারদোয়ারিয়াস’ বা ‘টাকুনিয়াস’ এবং ‘পানি-দোয়ারিয়াস’ বা ‘বারগিয়াস’ নামক তিন সম্প্রদায়ই প্রধান। এই তিন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার প্রায় একই প্রকারের। সাধারণ মনুষ্যজাতির সহিত নাগাগণের অবয়বের প্রধান পার্থক্য, তাহাদের মস্তকের কেশ ও গাত্রের লোমাবলী অতি অল্প, পুরুষগণের গোঁপ দাড়ি পর্য্যন্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মাথার কেশে গাঁইট বাঁধিয়া তাহাতে অর্দ্ধগোলাকৃতি কাষ্ঠনির্ম্মিত চিরুণি সংবদ্ধ করিয়া রাখা তাহাদের প্রথা। নাগারা ঊর্দ্ধে সাধারণতঃ প্রায় চারি হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে স্থূলাকৃতি লোকের বড়ই অভাব। তাহারা যখন গৃহে থাকে, তখন অধিকাংশ সময় তাহাদিগকে উলঙ্গ অবস্থাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে স্ত্রীলোক বা

পুরুষ কেহ কোনরূপ লজ্জা বোধ করে না। যখন বস্ত্রাদি পরিহিত আসামিগণের সম্মুখে গমন করে, তখন ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা তাহাদের কটিদেশ আবৃত করিয়া থাকে। সচরাচর নগ্নাবস্থায় থাকিলেও, তাহাদিগের স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতিই পোষাক ও অলঙ্কারদ্বারা দেহ শোভিত করিতে ভাল বাসে। লোমযুক্ত বস্ত্র ও নানাবর্ণের প্রস্তরের এবং কাচের মালা তাহাদের প্রধান অলঙ্কার। নাগা পাহাড়ে স্বর্ণের অভাব না থাকিলেও, তাহারা স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিতে বা স্বর্ণের কোনরূপ ব্যবহার করিতে আদৌ জানে না। যোদ্ধাগণ তাহাদের মৃত শত্রুর দন্ত-পংক্তি ও পরচুলা দ্বারা নিজ নিজ অঙ্গ ভূষিত করে এবং বরাহ দন্ত তাহাদের কর্ণে এয়ারিংয়ের স্থলে ব্যবহার করে। রমণিগণও এই প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। সর্দ্দার বা দলপতিগণ গৃহ সজ্জিত করিতে মনুষ্য বা পশুমুণ্ডের শুষ্ক কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া থাকে।

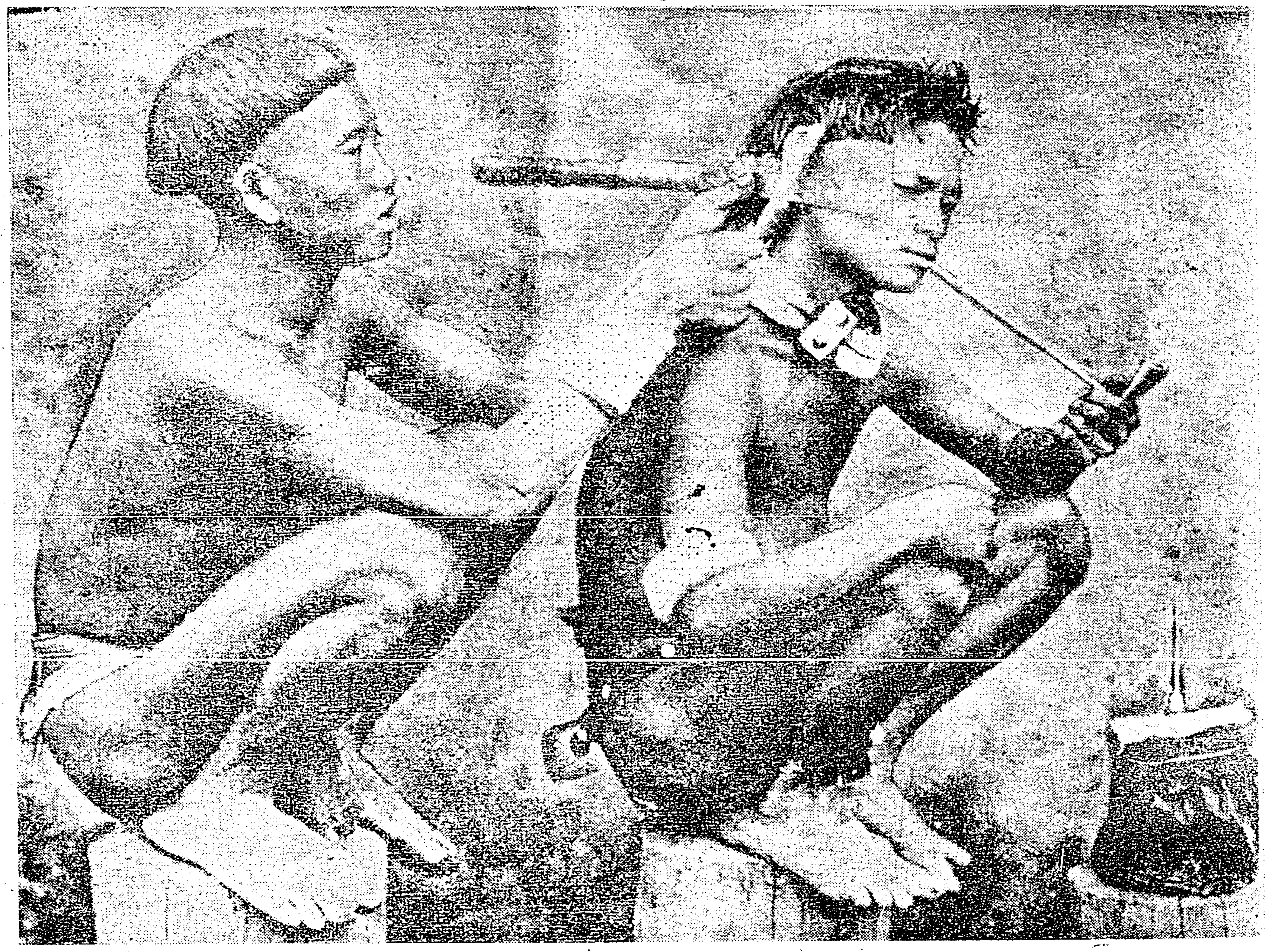

নাগাগণের ক্ষৌরকার্য্য।

কুকী, লুসাই, গিরি ও অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতির ন্যায় অধিকাংশ নাগাগণের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। তাহারা পাঁচ সাত বৎসর অন্তর প্রায় বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর শস্য উৎপাদন হইলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায়, তাহারা সার দিয়া কৃত্রিম উপায়ে জমির উর্ব্বরতা শক্তি পুনরায় বৃদ্ধি করিতে জানে না। নাগাদিগের বাস-স্থান পরিবর্ত্তনের ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। যখন যে স্থানের অধিবাসিগণ স্থানান্তরিত হইতে ইচ্ছা করে, তখন তথাকার সকলেই পুত্র, কন্যা, মহিষ, শূকর, বলদ ও বাসভবনের যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহের মমতা একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তৎপরে পর্ব্বতান্তরে গমন করিয়া পুনরায় গ্রাম স্থাপন করিবার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দেয়। এবং অবিলম্বেই তথাকার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়।

নাগাদিগের গৃহ নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ বংশ ও 'চৌকাপাড়' নামক এক প্রকার পার্ব্বত্য বৃক্ষের বৃহৎ পত্র। এই পত্র দ্বারা চাল ছাওয়া হয়, এবং কর্দ্দম, ঘাস ও এক-প্রকার বংশের দরমার সাহায্যে ঘরের দেওয়াল প্রস্তুত করে। শয়ন ও রন্ধনাগার ভিন্ন, বসিয়া কাজ কর্ম্ম করি-বার জন্য তাহাদের গৃহমধ্যে আর একটি বিভাগ থাকে। এই সকল পর্ণ গৃহের জানালা বা অন্য কোন প্রকার আলোক বায়ু প্রবেশের বা ধূমনির্গমনের পথ থাকে না।

নাগা পুরুষ ও রমণিগণ।

যে সকল পার্ব্বত্য বৃক্ষের বৃহৎ পত্র দ্বারা নাগাগণের গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, সেই পত্র দ্বারাই তাহাদের শয্যার কার্য্য সম্পন্ন হয়। মৃণ্ময় বা ধাতু নির্ম্মিত পাত্রের ব্যবহার তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। এক একটি গাঁইট-যুক্ত স্থূল বংশদণ্ডগুলিই সকল প্রকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ধাতুনির্ম্মিত পাত্রের ব্যবহার তাহাদিগের অপরি-জ্ঞাত থাকিলেও, লৌহকে তাহারা একটি অত্যন্ত আবশ্য-কীয় ধাতু বলিয়া জানে। তাহারা ইহা দ্বারা নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ করে।

নাগাগণ যুদ্ধকালে কয়েক প্রকার পরশু, বঁড়শা ও বড় বড় ঢাল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল অস্ত্র ও ঢাল তাহারা নিজেই প্রস্তুত করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী অধি-কাংশ অপরাপর পার্ব্বত্যজাতির ন্যায় তাহারা তীর ধনু ব্যবহার করে না। দিনে, রাত্রে, শয়নে, ভোজনে সকল সময়েই তাহাদের সহিত একখানি করিয়া পরশু থাকে। শত্রু আগমনের কোন সম্ভাবনা বোধ করিলে, গ্রামের সকল প্রবেশপথে তাহারা সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট বংশদণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া বেড়া দেয়, এবং ঐ সকল বংশের তীক্ষ্ণ

অগ্রভাগে 'বি' নামক একপ্রকার তীব্র বিষ মাখাইয়া রাখে। শত্রুগণ গভীর নিশীথে যখন ব্যগ্রতার সহিত গ্রামে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হয়, তখন ঐ বাঁশের খোঁচা লাগিয়া অবিলম্বে তৎস্থানেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। নাগাগণ কুকিদের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে ভীত নহে, তাহারা আত্মরক্ষার্থে যেরূপ প্রস্তুত হয়, আক্রমণেও সেইরূপ সাহস প্রকাশ করে।

নাগাগণের নৃত্যের পোষাক।

পৃথিবীর অধিকাংশ অসভ্যজাতিদের ন্যায় নাগারা নৃত্য করিতে বড় ভালবাসে। তাহাদের বাদ্যযন্ত্র সাদা সিধা রকমের হইলেও বাদ্যধ্বনি শুনিতে বিরক্তিকর। লেখকের মতে তাহাদিগের বন্য অবয়বে বন্য ভাবভঙ্গি ও চীৎকারের সহিত সেই পার্ব্বত্য তাণ্ডব নয়নের অতৃপ্তিকর নহে। যোদ্ধাদিগের সামরিক নৃত্যগীত বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে পুরুষগণ বঁড়শা হস্তে বৃত্তাকারে নৃত্য করিতে থাকে; আর রমণিগণ তাহারই মধ্যস্থলে আর একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকারে নৃত্য করে। এই সময় তাহারা পার্ব্বত্য করুণস্বরে যে গান গায়, তাহাও বেশ শ্রুতিমধুর।

নাগাগণ বড়ই মাংসাশী; হস্তি, মহিষ, ষাঁড় হইতে পক্ষী সর্প পর্য্যন্ত কিছুই তাহাদের অভোজ্য নহে। কিন্তু ঐ সকল পশু পক্ষীর মাংস তাহাদের প্রিয়খাদ্য হইলেও উহা সর্ব্বদা সংগ্রহ হয় না। চাউল তাহাদের দৈনিক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হস্তি মহিষাদি জন্তুবর্গের মাংস সচর্ম্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রা করিয়া, অগ্নিতে সামান্য ঝল্‌সাইয়া বন্য আলু ও এক প্রকার মূলের সহিত আহার করে; কিন্তু চাউল পাক করিতে তাহারা ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহারা মৃত্তিকা বা ধাতুনির্ম্মিত পাত্র প্রস্তুত করিতে জানে না, রন্ধন কার্য্যেও তাহারা বাঁশের চোঙ্গা ব্যবহার করে। একটি গাঁইটযুক্ত বাঁশের টুক্‌রামধ্যে চাউল, মাংস, লঙ্কা ও জলপূর্ণ করে. তৎপরে অগ্নির উত্তাপে কিছুক্ষণ রাখিয়া মাংস ও চাউলগুলি সামান্য সিদ্ধ করিয়া ভোজনোপযোগী করিয়া লয়। মাদকদ্রব্যের মধ্যে ধান্য হইতে উৎপন্ন মদ তাহারা অধিক পান করিয়া থাকে। তাম্বূলের সহিত তাম্রকূট চিবাইতে তাহারা অত্যন্ত ভালবাসে।

নাগাগণ যে ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে তাহা অন্যান্য পার্ব্বত্যভাষার সহিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংস্কৃত বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষার সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। ওয়েন সাহেব তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রায় সাত শত ইংরাজী শব্দের নাগা প্রতিশব্দ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার কয়েকটিমাত্র নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

গাভী—মান।	পুষ্প—চোন্‌পো।
পিতা—ভা।	স্বর্ণ—কাম।
কন্যা—দেহিএক্‌-চা।	পৃথিবী—হা-হান।
হস্তি—পুওক।	গজদন্ত—পুওকপা

লেখকের দীর্ঘ তালিকায় কেবলমাত্র আটটি শব্দ দেখিলাম যাহা আমাদের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা হইতে নাগাদিগের ভাষায় গৃহীত হইয়াছে যথাঃ—জাহাজ তালপাতা, গজাল, হাট, পিতল, নারিকেল, কুল (জাতি) ও পয়জার। এতদ্ভিন্ন 'টু-মো,' 'গো-মসা,' 'সি-নি,' ও 'পারি,' এই চারিটি শব্দ চুম্বন, গামচা, চিনি ও পায়রা শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। সূর্য্যের প্রতিশব্দ দেখিলাম 'সান্‌,' এইটির উৎপত্তি ইংরাজি Sun শব্দ হইতে কি না বলিতে পারি না। আর বংশ ও পিতা এই উভয় শব্দের প্রতিশব্দ দেখিলাম 'ভা'। গ্রন্থকার পরিশিষ্ট মধ্যে কতকগুলি ইংরাজি ছত্রের অনুবাদও দিয়াছেন, তাহা পাঠে আমাদের জানিত কোন ভাষার সহিত কোন সৌসাদৃশ্য দেখিলাম না, মনে হইল উহা অসভ্য নাগাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাষা।

নাগাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস আদৌ নাই। তাহারা সূর্য্যকে তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মনে করে। যদি কোন ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি দেবতার বিরাগভাজন হইয়াছে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। নাগা উপনিবেশসমূহে, মন্দির বা কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরোহিত বা কোন ধর্ম্ম-পুস্তকও তাহাদের নাই। খৃষ্টান মিশনারিগণের পরিশ্রমও তাহাদের জাতিমধ্যে সাফল্যলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

নাগাগণ বর্ব্বর নামে অভিহিত হইলেও তাহাদের হৃদয়ে দয়ার অভাব নাই। তাহাদের পরোপকারিতা ও আতিথেয়তা দেখিলে সুসভ্য মানবমণ্ডলীকেও চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাদের সামান্য পর্ণগৃহে যদি কখন কোন আগন্তুকের আগমন হয়, তাহা হইলে তাহারা আহার ও বিশ্রাম স্থান প্রদান করিয়া প্রাণপণে তাহার সেবা করিয়া থাকে। কোন আসাম-প্রবাসী-বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, গৃহাগত অতিথির মনোরঞ্জনার্থ তাহারা নিজ পরিবারের একটি যুবতী রমণীকে তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিতে দেয়।

নাগাগণ চোরকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, তাহাদিগের মতে চুরি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ কর্ম্ম। কোন ব্যক্তিকে উক্ত কার্য্য করিতে দেখিলে, তাহারা যে ভয়ানক দণ্ডের ব্যবস্থা করে; তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। চোরের হস্তপদাদি প্রথমে উত্তমরূপে বন্ধন করে, তৎপরে কোন পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় লইয়া গিয়া উপর হইতে নিক্ষেপ করে। সেই অপরাধী নিম্নে পতিত হইবার পূর্ব্বেই গড়াইতে গড়াইতে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যায়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নাগাগণ অনেক পরিমাণে সুখী। জ্বর, উদরি, কুষ্ঠ, বসন্ত প্রভৃতি উৎকট ব্যাধিগুলি তাহাদের নিকট এক প্রকার অজানিত। যদিও তথায় ওলাউঠা ব্যাধির প্রবেশলাভ ঘটিয়াছে, তথাপি তাহা আমাদের দেশের ন্যায় মারাত্মক নহে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে, রোগীকে জল মধ্যে গাত্র নিমজ্জিত রাখাই তাহাদের ব্যবস্থা। কঠিন ব্যাধি সকলের আধিপত্য অধিক না থাকিলেও খোস, পাঁচড়া, প্রভৃতি চর্ম্মরোগে তাহাদের প্রায়ই ভুগিতে হয়।

নাগাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। ইংরাজদিগের 'কোর্টশিপের' ন্যায় তাহাদের যুবক যুবতীরাও বিবাহের পূর্ব্বে উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ পরীক্ষা করে। নাগা বিবাহে প্রধান উৎসব ভোজ দেওয়া ও আমোদ আহ্লাদ করা। তাহাদিগের মধ্যে একটি নূতন ধরণের নিয়ম প্রচলিত আছে। তথায় অবিবাহিত যুবকের পিতৃভবনে পরিবারবর্গের মধ্যে নিশাযাপন করিবার নিয়ম নাই। প্রত্যেক গ্রামে 'মোরাং' নামক একটি করিয়া বৃহৎ গৃহ সাধারণের জন্য নির্ম্মিত থাকে। যুবকগণ তথায় রাত্রিকালে বাস করে।

সন্তানের জন্মোপলক্ষেও নাগাগণ উৎসব করিয়া থাকে। পুত্র সন্তান হইলে পুরুষগণ ও কন্যা সন্তান হইলে স্ত্রীলোকগণের দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হয়। কথিত আছে, অতি পূর্ব্বকালে যদি কোন সন্তান স্বাভাবিক সময়ের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিত, তবে তাহাকে সেই সময়েই মারিয়া ফেলা হইত।

পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যজাতির ন্যায় নাগাদিগেরও মৃত্যুর পর কতকগুলি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কোন নাগা-দলপতির স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যেরূপে সমাধা হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হইতে পাঠক পাঠিকাদিগের নাগা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার একটা মোটামুটি ধারণা হইতে পারে। সর্দ্দার-পত্নীর মৃত্যুর পর শবদেহকে ছয় মাস বাটীতে রাখা হইয়াছিল। উক্ত সময় উত্তীর্ণ হইলে, ঠিক পরদিন প্রাতঃকালে দুইটি বৃহৎ মহিষ, কয়েকটি শূকর ও অনেকগুলি পক্ষী বলিদান করা হইল। মধ্যাহ্নকালে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কতিপয় নাগা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধাস্ত্র লইয়া ঢাক ও ঘড়ি বাজাইতে বাজাইতে দলপতির বাটীতে মৃতা রমণীর নিকট উপস্থিত হইল। তৎপরে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল এবং তখন হইতে প্রায় সমস্ত রজনী ঐরূপে কাটিল। ঐ সকল গীত প্রাণহরণকারী দুষ্ট ভূতকে সম্বোধন করিয়াই গীত হইয়া থাকে। পরদিনও অনেক বেলা পর্য্যন্ত উক্ত প্রকার পৈশাচিক তাণ্ডব দ্বারা ভূতকে গ্রাম হইতে তাড়ান হইল। তৎপরে সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলে পর একদল যুবতী নারী শব সমীপে আগমন করতঃ পত্র ও পুষ্প দ্বারা শবদেহ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া দিল। এইবার ঐ মৃতদেহকে নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে লইয়া গিয়া উৎসবের মধ্যে দাহ করিয়া, শোকদুঃখের শেষ করা হইল।

যে পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধটি সঙ্কলিত হইল, তাহা অনেক দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে; ইতি মধ্যে অসভ্যনাগাদিগের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিনা জানি না।

শ্রীহরিহর শেঠ।

হুনড্রু জলপ্রপাত।

হাজারিবাগ জেলার মধ্যে যে সমুদয় প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য আছে, তাহাদের মধ্যে হুনড্রু জলপ্রপাত বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করে। যাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তন অথবা অন্য কার্য্যোপলক্ষে হাজারিবাগ গমন করেন, তাঁহাদের অনেকেই একবার হুনড্রু দর্শন-লালসা চরিতার্থ না করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষেই এই জলপ্রপাতটি যে একটা দ্রষ্টব্য পদার্থ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল জলপ্রপাত আছে, তাহাদের সহিত তুলনা করিতে গেলে ইহার স্থান নিতান্ত হীন নহে।

হাজারিবাগে অবস্থানকালে যখন এই জলপ্রপাতটির বর্ণনা শ্রুত হইলাম, তখন একবার চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিবার ইচ্ছা একান্ত বলবতী হইয়া উঠিল, শেষে তাহার তাড়নায় বাধ্য হইয়া বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে অন্য একজন সঙ্গী সংগ্রহ পূর্ব্বক হুনড্রু দেখিবার উদ্দেশ্যে তন্নিকটস্থ কোনও বন্ধুবরের আবাস অভিমুখে গোযানাবলম্বনে যাত্রা করিলাম। হুনড্রু প্রপাত হাজারিবাগ হইতে ৪০।৪২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত। হাজারিবাগ হইতে রাঁচি যাইবার যে প্রশস্ত রাস্তা আছে, তদবলম্বনে ৩০।৩১ মাইল রামগড়ে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে গোলা নামক স্থানে যাইতে হয়। গোলা হইতে হুনড্রু বোধ [illegible] মাইল হইবে। আমরা একদিন সন্ধ্যাকালে হাজারিবাগ ছাড়িয়া সারা রাত্রি গাড়ী চালাইয়া পরদিন বেলা ১০।১১ টার সময় রামগড়ে পৌঁছিয়া ছিলাম। তথায় একবেলা বিশ্রাম করিয়া রাত্রিতে আহারাদি অন্তে শকটারোহণ করিয়া লারা (বাগাড়ি)তে পৌঁছি; লারা রামগড় হইতে কতদূর তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কারণ রামগড়ের লোকেরা কেহ ৬ মাইল, কেহ ৮ মাইল এইরূপ বলিতেছিল।

যাহা হউক, আমরা যে কোন কারণেই হউক ঠিক ভোরে লারাতে পৌঁছি। তথাকার একমাত্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বন্ধুবর ক্ষেত্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের বাটীতে

আমরা আতিথ্য স্বীকার করি। যদিও তিনি বাটীতে ছিলেন না, তথাপি তাঁহার পিতা মহাশয় আমাদিগকে যথেষ্ট আদর যত্ন করেন। এখানে আমরা দুইদিন অবস্থান করি। লারা চিতরপুর হইতে এক মাইলের বেশি হইবে না। এই চিতরপুরে হাজারিবাগের ডবলিন ইনিভার্সিটি মিশনের একটি শাখা আছে। একটি ঔষধালয় ও একটি ডাক্তার আছেন। তদ্দ্বারা স্থানীয় লোকদিগের যে কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। খৃষ্টানগণের এই পরহিতকর কার্য্যকলাপই তাঁহাদিগকে এদেশীয়দিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলে সন্দেহ নাই।

লারি হইতে হুনড্রু অনুমান ৪।৫ ক্রোশ হইবে। আমাদের যাইবার জন্য যানের বন্দোবস্ত করিতে বন্ধুর পিতা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কোন যানই মিলিল না। আমাদেরও সময় সংক্ষিপ্ত, বেশি দেরী করিতে পারি না। অশ্বযান মিলিল বটে, কিন্তু উত্তমপুরুষ অশ্বযান দেখিলে চাণক্য পণ্ডিতের নীতিবাক্য সর্ব্বথা পালন করিয়া থাকেন, সুতরাং অধম পুরুষের জন্য কেমন করিয়া ঐ বন্দোবস্ত করা যায়। এজন্য আমরা পদব্রজে গমনই স্থির করিলাম। ৪।৫ ক্রোশ পার্ব্বত্য প্রস্তর কঙ্করবহুল পথে গমন করিতে আমাদের কোমল পদাঙ্গুলি অত্যন্ত খিন্ন হইবে, হয়ত অর্দ্ধপথে প্রত্যাবর্ত্তন ক্লেশানুভবই করিতে হইবে, স্থানীয় লোকেরা এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিল, কিন্তু আমরা ভীত হইলাম না। আমাদের অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে কৃত সংকল্প হইয়া আমরা সেই পৌষমাসের শীতের রাত্রি অনুমান ১১টার সময় আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক একজন পথপ্রদর্শক ও আমাদের শাকটিক সমভিব্যাহারে লারা হইতে যাত্রা করিলাম। পথপ্রদর্শকের হস্তে একখানি খরধার তরবারি রহিল; বন্ধুর পিতা বন্দুকও দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লেখক অশ্বারোহণ পটু, নালিকাস্ত্র পরিচালন দক্ষতা বিষয়ে অধিক পারদর্শী নহেন, অতএব শুধু শোভা বৃদ্ধির জন্য তাহা লইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলাম না। শুক্লপক্ষীয়া রজনী শীত ক্লিষ্ট শশধরের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন করজালে স্বীয় বপু আবৃত করিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। আমরা চারিটি প্রাণী নিতান্ত বিশ্বস্ত ভাবে তাঁহার করে আত্মসমর্পণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইলাম। যাঁহারা হাজারিবাগে গিয়াছেন, তাঁহারা তথাকার শীতের গুরুত্ব তথা আমাদের বীরত্বের পরিমাণ করিতে পারিবেন।

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে কোথাও একখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ব্যাঘ্রের আকার ধারণ করিয়া উপবিষ্ট, কোথাও কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বৃক্ষ শ্বেত-বস্ত্র-পরিহিতা রমণীর ন্যায় প্রতিভাত। আশে পাশে টিলা বা পাহাড় শ্বেতবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, চারিদিকে সব নীরব নিস্তব্ধ। আমরা চারিজনে সেই নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া স্বীয় পদধ্বনি শব্দে চকিত হইয়া চলিয়াছি। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের সেই ধ্যান স্তিমিত নিশ্চলভাব দেখিয়া আমার প্রাণে যেন কি এক মধুর ভাবের আবির্ভাব হইল। আমি সঙ্গিগণের আলাপে কর্ণপাত না করিয়া নীরবে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য, এই গাম্ভীর্য্য উপভোগ করিতে করিতে চলিলাম—মনে কত ভাবই উত্থিত ও লীন হইতে লাগিল। গভীর রজনীতে এরূপ নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া চলিতে মনে হইতে লাগিল বুঝি বা আমরা অনন্ত পথের যাত্রী—কেবল স্বীয় শক্তি এবং বিবেকের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে এই পথে চলিতে হইবে; সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরই স্কন্ধে, পথ জিজ্ঞাসার লোক নাই, উপদেশ করিবার লোক নাই, বৃক্ষ লতা পর্ব্বত প্রান্তরাদি নীরবে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে, আমাদের গতিবিধি দেখিতেছে! চল যাত্রি চল, প্রতি পদবিক্ষেপে সাবধান হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া চল, চল, চল! শীতকালে ঐরূপ প্রদেশে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির ভীতির কারণ যথেষ্ট বিদ্যমান থাকিলেও আমাদের সৌভাগ্যবশে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। নির্বিঘ্নে বরিয়াতু নামক গ্রামে আমরা পৌঁছিলাম। বরিয়াতু হুনড্রু প্রপাতের পর্ব্বতমালার সানুদেশে অবস্থিত। তথা হইতে পর্ব্বতমালা অনুমান দুই মাইল হইবে। জলপ্রপাত আরও এক মাইল দেড় মাইল। আমরা যে পথে গিয়াছিলাম, তাহাতে প্রপাত যেন দুই মাইলেরও কিছু বেশি দূর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

আমরা যখন বরিয়াতু উপস্থিত হইলাম, তখনও তিন চারি ঘণ্টা রাত্রি আছে। সুতরাং আমাদের পথপ্রদর্শক

স্থানীয় দুইএক জন মণ্ডল গোছের লোককে উপরে লেপ ও নীচে 'বর্‌সি'র গরম হইতে বহুকষ্টে উঠাইয়া হাজারিবাগ হইতে 'হুজুর লোক' যে তাহাদের ওখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ ও সম্মানিত করিতে চাহেন, তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল এবং হুজুর লোক যে সামন্তজির আত্মীয়, তাঁর আবাসও ধন্য করিয়াছেন, তাহাও বেশ গর্ব্বের সহিত বুঝাইয়া দিল। তাহার তৎকালিক ভাব, বচন বিন্যাস আদি দেখিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। এদিকে যত কুকুর তাহাদের গ্রামের সুখসুপ্তির বিঘ্নকারীদিগের প্রতি বেজায় বিরক্ত হইয়া দলে দলে আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং নানা-রূপ বেসুরলয়ে চীৎকার করিয়া আমাদের কর্ণপটহের ঘাতসহত্ব কঠিনরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিল, আর তিল-মাত্র যষ্ঠি সঞ্চালন কি হস্তোত্তোলনেই তীব্রতর তেজে রব করিতে করিতে বিশ হস্ত দূরে অপসৃত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমাদের প্রদর্শক শেষে বিরক্ত হইয়া সতেজে অসিকোষ মুক্ত করিয়া তাহাদের 'চিল্লানা এক দম্ বন্ধ করিতে অগ্রসর হইল এবং তাড়াইয়া প্রায় এক রশি পথ লইয়া গেল, কিন্তু বলা বাহুল্য সফলকাম হইল না। এ দিকে মণ্ডলেরদল হুজুর লোকদিগকে কোথায় রাখিবে তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এক খানি বড় ঘর তাহাই অতিথি সৎকারের ঘর; তথায় খড় বিচালি বিছাইয়া আমাদের সুখ শয্যা বিস্তৃত করিয়া দিল। পথশ্রান্ত আমরা তদুপরি কম্বলাদি বিস্তৃত করিয়া পরদিনের প্রভাতের আশায় তন্দ্রাবলম্বনে শয়ান রহিলাম। বিচালীর শয্যা বড় কোমল এবং বড়ই গরম। সে গরমে শীত পলায়ন করিল, নিদ্রা তন্দ্রার স্থান গ্রহণ করিল; তাহার কোল হইতে যখন চাহিলাম, তখন দেখি তার সঙ্গে সঙ্গে রজনীও পলায়ন করিয়াছে;—সূর্য্যদেব পূর্ব্ব-দিকের দ্বার খুলিয়া জাগরণক্লিষ্ট রক্তনেত্র মুছিতেছেন। আমরাও তখনই উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া লইলাম এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বরিয়াতুর প্রধানগণও আমাদিগের সঙ্গে একজন লোক দিল। আমরা তাহাদিগকে আমাদিগের জন্য কিছু দুগ্ধাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে বলিলাম। তাহারা আশ্বাস দিল যে সমস্তই প্রস্তুত থাকিবে।

বরিয়াতু গ্রাম পার হইয়াই হুন্‌ড্রু পর্ব্বত আমাদের নয়নসমীপে প্রতিভাত হইল। এই পর্ব্বতমালা বহুদূর বিস্তৃত। যেন প্রকৃতির একটি দেওয়াল উচ্চাবয়বভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। বালারুণকিরণ সংস্পর্শে সে পর্ব্বত-মালার দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়াছে। পর্ব্বততলদেশ পর্য্যন্ত বেশ রাস্তা আছে। গাড়ী যাইতে পারে। আমরা সেই পর্য্যন্ত গিয়া একটু বাঁকিয়া গেলাম। কারণ আমা-দের ইচ্ছা ছিল যে প্রথমে জালপ্রপাতের তলদেশে গমন পূর্ব্বক তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া তারপর উপরে আরোহণ করিব। আমরা যে পথে গেলাম সে দিকে আর রাস্তা নাই। পথ মাত্র আছে, ক্রমে সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আমরা পর্ব্বতারোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। পথ বন্ধুর, চড়াই উৎরাই যথেষ্ট, সুতরাং দেহ কিছু কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল বৈ কি? হৃদ্‌পিণ্ড দুরুদুরু করিতে লাগিল, জানুদ্বয় গমন বিষয়ে অপারগত্বের দরখাস্ত মুহুর্মুহু পেশ করিতে লাগিল। কিন্তু মন উৎসাহ তেজে এতই মত্ত যে, সে তাহা গ্রাহ্যই করিল না; নিজের জোরে হৃদয় ও পদদ্বয়কে চালিত করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত চলিতে লাগিল। পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিত সহস্র প্রকার অজ্ঞাতনামা তরুলতার দৃশ্য তাহাকে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিল। শেষে হৃদয় ও চরণদ্বয়ও বাধ্য হইয়া শান্ত হইল এবং সুবোধ বালকের ন্যায় মনের আজ্ঞানুবর্ত্তী ভাবে চলিতে লাগিল। পর্ব্বতপৃষ্ঠ বংশকুঞ্জাবলী দেখিয়া পাহাড়ী বাঁশের লাঠি করিবার জন্য মন অত্যন্ত উৎসুক হইল। দুঃখের বিষয় অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আসিতে ভুলিয়াছি, অতএব বড় সুবিধা করিতে পারিলাম না। আমার সঙ্গী বাবুটি ত্রেতাযুগের জীববিশেষের নাম স্মরণ করিয়া এই একটি বংশতৃণ (বৃক্ষ বলিলেই উদ্ভিদ্‌বেদী পাঠক মহাশয় কৈফি-য়ৎ তলব করিবেন, সুতরাং তৃণই ভাল) উৎপাটিত ও স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া চলিলেন। এইরূপে আমরা পর্ব্বত হইতে উপত্যকা, উপত্যকা হইতে অন্য পর্ব্বত এবং অধিত্যকা অতিক্রম করিতে করিতে চলিলাম। পর্ব্বতে বদরী বৃক্ষের ন্যায় একপ্রকার ফলবিশিষ্ট বৃক্ষ দেখিলাম কিন্তু তাহার ফল সুখাদ্য নহে; তিক্ততাপূর্ণ এবং বড় কষা। কোন পাখীতেও তাহা খায় না বলিয়া আদিম কেবল একটু স্বাদ লইয়াই নিবৃত্ত হইলাম। আরও দুই

এক রকম ফল দেখিয়াছিলাম, সঙ্গেও লইয়াছিলাম, তবে সে গুলিও খাদ্য নহে। এইরূপে যাইতে যাইতে আমরা একটি অতীব মনোরম অধিত্যকায় উপনীত হইলাম। তথায় চারিদিকেই উচ্চ পর্ব্বতমালার মনোরম দৃশ্য, মধ্যে প্রায় দুইশত বিঘা পরিমাণ তৃণবৃত গুল্মরাজি বিরাজিত সমতল ভূমি। স্থানটি নির্জ্জনতা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতিতে এতই সুন্দর যে আমি কিছুকাল তথায় উপবেশনপূর্ব্বক তাহার শোভা উপভোগ এবং বিশ্বনিয়ন্তার অসীম কারু কৌশল মহিমার চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিবার ইচ্ছা সংবরণ করিতে পারিলাম না।

এই সব পর্ব্বতের মধ্যেও উপত্যকা ভূমিতে চাষ করা হয়, তাহা আমরা অনেক স্থলেই দেখিলাম। যাহা হউক আর কিছুদূর যাইতেই আমাদের বৃদ্ধ পথপ্রদর্শক বলিয়া উঠিল "ঐ হুন্‌ড্রুর ডাক শোনা যাচ্ছে।"

ইতঃপূর্ব্বে চারুপাঠেই মাত্র জলপ্রপাতের অভিজ্ঞতা নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং তাহার রব কিরূপ হইতে পারে তাহার বিষয় একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু বৃদ্ধের বাক্যে একটু মনঃসংযোগ করিতে বুঝিতে পারি-লাম, জলপ্রপাত সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারণা বড়ই কম অথবা ভ্রান্ত ছিল। আমরা তখনও প্রপাত হইতে দুই মাই-লেরও অধিক দূরে রহিয়াছি, কিন্তু সেইখান হইতেই যে গভীর গর্জ্জন শুনিলাম, তাহাতে বোধ হইল যে শত শত স্পেশাল ট্রেণ অতি অদূরবর্ত্তী রেলপথের উপর দিয়া পূর্ণবেগে ছুটিতেছে। সে শব্দ, তাহার গাম্ভীর্য্য তাহার প্রাণোন্মাদকারী উত্তেজনা, বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে; অথবা আমার ক্ষীণা লেখনী এবং শব্দ সম্পদ্ দারিদ্র্য তাহাতে সম্পূর্ণই অক্ষম। সে শব্দ শুনিয়া উৎসাহে প্রাণ নাচিয়া উঠিল,—অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোরম একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাইব মনে করিয়া উল্লাসে প্রাণ মত্ত হইয়া উঠিল। আমরা দ্রুততরবেগে সম্মুখে অগ্র-সর হইতে লাগিলাম। পর্ব্বতচর জন্তুর ন্যায় লম্ফে লম্ফে শিলা হইতে শিলার উপর পড়িতে লাগিলাম— আমাদের পথপ্রদর্শক আমার ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল এবং তাহার বার্দ্ধক্যের বল সামর্থ্য এবং নিরুৎসাহ মন আমার অনুগমন করিতে অসমর্থ হইয়া আমাকে বলিতে লাগিল;—"হুল্‌ড়ুতো পলাইয়া যাইবে না বাবু তো অত তাড়াতাড়ি কেন!" হা মূর্খ! তুমি কি বুঝিবে যে অত তাড়াতাড়ি কেন! আমি নিজকেই যদি নিজে জিজ্ঞাসা করি, তবে নিজেই হয়ত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইব! জানি না হুন্‌ড্রুর কোন উন্মাদিনী শক্তি আছে কিনা, কিন্তু তাহার রব যেন আমাকে ব্রজবল্লভের বংশিরবে গোপিগণের মনের ন্যায় আকুল করিয়া তুলিল—আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল যদি পাখা থাকিত, তাহা হইলে ছুটিয়া গিয়া এক পলের মধ্যে এ উৎকণ্ঠার অবসান করিতাম।

যাহা হউক যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, হুন্‌ড্রুর গভীর উচ্ছ্বাস, তাহার সে কলকল ধ্বনি, সে হুঁ হুঁ রব, ততই স্ফুটতর হইতে লাগিল। তাহার প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তরঙ্গের প্রতি লহরিলীলারধ্বনি পৃথক, অথচ একত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহযোগে অন্তরাত্মায় নীত হইয়া তথাকার আনন্দোচ্ছ্বাস শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। তখন মনে হইতে লাগিল, ইহার হুন্‌ড্রু নামকরণ যেই কেন করুক না, তাহার প্রাণে কবিত্ব ছিল। বোধ হয়, এই জল-প্রপাতে রবানুকারী এমন সহজ অথচ উপযুক্ত শব্দ আর নাই।

ক্রমে একটি পর্ব্বতারোহণ করিলাম, তথা হইতে যেন বোধ হইতে লাগিল যে প্রপাত অতীব নিকট। পথপ্রদর্শক বলিল এই পর্ব্বত অবতরণ করিলেই প্রপা-তের দহে উপস্থিত হওয়া যাইবে। মহা উৎসাহে আমরা চলিতে লাগিলাম। আমি শব্দগত প্রাণ হইয়া পথে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম;—একবার তো অধঃপতনের আশঙ্কা বড়ই বেশী হইয়াছিল; পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ আমাকে একটু মিষ্ট ভর্ৎসনা করিল। আমিও পৈত্রিক প্রাণটির বিনিময় হুন্‌ড্রু দর্শনস্পৃহা অচরিতার্থ রাখা অপেক্ষা প্রাণটি বাঁচাইয়া রাখিয়া, তাহা চরিতার্থ করাই সঙ্গত মনে করিয়া একটু অবহিত হইয়াই চলিতে লাগি-লাম। সকল কষ্টেরই শেষ আছে, আমাদের উৎকণ্ঠা ও পথশ্রমেরও শেষ আসিল—আমরা ক্রমে অবতরণ করিতে করিতে নদীর রেখা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আর কিছু পরেই নদীগর্ভে অবতীর্ণ হইলাম।

আমরা নদীগর্ভে অবতীর্ণ হইলেও প্রথমতঃ প্রপাতের দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। কারণ আমাদের

এবং প্রপাতের মধ্যে একটি বাঁক মত ছিল। যাহা হউক শীঘ্রই আমরা সে বাধা অতিক্রম করিলাম। কয়েকটি মর্কট আমাদিগকে দেখিয়া এদিক ওদিক ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমরা প্রপাতের নিকটবর্ত্তী হইলাম। কি দেখিলাম? যাহা দেখিলাম, তেমন দৃশ্য আমি আর দেখি নাই। গত ইং ১৮৯১ সালে যশোহর জেলার ন্যায় যখন ঝিকরগাছা রেলওয়ে ব্রিজ ভাঙ্গিয়া যায়, সেই সময় ঐ পুলের উপর দিয়া গাড়ী যাতায়াত করিতে পারিত না, এ জন্য উভয়দিগের ষ্টেশনের যাত্রিগণকে নৌকা করিয়া পার করা হইত। যাঁহারা ঐ সময় ঐ পুলের নিকট দিয়া নৌকাযোগে গমন করিয়াছেন তাঁহারা আমি হুনড্রুতে কি দেখিলাম, তাহা কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমি কার্য্যবশতঃ প্রথম যে দিন গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়, সেই দিবসই নৌকাযোগে অন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। সে দিন সলিলের উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ,—গভীর গর্জ্জন এবং ফেনিল প্রস্রবণ যেমন দেখিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে ইহার তুলনা করা না চলিলেও কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে।

দূর হইতে মনে হইতে লাগিল যেন, সুবিমল রজত বিন্দুসমূহ অজস্রধারে ঊর্দ্ধ হইতে কোন অদৃশ্য হস্ত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অধঃনিক্ষিপ্ত হইতেছে। অথবা পর্ব্বতগাত্র হইতে কোনও অদৃশ্য দৈত্যদল অনবরত রৌপ্যবিন্দু উদ্গিরণ করিতেছে। অথবা তাহারা বুঝি বা বিশ্বকর্ম্মার বৃহৎকটাহে রৌপ্য জ্বালাইতেছে, গলিত রৌপ্য উথলিয়া পড়িতেছে। অথবা আর যে কি বলিব, তাহা বুঝিতে পারি না। কোনও কিছুর সহিতই ইহার উপমা দিতে পারি না, ইহার উপমা কেবল ইহাই বলিয়া বোধ হয়।

নদীর গর্ভে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসমূহ যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে। আমরা সেই সব প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে 'দহ' গুলি পার হইয়া একেবারে প্রপাতের তলদেশে উপস্থিত হইলাম। সেটাও একটা পাথরের উচ্চ 'চটান্'। আমরা সেই চটানের উপর দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ প্রপাতের শোভা দেখিতে লাগিলাম। প্রপাত-পাত-বিকীর্ণজল, লবঙ্কণবাহী সমীরণ আমাদের শৈত্য উৎপাদন করিয়া দিল। জলকণাসমূহ শিলা হইতে শিলান্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বাতাসে ধূলা হইয়া মিশিয়া যাইতেছে। এই কারণে প্রপাতের চতুর্দ্দিকে একটা স্বচ্ছ ধূমাবরণ পড়িয়া গিয়াছে এবং তদুপরি সৌরকর-পাতে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হইতেছে। তাহা দেখিতে বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম। আমরা এবং প্রপাতের মধ্যস্থলে একটি 'দহ' মাত্র ব্যবধান। প্রপাতের সলিল সর্ব্বনিম্নতলস্থিত একখানি সুবিশাল কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ চটান প্রস্তরের উপর পতিত হইয়া মুক্তামালার ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে এবং তাহাদের সমবায়েই এই দহের সৃষ্টি। প্রপাতবারি ঐ দহে মিশিয়া আবর্ত্ত ভঙ্গে স্রোতরূপে প্রবাহিত হইতেছে। দহের জল অতি স্বচ্ছ এবং নীলাভ। ঊর্দ্ধে রজতগিরিনিভ জলপ্রপাত, নিম্নে কূর্ম্মপৃষ্ঠ প্রস্তর-রাজের কৃষ্ণপাদ দেশ চুম্বন রত নীল সলিল! চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বহুল সুউচ্চ পর্ব্বতের গম্ভীর নিস্তব্ধতা! তাহার মধ্যে এই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রপাতে অশ্রান্ত অক্লান্ত অবিরাম বিশ্বকর্ত্তার নাম কীর্ত্তন ধ্বনি! যেন বোধ হয়, কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া সুবর্ণরেখা অবিরাম 'বোম্, বোম্' ধ্বনি করিতেছে, আর পর্ব্বত, বৃক্ষ লতা, প্রস্তর ঊর্দ্ধাধঃ পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিয়া নীরব নিশ্চল অবস্থায় সেই গীত মাধুর্য্য, সেই কীর্ত্তননাদ উপভোগ করিতেছে।

হুনড্রু জলপ্রপাত সুবর্ণরেখা নদীর অংশ। সুবর্ণরেখা নদী রাঁচির অন্তর্গত পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতেই প্রায় রামগড়ের পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তারপর হঠাৎ ঐ পর্ব্বতপথ একেবারে খাড়া নামিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সুবর্ণরেখা স্বীয় উচ্চ পদ হইতে দুই শত ফিটের অধিক নিম্নতলে অধঃপতিত হইয়া এই মনোরম নয়নানন্দকর প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রপাতের তলদেশ হইতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে যেন বোধ হয়, যে পাহাড়ের শিরোদেশ বিদীর্ণ হইয়া জলরাশি উচ্ছলিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। তলদেশ হইতে সুবর্ণরেখার অঙ্গের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। প্রপাতটির উচ্চতা আমরা ঠিক পরিমাণ করিতে পারি নাই, তবে তাহা যে দুই শত ফিটেরও অধিক হইবে, সে বিষয় আমরা কোনও সন্দেহ করি না।

আমরা শীতকালে উহা দেখিয়াছি, তখন উহার বিস্তৃতি খুব বেশী নয়। কারণ নদীতে তখন জল অতি অল্প। অনুমান তখন পনর কুড়ি হাতের মধ্যেই উহার বিস্তার সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ষাকালে যখন ভরা যৌবনে সুবর্ণরেখা সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে, তখন ইহার বিস্তৃতি ত্রিশ চল্লিশ হাতের কম হয় না। সে সময়কার দৃশ্য আরও বিস্ময়কর। আরও সুবর্ণরেখা সে সময় বলদর্পগর্জ্জিতা তেজোগর্ব্বপূর্ণা মূর্ত্তিতে ভগবৎপদ নিবদ্ধ মানসা যোগিনীর ন্যায় সহস্র সহস্র আপদ বিপদ বাধা বিঘ্ন তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া, শত বন্ধন উৎপাটিত ও ছিন্ন করিয়া প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে বিলাস লাস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাণ্ডবগতিতে অগ্রসর হয়। পর্ব্বত প্রান্তর, বৃক্ষ লতা সম্ভ্রমে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দেয়;—"কঃ ঈপ্সি তার্থে স্থির নিশ্চয়ং মনঃ নিয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

সুবর্ণরেখার বর্ষার লীলাক্ষেত্রের চিহ্ন আমরা বেশ দেখিলাম। পূর্ব্বে প্রপাতের গতিপথ যে স্থানে ছিল, আজকাল তাহা হইতে কিছু বামে সরিয়া আসিয়াছে। প্রপাতের বেগ ও গর্জ্জন উভয়ই খুব বেশি। আমাদের মনে হইল যে এই প্রপাত হইতে বল সংগ্রহ করিলে অথবা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিলে তদ্বারা অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। নানারূপ কল এই বলের সাহায্যে চলিতে পারে। সুবর্ণরেখা যে সহস্র সহস্র অশ্বের শক্তি স্বীয় বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়া কেবল প্রস্তর পর্ব্বতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে, তাহা মানবীয় কৌশলে তাহার উপকারার্থে অনায়াসে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। চাই কেবল ইচ্ছা ও উদ্যোগ।

স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য নিরতিশয় মনোরম। নীচে হইতে দেখিলে দৃশ্যটি আরও বেশি গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হয়। সম্মুখে প্রস্তরবহুল পর্ব্বতশির উচ্চ করিয়া যেন মহাযোগীর ন্যায় দণ্ডায়মান। মস্তক হইতে গঙ্গাধরের জটা পতিত ভাগীরথী প্রপাতবৎ সুবর্ণরেখার রজত প্রবাহ ভীম গম্ভীরনাদে অধঃপতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বাষ্পাকার মেঘমালা, ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি এবং চতুর্দ্দিকে স্ফটিক রত্নাবলী বিকীর্ণ করিয়া বাহ্যবস্তুর প্রতি প্রবল অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছে; পশ্চাতে অধঃপতিতা অতএব নষ্টতেজা সুবর্ণরেখা বক্র মন্থর গতিতে সরীসৃপ লীলাভিনয় করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যরাজিতে আত্মগুপ্তির প্রয়াস করিতেছে। বামে দক্ষিণে তাহার কূলে কূলে পর্ব্বতমালা বৃক্ষলতা সহচর সমভিব্যাহারে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। চারিদিকে গাম্ভীর্য্য ও শান্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। গর্ভে বিশাল প্রস্তরখণ্ডসমূহ সুবর্ণরেখার গতিরোধের নিষ্ফল চেষ্টায় স্বীয় কঠিন প্রাণপাত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রহিয়াছে।

এই দুইশত ফিট উচ্চ হইতে প্রপতিত সুবর্ণরেখা তিন চারি স্থানে প্রস্তরে ব্যাহত হইয়াছে। আমরা পেন্‌সিল সাহায্যে এই প্রপাতের একটি প্রতিকৃতি এবং চতুঃপার্শ্বস্থ মনোরম দৃশ্যেরও একটা মোটামুটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, ঐ খসড়া হইতে ভাল করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহা হারাইয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ মনোরম দৃশ্যের এই সামান্য বর্ণনা ব্যতীত কোন উপায় নাই।

আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এখানে দেখিলাম যে শত শত পায়রা এই প্রপাতের মধ্যে বা পার্শ্বে স্বীয় আবাস স্থল করিয়াছে। শ্বেত ও ধূসর বর্ণের পায়রা আমরা দেখিতে পাইলাম। ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের সম্মুখে তাহারা নানা ভঙ্গীতে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্র বলে অদৃশ্য হইয়া যায়। যেন বোধ হয়, প্রপাতের জলকল্লোলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমরা একান্ত প্রণিধান করিয়াও প্রথমে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। শেষে বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে একটি পায়রাকে জলপ্রপাত পরিধির সমীপবর্ত্তী কোটর হইতে নির্গত হইতে দেখিলাম। সুতরাং অনুমান করিয়া লইলাম যে, সকলগুলিই এইরূপ পার্শ্বস্থ কোটরেই বাস করে। কিন্তু অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছেন যে, পায়রাগুলি প্রকৃতই জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। জলস্রোতের পশ্চাতে পর্ব্বতগাত্রে তাহাদের কোটর আছে। তথায় জল প্রবেশ করে না। কারণ এক প্রস্তর হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া জল ধনুকের ন্যায় বক্রভাবে এক রেখা ধারায় অন্য প্রস্তরে পতিত হওয়াতে তাহাদের ও পর্ব্বতের মধ্যে ব্যবধান স্থান শূন্য থাকে, অতএব জল তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় না। স্বীয় আবরণ প্রভাবে

তাহারা স্বীয় স্বীয় কুলায়ের সমীপস্থ জলস্রোতে প্রবেশপূর্ব্বক পারে উত্তীর্ণ হয়।

শুনিয়াছি নর্ম্মদা প্রপাতের সন্নিকটেও এইরূপ পারাবত লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। পারাবতদিগের এইরূপ প্রপাতপ্রিয়তার কোন গূঢ় কারণ আছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু তাহাদের ফেনিল জলের ঊর্দ্ধভাগে এই লীলাঙ্কিত গতির দৃশ্য যে অতীব মনোরম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অধোদেশের দৃশ্য দেখিয়া আমরা পর্ব্বতের শিরোদেশে উঠিবার আয়োজন করিলাম। এবং প্রস্তরাবলী অবলম্বনে নদী পার হইয়া অপর পারস্থিত পথের সমীপস্থ হইলাম। তখন রৌদ্র সেই শীতকালেও প্রখর হইয়াছে। বন্ধুর-উচ্চ-পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া উপরে উঠা, তখন বিশেষ ক্লেশকর বোধ হইতে লাগিল। পর্ব্বতগাত্রের পথও পার্ব্বত্য। কোথাও বৃক্ষ মূল, কোথাও শাখা, কোথাও লতাবল্কলে উঠিতে হইল। একেবারে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া গেলাম; কিন্তু তথাপি পশ্চাৎপদ হই নাই। সকলের অগ্রেই আমি উপরে উঠিলাম। উপরে উঠিতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

পর্ব্বতের উপরের সে স্থানটি একটি অধিত্যকা। তাহার অবস্থান দৃশ্য মন্দ নহে। ক্রমে আমরা অভীপ্সিত সুবর্ণরেখার সমীপস্থ হইলাম। প্রপাতের ঠিক উপরেই একটি বাঙ্গলার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম, একজন সাহেব ঐ বাঙ্গলা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন।

সাহেবের যে সৌন্দর্য্যানুভব স্পৃহা বিশেষরূপই ছিল, তাহা এই বাঙ্গলার অবস্থান হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঠিক প্রপাতের কূলেই পর্ব্বতগাত্রে বাঙ্গলার অবস্থান। বামদিকের বারান্দা হইতে প্রভাতের সমুদয় দৃশ্য অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রায় ২৫০ ফিট গভীর নিম্ন প্রদেশ আত্মাপুরুষকে চমকাইয়া দেয়। কামরাতে শয়ন করিলে প্রপাতের অবিরাম গদ্‌গদ্ সঙ্গীত হৃদয়ে শান্তি ও গাম্ভীর্য্য প্রদান করে। চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অহর্নিশ নয়ন রঞ্জন করে।

শুনিলাম ঐ সাহেব ছোট নাগপুরের কমিশনার কি ঐরূপ একটা কিছু ছিলেন। তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিলে, ঐ বাঙ্গলা সরকার তরফ হইতে সংস্কার করিবার প্রস্তাবও নাকি হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিষ্প্রয়োজন বোধে নাকি তাহা করেন নাই। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট এরূপ করিয়া ভাল করেন নাই। কতরূপে সরকারের কত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, এমন সুন্দর স্থানের একটি শৈলাবাসের সংস্কার করিতে এত কি অধিক অর্থেরই প্রয়োজন হইত? অথচ প্রপাত দর্শনার্থী পথিকবৃন্দের উহা হইতে অনেক প্রকারের সুবিধা হইতে পারিত।

কেহ কেহ জনশ্রুতিমূলক এ কথা বলেন যে সর্পের মণি সংগ্রহ করিবার জন্য এক সাহেব এই স্থানে এই বাঙ্গলা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি চলিয়া যান।

বাঙ্গলার ভগ্নাবশেষের গাত্রে আমাদের আগমন স্মৃতি অঙ্গার সহযোগে অঙ্কিত করিয়া আমরা প্রপাতের স্থানে গমন করিলাম। সেখানকার দৃশ্যও অতি মনোরম। স্বল্পতোয়া সুবর্ণরেখা ধীরে ধীরে নিজ মনে আসিতে আসিতে উচ্চাবচ শৈল প্রস্তরে ব্যাহতা হইয়া দৃপ্তা ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছে এবং সর্পগতি অবলম্বন পূর্ব্বক বাধা বিঘ্ন হাসিতে হাসিতে নিরাকরণ করিয়া জয়োল্লাস মুখরিত জলোচ্ছ্বাস পর্ব্বতগাত্রে ঢালিয়া দিয়াছে। তিনচারি স্থানে বাঁক হইয়া তাহাকে যাইতে হইয়াছে। কয়েকস্থানে সলিলপাতজনিত গহ্বর ফেন বুদ্বুদ সমন্বিত রস কটাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। অনবরত সলিলবেগ সহিষ্ণু পাষাণখণ্ডগুলিতে নানারূপ নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই সব গহ্বরের মধ্যে শালগ্রাম শিলার ন্যায় অসংখ্য প্রস্তর গোলকসমূহ রহিয়াছে। গহ্বরের মধ্যে সলিলের অনবরত পতন ও উচ্ছ্বাসের বেগে প্রস্তরখণ্ড সমূহ সর্ব্বদা ঘষিত হইয়া এমন সুন্দর পালিশ হইয়াছে যে, তাহা কি বলিব। আমরা ছোট বড় অনেকগুলি প্রস্তরাগালক সংগ্রহ করিলাম।

জলধারা পার হইয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হওয়া অতীব কষ্টকর এবং আশঙ্কানীয়ও বটে। যেরূপ তেজে স্রোত বহিতেছে, পার হইতে গিয়া পিচ্ছিল শৈবালমণ্ডিত প্রস্তরে কিছুমাত্র পদস্খলন হইলেই দুষ্প্রবৃত্তি প্রলোভন স্খলিত

ধর্ম্মমার্গ হতভাগ্যের ন্যায় একেবারে সবেগে অধঃনিক্ষিপ্ত হইতে হইবে।

আমরা নানারূপ কৌশলে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অপরদিকে গমন করিলাম এবং প্রপাতের উৎপত্তি স্থলগুলি দেখিতে লাগিলাম। তিনচারিটি ধারা তিন চারি দিক হইতে প্রস্তর মধ্য দিয়া আসিয়া মিলিয়াছে। তাহাদের গতিপথ বৈচিত্র্য অবলোকন করিলে "কঃ ঈপ্‌সিতার্থে স্থির নিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখ প্রতাপয়েৎ" কবির এই উক্তির সম্পূর্ণ যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়।

প্রপাতের একখানি প্রস্তরের উপর একখানি পুরাতন ইংলিসম্যান্ কাগজ এবং একটি বোতল চূর্ণ পড়িয়া রহিয়াছে; দেখিয়া বুঝিলাম সম্প্রতি দুই একদিন মধ্যে কোনও সাহেব এইখানে শুভাগমন করিয়া স্বীয় পানভোজন সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

নদীর উচ্চকূলের শোভাটি দেখিতেও অতি সুন্দর। এইস্থান হইতে যে দিকেই তাকাই, তাই নয়নরঞ্জন। আমরা এই সব শোভাতে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, বেলাতিরেক অনুভব করিতে পারি নাই। ক্ষুব্ধ জঠরানল অবসর ক্রমে তাহা আমাদিগকে জানাইয়া ছিল। তখন সুখস্বপ্নময়ী কবিতার রাজ্য হইতে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই নীতির অনুসরণ করিতে হইল। সঙ্গী পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলাম, নিকটে কোনও স্থানে খাদ্য পাওয়া যায় কি না। সে বলিল এক মাইল দূরে পাহাড়ের উপর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে তথায় গুড়, চিঁড়া, খই পাওয়া যাইতে পারে। উপযুক্ত অর্থদ্বারা তাহাকে তদন্বেষণে প্রেরণ করিয়া আমরা নদীর কূলে গেলাম এবং কতকগুলি বংশকুঞ্জ দেখিয়া তাহা হইতে যষ্টি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে প্রত্যেকে এক এক গন্ধমাদন সংগ্রহ করিলাম। শেষে দেখিলাম বহন করা অসাধ্য। অতএব তাহার মধ্য হইতে আবার বাছিয়া বাছিয়া ভালগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। কূলে দুই একটি পেয়ারার গাছ ছিল, তাহা হইতে ফলসংগ্রহ করিয়া উদরদেবের কথঞ্চিৎ সম্মান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলাম।

ইতিমধ্যে পথ প্রদর্শক খই, গুড় ইত্যাদি লইয়া আসিল। স্নানার্থ তৈলও লইয়া আসিল। আমরা তৈল মাখিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। অন্যান্য সকলে নিরাপদ স্থান দেখিয়া স্নান করিল। কিন্তু আমার মনে হইল, এমন সুন্দর প্রপাতে আসিয়া যদি প্রপাতের ধারায় স্নান না করিলাম, তবে আর কি হইল? আমি সুযোগ খুজিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে একটি স্থান পাওয়া গেল। সে খানে প্রায় তিন হাত উচ্চ হইতে ধনুকের ন্যায় বক্র ধারায় জল পড়িতেছে, নিম্নে একখানি প্রস্তর আছে। তাহার উপর সাবধানে বসিলে ধারায় স্নান করা যায়। কিন্তু একটু অসাবধান হইলেই তৎক্ষণাৎ দক্ষিণপার্শ্বস্থ খরস্রোতে পতিত হইয়া যমকর কন্দুকলীলাভিনয় করিতে হইবে!

শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আমি সলম্ফে সেই প্রস্তরে পতিত হইলাম। এবং অতিশয় সাবধানতা ও তৃপ্তির সহিত সুবর্ণরেখার সেই পবিত্র ধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করিলাম। সংসারে নারী হৃদয়ের পবিত্র স্নেহ ধারাতেও এইরূপেই ক্লান্ত হৃদয় শান্ত হয়। তাপিত হৃদয় শীতল হয়।

এইখানে একটি শিবলিঙ্গও আছেন। তবে তাহা একটি প্রস্তরগহ্বরে স্থাপিত সিন্দূরলিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরাও ইচ্ছা করিলে ঐরূপ দশ বিশটা শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতে পারিতাম।

আমাদের প্রদর্শক তথায় খুব ভক্তি প্রণয়াদি করিল। আমরা পাষণ্ড থাকিয়া গেলাম। তবে বিশ্বেশ্বরের অনন্ত মহিমার নিকট প্রণত না হইয়া থাকিতে পারি নাই, সে কথা বলা বাহুল্য।

আমাদের জনৈক বাবু বলিয়াছেন, তিনি একবার এই স্থানে লোকজনসহ তাম্বুতে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। গভীর রজনীতে চতুর্দ্দিকের গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রপাতের গদ্‌গদ্‌ধ্বনি যেন সুর-সঙ্গীতের লহরিবৎ হৃদয়ে সুধাধারা বর্ষণ করে। যেন মনে হয়, বুঝি স্বর্গ হইতে দেবগণ হরি সঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ বাদন করিতেছেন। অক্লান্ত, অশ্রান্তভাবে এই ধ্বনি হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে একটা আলোড়ন উত্থাপিত করে, কি এক অদ্ভুতপূর্ব্বভাবে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, কি এক বৈরাগ্য হৃদয়কে উত্তেজিত করে, তাহা ভাষায় বর্ণন করা অসাধ্য। তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও তাহাই বোধ হয়।

এ স্থানের মাধুর্য্য যে রজনীর নিস্তব্ধতায় শতগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শীতের বেলা অবসান প্রায়। আর দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই সন্ধ্যার দূত অন্ধকার আসিয়া সমস্ত বনভূমি শ্যামায়মান করিয়া ফেলিবে, সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিগকে প্রপাত পরিত্যাগ করিতে হইল।

প্রপাতের নিম্নস্থ দহে বহুতর বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য আছে। ওখানকার একজাতীয় মৎস্যজীবি জলমধ্যে ডুব দিয়া ঐ সব মৎস্য সুকৌশলে ধৃত করে। জাল আদি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। বোধ হয় মৎস্যগুলি নদীর প্রস্তর গহ্বরে থাকে, মৎস্যজীবি ডুব দিয়া কৌশলে গহ্বর মুখ বন্ধ করিয়া ধরিয়া থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশে আমরা সে দিন মৎস্যজীবি পাই নাই। যখন ফিরিব তখন উপর হইতে দেখিলাম, কয়েকজন জালদ্বারা মাছ ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। পূর্ণ বয়স্ক মানুষগুলিকে আট দশ বৎসরের বালকের মত দেখাইতেছে। আমরা পনর কুড়ি মিনিট দেখিলাম, কিন্তু তাহারা কোন ভাল মাছ ধরিতে পারিল না।

আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনায় আমরা অতৃপ্ত বাসনার সহিত প্রপাত ত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থানের দিকে যাত্রা করিলাম। নদীকূলে ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের পদ চিহ্ন দেখা গেল। আমরা এবার অন্য পথে পর্ব্বত পার হইয়াছিলাম। এইটাই সাধারণ পথ।

ক্রমে বরিয়াতু পৌঁছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকার মণ্ডলদল আমাদের আহারের কোনই উদ্যোগ করিয়া রাখে নাই। ক্ষুণ্নমনে বন্ধুর গৃহের দিকে চলিলাম। পথে কয়েকখানি ইক্ষুদণ্ড ক্রয় করিয়া, তদ্দারা কথঞ্চিৎ ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় লারিতে ফিরিয়া আসিলাম।

হুনড্রু দর্শন শেষ হইল, কিন্তু সে মধুর স্মৃতি চিরজীবনে ভুলিব না।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

কবি।

হরিহর বাবুর পুত্র শ্রীমান জলধরের বাহিরের হাব ভাব দেখিয়াই বেশ বুঝা যায়, সে একজন কবি। মাথায় কার্ত্তিকের মত কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, নাকে সোণার ফ্রেমে বাঁধা চসমা, পায়ে মকমলের 'পামসু' (shoe) চোখে আকুলতাময় বিস্ফারণ, বেশ ভূষায় যত্নসাধ্য শিথিলতা—এ সকলই তাহার কবি হৃদয়ের পরিচায়ক। ইহা ছাড়া নির্জ্জনপ্রিয়তা আর একটি লক্ষণ।

জলধর কি বয়সে প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। বালক বালিকাগণের জন্য মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে সাত আট বৎসরের বালকের দুই একটি কবিতা দেখা যায়; জলধরের নাম তাহার মধ্যে দেখা গিয়াছে কি না, বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চয়, সে একজন অকাল প্রসূত কবি। কিন্তু গাছে যে ফলগুলি আগে ধরে, পরে প্রায়ই তাহারা শুকাইয়া যায়—সুপক্ক হইবার সময় পায় না। পৌষ মাঘ মাসের কাঁঠাল গ্রীষ্মের প্রখরতাপ সহ করিতে পারে না—একে একে সব খসিয়া পড়ে। অকালপক্ক মানুষের দশাও তদ্রূপ। সংসারের নিষ্পেষণে তাহারা অকাল প্রসূত, পাকিবার পূর্ব্বেই অনাদরে তাহারা পচিয়া যায়। এ হিসাবে জলধরের পচিবার আশঙ্কা অধিক; তবে কিনা সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে।

প্রথম প্রথম জলধরের সহপাঠিরা তাহার কবিতা-উৎসের অযাচিত বর্ষণে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শেষে পিতৃশাসনে তাহা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় লোক চক্ষুর অগোচরে অবিরাম স্রোতে চলিতে আরম্ভ করে। জলধরের বিশ্বাস, সে মনে করিলেই একজন উচ্চদরের কবি হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে কত যে পদ্য অবতারণা করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে কখনও স্নিগ্ধ প্রভাত তপনে মলয় সেবিত উপবনে ভ্রমণ করিত, কখন উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন আড়ালে শীতল বকুল বৃক্ষ-ছায়ায় আনমনে বসিয়া থাকিত, কখন নলিন সায়াহ্নের 'কুয়াসা-আঁধার'

নির্জ্জন শ্মশানক্ষেত্রে ভাবে বিভোর হইত, আবার কখন বা নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে নিস্তব্ধ তটিনীবক্ষে তরণী চালনা করিতে করিতে উদাস নয়নে চন্দ্রমা-পানে চাহিয়া রহিত। কিন্তু এখন আর সে সব নাই। সম্প্রতি তাহার ধারণা—প্রেমিক না হইলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না। যখন তাহার এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে একটি সুন্দরী বালিকামূর্ত্তি প্রতিবেশী কন্যা ক্ষুদ্র 'নান্‌কি' রূপে তাহার মনপদ্ম আগুলিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চদশবর্ষীয় প্রেমিক এইরূপে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে ভালবাসিয়া ফেলিল।

(২)

নান্‌কির ভাল নাম লাবণ্যময়ী। বয়সের অনুপাতে লাবণ্যময়ী দেখিতে আরও ছোট। তাহার পিতা শ্রীহরি বাবু কালেক্টরীতে অল্প বেতনে কার্য্য করেন। একে সহরের মেয়ে, তাহার উপর চঞ্চল স্বভাব; কাজে কাজেই নান্‌কির দৌরাত্ম্যে পাড়াটি অস্থির।

মানুষকে ক্ষেপাইতে তাহার মত পটু অতি অল্প বালক বালিকাই আছে। প্রাতঃকালে গোয়ালিনী দুধ দিতে আইসে, অমনি নান্‌কি তাহার সম্মুখে যাইয়া নিজের ভুরুর কামান টানিতে থাকে। গোয়ালিনী গালি দিতে দিতে চলিয়া যায়।

চার কুড়ি দুই বৎসর অতিক্রম করিলেও চতুর্থ পক্ষেও স্ত্রী বর্ত্তমানে গোবর্দ্ধন দত্ত কোনমতেই নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। তথাপি নান্‌কি তাহার দোকানে মুড়ি কিনিতে গিয়া তাহাকে 'গোবরা বুড়ো' বলিয়া ডাকিবেই। ইহার ফলে মুড়ি কিনিতে বহুবিলম্ব হয় এবং নান্‌কি প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে।

রাম বাবুর বাসায় বীরেশ্বর সিং নামে এক বরকন্দাজ আছে। 'লুচ্চা আদমী' বলিয়া ভুলিয়াও সে কখন শ্রীকৃষ্ণের নাম মুখে আনে না। তাহার মুখে সর্ব্বদা "জয় সীতারাম, জয় সীতারাম," স্নান করিবার সময় তাহার সহিত নান্‌কির প্রায়ই দেখা হয়। বেচারা লোটা কাপড় ঘাটের উপর রাখিয়া যখন জলে নামে, তখন নান্‌কি তাহাকে শুনাইয়া আপন মনে বলে "জলের মধ্যে যে কিষণজীকে দেখ্‌ছি"। বীরেশ্বরের আর স্নান করা হয় না। লোটা কাপড় লইয়া অমনি সে অন্য পুষ্করিণীর উদ্দেশ্যে ছুটে। বালিকা তখন চীৎকার করিয়া বলে "ও বীরু সিং তোর কাপড়ে কিষণজী, তোর লোটায় কিষণজী" বীরেশ্বর উভয় মাটীতে ফেলিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করে। নান্‌কি হাসিয়া কুটিকুটি!

ইহা ছাড়া নান্‌কির আরও অনেক 'প্রতিবাদ' আছে। দ্বিপ্রহরের সময় তাহার মাতা সহস্র চেষ্টাতেও তাহাকে বাসায় রাখিতে পারেন না। সে কুলতলায় যাইয়া হয়ত কখনও চীৎকার করিতেছে—"আক্কোরে মাক্কোরে কুল পেড়ে নিল," আবার কখন পুষ্করিণীর সান ধরিয়া পা আছড়াইয়া সাঁতার দিতেছে; আবার কখন রাস্তায় গাড়োয়ানকে সতর্ক করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—"পিছারি চাবুক।"

কিন্তু হাসিতে হইলে কাঁদিতে হয়। বলা বাহুল্য নান্‌কির পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। সময়মত একবার মাতৃহস্তে পড়িলে তাহার আর নিস্তার নাই। হাতে না কুলাইলে যষ্টি প্রহারও চলে। কিন্তু সে প্রহার কোন কাজে আইসে না। বিড়াল একবার গা ঝাড়া দিতে পারিলে সমস্ত প্রহার যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। নান্‌কির পক্ষেও তাহাই। বাস্তবিকই সে বড় 'বেহায়া' মেয়ে।

(৩)

কবি জলধর এখন নান্‌কিকে লইয়া অহরহঃ ব্যতিব্যস্ত। কখন তাহার জন্য ছবি আঁকিতেছে, কখন কাগজের নৌকা তৈয়ার করিতেছে, কখন আবার তাহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। নান্‌কি উপস্থিত থাকিলে এক দণ্ডের জন্যও তাহার সোয়াস্তি নাই। সে তাহার উপহাসের বস্তু, ক্রোধের পাত্র, আবদারের সামগ্রী, সে যাহা বলিবে, 'বেকুব' জলধরকে তাহাই করিতে হইবে। একদিন এইরূপে নান্‌কি তাহাকে পাড়ার সমস্ত রাস্তা মাথায় গাধার টুপি বহন করাইয়াছিল। ফল কথা, জলধরের এখন আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই। পড়াশুনায় প্রায় 'ইতি,' নান্‌কির প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে, প্রতি নেত্রপাতে, প্রতি ব্যবহারে, এমন কি প্রতি কথায় সে তাহার "প্রতিধ্বনি"র পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে ব্যস্ত।

সর্ব্ব বিষয়ে অলসচিত্ত হইয়া শ্রীমান এখন সুধু কবিতা লেখে ও কবিতায় বাস করে। ইহার জন্য তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। একদিন পেছনের বেঞ্চে বসিয়া সে চুপে চুপে কবিতা লিখিতেছে, এমন সময় মাষ্টার মহাশয় জলদগম্ভীরস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জলধর, কি কর্‌ছো? এদিকে একবার কাগজখানা নিয়ে এস ত।" ক্লাসের সকল ছেলেই জানে জলধর তখন কি করিতেছে। একটি ছোট ছেলে বলিয়া উঠিল,—"Sir! ও poetry লিখ্‌ছে;—ও খুব ভাল লিখ্‌তে পারে," ক্রোধ হইতে মাষ্টার মহাশয়ের ঔৎসুক্য জন্মিল। তিনি জলধরকে অভয়দান করিয়া কাগজখানি লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন। কবি সন্ধিপূজার ছাগশিশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে মাষ্টার মহাশয়ের হাতে কাগজখানি দিল। তিনি পড়িয়া ঈষদহাস্যে বলিলেন,—"এ যে দেখ্‌ছি রবি ঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন কবিতা হ'তে লাইনগুলি চুরি করে একত্র করেছ! যাক্ মন্দ হয় নাই।" সহপাঠিরা প্রকৃত গুণ বুঝিতে পারিয়া কবির নাম রাখিল—"plagiarist।"

কিন্তু যে দিন 'কাল্‌টি'কে দিয়া নান্‌কিকে কবিতা ও উপহার প্রথম পাঠান হয়, সে দিন সে সকলের চেয়ে বেশী জব্দ হইয়াছিল। পঞ্চমবর্ষীয়া কাল্‌টি ওরফে কালীতারা দৌত্যকার্য্যে তেমন সুদক্ষ নহে; সে বরাবর রান্নাঘরে মাতার নিকট উপহারের বস্তুগুলি দাখিল করিয়া নিজের ক্ষুদ্র সংসারের কার্য্যে চলিয়া গেল। ভাগ্যে মাতা লেখাপড়া জানেন না, নতুবা সেই দিন হইতেই শ্রীমানের সহিত শ্রীমতীর দেখা সাক্ষাৎ এককালীন বন্ধ হইত। কাগজের কোন মূল্য না ধরিয়া সুধু উপহারের জিনিষগুলি দেখিয়া তিনি 'তেলে বেগুনে' জ্বলিয়া উঠিলেন। "কি, তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'পয়সা রোজগার কর্‌ছেন, আর ও কি না তাই এসেন্স রুমাল কিনে উড়িয়ে দিতে বসেছে? আমি চাই না এ সব। আমার দু'কাল গিয়েছে, এখন এক কাল বাকী! ও কাল্‌টি, ও আবাগি, শীগ্‌গির এ সব ফিরিয়ে দিতে বল্; কর্ত্তা দেখ্‌লে পরাণ আর রাখবেন না। মর্, বালাই গেল কোথা?" মাতার শাসনে পিতা বাটীর মধ্যে হাজির। তিনি স্বভাবতঃ কিছু কৃপণ। পুত্রের এই অমিতব্যয়ে তিনি যে কিরূপ চটিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন। এদিকে শ্রীমান জলধর বাড়ীর ভিতর তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া, আশুবর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, নিতান্ত সুবুদ্ধি বালকের মত স্নান করিতে প্রস্থান করিল। তর্জ্জন গর্জ্জনের তখন কোন ফল ফলিল না বটে, কিন্তু বৈকালে কবি জানিতে পারিলেন, এক মাসের জন্য তাঁহার জলখাবারের পয়সা বন্ধ। কবি ইহাতেও সন্তুষ্ট, কারণ গূঢ় তথ্য কেহ অবগত হন নাই।

(৪)

দুই তিন বৎসর চলিয়া গেল। হিন্দুগৃহে জন্মিয়া নান্‌কি এখন বিবাহ যোগ্যা; সুতরাং তাহাকে আর নান্‌কি বলা উচিত নহে;—এখন সে লাবণ্যময়ী, গদাধর ডাক্তারের কন্যা আট নয় বৎসর পর্য্যন্ত 'খাঁদি' নামে পরিচিতা ছিল। দশ বৎসরে পড়িতে না পড়িতে সকলের উপর কড়া হুকুম জারি হইল, কেহ আর তাহাকে 'খাঁদি' বলিয়া ডাকিতে পারিবে না। সে অবধি সে 'স্নেহকুসুম' নামে অভিহিতা হইতেছে। যদিও নান্‌কির পক্ষ হইতে সেরূপ কোন হুকুম প্রচার হয় নাই, তথাপি পূর্ব্ব হইতে আমাদিগের সাবধান হওয়া যুক্তি সঙ্গত।

দেখিতে দেখিতে লাবণ্যময়ী বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মতি আর তেমন চঞ্চল নহে;—সে এখন শান্ত, স্থির, গম্ভীর। জননীর সহকারিতায় সদা সর্ব্বদা থাকায় 'কর্ম্মা' বলিয়া পাড়ায় তাহার যশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লাবণ্যময়ী সিদ্ধ শ্রোত্রীয়ের কন্যা; সুতরাং তাহার সম্বন্ধের আর অভাব নাই। কিন্তু মাতাপিতা একমত না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত সে অবিবাহিতাই আছে। এ জন্য বিধবা ব্রহ্মঠাকুরাণী ও রাঙ্গা বউয়ের কাছে মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে যে কথা শুনিতে না হয়, তাহা নহে; তবে তাঁহারা সে সব কথা প্রায়ই কানে তুলেন না।

জলধরের সহিত লাবণ্যময়ীর আর বড় একটা দেখা শুনা হয় না। কবি কল্পনাপ্রিয়; সে আশা দিয়া, ভাষা দিয়া, আপনার মানসী প্রতিমা গড়িয়া লয়। লাবণ্যময়ীর এই শান্তমূর্ত্তি ধারণে ও তাহার বিরল দর্শনে কবি জলধর যে নানারূপ কল্পনা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে ভাবিতে লাগিল, গভীর প্রণয়গুরুত্বে লাবণ্যময়ী গম্ভীর হইয়াছে, তাই মধুর লজ্জায় তাহার নিকট আসিতে

সঙ্কোচ বোধ করে। এইরূপ সুখ কল্পনায় কবির কয়েক মাস কাটিয়া গেল!

এদিকে ঘন ঘন লাবণ্যময়ীর সম্বন্ধ জুটিতে লাগিল। কবি কল্পনায় আর কি ভাবিয়া কতদিন সুস্থির থাকিবে? তাহার পর লাবণ্যময়ীকে পাইবার কোনরূপ লক্ষণও সে দেখে না। সেই কবি এখন চিন্তিত, আহার নিদ্রাবর্জ্জিত। সন্তানের উৎকট ব্যাধি হইয়াছে মনে করিয়া জননী ভাবিয়া আকুল। ব্যাধি উৎকটই বটে।

(৫)

জলধরের পিতা অত্যন্ত রাগিয়াছেন, সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসিতে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে, দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ফরাসে একটি কাগজের মোড়ক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একাকী পড়িয়া রহিয়াছে। হরিহর বাবু উৎসুক হৃদয়ে মোড়কটি খুলিয়া পাঠ করিলেন। পড়িয়া তিনি রাগতঃ স্বরে বলিলেন,—"কি, ছেলের এত বড় আস্পর্দ্ধা!" তাহার পর বাটীর ভিতর যাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে জলধরকে কাগজখানি পড়িতে বলিলেন। উভয়ে কর্ত্তার ক্রোধমূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কবির মুখ শুকাইয়া গেল। কাগজখানি ধরিয়া সে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরিশেষে কর্ত্তা কনিষ্ঠ পুত্র শশধরকে ডাকিয়া সেই লেখা পড়িতে আদেশ করিলেন। বালক কম্পিতস্বরে পাঠ করিল—"আমি শ্রীহরি বাবুর কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যময়ীকে বিবাহ করিব।" গৃহিণী গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হরিহর বাবু জলধরকে প্রহারাদি না করিয়া সুধু বলিলেন—"বাড়ী থেকে বেরো পাজি, তোর মুখ দেখ্‌তে নেই।" জননী সভয়ে কোলের কাছে ছেলেকে টানিয়া লইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সহরের অধিকাংশ স্থানে ছাত্র মহলে এ ব্যাপার রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহার দিন দুই পর একদিন প্রাতঃকাল হইতে শ্রীমান জলধরকে বাড়ীতে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। চারিদিক অনুসন্ধান হইল,—কিন্তু সবই বৃথা। ক্ষোভে অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া বালক কবি পলায়ন করিয়াছে।

নাইনিতালে হরিহর বাবুর মাতুলপুত্র হেমবাবু কর্ম্ম করিতেন। জলধর একদিন সহসা তথায় গিয়া উপস্থিত হেম বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ শ্রীমানের এই অকস্মাৎ আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; জলধর অবনতবদনে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "শরীর খারাপ তাই জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য আসিয়াছি। তাড়াতাড়িতে পত্র লিখিবার সময় হয় নাই।"

শ্রীমান জলধরের গৃহত্যাগের মাসখানেক পরে একদা বসন্তের প্রফুল্ল প্রভাতে শ্রীহরি বাবুর বাটী হইতে সানাই ললিত মধুর রাগিণীতে বাজিয়া বাজিয়া শ্রীমতী লাবণ্যময়ীর শুভবিবাহ সংবাদ পল্লিমধ্যে ঘোষণা করিতে লাগিল। নাইনিতালে বসিয়া জলধর ভ্রাতা শ্রীমান শশধরের পত্রে এ সংবাদ অবগত হইল।

সেই কল্পনা কুসুমময়ী-মানস-প্রতিমার শুভপরিণয়-সংবাদে জলধরের ব্যথিত হৃদয় মথিত করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল এবং দক্ষিণ করে কপোলতল ন্যস্ত করিয়া সুনীল আকাশ ও দূরস্থ পর্ব্বত নীলিমার প্রতি অপলক উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া কবি ভাবে একান্ত বিভোর হইয়া পড়িল।

পরদিন বাড়ী যাইবার জন্য কঠোর আদেশ সম্বলিত হরিহর বাবুর এক পত্র তাহার হস্তগত হইল। পিতার এই কঠিন আদেশলিপির নির্ম্মম আঘাতে, সর্ব্বোপরি পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হইবার নিদারুণ আশঙ্কায়, কবি জলধর তাহার কবিত্ব এবং কল্পনার কুসুম কানন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিতান্ত সুবোধ শিশুটিরমত পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ প্রস্তুত হইল।

শ্রীমান জলধরের দুর্লভ কবিজীবনের এই খানেই পরিসমাপ্তি হইল কি না, সে সংবাদ এ পর্য্যন্ত আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চৌধুরী।

কবিতাগুচ্ছ।

পূরাতন।

বসাইনু হৃদয়ের শূন্য সিংহাসনে,
নবীন প্রতিমা গড়ি’—লাবণ্যের খনি,
অমিয়-ছানিত তনু, ইন্দুনিভাননী,
তরুণ তড়িত-লতা খচিত রতনে;—
সোহাগ জড়িত কণ্ঠে, আপনা ভুলিয়া,
প্রীতি-পুষ্পে চারু অর্ঘ্য করিয়া রচনা,
করিনু কাতর প্রাণে কতই অর্চ্চনা
নব মন্ত্রে, নব্য তন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া।
কিন্তু হায়! শূন্য হৃদি—শূন্যের নিলয়—
নব দেবী প্রতিমার নাহি তাহে স্থান;
কোথাও না পাই তাঁর করিয়া সন্ধান,—
সব শূন্য—সব ধূ-ধূ—সব মরুময়!
অতীতের স্মৃতি-লেখা ভুলিব কেমনে?—
মন বাঁধা শুধু ‘সেই এক পুরাতনে।’

শ্রী ঃ———

বর্ষার নদী।

গৈরিক বসন পরি যোগিনীর মত
সলিল কল্লোলে কারে মর্ম্মের কাহিনী
কহিছ বিরলে, অয়ি চঞ্চল গামিনি!
কোন দেব-পদ লাগি ধরেছ এ ব্রত?
যৌবন—উচ্ছ্বাস-যুত তরঙ্গিত কায়
নীরবে দিতেছ ঢালি’ কোন দেবতায়?
অনন্ত প্রশান্ত সিন্ধু তব যোগ্যপতি।
যার তরে এই ব্রত ধরেছ যুবতি!
অবিশ্রাম সাধিতেছ জগত-কল্যাণ,
আপনার সুখ শান্তি নাহি অভিলাষ,
উপাস্য চরণে করি সরবস্ব দান
পাইছ অমোঘ তৃপ্তি, অপার উল্লাস।
ধন্য নদী, ধন্য তব স্বার্থ-হীন ব্রত,
তোমার আদর্শ হোক জগতে জাগ্রত।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন।

পরপারে।

মরণের পরপারে কনক আলোকে
যবে মোরা মিলিব দুজনে,
বিশ্বের মাধুরিরাশি পড়িবে উছলি’
ওই দুটি অমল চরণে;
জীবন গগনে মম অমর উজ্জ্বল
পূর্ণচন্দ্র জাগিবে মোহন,
ধাতার করুণা-বলে হবে অচঞ্চল
দুঃখহীন অনন্ত জীবন।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

নিঃস্বার্থ।

সবইত ফুটে থাকে ফুল।
কোনটিতে মালা গাঁথে’ কোনটি বা দেবব্রতে,
কোনটি বা রূপশীর আলো করে চুল।
কোনটি বা ঝরে পড়ে, নির্দ্দয় নির্ম্মম ঝড়ে,
পরাণের আশাটুকু পরাণে নির্ম্মূল।

সবারি হৃদয়ে কিন্তু একই উচ্ছ্বাস।
একই নিষ্ফল আশা, অযাচিত ভালবাসা,
একই ফুটন্ত হাসি উদাস উদাস।
একই নির্ম্মল শান্তি, সরস পিযূষ কান্তি,
একই করুণা এক নীরব বিকাশ।

একই আশ্বাসে এক ঊর্দ্ধমুখী ধ্যান।
একই শিশির বিন্দু, একই বিমল ইন্দু,
মলয় নির্ভর এক বিশ্বমুক্ত প্রাণ।
একই আঁধার বনে, আজীবন ফুল্লমনে,
পরের মঙ্গলে সদা ঢেলে দেয় প্রাণ।

শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৬ষ্ঠ ভাগ। কার্ত্তিক, ১৩১০। ৭ম সংখ্যা।

পূজা।

সপ্তমী অষ্টমী কিম্বা নবমী দশমী
নাহি এ পূজায়। এ পূজা হ’তেছে নিত্য।
প্রভাতে তেয়াগি’ শয্যা মেলিয়া নয়ন
চাহিবে যেমনি পূর্ব্বে, হেরিবে অমনি—
রক্তবস্ত্র পরিহিত পুরোহিত রবি
বসেছে পূজায়; থরে থরে সুসজ্জিত
কাননে কুসুমগুচ্ছ রয়েছে সুন্দর।
গাহিছে বন্দনা-গীতি সুকণ্ঠ-বিহগ;
পবনে দোলায়ে শির ব্যজনে নিয়ত
রয়েছে পাদপ; শিশুর আনন্দ রোলে
হ’তেছে ধ্বনিত মিষ্ট বাজনার রব।
নদ নদী সিন্ধুবারি হ’তে বাষ্পাকারে
উঠিতেছে ঊর্দ্ধ দেশে ধূপ-ধুনা-ধূম।

মধ্যাহ্নে হেরিবে পুন মস্তক উপরে,—
বর্দ্ধিত ভাস্বর তেজ দীপ্তিময় রবি,
তেয়াগিয়া রক্ত-বস্ত্র পূজা অবসানে,
সমুজ্জ্বল শুভ্রবেশে হয়েছে সজ্জিত;
হেরিছে কি কৌতূহলে ভোজন ব্যাপার
প্রতি গৃহে গৃহে, এ ভোজনে নাহি কোন
জাতি বর্ণ ভেদ।

সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে হেরিবে আবার—
রক্ত-বস্ত্র পরি’ রবি আরতির তরে
বসেছে আসনে; বিহগের কণ্ঠে পুনঃ
উঠিছে বন্দনা-গীতি; ধূপ-ধূমরূপে—
মেঘমালা যেন শোভিছে গগন কোলে।
দোলাইছে তরুলতা সুনীল চামর;
যুক্তকরে ভক্তিভরে দিগ্‌বধূগণ
করিছে প্রণাম।

নিশায় চাহিবে যবে দেখিবে তখন
নভঃ চন্দ্রাতপ কিবা আলোক মালায়
হয়েছে সজ্জিত ; উজ্জ্বল তারকারাজি
ছড়াইছে স্নিগ্ধরশ্মি ; বাজিছে মধুর
ঝিল্লি রবে ঐকতান ; শ্যামার সুতানে
ঝরিছে সঙ্গীত-সুধা ; পত্র অন্তরালে
বেলা যুঁথি যাতি আদি লুকায়ে গোপনে
হরষে শুনিছে তাহা।

এ পূজায় নাহি বলি নাহি প্রাণিবধ,
নাহি করে রক্তস্রোত কলঙ্কিত ধরা।
সম্পদ গরিমা বৃথা নাহি এ পূজায় ;
ভক্তি-প্রেম-প্রীতি শুধু এ পূজা সম্ভার !

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চৌধুরী।

হায়দার আলি ও ইংরাজ-সমরে লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিলের পত্র।

মহীশূরের মহাবীর হায়দার আলির নাম ভারতের ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। কাহারও নিকট হায়দার আলি একজন পররাজ্যাপহারক ঘৃণিত দস্যু বলিয়া পরিচিত, কাহারও নিকট তিনি একজন নিতান্ত নৃশংস নবাব—দয়া শূন্য স্নেহ শূন্য—মমতা শূন্য। বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক রেনেল ও গ্লিগ হায়দারের যত প্রশংসা করিয়াছেন, অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ হায়দারের ততই নিন্দাবাদ গাহিয়াছেন। রেনেল মহোদয় নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন, 'হায়দার আলি প্রতীচ্যের্ ফ্রেডরিক,*—গ্লিগ বলিয়াছেন, 'হায়দারের যুগে তিনিই পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেনাপতি ছিলেন'। †

কিন্তু রেনেল সাহেবও বলিয়াছেন, নিষ্ঠুরতাই হায়দার-চরিত্রের কলঙ্ক। পৃথিবীতে কলঙ্কশূন্য চরিত্র বিরল। হায়দারের হৃদয় যে রমণীজনসুলভ কোমলতায় পূর্ণ ছিল, তাহা আমরা বলিতেছি না,—হায়দার যে কুসুমের ন্যায় কোমল ও চন্দ্রকরের ন্যায় স্নিগ্ধ ছিলেন, তাহাও আমরা বলিতেছি না, যোদ্ধা তেমন হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। শাণিত খড়্গ পরিচালনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত্রুর ছিন্নশির ভূলুণ্ঠিত করাই যাহার জীবনের ব্রত,—শোণিত দর্শনে তাহার হৃদয় বিচলিত হয় না। সুতরাং যোদ্ধা হায়দার আলিও শোণিত দেখিয়া, ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়া, আহত মরণোন্মুখ সৈনিকের শেষ রুদ্ধ আর্ত্তনাদ শুনিয়া বিচলিত হইতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার হৃদয় সে সকল আঘাত অনায়াসে সহিত—তাহাতে কোনরূপ রেখাপাত হইত না।

এজন্য নগণ্য দরিদ্র সন্তান হায়দার নায়ক কেবল আপন বাহুবলে, বুদ্ধি ও কৌশলে মহীশূরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন ; সুতীক্ষ্ণ তরবারির সাহায্যে যাঁহাকে সর্ব্বদা আপন পথ সুগম ও সহজ করিতে হইয়াছিল—নরশোণিতপাত করিয়া রক্তরঞ্জিত খড়্গহস্তে যিনি সৌভাগ্য-শৈল-শিখরের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহার পথ যে কোমল কমলদল সমাকীর্ণ ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষাই মানুষকে দেবতা করে। শিক্ষাই মানব হৃদয়ের সকল সুন্দর বৃত্তিগুলি সম্যক প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে—শিক্ষার পুণ্য-কিরণসম্পাতে অন্ধকার-হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠে—অসম্পূর্ণাবয়ব চিত্তবৃত্তিগুলি শিক্ষার সদ্‌গুণে সম্পূর্ণাবয়ব হইয়া সুন্দর হয়। হায়দারের শিক্ষা ছিল না—তিনি আজীবন নিরক্ষর ছিলেন ; সুতরাং হায়দার-চরিত্রে নিষ্ঠুরতা একটি অসম্ভব ব্যাপার নহে। তবে কয়েকজন ইংরাজ ঐতিহাসিক হায়দারকে যেরূপ নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, হায়দার আলি সেরূপ ছিলেন কি না সন্দেহ। হায়দার যদি প্রকৃতই পিশাচ হইতেন, তাহা হইলে একবার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াই পুনরায় নিমেষমধ্যে সৈন্যবল সংগ্রহ করিতে পারিতেন না—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে লক্ষ যোদ্ধা রণ সজ্জায় সজ্জিত হইত না। অর্থে সকলই ক্রয় করিতে পারা যায়, কিন্তু শুধু অর্থে প্রাণ কিনিতে পারা যায় কি ? শুধু অর্থে হৃদয় বাঁধা পড়ে কি ?

* Rennel's Memoirs of Hindustan—*Intro.*
† History of British India—*R. G. Gleig vol. II.*

ভারতেতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন, হায়দার আলি জীবনে কতবার শত্রুকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছেন,– কতবার তাঁহার অর্থ, সেনা, শক্তি সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়াছে,—আবার হায়দার আলি অর্থ-সংগ্রহ করিয়াছেন—সেনাবল সংগ্রহ করিয়াছেন—শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। হায়দার যদি নিতান্ত নিষ্ঠুর হইতেন, তাহা হইলে কিছুতেই তাহা পারিতেন না। শুধু অর্থের লোভেই যে সৈনিকগণ হায়দারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন তাহা নহে। যাহারা সমরক্ষেত্রে শয়ন করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিত, তাহারা সেনাপতির অসামান্য গুণরাশি ও ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, হায়দারের মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আবশ্যক—বারান্তরে সে সকল প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিব।

ইংরাজ ও হায়দার-সমরে অনেক ইংরাজ সৈন্য বন্দীকৃত হইয়া হায়দারের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন—তাঁহাদিগের মধ্যে ইংরাজ কাপ্তান, ইংরাজ কর্ণেলও অনেক ছিলেন—সিপাহী সৈন্য ত দূরের কথা। কতকগুলি ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন, এই সকল বন্দীকৃত যোদ্ধাদিগের প্রতি হায়দার আলি অমানুষিক পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছেন—ক্ষুধার সময় পর্য্যাপ্ত আহার দেন নাই—পরিধানের জন্য পরিমিত পরিধেয় দেন নাই—পীড়ায় সময় ঔষধ দেন নাই—এমন কি তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া স্বয়ং আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন ! কিন্তু একজন ইংরাজই হায়দারের জীবন-চরিত লিখিয়া চরিত্র সমালোচনায় বলিতেছেন :—

"যদিও তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল এবং অপরাধীর প্রতি কঠিন দণ্ড বিধানই তাঁহার শাসনের অন্যতম অঙ্গ ছিল, তত্রাচ তিনি যে কেবল যন্ত্রণা দিবার জন্যই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন, অথবা বন্দিদিগকে কষ্ট দিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হইতেন, এমন বোধ হয় না।*

স্বনামধন্য হলওয়েল সাহেব একদিন সাইরেল পোত হইতে মিঃ উইলিয়ম ডেভিসের নিকট ইতিহাস প্রসিদ্ধ অন্ধকূপ হত্যার লোমহর্ষণকাহিনী, প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন,—ইংরাজ নরনারী সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে কত শত বার শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন ; কত শত বার ঘৃণায়, ক্রোধে, অপমানে, দুঃখে দুর্ভাগ্য সিরাজের উপর তীব্র তীরস্কার, অগ্নিসম অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সিরাজ-চরিত্রের ইংরাজ-বর্ণিত সেই কলঙ্ককাহিনীর পরিচয় আজিও কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া যায়। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের অনুগ্রহপ্রোথিত প্রস্তরফলক আজিও সেই বীভৎস কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে।

ইংরাজ ও সিরাজ-সমরে যেমন হলওয়েল, ইংরাজ ও হায়দার-সমরে তেমনি লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিল। থরন্‌টন্ প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিলের করুণকাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান দিয়া তাহা যুগ যুগান্তরের জন্য হায়দারের নিষ্ঠুরতার স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ সুরক্ষিত করিয়াছেন।*

কর্ণেল বেলির সহিত লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিলও নাকি হায়দারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। অস্ত্রের আঘাতে তাঁহার বাম হস্তখানি নাকি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল—তরবারির আঘাতে দক্ষিণ হস্তেরও মাংসপেশী কাটিয়া গিয়াছিল। মেল্‌ভিল স্বয়ং লিখিয়াছেন :—

"এইরূপে আহত হইয়া আমি অনেকক্ষণ সমরক্ষেত্রে পড়িয়াছিলাম,—এরূপ অবস্থায় যে সকল যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, আমি সে সমস্তই সহ্য করিতেছিলাম। কিছুকাল পর আমরা বিজয়ী হায়দারের শিবিরে আনীত হইলাম ; তথায় আমার মত আশা-ভরসা-বিহীন অসহায় আরও অনেক আহত সৈনিক উপস্থিত ছিল। হায়দার-শিবির হইতে আমরা প্রথমে আর্ণি ও তৎপরে বেঙ্গলোরে যাইয়া উপনীত হইলাম।"

"এই দুঃখপূর্ণ সুদীর্ঘ পর্য্যটন সমাপনান্তে আমরা আনন্দিত হৃদয়ে মনে করিয়াছিলাম, যে এইবার বুঝি কতকাংশে দুঃখের লাঘব হইবে। কিন্তু যখন আমাদিগের

* Neverthless, although his training had been defective, and his policy often dictated severe punishments, it does not seem that he was *wantonly brutal* or *that he took a pleasure in torturing* his prisoners."
Life of Haidar Ali—Bowring
Rulers of India Series.

* Thorntons British Empire; vol. II.

বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট, জল বায়ুর গতিরোধে অসমর্থ একখানি সামান্য কুটিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আরও অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন, তখন আমরা নিরতিশয় ভীত ও নিরাশ হইয়াছিলাম। বন্দিদিগের শীর্ণবদন, মলিনদেহ, অবিলম্বেই কারাগৃহের গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়া দিল—নূতন অতিথিদিগের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাও আমরা অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলাম।"

"তাহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের শারীরিক বেদনা অধিক থাকায় আমাদের অভাবও অনেক বেশী ছিল; সুতরাং তাহারা যে কষ্ট পাইতেছিল, আমাদিগের তদপেক্ষা অনেক অধিক কষ্ট হইয়াছিল। বেঙ্গলোর কারাগৃহে আমরা যে সকল ইংরাজবন্দিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলাম, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ একেবারেই অক্ষত অবস্থায় বন্দী হইয়াছিল, আর কেহ কেহ বা এত সামান্য আঘাত পাইয়াছিল যে, তাহাদিগকে ত্বরিদ্‌গমনে সে স্থান হইতে হায়দারের রাজ্যমধ্যে লইয়া গেলেও তাহারা সহ্য করিতে পারিত।"

"আমরা এরূপ কঠিন আঘাত পাইয়াছিলাম যে, আমাদের একজন অস্ত্রচিকিৎসকের আবশ্যক ছিল—কেহ কেহ বা অঙ্গহীন হইয়া অসহায় অবস্থাতেও ছিল।"

"আমাদিগকে কেহই ঔষধপত্র দিত না; গোপনে ঔষধ সংগ্রহ করাও অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছিল। কারণ কারাগৃহ হইতে কাহারও ঔষধ আনা একেবারেই নিষিদ্ধ; ধরা পড়িলে তজ্জন্য দণ্ডভোগ করিবার আশঙ্কাও ছিল।"

"এমনি করিয়া আমাদের শরীর বেদনায় প্রপীড়িত হইতে লাগিল—রোগে দুর্ব্বল হইতে লাগিল এবং নিরাশা ও দুঃখান্ধকারে মন ক্রমশই অবসন্ন হইতে লাগিল। হায়দারের সহিত সন্ধি সংঘটিত হইয়াছে, অথবা আমরাই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি—যদি কখন কখন এইরূপ কোন সুখের জনরব কর্ণগোচর হইত, তাহা হইলেই মনে করিতাম বুঝি আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন ভীষণ আবাসে আশার একটি অতি ক্ষীণ আলোর রেখা সম্পাতে আলোকিত হইয়া উঠিল—কিন্তু পরক্ষণেই অন্য একটি দুঃসংবাদ আসিয়া সেই আলোর রশ্মিকে দূরে সরাইয়া দিত এবং আমাদিগের দুর্দ্দশার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই যেন হতাশা আরও বাড়াইয়া তুলিত!"

"উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও আসিয়া কৌতূহলপূর্ণ নয়নে আমাদিগের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহারা সর্ব্বদা যেমন ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার চক্ষে আমাদিগকে দেখিত, তাহা অতীব যন্ত্রণাদায়ক। এমন কি শৃঙ্খলের অপমান হইতেও উহা আমাদিগের হৃদয় মধ্যে অধিক বিদ্ধ হইত।"

"আমাদিগের হৃদয়হীন রক্ষিবর্গ কর্ত্তাদিগের অনুকরণ করিয়া এবং তাহাদিগেরই মত বিদ্বেষ বিতাড়িত হইয়া আমাদিগকে যেরূপ অপমান করিত এবং কষ্ট দিত ও তাড়না করিত, তাহা তাহাদিগেরই নিজ নিজ হীনজন্ম ও নীচ অবস্থার অনুরূপ।"

"দুঃখের শান্তির জন্য যদি আমরা কখনও কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতাম, তাহা হইলে আমাদিগের নিবেদন অতিশয় ঘৃণাপূর্ণ ঔদাস্যের সহিত উপেক্ষিত হইত। তাহারা আমাদিগকে বারম্বার বলিত যে, যদি তাহাদিগের ঘৃণিত অনুরোধ রক্ষা করিয়া, আমরা আমাদের মাতৃভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করি, তাহা হইলে কারাগার হইতে পুনরায় জীবিত ফিরিয়া যাইবার জন্য আমরা বন্দী হই নাই।"

"যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ স্বাধীনতার প্রিয়-পুত্রদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে, তাহাদিগের হৃদয় ও মনোভাব সম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই বিচার করিয়া দেখিবেন, যখন আমাদিগের সেই ক্ষুদ্র কারাগৃহের সীমামধ্যেও সেই সকল নীচ কাররক্ষিগণ আমাদিগকে শাসন করিত, ভয় দেখাইত, এমন কি কখন কখন প্রহার পর্য্যন্ত করিত; তখন আমাদের এই হীন হেয় পতিত অবস্থা আরও কত অধিক যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া মনে হইত।"

"কৃতদাসের ন্যায়, উৎকট অপরাধীর ন্যায়—তাহারা দিবসে দুইবার আমাদিগকে একত্র করিয়া পরীক্ষা করিত; কারাগৃহান্তরে কোন বন্ধুর সহিত আমরা কেহ কথা কহিয়াছি বা কাহারও নিকট পত্রাদি লিখিয়াছি, অথবা স্থানান্তর হইতে অর্থ বা আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, যদি কাহারও উপর এরূপ সন্দেহ হইত, তাহা হইলেই তাহাকে অতিশয় ঘৃণার্হ, লজ্জাস্কর পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হইত। এই সময়ে তাহারা আমাদিগকে এক এক [illegible]ন করিয়া কারাগৃহের অদূরে একটি স্থানে লইয়া যাইত এবং দুর্গের একজন প্রধান কর্ম্মচারী আমাদিগের পরিচ্ছদাদি অনুসন্ধান করিত। আমাদিগের মধ্যে অনেক হতভাগ্য ভ্রাতাগণ কেহ বা তরবারি দ্বারা, কেহ বা বিষ প্রয়োগে নিহত হইবার জন্য কারাগার হইতে কারাগারান্তরে প্রেরিত হইত। তাই উক্ত লজ্জাস্কর পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের সময়, যখনই আমরা পরস্পর পরস্পর হইতে অধিক সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হইতাম, তখনই ভয় হইত, বুঝি তরবারির আঘাতে বা বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবার জন্যই আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিতেছে! যে সকল অত্যাচারিগণ আমাদিগের রক্ষী ছিল, তাহারা আমাদের ভীতির কারণ বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সেই জন্যই এমন ভাবে কাজ করিত যে, তাহাতে আমরা আরও শঙ্কিত হইতাম।"

"সমরক্ষেত্রে তাহাদিগের সৈন্যগণ যখন সামান্য একটুও সুবিধা লাভ করিলে, সেই ঘটনা সহস্র পল্লবে পল্লবিত হইয়া আমাদিগের নিকট পৌঁছছিত; আমরা শুনিতাম যে তাহারা একটি ভীষণ যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছে। শুধু ইহাই নহে,—কারাগারের চতুর্দ্দিকে স্থাপিত কামানগুলির মুহুর্মুহু গুরু গভীর গর্জ্জনে সেই সমর-বিজয়-সংবাদ আমাদিগের কর্ণে বিঘোষিত হইত। সেই সকল কামানের প্রত্যেক অগ্নিশিখা, প্রতি গর্জ্জন আমাদের হৃদয় মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিত; হায়! তখন আমাদের মনে হইত, যেন কোন প্রিয়তম বন্ধু বা আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইতেছে।"

"আমরা শুনিয়াছি বন্দীকৃত আমাদিগের অনেক স্বদেশীয়ের উপর তাহারা কত বল প্রয়োগ করিয়াছে এবং সেই সময় মনে করিয়াছে, যদি একবার আমরা মহম্মদীয় ধর্ম্মের অমোচনীয় চিহ্ন * ধারণ করি তাহা হইলেই যীশুর ধর্ম্ম ত্যাগ করিব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের পার্থিব নরপতির পক্ষও পরিত্যাগ করিব; কারাগৃহে থাকিতে থাকিতেই আমরা এ কথা শুনিয়াছি এবং অন্য স্থান হইতেও সংবাদ পাইয়াছি যে, ইহা প্রকৃত সত্য। যখনই একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আসিয়া কারাগার পরিদর্শন করিত এবং আমাদিগের উপর তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, তখনই মনে হইত বুঝি সেই ঘৃণিত কৌশলে বাধ্য করাইবার জন্যই তাহারা আসিয়াছে।"

"এমনি নানারূপ মনোকষ্টে জীবনের প্রায় চারিটি বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময় মধ্যে আমরা যে শারীরিক কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা মানসিক কষ্ট অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।"

"ভূমিতে সামান্য পরিমাণে খড় বিছাইয়া আমরা শয্যা রচনা করিতাম—যে হীন পরিধেয় দিবসে নগ্নাবস্থার লজ্জা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিত—রাত্রিতে তাহাই আমাদিগের গাত্রাবরণ ছিল। অতিশয় অপরিচ্ছন্ন ভগ্ন মৃৎপাত্রপূর্ণ ধানাগারের জঞ্জাল ও আবর্জ্জনাই আমাদিগের আহার্য্যস্বরূপ প্রদত্ত হইত। ক্রমে আমাদিগের ক্ষত মধ্যে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক রাশি রাশি কীট জন্মিতে লাগিল এবং আমাদিগের চতুর্দ্দিক এইরূপ পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিল যে, কারারক্ষিগণও আর শেষে তাহা সহ্য করিতে পারিত না।"

এইখানেই মহাত্মা মেল্‌ভিলের পত্র সমাপ্ত হইয়াছে। বারান্তরে হায়দার-চরিত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* Haider Ali—Bowring; foot note p. 109.

বৈদিকযুগে আর্য্য-সভ্যতা।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন পিতামহেরা বড় সরল ও সুন্দর জ্ঞানাপোষণ করিতেন। কোনও প্রাচীন আর্য্যজাতির ইতিহাসে এ প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয় না। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা ঋগ্বেদ হইতে কয়েকস্থান উদ্ধৃত করিলাম।

"সেই বলই বা কি, সেই বৃক্ষই বা কি, যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই দ্যুলোক ও ভূলোক নির্ম্মিত হইয়াছে? পুরাতন দিবা ও ঊষা জীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ইহারা কেমন পরস্পর সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কখনও একবারে পুরাতন ও জীর্ণ হয় না।" [৭-৭-১০-৩১-৭]

"দেবোৎপত্তির আগে অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক্ সকল জন্মগ্রহণ করিল। উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবী জন্মিল। পৃথিবী হইতে দিক্ সকল, অদিতি হইতে দক্ষ ও দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিল।......তাঁহাদের পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন। [৮-৩-১০-৭২—৩ হইতে ৫]

"সৃষ্টিকালে তাঁহার আশ্রয়স্থল কি ছিল? কোন স্থান হইতে তিনি সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন, সেই বিশ্বকর্ম্মা কোন স্থান হইতে পৃথিবী নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করিয়া দিলেন।

[৮-৩-১০-৮১-২]

"সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপে সৃষ্টি করিয়া কালে কালে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দিব্য পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূর হইয়া উঠিল, তখন মর্ত্ত্য ও স্বর্গ পৃথক্ হইল। *

[৮-৩০-১০-৮২-১]

"যিনি বিধাতা যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, তিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন।" [৮-৩-১০-৮২-৩]

ঋগ্বেদের বহুতর স্থানে বহুতর দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হইলেও, আমাদের পিতামহেরা যে এক পরম পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে আস্থাবান ছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ উপরোক্ত শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ আরও অনেক স্থান উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না। তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানাপ্রকার কল্পনা করে। তাহারা শনির তৃপ্তির জন্য নানাপ্রকার স্তবস্তুতি করিয়া বিচরণ করে।

[৮-৩-১০-৮২-৭]

সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান যে কিরূপ সুবন্দোবস্ত ও সরল ছিল, তাহা উপরোক্তভাবে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তাঁহারা সেই বাধ্যতার শৈশবযুগে সামান্য কুটিরে উপবিষ্ট হইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আজ প্রায় চারি সহস্র বৎসর পরে জ্ঞান ও সভ্যতাদর্পী মানব সভ্যতার চরম শিখরে অধিরূঢ় হইয়া তাহা হইতে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন নাই; 'ঈশ্বর কি', 'পরলোক কোথায়', 'সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি' প্রভৃতি তত্ত্বে আমরা সেই প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে এক পাও অগ্রসর হই নাই।

"ভুরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহারা গর্ভাধানপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল। তাহা হইতে দেবতাদিগের প্রমাণ স্বরূপ যিনি, তিনি উৎপন্ন হইলেন।"

[৮-৭-১০-১২১-৭]

"তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রিদিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত ও জলময় ছিল। কেই বা প্রকৃতি জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? নানা সৃষ্টির পর দেবতারা কোথা হইতে জন্মিল।

[৮-৭-১০-১২৯—১ হইতে ৬]

আর্য্যগণের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ঋগ্বেদের যে কয়েক স্থান উদ্ধৃত হইল, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই যথেষ্ট। সৃষ্টিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা সেই প্রাচীনতমযুগেও যে অতি সুন্দর ও সমীচীন মত পোষণ করিতেন, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। অধিকন্তু ঐ সকল উদ্ধৃত ঋক্ হইতে তাঁহাদের একেশ্বরবাদীত্বেরও স্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে হয়ত এই স্থানে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তাহা হইলে ঐ সকল শ্লোকে তাঁহারা বহুতর দেবতার উল্লেখ কেন করিয়াছেন?

তাঁহারা একমাত্র পরমাত্মার অস্তিত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এরূপ উচ্চ ও মহান্ বলিয়া মনে করিতেন যে তাঁহার কৃপালাভের সঙ্গত কোনও উপায় তাঁহারা স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিতেন, পরমাত্মা যখন ঐ রূপ মহান্, তখন তাঁহার উপাসনা প্রণালীও সেই [illegible] হইবে। ঐ প্রণালী অবগত হইবার জন্য তাঁহারা

* ঋগ্বেদের সময় নীল আকাশে জলীয় বলিয়া যে অনুমান করা হইত, তাহার উল্লেখ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এই জন্যই পৃথিবী ও স্বর্গের প্রথম কারণ জল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

নানাপ্রকার স্তবস্তুতির অবতারণা করিতেন। এদিকে অগ্নি, বায়ু, নদী, মেঘ, সিন্ধু ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ক্ষমতা দর্শনে ও তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে একান্ত অক্ষম হইয়া, তাহাদিগকে অজ্ঞাতক্ষমতাশালী দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। এবং তজ্জন্য তাহাদিগকেও বহুবিধ স্তবস্তুতি দ্বারা উপাসনা করিতেন। ভাবিতেন, দুজ্ঞেয় পরমাত্মার উপাসনা পথে ঐ সকল প্রত্যক্ষ দেবতা যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিবেন। তাঁহারা ঐ সমস্ত দেবতাকে বড় অধিক ক্ষমতাশালী মনে করিতেন না, তাহার বহুতর প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দুসমাজে ঐ দেবতা যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে যেরূপ অধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে, বৈদিকযুগে তাহার নিদর্শন আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পরিবর্ত্তন কিরূপে সংসাধিত হইল, তাহার বিবরণ যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

প্রাচীনতম আর্য্যেরা সর্ব্বপ্রথম দৃষদ্বতীতীরে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, [৬-৫-১৭-৮-১০] ঐ স্থান সমুদ্রতীর হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এই জন্য

সমুদ্র জ্ঞান।

ঋগ্বেদের প্রথম অংশে আমরা সমুদ্রের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাই না। ইহা যে বিশেষ বিস্ময়ের কথা নহে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রথমতঃ ঐ সময়ে ভারতে তাঁহারা নিতান্ত নবাগত। এই স্থানের কোথায় কি আছে, তাহা তাঁহারা একবারে জ্ঞাত ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যায় তাঁহারা নিতান্ত অল্প থাকাতে, সর্ব্বদা ভারতের আদিমঅধিবাসিগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা উৎপীড়িত হইতেন। এবং তজ্জন্য উপনিবেশ স্থান হইতে কোনও দূরতর স্থানে যাইবার অবকাশ পাইতেন না ও সাহস করিতেন না। কিন্তু ঋগ্বেদের শেষাংশে আমরা অনেক স্থানে সমুদ্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ সময়ে আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে কোনও প্রকার ভীষণ যুদ্ধাদির বিবরণও পাঠ করিতে পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, আর্য্যেরা যখন অনার্য্যগণকে বশীভূত করিলেন, তখন তাঁহারা ভারতের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে সচেষ্ট হইলেন। এই ভ্রমণের পরিণামে ক্রমশঃ তাঁহারা পঞ্চনদ প্রদেশের ও উত্তর ভারতের অনেক অজ্ঞাত স্থান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন পরিশেষে সিন্ধুনদীর সাহায্যে আরব সাগরের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। [৩-৫-১০-৪৭-৯]

সমুদ্রের কূলে আসিয়া তাঁহারা যখন উহার বিশাল ও বিপুল দেহ দর্শন করিলেন, তখন যে তাহাকে সহজেই অসীম ও অনন্ত বলিয়া জ্ঞান করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি! তাঁহারা অনেক স্থানে পৃথিবীকে অনন্ত চতুঃসমুদ্র পরিবেষ্টিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [৮-১-১০-৪৭-২ এবং ৭-২-৩-২৫-৪] ইহাতে যাহারা মনে করেন যে, প্রাচীন আর্য্যেরা ঐ সময় চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা পৃথিবীর চতুঃসীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মোক্ষমূলর সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে বৈদিক আর্য্যগণের ভূগোলজ্ঞান সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ আমরা যথাস্থানে করিয়াছি। * তবে তাঁহারা পৃথিবী সমুদ্র বেষ্টিত কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; ইহার উত্তর পণ্ডিত প্রবর মোক্ষমূলর যে প্রকার দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিলাম।

"ঐ প্রাচীন সময়ে আর্য্যেরা এক সিন্ধুদেশ ও আরব সমুদ্র ভিন্ন ভারতের অপর কোন সীমান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে তাঁহারা অন্যান্য প্রান্ত সীমায় উপনীত হইবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে ভারতের চতুর্দ্দিকে যে প্রকার নিবিড় দুর্ভেদ্য কাননপূর্ণ ও অসভ্য হিংস্র আদিম অধিবাসী সমাকীর্ণ ছিল তাহাতে তাঁহাদের সেই চেষ্টা নিতান্ত বিফল হইয়াছিল। দক্ষিণ দিকে বিশালকায়া সিন্ধু ছিল বলিয়া, তাঁহারা তরণী সাহায্যে ঐ কানন ও অনার্য্যরূপ বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

* প্রদীপ আষাঢ়—বৈদিকযুগ আর্য্যভূমি।

সপত্নী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সিমলা ষ্ট্রীটে একটি নাতিবৃহৎভবনে প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বসু, এম্, বি, মহাশয়ের বাসস্থান। নরেশ বাবু চারিদিন কলিকাতায় আসিয়াছেন, সুরেশ বাবুর আলয়েই তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছে। অর্থাগমের কোন উপায় তাঁহার নাই; এতদিন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। ইচ্ছা থাকিলেও তিনি তাহা করিতে পারিতেন না, এখন অর্থের ভয়ানক আবশ্যকতা হইয়াছে; কিন্তু সম্প্রতি তিনি মানসিক ক্লেশে এতই কাতর যে, কোন রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার সাধ্য বা প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং সম্প্রতি পরম সুহৃদ্ সুরেশের আলয়ে অবস্থান ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর নাই। সুরেশ সুহৃদকে পরমযত্নে রাখিয়াছেন এবং একটি নির্দ্ধারিত কক্ষ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহারই কার্য্যের জন্য একটি ভৃত্য নিয়োজিত হইয়াছে।

প্রাতঃকাল, বেলা সাড়ে সাতটা হইবে। নরেশ অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, নিকটে আর কোন লোক নাই। ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, দেহের বর্ণ পাণ্ডু, বদনের ভাব চিন্তাক্লিষ্ট, তাঁহাকে যাহারা পূর্ব্বে দেখিয়াছে, এখন দেখিলে তাহারা মনে করিবে যে নিশ্চয়ই তিনি কোন দুরন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; বাস্তবিকই তাঁহার ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য ও অপ্রতিবিধেয়। এ সংসারে চিন্তার অপেক্ষা ক্ষয়কারী রোগ আর কি আছে? গুরুতর চিন্তাজ্বরে যুবা বৃদ্ধ হইয়াছে, ভ্রষ্টবুদ্ধিও উন্মাদ হইয়াছে, কখন বা অকালে কালকবলে প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নরেশের অদৃষ্টাকাশে যে সকল দুর্দ্দৈব-ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা জানি, সুতরাং তাঁহার বিপদের পরিমাণ আমরা অনুভব করিতে পারি।

শ্বশুরালয় হইতে পলায়ন করিয়া পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিবার অভিপ্রায়ে, প্রথমেই নরেশ বাটী গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার দুর্দ্দান্ত শ্বশুর তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠাইবেন, দেখিতে পাইলে তাঁহাকে নরহত্যাকারী অপরাধীর ন্যায় ধরিয়া লইয়া যাইবেন এবং অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা রাখিবেন না। ইহাও তিনি জানিতেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তাঁহার পিতা মাতার উপর অশেষ নির্য্যাতন হইবে, তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে চুঁচুড়ায় এক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কুটম্বের বাটীতে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বয়ং উত্তর-পাড়ায় আসিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি দীনা শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর নিকট যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল।

কুমুদিনীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে নরেশের কখনই পরিচয় হয় নাই। কুমুদিনীর রূপেও কোন মাদকতা-শক্তি ছিল না, তথাপি নরেশ জানিতেন কুমুদিনীর ন্যায় নারী এ জগতে বড়ই দুর্লভ। ঘটনার দাস হইয়া তাঁহাকে ধন-শালিনী স্ত্রীর একটা আসবাব—তাঁহার টিয়াপাখী, ময়না, কেনারী ও কুকুরের ভাবে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা তাঁহার মনে ছিল যে, যদি কখন ঈশ্বর তাঁহাকে দিন দেন, তাহা হইলে এরূপে স্ত্রীর একটা জিনিষ হইয়া তিনি কখনই থাকিবেন না। তাহা হইলে যে নারী তাঁহার নাম শুনিলে পুলকিত হয়, নিরন্তর তাঁহাকে ধ্যান করে, অন্তরে ও বাহিরে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা জ্ঞানে পূজা করে,—তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে অনবরত তাঁহার চরণাশ্রিতা দাসী জ্ঞানে কালাতিপাত করে; তাঁহার সেই দুঃখিনী সহ-ধর্ম্মিনী কুমুদিনীকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া পরম সুখের অধিকারী হইবেন। সেই কুমুদিনীর এই বিপদবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইল। বুঝিলেন, লবঙ্গ তাঁহাকে খুন করিতে পারে, অথবা বলে ও কৌশলে অধ-র্ম্মের পথে ফেলিয়া মরণের অপেক্ষাও দুর্দ্দশা ঘটাইতে পারে। বৃদ্ধা-শ্বশ্রু ঠাকুরাণীকে তিনি সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন না; প্রবোধে দুই একটা বাক্য বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নরেশ বুঝিলেন, এই জন্যই হেমলতা বলিয়াছিলেন, কুমুদিনী কলিকাতায় বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ঘটনা শুনিয়া বুঝা যাইতেছে, লবঙ্গ তাঁহাকে কলিকাতার ঐ দিকেই লইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশাল-সমুদ্র বিশেষ, [illegible]খানে কেবল নামমাত্র উপলক্ষ করিয়া একটা স্ত্রীলো-

কের অনুসন্ধান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। লবঙ্গ সকলই জানে, কেবল সেই-ই সকল কথা বলিতে পারে।

তাহাকে উৎপীড়ন করিলে এবং বিপদে ফেলিলে কথা বাহির করা না যায়, এমন নহে। কিন্তু সে ত এখন হরিপুরে! সেখানে যাইলে কুমুদিনীর উদ্ধার দূরে থাকুক, নরেশকে ঘোরতর বিপদে পড়িতে হইবে। তবে কি সন্ধানের আর উপায় নাই?

নরেশ সংকল্প করিলেন, যেমন করিয়া হউক কুমুদিনীর সন্ধান করিবই করিব। কলিকাতার মিউনিসিপালিটী প্রত্যেক বাটীর টেক্স আদায় করে, আমিও নিয়ম করিয়া সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাটীতে অন্বেষণ করিব। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী ফিরিব, রাত্রি ১০টার পর সুরেশের বাসায় গিয়া মুখে জল দিব, এইরূপে যতদিনে হউক, নিশ্চয়ই সন্ধান হইবে। প্রথমে ঘাটে ঘাটে প্রত্যেক নৌকার মাঝিদিগের নিকট সন্ধান করিব। পিশাচী লবঙ্গ, নৌকাযোগেই তাহাকে লইয়া গিয়াছে, এ সকল সন্ধানে যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে শেষে লবঙ্গকে ধরিব। সকল দিক ঠিক সাজাইয়া লবঙ্গকে আদালতে হাজির করিব কি না, তাহার ভাবনা পরে ভাবিব।

নরেশ বাবু প্রথমে নৌকার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, অনন্যকর্ম্ম হইয়া ঘাটে ঘাটে তিনি ফিরিতে লাগিলেন; বড়দিনের পর মধ্যে একদিন বাদে সন্ধ্যার একটু পরে কুমুদিনীকে লইয়া লবঙ্গ নৌকাযোগে কলিকাতা আসিয়াছিল। ১৩ই পৌষ যে কুমুদিনী চলিয়া আসিয়াছিল, ইহা তাহার জননীর বাক্যে নরেশচন্দ্র সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৩ই পৌষ কোন নৌকা দুইটি স্ত্রী-লোককে লইয়া কলিকাতা আসিয়াছিল, ইহাই তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চিৎপুরের ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া বাবুঘাট পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন,—কোন মাঝি স্বীকার করিল না। কিন্তু হাটখোলার ঘাটের এক নৌকাওয়ালা সন্ধান দিল, জগন্নাথের ঘাটে রাত্রি প্রায় ৮টার সময় উত্তর দিক হইতে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিয়াছিল। সেই নৌকা হইতে দুইটি স্ত্রীলোক নামিয়াছিলেন, ইহা সে দেখিয়াছিল, সঙ্গে জিনিষ পত্র কিছু ছিল না। একটি স্ত্রীলোক মোটা কাপড় মুড়ি দিয়া অপর স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া নামিয়া ছিলেন। উপরে একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ি ও একজন লোক দাঁড়াইয়াছিল, যে স্ত্রীলোক হাত ধরিয়া সঙ্গিনীকে নামাইয়া ছিল, তাহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, সে বিধবা, বড়দিনের পর এক দিন বাদ দিয়া যে তাহারা আসিয়াছিল ইহাও মাঝি ঠিক বলিতে পারিল। ১৩ই পৌষ মনে থাকিবার তাহার অনেক কারণ ছিল, কিন্তু ইহার বেশী এক বর্ণও সে বলিতে পারিল না। যে নৌকা তাহাদিগকে লইয়া আসিয়াছিল, তাহার মাঝিরা অপরিচিত। এ ব্যক্তি অনুমান করে নৌকাখানা হুগলি বা ফরাসডাঙ্গার হইতে পারে, সোয়ারি নামাইয়া দিয়া নৌকা পুলের দিকে গিয়াছিল, ইহাও সে দেখিয়াছে। কথাগুলি এবং মাঝির নাম ও ঠিকানা নরেশ বাবু সযত্নে লিখিয়া রাখিলেন।

নৌকার সন্ধান শেষ হইবার সময়ে রত্নেশ্বর বাবুর এক দ্বারবানের সহিত নরেশ বাবুর সাক্ষাৎ হইল। তাহার মুখে তিনি জানিতে পারিলেন যে, রত্নেশ্বর বাবু সেই দিন স্বপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন; এবং লবঙ্গও সঙ্গে আছে। দ্বারবান জামাই বাবুকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিল, নরেশচন্দ্র অনেক কাজের ওজরে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। বলা বাহুল্য বাসায় ফিরিয়া দ্বারবান জামাই বাবুর সংবাদ প্রচার করিল।

রত্নেশ্বর বাবু যেরূপ ধনবান ও দুর্দ্ধর্ষ লোক হউন না কেন, কলিকাতায় যে তিনি বিশেষ অত্যাচার করিতে পারিবেন না, ইহা নরেশ বাবু ঠিক বুঝিলেন; সুতরাং তাঁহার ভয়ে পলাইবার বা লুকাইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে একটু সাবধানে চলা ফেরা করিতে হইবে। তিনি বিবেচনা করিলেন, লবঙ্গ কলিকাতায় আসায় ভালই হইয়াছে, যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহাকে পাওয়া যাইবে,—কলিকাতায় থাকিলেই সে হাতের মধ্যে থাকিল।

গত কল্য হইতে নরেশ বাবু নৌকার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে তিন চারি বার বাটীর বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু অবিলম্বে ফিরিয়া ছিলেন; অন্য দিনের ন্যায় এককালে অন্তর্দ্ধান হন নাই, সমস্ত দিন কোন রূপ আহারাদি করেন নাই, পরম মিত্র সুরেশ বাবুর সহিত

দেখা করেন নাই, প্রায় অনেক সময় দ্বাররুদ্ধ করিয়া কাল কাটাইয়াছেন।

প্রাতে নরেশ বাবু যখন নিতান্ত বিমর্ষভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন, তখন কার্ত্তিক তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এ কি? আপনাকে আজ বড় কাতর দেখিতেছি কেন?"

নরেশ বলিলেন,—"শরীর ভাল নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"পরশু রাত্রে আপনার সহিত আমার প্রথম আলাপ হইয়াছে। তখনও আপনাকে অতিশয় চিন্তিত এবং অন্যমনস্ক দেখিয়াছি, আজ কিন্তু গুরুতর ভাবান্তর দেখিতেছি, ইহার মধ্যে অবশ্যই বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়াছে। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিলে বোধ হয় ভাল হইত।"

নরেশ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ভাবনা চিন্তার শেষ হইয়াছে। কি আর বলিব!"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আপনার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও আমি এতদিন আপনার অপরিচিত ছিলাম, এজন্য আমাকে আপনার বিশ্বাস না হইতে পারে, আর আমার খুড়া মহাশয় এবং ভগ্নী আপনার সহিত নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, আমাকে সেই পক্ষের লোক জানিয়া সহজেই আপনার অবিশ্বাস হইতে পারে। কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি, তাঁহাদের সহিত আমার মনের মিল নাই, তাহা থাকিলে বাল্যকাল হইতেই বাড়ী ছাড়িতাম না। আপনার সহিত আলাপ করিয়া, আপনার কাতরভাব দেখিয়া এবং আপনার অন্তরে অতিশয় ক্লেশ আছে বুঝিয়া, আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত সহানুভূতি হইয়াছে। আমি সামান্যলোক হইলেও চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই আপনার কিছু না কিছু উপকার করিতে পারি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।"

নরেশ হতাশভাবে বলিলেন,—"কি আর বিশ্বাস করিব! আপনার ভগ্নীর সহিত আমার মনান্তরের সংবাদ আপনার অবিদিত নাই। নূতন করিয়া সে কথা আর কি বলিব, তাঁহার সহিত সদ্ভাবের আর কোন আশা নাই, তাঁহার সংবাদ জানিতেও আর আকাঙ্ক্ষা নাই।"

আমার ভগ্নীর সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পরে স্থির করা যাইবে। কিছু করিতে পারিব বলিয়াই আমি বিষয়ে মাথা দিয়াছি, কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমি বুঝিতে পারিতেছি আমার ভগ্নিঘটিত মনান্তরের জন্য আপনি এত কাতর নহেন; নিশ্চয়ই ভিতরে আরও কোন কথা আছে!

নরেশ বলিলেন,—"আর কি কথা। যদিই আর কোন কথা থাকে, তাহার সহিত আপনাদের কোন সম্বন্ধ নাই।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"কেন সম্বন্ধ নাই? আপনার প্রথমা স্ত্রীকে ভগ্নী বলিয়া আমি জ্ঞান করিতে বাধ্য, তাঁহার হিতাহিতের সহিত অবশ্য আমার সম্বন্ধ আছে।"

নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাগ্রহে বলিলেন,—তাহার কথা আপনি কি করিয়া জানিলেন, কি জানেন। বলুন?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমি জানি, লবঙ্গ তাঁহাকে স্বামীর কাছে লইয়া যাইতেছি বলিয়া কলিকাতায় আনে, এখানে পেঁচো অথবা পাঁচকড়ি দত্ত নামে একটা সামান্য লোকের সহায়তায় লবঙ্গ আপনার স্ত্রীকে মাথাঘসা গলির মধ্যে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে রাখে। রাত্রি ১০টার পর লবঙ্গ হরিপুর চলিয়া যায়, পরদিন প্রাতে আপনার স্ত্রী অথবা পেঁচো কাহাকেও সে বাটীতে পাওয়া যায় নাই, এ পর্য্যন্ত কাহারও সন্ধান হয় নাই। পেঁচোর সন্ধান হইলেই অন্য সন্ধান হইবে ভাবিয়া আমি তাহার পিছনে লোক লাগাইয়াছি; বোধ হয়, সত্বরেই পেঁচো ধরা পড়িবে।"

নরেশ হতাশভাবে পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"দেখিতেছি যেরূপেই হো'ক আপনি অনেক সংবাদ জানিতে পারিয়াছেন, আপনি মহাশয় ব্যক্তি, এ সম্বন্ধে আর অনর্থক কষ্ট স্বীকার করিবেন না; সকল সন্ধানের শেষ হইয়াছে, কল্য আমার সে স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।"

কার্ত্তিক চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"কে বলিল! কিরূপে জানিলেন, কোথায় মৃত্যু হইল, কিসে মৃত্যু হইল?

নরেশ বিছানার নিম্নদেশ হইতে একখানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—"এই কাগজে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। জোড়াবাগান থানার এলাকায় পুলিশ পথের উপর রক্ত-মাখা মরণাপন্ন এক নারীর দেহ পতিত দেখিতে পায় এবং তখনি তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহার মরণকালীন উক্তি লিখিয়া লইতে আইসেন; অতি কষ্টে রমণী বলিতে পারিয়াছিলেন; তাহার নাম কুমুদিনী—তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা; এই অভাগিনী আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই নহে। হা ভগবান্।"

নরেশ হাতের কাগজ ফেলিয়া দিলেন এবং অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। কার্ত্তিক পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"বুঝিতেছি আপনার স্ত্রীর নাম কুমুদিনী। কিন্তু কুমুদিনী একটা সাধারণ নাম, এই নামের মিল দেখিয়া তিনিই যে আপনার স্ত্রী এরূপ মীমাংসা করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।"

নরেশ বলিলেন,—"যে অভাগিনীর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, সে ভিন্ন এ আর কে হইবে। কেবল নামের মিল ছাড়া আরও কথা আছে; জাতিও মিলিয়াছে। কাগজে লিখিতেছে, মৃতা নারীর চেহারা ভাল এবং সে যুবতী, এই সকল কথা ধরিয়া এবং আমার স্ত্রীর উপর প্রবল লোকের যেরূপ হিংসা বিদ্বেষ আছে, তাহা স্মরণ করিয়া মৃতা যে আমার স্ত্রী; তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—বুঝিতেছি, আপনার মনে এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। আপনি এখন অতিশয় কাতর হইয়াছেন। এ সময়ে অধিক কথা কহিয়া আপনাকে বিরক্ত করা অনুচিত। আরও দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল, এখন থাক সময়ান্তরে হইবে।"

নরেশ বলিলেন,—"আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কথার উত্তর দিতে পারিব না এমন নহে, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন করুন।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন, ডাক্তারের রিপোর্ট শুনিয়াছেন?

নরেশ বলিলেন,—"হাঁ। আমি স্বয়ং তাহা পড়িয়া আসিয়াছি। ডাক্তার বলিয়াছেন, তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাতে যুবতীর মৃত্যু হইয়াছে। পশ্চাৎ দিক হইতে ছুরি মারিয়াছে; একটা ভিন্ন আঘাতের চিহ্ন নাই, সেই আঘাতেই রক্তক্ষয় হইয়া এই নারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—পুলিশ কি বলিতেছে?"

নরেশ বলিলেন,—"পুলিশেও আমি বার বার গিয়াছি এবং ইন্‌স্পেক্টারের সহিতও দেখা করিয়াছি, তাহারা বলে এ নারীকে কেহই সেনাক্ত করে নাই, অনেক বেশ্যা একত্র করা হইয়াছিল, তাহারাও চিনিতে পারে নাই, এ জন্য বোধ হয়, এই স্ত্রীলোক অন্য স্থান হইতে আসিয়া ছিল; বেওয়ারিস লাসরূপে তাহার দাহ হইয়াছে।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন, পুলিশ হত্যাকারীর কোন সন্ধান করিতেছে?

নরেশ বলিলেন,—"চেষ্টা যথেষ্ট করিতেছে, ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে কিছু কিছু কথা বলিতে হইয়াছে। লবঙ্গের সহিত আমার স্ত্রীর আগমন, পরে আমার স্ত্রীর নিরুদ্দেশ ইত্যাদি কথা তাহারা লিখিয়া লইয়াছে; আমার স্ত্রীর নাম, বয়স ইত্যাদি অনেক সংবাদ তাহারা জানিতে পারিয়াছে।"

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—মৃতা স্ত্রীর কাপড় অলঙ্কারাদি কি হইল?

নরেশ বলিলেন,—কোন মূল্যবান অলঙ্কার গায়ে ছিল না। হাতে শাঁখা ও লোহা ছিল, একটা রিঙে দুইটা চাবি ছিল, পরিধান বস্ত্র ও এই কয়সামগ্রী পুলিশ সযত্নে রক্ষা করিয়াছে।'

কার্ত্তিক বলিলেন,—"কথা সকলি শুনিলাম, কিন্তু কি জানি কেমন মনে হইতেছে, যিনি মারা গিয়াছেন তিনি আপনার স্ত্রী নহেন। হত্যাকারী স্থির করিতে পারুক না পারুক অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ জানিতে পারিবে যে, মৃতা স্ত্রীলোক ও আপনার স্ত্রী একই ব্যক্তি কি না?

আমার মনে হয়, এ খুনের সহিত আপনার স্ত্রীর নিরুদ্দেশের কোন সম্পর্ক নাই, আমি বিধিমত যত্নে এই তদন্তে ফিরিব, আমার যে বন্ধু অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাকে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগাইব, পুলিশেও আমি যাইব, সে কেবল এই খুনের তাহারা কোন কিনারা করিতে পারিতেছে কি না ইহাই জানিবার জন্য। এক্ষণে বিদায় হই, আপনি হতাশ হইবেন না, অতি ত্বরায় আমি শুভ সংবাদ আনিতে পারিব।"

নরেশ বলিলেন,—আপনি অতি উদার লোক। আপ-

নার সহিত পূর্ব্বে পরিচয় থাকিলে এবং আপনি আত্মীয়গণের সহিত সংশ্রব রাখিলে বোধ হয়, আমার এত নিগ্রহ হইত না, সে যাহা হউক, কেবল পরোপকারের নিমিত্ত আপনি অনেক আয়াস স্বীকার করিতেছেন; সে জন্য আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। কিন্তু আমার অনুরোধ, এ বিষয়ে আপনি বা আপনার বন্ধু অকারণ আর যেন ক্লেশ না করেন।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সে কথার বিচার এখন থাকুক, আপনি একাকী সারাদিন এই ঘরে বসিয়া বৃথা চিন্তা করিয়া শরীর নষ্ট করিবেন না। এখান হইতে বাহির হইয়া একটু এদিক ওদিক ঘুরিলে ফিরিলে ভাল হয়।"

নরেশ বলিলেন,—"আপনি আমার বড় হিতৈষী বন্ধু, পারি যদি আপনার বাসায় বেড়াইতে যাইব; চোরবাগানে বাসা শুনিয়াছি।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"ঠিক শুনিয়াছেন, কিন্তু আপনারা সভ্য-ভব্য শিক্ষিত লোক, আর আমি অসভ্য-অভব্য মূর্খ জীব, আমার মত লোকের যাহা হওয়া উচিত, আমি তাহাই হইয়াছি। কখন বিবাহ করিয়া ভদ্রলোকের মেয়েকে কাঁদাইয়া মারি নাই, সময় অসময়ে একটু আধটু মদও মুখে দিই আর একটা স্ত্রী লোক লইয়া বাস করি, লোকের বিচারে সে বেশ্যা, কিন্তু আমি জানি আমার জন্ম জন্মান্তরের বহু তপস্যা ছিল বলিয়া, তাহার সহিত আমার মিলন হইয়াছে। এরূপ স্থলে আমার বাসায় যাইলে, হয়ত, আপনার জাতি যাইতে পারে, যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সেখানে কখন যাইবেন না, আমি বার বার মহাশয়ের নিকট আসিব, তাহা ছাড়া দরকার পড়িলে আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন।

কার্ত্তিক প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা ১টা। চোরবাগানে কার্ত্তিক বাবুর বাসায় মাণিকলাল আসিয়া জুটিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, অদ্য বেল[illegible] ৩টার ট্রেণে তিনি কোন্নগর যাইবেন। কোন্নগরে[illegible] পেঁচোর বাস। কিরণ পরামর্শ দিয়াছে যে, লবঙ্গ মাথাঘসা গলিতে কুমুদিনীর আগমনের পর আর কোন কথাই জানেন না, তখন তাহাকে লইয়া টানাটানি করিলে কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে, এরূপ বোধ হয় না। পেঁচো শেষ পর্য্যন্ত সেখানে ছিল, তাহার হাতে কুমুদিনীকে সমর্পণ করিয়া লবঙ্গ চলিয়া গিয়াছিল, অতএব কুমুদিনীর কি হইল সে সংবাদ পেঁচোর জানাই সম্ভব। তাহাকে যখন কলিকাতায় পাওয়া যাইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই সে বাটীতে আছে। যদি বাটীতে না থাকে, তাহা হইলে তাহার বাটীর লোকেরা নিশ্চয়ই বলিতে পারিবে, সে এখন কোথায় আছে।

প্রাতে যখন কার্ত্তিক বাসায় ছিলেন না, তখন কিরণের সহিত মাণিকলালের এই সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কার্ত্তিক ১০টার সময় বাসায় ফিরিয়া স্নান আহার করিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন যে মাণিকলাল দুপুর বেলা আসিবেন। এক্ষণে মাণিকলাল আসিলে কার্ত্তিক বলিলেন,—"ঘটনা ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির কর।"

কার্ত্তিক একে একে কুমুদিনীর মৃত্যুঘটিত সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। সমস্ত শ্রবণ [illegible]র পর কিরণ বলিল, যে মারা গিয়াছে সে কুমুদিনী [illegible] লোক, তোমরা এখনি গাড়ী করিয়া পুলিশে যাও, সেখানে কত দূর কি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিবে। পুলিশ হয়ত এতক্ষণে বুঝিয়াছেন মৃতা কুমুদিনী আর একজন, তথাপি তাহারা লবঙ্গকে ধরিয়া টানাটানি করিতে ছাড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু লবঙ্গের দ্বারা এ খুনি মামলার কোন কিনারা হইবে না।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তাহা ঠিক। লবঙ্গকে লইয়া পুলিশ কিন্তু ভয়ানক ছেঁড়াছিঁড়ি করিবে। বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুস্‌লাইয়া আনা অপরাধে লবঙ্গকে মামলায় পড়িতে হইবে। এ মামলায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে মহাশয়কেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"এ কথা আমারও বার বার মনে হইতেছে। বিশেষ কুমুদিনী মারা গিয়াছেন শুনিয়া আমারও হৃৎকম্প হইতেছে। মৃতা কুমুদিনী দে নরেশ বাবুর স্ত্রী নহেন, এরূপ বিবেচনা করিবার আপাততঃ

কোন কারণ নাই। বরং সমস্ত অবস্থা বিচার করিলে মৃতাকেই নরেশ বাবুর পত্নী বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহাকে যে ষড়যন্ত্রে লবঙ্গ আনিয়াছিল, আমিও সম্পূর্ণ না হই, কতকটা সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মোকর্দ্দমায় যাহা হয় হইবে, কিন্তু আপাততঃ আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইতেছে।

কিরণ বলিল,—"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" মেয়ে মানুষের নাম শুনিলেই লাফাইয়া উঠা বড় পাপ। যে ধর্ম্ম জ্ঞান এখন হইতেছে, তাহার সিকিও যদি তখন হইত, তাহা হইলে কোন কষ্টই পাইতে হইত না।"

মাণিকলাল বলিলেন,—"বল বল যত পার বল। কিন্তু মা গঙ্গা জানেন, পুরাপুরি দোষ আমার নহে।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—এক্ষণে সে বিচার অনাবশ্যক। মোকর্দ্দমায় তোমার কিছুই হইবে না, ইহা স্থির। নরেশ বাবুর অথবা তাঁহার শাশুড়ীকে বোধ হয় এ মোকর্দ্দমা চালাইতে হইবে, কুমুদিনীকে না পাইলে মোকর্দ্দমার কোনই সুবিধা হইবে না। তাঁহাকে পুলিশের চেষ্টায় পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তোমার আমার চেষ্টাতেই পাওয়া যাইবে। পাওয়া যাউক বা না যাউক এসম্বন্ধে কোন লোক মোকর্দ্দমা চালাইবে না, ইহা আমি বেশ বলিতে পারি।"

মাণিক বলিলেন,—মোকর্দ্দমায় যাহা হয় হইবে, আপাততঃ কালবিলম্ব না করিয়া সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।"

কিরণ বলিল,—"এত দিন গিয়াছে, আজিকার দিনটাও যাউক, কালি হইতে তোমরা দুইজনে সন্ধান আরম্ভ করিও।"

কার্ত্তিককে চিন্তামগ্ন দেখিয়া মাণিকলাল বলিলেন,—"কি ভাবিতেছ ভাই! তোমার মুখে কথা বন্ধ হইলে বড় ভয় হয়।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"বড় বিষম ভাবনা ভাবিতেছি, এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে বড়ই নিন্দার কথা হইবে। আমার ভগ্নী, খুড়া সকলেরই ভয়ানক দুর্ণাম রটিবে। পারিবারিক কলঙ্কের সম্ভাবনা মনে করিয়া আমার ভাবনা হইতেছে।"

কিরণ বলিল,—"তাহার অপেক্ষাও গুরুতর কথা রহিয়াছে। যে কলঙ্কের অপেক্ষা গুরুতর কিছুই নাই তোমার ভগ্নীর নামে শীঘ্রই যে সেই কলঙ্ক রটিবে, তা[illegible] কি ভাবিতেছ? লবঙ্গ মাণিক বাবুর কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছে, সেটা কাহার কথা বলিয়া তোমার মনে হয়?"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"ভাবিলেও লজ্জায় মাথা কাটা যায়, নিশ্চয়ই তাহা হেমলতার কথা।

কিরণ বলিল,—"আমি এই জন্যই কল্য রাত্রে বলিয়াছিলাম যে, নরেশ বাবুর দুই স্ত্রীই তোমাদের এখন ভাবনার বিষয়। প্রথম স্ত্রীর সম্বন্ধে যতই গোল বাধুক, আর তোমরা যতই ভাব, আমি বিশেষ ভয়ানক ব্যাপার দেখিতেছি না। আমি জানি তিনি পরমা সতী, যে নারী সতীত্বের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছে, এ জগতে কেহই তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে না। আর বিপদের কথা বলিতেছ, আমার বিশ্বাস তাঁহার কোন বিপদই হয় নাই। তিনি আমাদিগের নিকটেই নির্ব্বিঘ্নে আছেন বলিয়া আমার মনে হয়। মাণিক বাবু একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহার সন্ধান পাইবেন, পেঁচোকে ধরিলেই সব ঠিক হইবে। তাহাকে ধরা বিশেষ কঠিন নহে। সে কখনই দেশ ছাড়িয়া পলায় নাই। এখানে কোথায় লুকাইয়া আছে। তাহার পর দ্বিতীয় কথা হেমলতা। সে কাজে না হউক, মনে পাপী হইয়াছে। মাণিক বাবুর উপর তাহার এখন ভয়ানক ঝোঁক পড়িয়াছে, যত দিন মাণিক বাবু সাবধান থাকিয়া, মুখে তাহাকে মাতাইয়া রাখিতে পারিবেন, তত দিন সে এই ঝোঁকেই মজিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি ইহাতে সে বাধা পায় বা হতাশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে অন্য পথ খুঁজিবে। পাপের পথে পা বাড়াইলে ক্রমেই তড় তড় করিয়া নামিতে হইবে। অতএব মাণিক বাবু! তাহাকে এখন ডুবিতে না দিয়া ভাসাইয়া রাখা তোমারই কাজ। অধিকক্ষণ ভাসিতে পাইলে, বাঁচিবার অনেক উপায় হইতে পারে, ডুবিলেই মৃত্যু, কিন্তু আমি ত ভ্রষ্টা, এত তত্ত্বকথা আমার মুখে শোভা পায় না।"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"তোমার দুই অনুমানই সত্য। তোমার পরামর্শমতেই আমরা কার্য্য করিব। মাণিকলাল ভাই বড় লজ্জার কথা। তথাপি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার ভগ্নীকে তুমি প্রশ্রয় দিতে ক্ষান্ত হইও না। সম্প্রতি আমার অগোচরে তুমি কুমুদিনী-ঘটিত ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়াছ সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও আমি বিশ্বাস করি, তোমার দ্বারা আমার ভগ্নীর কোন অনিষ্ট

হইবে না। তুমি টানিয়া রাখিলে সে কুপথে মজিতে পারিবে না। কুমুদিনীর বিষয়েও কিরু যাহা বলিতেছে, তাহা সম্ভব। হয় তো কুমুদিনী নানারূপ বিপদের আশ-ঙ্কায় বাধ্য হইয়া এখানেই কোথায় লুকাইয়া আছেন; আমরা কেবল পরামর্শ করিয়াই সময় কাটাইতেছি। আজ যাহা হয় হউক, কাল এই সন্ধান ছাড়া আর কোন কর্ম্মই নহে। এখন বেহারাকে থানায় যাইবার নিমিত্ত গাড়ি আনিতে পাঠাই।”

বেহারাকে ডাকিয়া গাড়ি আনিতে পাঠান হইল। বেহারা ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এমন সময় একটি অপরিচিত ভদ্রবেশধারী পুরুষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাটীতে কার্ত্তিক বাবু নামে একটি ভদ্রলোক থাকেন কি?”

প্রশ্ন কার্ত্তিক বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া বলিলেন,—“কোন ভদ্র-লোক এখানে থাকেন না। এই অধম অভদ্র চূড়ামণির ইহা বাসস্থান। আপনি দাঁড়ান, আমি এই নীচে যাইতেছি।

আগন্তুক নরেশ বাবু বলিলেন,—“আপনার কষ্ট করিয়া আসিতে হইবে না, যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমিই ভিতরে যাইতেছি।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“সে সৌভাগ্যের আশা আমি সহসা করিতে পারি না বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলাম; কৃপা করিয়া আসুন তবে।

কিরণ মাথায় কাপড় দিয়া অবনত মস্তকে একটু দূরে বসিয়া রহিল। নরেশ বাবু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ চিন্তা-কালিমায় সমাচ্ছন্ন ও কাতর।

কার্ত্তিক তাঁহাকে সাদরে বসাইয়া বলিলেন,—“এই ভদ্রলোক, বাবু মাণিকলাল দে। লবঙ্গ ইঁহারই নিকট আনিবে বলিয়া, কুমুদিনীকে ঘর হইতে আনিয়াছিল। ইনি আমার পরম বন্ধু, আর এই নারী, কি বলিয়া কি বলিব? যাহার জন্য সকল আত্মীয়ের পরিতক্ত হইয়াও আমি পরম সুখী, যাহার জন্য সংসারের কোন কষ্টই আমাকে অবসন্ন করিতে পারে নাই এবং যাহার জন্য কলঙ্ক গায়ে মাখিয়া আমি ভাগ্যবান হইয়াছি; ইনিই সেই কিরণবালা। আমরা তিনজনে এখন কেবল সেই সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতেছিলাম। আপনি সকলকে বিশ্বাস করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারেন, কোন কথা একজনকে বলিলে, তিন জনকেই বলা হইবে; সুতরাং তিনজনকেই বিশ্বাস করা আবশ্যক।

কিরণ মৃদুস্বরে অবনত মস্তকে কার্ত্তিকের দিকে ফিরিয়া বলিল,—“বাবু অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া কাতর হইয়া আসিয়াছেন, একটু জল খাবার কি সোডা, লিমনেড্, কি একটু চার কথা আগে জিজ্ঞাসা কর।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“এখানে একটা পান খাইতে বলিতেও সাহস হয় না।”

নরেশ বলিলেন,--“যদি নিতান্ত অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে দয়া করিয়া একটু চা দিলে বাধিত হইবে।”

কিরণ উঠিয়া গেল। নরেশ বলিলেন,—“পুলিশ বড় গোলে পড়িয়াছে। আমার স্ত্রী ও মৃতা কুমুদিনীকে তাহারা এক লোক দাঁড় করাইতে পারিতেছে না। চাবি কাপড় কিছুই তাহাদের সহায়তা করিতেছে না। আমার স্ত্রীর যে বাক্স পেটরা আছে, পুলিশের হস্তস্থিত চাবির দ্বারা তাহা খোলে না, কাপড়ের ধোপার দাগ বালি-উত্তরপাড়ার কোন ধোবার দাগের সহিত মিলে না, অন্যান্য ঘটনার আলোচনা করিয়াও পুলিশ ঠিক সাজাইতে পারিতেছে না, তথাপি তাহারা বিশ্বাস করিতেছে, মৃতা কুমুদিনী আমার স্ত্রী।”

কার্ত্তিক বলিলেন,--“আমি প্রাতে আপনাকে বলিয়া-ছিলাম যে, আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস আপ-নার স্ত্রী কুমুদিনী স্বচ্ছন্দ শরীরে এবং নির্ব্বিঘ্নে আছেন। যে কুমুদিনী মারা গিয়াছেন, তিনি অন্য লোক। আমরা নানাকারণে আজ তদন্তে লাগিতেছি না; কালি হইতে আমরা স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিব। আপাততঃ এখনি আমরা পুলিশে যাইব।”

নরেশ বলিলেন,—“দুইটি সংবাদ জানাইবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রথম আমাকে এখনি উত্তরপাড়া যাইতে হইবে। পুলিশ গিয়া আমার শ্বশুর বাটীতে গোল করিয়াছে, সুতরাং আমার বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকুরাণী বুঝিয়াছেন, তাঁহার কন্যা ইহলোকে নাই। এ অবস্থায় তাঁহার শোক আমি হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে নিবারণ করিতে পারিব।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“আপনার এখনি যাওয়া খুব আবশ্যক।”

চা আসিল। বেহারা চায়ের বাটী নরেশ বাবুর সম্মুখে স্থাপন করিল, কিরণ সঙ্গে সঙ্গে আসিল, কার্ত্তিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—“আমি চা ছুই নাই। প্রস্তুত করিবার সময় দূরে দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিয়াছি মাত্র। চা মাটীতে রাখা হইয়াছে।”

নরেশ বিছানার উপর চা তুলিয়া লইলেন। কিরণ বিছানা স্পর্শ করিল না, দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুই এক চুমুক চা খাইয়া নরেশ বলিলেন,—“অতি সুন্দর। তাহার পর দ্বিতীয় কথা, অদ্যই পুলিশ ওয়ারেণ্ট লইয়া লবঙ্গকে গ্রেপ্তার করিবে, এ বিষয়ের আপনি যদি কোন প্রতিবিধান করিতে চাহেন, এখনি করুন।

কার্ত্তিক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“কোন প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা করি না, সাধ্যই বা কি আছে। তবে এ মোকর্দ্দমায় লবঙ্গর দ্বারায় কোনই উপকার হইবে না। আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনা তারপর মাথাঘসার গলির ভাঙ্গা বাটীতে রাখা পর্য্যন্ত সে জানে, পরের ঘটনা আর সে কিছুই জানে না। ইহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি। তাহাকে লইয়া টানা-টানি করিলে অনেক পারিবারিক কথা বাহির হইয়া পড়িবে, কিন্তু উপায় কি? এ মোকর্দ্দমায় সে কোন কাজে না লাগিলেও সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিষম মোকর্দ্দমায় তাহাকে পড়িতে হইবে। বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুস্‌লাইয়া লইয়া আসার অপরাধ তাহার ঘাড়ে ঝুলিতেছে। সে মোকর্দ্দমা চালান না চালান আপনার ইচ্ছাধীন।”

নরেশ বলিলেন,—“সে কথার বিচারে এখন কি প্রয়োজন। যে আর ইহলোকে নাই, তাহার জন্য কাহাকেও দণ্ডিত করা নিষ্প্রয়োজন। চা খাওয়া শেষ হইল, আমি তবে এখন প্রস্থান করি।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“কখন ফিরিবেন, আপনার সহিত সাক্ষাতের হয়ত অনেক প্রয়োজন হইবে।”

নরেশ বলিলেন,—“কাল প্রাতেই ফিরিব। কলি-কাতায় আসিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপ-নাদিগকে অনেক কষ্ট দিতেছি, আমি বড়ই বিপন্ন, আমাকে ক্ষমা করিবেন। বসুন আপনারা, আমি আসি তবে।”

নরেশ প্রস্থান করিল। অল্পকাল পরে কার্ত্তিক ও মাণিকলাল গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহারা অনর্থক পুলিশে ঘুরিয়া আসিলেন। সেখানে তাঁহারা কিছু নূতন সংবাদ পাইলেন না। বুঝিয়া আসিলেন, পুলিশ যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে হয়ত কল্যই মাণিকলালের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। সে জন্য তাঁহারা কিছু ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না। সেখানে আরও শুনিলেন, লব-ঙ্গকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত অনেক পুলিশ কর্ম্মচারী রত্নেশ্বর বাবুর বাসায় গিয়াছে। পাছে তাঁহার পিতৃব্য কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় কার্ত্তিক অতিশয় ভীত হইলেন। পুলিশ হইতে বাসায় না ফিরিয়া তাঁহারা বহুবাজারে রত্নেশ্বর বাবুর আবাসে গমন করিলেন।

কার্ত্তিক গাড়ী হইতে নামিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করি-লেন। দ্বারবানেরা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। বলিল,—“খবর বড় খারাপ হুজুর। লাবঙ্গী জামাই বাবুর বড় বৌকে খুন করিয়াছে, অনেক পুলিশ আসিয়া এখন ধরিয়া লইয়া গেল।”

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,“কর্ত্তাবাবু তখন বাড়ী ছিলেন?”

বক্তা বলিল,—“হাঁ হুজুর।”

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন,—“কর্ত্তা কি বলিলেন?”

বক্তা বলিল,—“প্রথমেই তিনি সব লোককে হাঁকাইয়া দিবার জন্য হুকুম দিয়াছিলেন। পুলিশের সহিত একজন সাহেব ছিল, সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, হাঁকাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে, কেবল বেশী বিপদে পড়িতে হইবে। এ বিষয়ে কোন উপায়ে আসামীকে আট্‌কাইয়া রাখিবার সাধ্য নাই; তবে কেন আপনি মেয়েছেলে লইয়া বিপদে পড়িতে চাহেন। আরও অনেক কথা সাহেব কর্ত্তাকে বুঝাইল। সাহেবের সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ত্তা লবঙ্গীকে বাহিরে আসিতে হুকুম দিলেন।”

তাহার পর?

তাহার পর পুলিশের লোকেরা লবঙ্গীকে ধরিয়া লইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কর্ত্তা কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু দিদি বাবু চেঁচাইয়া বলি-লেন,—“তোর কোন ভয় নাই; কাল্‌ই তুই খালাস হ’বি।”

কার্ত্তিক জিজ্ঞাসিলেন, কর্ত্তা কি করিতেছেন?”

বক্তা বলিল,—“বাহিরে নাই। ভিতরে কি করিতেছেন জানি না। উকিল রাম বাবুকে আনিতে গাড়ী গিয়াছে; তিনি আসিলে কোন মতলব হইতে পারে। আপনি ভিতরে যান, সব জানিতে পারিবেন।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“থাক। এখন আর যাইব না। এখন কর্ত্তা বড় চঞ্চল হইয়া রহিয়াছেন, এ অবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত নহে।”

কার্ত্তিক বাবু পুনরায় গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তন্মধ্যস্থ মাণিকলালকে সমস্ত কথা বলিলেন। গাড়ি চোরবাগানের বাসায় ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একখানী গাড়ী আসিয়া কার্ত্তিক বাবুর দ্বারে লাগিল এবং তাহা হইতে এক সুন্দর পরিচ্ছদধারী দ্বারবান নামিয়া দরজায় বাবু বাবু শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

কার্ত্তিক উপর হইতে “জিজ্ঞাসিলেন, কে হে?”

দ্বারবান বলিল,—“হুজুর আমি আপনার তাবেদার। কর্ত্তাবাবু আপনাকে এখনি ডাকিতেছেন, খুব জরুর বলিয়াছেন, গাড়ী তৈয়ার।

কার্ত্তিক বাহিরের বারান্দায় আসিয়া বলিলেন,—“কেন বল দেখি? কে আছেন সেখানে?”

দ্বারবান বলিল,—“উকিল বাবু আছেন। কেন হুজুরকে তলব হইয়াছে, তাহা জানি না, কিন্তু ফেসাদের কথা হইতে পারে।”

কার্ত্তিক বলিলেন,—“তবে দাঁড়াও যাইতেছি।”

কিরণের সহিত দুই চারিটা প্রয়োজনীয় কথা শেষ করিয়া, রাত্রি প্রায় ৮টার সময় কার্ত্তিক বাবুকে পুনরায় গাড়িতে উঠিতে হইল। ক্রমশঃ।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

শিবরহস্য।

আঁলোচ্যগ্রন্থের নাম ‘শিবরহস্য’। গ্রন্থে ভগবানের দশাবতার ও সৃষ্টি প্রণালী প্রভৃতি নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম—জ্ঞান দাস। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে মাত্র একটি স্থানে ভণিতাযুক্ত পদ আছে। যথা:—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদযুগে করি আস।
ভাগবতরে কিছু কহে জ্ঞান দাস॥

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকারের অন্য পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। এখন কথা হইতে পারে, ইনি কোন্ জ্ঞান দাস? যিনি বীরভূমের কাঁদর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সুমধুর সঙ্গীত ধারায় বঙ্গবাসীকে বিমল আনন্দ সলিলে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, যিনি মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত-স্রোতে লোকের আশা, উদ্যম, উৎসাহ, বুদ্ধি, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও কর্ম্মশীলতাকে সঞ্জীবিত ও পরিচালিত করিয়াছিলেন, যাঁহার বীণা হইতে

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিয়া মোর প্রাণ।

কাব্য রাগিণী নিঃসৃত হইয়া বহু বৎসর পর অদ্যাপিও আমাদিগকে সেই স্বরে মুগ্ধ করিতেছে, যিনি জয়দেবের পদানুসরণ করিয়া সাহিত্যোদ্যানে নন্দন কাননের সৌন্দর্য্য রাখিয়াছেন, জানি না ‘শিবরহস্য’ প্রণেতা সেই জ্ঞান দাস কি না?

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞান দাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ দৃষ্টে অনুমান করা যায়, জ্ঞান দাস ১৫৮০ শকের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। মনোহর দাস, জ্ঞান দাসের সমসাময়িক। গোবিন্দ দাস তাঁহাদের পরবর্ত্তী কবি।

‘শিবরহস্য’ কত শকে রচিত হইয়াছে অথবা কোন সালে কে নকল করিয়াছে, গ্রন্থে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। ভাষা এবং পদলালিত্য দেখিয়া ইহাকে বৈষ্ণব কবি জ্ঞান দাসের লেখনী নিঃসৃত কি না পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। গ্রন্থের আরম্ভ ভাগ যথা:—

৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানঞ্জন সলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥
জয় জয় শ্রীগুরু পতিতের বন্ধু।
জয় জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র প্রেমারস সিন্ধু॥
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর।
জয় জয় নরহরি পুযো গদাধর॥
জয় জয় অদ্বৈত যার যত ভক্তগণ।
জয় জয় বৃন্দাবন জয় গোবর্দ্ধন॥
জয় জয় জমুনা জয় জয় ব্রজবাসী।
জয় জয় গোপীকৃষ্ণ প্রেম অভিলাসি॥
শিব রহস্য আগমে জে কথা শুনিলা।
পার্ব্বতি বেসে কথা সদাসিব কহিলা॥
একদিন পার্ব্বতি সহিত মহেস্বর।
রহাস্যে বসিলা দুহে কৈলাস সিখর॥
নানা প্রকারে প্রেম করি আচরণ।
প্রেম আচরিঞা স্থির হইলা দুই জন॥
পার্ব্বতি বোলেন গোসাঞি করি নিবেদন।
এক কথা মোর মনে পড়িল স্মরণ॥
রাধা কৃষ্ণ তত্ত আজি কহিবা আমারে।
যদি কৃপা থাকে প্রভু মোর তরে॥
এ বোল শুনিয়া তুষ্ট হৈলা পঞ্চানন।
কহিব তোমারে প্রিয়া সব বিবরণ॥
গুহের গুহ্য পরম রহাস্য।
তুমি হেন পৃয়া মোর কহিব অবস্য॥
তথাহি। এক ব্রহ্মাদ্বিধ ভূতং জোগিনাং জ্ঞান হেতব।
তদানন্দ মহেরাধা তদানন্দ মহেশ্বরি॥ ইতি॥১॥
রাধা কৃষ্ণ এক দেহ জানিহ নিশ্চয়।
দুই ভাব করিলে বড়ই সংসয়॥
এক দেহ থাকিলে পাইবে সর্ব্বজন।
দুই দেহ হইলা জোগি সিদ্ধার কারন॥
স্থুল সুক্ষ্ম দুইরূপে তাহার কারণ।
জোগি সিদ্ধাগণ ভাবে সুক্ষ দিয়া মন॥
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সুক্ষ রূপ হয়।
তাহার অঙ্গের ছটা সে জ্যোতির্ম্ময়॥
সেই জুতি হইতে আমা সভার প্রকাস।
অচল সচল চরাচর আকাশ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আমা দিয়া এ হিন কায়।
তিন গুণ দিয়া তিনেরে দিলেন আশ্রয়॥
ব্রহ্ম স্বরূপ ব্রহ্মা কহে চারিবেদ।
পুর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র না জানে কেহো ভেদ॥
বৃন্দাবন মাঝে সদত নিত্য বিহরে।
প্রধান পুরুস সেহি সর্ব্ব অগোচরে॥

পুঁথিতে যেরূপ বর্ণবিন্যাস আছে, আমি অবিকল সেইরূপ উদ্ধৃত করিলাম। ১৩০৮ সালের তৃতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আমি একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহাতে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি ছিল, তাহা আধুনিক বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি অনুসারে সংশোধন করিয়াছিলাম। তাহাতে উক্ত পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, “প্রাচীন পুঁথির এইরূপ সকল বানানকে বর্ণাশুদ্ধি বিবেচনা করা সঙ্গত নহে, তৎকালে বানানের প্রচলিত নিয়মই এইরূপ ছিল। প্রাচীন পুঁথিসংগ্রাহকেরা এইরূপ প্রাচীন নিয়মানুযায়ী বানানে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।” প্রাচীন বানানে হস্তক্ষেপ না করাই যে উচিত, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সে কালে যে কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণ ছিল, তাহা আমি জানি না। থাকিলেও ঐরূপ বানানই যে ব্যাকরণ সিদ্ধ ছিল, তাহার কি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়? সকল দেশের সকল উন্নত ভাষারই ব্যাকরণ আছে এবং সকল ভাষাই ব্যাকরণের কাঠগড়ায় আবদ্ধ। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার অপিচ বঙ্গবাসীর এমনি দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের সেরূপ একখানি খাঁটি ব্যাকরণ নাই এবং কেহ যে এই অভাব পুরণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও বোধ হয় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদিও এই সকল প্রতীকারের জন্য স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি এই সুদীর্ঘ নয় বৎসরে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমি যদিও একজন পরিষৎ-সংস্রবি ব্যক্তি, তবুও কর্ত্তব্যানুরোধে এই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

প্রাচীন পুঁথির বানান এইরূপ থাকিলে, যদি তাহা বর্ণাশুদ্ধি জ্ঞান করা অকর্ত্তব্য হয়, তবে যে একই পুস্তকে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বানান পাওয়া

যায়, সে স্থলে কোন্‌টি শুদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে ? দৃষ্টান্ত স্থলে এই গ্রন্থ হইতেই একটি উদাহরণ দিতেছি।—

স্থন স্থন প্রাণ পৃয়ে কহিয়ে তোমারে।
কেমনে করিব শ্রীষ্টী কহিয়া য়ামারে॥

এই চরণের পরেই লিখিত হইয়াছে,—

রাধিকা বলেন প্রভু স্থনহ বচন।
শ্রীষ্টি করিতে তোমার হইলেক মন॥

এখানে "সৃষ্টি" শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বানান নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ইহার মধ্যে কোন্‌টি শুদ্ধ আর কোন্‌টি অশুদ্ধ ? এই সকল নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রাচীন-সাহিত্যের একখানি অভিধান প্রণয়ণের প্রয়োজন হইয়াছে।

কবির কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয়। পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

আর কিছু কৃপা করি কহো যোগেশ্বর।
পূর্ণব্রহ্ম কিরূপে করয়ে বিহার॥

তদুত্তরে। সিব বলে স্থন দেবি গুহ্য বিবরণ।
সহজে বামাজাতি না বুঝে কারণ॥
অখণ্ড গোলক মধ্যে গুপ্ত বৃন্দাবন।
তাহার অধিক স্থান নাহি ত্রিভুবন॥
দিবা নিশি নাহি ভেদ সদায় দিপ্তময়।
কত বা কৌতুক তাহে নাহি সিমাশ্রয়॥
নিত্য পুস্প জত সব সদা বিকসিত।
লোভ মোহ আদি ছয় তরঙ্গ রহিত॥
তরুগণ ডালে ডালে সদা আছে জুড়ি।
মধুময় লতা পড়ি আছে বেড়ি॥
নানা বর্ণে ফল ফুল দেখিতে সুন্দর।
সারি স্থক পিকু তাহা মত্ত মধুকর॥
সভ বৃন্তে একত্র তাহে হয় স্থথে স্থথে।
জার জেই সেবা সেই করে সসঙ্গিতে॥
মান সরবর সোভা করিছে বোষ্টীত।
হংস চক্রবাক তাহে পদ্ম স্থশোভিত॥
পূর্ণব্রহ্ম সেই স্থানে করে নানা কেলি।
কৈসর বয়েস সব সঙ্গে রঙ্গ ভালি॥
শোক মহ জরা মৃত্যু নাহি কারু ভয়।
হৃদয় সমান ভাবে নিত্য লিল্লা হয়॥
আত্মাশক্তি মই হন রাধা চান্দরাণি।
তার সঙ্গে বন্ধে কেলি দিবস রজনি॥
আত্মাসক্তি রাধাকৃষ্ণ আদ্য পুরুস।
এক ব্রহ্ম দুই রূপে করেন বিলাস॥
রাধিকা আত্মাশক্তি রাধা পারে নাহি।
তোমারা সকল দেবি সেই অংশ পাই॥

প্রাচীন কবিরা আত্মত্যাগের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই স্বরচিত গ্রন্থ কিম্বা সঙ্গীতাদি সুধী-সমাজে পরিচিত করিবার মানসে অন্য কোন সুপ্রসিদ্ধ কবির নামে ভণিতা দিয়াছেন—অন্যের গুণ-গরিমার নিকট নিজের গুণ-গৌরব সঙ্কুচিত করিয়াছেন। এই সকল কারণে অনেক গ্রন্থের রচয়িতার প্রকৃত নাম জানা যায় না। আমার বিশ্বাস গ্রন্থখানি অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া জ্ঞান দাসের নামে ভণিতাযুক্ত হইয়াছে। অথবা এই জ্ঞানদাস আমাদের পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

গ্রন্থের শেষ ভাগে এইরূপ ঃ—

জাহার পদলাগী ত্রিজগত বিকল।
সেই পাদ পদ্ম লাগি আমিত পাগল॥
তোমারে কহিল দেবি পরাপর আগম।
এ তিন ভুবন মধ্যে নাহি কৃষ্ণ সম॥
গৌরাঙ্গ বন্যায় আসি ভাসাইলা সংসার।
পণ্ডিত রহিল উচ্চ বান্ধিয়াটি কর॥
তপনের তাপ তারা সহিতে না পারি।
উলুক রহিল জেন বৃক্ষ ডাল ধরি॥
থাকীল পণ্ডিত তারা নিজ মান করি।
বিদ্যাকুলমদে দ্বিজ না ভজিল হরি॥
প্রেমবন্যা দেখি দ্বিজ পান মহাভিত।
ত্রোত্রওসে হইল তারে বিধি বিড়ম্বিত॥
সেই বন্যায় ডুবিল পাপী জগাই মাধাই।
প্রেম জল পাঞা নিস্তারিলা দুই ভাই॥
ভকত হইল জলে মৎস্য মগর।
আনন্দ হইয়া ফিরে কারে নাহি ডর॥
* * জঙ্গমে জীব যতেক গরাসিল।
হরিনাম শুনি তারা ত্রাণ পাইল॥

ঠাকুর গৌরাঙ্গে গুণ কহন না যায়।
অনন্ত মহিমা বেদে পুরাণে না পায়॥
সংখেপে কহিল কিছু আগমের ভাসা।
শ্রীগুরু চরণ ভাই বিপদ বিনাসা॥
যে হয় রসীক সেই করিবে শ্রবণ।
ইহাতে জানিবে তত্ত সকল কারণ॥
পয়ার প্রবন্ধ শুনিলাম সিংহপদ।
কৃষ্ণ কথা রসে সদা বিনাসেরি পদ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদযুগে করি আস।
ভাগবত্তরে কিছু কহে জ্ঞান দাস॥

ইতি শ্রীসিব রহস্যগমে হরগৌরী সম্বাদে আগম প্রসঙ্গে ভগবত তত্ত লীলা সমাপ্ত ঃ॥০॥

কবির ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস। লিপিকর প্রমাদে অনেক স্থলের সম্যক অর্থ করা যায় না। গ্রন্থখানি পয়ার ছন্দে রচিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২, চরণ সংখ্যা ৩৫০।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

চুণার।

আব-হাওয়া পরিবর্ত্তন আজকাল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একটি বিশেষ বিলাসসামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এই হাঁপায় পড়িয়া অনেকে মধুপুর, বৈদ্যনাথ, দেওঘর গিয়া থাকেন। কিন্তু আজকাল সে সব দেশে আর বড় মন উঠে না। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বর্ত্তমানে চুণার আব-হাওয়া বিলাসীবাঙ্গালীবাবুদিগের নিকট ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। সুধীপাঠকবৃন্দের নিকট তাহারই দুইটা কথা শুনাইতে ইচ্ছা করি। চুণার বেহারীদিগের নিজস্ব হইলেও বাঙ্গালীরা ক্রমে নিজের দিকে টানিয়া লইতেছেন। পূজাবকাশে অথবা গ্রীষ্মের ছুটিতে অনেকানেক বড় বড় আফিসের কর্ম্মচারী, পরিব্রাজক ও বিলাসী-বাঙ্গালী ধুরন্ধরদিগের আগমনে চুণার সহর মুখরিত ও কলকলায়িত হইয়া উঠে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রধান ষ্টেশন চুণার। হাওড়া হইতে প্রায় ৪৮৯ মাইল; মোগলসরাই হইতে এই ষ্টেশন দশক্রোশ দূরে অবস্থিত। স্থানটি বাস্তবিক মনোমদ অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত। চুণার একে পর্ব্বতময় প্রদেশ, তাহাতে ভাগীরথীতটোপরি সংস্থাপিত, এই উভয় কারণে স্থানটি পরিব্রাজক ও স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনশীল বাবুগণের প্রীতিকর। পাহাড়ে ফুর ফুরে শীতল হাওয়া ভাগীরথীর বক্ষ চুমিয়া শ্যামল পর্ব্বতের গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ কর—মৃদু সমীরণ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে। দেশের এক প্রান্ত দিয়া ভাগীরথী লহর তুলিয়া আরোহীপূর্ণ তরিগুলিকে বক্ষে লইয়া চলিয়া যাইতেছে, তটোপরি সুশ্যাম পর্ব্বতমালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। দেশের মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় নিম নিসিন্দার প্রাচুর্য্য অধিক পরিলক্ষিত হইবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে নিম নিসিন্দার বহুবিধ গুণের কথা উল্লেখ আছে। দেশে জল কষ্ট নাই। দেশ মধ্যে "জার্গো" নাম্নী একটি ক্ষুদ্র নদী একটা পার্ব্বতীয় "ঝরণা" হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাগীরথীর

সহিত মিলিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আকবর বাদশাহ খনিত "বুচায়া" "দুর্গা" নামক দুইটি উল্লেখযোগ্য বিশুদ্ধ-তোয়া ইন্দারা রহিয়াছে। রোগীদিগকে পানীয়রূপে এই কূপের জল প্রদান করা হয়।

পূর্ব্বে চুণারে সকল দ্রব্যই পাওয়া যাইত। যখন ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সৈনিকাবাস ছিল, তখন এ প্রদেশ অধিকতর জাঁকাল ছিল। চুণারের পাথরের শিল্প কাজ অতি উৎকৃষ্ট এবং খুব বিস্তর। পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য এখানে পাওয়া যাইত—খৃষ্টান মিসনরিগণ ধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে তখন বিশেষ লীলা করিয়াছেন। যাহা হউক, সে সব পুরাতন কথা লইয়া অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া এক্ষণে চুণারের দর্শনীয় প্রধান প্রধান বিষয়-গুলির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

চুণারের কেল্লা বা চুণার গড়।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

অতি প্রাচীনকাল—এমন কি ত্রেতাযুগ হইতে এই কেল্লার অস্তিত্ব শুনা যায়। তখন যে কেল্লার গঠন এরূপ ছিল না, একটু অবধান করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন সময়ে কেল্লা এরূপ আকৃতি ধারণ করে, পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। পুরা-তত্বানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ভগবান বামনরূপী নারায়ণ যে সময়ে রাজা বলির দাতৃত্ব পরীক্ষার্থ ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিয়া, তিন চরণ দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোক আচ্ছন্ন ও অধিকার করিয়াছিলেন; সেই সময়ে ভগবানের প্রথম চরণ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। এইজন্য ইহার একটি নাম "চরণাদ্রি"। যে পাহাড়ের উপর চরণ পতিত হইয়াছিল, তাহার আকৃতিও কতকটা চরণের ন্যায়; এজন্য ইহাকে "চরণাদ্রি" বলে।

দ্বাপরে মহারাজ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জরাসন্ধ উক্ত পাহাড়ের উপর রাজগিরি নামে গড় নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে অনেক রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে ভীম জরাসন্ধকে নিহত করিয়া বন্দিরাজগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের কারাগৃহ এখনও নাকি ম্যাগাজিনের পার্শ্বে রহিয়াছে।

রাজা ভর্তৃরী স্ত্রীর ব্যবহারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া এই স্থানে উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া বহুবৎসর তপশ্চরণ করেন। কথিত আছে, এই চরণাদ্রি পাহাড়ে তাঁহার আশ্রম ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে এই স্থানে প্রাপ্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যা-গমন জন্য বিস্তর অনুনয় ও অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হয়েন না। রাজা ভর্তৃরী গড়ের তাৎকালীক দুরবস্থা এবং শ্বাপদ-সঙ্কুলতা বর্ণনা করিয়া অনেক খেদ করিয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য এই কারণে গড় মেরামত করাইয়া "ভর্ত্তরী কি নগরী" এই নাম প্রদান করেন। অদ্যাপি ম্যাগাজিনের নিকট "ভর্ত্তরী চবুতর" বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকে এই বেদিতে নাকি তৈল ঢালিয়া দেন, কিন্তু একবিন্দুও বাহিরে আইসে না।

পাথর গড় বা প্রবাদ রহস্য।

যে স্থান যতই প্রসিদ্ধিলাভ করুক না কেন, মানুষ তাহার প্রসিদ্ধি-গর্ব্ব ফুলাইয়া নানারূপ কল্পনা সাহায্যে আপনাদের অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেয়। স্থান মাহাত্ম্য অধিকতর প্রসার ব্যপদেশে মানুষ অনেক রূপ ভ্রান্ত কল্পনা অভ্রান্ত মূর্ত্তিতে তাহাদের সম্মুখে ধরাইয়া তাহাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দেয়। চুণার ও এই অদ্ভুত প্রবাদোদ্ভুত রহস্যের হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। কথিত আছে, একদা জনৈক ব্রাহ্মণ হস্তিনাপুরে একটি লৌহশলাকা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তথায় বুপিথৌরারাজকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বলেন। তিনি বলিলেন যে, উক্ত শলাকা বাসুকির মস্তক ভেদ করিয়াছে, সুতরাং তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে সেই দুর্গ চিরস্থায়ী হইবে। রাজা তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণ ক্রোধভরে শলাকা উত্তোলিত করিলেন। সকলে বিস্ময়ে দেখিলেন, শলাকার অগ্রভাগে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। রাজা তখন ব্রাহ্মণের পদদ্বয় ধারণ করিয়া, ঐ শলাকা পুনঃ প্রোথিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, যে লগ্নে ঐ শলাকা প্রোথিত হইয়াছিল সে লগ্ন অতীত হইয়াছে, সুতরাং উহাতে কোন ফল হইবে না। এই বলিয়া গমন কালে ব্রাহ্মণ বলিয়া গেলেন যে, ঐ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ

করিলে দুর্গ কিছুকাল অটুট থাকিতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়ী হইবে না। তখন রাজা চরণাদ্রি মেরামত করিয়া "পিথৌরা গড়" এই নামে অভিহিত করিলেন। এই পিথৌরা গড় লোক মুখে "পাথর গড়" হইয়াছে।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

যেমন বিসদৃশ বৈচিত্রময় পৌরাণিক ঘটনা পরম্পরার জন্য চুণার প্রসিদ্ধ, তেমনি ঐতিহাসিক রঙ্গনাট্যের উচ্ছ্বাস-ময় বিচিত্র ঘটনা বিন্যস্ত অঙ্কগর্ভাঙ্কা-ভিনয়ের তেমনি লীলা ক্ষেত্র! রাজার পর রাজা—হিন্দুর পর মুসলমান—মুসলমানের পর খৃষ্টান রাজা—যুদ্ধের পর যুদ্ধ—অবিশ্রান্ত রক্তপাতে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এখনও হইতেছে। চুণারে সর্ব্ব প্রথম হিন্দু রাজাসন স্থাপিত হইয়াছিল—পরে মুসলমান; এখন তথায় প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশগবর্মেণ্টের বিজয়পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে। ১০২৯ খৃঃ রাজা সহদেব নামে জনৈক হিন্দু রাজা এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার শোন্‌বা নাম্নী একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। রাজা প্রতিজ্ঞা করেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তিনিই কন্যারত্ন লাভ করিবেন। অবশেষে মহোরার রাজা ওসনের পুত্র ওদল যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া শোন্‌বাকে লাভ করেন। অদ্যাপি শোন্‌বার মহল ও সেই বিবাহের ছায়ামণ্ডপ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

তৎপরে ১৪৮৮—১৫২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত চুণার বীরসিংহ ও বীরভান সিংহ নামক নৃপতিদ্বয়ের অধীন থাকে। তাঁহা-দের নির্ম্মিত বহুব্যয় সাপেক্ষ রাজকীয় মন্দিরসমূহ রাণীঘাট ও দেবল আজও পর্য্যন্ত "ভর্ত্তরী চবুতরের" নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চুণারযাত্রী-দর্শকের নিকট ইহা একটি দর্শনীয়। ১৫২৯ খৃঃ মোগল কুলতিলক বাবরশাহ যখন বেনারস দখল করেন, তখন স্বীয় বিপুল অনিকিনীসহ নিজে চুণার গড়ে অবস্থিতি করেন। তিনি স্বীয় জীবন বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তৎকালে এই স্থান গভীর অরণ্যানীব্যাপ্ত সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা ক্ষেত্র ছিল। গণ্ডার, বন্যহস্তী ও প্রকাণ্ডকায় বিষধরগণ অহরহঃ আপনাদের তীব্র পৈশাচিকবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। পরবর্ষে বাবরের মৃত্যুর পর শেরশাহ এই স্থানে স্বকীয় আবাসবাটী ও স্নানাগার নির্ম্মাণ করেন। তাহার নাম "শিলহখানা"। গড় শেরশাহের অধিকৃত শুনিয়া দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন সসৈন্যে আসিয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত রক্তপাতের পর পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করেন। শেরখাঁর মৃত্যুর পর গড় আবার মোগল করায়ত্ত হয়। মোগলকুলতিলক আকবর গড়ের ভিতর একটি দ্বার নির্ম্মাণ করান; উহাকে পাণিঘাটের দ্বার বলে। দ্বারের নির্ম্মাণের সন তারিখ খোদিত আছে। সম্রাট জাঁহা-গীরের সময় এগ্তিয়ার খাঁ এখানকার দেওয়ান নাজিম নিযুক্ত হয়েন। তাঁহারই সেই বৈঠকে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কাছারি করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহের নাজির বহরাম মির্জা যে মসজিদ নির্ম্মাণ করনে, অদ্যাপিও তাহা গড়ের ভিতর বর্ত্তমান আছে।

যে সময়ে কীর্ত্তিদৃপ্ত মোগল সম্রাটের উদিয়মান প্রবল প্রতাপ ধীরে ধীরে অবসন্ন হইতেছিল—মোগলসূর্য্যের মন্দী-ভূত কিরণজাল অস্তগমনের আভাস স্পষ্ট প্রকাশ করিতে-ছিল—তখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের রাজ্যস্থাপনের প্রথম আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল। সেই সময়ে ১৭৬৪ খৃঃ অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌল্লা চরণাদ্রির অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। আহমদশাহ দুরানী সেই বর্ষে ভারত আক্রমণ করিয়া মোগল ও মারাঠাদিগের শেষ আশাভরসা একে-বারে বিলীন করিয়া দেন। ১৭৬৫ খৃঃ ইংরাজ সেনানী মেজর মনরো, ইহা অবরোধ করেন। কিন্তু দেশীয় সৈন্যগণের অশিক্ষিততাই তাহার সেইবার পরাজয়ের কারণ। দ্বিতীয়বার তিনি বিলাতের খাস বিদেশীয় গোরা পলটন লইয়া চুণার গড় আক্রমণ করিলেন—কিন্তু এবারেও ইংলণ্ডীয় সাহসে কুল পাইল না—তথাপি মনরো ভগ্নোৎসাহ হইলেন না—তিনি স্থায়ী অবরোধের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া মেজর কর্ণ্যাকের সহিত মিলিত হইবার জন্য বেনারস যাত্রা করেন। এই সময়ে নবাব সুজা উদ্দৌল্লা চুণার আগমন করেন। সম্মুখ যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া মনরো সৈন্যাদি উঠাইয়া লইলেন। চুণার অনধিকৃত রহিল—মনরো সাহেবকে চুণার অধিকারের খ্যাতি-লাভাশায় জলাঞ্জলি দিয়া সত্বর বিলাতযাত্রা করিতে হইল। ১৭৬৫ খৃঃ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণ্যাক ইহার পুনরবরোধ করেন—প্রথম রাত্রির আক্রমণে বিপুল ক্ষতি-

পশ্চাৎপদ হইতে হয়—পরে অন্য উপায় অবলম্বন

করেন। নিকটস্থ গদাপাহাড় হইতে অনবরত তোপ দাগিয়া দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করেন। তখন সুজা উদ্দৌল্লার সৈন্যগণ উপায়শূন্য হইয়া আত্মসমর্পন করে। দেশীয় ইতিহাসে বৃটিশ বলের সম্মুখে, দেশীয়দিগের ইহা কম বীরত্বের কথা নয়।

কেল্লা ইংরাজদিগের অধীনে আসিলে, কিছুদিনের জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অস্ত্রাগার স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে "ষ্টেট প্রিজন"এ পরিণত হয়। ত্র্যম্বকজী দেঙ্গলিয়া ইহার প্রথম কয়েদী। ইনি ১৮১৭—১৮ খৃঃ মহারাট্টা রাজদ্রোহীদলের প্রধাননায়ক ছিলেন। বর্ত্তমানে ইহা একটি সামান্য জেলখানা।

দুর্গের ভিতর জলের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই নাই, গঙ্গা-জলই প্রধান পানীয়।

টীকৌর মহল্লা (দুর্গাহ।)

ইহা একটি সমাধি বিশেষ। কাসেম সোলেমান নামক একজন ফকীরের সমাধি। মনের বৈরাগ্যে ইনি দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতেন। পেশওয়ার ইঁহার জন্ম স্থান—ইঁহার শিষ্য সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, যখন কাসেম সশিষ্য লাহোরে উপস্থিত হয়েন, তখন তত্রত্য রাজকর্ম্মচারী ভয়ে ভীত হইয়া সম্রাট আকবরকে যুদ্ধা-শঙ্কার সংবাদ দেন। আকবর আদেশ করিলেন, হয় কাসেমকে হাতবেড়ী লইতে বলিও, নতুবা যুদ্ধ করিতে হইবে। কাসেম ফকীর, যুদ্ধে তাঁহার প্রয়োজন কি? তিনি স্বেচ্ছায় বন্দী হইলেন। তখন বন্দী কাসেমকে চুণারে স্থানান্তরিত করা হইল। চুণার গড়ের নীচে একটি মসজিদে তিনি সায়ংকালীন নামাজ পড়িবেন, হাত-কড়ি আপনা হইতে খুলিয়া গেল—উপাসনা শেষ হইলে তিনি যে বন্দী সেই বন্দী। ক্রমে সকলে ইহা জানিতে পারিল—সকলে ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল। তখন প্রতীতি হইল যে, কাসেম সামান্য ফকীর নয়। আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল যে, মৃত্যুর দিন কাসেম সকলকে ডাকিয়া আপন মৃত্যুকাল জ্ঞাপন করিলেন। সকলের সম্মুখে একটি তীর ছুড়িয়া বলিলেন, তীর যেখানে পড়িবে, সেখানে যেন তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। তীর গড়ের সম্মুখে পড়িল। তিনি বলিলেন, "টুক আউর" অর্থাৎ আর একটু যাও। তীর ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আরও কিছুদূর গিয়া পড়িল। সেইখানে এই অদ্ভুত ফকীরের সমাধি দুর্গাহ। "টুক আউর" হইতে টীকৌর মহল্লা নাম হইয়াছে।

কদমরসূল (চরণপাদুকা।)

কেল্লার নিকট টীকৌর মহল্লাতে সেখ ইমাম বক্সের মসজিদের একটি ঘরে উহা সযত্নে রক্ষিত আছে। এক-খানি কৃষ্ণ প্রস্তরে চরণের সম্মুখস্থ অৰ্দ্ধাংশ বিদ্যমান। ইংরাজ গবর্মেণ্ট যখন চুণার দুর্গ হইতে দেবমূর্ত্তি সকল অপ-সারিত করেন, তখন মুসলমানগণ উহা লইয়া গিয়া আপনাদের মসজিদে স্থাপিত করেন। মুসলমানগণ উহার নাম দিয়াছেন "কদমরসুল"। হিন্দুগণ বলেন "চরণ পাদুকা"। এই প্রস্তরখানির প্রতি হিন্দু মুসলমানের সমান শ্রদ্ধা। হিন্দুগণের মতে ভগবানের যে দুইটি চরণ পৃথিবীর উপর পতিত হয়, তাহার দক্ষিণ চরণের চিহ্ন উক্ত প্রস্তরে পতিত হয়। বাম চরণের চিহ্ন গয়ায় আছে। মতান্তরে জানা যায় যে, জরাসন্ধের বন্দিরাজ-গণ উদ্ধারের সময় শ্রীকৃষ্ণের চরণ ঐ প্রস্তরের উপর পতিত হয়; সেই অবধি হিন্দুগণ উহাকে ভক্তির চক্ষে দেখেন।

মুসলমানগণ "কদমরসুল" তাঁহাদের বলিয়া দাবী করেন। ইঁহারা বলেন, ফিরোজ শাহার রাজত্বকালে মারুজ নামক জনৈক হাজী—মক্কা হইতে ফিরিয়া আসি-বার সময় দুইটি কদমরসুল বামচরণার্দ্ধ লইয়া আসিয়া একটি সম্রাটকে উপহার দেন। সম্রাট হাজী সাহেবকে চুণার জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন, দ্বিতীয়টি তিনি কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক মসজিদে স্থাপিত হইলে অনেক হিন্দুযাত্রী ইহা দর্শনমানসে এখানে আগমন করেন। কাশীর মহারাজার বৃত্তিপ্রাপ্ত জনৈক ব্রাহ্মণ ইহার সেবা করেন।

গদা পাহাড়।

এই পাহাড় হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া ইংরাজ সেনা-পতি দুর্গ ধ্বংস করেন। গদাশাহ নামক জনৈক ফকীরের সমাধি, সেই জন্যই ইহার নাম গদাপাহাড় হইয়াছে।

এই কবরের চতুঃপার্শ্বে হস্ত ঘর্ষণ করিলে চন্দনের গন্ধ পাওয়া যায়, বলিয়া শুনা যায়। ইহা টিকৌরে অবস্থিত।

চুণারের আরও অনেক বলিবার থাকিলেও প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে; বারান্তরে হয়ত নূতন কথা লইয়া পাঠকসমীপে উপস্থিত হইতে পারিব।

শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ।

সৌর-জগৎ।

নীহারিকা।

মানুষের যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা আছে, বিশ্ব সংসারের জ্যোতিষ্কদিগেরও সেইরূপ অবস্থা পর্য্যায় থাকিতে দেখা যায়। আদৌ সৌর-জগৎ কেবল-মাত্র জ্যোতিষ্মান্ বাষ্পময় ছিল, তাহার না ছিল আকার, না ছিল নির্দ্দিষ্ট সংস্থিতি। অমাবস্যার সমকালে আমরা যে, আকাশের সীমান্তরেখার মত শুভ্র ছায়াপথ দেখি, তাহা কুজ্ঝটিকা সমতুল্য জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পের আভাস-মাত্র; উহার স্থানে স্থানে সেই অগ্নিময় কুজ্ঝটিকা ক্রমশঃ জমিয়া জমিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতেছে; ইহাই জ্যোতিষ্কের ভ্রূণ ও শৈশবাবস্থা। ছায়াপথের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, নগ্ন-দৃষ্টিতে তাহাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় বাষ্প কুজ্ঝটিকা হইতে পৃথক করা যায় না। পুঞ্জীকৃত নক্ষত্র আমাদের চক্ষে ক্ষুদ্ররূপে প্রতিভাত হইলেও, তাহাদের ক্ষুদ্রতম আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা অতুলনীয়রূপে বৃহৎ। নীহারিকা বা ছায়াপথ আমাদের সৌর-জগৎ নিজের কোলে রাখিয়া সমগ্রভাবে বেষ্টন করিয়া আছে; তাহার দূরত্ব আমাদের ধারণাতীত; এই দূরত্ব নিবন্ধনই আমরা বৃহত্তম নক্ষত্রপুঞ্জকেও বাষ্পবৎ দেখিয়া থাকি। নীহারিকার বাষ্প-ঘন নক্ষত্র সকল কালে এক একটি সূর্য্যরূপে নিজ নিজ রাজ্য সৃষ্টি করিয়া শাসন করিবে। নীহারিকা আত্ম-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মতী।

নীহারিকার যে অবস্থা, আমাদের সৌর-জগতেরও একদিন সেই বাষ্পময় শৈশবাবস্থা ছিল। তাহা হইতে সূর্য্যের জন্ম; সূর্য্য যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, তাহার দীপ্তি ও ঘূর্ণাবেগও তত বাড়িতে লাগিল। চক্রনেমি হইতে কর্দ্দম যেমন ছিট্‌কাইয়া যায়, তেমনি সূর্য্য হই-তেও প্রতপ্তপিণ্ড সকল ছিট্‌কাইয়া গিয়া মাধ্যাকর্ষণে ধরা পড়িয়া, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে থাকে, ইহারাই গ্রহ এবং সবিতা সূর্য্য। গ্রহগণ ঘুরিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের অকঠিন শরীর হইতেও পিণ্ডসকল বিচ্ছিন্ন হইয়া উপগ্রহ সকলের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এক সঙ্গে তিন আকারের তিনটি লৌহপিণ্ড তপ্ত-লোহিত করিয়া রাখিয়া দিলে, দেখা যাইবে যে, ছোটটিই সর্ব্বাগ্রে শীতলতা প্রাপ্ত হইবে; তৎপরে মাঝারি, সর্ব্ব-শেষে বৃহৎ পিণ্ডটি শীতল হইবে। এই জন্যই চন্দ্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র উপগ্রহ ও গ্রহ সর্ব্বাগ্রেই সম্পূর্ণ শীতলতাপ্রাপ্ত হই-য়াছে, এইরূপ অবস্থা গ্রহের বার্দ্ধক্য বা শেষাবস্থা; চন্দ্র যেরূপ ফাটিয়া রসশূন্য হইয়া আছে কালে হয় ত, তাহার শরীর রেণু রেণু হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে; এইরূপেই বোধ হয়, গ্রহাদির মৃত্যু বা ধ্বংস হইয়া থাকে। পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণের এখন যৌবনাবস্থা; তাহারা হরিৎ শস্যশালিনী, অশেষ শোভাময়ী; কালে উহারাও শীতল হইয়া জলকণামাত্র শূন্য মরুময় হইয়া ধ্বংসের পথ অনুসরণ করিবে। বৃহস্পতি, উরেনাস প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহ-গণের এখনও কৈশোর উত্তীর্ণ হয় নাই; তাহারা এখনও কাঠিন্য ও তারল্যের মধ্যাবস্থায় রহিয়াছে; কালে তাহারা শীতল হইয়া পৃথিবীর ন্যায় শোভা সম্পদ জীবনিবাস যোগ্য হইবে; তৎপরে মরুময় হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্র-সর হইবে। উহাদের পর স্বয়ং সূর্য্যঠাকুরের পালা। আমাদের মানব সংসারে যেমন প্রথম পিতা, তৎপরে পুত্র, তৎপশ্চাৎ পৌত্র প্রভৃতি বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সৌর-জগতের নিয়ম তদ্বিপরীত। সূর্য্য শীতল হইয়া যখন পৃথি-বীর ন্যায় অনচ্ছ হইবে, তখন সে আবার স্বয়ং দানরিক্ত হইয়া কাহার দ্বারস্থ হইয়া এক কণা আলোকের জন্য আপনার যাচ্ঞা ঘৃণিত জীবন বিক্রয় করিবে, তাহা সেই দর্পহারী ভগবানই জানেন।

উল্কা।

রাত্রিকালে উল্কাপাত সকলেই দেখিয়াছেন। উল্কাগণও গ্রহাদির ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে দলবদ্ধ হইয়া বৃত্তাভাস কক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রে একটি মাত্র উল্কাবলয় দর্শিত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুত সৌর জগতে বহু উল্কা বলয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটিই প্রধান। এই সকল উল্কাবলয় সমস্ত গ্রহকক্ষ ভেদ করিয়া গিয়াছে; গ্রহগণ ও উল্কাপুঞ্জ ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পরস্পর সন্নিহিত হয়, তখন গ্রহগণের মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উল্কা সকল গ্রহাভিমুখে ছুটিয়া তাহার বক্ষে বিরামলাভ করে। পৃথিবী প্রত্যেক বৎসর ১৩ই ও ১৬ই নভেম্বরের মধ্যে কোন দিন প্রধান উল্কা বলয় অতিক্রম করিয়া যায়; সেই সময় বহু উল্কাপাত হইয়া থাকে; ৩৩ বৎসর অন্তর পৃথিবী ও যথেষ্ট উল্কাপুঞ্জ পরস্পর সন্নিহিত হয় ও সেই সময় যথেষ্ট উল্কাবৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবী ও উল্কার গতির ত বিরাম নাই; পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই উল্কাবলয় ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, তখন উল্কাপুঞ্জ অব্যাহতি লাভ করে; কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণে যে সকল উল্কা তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাহাকে ধরিতে না পারিয়া কুলত্যাগিনীর মত 'তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল' তুই হারাইয়া স্বতন্ত্রপথে পর্য্যটন করিয়া নূতন উল্কাবলয় সৃষ্টি করে। এইরূপ প্রত্যেক বৎসর কোটি কোটি উল্কা পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের বক্ষে আশ্রয় লইতেছে, সহস্র সহস্র প্রধান বলয় বিচ্যুত হইয়া নূতন বলয় গঠন করিতেছে; তথাপিও প্রধান বলয়ে এখনও কোটি কোটি উল্কা বিচরণ করিতেছে, বুঝি তাহাদের শেষ নাই।

উল্কার নিজস্ব আলোক নাই; পৃথিবীর আকর্ষণে যখন তাহারা ছুটিয়া আসিয়া বেগে বায়ুর উপরে পড়ে, তখন বায়ু তাহাকে সহজে ও নির্ব্বিবাদে পথ ছাড়িয়া দেয় না; উভয়ের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে উল্কা চটিয়া লাল হইয়া উঠে, অনেক সময় এই সংঘর্ষে বেচারাদের নির্ব্বাণ মুক্তি ঘটে, তাহাদের ছাইটুকুও ধরাপৃষ্ঠে পৌছিতে পায় না; তাহাদের প্রেমাভিসারের এই পরিণাম। যে গুলি ক্ষুদ্র তাহারাই বায়ু সংঘর্ষে বাষ্পপরিণত হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা অতিবৃহৎ তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হইতেও দগ্ধাবশেষ কলেবর লইয়া ধরায় ধূলি চুম্বন করিয়া থাকে। কলিকাতা পুরাদ্রব্যালয়ে (Calcutta Meuseum) বহু ছোট বড় উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত আছে, লণ্ডন মিউজিয়মে একটি ৫৬ মণ ওজনের উল্কা আছে।

উল্কাপিণ্ড সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, উহারা কোনও বৃহৎ পদার্থের ভগ্নাংশ। Tschermak অনুমান করিয়াছেন যে, অধিকাংশ উল্কার উদ্ভব হইয়াছে আগ্নেয়গিরির উদ্গম হইতে এবং সেই সকল আগ্নেয়গিরি খুব সম্ভব ধরা পৃষ্ঠেরই। আইস্‌লণ্ডের হেক্লা নামক আগ্নেয়গিরির কোনও এক উচ্ছ্বাসকালে উদ্গত ভস্মাদি স্কটলণ্ডে আসিয়া পড়িয়া ছিল; এখনই যদি আগ্নেয়গিরির অত বল, তবে পৃথিবীর আভ্যন্তরিণ তাপ যখন আরও অধিক ছিল, তখন আগ্নেয়গিরি সকলের তেজও অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাৎকালিক উদ্গমকালে, যে সকল দ্রব্য উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হয়ত পৃথিবীর আকর্ষণী-শক্তির সীমার বহির্ভূত হইয়া খোদ সূর্য্যের শাসনাধীন হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন যে বৃহস্পতি-গ্রহের আগ্নেয়গিরি ধরণীপৃষ্ঠের আগ্নেয়গিরি অপেক্ষা ৫।৬ গুণ শক্তিশালী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৃহস্পতি গ্রহের এখন শৈশবাবস্থা; অতএব পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় যে তাহারও অমিত বল ছিল না, কে বলিবে? কিন্তু এমনও কি হইতে পারে না যে, কোনও গ্রহ বা উপগ্রহ বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রাপ্তির পর খণ্ড খণ্ড হইয়া উল্কারাশিতে পরিণত হইয়াছে?

যদিই ঐ উল্কারাশি ধরা সম্ভব হয়, তবে এককা[illegible] যাহারা তাহার বক্ষবিদীর্ণ করিয়া মহা শূন্যের সংবা[illegible] লইতে ছুটিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে আবার তাহারই বক্ষে আশ্রয় লইতেছে। বসুন্ধরার এক্ষণে সঞ্চয় কাল, সে এখন নিজের ভাণ্ডার হইতে একটু রেণুকণাও অন্যত্র যাইতে দেয় না।

উল্কা শরীরে প্রধানতঃ লৌহ, নিকেল প্রভৃতি ধাতু বিদ্যমান দেখা যায়। ঐ দুই পদার্থ প্রায় সকলের শরীরেই আছে। ভিন্ন ভিন্ন পিণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থও পাওয়া যায়। উল্কা সেকেণ্ডে ২০ মাইল চলে; এত দ্রুতগতি আর কাহারও নাই।

ধূমকেতু।

ধূমকেতু আমাদের সৌর-জগতের খাস অধিবাসী নহে, তাহারা বিশাল বিশ্ব-জগতের অধিবাসী। বিশ্ব পর্য্যটনে তাহারা নিযুক্ত আছে। ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সৌর-জগতের সীমায় পদার্পণ করে, তখন ঊর্ণনাভজালে মক্ষিকার মত সূর্য্যের করায়ত্ত হইয়া পড়ে। উহাদের ভ্রমণ-কক্ষও বৃত্তাভাস বটে, কিন্তু গ্রহকক্ষের ন্যায় ellipse নহে; উহাদের কক্ষের আকার ইংরাজিতে Parabola নামক ক্ষেত্র সদৃশ। Parabolaও একপ্রকার ellipse বলিলেই হয়; উভয়ের পার্থক্য এই যে ellipseএর দুইটি কেন্দ্রই এক সসীম ক্ষেত্রে থাকে, কিন্তু parabolaর একটি নাভি সসীম ক্ষেত্রে ও অপর নাভি অনন্তপথ দূরে অবস্থিত থাকে। এই জন্য ধূমকেতুর আগম নির্গম ঠিক করিয়া বলা সুকঠিন। তবে যাহারা সূর্য্যের নিকট ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ অনেকটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ধূমকেতু বাষ্প বেষ্টিত সূক্ষ্ম রেণু সমষ্টি। এই জন্য অনন্তশূন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার দেহ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এতদতিরিক্ত তথ্য আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।

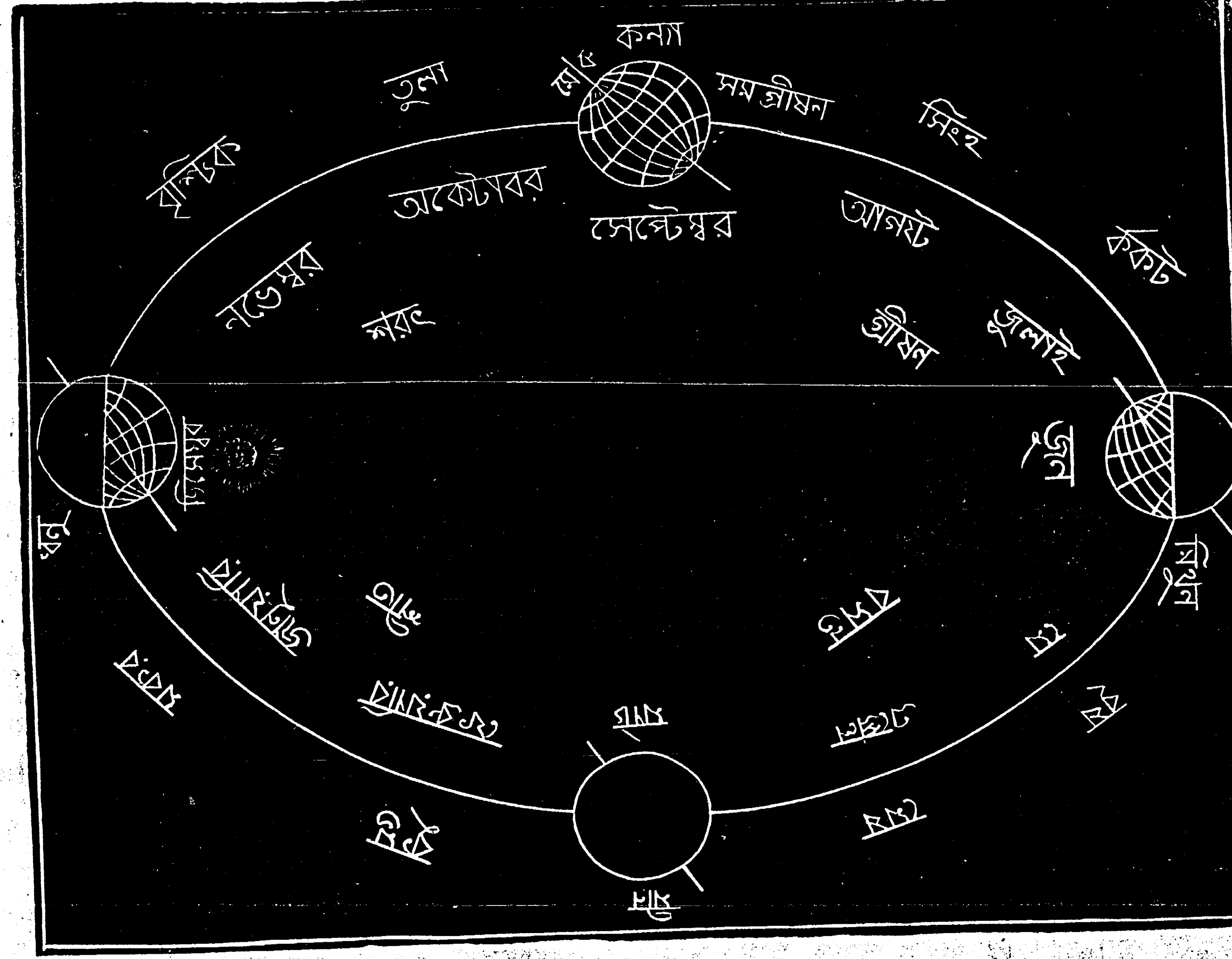

রাশি চক্র।

প্রাচীনকালের জ্যোতিষিগণ সূর্য্যের আনুমানিক নভো-[illegible]কে (বাৎসরিক পথ) কতকগুলি তারকাপুঞ্জের চিহ্ন [illegible]ধিয়া ১২ অংশে ভাগ করেন। প্রত্যেক ভাগের তারকা- [illegible] এক একটি জন্তুর আকার সদৃশ, এজন্য জন্তু প্রভৃতির [illegible] তাহাদের নামকরণ হইয়াছিল।

ঋতু বিপর্য্যয়।

পৃথিবীর গতি ও সূর্য্য ও পৃথিবীর সংস্থান পরম্পরায় আমাদের পৃথিবীতে ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে যে পৃথিবীর অক্ষদণ্ড ও সূর্য্য ঠিক সমকোণে অবস্থিত থাকে না, এবং ইহার ফলে সূর্য্য একবার নিরক্ষবৃত্তের নিম্নে পড়ে ও আবার নিরক্ষবৃত্তের

উপরে উঠে। আবার সূর্য্য বৃত্তাভাসের এক নাভি অধিকার করিয়া রহিয়াছে বলিয়া পৃথিবী একবার সূর্য্যের অতি নিকটে, আর বার সূর্য্যের অতি দূরে যাওয়া আসা করিয়া থাকে। এই সকল কারণে ঋতু বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়।

পৃথিবীর মধ্যরেখা ও ভূচক্রের মধ্যরেখা সমসূত্রপাতে যেখানে মিলিত হয়, তাহার নাম ক্রান্তিপাত। ঐ ক্রান্তিপাত হইতে উত্তর দক্ষিণে লম্বা যে একটি রেখা আমরা কল্পনা করিয়া থাকি, তাহার নাম বিষুবরেখা। পৃথিবীর গতিতে সূর্য্য ঐ রেখার ২৭ অংশ উত্তরে ও ২৭ অংশ দক্ষিণে গমন করে, তাহার নাম অয়নগতি। এক অয়নাংশ গমনের কাল ৬৬।৮ মাস; এই অয়নাংশ গতিদ্বারা দিবা রাত্রির ব্যত্যয় হইয়া থাকে। যে বৎসর অয়নাংশ শূন্য সেই বৎসর ৩০ চৈত্র ৩০ আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হয়; কারণ, ঐ দিবস সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে ক্রান্তিপাতে গমন করে। ঐ অয়নাংশ ক্রমে যত অংশ বৃদ্ধি পাইবে, ততদিন পূর্ব্বে দিবারাত্রি সমান হইবে। এক্ষণকার অয়নাংশ ২১, অতএব এক্ষণে ৯ চৈত্র ও ৯ আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হইতেছে। বিষুবরেখাস্থ স্থান সকলে দিবারাত্রি চিরদিনই সমান থাকে।

সূর্য্যের গতির উত্তর সীমা কর্কট রাশি ও দক্ষিণ সীমা মকর রাশি। যে কোন মানচিত্রে কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট দেখা যাইবে। কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তির মধ্যস্থিত স্থান গ্রীষ্মমণ্ডল অর্থাৎ ঐ স্থানের ভিতর সূর্য্য অবস্থিতি করে বলিয়া ঐ স্থান পৃথিবীর মধ্যে অধিক উত্তপ্ত। গ্রীষ্মমণ্ডলের উভয়পার্শ্বে সমমণ্ডল; তৎপরে মেরু সন্নিহিত প্রদেশের নাম মেরু বা শীত মণ্ডল।

গ্রীষ্ম মণ্ডল ও সমমণ্ডলেও সূর্য্য ও পৃথিবীর সংস্থান বশতঃ তাপের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জুন বা আষাঢ় মাসে পৃথিবী সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া যায়। তখন সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উপরে থাকে; ইহাতে যে যে দেশ নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে অবস্থিত সেই সেই দেশ উষ্ণ হইয়া উঠে। নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণ অংশ শীতল হইয়া পড়ে। আবার ডিসেম্বর বা অগ্রহায়ণ মাসে পৃথিবী জুন মাস অপেক্ষা তিন লক্ষ মাইল সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়। তখন সূর্য্য বিষুবরেখার দক্ষিণে পড়ে; ইহাতে বিষুবরেখার উত্তরে শীত ও দক্ষিণে গ্রীষ্ম হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবী ডিসেম্বর মাসে শীতের সময় সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় ও জুন মাসে গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের তফাতে চলিয়া যায়। আবার ডিসেম্বর মাসে সূর্য্য সন্নিহিত হইলেও জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে অধিক শীত হয় এবং জুনে নিকটবর্ত্তী হইলেও জুলাই আগষ্টে অধিক গ্রীষ্ম হইয়া থাকে। শীতকালে সূর্য্যের নিকটে ও গ্রীষ্মকালে তফাতে পৃথিবী না যাইলে শীত গ্রীষ্ম আরও ভীষণ হইত, এই জন্য বিধাতার এই নিয়ম।

সূর্য্য যখন ঠিক মাথার উপর আইসে, তখন পৃথিবী অধিক তাপ পায়। আমরা কিন্তু ১২টা অপেক্ষা ১টা ২টার সময় অধিক তাপ অনুভব করি; ইহার কারণ ১২টা পর্য্যন্ত পৃথিবী যে তাপ আত্মস্থ করিয়া লয় ১২টার পর সূর্য্য পশ্চিমে হেলিলে, তাহা পুনরায় উদ্গিরণ করিতে থাকে; ইহাতেই তৎকালে অধিক তাপ অনুভূত হয়। যেমনি রাত্রে ১টা ২টার সময় সর্ব্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা হয়, তৎপরে তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পূর্ব্ব চিত্র হইতে দিবারাত্রি সংঘটন প্রণালী স্পষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। মেরু প্রদেশে সূর্য্য সর্ব্বদাই দিগ্বলয়ের ধারে থাকে, কখনও মাথার উপরে উঠে না। তাহার কারণ, সূর্য্য উত্তরে কর্কটক্রান্তি ও দক্ষিণে মকরক্রান্তি অতিক্রম করে না; এজন্য সূর্য্যকে সর্ব্বদাই মেরুর দিগ্বলয়ে থাকিতে হয়। যখন সূর্য্যের উত্তরায়ণ, তখন সূর্য্যকে ছয় মাস কাল বিষুবরেখার উত্তরে থাকিতে হয়; এবং তখন উত্তর মেরুর দিগ্বলয়ে নিয়ত ছয় মাস কাল সূর্য্য পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। আবার দক্ষিণায়ন সময়ে দক্ষিণ মেরুর সদৃশ অবস্থা ঘটে। যখন এক মেরুতে ছয় মাস দিন, তখন অপর মেরুতে ছয় মাস রাত্রি চলিতে থাকে।

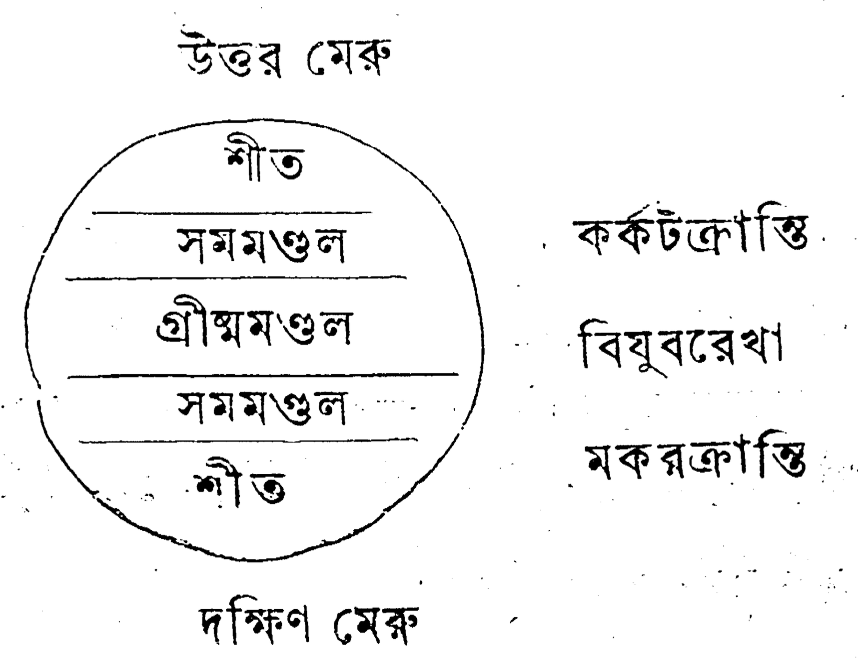

উপসংহার।

বাল্যকালে হেঁয়ালি প্রশ্নে শুনিতাম, "এক থাল সুপারী, গনতে নারে বেপারী"। কিন্তু এখন এই সুপারীবেপারীদের ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আকাশে আমরা যে সকল নক্ষত্র দেখি, তাহারা (আমাদের পরিচিত গ্রহ উপগ্রহাদি বাদে) এক একটি সূর্য্য; স্ব স্ব জগতের রাহু গ্রহ উপগ্রহের অধীশ্বর। উহারা অগণ্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ৮ মিনিট সময় লাগে, ইহাতে সূর্য্য উদিত হওয়ার ৮ মিনিট পরে আমরা সূর্য্য দেখিতে পাই *। আলোকের গতি কত দ্রুত ইহা হইতে বুঝা যাইবে। কতকগুলি নক্ষত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; অর্থাৎ তাহাদের আলোক সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া এতদিনে আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছিয়াছে। বুঝুন, সে সকল নক্ষত্রের দূরত্ব। এমনও অনেক নক্ষত্র আছে, যাহাদের আলোক আজও পৌঁছে নাই, কবে পৌঁছিবে তাহার স্থিরতা নাই।

এ. বেরি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, দিগ্বলয় বেষ্টিত নভোমণ্ডলে এককালীন আমরা নগ্নচক্ষে দুই সহস্রের অধিক জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই না। ইহা বিলাতের কথা; কুজ্ঝটিকা ও মেঘ সেখানে সদা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। আমাদের মত নির্ম্মলাকাশে দ্বিসহস্রাধিক নক্ষত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিগম্য হয়, সন্দেহ নাই।

সূর্য্য ও নীহারিকাই জ্যোতির্ম্ময়। গ্রহ উপগ্রহ সকল পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া থাকে, একথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য।

সৌর জগতের যৎকিঞ্চিৎ রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা; রাহু মনিষী জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এক একটি করিয়া রহস্যাবরণ উন্মোচন করিয়াছেন; দেশে দেশে কালে কালে আরও বহু ঋষি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বহু নূতনতর রহস্য উদ্ঘাটিত করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। তাঁহাদের অসাধারণ অধ্যবসায় ও ক্ষমতা প্রতিভার বিষয় চিন্তা করিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈচিত্র অথবা মানুষের বুদ্ধি বৈচিত্র্য কিসে অধিক বিস্মিত হইব, তাহা স্থির করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* বায়ুতে সূর্য্যকিরণের refraction হয় বলিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (অর্থাৎ সূর্য্য দিগ্বলয়ের উপরে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে) আমরা সূর্য্য দেখিতে পাই। সূর্য্যোদয়মাত্র যদি আমরা আলোক পাইতাম, তাহা হইলে বর্ত্তমান অপেক্ষা ৮ মিনিট পূর্ব্বেই আমরা সূর্য্য দেখিতে পাইতাম।

ভারতীয় জাতীয় জীবনের উপর মুসলমান রাজত্বের ফলাফল।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাই, ভারতে মুসলমান শাসন-কাল তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়া মুসলমান শাসন চলিয়া শেষে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। এই তিন অবস্থার প্রথমটিকে, অরাজক-যুগ, দ্বিতীয়টিকে, মিলনযুগ এবং তৃতীয়টিকে বিচ্ছেদযুগ বলা যাইতে পারে। মিলনেই দৃঢ়তা ও স্থিতি; এবং বিচ্ছেদেই শৈথিল্য ও বিনাশ। মুসলমান শাসনে এই শেষোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছিল বলিয়াই, ইহা ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ভারতীয় জাতীয় জীবনে মুসলমান রাজত্বের ফলাফল বিচার করিতে হইলে, তদুপরি এই তিন অবস্থার ফলাফল পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ অরাজকযুগ—মহম্মদ ঘোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণ ও জয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠানদিগের রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত—দিল্লীর সিংহাসনে বাবরের অধিরোহণ পর্য্যন্ত, এই অরাজকতার অবস্থা। ১১৯৪ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী এই দীর্ঘকাল সমগ্র ভারতবর্ষকে অত্যাচার, অনাচার ও অবিচার স্রোতে একেবারে ভাসাইয়া দিয়াছিল। যদিও মুসলমানগণ ভারতে বাস করিয়া ভারতবর্ষীয় হইতেছিল,

তথাপি জেতৃজিত ভাব ও তৎপ্রসূত ঘৃণা দ্বেষ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। অমিতবলশালী মুসলমান অদম্যপ্রবাহে রক্তনদী বহাইলেও সমগ্র ভারতবর্ষকে আপনার অধীন করিতে পারে নাই। গৃহবিবাদও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বত্রই অশান্তি; তখনও নিশ্চিত হয় নাই, হিন্দু কি মুসলমান ভারতে রাজত্ব করিবে। এই দীর্ঘকালব্যাপী, পাঠান রাজত্বরূপী অরাজক অবস্থার বিভিন্ন রাজবংশগুলির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই, ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

এই অরাজকযুগের প্রথম রাজবংশকে দাসবংশ বলা হইয়া থাকে। ইহার স্থিতিকাল ১২০৬ হইতে ১২৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। যদিও ইঁহারা প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ বা আর্য্যাবর্ত্তকে আপনাদের অধীন করিয়াছিলেন, দক্ষিণ ভারতবর্ষ ইঁহাদের অধীনতা স্বীকার করে নাই, হিন্দুদিগের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনের কোন চেষ্টা করা হয় নাই; কোনও উচ্চ রাজপদে হিন্দু কর্ম্মচারী ছিল না। জেতৃজিত ভাব পূর্ণমাত্রায় উভয়জাতির মনের উপর আধিপত্য করিতেছিল। এদিকে গৃহ-বিবাদও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সিন্ধু, বাঙ্গালা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা মধ্যে মধ্যেই বিদ্রোহীপতাকা উড্ডীয়মান করিয়া স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেন। নিজেদের মধ্যে এই আত্মদ্রোহিতা; হিন্দুদিগের সঙ্গে দ্বেষাদ্বেষী; তাই দাস রাজবংশ দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

এই অরাজকযুগের প্রথম রাজত্বের ফলাফল এখন একবার বিচার করা যাউক।

হিন্দুদিগের যে জাতীয় জীবন আপনা হইতে স্তিমিতপ্রায় হইয়া আসিতেছিল; এবং যাহা স্তিমিতপ্রায় হইয়াছিল বলিয়াই, মুসলমানগণ ভারতে আধিপত্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই রাজত্বে সেই জাতীয় জীবনের নিস্তেজতা ক্রমেই বিজিত হিন্দুদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। ইঁহাদের জাতীয় জীবন নিস্তেজ হইবার প্রধান কারণই হইয়াছিল, ভারতে তখন একছত্র কোন রাজা ছিলেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া, ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহার যাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বার্থ ও প্রতাপ লইয়া ইঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমগ্র ভারতের কথা কাহারও মনে হইত না। ভারতবর্ষ যে একটি দেহ স্বরূপ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি যে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ; এবং এই গুলির স্বার্থ যে সমগ্র ভারতের স্বার্থের সঙ্গে ও নিজেদের মধ্যে ঐক্যতা ও এক দেহিত্ব বোধের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত, তাহা কাহারও মনে হইত না। শরীরের একটি অঙ্গের অনিষ্ট সাধিত হইলে যে, সমস্ত শরীরের অনিষ্ট সাধিত হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মধ্যে ঐক্যতা ও সামঞ্জস্য না থাকিলে যে সমস্ত শরীরটা নষ্ট হইবার কথা, ইহা স্বার্থ-লোলুপ এই ক্ষুদ্র রাজগণ বুঝিয়াছিলেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া কালক্রমে এক দেহিত্ব ও এক জাতিত্ববোধ ভারতবাসীদিগের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল বলিয়াই, মুসলমানের ভারত প্রবেশ ও ভারত অধিকার অত সুখকর হইয়াছিল।

ভারতে লব্ধপ্রবেশ হইয়া, মুসলমান যখন জেতৃজিত ভাব-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল, হিন্দুদিগের সহিত সৌহৃদ্যস্থাপনের কোন চেষ্টাই যখন ইহারা করিলেন না, তখন আবার হিন্দুগণ চক্ষু মেলিয়া চাহিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান-বিজাতীয়, ম্লেচ্ছ; আপনারা হিন্দু এক জাতি—তাঁহাদের মনে এই ধারণা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতীয় জাতীয় জীবনের উপর দাসরাজত্বের এই ফল ফলিল যে, হিন্দুগণ স্বকীয় জাতীয় জীবনের অভাব ও তৎপ্রসূত অসুবিধার দিকে চক্ষু মেলিতে শিখিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশীয় স্বার্থ কেমন করিয়া জাতীয় দেশীয় স্বার্থের নিকট বলি দিতে হয়, তাহা শিখিতে আরম্ভ করেন নাই।

দ্বিতীয় রাজবংশকে খিল্‌জির বংশ বলা হয়: ইহা ১২৯০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। এই রাজত্বে যদিও মুসলমান অধিকার দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; যদিও সম্রাট্ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, চিতোর-দুর্গ যদিও আলাদিন-কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা ছিল না। মুসলমানগণ নিজেরা আত্মদ্রোহী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল; নিজেদের মধ্যে রাজদ্রোহীতা ও রাজহত্যা প্রায় প্রতিনিয়তই সাধিত হইত। এদিকে হিন্দুগণও ক্রমে ক্রমে নিজেদের অধিকার

হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল, রাজপ্রসাদভোগও তাহাদের অদৃষ্টে হইল না। সকল উচ্চপদেই মুসলমান প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর আদর ও গৌরবের জিনিষ ধর্ম্ম ও রমণী, প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে লাগিল। পদ্মিনী, কমলা দেবী ও দেবল দেবীর কথা হিন্দু-হৃদয়ে শেলাঘাত করিল। জাতি, ধর্ম্ম ও রমণীর প্রতি সম্মান —যাহা জাতীয় জীবনের মূল উপাদান—তৎসমস্তই মুসলমানগণ অবমাননা করিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতেও গভীরতর ভাবে, হিন্দু জাতীয় জীবনের অভাব বোধ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে স্বার্থপরতা ও আত্ম-বিচ্ছেদের ভাব হিন্দু-হৃদয়ে অধিকার করিয়াছিল, তাহা এতই গভীর, এতই দৃঢ় হইয়াছিল যে, কেমন করিয়া ব্যক্তিগত কি প্রাদেশিক স্বার্থ, জাতীয় ও দেশীয় স্বার্থের নিকট উৎসর্গ করিতে হয়, হিন্দুগণ তখনও তাহা শিখেন নাই; তাই আত্মদ্রোহী মুসলমান, বংশের পর বংশ, ভারতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় তোগলক্ বংশ—১৩২০ হইতে ১৪১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় একশত বৎসর কাল। এই রাজবংশ দীল্লির সিংহাসনপূর্ণ করিয়াছিল। এই বংশীয় রাজগণ প্রায়ই রাজনীতি অনভিজ্ঞ, এবং রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। প্রজাভক্তির উপর সুদৃঢ় প্রোথিত না হইলে যে, রাজশক্তি স্থায়ী ও শুভ হইতে পারে না, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির অতীত ছিল। মুসলমান সেনাপতিগণ স্ব স্ব প্রধান হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ আত্মদ্রোহীতার সময় যদি প্রজাশক্তি ও রাজশক্তিতে সদ্ভাব না থাকে, তবে সে রাজশক্তির পতন অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। তাই তোগলকবংশের পতন হইল। শুধু, তাহাই নহে, বিস্তীর্ণ পাঠানসাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যসমূহে বিভক্ত হইয়া পড়িল। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ, বঙ্গদেশ, জৌনপুর, গুজরাট ও মালোয়ার স্বাধীন মুসলমানরাজ্যে পরিণত হইল।

মুসলমানরাজত্বের প্রতি হিন্দুর মনে ঘৃণা ও দ্বেষ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, জাতীয় জীবনহীন জাতি একেবারে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। দেশের অরাজকতা দূর করিতে হইলে, যে সাহস যে আত্মবলিদান প্রবৃত্তির প্রয়োজন, তখনও স্বার্থপর ভারত, তাহা শিখে নাই। সংগ্রাম সিংহ কি প্রতাপ সিংহের জন্মিবার সময় এখনও তাহার আইসে নাই। অত্যাচারে অত্যাচারে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে মাত্র। এটুকুও শুভ বলিতে হইবে।

ইহার পরে, এই অরাজকযুগের আরও দুই বংশ, সৈয়দ ও লোদী ক্রমান্বয়ে ১৪১৪ হইতে ১৪৫০ ও ১৪৫০ হইতে ১৫২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দীল্লিতে রাজত্ব করিয়াছিল। সৈয়দবংশ অত্যন্ত হীনবল ছিল; ইহাদের অধিকার দীল্লির বাহিরে বড় বেশী দূর বিস্তৃত হইয়াছিল না, লোদীবংশের প্রথম দুই রাজা যদিও প্রতাপান্বিত ছিলেন, দীল্লি সিংহাসনের ক্ষমতা যদিও ইঁহারা জৌনপুর এবং বিহার ও উত্তর ভাতরবর্ষে বিস্তার করিয়াছিলেন, তথাপি ইঁহাদের বংশ অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই, তৃতীয় রাজা সর্ব্বথা অকর্ম্মণ্য ছিলেন; ইঁহার অত্যাচারে সমগ্রদেশব্যাপী অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। শেষে বাবর আসিয়া, ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাঠানরাজত্বের পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিলেন।

এতদিনে ভারতের সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হইয়াছে। পাঠানরাজত্বের দীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতা ও অত্যাচার ভারতবাসীকে জাগ্রত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংগ্রাম সিংহের জন্মিবার সময় হইয়াছে। কিন্তু এ সব হইলে কি হইবে? বিধাতার ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ। কোথা হইতে বাবর আসিয়া ভারত আক্রমণ করিলেন; এই বৈদেশিক আক্রমণের পূর্ব্বে সংগ্রাম সিংহ যদি জাতীয় জীবনে জীবিত হইতেন, যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে অঙ্কুর জন্মিবার অবসরটুকু হইলেও বোধ হয়, ভারতবর্ষের অদৃষ্ট অন্যভাব ধারণ করিত; হিন্দুস্থান আবার হিন্দু রাজা বক্ষে ধারণ করিত।

এতকথা বলিলাম শুধু বাবর আসিয়া দীল্লির সিংহাসনে বসিয়াছেন বলিয়া নহে,—তিনি আসিয়া ভারতের রাজশক্তির গতি অন্যদিকে প্রবর্ত্তিত করিলেন বলিয়া। অত্যাচার, অনাচার—যাহা আঘাতে আঘাতে ভারতকে জীবিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—ক্রমে ক্রমে সে সকল রুদ্ধ হইতে লাগিল। হিন্দু মুসলমানের দ্বেষাদ্বেষী ভাব তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু বাবরের এই সুনিয়ম, ইন্দ্রিয় সুখের ন্যায় আপাততঃ মধুর হইয়া সর্ব্বনাশ

সাধন করিল। যে মিলনের যুগ বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া আওরঙ্গজেবের সিংহাসনাধিরোহণ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, যদি সেই মিলনের অবস্থা ভারত ভাগ্যে না ঘটিত, সঞ্জীবনী পূর্ব্ব অরাজক অবস্থা যদি আর শত বৎসর মাত্র চলিত, ভারত আজ "ইণ্ডিয়া" না হইয়া হিন্দুস্থান হইত, তাই এতকথা বলিলাম। বাবর যাহা করিয়াছিলেন, আকবর আবার তাহার শতগুণ করিয়া ছাড়িলেন। পিতামহ হইতে তিনি আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন, হিন্দু মুসলমান একলা হইলে, এ দুই মোগলসাম্রাজ্যের দুই স্তম্ভ-স্বরূপ প্রোথিত না হইলে, কিছুতেই মুসলমান শাসন ভারতে চিরস্থায়ী হইতে পারিবে না। বাবরের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন, স্বার্থপরতার যে মোহমন্ত্রে বীর সিংহ হিন্দু নিদ্রাবেশে অলস অবশ হইয়া পড়িয়াছে, পাঠানশাসনের অরাজকতায় তাহার সে মোহমন্ত্র হৃত-শক্তি হইয়াছে, সামান্য একটু তন্দ্রামাত্র আছে, এ তন্দ্রা লইয়াই সংগ্রাম সিংহ কি বৃহৎকাণ্ড করিতে বসিয়াছিল। যদি সেই অরাজকতার অবস্থা সত্বর রুদ্ধ না হয়, তবে এ তন্দ্রাটুকুও যে আর থাকিবে না। এই তন্দ্রা লইয়া প্রতাপ সিংহ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড না করিয়া ফেলিল। তন্দ্রা ভঙ্গে যখন ভারত নয়ন মার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া বসিবে, তখন যে আর তাহার নিকট তিষ্ঠান ভার হইবে। এত সব বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে হিন্দু মুসলমানের বৈষম্য তিরোহিত করিতে লাগিলেন। এবং তিনি এই সঙ্কল্পসাধনে অত চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই, যখন তন্দ্রাবেশেও প্রতাপ সিংহ সিংহগর্জ্জনে "দীল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো"কে প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। মহাবলশালী মানসিংহ প্রমুখ হিন্দুবীরগণের তখনও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তাই ভারত জাগিতে জাগিতে আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর শাজাহানও পিতৃ পিতামহের পদানুসরণ করিয়া, ভারতের নিদ্রা আরও গভীরতর করিলেন।

ইহাই মুসলমান রাজত্বের মিলনের অবস্থা। এ সময়েই হিন্দু মুসলমান এক জাতি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি এ সময়েই সুদৃঢ় প্রোথিত হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, এই ভারত স্থায়ীরূপে মুসলমানের পদানত হইল। তাহার অদৃষ্টে যে নূতন দাসত্ব, রহিয়াছে, তখন তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু কি অশুভক্ষণেই আওরঙ্গজেব জন্মিয়াছিল। সুর্পনখার ন্যায় স্বর্ণলঙ্কা একেবারে শ্মশান করিয়া ফেলিল।

কিন্তু এই মিলনযুগও ভারতের পক্ষে এক প্রকার শ্রেয়স্কর ছিল; "নেই মামার চেয়ে কাণা ভাল"। মুসলমান ভারতে বাস করিয়া ভারতবাসী হইয়াছিল, সতীনকে ভরণপোষণ করিবার জন্য ভারতের আর ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইত না। মুসলমান স্বামী হোক তবু ভারতের সপত্নী ছিল না। "সতীনের বড় জ্বালা লো!" তাহাকে গাইতে হইত না। বড় জোর সে বলিত "পেঁয়াজ রসুন গন্ধে মোর নাড়ী উল্টে যায়", তবু ভারত তখন স্বামী সোহাগিনী ছিল, সেই মিলনের অবস্থা আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলে হিন্দু মুসলমান যে এতদিনে এক হইয়া যাইত; পেঁয়াজ রসুনের গন্ধে যে, ভারতবাসী এতদিনে ঘরে ঘরে অভ্যস্ত হইয়া পড়িত। এখন আর কোন দুঃখ কষ্টই থাকিত না, বিশেষতঃ জাহাঙ্গীর বাদশাহের ন্যায় কত শত হিন্দু-জননীর গর্ত্ত-প্রসূতসন্তান দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিত! তাঁরা যে "হরিহরের" ন্যায় হিন্দুমুসলমান উভয়ই হইত, শাক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় হিন্দুমুসলমান উভয়ই যে তাহাতে তৃপ্ত হইত! কিন্তু হায়! কি কুক্ষণেই আওরঙ্গজেব জন্মিয়াছিল! সতীনের বাড়ীতে বিষ্টা মাড়িয়া না খাইলে বাটী নষ্ট হয় না; তাই নিজেও বমি করিয়া মরিল! বাটীও নষ্ট করিয়া গেল, সতীনও যেন অনাহারে মরে! ধন্য বিধাতা! ধন্য তোমার সৃষ্টি!

হিন্দুর জাতীয়জীবনের পক্ষে যদিও এই মিলনযুগ অত্যন্ত অশুভ হইয়াছিল; হিন্দুর যে জাতীয়জীবন পুনর্গঠনের আশা পাঠানশাসন সময় হইয়াছিল, যদিও এইযুগে তাহা সদূরপরাহত হইয়া পড়িল, অন্যদিকে ইহাতে একটী বৃহৎ জাতীয়জীবন গঠিত হইবার আশা হইয়াছিল। আরও একশত বৎসর এ মিলনের যুগ চলিলে, হিন্দু মুসলমান এক হইয়া, এক মহাজাতির সৃষ্টি হইত—তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জাতীয়জীবন মিলিয়া অপূর্ব্ব ও অদম্যশক্তি এক মহাজাতীয়জীবন গঠিত হইত—এক সঙ্গে হিন্দু মুসলমান উভয়ের গুণ মিলিত হইয়া, বিদ্যা-বুদ্ধি শারীরিক মানসিকবলে ভারত আবার পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইত। কিন্তু ভারত, জয়চন্দ্রের মত পুত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, তুই বুঝি চিরজন্মের মত বিধাতার অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছিস্!

এই মিলনযুগ আওরঙ্গজেবের সিংহাসনাধিরোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তাঁহার শাসন সময়ে মোগল সাম্রাজ্য যে ঐশ্বর্য্যে, ক্ষমতায় ও বিস্তৃতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী এই মিলনযুগই তাহার কারণ। এই যুগে হিন্দুর জাতীয়জীবন ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। রাজ-প্রসাদ উপভোগ করিয়া হিন্দু জেতৃ-জিত-ভাব ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হিন্দু পরাধীন জাতি, যত সহজে প্রভু-দ্বেষ বিস্মৃত হইয়াছিল, মুসলমান প্রভুজাতি তত সহজে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। আরও কয়েক বৎসর এই মিলনের যুগ চলিয়া, মুসলমানজাতি হিন্দুদ্বেষ বিস্মৃত হইলে, আওরঙ্গজেবের মত হিন্দুদ্বেষী সম্রাট যদি ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করিত, (এবং কয়েক বৎসর পরে এতাদৃশ সম্রাট সম্ভবপর হইত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে) তাহাতে বড় কিছু অনিষ্ঠ হইত না। সমগ্র মুসলমানজাতি হিন্দুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তৎপ্রতি অত্যাচার ও অনাচার প্রতিষ্ঠিত হইতে দিত না। কিন্তু ভারত ও মোগল-সাম্রাজ্য, উভয়ের দুরদৃষ্টবশতঃ, মুসলমান হিন্দুজাতিকে ভালবাসিতে না বাসিতেই মিলনযুগের সুখ-স্বচ্ছন্দতায় হিন্দু আবার জাতীয়জীবন হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে, আওরঙ্গজেব মোগল-শাসন-দণ্ডধারণ করিলেন। ইহার পরিণাম হইল, মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও ভারতের দৃঢ়তর দাসত্ব! মিলন-যুগের পূর্ব্বে যে হিন্দু স্বার্থপরতার মোহমন্ত্র ভেদ করিয়া, জাতীয়-জীবনে জীবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, মিলন-যুগে জেতৃ-জিত-ভাব বিস্মৃত হইয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিয়া, আবার তাহারা স্বার্থপরতায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে হিন্দুবীরগণ আসিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ দণ্ডায়মান হইলে, সে সাম্রাজ্য অমিতবলশালী হইয়া পড়িল। নিজেদের নিজস্ব ভুলিয়া হিন্দু যখন হিন্দুভাবে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তখন আওরঙ্গজেব কার্য্যতঃ মুসলমান সম্রাট হইলেন। মিলন-যুগের সম্রাটগণ জাতিতে মুসলমান হইলেও সম্রাটভাবে হিন্দুমুসলমান উভয়ই ছিলেন। বিচ্ছেদ-যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া, আওরঙ্গজেব মুসলমান সম্রাট হইলেন, হিন্দুর আবার তন্দ্রা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, সত্য, কিন্তু সে তখন বেশ বুঝিতে পারিল এ তন্দ্রায় যে হিন্দুত্ব হারাইয়াছে; হিন্দুর সে বলবীর্য্য আর নাই--জাতীয়-জীবনের আশা এখন সম্পূর্ণ সুদূর-পরাহত। দুঃখের দিনে যে হিন্দুজাতি আসিয়া আবার একত্র হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, মিলন-যুগের সুখস্বচ্ছন্দতায় আবার তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বার্থপরতার ক্ষুদ্রগণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, হিন্দু জাতিগত, ধর্ম্মগত, রমণী-গত সকলপ্রকার শুভসংস্কার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। জাতীয়-জীবনের মূল উপাদান—জাতি, ধর্ম্ম, ও রমণীর প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বিস্মৃত হইয়া হিন্দুর এখন আর এমন শক্তি নাই যে, মুসলমানশক্তির গতিরোধ করে। এমতাবস্থায়, দুর্ব্বলে সবলে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইলে, বুদ্ধিমান দুর্ব্বল আত্মরক্ষার জন্য যাহা করে, হিন্দুরও এখন তাহাই একমাত্র সম্বল হইল। ক্রূরতা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা এখন হিন্দুর আত্মরক্ষার অস্ত্র হইল। ঋজুপাঠের শশক যেমন করিয়া ভাস্বুরক সিংহকে বিনাশ করিয়াছিল, হিন্দুশশক মুসলমান সিংহকে বিনাশ করিবার সেই উপায় অবলম্বন করিল। কিন্তু সে শশক কূপে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিল, হিন্দুশশক মুসলমানসিংহকে কূপ দেখাইতে যাইয়া, সিংহ কূপে লম্ফপ্রদান করিবার সময় তাহার পায়ের বাতাসে আপনিও কূপে পতিত হইল। ভারত মুসলমান অধিকারে আসিবার আগেই ইহা ঘটিয়াছিল; ইংরেজ অধিকারেও তাহাকে এই ভাবেই আসিতে হইয়াছে। আত্মদ্রোহীতা, ঈর্ষ্যা, ও দ্বেষেই ভারতের পতনকারণ।

যখন শিবজি আওরঙ্গজেবসহ সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে সময়ে হিন্দুর একতা থাকিলে ভারত হইতে মুসলমানসাম্রাজ্য বিলুপ্ত ত হইতই, হিন্দুস্থান স্বাধীনও হইত। কিম্বা এই শিবজীর মিলন-যুগের অব্যবহিত পরেই জন্ম না হইয়া, আওরঙ্গজেব ও তদীয় বংশধরগণের অত্যাচারে অত্যাচারে হিন্দুজাতি আবার ম্লেচ্ছদ্বেষী হইতে আরম্ভ করিলে পর যদি তাঁহার জন্ম হইত, তবে বুঝি ভারতের অদৃষ্ট অন্যপ্রকার হইত।

মুসলমান রাজত্বের আরম্ভকালে, অরাজকযুগের অত্যাচারে হিন্দু জাতীয়জীবন প্রাপ্ত হইতেছিল, ইহার শেষ অবস্থায় বিচ্ছেদযুগে, আওরঙ্গজেব ও তদীয় বংশধরগণের

অত্যাচারে, হিন্দু জাতীয়জীবন প্রাপ্ত না হইয়া, ক্রূরতা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল। মিলন-যুগে যে তাহারা জাতি, ধর্ম্ম, রমণী-প্রীতি, রমণী-সম্মান বিস্মৃত হইয়াছে! ইহা ব্যতীত জাতীয়-জীবন গঠন সম্পূর্ণ অসম্ভব! তাই মিলন-যুগ ও তৎপরবর্ত্তী বিচ্ছেদ-যুগ একত্র হইয়া, হিন্দুজাতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। এদিকে বিচ্ছেদ-যুগে, হিন্দু মুসলমানে আবার জাতিগত বৈষম্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কাজেই মিলনযুগে যে ভারতীয় জাতীয় জীবন গঠনের আশা হইয়াছিল, তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল।

ইহাই হইল মুসলমানরাজত্বে হিন্দুর ও ভারতীয় জাতীয়জীবনের উপর ফলাফল। এখন একবার ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল দেখা যাউক।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

কবি শিবচন্দ্র।

ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁচাদিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বৈদ্য প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র সন্তান একদিন নির্ব্বিবাদে পরস্পর বন্ধুতার সহিত সুখ-শান্তিতে বসতি করিতেন। কালের নিষ্ঠুর তাড়নায় সেই ভদ্রপল্লিখানি আজ বিশ্ব-গ্রাসিনী পদ্মা নদীর বিশাল সলিল গর্ভে চির আশ্রয় প্রাপ্ত। কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে উক্ত গ্রাম নিবাসী বৈদ্য-বংশ সম্ভূত ৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় তিনটি কৃতী সন্তান লাভ করিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুত্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম শিবচন্দ্র, দ্বিতীয় শম্ভুচন্দ্র ও তৃতীয় কৃষ্ণচন্দ্র নামে জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। শিবচন্দ্র কবিত্ব পীযূষস্রাবী—"সারদা মঙ্গল" এবং "সত্য-নারায়ণের পাঁচালী" রচনা করিয়া কবিগণের বরেণ্য আসন-প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শম্ভুচন্দ্র হস্তাক্ষরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে ও বিবিধ শিল্পের অসামান্য নৈপুণ্যে সাধারণে বিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর বলিয়া সমগ্র বিক্রমপুরের প্রথম শিক্ষার্থী বালকগণ কর্ত্তৃক 'আদর্শ' রূপে বহুকাল ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাঁহার শিল্প-কৌশলের প্রশংসা করিতে গিয়া প্রাচীনেরা আজিও নানাপ্রকার গল্প করিয়া থাকেন। শম্ভুচন্দ্রের প্রস্তুত মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকমাত্রেই নাকি তাহা সজীব বলিয়া ভ্রম করিতে বাধ্য হইতেন। এই নিপুণ-শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ ছিল।

কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রজদ্বয়ের ন্যায় গুণগৌরবে খ্যাতি-লাভ করিতে না পারিলেও কৃতিত্বে নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না।

শিবচন্দ্র স্ব-রচিত "সারদামঙ্গল" কাব্যে আত্ম-পরিচয় এইরূপে প্রদান করিয়াছেন;—

"বৈদ্যকুলে জন্ম হিন্দু সেনের সন্ততি।
সেনহাটী গ্রামে পূর্ব্বপুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত।
যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাচিত॥
রত্নেশ্বর গুণিবর তাহার তনয়।
রতন স্বরূপ কুলে হইল উদয়॥
তাঁহার তনয় হৈল ভুবন বিখ্যাত।
রাম নারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনা অতুল।
রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধ কুল॥
গঙ্গাদেবী দত্তক পুত্র তার পবিত্র।
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুপবিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁচাদিয়া গ্রামে ধাম।
ধন্বন্তরি বংশে জন্ম প্রাণনাথ নাম॥
তাঁহার তনয়া মহামায়া নাম তান্।
সালঙ্কারে সুপাত্রে কন্যা কৈল দান॥
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান্।
জনমিল তাঁহার এই তিন সন্তান॥
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম।
সম্প্রতি বসতি স্থান কাঁচাদিয়া গ্রাম॥

শিবচন্দ্রের কবিতাগুলি যেরূপ কবিত্ব-সৌরভে ও ললিত-মধুর-পদ-বিন্যাস গৌরবে সুধীজন সেব্য, তেমন সরল লিপিচাতুর্য্যে তাহা নিরক্ষরেরও দুর্ব্বোধ্য

নহে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে কতিপয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পাষাণময়ী গৌতমী রঘুকুলপতি রামচন্দ্রের পবিত্র চরণরেণু সংস্পর্শে মানবতনু ধারণ করিয়া স্তব করি-তেছেন;—

"তুমি নারায়ণ, তুমি পঞ্চানন,
তুমি ব্রহ্ম গণপতি;
তুমি সৃষ্টিকারী, তুমি গিরিধারী,
তুমি গতিহীনের গতি।
তুমি নিরাকার, তুমি বিশ্বকার,
সকল স্বরূপ তুমি।
তুমি গদাধর, তুমি শশধর,
তুমি জল, গিরি, ভূমি।

স্তবটি কেমন প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। ইহা সেই প্রাচীন যুগের 'কটমট' রচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অন্যত্র:—

রামচন্দ্রের অমৃতময় রাজ্যাভিষেক সংবাদ শ্রবণে কৈকেয়ীর পবিত্র হৃদয় আনন্দোৎসে উছলিয়া উঠিল। সে প্রীতিপ্রফুল্ল মানসে ধাত্রী মন্থরাকে বলিল,—

" * * *

কি শুনালি কাণে অমৃতবাণী
রামচন্দ্র রাজা রাজ্যেতে হবে
নয়ন ভরিয়া হেরিব কবে?
কি শুনালি কাণে অমৃতময়—
প্রাণ দেই তোরে মনেতে লয়।"

কৈকেয়ী আনন্দ গদ্‌গদ স্বরে ইহা বলিয়া—

"গলে হার হীরামণি কাঞ্চনে,
দিয়াছিল রাজা অতি যতনে
মন্থরার গলে দিয়া সে হার,
আনন্দ হরিষে দিছে জোকার।"

কিন্তু নীচাশয়া,—সরলা কৈকেয়ীর পবিত্র হৃদয়ে—কুমন্ত্রণার বিষ ঢালিয়া অযোধ্যার আনন্দ আলোকমালা নির্ব্বাপিত করিল।

"মন্থরা কোপেতে ছিঁড়ি সে হার,
কটু কহে কতমত প্রকার।
যার মেয়ে বটে তার জামাই,
পাড়া পড়শীর কাজ কামাই।
রামচন্দ্র হবে রাজ্যের পতি—
রাজমাতা হবে কৌশল্যা সতী।
দশ বান্দীর এক বান্দী হ'য়ে,
থাইবি কি সুন্দর রূপ ধু'য়ে।
রাজা ছিল তোর বাধ্য তোর কেবল,
কাজে কাজে বুঝা গেল সকল।
তোর পুত্র রাখি দেশ অন্তরে
কৌশল্যার পুত্র ভূপতি করে।"

ইহা শুনিয়া কৈকেয়ী নারীজনসুলভ চঞ্চলতার পরি-চয় দিল। মন্থরার ঈর্ষ্যা সন্ধুক্ষিত কুমন্ত্রণা,-অনল উত্তাপে কৈকেয়ী-হৃদয়ের পবিত্রতা শুকাইয়া গেল।

মন্থরার কুপরামর্শে চঞ্চলা কৈকেয়ী পলকে দেবতার পবিত্র বেশ পরিত্যাগ করিয়া যে প্রলয়ঙ্করী রাক্ষসীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, কবি তাহা সরল মধুর ধ্বন্যাত্মক শব্দে সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন। যথা:—

"ঘন ঘন শ্বাস নাসায় সরে,
থরতর জল নয়নে ঝরে;
থর থর করি কাঁপিছে ত্রাসে।
মর মর করি রোদন আসে।
কট্ কট্ করি দশন কাটে।
ফর্‌ফর্ পরাণ ফাঁটে।
টানি টানি টানি ভূষা ফেলায়।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে একাগ্রে চায়।
কান্দি কান্দি কহে শুনলো ধাই।
তুমি বিনা মোর বান্ধব নাই।" ইত্যাদি।

সমগ্র "সারদামঙ্গল" গ্রন্থখানি এইরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থখানিকে রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যায়। শিবচন্দ্রের কবিত্বশক্তি স্থানে স্থানে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। শিবচন্দ্রের সমসাময়িক কবিদিগের রচনা প্রায়ই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু ইঁহার রচনা সুনীতি-সম্পৃক্ত বলিয়া আমাদের নিকট বেশী ভাল লাগি-য়াছে। রূপ বর্ণনাদিতে যদিও কবি কোনরূপ নূতনত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তথাপি ভাষার গুণে তাহা

প্রীতিপ্রদ। আমরা নমুনা স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। জানকীর রূপ বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন ;—

"———— ————
জানকী তাহার কন্যা শুন নারায়ণ ॥
অতসী কুসুম তার জিনিয়া বরণ।
প্রতিবিম্ব দেখা যায় যেমন দর্পণ ॥
কোটি শরদের শশী জিনিয়া বদন।
অঞ্জনের গর্ব্ব ভঙ্গ কুন্তল শোভন ॥
সাবধানে সখীগণ বন্দিছে সরসে।
মুক্ত হইলে অঙ্গ ঢাকি ধরণী পরশে ॥
তিল ফুল জিনি নাসা, সুদীর্ঘ নয়ন।
কাম ধনু জিনি ভুরু খঞ্জন গমন ॥
বিম্বফল জিনিয়া সুন্দর ওষ্ঠাধর।
লাবণ্যেতে মনোহর রতির নাগর ॥
অপরূপ রূপবতী ভুবনমোহিনী।
হরির কমলা কিংবা হরের ভবানী ॥"

সারদামঙ্গল রামায়ণের ন্যায় অযোধ্যা প্রভৃতি সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। সারদামঙ্গল ছাড়া কবি শিবচন্দ্রের "সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পাঁচালী" নামক আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। পাঁচালীখানিও "সারদামঙ্গলের" ন্যায় সরল মধুর ভাষায় লিখিত। বিক্রমপুরের বহু গৃহে এই পাঁচালীখানি আজিও শ্রদ্ধার সহিত পঠিত বা গীত হইয়া থাকে। পাঁচালীর রচনালালিত্যও আস্বাদযোগ্য। নিম্নে কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

নারায়ণকে অবজ্ঞা করাতে ঘাটে জামাতার সহিত সাধুর নৌকা ডুবিয়া গেল। এই আকস্মিক বজ্রনির্ঘাতবাণী শুনিয়া সাধুপত্নী যে করুণ বিলাপ করিয়াছে, তাহা বস্তুতঃ প্রাণস্পর্শী ঃ—

"শুনিয়া নির্ঘাত বাণী, সাধুসুতা সুবদনী,
পড়িল কান্দিয়া ধরা'পর।
কমল যুগল করে, হানিছে মস্তক 'পরে,
নয়নেতে ধারা খরতর।
ওহে প্রভু প্রাণনাথ, বজ্রাঘাত অকস্মাৎ,
নিজ নারী পরেতে হানিলা।
যাইতে প্রবাস পথে, কত বুঝাইনু তাতে,
ঘাটে আসি সব বিস্মরিলা।
চিরকাল পরবাস, মনেতে করেছ আশ,
দেখিব বদন শশধর।
আশানদী হৈল দূর, যৌবনের গর্ব্ব চুর,
হেলাতে করিলা প্রাণেশ্বর।
নারীর জীবন পতি, পতি রমণীর গতি,
নারীর বসন ভূষা পতি।" ইত্যাদি।

পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে অতীতের তিমিরাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে শিবচন্দ্রের ন্যায় বহু মূল্যবান্ মণিমাণিক্য উদ্ধার করিতে পারা যায়।

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

সংসারের সুখ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজি শনিবার। জীবনসংগ্রামের জন্য কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ছয়দিনের পর একদিনের তরে বিশ্রাম ও শান্তিলাভ আশয় শচীন্দ্রনাথ আজি কলিকাতা হইতে বাটি আসিলেন। যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বহির্বাটী হইতে শুনিলেন, ভিতরে অস্বাভাবিক গোলমাল হইতেছে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, বাহির হইতে মনঃসংযোগপূর্ব্বক সব শুনিতে লাগিলেন। কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা ভাল বুঝিলেন না; এইমাত্র মাতাঠাকুরাণী বধূদ্বয়ের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া অনেক বাক্যযন্ত্রণা ও অযথা বলিয়া গালি দিতেছেন, আর বিধবা কনিষ্ঠা ভগ্নী মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহায়তা করিতেছে। মাতা কেবলমাত্র বধূকে গালি দিয়াই নিরস্ত নন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উর্দ্ধতম পুরুষকেও তাহার অংশ প্রদান করিতে ছাড়িতেছেন না।

এই শেলসম বাক্যবাণ কাহার উপর বর্ষিত হইতেছে এবং তাহার অপরাধের সীমা কতদূর তাহা যদিও শচীন্দ্রনাথ আদৌ অবগত নহেন, তথাপি তিনি কতকটা অনুমানে

নির্ণয় করিলেন। তাঁহার অনুমান মাতাঠাকুরাণী ও ভগ্নীর লক্ষ্য আর কেহ নহেন, তাঁহারই স্ত্রী কমলা। মনে মনে এরূপ স্থির করার কারণ আছে। শচীন্ মাসের মধ্যে অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ দিন কলিকাতায় থাকিলেও তিনি জানিতেন, কমলাকে সর্ব্বদাই সামান্য বা বিনা কারণে মাতাঠাকুরাণী, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া ও কনিষ্ঠা ভগ্নীর নিকট হইতে লাঞ্ছনা ও বাক্যযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে ও নীরবে সকল নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। ছোট বৌয়ের প্রতি তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি অধিক একথা শুধু শচীন্দ্র কেন, প্রতিবেশী রমণিবর্গের মধ্যেও অনেকে জানেন। এতদ্ভিন্ন তিনি শুনিলেন, মাতা বলিতেছেন—"বাপের ধনের গুমরে আর সোয়ামী উপায় করেন বলে, আর গুমর ধরে না; দিন রাত্ পায়ের উপর পা দিয়ে দোতলায় ব'সে আছেন। ব্যামো হয়েছিল, মলেও আপদ চুকে যেত, যম যে ভুলে আছে।" বধূদের মধ্যে পিতার ধনের খোঁটা ও স্বামীর অর্থোপার্জ্জনের উল্লেখ করিলে, শচীন্দ্রনাথকে যত সহজে অনুমিত হয়, এত আর কাহাকেও হয় না। সুতরাং এইসকল কারণে শচীন্দ্রনাথ মনে মনে যাহা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে।

সংসার তোমার চরণে কোটী নমস্কার। আজ প্রাতে কলিকাতার বাসায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে, যখন শচীনের নিদ্রালস-কাতরনয়নে বালারুণদ্যুতি প্রথম প্রতিভাসিত হয়, তখন সর্ব্ব প্রথম কথা কি মনে করিয়াছিলেন, কোন আশায় তাঁহার শান্ত পিপাসিত প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছিল,সেই প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণে দিবসের কার্য্য ও কর্ত্তব্য অবসানের শেষ মুহূর্ত্তের জন্য ব্যাকুলতার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন কিসের জন্য? ছয় দিনের বিরহের পর বাটী আসিবার জন্য; পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নীপূর্ণ সংসারে আসিয়া তৃষিত তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্য। সংসার অর্ণবের মোহময় অপূর্ব্ব মদিরাপানে একটি দিনের জন্য বিভোর হইয়া থাকিবার জন্য। কিন্তু হায়! প্রকৃত সুখ শান্তি সংসারে কত অল্প! ইহাও আশাপ্রলোভনের নিত্য ক্রীড়াভূমি। এই মিথ্যা আশা না থাকিলেও কাহারও কোন দুঃখই ছিল না; আশাই মানবের সুখ, আবার এই আশাই দুঃখের মূল কারণ।

শচীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সংসারের কঠোরতার কথা চিন্তা করিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে আপন কক্ষে গমন করিলেন অন্যদিন হইলে তৎক্ষণাৎ হস্তপদ প্রক্ষালন ও বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক কিছু জলযোগ করিয়া বাহিরে আসিতেন, কিন্তু আজ তাহা করিলেন না, একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অদ্য কমলার পরিবর্ত্তে মাতাঠাকুরাণী অস্বাভাবিক মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শচীনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

"সংসার করাও আমার দায় হ'য়ে উঠ্‌ল। বড়মানুষের মেয়ে এনে দেখ্‌চি আমার বাড়ী ছেড়ে পলাতে হ'ল। এক আধদিন হয় ত পারা যায়, নিত্য নিত্য এমন কোল্লে আর কে পারবে! রোজ রোজই মনে করি তাও কি কখন হয়! এখন বুঝ্‌ছি বড় বো'য়ের ত কোন দোষ নাই। আহা! বাছাকে কত দিন কত মিছে মনে কষ্ট দিয়েছি; আজ নাকি স্বচক্ষে দেখলুম্ তাই বলচি, তা' না হ'লে হয়ত আজও তাকে কত বোকতুম। আহা, বড় বৌমা নাকি বড় লক্ষ্মী তাই, এত বলি তবু কোন কথাটি কয় না, চুপ কোরে থাকে। তা বাছা তোমাদের যা' ভাল হয় কর, আমিত আর এমন ক'রে সংসার কোর্ত্তে পারবো না।"

এই কথা বলিয়া মাতাঠাকুরাণী নিবৃত্ত হইলে, শচীন্ আস্তে আস্তে বলিলেন,—

"কি হয়েছে।"

"হবে আর কি, আমার মাথা, সবাই মনে করে, আমি কেবল মিছে লাগাই। তুমি এসেছ, বেশ হোয়েচে, নিজে দ্যাখসে না কি হয়েছে।"

"আমি আর কি দেখ্‌বো মা, তুমি কি মিছে বোল্‌ছ!"

"না মনে কোর্‌বে, আমি ছোট বৌকে দেখতে পারি না, মিছে লাগাই, এখনও সব ঠিক রোয়েছে, দেখ সে।"

"হয়েছে কি বল না!"

"আমি কি সব কথা বলি, বলি মোরুগ্‌গে, ছেলে মানুষ দু'দিন পরে সব শুধ্‌রে যাবে। ওমা এখন দেখ্‌চি দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগ্‌লো। এই সে দিন বোল্লুম বৌ মা, আজ বেশ রৌদ্দুর হোয়েছে, শাল টাল শীতের পোষাক গুলো একবার রোদে দেওগে না। বিকেলে আমি ছাদে কাপড় তুল্‌তে যাই, দেখি কি না, পোষাকগুলো সব একজায়গায় গাদা কোরে রেখেছে, আর ওম্‌নি ঘরে এসে মজা কোরে বোসে আছেন। যদি একখানা কেউ নিয়ে যেত। গেরস্ত

ঘরের বৌ ঝি কি অমন হ'লে চলে। বাপের বাড়ী চল্‌ত বলে এখানে তা চল্‌বে না। বল্‌ব কি, কুটোটী পর্য্যন্ত নাড়্‌তে চায় না।"

শচীন্দ্র ব্যথিতচিন্তিতচিত্তে অধোবদনে নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। মাতা পুনরায় বলিলেন,—

"এই আজ এক কড়া দুধ বাদ কোরে বেড়াল্‌কে খাওয়ালে, এই গুলো কি কথা। ছেলে মেয়ে গুলো এখন উননের পাঁশ খেয়ে থাক। বড়মানুষের মেয়ে কথায় কথায় অভিমান, কি বল্‌ব, কি হবে তাই মুক বুজে থাকি। ওরা সব নিখ্‌তে পোড়্‌তে জানে, এখন কি আমাদের ওদের কাছে গিন্নেত্ব খাটবে।"

শচীন্দ্রনাথ কিয়ংকাল পরে নিতান্ত দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—

"বড় সাধ করে বৌ নিয়ে এসেছিলে মা, কি কোর্‌বে বল! অদৃষ্টে সুখ নাই, যে কয়দিন বাঁচ্‌বে, এমনই কষ্ট ভুগ্‌তে হবে।"

মাতা বধূর দোষের আরও অনেক কথা বলিয়া কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন।

শচীন্দ্রনাথ বসিয়া বসিয়া কতই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—'সত্যই কি কমলা এইরূপ করিয়াছে! সত্যই কি সে মাতার অবাধ্যাচরণ করে! না করিলেই বা জননীর এরূপ অযথা বলিবার প্রয়োজন কি! কোন্‌ মাতা আপন পুত্র পুত্রবধূর মনে অনর্থক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করেন নিশ্চয় তিনি কমলার আচরণে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন, নচেৎ কখনই এত কথা বলিতেন না।" আবার পর মুহূর্ত্তেই ভাবিলেন,—"না কমলা এমন নহে; সে এমন হইলে কি এত দিন আমি এ সংসারে থাকিতে পারিতাম! এক দিন নহে; দুই দিন নহে, সাত বৎসর দেখিয়া আসিতেছি, কখনও কোন অন্যায় দেখেছি ব'লে, মনে হয় না। কমলা প্রকৃতই সংসারের কমলা। না, না, তার কোন দোষ নাই, মায়ের কোন দোষ নাই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া, শ্বশুর ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আহারাদি শেষ হইলে, কমলা আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিছু পূর্ব্বে তিনি স্বামীর জন্য যে আহারীয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, দেখিলেন, তাহা এখনও গৃহের মেজেয় তেমনই অভুক্তাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কমলা অনেকবার শচীন্‌কে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন, তিনি ভোজনে অনিচ্ছা জানাইয়া শয়ন করিলেন। অগত্যা কমলা নিতান্ত দুঃখিত মনে, ভোজনের জন্য আর বৃথা অনুরোধে নিবৃত্ত হইলেন।

শচীন্দ্রনাথ অদ্যকার সকল বৃত্তান্ত সঠিক জানিবার জন্য কমলাকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বিশেষ কিছুই বলিলেন না, আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে কোন কথা বা অপর কাহারও বিপক্ষে কিছুই বলিলেন না, বরং নিজের দোষ বলিয়াই স্বীকার করিলেন। শচীন্‌ অনেক প্রশ্ন করিয়াও মনোমত উত্তর পাইলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, কমলার নিকট হইতে প্রকৃত ঘটনার কিছুই অবগত হইতে পারিবেন না, কারণ এরূপ ঘটনা তাঁহাদের সংসারে নূতন নহে, অনেকবার ঘটিয়াছে, কখনই কিছু জানিতে পারেন নাই। তবে ইহা তিনি বেশ বুঝিলেন যে, কমলা নিরপরাধা, তিনি বিলক্ষণ জানেন, যদি প্রকৃত সে দোষী হইত, তাহা হইলে তাহার এত নির্ব্বিভাব থাকিত না, হাসিমুখে আপন দোষ স্বীকার করিত। কিন্তু কমলা বস্তুতঃ দোষী হউক বা নির্দ্দোষী হউক, যখন শ্বশ্রূমাতা রাগ করিয়া দোষারোপ করিতেছেন, তখন যে তাঁহার নিশ্চয় দোষ আছে, ইহা তাঁহার নিজের আন্তরিক বিশ্বাস। শচীন্দ্র অনেক ক্ষণের পর বলিলেন,—

"কমল, আমি বেশ জানি, তোমার কোন দোষ নাই। শুধু আজ কেন কখনই তোমার দোষ দেখি না। তবে কেন এমন হয়, তোমার মনের কি বিশ্বাস, বোল্‌বে কি?"

"আমার আবার দোষ নয়, তবে কার দোষ? কৈ দিদিকে ত কিছু বল্‌তে হয় না। আমি মায়ের মনের মতন হ'তে পারি না, তাইত। আমার জন্য ত সবায়ের কষ্ট। এই ক'দিন পরে আজ তুমি বাড়ী এলে, কত কষ্ট পাচ্ছ, দেখ দেখি। আমি ম'লে সত্যই সকলের আপদ চুকে যায়।"

শচীন্‌ আর কিছুই বলিলেন না। কমলা অতিশয় মনোকষ্টে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আপনাকে সংসারের সকলের মানসিক অসুখের মূল কারণ বুঝিয়াই তাহার এত যন্ত্রণা। তিনি কখনও পরের দোষ দেখিতে

শিক্ষা করেন নাই, আপনার মন যেমন সরল, জগৎসংসারকে তেমনই দেখিয়া থাকেন। মানুষ মানুষকে ইচ্ছা করিয়া বৃথা মনোকষ্ট দিতে পারেন ইহা তাঁহার ধারণার বহির্গত। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যখন যিনি যাহা বলেন, তিনি আপনার অপরাধ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারেন না। কমলার স্বভাবই এইরূপ, প্রকৃতই সে বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তাঁহার বিশেষ দুঃখ এই যে, তাঁহার দোষের জন্য শ্বশ্রূমাতা তাঁহাকে কখন তিরস্কার করেন না। তিনি সাধ্যমত সতর্কতার সহিত, সাংসারিক কাজকর্ম্ম করেন, এবং শাশুড়ী, ননদ, ও বড় যায়ের মনোমত হইয়া চলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ কিছুতেই তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারেন না। পাছে কি করিলে দোষ হইবে, কি করিলে অন্যায় হইবে, এই মনে করিয়া প্রকৃতই কমলা অনেক সময় একাকী আপন কক্ষে বিরলে বসিয়া রোদন করেন। তিনি বড়বধূর মত শ্বশ্রূমাতাকে মৌখিক যত্ন ও ভক্তি দেখাইতে জানেন না, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া, আর তাঁহার নিকটে থাকেন না, একাকী আপন কক্ষে বসিয়া কাল অতিবাহিত করেন, কখনও কখনও শচীনের ছোট ভ্রাতস্পুত্রকে লইয়া খেলা করেন, কিন্তু ইহাতেও ফল বিপরীত ফলে, তাঁহার বসিয়া থাকার কারণ, গৃহিণী প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে নানা ক্লেশ ও কটূক্তি করেন। তাঁহার সুখ আদৌ নাই। সংসারে দুইটা সুখ দুঃখের কথা কহিবার তাঁহার কেহ নাই। যদি কেহ প্রকৃত তাঁহাকে ভালবাসেন, তবে সে বাটীর প্রাচীনা দাসী পরাণের মাতা। এই বৃদ্ধার হৃদয় কেবল যথার্থ তাঁহার দুঃখে আর্দ্র হয়। এজন্য সেও গৃহকর্ত্রীর প্রিয় হইতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিদ্রায় অনিদ্রায়, দুঃখে যন্ত্রণায় শচীনের দীর্ঘযামিনী কাটিয়া গেল। সরলা কমলা নিজ হৃদয়ের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন সযতনে ঢাকিয়া রাখিয়া কতবার তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রমার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। সকলেরই একটা সীমা আছে, বোধ হয়, শচীনের ধৈর্য্যধারণের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

শচীন্দ্রনাথ প্রাতঃকালীন শৌচাদি কার্য্য সমাপনান্তর দেউড়িতে প্রবেশ করিতেছেন, এই সময় তাঁহার পিতা নীলাম্বর বাবু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মৃদুগম্ভীরভাবে বলিলেন,—

"শচীন্‌ শোন!"

শচীন্দ্রনাথ কোন কথা না কহিয়া কপাটের বাজুর পার্শ্বে ধীরভাবে দাঁড়াইলেন। তখন নীলাম্বর বাবু মুখ হইতে হুঁকা নামাইয়া বলিলেন,—

"দেখ! প্রত্যহই দিন রাত বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ নিয়ে বাস করা ক্রমে দুর্ঘট হ'য়ে উঠ্‌লো। ছোট বৌ মা এখন আর নিতান্ত ছেলে মানুষটি নাই, আমরা সব সহিতে পারি, কিন্তু বড় বৌ মা পরের মেয়ে ওঁর জন্য নিত্য কথা শুন্‌বেন কেন? আজকের বাজারে কে কার জন্য কথা শুন্‌তে চায়! আর এই অহর্নিশি গোলমাল কোন্দলে আমারও পাড়ায় ক্রমে মুখ দেখান দায় হয়ে উঠ্‌লো।"

শচীন কোন কথাই কহিলেন না, পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। নীলাম্বর বাবু পুনরায় বলিলেন,—

"তোমায় বোল্‌লে চুপ কোরেই থাক, কোন কথা কও না। মনোগত কি খোলসা বল!"

শচীন্দ্র অবনত বদনে বলিলেন,—

"কি বোল্‌বো বলুন?"

পিতাঠাকুর অপেক্ষাকৃত রূক্ষস্বরে বলিলেন,—

"তোমার কথা তুমি বল্‌বে না! আপনার স্ত্রীকে শাসন কর্‌তে পার না। তোমার স্ত্রীকে কি অপর কেউ শাসন কর্‌তে আসবে?"

শচীন্‌ আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। পিতা যাহা যাহা বলিলেন, সকল শুনিলেন এবং গোপনে নয়নের অশ্রু মুছিলেন।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। শচীন্‌ বাহিরের ঘরে একাকী অনাহারে উপাধানে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছেন। পূর্ব্ব রজনী অনশনে গিয়াছে, আজও এত বেলা হইল, তথাপি ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, অথবা তাহা আছে, ভোজনে প্রবৃত্তি নাই বা আহারের কথা আদৌ মনে নাই। মাতার পুত্রের প্রতি রাগ বা অভিমান আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীমান্‌ সুধীরচন্দ্রকে তাহার কনিষ্ঠ খুল্লতাতকে আহারার্থে ডাকিতে পাঠাইলেন। সুধীর আসিয়া বলিল যে, তাহার

কাকা নিদ্রিত রহিয়াছেন। তখন মাতা স্বয়ং তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, পুত্রকে স্নান আহারার্থে উঠাইলেন। শচীন্ উঠিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আসিলেন এবং ঘরের বারন্দায় বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু পরে তিনি অস্পষ্ট কথোপকথন শুনিয়া বুঝিলেন, পার্শ্বের ঘরে পিতাঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণীতে তাহার সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন। তিনি শুনিলেন, পিতা ক্রোধ-ব্যঞ্জকস্বরে বলিতেছেন,—"ছ্যা, ছ্যা, ব্যাটার মুখ দেখিতে নাই, ওর জন্য আমার মাথা হেঁট হয়েছে, লেখাপড়া শিখিয়েই শেষ এই হ'ল। আমার সাক্ষাতেও এত বেহায়াপণা, স্ত্রৈণের এক শেষ। ওরই জন্য সংসারটা যেতে বসেছে।"

শচীন্ আহার শেষে আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অপেক্ষায় মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি যাঁহারা এতক্ষণ আহার করেন নাই, তাঁহারা এইবার মধ্যাহ্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। পরাণের মাতা শচীন্দ্রনাথকে শৈশব হইতে পালন করিয়াছে, সে তাঁহাকে পুত্রাধিক ভালবাসে। তাঁহার প্রতি সংসারের নিত্য অন্যায় অত্যাচার অবিচার দেখিয়া বৃদ্ধা অন্তরে ব্যথিত হইয়াছে। সে এই সময় সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে যে প্রকোষ্ঠে শচীন্ আছেন, তথায় প্রবেশ করিল এবং তাহাকে বলিল,—

"দেখ শতু ভাই! আমার একটি কথা শোন, বৌকে আর এক দণ্ড এখানে রেখো না। কালই তুমি কল্‌কাতায় নিয়ে যাও, আপাততঃ বাপের বাড়ী নিয়ে যাও, তার পর যা হয়, হ'বে পরে।"

পরাণের মাতা শচীন্‌কে বরাবর শতু বলিয়া ডাকে এবং আধুনিক সভ্যতার অনুমোদিত সম্বোধনাদি করিতে বড় সে পারে না। শচীন কখনও 'পরাণের মা' কখনও বা 'বুড়ি' বলিয়া থাকে। অদ্য অকস্মাৎ পরাণের মাকে নিকটে পাইয়া এবং তাহার কথা শ্রবণ করিয়া, তিনি একটু সুখ অনুভব করিলেন। কল্য সন্ধ্যা হইতে এখন পর্য্যন্ত তাহার সহিত আর কেহ এমন করিয়া কথা কহে নাই, তাই তিনি বৃদ্ধা দাসীর স্নেহ ও আন্তরিকতাপূর্ণ সরল কথায় এত তৃপ্তি বোধ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"তাতে কি হ'বে পরাণের মা, বৌকে বাপের বাড়ী পাঠালেই কি অদৃষ্ট ফির্‌বে?"

"কি হবে তা কি ভাই বুঝ্‌তে পাচ্ছ না! এখানে রাখ্‌লে ডাকিনী রাক্ষসীতে বৌ-টাকে মেরে ফেলবে, আর কি হবে বল?"

"মাকে, বড় বৌকে তুমি মিছে গালি দিও না। ওর কিছু দোষ না থাকলে কি মিছা মিছি ওঁরা এত বলেন। বাবা পর্য্যন্ত যখন এত বিরক্ত হ'য়েছেন, তখন ওর দোষ নিশ্চয়ই আছে।"

"বাবা পুরুষ মানুষ, যা বোঝায় তাই বোঝেন, ভেতরের কথা কি জানে বল! আমার কথা শোন, কালই নিয়ে যাও, অমন সোনার বৌকে এখানে রাখ্‌লে, কখনই ওরা বাঁচ্‌তে দেবে না।"

"মিছামিছি কি কেউ কাকেও এরূপ যন্ত্রণা দিতে পারে?"

"মেয়ে মানুষের স্বভাব তোমরা কি বুঝবে? বৌ কাঁট্‌কিদের এই রকমই স্বভাব, আর যা, ননদ, কোন কালে কার আপনার হয় বল? ছোট বৌদিদির কিছুই দোষ নাই, যাতে সে কষ্ট পায়, এই ওদের ইচ্ছে। এই কাল যে জন্যে এত কাণ্ড, তাতে বৌদিদির কি অপরাধ। ছোট বৌদিদি দুধের কড়া ঘরে তুলে শেকল দিয়ে রোয়াকে বসে কুট্‌নো কুট্‌ছিল, বড় বৌ এসে একটা কাজের অছিলে ক'রে, তাকে সেখান থেকে পাঠিয়ে দিয়ে তারপর আপনি চুপি চুপি ঘরের শেকল খুলে, কড়া থেকে খানিকটা দুধ জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে, তারপর বেরালটাকে ডেকে ঘরে ঢুকিয়ে কাপড় কাচ্‌তে গেল। মা এসে দেখ্‌লে বেরালে দুধ খাচ্চে। দুধ ঘরে তোলা, জ্বাল দেওয়া, ছোট বৌয়ের কাজ, তাই বৌদিদির উপর এত তাল্ পড়্‌ল।"

"পরাণের মা, এ কথা কি সত্য? তুমি কি আপন চক্ষে দেখেচ?"

"আমি এ বাড়ীর দেখে দেখে বুড় হয়ে গেলুম, কাল আমি নিজের চখেই না হয় দেখিনি, সুধীর আমায় চুপি চুপি বলেচে।"

"না পরাণের মা, এ সম্ভব হ'তে পারে না, ছোট বৌ কি এতই ওঁর চক্ষুশূল। সুধীর ছেলে মানুষ, মিছে কথা বলেচে।"

"এর সব সত্যি, সুধীরই ত বেরালটাকে ধরে নিয়ে গেছ্‌ল। দাদা আমার, এ সংসারে কি আর থাকতে আছে। পরের মেয়ে বলে কি এম্‌নি করে দগ্ধে দগ্ধে মারবে। শ্বশুরবাড়ী যদি না থাকতে ইচ্ছে হয়, দু দিন পরে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে থেকো, যদি বল ত আমিও যাই। আমার আর এ পোড়া সংসারে এক দণ্ড থাকতে ইচ্ছা করে না।"

শচীন্ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন,—

"পরাণের মা ঠিক বলেচ। এ পাপসংসার থেকে যেতে না পারলে সুখ নাই, তোমার পরামর্শই শুনব।"

শচীনের কথা শেষ না হইতে মাতাঠাকুরাণী উপরে আসিতেছেন বোধ হইল। দাসী আর অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরাণের মাতা চলিয়া গেলে, শচীন্দ্রনাথও ভিতর বাটী ত্যাগ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। ভাবিলেন,—'এ সংসারে সুখ কি?' এই একই কথা কতদিন ভাবিয়াছেন, আজ আর একবার ভাবিলেন। অন্যান্য বারের ন্যায় আজও শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—প্রকৃত সুখ বা শান্তি এ জগতে নাই; বা যদি থাকে, তবে তাহা অতি বিরল, এখানে কেবল সুখের অলীক আশা ও প্রলোভনমাত্র আছে। এই আশা ও প্রলোভন, যে মহাত্মাকে স্পর্শ করিতে না পারে বরং তিনিই সুখী। প্রকৃতই শচীন্দ্রনাথ সুখের এত আশা না রাখিলে কি আজ এতাদৃশ মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহার অবস্থা কি শোচনীয়, একদিকে প্রাণভরা অপরিমেয় আশা আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে কঠোর আশাপথের কণ্টক প্রতিকূল নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য। একদিকে ভ্রান্ত পিতা মাতা, অপরদিকে নিরপরাধা সরলা পত্নী। এক দিকে সুখতৃপ্তি অন্যদিকে ক্রূর অথচ অপরিত্যাজ্য সংসার-চক্র। শচীন্ কতক্ষণ একাকী বসিয়া ভাবিলেন, বুঝিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, তাঁহার আশা এ জনমে পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, শান্তির পবিত্র রাজ্যে তাঁহার যাইবার জন্য কোন সুগম বা দুর্গম মার্গ নাই, সম্মুখে কেবল অনন্ত নিরাশা মাত্র। যে আশার পরিণাম হৃদয়ভেদী দারুণ নৈরাশ্য, সে আশা মানব হৃদয়ে প্রদান করিয়া পরম করুণানিধি জগৎপিতার কি করুণা প্রকাশ পাইতেছে; আমরা ক্ষুদ্র মানব তাহা বুঝিতে পারি না।

শচীন্ অকূল চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অকস্মাৎ প্রকৃতির প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, সন্ধ্যা সমাগত। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ৎকাল কি ভাবিলেন, তৎপরে একবার বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

মধ্যাহ্নকালে যখন পরাণের মাতা ও শচীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন হয়, তখন নীলাম্বর বাবু পার্শ্বের কক্ষ হইতে তাঁহাদের সকল কথা শ্রবণ করেন। দাসীর কথা যদি প্রকৃত হয়, সত্যই যদি গৃহিণী ও বড় বধূ বা কনিষ্ঠা কন্যা ষড়যন্ত্র করিয়া ছোট বধূকে এইরূপ ক্লেশ দেয়, তাহা হইলে ইহা বড় ভয়ানক কথা। তাহাদের জন্য অনর্থক নির্দ্দোষী পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন মনে করিয়া, তিনি অন্তরে দুঃখ অনুভব করিলেন এবং পুত্র বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করিবেন বলিয়া, ভাবিতে লাগিলেন।

শচীন বাহির হইয়া গেলে পর, নীলাম্বর বাবু বহির্ব্বাটী হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"সুধীর!"

সুধীর অন্তঃপুরের মধ্য হইতে উত্তর দিল,—"কি ঠাকুর্দ্দা।"

নীলাম্বর বাবু বলিলেন,—"একবার শুনে যা।"

শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র পিতামহের স্বর শুনিয়া বুঝিল, যে আজ তাঁহার প্রকৃতি স্বাভাবিক নাই। সে ভয়ে ভয়ে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎপরে নীলাম্বর বাবু সুধীরকে গত রোজের দুগ্ধসংশ্লিষ্ট সকল বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিতে আজ্ঞা করিলেন। মাতার নিকট প্রহারের ভয়ে, বালক নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও, যাহা জানিত সকল কথা বলিয়া ফেলিল। তখন নীলাম্বর বাবুর অনেক দিনের ভ্রম একেবারে অপসারিত হইল; বুঝিলেন, কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সংসারের প্রকৃত লক্ষ্মী, আর বড় বধূ দানবী। তিনি ক্রোধে, দুঃখে ও নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় গভীর যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, শচীনের চরিত্র কত মহান, অন্যায় তিরস্কারে সে পিতার কথায় প্রত্যুত্তর দেয় নাই, সে এই সামান্য বয়সে নিজ কর্ত্তব্য বুঝিল, আর আমি বৃদ্ধ হইয়াও একবার ভাবিলাম না, দেখিলাম না, উপযুক্ত পুত্রকে অন্যায় তিরস্কার করিলাম; আমার কর্ত্তব্যও বুঝিলাম না। হায়, কতদিন হয়ত এইরূপ অন্যায়

ব্যবহার করিয়াছি। বৌ মা বালিকা, কিন্তু এই সংসারে সে কতই জ্বলিতেছে। যাহা হউক কাল প্রাতে পুত্র পুত্রবধূর নিকট নিজ অপরাধ স্বীকার করিব। তারপর যাহা ব্যবস্থা হয়, করিব।

প্রভাত হইলেই নীলাম্বর বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শচীন্দ্রনাথের সুপ্তোত্থিতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন বেলা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অথচ পুত্রকে বহির্বাটীতে আসিতে দেখিলেন না, তখন তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহার শয়নকক্ষ অনুসন্ধান করিতে গমন করিলেন। তথায় পুত্র বা পুত্রবধূ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। নীলাম্বর বাবুর আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, পুত্র বিশেষ মনোদুঃখে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাটী ত্যাগ সংসারের কেহ একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলিয়া মনে করিলেন না, বা কেহ বিশেষ দুঃখিত হইলেন না; কেহ প্রকাশ্যে, কেহ মনে মনে বলিলেন,—'আচ্ছা দেখা যা'বে কতদিন বাড়ী ছেড়ে শ্বশুরের খেয়ে থাকে।' কিন্তু নীলাম্বর বাবু অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মনে মনে আপনার ও আপন সংসারের প্রতি বিশেষ ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে শচীন্দ্রনাথের শ্বশুরালয়ে এবং যে আফিসে তিনি কর্ম্ম করেন তথায় ও অন্য যে যে স্থানে তাঁহার যাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন, লোক পাঠাইলেন; কিন্তু হায়! কোন স্থানেই পুত্র পুত্রবধূর সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রায় সপ্তাহকাল পরে তিনি ডাকযোগে একখানি পত্র পাইলেন। তাহা এইরূপ :—

অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আমি গৃহ ও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করুন। যে পুত্রের জন্য পিতামাতার মস্তক অবনত হয়, তাঁহাদের সুখশান্তির পথ অবরুদ্ধ হয়, সে পুত্রের মরণই ভাল। কিন্তু আপনার এ অধম পুত্র মৃত্যুর অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিতে না পারিয়া, আপনাদের নিকট হইতে বহু অন্তরে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে, ইহাই স্থির করিয়াছে। ইহাতে আপনাদের কোন ক্ষতি হইবে না, বরং কুপুত্র পুত্রবধূর অবর্ত্তমানে এই বার সংসারে শান্তিস্রোত প্রবাহিত হইবে। কিন্তু আমার সংসার বাসনা, হৃদয়ের শত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা চির বিদলিত হইল। যাহা হউক, এক্ষণে আর সে জন্য পরিতাপ করি না, এক্ষণে শ্রীচরণে এই ভিক্ষা, একবার অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মানবের বিশাল কর্ত্তব্য মস্তকে রাখিয়া কঠোরতর নবীনপথে অগ্রসর হইতে পারি। ইহ জীবনে আপনার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইতে আজ্ঞা হয়। আর কি লিখিব, আপনার অবোধ সন্তান মনে করিয়া আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন, ইতি—

আপনার চির আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী সেবক শচীন্।

শ্রীহরিহর শেঠ।

জন্ম জন্মান্তরে।

জন্ম জন্মান্তরে মোর হৃদয় নিলয়ে
আমার প্রেয়সী,
সৌন্দর্য্যের ষোল-কলা পরিপূর্ণ করি
উঠিও বিকসি,
আমি যদি হই প্রিয়া সুনীল সুন্দর
অনন্ত নীলিমা,
তুমি হ'য়ো চারুচন্দ্র চির পূর্ণিমার
সোণার প্রতিমা,
আমি যদি হই সখি, শ্যামল শীতল
সরসী বিমল,
ফুটিও মৃণালবৃন্তে হৃদয়ে আমার
সোণার কমল,
আমি যদি হই কভু করমের ফলে
বিষধর ফণী,
লভিয়ো জনম তুমি হ'য়ে প্রাণাধিক
মনোহর মণি,
আমি যদি হই কভু নীরস কঠিন
অচল প্রস্তর,
তুমি হ'য়ো বক্ষতলে স্নিগ্ধ সুশীতল
রজত নির্ঝর!

শ্রীনিশিকান্ত সেন।

সুখ-দুঃখ।

বহু সাধনায় যাহা পেয়েছিনু বুকে
গোপনে চলিয়া গেছে চক্ষের পলকে,
অনাহূতভাবে যাহা আসিয়াছে ঘরে
শত সাধনায়ো আজি যেতেছে না স'রে।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

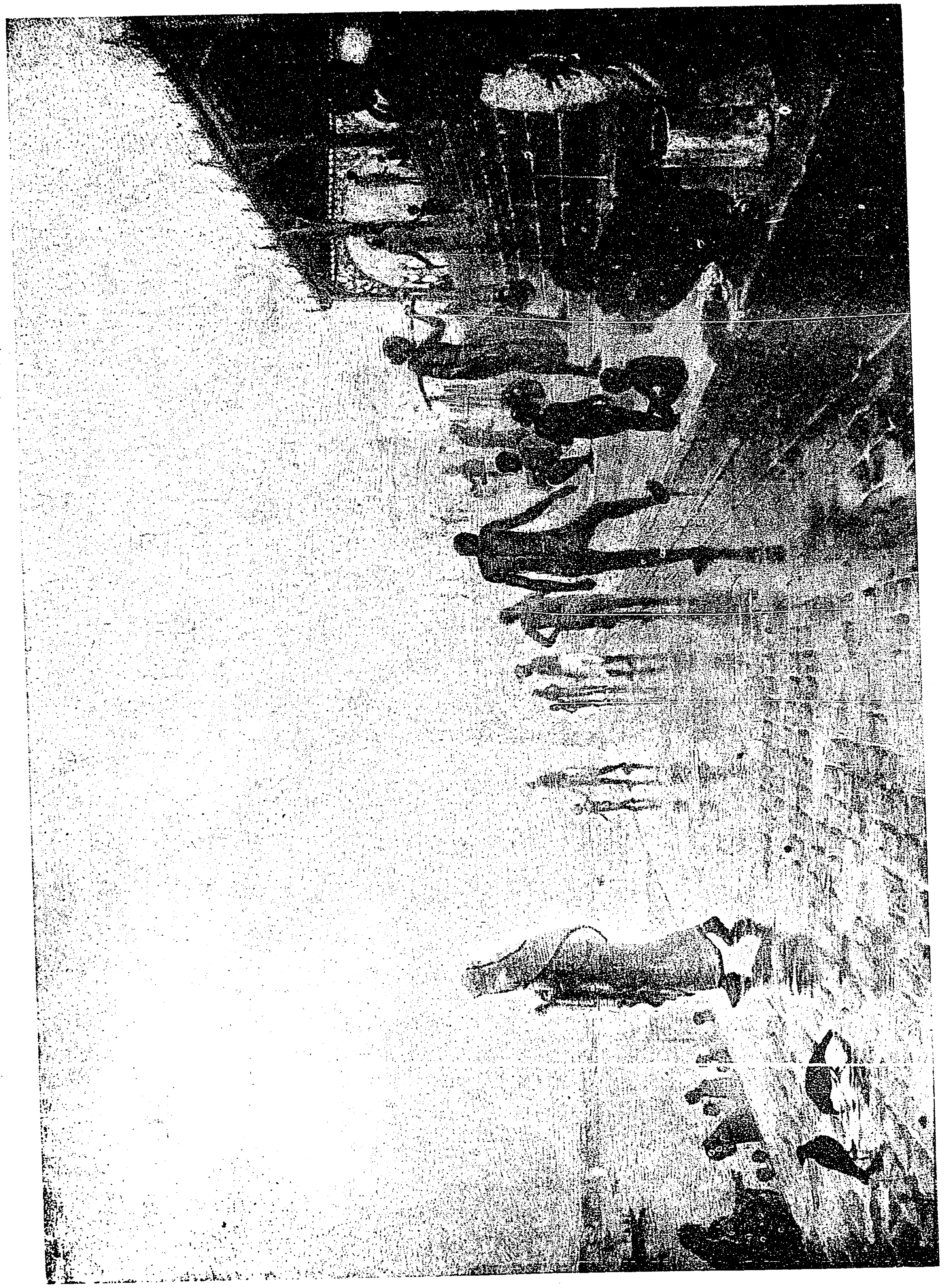

গঙ্গার স্নানের ঘাট।

From a Photo of the original drawing by J. P. Ganguli.

৬ষ্ঠ ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১০। | ৮ম সংখ্যা।

বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যা।

আমাদের দেশে এখন মধ্যবিত্ত লোকের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা গভীর আশঙ্কাজনক। পূর্ব্বকালে এই সম্প্রদায় স্বীয় পল্লীজীবন অনেকটা সুখে শান্তিতে অতিবাহিত করিতেছিলেন। পল্লীর জমীদার পল্লীর রাজার মত নানারূপ শুভ ও হিতকর বিধানদ্বারা স্বীয় পল্লীখানি শ্রীযুক্ত করিয়া রাখিতেন। অনেক পল্লীতেই পল্লীর জমীদারের সঙ্গে গরীব প্রজাগণের যে সম্পর্ক ছিল, তাহা স্নেহ-সম্ভ্রমের। জমীদারবাড়ীতে সন্ধ্যায় পূজার আরতিসূচক শঙ্খ ঘণ্টা ও খোল করতাল বাজিয়া উঠিলে, প্রজাগণ আনন্দে মনিববাড়ী জুটিত, আবালবৃদ্ধ সকলে সঙ্কীর্ত্তনের প্রসাদ পাইত। মনিব বাড়ীর সুখের হিল্লোলে পল্লীর সমস্ত চিত্রটি যেন আনন্দে কাঁপিত। পল্লীর সমস্ত সুখ দুঃখ—মনিববাড়ীর বহির্বাটী ও অন্তঃপুর আনন্দিত বা ব্যথিত করিত। প্রত্যেকখানি গ্রাম একটি সমগ্র শান্তির চিত্রের ন্যায় ছিল,—তাঁতিপাড়ায় কাপড় প্রস্তুত হইত, কর্ম্মকারপাড়ায় ও কাঁসারিপাড়ায় নিত্য ব্যবহারের উপযোগী জিনিষগুলি প্রস্তুত হইত, মৎস্যজীবিগণ গ্রামের নদীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গায় বসিয়া মাছ ধরিত, গ্রাম্য-ক্ষেত্র অকাতরে স্বর্ণশীর্ষ ধান্য লইয়া বুক ফুলাইয়া গ্রামের সৌভাগ্যের কথা জ্ঞাপন করিত,—গ্রামের বাজারখানি স্বীয় ক্ষুদ্র আড়ম্বরবর্জ্জিত এবং আবশ্যক সামগ্রী লইয়া পল্লীর অভাব মোচন করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিল। গ্রাম্য গাভী হৃষ্টপুষ্ট দেহে স্বীয় বৎস ও গ্রামবাসিগণের পোষণোপযোগী সুধাতুল্য দুগ্ধ দান করিত।

সেই এক দিন ছিল, আমরা এখনও বৃদ্ধ হই নাই, কিন্তু আমরাও সেই সময়ের আভাষ শৈশবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে আমোদ-কলরব-মুখর-সুখলক্ষ্মী পল্লীগ্রামের শ্যাম-পল্লবচ্ছায়া হইতে চিরতরে বিদায় লইয়াছেন, তাহার মুকুটের শেষ আভাটুকু আমাদের শৈশব-জীবনের উপর

খেলিয়া অস্ত গিয়াছিল, তাহার স্মৃতিটুকু হৃদয়ের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়।

পল্লী-জমীদারগণ যে স্থানে স্বীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন, তাহার চতুঃপার্শ্বে পুরোহিত, গোয়ালা, কামার,কুমার,নাপিত প্রভৃতি আশ্রিতবর্গের বাসের স্থান নিরূপণ করিতেন। আবশ্যকমতে সমস্ত সামগ্রী পাইতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না। তাঁহাদের ইচ্ছায় হিন্দু মুসলমান প্রজাগণ এক মুহূর্ত্তে প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইত। তখনকার ভৃত্যকে তাড়াইয়া দিলে বাড়ী হইতে যাইত না এবং গৃহিণী কিছু বলিলে তাহার উত্তরে সময়ে সময়ে কঠোর-ভাষায় গালি দিতেও ছাড়িত না—অথচ বাড়ীর শিশুটি পীড়িত হইলে, তাহার জননী অপেক্ষা সে কম ব্যস্ত হইত না ও তাহার আবদারের জন্য সে যত লাঞ্ছনা সহ্য করিত, তাহার শতাংশের একাংশ সহিতে পারে, এরূপ বিশ্বাসী ভৃত্য একালে দেখা যায় না। জমীদারের খরচে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত এবং বিজয়ার দিনে প্রতিমা বিসর্জ্জনের উৎসব, নৌকাবিহার ও প্রীতি-আলিঙ্গনের ধূমে সমস্ত পল্লীখানির উপর বিদায়ের অশ্রু ও আনন্দ সম্মিলন যে অপূর্ব্ব দীপ্তি বিচ্ছুরিত করিয়া দিত, তাহা মনে হইলে আনন্দ হয়।

তখন সুস্থদেহে বালকগণ যে সকল ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিত, তাহার আনন্দ-কলকোলাহলে গ্রামখানি শ্যাম-সন্ধ্যায় মুখরিত হইত এবং রামায়ণ ও মহাভারতাদি পাঠে হৃদয়ে যে উচ্চ নৈতিকশিক্ষা ও সুকুমারবৃত্তির অনুশীলন হইত, এখনকার দিনের উচ্চশিক্ষা সেই কোমল ভাবটুকু হৃদয়ে জাগাইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না।

এই বঙ্গদেশের বহুস্থানে তখন শিল্পশোভার উন্নতি সাধিত হইত। হায়, ঢাকার মস্‌লিন্! জাহাঙ্গীরের অশ্বক্ষুরে একদা একখানি সূক্ষ্ম সুন্দরবস্ত্র সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল; তাঁতি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া জানাইলে, জাহাঙ্গীর প্রণমত বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার অশ্বের ক্ষুরে একখানি বস্ত্র জড়াইয়া আছে। উহা ঘাসের উপর মসৃণ একখানি হিমের স্তরের মত পড়িয়াছিল; কষ্টে তাহা আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল,উহা একখানি সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য খচিত প্রমাণ সুন্দর সাড়ী। ঢাকার মস্‌লিন্ জগতের সমস্ত প্রদেশে বিলাস ও শোভার চরমদ্রব্য বলিয়া গণ্য ছিল, সেই মস্‌লিন্ আর এখন নাই; সে সকল শিল্পী আর নাই,—যাহারা আছে, তাহারা আর কেহ সেরূপ সূক্ষ্ম সুন্দরবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না। মাঞ্চেষ্টারের স্বল্পমূল্য, স্বল্পস্থায়ী স্থূল আমদানী কি শোভা ও সৌন্দর্য্যের হাটই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ফরিদপুরে সাতৈর নামক স্থানে একরূপ পাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার এক এক খানি সুন্দর চিত্রপটের ন্যায়। এক সময় ২০০।২৫০৲ টাকা মূল্যের উপযুক্ত এব এক খানি পাটীও পাওয়া যাইত, এখনও ২০।২৫৲ টাকা মূল্যের পাটী পাওয়া যায়; দিন কয়েক পরে হয়ত তাহাও পাওয়া যাইবে না। পাটী বিক্রেতার বংশধর একবার জেলা কোর্টে য়্যাপ্রেণ্টিসির সন্ধান পাইলে হয়! ত্রিপুরার সরাইলের ধুতি, বঙ্গবিখ্যাত শান্তিপুরের ধুতি, এখন মাঞ্চেষ্টারের নিকট হতমান হইয়া দেশীয় লোকের দ্বারে দ্বারে মৌনক্রন্দনের দৈন্য জানাইতেছে। এই প্রার্থনা কি কেহ শুনিবেন না? আমাদের শোভা ও সৌন্দর্য্যের হাট মাঞ্চেষ্টার নির্দ্দয়ভাবে ভাঙ্গিয়া দিতেছে। কতকগুলি ফিন্‌ফিনে, ক্ষণস্থায়ী রঙ্গিন অপদার্থকে সিল্ক-নাম দিয়া, জার্ম্মেনি আমাদের বহরমপুরের গৌরব রেসমের কারবার একবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ২০৲ টাকা বেতনের অর্দ্ধভুক্ত কেরাণিগণ জঠরানলে জ্বলিয়া সারা বৎসর এই জার্ম্মেনির সিল্কের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন!

কিন্তু পূর্ব্বে যে আমাদের দেশে শিল্পের নানারূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল হিন্দু ও মুসলমান জমীদারগণের উৎসাহ। যেখানেই শিল্প কোন উজ্জল ও সুন্দর আদর্শ ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছে, সেখানেই দেখা যায়, কোন ধনিসন্তান স্বীয় অকুণ্ঠিত বদান্যতার বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন! দেশীয় লোকের স্বদেশভক্তি এখনকার মত তখন সভাসমিতির বক্তৃতার বাজে খরচ হইয়া যাইত না—দেশের প্রকৃত কল্যাণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হিন্দু ও মুসলমান জমীদারগণ দেশীয় শিল্পের নানারূপ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। প্রতি নগরে প্রতি পল্লীতে সেই ধনিসন্তানগণের সচেষ্ট উদ্যমের জলন্তশিখার নির্ব্বাণোন্মুখ নিদর্শন এখনও দেখা যাইতেছে। হায়, কে আর এই শিখা বদান্যতার তৈলসংযোগে উজ্জ্বল করিয়া শ্রী সম্পন্ন করিবে!

দেশের তখন যাহা অভাব ছিল, দেশীয় শিল্প তাহাই পূরণ করিতে সচেষ্ট ছিল। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, সুতরাং ঢাকার মস্‌লিনের সূক্ষ্ম জমী এদেশেরই উপযোগী। যাঁহারা মনে করেন, উহাতে শীলতা রক্ষিত হয় না, তাঁহাদের ধারণা ভুল। উত্তমরূপে ধৌত হইলে মস্‌লিনের জমী কাগজের মত হইয়া যায়। উহা মাঞ্চেষ্টারের ধুতি অপেক্ষা শীলতা রক্ষা করিতে কোনরূপে অক্ষম নহে। এই সূক্ষ্ম সুন্দর বস্ত্র গ্রীষ্মপ্রধানদেশের পক্ষে অপূর্ব্বরূপে আরামজনক। যাঁহারা উৎকৃষ্ট 'ঢাকাই' ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, উহা পরিধানে অভ্যস্ত হইলে, অপর সকল সূক্ষ্মবস্ত্র ভার বলিয়া বোধ হয়। শুধু নগ্নতা আচ্ছাদন করিয়া, গ্রীষ্মপ্রধানদেশের অভিপ্সিত যে বিলাস ও শান্তিটুকু তাহাতে বিঘ্ন না ঘটায়, এই জন্য এই বস্ত্রের সৃষ্টি। এ দেশের প্রকৃতি যাহা চাহিয়াছিল, শিল্প তাহা সুচারুরূপে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। সাতৈর ও শ্রীহট্টের পাটী "শিতল-পাটী" নামে অভিহিত, গ্রীষ্মপ্রধানদেশের জন্য ইহা হইতে আরামের শয্যা কল্পনা করা যায় না। প্রাচীন-গাথায় মাণিকচন্দ্র রাজার মহিষী রাজাকে যখন বলিয়াছিলেন, "শীতল-পাটী বিছায়ে দিমু বালিসে হেলানপাইও," তখন এই সূক্ষ্ম সুন্দরবর্ণের বিবিধ চিত্রবিশিষ্ট পাটীর কথাই উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কৃত্তিবাস রাজসভা বর্ণনকালে "রাঙ্গা মাজুরী"র উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই "রাঙ্গা মাজুরী" যে কি অপূর্ব্বসামগ্রী তাহার একখানি নিদর্শন আমি বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছি, উহা তাঁহার একজন ত্রিবাঙ্কুরের বন্ধু উপহার দিয়াছিলেন।

কিন্তু এই গ্রীষ্মপ্রধানদেশে সহসা কতকগুলি ফ্লানেল ও সার্জ্জ আসিয়া যে এরূপ জবরদস্তিভাবে দখল করিয়া বসিবে, তাহা বোধ হয় এদেশের প্রকৃতি-লক্ষ্মী কখনই আশঙ্কা করেন নাই। আমাদের প্রভুগণ শীতের রাজ্য হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু তদ্দেশীয় তুষারমিশ্র তীক্ষ্ণশীতের হাওয়া যে এ দেশে তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে, এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না। তবে এ সকল কম্ফোর্টার, ওয়েষ্টকোট, আলষ্টারের উপদ্রব এখানে কেন? এই উত্তরদেশের শীতের পোষাক গ্রীষ্মদেশোচিত চিত্র সূক্ষ্ম ও সুন্দর শিল্পকার্য্যকে নগ্ন বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে ও আমরা ভারবাহী রাসভের মত না বুঝিয়া বিলাতী নেকটাই, কোট ও আলষ্টার প্রভৃতি বহন করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছি ও শিশুগণের অকালে মস্তিষ্করোগ সৃষ্টি করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাদিগকে এরূপ স্থূল মোড়কের ভিতর সর্ব্বদা পুরিয়া রাখিতে অভ্যাস করাইতেছি যে, একটুখানি মুক্তবায়ুর স্পর্শেই তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা জন্মিতেছে।

শীতের জন্য কাশ্মীরের শাল প্রস্তুত হইত। সেরূপ উৎকৃষ্ট শাল আর এখন পাওয়া যায় না। সেরূপ উৎকৃষ্ট শিল্পসৌন্দর্য্যশোভিত-শীতবস্ত্র জগতে আর হয় নাই, উহা সর্ব্বদেশের রাজন্যবর্গ ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ বারাণসী শাড়ী ও বঙ্গদেশের বালুচরের শাড়ীর গৌরবের নির্ব্বাণোন্মুখ ভাতিটুকু অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উদয় হইতেছে। অনেকে বলিবেন, সে কালের শিল্প রাজা ও আমীরগণের জন্য—সাধারণের জন্য ছিল না। সর্ব্বসাধারণের হিতকল্পে ভারতীয় শিল্প সচেষ্ট হয় নাই, সুতরাং বর্ত্তমানকালের প্রয়োজন ইহা পূরণ করিতে অসমর্থ। এ সম্বন্ধে প্রাচীন-প্রথার সঙ্গে আধুনিককালে প্রবর্ত্তিত প্রথার একটু তুলনায় আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের সমাজে পূর্ব্বকালে যেরূপ বিধান ছিল, তাহাতে শিল্পকে সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াসী করা হয় নাই। বিংশতি মুদ্রা যাহার বৃহৎ পরিবারের একমাত্র সংস্থান, তিনি শিল্পশোভায় শোভান্বিত হইতে প্রার্থী হইলে সংসারে যে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, তাহা এখনকার দিনে ঘরে ঘরে দৃষ্ট হইতেছে। দরিদ্রের ঘরে বিলাস প্রবেশ করিলে, তথা হইতে গার্হস্থ্যলক্ষ্মী তদ্দণ্ডেই বিদায় লইয়া থাকেন। আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আজ যে দুর্দ্দশার সাগরে ভাসমান, তাহা অনেক পরিমাণে মাঞ্চেষ্টারের সুলভ-শিল্পের মহিমায় নয় কি? হায়, শাস্ত্রকারগণ! তোমরা যে প্রাচীনকাল হইতে নিবৃত্তির পাঠ শিক্ষা দিলে, চরিত্রমহত্ব, সরলতা প্রভৃতিই মনুষ্যের পরম ভূষণ, বাহ্য বেশভূষা চিরদিন উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিলে—যে শিক্ষার প্রভাবে পল্লীর ভদ্রসন্তানের জীর্ণ কুটিরটি জগতের উজ্জ্বলতম নিবৃত্তি ও পরার্থ

জীবন সমর্পণের পুণ্য আদর্শের পতাকা উড়াইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল,—কয়েকখানি রঙ্গিন, অকর্ম্মণ্য বস্ত্র ও জুতার দোকান সেই বহুদিনের পুণ্যঅর্জ্জিত ব্রতভঙ্গ করিয়া দিল! ফলে কি দাঁড়াইয়াছে—তাহা দ্রষ্টব্য। মধ্যবিত্ত লোকগণ দেবপূজার ব্যবস্থা ও অতিথিসৎকারপূর্ব্বক মাসে প্রতিবাসিগণকে প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া বহুগোষ্ঠী এক পরিবারভুক্ত থাকিয়া যে শান্তি, আনন্দ, দীর্ঘজীবন ও সুস্থদেহ উপভোগ করিতেন, আজ তাহার সকলেরই অভাব; আজ সেই মহোৎসবের উদারদৃশ্য, পল্লীর উন্মুক্ত অবারিত করুণার ভাণ্ডার প্রকাশ করিয়া দেখায় না, আজ 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' আত্মীয় স্বজন বিদায় হইয়াছেন—দেবগৃহের সন্ধ্যাবাতি নিবাইয়া দিয়াছি, অতিথি দেখিলে শেয়াল কুকুরের মত তাড়া করিয়া যাই, গুরুজন প্রতিপালনের দায়িত্ব স্বীকার করি না, আমাদের সেই প্রাচীন সুবৃহৎ পরিবার এখন শুধু ভার্য্যার নামান্তর বলিয়া গণ্য হইয়াছে—তথাপি অভাব ঘুচিতেছে না। উদরতৃপ্তি অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, শিশুগুলি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত কিম্বা চিররুগ্ন হইয়া যাইতেছে। আমাদের সেই সাবেক দোপাটা ও কাষ্ঠপাদুকার কি দোষ ছিল, তাহাদের বিনিময়ে যাহা পাইলাম, তাহাতে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। আমাদের নাম পৃথিবী হইতে চিরতরে লুপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছে। আমাদের তাঁতিগণ সাবেক যে কাপড় বুনিত, তাহা ত্যাগ করিয়া আমরা ভাগ্য লক্ষ্মীকে বিদায় দিতে বসিয়াছি।

আর এই বিদেশীয় শিল্প যে নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া, জীবনকে একান্ত কৃত্রিম করিয়া তুলিতেছে, তাহার বিষময় ফল, তাহাদের দেশেই প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাদের দেশে উচ্চ ও নীচের সংঘর্ষ প্রলয়ের বিষাণবাদ্য বাজাইয়া ভাবী মহা অনর্থের সূচনা করিতেছে। জাতিভেদ সত্ত্বেও আমাদের দেশে নিম্নতম স্তরের সহিত উচ্চতম স্তরের যে প্রীতির সংযোগ ছিল, তাহা তাহাদের দেশে কোথায়? তাহাদের দেশে খাদ্য ও খাদক মূর্ত্তিতে সমাজের অধস্তর ও উচ্চস্তর সর্ব্বদা নিশংস প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হইতেছে। যাহাদের অর্থ সামর্থ্য নাই, তাহাদিগের মধ্যে বিলাস জাগাইয়া তুলিলে, সেই ক্ষুব্ধ সতত প্রতিহত প্রবৃত্তির নৈরাশ্য যে সংহার মূর্ত্তিতে দাঁড়ায়, য়ুরোপ সেই উৎকটস্বপ্ন-দর্শনে আতঙ্কিত হইতেছে। সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থানে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, তাঁহারা বিলাসসমৃদ্ধির জাঁকাল পরিচ্ছদ পরিয়া নিম্নস্তরের প্রতি ক্রূর হাস্যসহ যদি স্বীয় বাহ্য শ্রেষ্ঠত্ব অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তবে সেই নিগৃহীত রক্তচক্ষু ইতরশ্রেণী রাজচক্রবর্ত্তীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। চতুর্দ্দশ লুইয়ের হত্যা এবং নিহিলিষ্টদিগের অবিরত চেষ্টা বিনিদ্র য়ুরোপকে আজ এই কথা বুঝাইতেছে; কিন্তু যে দেশের সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগণ ত্যাগের গৌরবে গৌরবান্বিত, যাঁহাদিগকে দেখিলে সসম্ভ্রমে রাজেশ্বর সিংহাসন ছাড়িয়া দাঁড়ান, যাঁহাদের বিধি সমস্ত সমাজ অবনত মস্তকে গ্রহণ করে এবং রাজদণ্ডের পরিচালন নির্দ্দিষ্ট করে, তাঁহারা নগ্নপদে কৌপিনসারবেশে দাঁড়াইলে, যে শুভ্র সাত্ত্বিকমহিমা বিকাশ পাইয়া উঠে, তাহা সমাজদেহের সমস্ত তমঃ অপসারিত করিয়া উহা করুণার শান্তিতে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। আমাদের সেই প্রীতিসমুদ্রে কে এই বিলাসের বাড়বানল জ্বালাইয়া দিল! আমরা স্নেহের সম্পর্ক ভুলিয়া গিয়া, শিশুর মত দোকানে দোকানে খেলনা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি এবং সেই চেষ্টার পরিমাণে উদর তৃপ্তির ব্যাঘাত জন্মিতেছে ও আয়ুক্ষয় হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সুতরাং আমাদের সামাজিক নেতাগণ যে সাধারণকে এই শিল্প বিলাসের গণ্ডি হইতে একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় ভালই করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বড় মানুষদের বাড়ীতে যে সকল আমোদ আহ্লাদের ব্যাপার সম্পন্ন হইত, তাহাতেই বিনা ব্যয়ে সর্ব্বসাধারণের তৃপ্তি ঘটিত, তাহা সশস্ত্র-প্রহরীসংরক্ষিত অর্গলবদ্ধ গৃহে কতিপয় বিলাসীবন্ধুর চিত্তরঞ্জনোপযোগী অনুষ্ঠান নহে। আকাশাচ্ছাদী সুবিস্তৃত চাঁদোয়ার নিম্নে সুপ্রসার ফরাসের দেহ ধূলিকলঙ্কিত করিয়া পল্লীর আবালবৃদ্ধগণ সেই আমোদে যোগ দিতেন এবং যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি দীর্ঘব্যাপী আমোদলহরীর মধ্যে যে নৈতিক সুশিক্ষা হইত, তাহাতে ধনী-ভূস্বামীর সঙ্গে দরিদ্র-প্রজার প্রীতিবন্ধন বৃদ্ধি পাইত এবং একান্নভুক্ত পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির পরার্থত্যাগের প্রবৃত্তি বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিত।

এখন যদি সত্যসত্যই সমাজের এরূপ অধোগতি হইয়া থাকে যে প্রাচীন অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য-জীবনের স্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব হইয়া থাকে, যদি সত্য সত্যই তুলার মের্জ্জাই কিম্বা বালাপোষ আমাদের চির অগ্রাহ্য হইয়া গিয়া থাকে, যদি কাষ্ঠপাদুকা কিম্বা কট্‌কী-চটী পরিতে পাদপদ্ম একবারেই নারাজ হইয়া থাকেন, যদি চক্‌মকী-পাথর ও গন্ধকশলাকাদ্বারা অগ্নি জ্বালিতে আমাদের নিতান্ত দরিদ্রগণও অস্বীকৃত হয়, তবে সমাজের বর্ত্তমান অভাব পূরণ করিবার জন্য দেশীয় শিল্পকে একটু ভিন্ন পন্থায় দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু এতদ্দেশীয় শিল্প পূর্ব্বকালেও দেশীয় ধনী লোকের চেষ্টায় বিকাশ পাইয়াছে, এখনও ধনিগণের চেষ্টা ব্যতীত ইহা সার্থক হইতে পারিবে কি না সন্দেহ।

ধনী সন্তানগণ এখন কোনও প্রকৃত সুখভোগ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে অবিরত সাহেবদিগের পরিতুষ্টির জন্য অর্থভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিতেছেন ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণকে দান করিবার সময় কড়াক্রান্তির বিচার করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রকৃত মর্য্যাদার হানি হইতেছে; তাঁহারা যাঁহাদের উৎসাহ পাইয়া ক্ষণিক একটু আত্মতৃপ্তির মোহ সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে নিজকে একান্ত হেয় করিয়া তুলিতেছেন। যাঁহারা নিজেরা স্বাধীন ও পৌরুষগর্ব্বে স্ফীত, তাঁহারা অপরের নীচতা ও দাস্য স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে হইলে সাময়িকভাবে যতই কেন বাহ্য প্রসাদের চিহ্ন প্রদর্শন করুন না কেন, হৃদয়ের ভিতরে তাঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রবল না হইয়া যায় না। এই আভ্যন্তরীণ অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব ঢাকিয়া তাঁহারা যে বাহ্য-সৌহার্দ্দের চিহ্ন প্রকাশ করেন, সেই সখ্য চিহ্ন কি হৃদয়ের প্রকৃত তৃপ্তি জন্মাইতে পারে? স্বদেশীয় শত শত সাশ্রুনেত্র দীনহীন তাঁহাদিগের দিকে অকৃত্রিম নির্ভরের ভাবে তাকাইয়া আছে, তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ যে প্রকৃত সন্তোষের সৃষ্টি করে, তাহা ধনিগণ এখন পাইতেছেন না, কিন্তু সেই তৃপ্তির জন্য লালায়িত হইতে না শিখিলে তাঁহাদের প্রকৃত সুখশান্তি লাভ হইবে না। পল্লীগ্রামগুলি ধনিগণ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ধনিগণেরও স্বাভাবিক শ্রী কতকটা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে প্রীতি আকর্ষণ করিয়া পরের অভাব মোচন করিয়া তাঁহারা প্রকৃত রাজপদে বরণীয় ছিলেন, সেই প্রকৃত রাজত্ব-স্পৃহা ত্যাগ করিয়া এখন তাঁহারা উপাধির রাজত্ব খুঁজিতেছেন। আর কি ফিরিয়া গ্রাম্য জীবনে সন্তুষ্ট থাকার পথ নাই? পরিত্যক্ত পল্লীর রাজগণ স্বীয় পল্লীতে ফিরিয়া আসুন, দেশীয় শিল্প তাঁহাদের চেষ্টায় উন্নত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে,—তাঁহাদের নিবাস স্থানের প্রস্তুত সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া তাঁহারা দেশের দৃষ্টান্তস্থলীয় হউন। যদি দেশের লোকের গার্হস্থ্য জীবনের অভাবগুলি কালবশে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে ও তাহা রোধ করিবার উপায় রহিত হইয়া থাকে, তবে অবস্থানুযায়ী বিধান করিবার জন্য তাঁহারা দেশীয় শিল্পকে নিযুক্ত করুন। ধনিগণ পল্লীতে ফিরিয়া গেলে,—ডাক্তার কবিরাজ, শিক্ষক, তাঁতি ও কাঁসারি সকলেই পল্লীতে ফিরিবেন এবং এখন পরিত্যক্ত পল্লীগুলি গুণ্ডার প্রাদুর্ভাব বশতঃ যেরূপ ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য হইয়া যাইতেছে—জমীদারগণের শাসনে তাহা নিবারিত হইয়া উহারা পুনশ্চ নিরাপদ হইবে, এবং যে সুন্দর স্বপ্নরাজ্য এখন মলিনতাগ্রস্ত হইয়া দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া পড়িতেছে, তাহা পুনর্ব্বার শস্যশ্যামল হইয়া উজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তিতে বিকাশ পাইয়া উঠিবে। আমাদের দেশের ধনীগণ অনেক সময় মনে করেন তাঁহাদের কোন কাজ নাই, সুতরাং অলসভাবে বৃথা উপাধি ও দুর্নীত আমোদের চেষ্টায় স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির অপব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এই দেশের মৃতপ্রায় শিল্প যে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য তৃষিত হইয়া আছে, তাঁহারা একবার ইহার পুনরুদ্ধার কল্পে সচেষ্ট হউন। কৃষ্ণনগরের রাজগণের চেষ্টায় যে সুন্দর মাটীর পুতুল নির্ম্মিত হইত, তাহা কারবারের পক্ষে উপযোগী নহে, মাটির জিনিষ ভাঙ্গিয়া যায়, পোর্সলেন (চীনে মাটী) দ্বারা এইরূপ মূর্ত্তি ছাঁচে গড়িলে, তাহা বিলাতী পুতুল পরিপ্লাবিত বাজারে দেশীয় শিল্পের জন্য এক নূতন বিজয়বার্ত্তা প্রচারিত করিতে পারে। আমাদের দেশের ধনিগণের মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যিনি এই পুতুলগুলিকে চীনে মাটিতে তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন; এইরূপ একটা কারবার বিস্তর লাভজনক হইতে পারে এবং ধনীগণের পক্ষে ধনাগমের নূতন

পন্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। দেশীয় চিত্র রাজা রবি বর্ম্মার চেষ্টায় আজ সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিলাতী অল্প মূল্যের ওলিওগ্রাফ্ চিত্রগুলি এখন বহু পরিমাণে বাজার হইতে তাড়িত হইয়াছে। এক একটি বিশেষ শিল্প অবলম্বন করিয়া ধনিগণ তদুন্নতি চেষ্টায় বদ্ধ পরিকর হইলে, তাঁহাদের নিজেদের সর্ব্বপ্রকার লাভ, যশোবিস্তার ও দেশের অসংখ্য হিতসাধিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যেরূপ মাঝে মাঝে বড় লোকগণের কৃপায় পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইত, এখন কামার, কুমার, শিল্পী, শিক্ষক ডাক্তার লইয়া কি জমীদারগণ নূতন পল্লী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহা সর্ব্বপ্রকারে শ্রীসম্পন্ন করিতে মনোযোগী হইতে পারেন না? একটি গ্রাম এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্লেগাতঙ্ক ইংরেজপ্রেরিত চাঁদার খাতার আতঙ্ক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভীতিবর্জ্জিত হইয়া আদর্শ-পল্লী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ধনী সন্তানগণের যে অর্থ গেজেটে কাগজে নাম প্রকাশের মূঢ় উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, তাহা যদি এই ভাবে ব্যয়িত হয়, তবে আমাদের কত না হিত সম্পাদিত হয়! এই যে নগরবাসী ধনী দরিদ্র সকলের শিশুগুলি কয়লার ধূমাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বিশুদ্ধ হাওয়া না পাইয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, পল্লীজীবনে স্বভাবের আশ্রয় পাইলে তাহাদের দেহে শ্রী ও মনে বল ফিরিয়া আসিবে, —পুষ্করিণী খনন ও জলনির্গমের সুব্যবস্থা করিলে পল্লীগুলি আবার স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতে পারে। পূর্ব্বকালে পল্লীতে অবরোধ প্রথা অতি শিথিল ছিল, রমণীগণ নদীতীরে,— এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় সর্ব্বদা হাঁটিয়া বেড়াইতেন, নানা স্নিগ্ধ মধুর সম্পর্কে গ্রামবাসী সকলের সঙ্গে পরস্পরের এরূপ একটা সৌহার্দ্দ্য থাকিত যে, রমণগিণ অবরোধ প্রথার কষ্ট অনুভব করিতেন না। এখন নগরের দ্বিতল ত্রিতল গৃহের সোপানাবলী উত্তীর্ণ হওয়ার প্রাত্যহিক উৎকট ব্যায়াম ব্যতীত নগরবাসিনীগণের ভ্রমণের গণ্ডী একবারে সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা প্রকৃতই পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিণী; চলা ফেরার সুবিধা একান্তরূপে লুপ্ত হইলে মানুষের স্বাভাবিক অনেক শক্তি লোপ পায়। এই নগরবাসিনিগণ যে চিররুগ্না হইয়া পড়িবেন ও তাহাদের হতভাগ্য সন্তানগণ যে বাতরোগগ্রস্ত ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? তারপর শিশুগণের নৈতিক-জীবনের পক্ষে নগরের মত বিষময় স্থান আর কি কল্পনা করা যায়! জমীদারগণ যদি পল্লিজীবন পছন্দ করেন এবং পল্লীর উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প হন, তবে এই সকল মহা অনর্থের প্রতিকার সম্ভবপর হয় ও আমরা বিদেশীয় রাজত্বে বাস করিয়াও হিন্দুরাজত্বের আভাষ কল্পনা করিতে পারি। আমাদের যোগ্যতা দেখিলে গবর্ণমেণ্ট কেনই বা প্রতিকূল হইবেন, জমীদারবর্গের দেশহিতকল্পে চেষ্টা দেখিলে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের অনুকূলতা করিবেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস। অন্যথা হইলেও কর্ত্তব্য-সম্পাদনের উন্নত ও নির্ম্মল আত্মতৃপ্তি হইতে কে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিত? আমরা যখন বৈদ্যুতিক-ট্রাম বা বাষ্পযানে আরোহণ করি, তখন কি আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক নহে যে, আমরা চিত্র পুত্তলিকার মত,— এই সকল বৃহৎ বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানে আমাদের কোন হাত নাই, বহুমূল্য পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আমরা অপর একজাতির বহুপরিশ্রমলব্ধ পুণ্যের অকর্ম্মণ্য অংশীদার হইয়াছি, তাঁহারা যদি আমাদের প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তবেই বা আমাদের ক্রুদ্ধ হইবার কি অধিকার আছে? যাঁহারা অশেষরূপ কঠোরতা সহ্য করিয়া স্বজাতীয় শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা যদি আমাদিগের অযোগ্যতা ও দৈন্য দেখিয়া ঘৃণায় সরিয়া বসেন, কিম্বা কথা না বলেন, সেই উপেক্ষা ও ঘৃণা কি আমরা যথেষ্টরূপে অর্জ্জন করি নাই! আমাদের অকর্ম্মণ্য স্পর্দ্ধা ও বৃথা বক্তৃতায় কেনই বা তাঁহারা কর্ণপাত করিবেন? আমাদের হাড়িকাষ্ঠে আবদ্ধ মেষের চীৎকারে দেবতারাও কর্ণপাত করেন না। যাঁহারা অযোগ্য, তাঁহাদের স্থান যোগ্যতর ব্যক্তিরা আবহমান কাল হইতে অধিকার করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং রেলপথে বা ষ্টীমারে যাওয়ার সময় তুল্যাসনে বসিতে পারিলেও তজ্জন্য 'অধিকার' 'অধিকার' বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করা আমাদের সঙ্গত নহে। যাহা প্রসাদ, তাহা প্রসাদের ন্যায় বিনীতভাবেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এখন আমাদের যোগ্যতা দেখাইয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করার প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকদিগের প্রতি আমরা না তাকাইলে বিদেশীয়গণ কেনই বা কৃপা প্রদান করিবেন? এই যে আমাদের

নিকট হতাদৃত হইয়া তাঁতিকুল নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে, এনেমল্ করা লৌহপাত্রের প্রভাবে কাংস্য-ব্যবসায়ীগণ স্বীয় দোকান ক্রমশঃ সংকীর্ণ করিতেছে, কেরাসিনের প্রবাহ আসিয়া আমাদের চক্ষুর জ্যোতির সঙ্গে সর্ষপ ব্যবসায়ীর ব্যবসায় মাটী করিয়া ফেলিতেছে, বিট-সুগার আসিয়া দেশীয় খর্জ্জুর ও ইক্ষুদণ্ডকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখাইতেছে,—আমাদের বিপদরাশি বন্যার মত চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগের সর্ব্বস্ব পরিপ্লাবিত করিয়া দিতেছে—এই শিল্প রক্ষাই আমাদের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত। মেক্সিকোর অসভ্যগণ স্বজাতীয় উন্নতিকল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ৬০ বৎসর কাল লবণের ব্যবহার ছাড়িয়াছিল, মাঞ্চেষ্টারের রঙ্গিন ন্যাকড়াগুলি ও বিলাতী আসবাব্ কি আমাদের এতই প্রিয় যে তজ্জন্য আমরা দেশশুদ্ধ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিব?

অনেকের ধারণা এই যে আমাদের কবিরাজী ঔষধ কতকগুলি রোগদমনের পক্ষে আশাতীত ফল প্রদান করে, এখন কবিরাজী ঔষধের অনুকূলে দেশীয় লোকদের মতি কতক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখা যায়, ইহা একটি শুভ লক্ষণ,—এই সকল ঔষধ বিক্রয়ে কতকটা বিলাতী প্রণালী অবলম্বন করিয়া--অর্থাৎ অনুপানের বাহুল্য দূর করিয়া এবং ভাল শিশিতে পূরিয়া যদি বিলাতে কোন কারবার খোলা যায় ও আড়ম্বর করিয়া বিজ্ঞাপনাদি প্রচারপূর্ব্বক উহার প্রতি সভ্যজগতের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, তবে বোধ হয়, এই ব্যবসায়টা বিদেশেও চলিতে পারে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশীয় শিল্পজাত নানা দ্রব্যই সমস্ত জগতে চলিত,— য়ুরোপ বিপুল-বদন-ব্যাদন করিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রকার শিল্প গ্রাস করিবার ভীতি উৎপাদন করিতেছে, আমরা উত্তর দেওয়ার ছলে কি এক আধটু মুখভঙ্গী করিতে পারি না, অন্ততঃ দুই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

এই বিপদের দিনে আমরা কোন অজ্ঞাত ভাবী-মহাজনের প্রতীক্ষা করিয়া আছি। যাঁহার হৃদয় সত্যসত্যই দেশের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিবে, যিনি পরদেশীয় পরিচ্ছদে স্বীয় দেহ অপবিত্র করিয়া দেশের জন্য মিছা মায়ার কান্না কাঁদিবেন না এবং বার্কের মত কথাগুলি গুরুগম্ভীর হইয়াছে কি না,—এই বিষয়ে অনুকূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্বদেশ হিতের চরমলাভ গণ্য করিবেন না, কিন্তু যিনি নির্জ্জন তপস্যা ও ত্যাগের দ্বারা মায়ের মূর্ত্তি কল্পনায় ধন্যা ও বরণীয়া করিয়া তুলিবেন; যিনি দেশীয় শিল্পকে পুনরায় দেশীয় অভাব মোচনের যোগ্য করিবার চেষ্টায় প্রাণ উৎসর্গ করিবেন; যিনি অসমর্থের সঙ্গে সমর্থের তুল্যাসন কল্পনার বৃথা কুহকে মুগ্ধ হইবেন না, অথচ যিনি স্বদেশের চীরবাসকেও মহার্ঘ বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইবেন; মুসলমানদের সময়ে যেরূপ ম্লেচ্ছস্পর্শে নিষ্ঠাবান হিন্দু স্নান করিতেন, বিদেশজাত দ্রব্যস্পর্শে যিনি আপনাকে সেইরূপ অপবিত্র মনে করিবেন, আর সর্ব্বোপরি যিনি হিন্দুকে নিবৃত্তি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন; নব-প্রবর্ত্তিত বিলাসমুখী-গতি ফিরাইয়া যিনি হিন্দু গৃহস্থকে তাঁহার জীর্ণকুটীরের পবিত্রতার গৌরবে হৃষ্ট করিবেন, যাঁহার মহিমার চক্ষু উন্মীলিত হইলে হিন্দু দেখিতে পাইবেন, এই বিলাসের প্রশ্রয় মনুষ্যকে হীন ও অপবিত্র করে; ধর্ম্মব্রত, উপবাস, পরসেবা এবং বাহ্য দৈন্য আত্মার পুষ্টিসাধন করে। এই আদর্শ লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত হইয়াছিল এবং জগৎ যদি আবার কোন কালে হিন্দুস্থানের নিকট শির অবনত করে, তবে এই নিবৃত্তি শিক্ষা করিতে তাহা করিবে। আমাদের ভাবী শিক্ষক সমস্ত বিলাসের দ্রব্যসম্ভার উপেক্ষা করিয়া হিন্দুর নিবৃত্তির চীরবসনখানির প্রান্তভাগ বিশ্বের জয়কেতু স্বরূপ ঊর্দ্ধে উড়াইয়া স্বজাতির নিশ্চিত ও অপ্রতিহত লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন, সেই নিবৃত্তি-সূচক পরার্থ ত্যাগস্বীকারের চিহ্নকে যে জাতি স্বীয় জাতীয় পতাকা বলিয়া বরণ করিয়া না লইবে, তাহা ধ্বংস মুখে পতিত হইবে। আমরা কৃত্রিম রাজা মহারাজার উপাধিতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া সেই প্রকৃত রাজচক্রবর্ত্তীর আশায় প্রতীক্ষা করিতেছি, তাঁহার জীর্ণ কুটিরকে আমরা মহারাজের প্রাসাদ বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইব, তাঁহার অমণ্ডিত ললাটে আমরা অক্ষয় রাজটীকা লিখিয়া দিব, আমাদের কবিগণের সালঙ্কার বাক্যাবলী সেই মহাজনের জীবনকে অমর-সঙ্গীতে পরিণত করিবে।

সেই মহাজনের আগমনের জন্য আমাদের জাতির তপস্যা করা উচিত। আমাদের দেশ যুদ্ধাদি হিংসা ব্যাপার ভুলিয়া গিয়াছে, আর লাঠিয়াল ও সঙ্গীনধারী দাঁড় করি-

বার প্রয়োজন নাই। আমরা ক্ষমা-সুন্দর চির-সহিষ্ণু সত্যব্রত দৈন্যকে আলিঙ্গন করিয়া লইব; আমরা পরকীয় ঐশ্বর্য্যদর্শনে লুব্ধ হইয়া সেই বিলাসের অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যাইব না—আমরা নিবৃত্তিমূলক কঠোর তপশ্চরণদ্বারা শান্তিলক্ষ্মীকে এদেশে পূজা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিব। এই ব্রতসাধনের জন্য আমাদের ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, কিন্তু বিদেশীয় সামগ্রী ত্যাগ করা আমাদের ত্যাগ নহে—লাভ। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা কেন না পারিব?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ভক্তিপ্রতিমা।

(চিত্র দর্শনে)

চিত্রপট আলো করি', মরি, নত জানু,
জোড়পাণি ভক্তির প্রতিমা! গদগদ
নিবিড় কুন্তলদাম পড়েছে ছড়ায়ে,
নয়ন-চকোর দুটি উর্দ্ধে গেছে উড়ি'!
এ মরতে আর নাই উহার পরাণ,
মুহূর্ত্তে চলিয়া গেছে অনন্তের দেশে;
স্বরগে মরতে বাঁধি পুণ্যের সোপান
ডাকিছে তাপিত নরে দেখাইয়া পথ!
এ নহে বিরাগতিক্ত নীরস তাপস
সাধিছে অরণ্যে ঘোর কঠোর সন্ন্যাস,
মধুর রমণী এ যে, কোমলা অবলা,
নিত্যকার প্রীতিছবি মানবভবনে!
মৃদু হাসি হাসিতেছে কি জানি স্বপনে,
কোথায় পেয়েছে যেন অমৃতের স্বাদ;
করে না মুক্তির আশা কাম্য সাধনায়,
শুধু কারে ভালবাসে পাগলিনীপ্রায়!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন।

বঙ্গ-সাহিত্য-পাঠকের নিকট কুন্দনন্দিনী অপরিচিতা নহেন। "বিষবৃক্ষে"র "কুন্দ"চরিত্র এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সরলতা ও মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশ এরূপ স্ফুটতরভাবে অন্য কোনও চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না। অদৃষ্ট-লাঞ্ছিতা পিতৃমাতৃহীনা, অনাথা, হতভাগিনী কুন্দনন্দিনীর দুঃখে "বিষবৃক্ষে"র পাঠকমাত্রেই অভিভূত হইয়া পড়েন। সহানুভূতি ও করুণায় হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়।

কুন্দনন্দিনীর চরিত্র সমালোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যদি কেহ কুন্দ-চরিত্রের নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিতে চাহেন; তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত, বিখ্যাত সমালোচক ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর "বঙ্কিমচন্দ্র" পাঠ করিয়া দেখিবেন। কিন্তু গিরিজাবাবু তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন সম্বন্ধে কোনও সমালোচনা করেন নাই এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে সে সম্বন্ধে কেহ কোনও কথা বলেন নাই। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে "কুন্দ" পিতার মৃত্যু-রজনীতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দু' চার কথা বলিতে প্রয়াস পাইব এবং সেই স্বপ্নের সহিত "বিষবৃক্ষে"র মূল ঘটনার কি সম্বন্ধ তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

পিতার মৃত্যু-রজনীতে কুন্দ স্বপ্ন দেখিল। দেখিল যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশমণ্ডলে যেন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্র নাই! তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী এক অপূর্ব্বজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি-সনাথ-চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল সহস্র শীতলরশ্মি স্ফুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। * * তখন কুন্দ সভয়ে সানন্দে চিনিল যে, সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। * * * পরে জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থা, কুন্দের মুখ চুম্বন করিয়া

বলিলেন, "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস্। আমি জানিতেছি যে বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা-বয়ঃ, এই কুসুমকোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস্ না। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন উত্তর করিল যে "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী অঙ্গুলিনির্দ্দেশদ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্রালোক দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, "ঐ দেশে।" কুন্দ যেন * * কহিল, "আমি অতদূর যাইতে পারিব না। আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া কুন্দের জননী মৃদুগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "বাছা, যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। * * * এখন তুমি আমার অঙ্গুলিসঙ্কেত-নীত নয়নে আকাশ প্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।" তখন জ্যোতির্ম্ময়ী অঙ্গুলি-সঙ্কেতদ্বারা গগনোপান্ত দেখাইলেন। কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীলগগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষ-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট, সরল, সকরুণ কটাক্ষ, তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিমগ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্বুদবৎ—গগনপটে বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন "ইহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভুলিও না, ইনি মহদাশয় হইলেও তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবোধে ইহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া, গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয়মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল, কিন্তু এবার পুরুষমূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশনয়নী যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীত হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।" ইহা বলিতে বলিতে সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল। * * * তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।"

কেহ কেহ বলেন যে, বঙ্কিমবাবু অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করিতেন এবং কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন সেই বিশ্বাসের পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। "চন্দ্রশেখরের" "যোগ না Psychic force" নামক অধ্যায়, সন্ন্যাসীর ক্ষমতাবলে "রজনী"র, শচীন্দ্রনাথের সহিত "কাণা-ফুলওয়ালীর" প্রণয়ের ইতিবৃত্ত ও কপাল কুণ্ডলার স্বপ্নে মহামায়ার ভ্রূকুটী দর্শন ইত্যাদি পাঠ করিলে, স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বঙ্কিমবাবু অলৌকিক শক্তি (Supernatural power) বিশ্বাস করিতেন। "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে" লব্ধপ্রতিষ্ঠ-লেখক ও ঔপন্যাসিক বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর আত্মমতও প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত প্রসঙ্গ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মন্ত্রে তন্ত্রে বঙ্কিমবাবুর আস্থা ছিল। কিন্তু আমরা শুধু এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলাম না। আমরাও গিরিজাবাবুর কথা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি যে, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে এমন কোন খুঁটি-নাটি ঘটনা নাই, যাহার সহিত মূল ঘটনার কোনও সম্বন্ধ নাই।

বিখ্যাত লেখক "আর্য্যদর্শন"-সম্পাদক, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কুন্দ-চরিত্রের সমালোচনায় নগেন্দ্রনাথের প্রতি কুন্দের প্রণয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি বলেন, "সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রের পরস্পর প্রেম গুণজ। নগেন্দ্রের কুন্দপ্রেম রূপজ; কিন্তু কুন্দের নগেন্দ্র-প্রেম কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত তাহার তিনি (বঙ্কিমবাবু) কোন উল্লেখ করেন নাই।"

দেখিতে পাওয়া যায়, কাহারও প্রতি কাহারও হৃদয় স্বতঃই প্রীতিপ্রবণ হয়। সেই প্রণয়ের মূল অনুসন্ধান করা দুরূহ। তাহাকেই নিষ্কারণ প্রেম বলা যাইতে পারে। যে প্রেম নিষ্কারণ তাহা অপ্রতিবিধেয়। সেই প্রণয় দুইটি হৃদয়কে অনুস্যূত করিয়া দেয়। ইত্যাদি দ্বারা ভবভূতি যে অহেতু অপ্রতিবিধেয় প্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন, কুন্দের নগেন্দ্র-বিষয়ক প্রেম সেই প্রেম। বঙ্কিমবাবু কুন্দে এই প্রেমের ছবি দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রেমের বিশ্লেষণ ও বিবরণস্থলে এই অহেতু ও অপ্রতিবিধেয় প্রেমের কোনও উল্লেখ করেন নাই।"

পূজ্যপাদ যোগেন্দ্রবাবু যদি কুন্দের স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করিতেন এবং তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কুন্দের নগেন্দ্র-বিষয়ক প্রেমকে "নিষ্কারণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমবাবুর "প্রেম-বিশ্লেষণ" সম্পূর্ণ (exhaustive) নহে। কারণ তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, "ভালবাসা এক কারণে উপস্থিত হয় না।" শুধু রূপ কিম্বা গুণ ব্যতীত ভালবাসা অন্য কারণেও সংঘটিত হইতে পারে। আমাদের মতে এই স্বপ্নকে কুন্দের নগেন্দ্র-বিষয়ক প্রেমের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং এই স্বপ্নই কুন্দনন্দিনীর প্রণয়ের পূর্ব্বরাগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কুন্দ স্বপ্নে এক "দেববিনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি" দেখিলেন; তাঁহার "সরল সকরুণ কটাক্ষ" কুন্দের হৃদয়ে স্তরে স্তরে বিদ্ধ হইয়াছিল। পর দিবস কুন্দ যখন বাস্তবজগতে সশরীরে সেই "অনিন্দ্য দেবকান্তি"-বিশিষ্ট নগেন্দ্রনাথকে দেখিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আসিতে আসিতে দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল, তাহার পর আর পা সরিল না। বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল! * * বালিকারা অগ্রসর হইতে হইতে সঙ্কুচিতা হইল দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাদিগের নিকট আসিলেন এবং কুন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না, কেবল বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এই সুন্দর মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত দেবমূর্ত্তি হইতে যে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হইবে, তাহা কুন্দ একবারও ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না! বাহ্যাকৃতি হইতে চরিত্র অনুমান করা অনেকটা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। একটি নূতন লোক দেখিলে জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক,—তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা অনুমান করিয়া থাকি। লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অবশ্য হয়ত অনেক সময় আমাদের অনুমান প্রকৃত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা অনুমান করিতে বিরত থাকি না। তাই কুন্দনন্দিনী অনুমান করিলেন যে, এই সুন্দর পুরুষ কর্ত্তৃক, তাঁহার কোন অনিষ্ট সম্ভব হইবে না। জননীর কথা কুন্দ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্নহেতু নগেন্দ্রনাথের প্রত্যেক কার্য্যে ও হাবভাবে কুন্দের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই বিস্ময়, কুন্দের নগেন্দ্রবিষয়ক প্রেমের অন্যতম কারণ। বিস্ময় হইতে প্রণয়োৎপত্তি সম্ভবও হইতে পারে। কারণ বিস্ময় ও ভালবাসা একশ্রেণীর মনোবৃত্তি বা মনাবেগ (emotion)। জড়জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈজ্ঞানিকেরা এক শক্তিকে (force) অতি সহজে অন্য শক্তিতে পরিণত করিতে পারেন। গতি (motion) হইতে বৈদ্যুতিকশক্তির প্রকাশ (electricity), আবার বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে তাপের বিকাশ ইত্যাদি বিজ্ঞানের মূল নীতি। বাহ্যজগতে যাহা সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, অন্তর্জগতেও তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়। তাই কোন বিখ্যাত ইংরেজ-লেখক বলিয়াছেন যে, "Admiration is the stepping stone to love" অর্থাৎ বিস্ময় প্রণয়ের সোপান স্বরূপ। প্রকৃতিগত হিসাবে (qualitative) বিস্ময়ের কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং সর্ব্ব প্রকার বিস্ময় হইতে অনুকূল ঘটনাচক্রে প্রেমের বিকাশ হইতে পারে। কবিগুরু সেক্সপীয়র "ওথেলো" নামক গ্রন্থে এই তত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ করিয়াছেন। "ডেস্‌ডেমোনার" চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বিস্ময় হইতে প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে। বালিকা "ডেস্‌ডেমিনা" ওথেলোর শৌর্য্যবীর্য্যের গল্প শুনিয়া বিস্মিতা হইত। সেই বিস্ময় কালে কিরূপে প্রেমে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সেক্সপীয়রের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। আমারও বিশ্বাস যে এই বিস্ময় হইতেই কুন্দের চিত্ত নগেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তবে রূপজমোহ যে কুন্দের চিত্তে আদৌ স্থান পায় নাই, আমরা এমত কথা বলিতে পারি না। কারণ যে রজনীতে কুন্দ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার পর দিবস কুন্দ প্রতিবেশী কন্যা চাঁপার সহিত স্বপ্ন-কথাচ্ছলে বলিলেন, "সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখনও দেখি নাই।" সুতরাং বুঝিলাম, সে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের রূপেও কুন্দের হৃদয় মুগ্ধ।

আর একটি কথা। স্বপ্নে কুন্দের মাতা কুন্দকে নগেন্দ্রনাথকে "বিষধরবৎ" প্রত্যাখ্যান করিতে উপদেশ

দিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু কুন্দ নগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে যে আচরণ লাভ করিলেন, তাহা আশাতীত। চিরকালের প্রতিবেশীরা কুন্দের দুর্দ্দশায় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট "বিষধর" নগেন্দ্রনাথ, তাঁহার প্রতি অসাধারণ করুণা প্রকাশ করিলেন। জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, কুন্দের হৃদয়ে সে স্মৃতি জাগরূক ছিল। গোবিন্দলালের "অসময়ে করুণা" হইতে রোহিণীর "কপাল পুড়িয়াছিল।" এই "অসময়ে করুণা" হইতে কুন্দেরও প্রণয় সঞ্চার হইল। রোহিণীর বিশ্বাস যে বিনাপরাধে সে গোবিন্দলালের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছে। কুন্দেরও বিশ্বাস যে তাঁহার জননী অকারণ নগেন্দ্রনাথের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন।

কুন্দের হৃদয়ে অলক্ষিতভাবে সহানুভূতির উদয় হইল। কুন্দ এই অন্যায়াচরণের প্রতিকার করিতে যত্নবতী হইলেন। তবে পূর্ব্বপ্রদর্শিত "বিস্ময়" যদি কুন্দের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিত, তাহা হইলে হয় তো কুন্দের কৃতজ্ঞতা অন্যভাবে প্রকাশ পাইত। সত্য বটে কুন্দ তারাচরণের গৃহিণী হইল; কিন্তু এই বিবাহের বহুপূর্ব্ব হইতে কুন্দ নগেন্দ্রনাথের প্রতি প্রেমাসক্তা। সুতরাং তারাচরণের প্রতি কুন্দের দাম্পত্য-প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় নাই। কুন্দের হৃদয়াকাশ কিছুকালজন্য তারাচরণ-মেঘে আবৃত ছিল মাত্র। তাই বঙ্কিমবাবু তারাচরণকে অত শীঘ্র অপসারিত করিয়া কুন্দের স্বাভাবিক চিত্তবিকাশের অবকাশ করিয়া দিলেন।—নগেন্দ্রনাথের প্রতি কুন্দের প্রচ্ছন্নানুরাগের প্রকাশ পাইবার সুবিধা হইল। তারাচরণের মৃত্যুর পর কুন্দ নগেন্দ্রনাথের বিস্তীর্ণ ভবনে আশ্রয় পাইলেন। "ক্ষণিক বিচ্ছেদে" তাঁহার মনোবৃত্তি দ্বিগুণতরভাবে বলবতী হইয়া উঠিল। তখন স্বীয় অদৃষ্ট চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা কুন্দের হৃদয়ে স্থান পাইত না। কিন্তু কুন্দের অদৃষ্ট নগেন্দ্রনাথের স্মৃতির সহিত এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে, কুন্দ যখনই অদৃষ্টের কথা ভাবিতেন, তখনই নগেন্দ্রনাথের চিন্তা ও মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। সুতরাং নগেন্দ্রনাথের প্রতি কুন্দের গূঢ় প্রণয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "সোণার সংসার ছারখার যাইতে বসিল। "বাপীতীরে" "নক্ষত্রালোকে বসিয়া কুন্দনন্দিনী এক দিন মনের দুঃখ ভাবিতে লাগিলেন।" পিতার পরলোকযাত্রার রাত্রে, কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না। কখনও মনে হইত না, এখনও মনে হইল না। কেবল আভাসমাত্র মনে আসিল।

এইমাত্র মনে হইল, "যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাঁহার মা যেন তাঁহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছেন।" কুন্দ ভাবিলেন, "বেশ তো; নক্ষত্র হইতে পারিলে তাঁহাকে তো রোজ দেখিতে পাইব।" স্বপ্নস্মৃতি তাঁহার প্রণয় আবেগকে আরও উচ্ছলিত করিয়া দিল। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া কুন্দ দেখিলেন যে, "যারা আমার জন্য এত করিয়াছে, তাহাদের তো সর্ব্বনাশ করিতেছি।" সুতরাং কুন্দ ভাবিলেন, "ডুবে মরি।" মরিবই; মরিব। বাবা গো!—তুমি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে। কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালার ন্যায়, কুন্দের সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট মনে পড়িল। কুন্দ তখন "বিদ্যুৎস্পৃষ্টার" ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। "আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি, আমি কেন মার কথা শুনিলাম না—আমি কেন গেলাম না! আমি কেন ম'লাম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।" এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সরোবর সোপান অবতরণ আরম্ভ করিলেন। "অস্খলিত-সংকল্পে সে মাতার আজ্ঞাপালনার্থ ধীরে ধীরে যাইতেছিল।" কিন্তু কুন্দের এই মরণ জননী-নির্দ্দিষ্ট দুঃখের মরণ নহে; সুখের মরণ। প্রণয়পাত্রের সুখের জন্য—মঙ্গলের জন্য—কুন্দ আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এখানেও নগেন্দ্রনাথ প্রতিবাদী হইলেন। কুন্দের মরা হইল না। যে গুপ্তপ্রণয় এতকাল ধরিয়া কুন্দের হৃদয় পলে পলে তিলে তিলে দগ্ধ করিতেছিল, এখন তাহা জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং সে বহ্নিতে গোবিন্দপুরের "সোণার সংসার" "কুন্দ-পতঙ্গ" সবই পুড়িয়া ছারখার হইল। সুতরাং বুঝিলাম যে কুন্দের স্বপ্ন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কি ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

তার পর হীরা দাসীর কথা। স্বপ্নে কুন্দ হীরাকে দেখিয়া ভীতা হইলেন না। কিন্তু দত্তদের গৃহে যখন সশরীরে হীরাকে দেখিলেন, তখন কুন্দের শরীর কণ্টকিত এবং আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল। * * কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া মৃদু নিক্ষিপ্ত শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?" প্রথম-দর্শন-জনিত এই ভীতিবিহ্বলতা কখনও কুন্দকে পরিত্যাগ করে নাই। কুন্দ যখনই হীরাকে দেখিতেন, অমনি অপরাধিনীর ন্যায় ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িতেন। প্রখর-বুদ্ধিশালিনী-হীরা তাহা বুঝিত। তাই সে দাসী হইয়াও মুনিবপত্নী কুন্দের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে সাহস পাইত। এ জন্য কুন্দ প্রভু-পত্নী হইয়াও দাসীর নিকট দাসীর মত থাকিতে লাগিল। হীরা দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর প্রভু হইয়া বসিল।

হীরার আচরণে কুন্দ হৃদয়ে ব্যাথা পাইলেও মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে পারিতেন না। তাই হীরা কুন্দকে হস্তগত করিয়া স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের পথ দেখিতে লাগিল। হীরাকে দেখিবামাত্র কুন্দ এক অস্পষ্ট অজ্ঞাত ভয়ে অভিভূতা হইয়া পড়িতেন। সুতরাং তিনি হীরার নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। দত্ত গৃহ হইতে রজনীযোগে পলায়ন করিয়া, কুন্দ যখন হীরাকর্ত্তৃক যত্নে রক্ষিতা হইতেছিলেন, সে সময়েও ভীতিবিহ্বলতা" তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাই মালতী-সংক্রান্ত ব্যাপার কুন্দ ভয়ে হীরাকে বলিতে পারিলেন না। তাই অসময়ে হীরার নিকট হইতে সদয় ব্যবহার লাভ করিয়াও কুন্দ হীরাকে না বলিয়া কহিয়া রাত্রিতে তাহার গৃহ ত্যাগ করিলেন। এই ভয়হেতু কুন্দ হীরাকে ভালবাসিতে পারিলেন না; বরঞ্চ তাহাকে এক অনির্দ্দিষ্ট, অব্যক্ত ভয়ের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কুন্দের প্রতি হীরার কর্ক্কশ আচরণে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ কুন্দের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

কুন্দ বুঝিলেন যে, এই "নারী বেশে রাক্ষসী" হইতে দূরে পলায়ন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের শুভদায়ক। কিন্তু হীরা হইতে দূরে পলায়ন কুন্দের পক্ষে অসম্ভব। কারণ সামান্য "রাক্ষসীর" ভয়ে হৃদয়ের "উপাস্য-দেবতা" নগেন্দ্রনাথ হইতে দূরে থাকিতে কুন্দ ইচ্ছুক ছিলেন না। নগেন্দ্রনাথের চিন্তায় নিবিষ্টা থাকিয়া, হীরার চিন্তা কুন্দের হৃদয়ে স্থান পাইত না। আনন্দের দিনে অশুভ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই কুন্দ যখন নগেন্দ্রনাথের চিন্তায় নিমগ্না থাকিতেন, তখন হীরাকে ভুলিয়া যাইতেন। এ সংসারে উৎসবের দিনে কে অশুভ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিতে চাহে? "গোবিন্দলালের প্রেম-বঞ্চিতা হইয়া ভ্রমর ভাবিলেন" "ভয় কি? যম তো আছেন!" উপাস্যদেবতার বিরক্তিভাজন হইয়া কুন্দ কি বাঁচিতে চাহেন? অকস্মাৎ "মৃত্যু-কিঙ্করী"-সদৃশ হীরা দুর্দ্দশাগ্রস্তা কুন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কুন্দের চিত্ত আজ ভীতিশূন্য। মরণ? সে তো আজ কুন্দের পক্ষে মঙ্গলময়। কাজেই অদ্য হীরাকে দেখিয়া কুন্দ ভীতা হইলেন না। কেমন করিয়া কুন্দ এ জ্বালা ভুলিবেন—এই চিন্তায় আজ কুন্দের হৃদয় আলোড়িত। দুর্দ্দশার দিনে অশুভ চিন্তা হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই কুন্দ জননী-নির্দ্দিষ্টা অশুভদায়িনী হীরার সংস্পর্শ হইতেও যন্ত্রণাবসান-পথ খুঁজিতে লাগিলেন্। "মৃত্যু সহচরী" হীরার মুখে আত্মহত্যার কথা শুনিয়া কুন্দ "আকাশের চাঁদ" হাতে পাইলেন। "সর্ব্বসন্তাপহারী, সর্ব্বদুঃখভঞ্জন যম, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় অগতির গতি যম"; তাহার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি কুন্দের হৃদয়জ্বালা জুড়াইবে না? দুর্দ্দিনে দুষ্টা স্বরস্বতীর অস্পষ্ট-পরামর্শ প্রণয়-লাঞ্ছিতা কুন্দের নিকট উপদেশবাণী বলিয়া বোধ হইল। স্বপ্নে "মহাকালীর বিরাগ ভাজন হইয়া কপালকুণ্ডলা আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।" আর "উপাস্য-দেবতা" নগেন্দ্রনাথকর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়া, হতভাগিনী কুন্দনন্দিনী নিরাশ প্রণয়ের শোণিতাক্ত বেদীর নিকট আত্মবলি প্রদান করিলেন।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে, একই স্বপ্ন হইতে দুইটি বিভিন্ন মনাবেগ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে কুন্দের জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অকালে কুন্দ-কুসুম শুকাইল।

শ্রীবিনোদলাল মজুমদার।

প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধার।

বঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কল্পে এখন নানা দিকে নানা আয়োজন হইতেছে। তাহার ফলে ইতিমধ্যেই প্রাচীন সাহিত্যের বহুল-কীর্ত্তিরাজির আবিষ্কার হইয়াছে। অদ্যাপি কত অসংখ্য রত্নরাজি অজ্ঞাত অবস্থায় থাকিয়া বিস্মৃতির অতল-গহ্বরের দিকে ক্রমশঃ প্রধাবিত হইতেছে, তাহা কে বলিবে? হস্ত-লিপিতে সীমাবদ্ধ সাহিত্যের শত্রু অনেক। আমাদের এত দিনের অবহেলায় ইহার কত সম্পত্তি যে কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

সম্প্রতি 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' প্রাচীন কাব্যাদি প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'সাহিত্য-সভা'ও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন,—যদিও তৎকৃত কার্য্যপরিমাণ আজও সামান্য। ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও অধুনা অনেক প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার হইতেছে। এ সকলই আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবিষ্কৃত প্রাচীন গ্রন্থরাজির তুলনায় উক্ত সমস্ত আয়োজনই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুমিত হয়। সকলে অনন্যমনে তৎ কার্য্যে নিযুক্ত না হইলে, আমাদের ধ্বংসোন্মুখ সাহিত্যের উদ্ধার সুদূরপরাহত হইবে, সন্দেহ নাই। আমাদের প্রত্ন-সাহিত্য এতই বিস্তৃত যে, দুই চারি জনের দ্বারা কখনও তাহার সমুদ্ধার সম্ভব নহে।

আমাদের ধনাঢ্যগণ সাহিত্য-বিষয়ে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত;—পক্ষান্তরে দরিদ্র-সাহিত্য-সেবিগণ এই কার্য্যে শরীরের শোণিত দান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, তাঁহাদের কষ্টার্জ্জিত অপ্রচুর অর্থদান করিতে আদৌ অক্ষম! সুতরাং এই অবস্থায় দীনা মাতৃভাষা আমাদের কাহার আশ্রয়ে যাইবেন?

বঙ্গে এখন সাময়িক সাহিত্যের খুবই প্রসার। প্রাচীন-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী পাঠক ও লেখকের সংখ্যাও এখন নিতান্ত সামান্য নহে। আমাদের সাময়িক পত্রাদি যদি প্রাচীন-সাহিত্যকে আশ্রয় দেয়, তবে তাহার উদ্ধার হইতে বেশী দিন লাগিবে না, ইহা নিশ্চয়। সাময়িক-সাহিত্যের নেতৃগণ ইচ্ছা করিলেই, ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তার আর সন্দেহ নাই।

এমন অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে, আকারের ক্ষুদ্রতা হেতু তাহাদের স্বতন্ত্র প্রকাশ নানা কারণে অসুবিধাজনক, অথচ সেগুলি সাময়িক পত্রাদিতে অনায়াসেই প্রকাশিত করা যাইতে পারে। প্রাগুক্ত 'সাহিত্য-পরিষৎ' প্রভৃতির চেষ্টায় বড় বড় পুঁথিগুলি প্রকাশিত হইতেছে। আমরা বলি, আমাদের মাসিকপত্রাদিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন কাব্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা হউক। ইহাতে কাহারও অনিষ্টাশঙ্কা নাই; পরন্তু মাতৃভাষার বিলুপ্তপ্রায় সম্পত্তির উদ্ধার-জনিত বিমলআনন্দ লাভের সম্ভাবনা আছে। সাহিত্যই জাতীয় জীবনের নিখুঁৎ ফটো। সাহিত্য ভিন্ন কোন জাতিরই অভ্যুদয় সম্ভব নহে। পুরাতত্ব নাই বলিয়া, ভারতের একটা চিরকলঙ্ক আছে। বঙ্গেরও কি তাহাই নহে? আমাদের বঙ্গদেশে, বাঙ্গালীজাতির এবং বাঙ্গালীহৃদয়ের অনেক তত্ব আমাদের প্রাচীন-সাহিত্যে আজও ভস্মাচ্ছাদিত হুতাশনের ন্যায় প্রচ্ছন্ন আছে। জাতীয় ইতিহাসের বা ভাষা-ইতিহাসের খাতিরে আমাদের সে সমস্ত তথ্যরাজির সংগ্রহ ও রক্ষণ যে একান্তই আবশ্যক, তাহা কি কোন বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে? আমরা যাহাকে তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, তাহাই হয়ত ঐতিহাসিকের নিকট অমূল্য রত্নস্বরূপ পরিগণিত হইবে। এই জন্যই পুরাতত্বের সামান্য কণিকাটি পর্য্যন্ত পরিবর্জ্জনীয় নহে। বিশেষতঃ বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যেরও অঙ্গ বৈকল্য ঘটিবে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? এই প্রাচীন সাহিত্যই বাঙ্গালী হৃদয়ের খাঁটি জিনিষ,—আধুনিক সাহিত্যের মত তাহা কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট নহে। বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইলে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে অবলম্বন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এইরূপ নানা শুভোদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই আমরা বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্যের নেতৃগণের নিকট প্রাচীন-সাহিত্যোদ্ধার কার্য্যে সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, আমাদের এই উদ্দেশ্যের সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া, তাঁহারা আমাদিগকে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

প্রাগুক্ত উদ্দেশ্য মতে অন্য আমরা 'প্রদীপের পাঠক-বৃন্দকে নিম্নোদ্ধৃত ক্ষুদ্র কাব্যখানি উপহার প্রদান করিতেছি।

শনির পাঁচালী।

বঙ্গের প্রাচীন বড় বড় কবিগণেরই জীবনকাহিনী অন্ধকার-গুহা-নিহিত, ক্ষুদ্র কবিগণের ত কথাই নাই! এই ক্ষুদ্র পুঁথির রচয়িতা 'দ্বিজ বিনোদ' সম্বন্ধেও আমরা কোন বৃত্তান্ত হস্তগত করিতে পারি নাই। কিন্তু সে জন্য আমাদের ক্ষোভ কি? পুরাতত্ত্ব-হীনতার জন্য ত আমরা জগতের নিকট চিরকলঙ্কিতই আছি!

পুঁথিখানি কিরূপ সুন্দর অথবা কতদিনের প্রাচীন, ভাষালোচনা করিয়া পাঠকগণ তাহা নিজেই মীমাংসা করিবেন। আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না। প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন জন্য আমরা লালায়িত নহি; ঐতিহাসিকতার জন্যই তাহা আদরণীয়। এই পুঁথিখানি চট্টগ্রামী-সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয় না। চট্টগ্রাম—আনোয়ারাবাসী উমাকান্ত শর্ম্মা 'নীলকান্দি' হইতে পুঁথিখানি নকল করিয়া আনিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় ৫০।৬০ বৎসরের কথা। মূল প্রতিলিপিতে লিপি-কালটি দেওয়া হয় নাই; প্রাচীন বাঙ্গালা কাগজের উভয় পৃষ্ঠে ইহা লিখিত হইয়াছে।

এই পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয়ে অর্থাৎ শনি-পূজা বা তন্মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বাক্য পল্লবিত করার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। শনি-পূজা আজও হিন্দুর মধ্যে বিশেষ রূপে প্রচলিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সত্যপীরের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, সূর্য্য ব্রতের পাঁচালী ইত্যাদি দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক পুঁথিগুলির উপাখ্যানসমূহ সকল দেশে সকল সময়ে একইরূপে চলিয়া আসিয়াছে;—মূলতঃ সকলেরই পরস্পর সাদৃশ্য রহিয়াছে! বাঙ্গালীর হৃদয়-বৃত্তির এই গতি পর্য্যালোচনার সামগ্রী, তাহাতে আর সংশয় নাই। যাহা হউক এইরূপেও যে আমাদের একটা সাহিত্য হইয়াছে, তাহাতে আমাদের নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করিতে হইবে।

বোধ হয় অনেকেই জানেন, একমাত্র প্রতিলিপির সাহায্যে কোন প্রাচীন রচনাই বিশুদ্ধরূপে প্রচারিত করা যায় না। এই জন্যই এই পুঁথির পাঠ মধ্যেও স্থানে স্থানে কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। বলিয়া রাখা উচিত যে, প্রাচীন সাহিত্যের অশুদ্ধি-শোধন, মহাজন-সম্মত নহে বলিয়া, আমরা পাঠোদ্ধারকার্য্যে অনেক স্থানে প্রাচীন বর্ণ-বিন্যাস পদ্ধতিরই অনুসরণ করিব। কিমধিকমিতি। পুঁথিখানি এইরূপ ঃ—

অথ শনৈশ্চরায় নমঃ।

সরস্বতী পদযুগে করিআ প্রণতি।
ব্যাস বৃহস্পতি পদে করিআ ভকতি॥
নবগ্রহ মধ্যেতে প্রধান গ্রহ শণি।
যার দৃষ্টে গণেশের মুণ্ড হৈল হানি॥
প্রত্যক্ষ জানিআ ভাই হইয় সাবধান।
মনের মানসে পূজা করহ তাহান॥
দেবতা হৈআছে পূর্ব্বে এই বিবরণ। (?)
লোকেতে হএছে যেই শুনহ এখন॥
চম্পক রাজ্যেতে ছিলো এক দ্বিজবর।
পিতৃমাতৃ ছিলো নাই (নাই) সহোদর॥
দয়াশীল কুলমান বিপ্র মহামতি।
ভার্য্যার সহিত বিপ্র করহে রক্ষতি (?)॥
জীবনের উপায় না দেখি কোন মতে।
কি করিব উপায় পরে বলহ আমাতে॥
ব্রাহ্মণী বোলেন প্রভু স্থির কর মন।
মহাগুণী রাজা আছে নামে সুদর্শন॥
বণিক্য কুলেতে জর্ম্ম কুলেতে প্রকাশ।
অধ্যাপক হইআ তুমি যাও তার পাশ॥
আপনা ধর্ম্মের কথা কহিও রাজাকে।
শিশু পড়ানের কাজে রাক্ষিবে তোমাকে॥
এতেক বচন দ্বিজ প্রত্যয় মানিয়া।
সহসাত রাজপুরে গেলেন চলিআ॥
জোর হস্ত করি বিপ্র লাগে বোলিবারে।
রাজা বোলে কি চাহ বিপ্র বলহ সত্বরে॥
বিপ্র বোলে মহারাজা করি নিবেদন।
আমার সমান দুঃখী নাহি ত্রিভুবন॥

যদি অনুকূল মোরে কর নৃপবর।
রাজপুত্র পড়াইব থাকি নিরান্তর॥
এথেক শুনিআ যদি রাজা সুদর্শন।
চৌপারিতে * নিবোজিয়া রাখিলা ব্রাহ্মণ॥
দুই জনের অন্ন বস্ত্র রাজ দ্বারে পাএ।
আনন্দিত হৈআ বিপ্র বালক পড়ায়॥
এক দিন শণি গ্রহ রাজ দ্বারে যাইতে।
সেই বিপ্র সঙ্গে দেখা হইলো অকস্মাতে॥
বালক সহিতে পুর্ব্বে শাস্ত্র পড়িছিলো।
অধ্যাপক দেখি শণির দয়া উপর্জিলো॥
শণি বোলে বর নেও ব্রাহ্মণ নন্দন।
বিপ্র বোলে বরদাতা হও কোন জন॥
যদি মোরে কৃপাযুক্ত হৈলা মহাশয়।
আপনার পরিচয় দেঅ মহাশয়॥
ব্রাহ্মণের কথা শুনি তুষ্ট হৈআ অতি।
শণি গ্রহ নাম মোর শুন মহামতি॥
ভক্তি করি মোর সেবা করহে যেই জন।
অপমৃত্যু নাই তার অকালে মরণ॥
সেবার বিধান কহি শুন মন দিআ।
জ্ঞাতি বন্ধু সকল আনিবো নিমন্ত্রিআ॥
সোআ সের প্রমাণ তণ্ডুল চূর্ণ যে করিবা।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দিআ রচনা করিবা॥
নৈবিদ্য বেষ্টিত করিয় রম্ভাফলে।
সোআ সের ইক্ষুরস শর্করা মিশালে॥
আর যথ নানা দির্ব্ব (দ্রব্য) দিয় নানা ফলে।
মধ্যে লৈআ বসিবেক বান্ধব সকলে॥
আর এক কথা আমি কহি যে তোমাতে।
অভিপ্রায় মত দির্ব্ব (দ্রব্য) করিয় সাক্ষ্যাতে॥
পাচালির মত কথা কহিহ ব্রাহ্মণে।
দণ্ডবত হৈআ করিয় নিবেদনে॥
সেবার বিধান এহি শোনহ ব্রাহ্মণ।
যাগ অভীষ্ট বর সেই লয়ে মন॥
শুনিআ ব্রাহ্মণ তবে হইল বিস্ময়।
আমার রাশিতে ভোগ অবশ্য আছয়॥
কৃপা করি বর যদি দিতে চাহ মোরে।
তোমা অধিকার ছাড় আমার উপরে॥
দ্বিজের বচন শুনি হইলো কৌতুক।
বৎসর নিয়মে দণ্ড করিবেক ভোগ॥
দশ দণ্ড অধিকার তোমার উপর।
এতেক বোলিআ শণি হইলা অন্তর॥
ঘরে আসি সব কথা কৈল ব্রাহ্মণীরে।
আজ্ঞানুসারের কর্ম্ম করিতে লাগিলো॥
শণির কৃপায়ে দ্বিজ বহু ধন পাইলো।
এই মতে বহুকাল সুখে গোঙাইল॥
মনের কৌতুকে সুখে বঞ্চয়ে ব্রাহ্মণ।
দৈবযোগে শণির ভোগ হৈল উপক্রম॥
দশ দণ্ড ভোগ শণি সাক্ষ্যাতে পাইলো।
হেন কালে সেই বিপ্র হাটেতে চলিলো॥
হাটেতে আসিআ বিপ্র নানা দির্ব্ব (দ্রব্য) কিনে।
গ্রহরাজ শণিদেব সেবার কারণে॥
দ্রব্য দিয়া ভাণ্ড ভরি বাড়িতে চলিলো।
মূল্য দিয়া রুহিতের মুণ্ড এক লৈল॥
শণির কপটে অঙ্গের বর্ণ হানি হৈল।
তরুতলে আসি বিপ্র বিশ্রাম করিল॥
সুদর্শন রাজার পুত্র নামেতে সুদিষ্টি।
উদ্যানেত গায়াছিল * আপনার রিষ্টি॥
পুত্রেকে ডাকিআ রাজা না পাইলো সত্বর।
কোতোআল আনি রাজা তর্জ্জিলো বিস্তর॥
রাজার আদেশে দূত করিলো গমন।
তরুতলে বিপ্রসনে হৈল দরশন॥
ব্রাহ্মণের সনে তবে দূতে কহে কথা।
শণির কপটে দেখি রাজপুত্রের মাথা॥
দূতে বোলে বিপ্র তুমি চলহ সত্বর।
বিপ্র নি' (নিয়া) ভেটি দিলো রাজার গোচর॥
তোমার পুত্রের মাথা দেখহ রাজন।
না জানি কি রূপে ছেদ করিছে ব্রাহ্মণ॥
পুত্রশোকে সুদর্শন বিচার না কৈল।
অস্ত্রধারী দূত স্থানে ব্রাহ্মণ ভেটিলো॥
দূতের প্রতাপে দ্বিজের কম্পিত অন্তর।
বুঝিলাম পরিত্রাণ নাহিক আমার॥

---

* চৌপারি—'চতুষ্পাঠী'র অপভ্রংশ মাত্র।

* গিয়াছিল।

দ্বিজ বোলে শুন দূত আমার বচন।
তোমার হস্তে হৈল আমার মরণ॥
কিন্তু এক নীতি আছে আমার কুলেতে।
মহামন্ত্র জপ করি যম ঘরে যাইতে॥
দূতে বোলে মন্ত্র জপ কর শীঘ্রগতি।
মালা হস্তে বসিলেক বিপ্র মহামতি॥
শণির বিষম মায়া বুজন সংশয়।
মারিয়া জীআইতে পারে সেই মহাশয়॥
উদ্যান হৈতে রাজপুত্র নানা দৈব্য (দ্রব্য) লৈআ।
আপনা মন্দিরে আইলো হরসিত হৈআ॥
রাজপুত্র দেখি সবে হরি হরি বোলে।
অকারণে ব্রহ্মবধ কৈল মহীপালে॥
পুত্রেরে দেখিয়া রাজা হৈল হরসিত।
কোতআল স্থানে রাজা বলিল ত্বরিৎ॥
বিলম্ব না কর দূত চল শীঘ্রগতি।
আমার সাক্ষ্যাতে আন বিপ্র মহামতি॥
রাজার আজ্ঞায় দূত চলিল সত্বরে।
দেখে বিপ্র বসিআছে মালা জাপ করে॥
কর জোর করি দূত বোলে তার কাছে।
তোমাকে নিবার আজ্ঞা দিআছেন রাজে॥
শীঘ্র করি চল যাই ব্রাহ্মণ নন্দন।
এত শুনি দ্বিজবর হরসিত মন॥
দূতের বচনে বিপ্র মালা সম্ভারিলো (সম্বরিল?)।
রাজার সাক্ষাতে যাইআ উপস্থিত হৈল॥
দণ্ডবত হৈআ রাজা পড়িলা চরণে।
বিবেচিআ কহ গোসাঞী শুনি বিবরণ॥
ব্রাহ্মণে বোলেন আমি কিছু নাই জানি।
দশ দণ্ড ভোগ মাত্র পাইআছিলো শনি॥
এতেক শুনিআ রাজা বড় তুষ্ট হৈল।
বহু মূল্য ধন দিআ ব্রাহ্মণ তুষিল॥
করিল অনেক দোষ ক্ষেম মহাশয়।
প্রণতি করিআ বহু করিলো বিনয়॥
দ্বিজ (বোলে) তোমার দোষ নাইক রাজন।
শণির কপটে হৈল এত বিড়ম্বন॥
রাজা বোলে কহ শুনি পূজার বিধান।
বিবেচি কহিতে লাগিল বিদ্যমান॥

ব্রাহ্মণের মুখ হৈতে শুনিআ বচন।
সরর্য্যা (স্বরাজ্য?) মিলি করে শনির সেবন॥
ঘরে গিআ ব্রাহ্মণে কহিল বিবরণ।
করহ শণির সেবা করিআ যতন॥
এই মতে শনির সেবা করে মাসে মাসে।
শনির কৃপাএ তার দরিদ্রতা নাশে॥
মধুকর নামে দাস ছিলেক নগরে।
কাল পাইআ সেই দাস গেল যম ঘরে॥
তার এক কন্যা আছে নামেতে নগরি।
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ফিরে ভিক্ষা করি॥
এই মতে কষ্ট করি দুই জনে খায়॥
দৈব যোগে এক দিন বিপ্র ঘরে যায়॥
ব্রাহ্মণের সজ্জা দেখি বিস্ময় হইলো।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলো ধন কোতায়* পাইলো।
সেই দিন রহিলেক ব্রাহ্মণের ঘরে।
দিবাগতে ব্রাহ্মণে যে সেবার সজ্জা করে॥
কুমারী জিজ্ঞাসাতে বোলিল ব্রাহ্মণ।
করিবো শণির সেবা শুন দিআ মন॥
এই ব্রত করে যেই কায়া মন চিত্তে।
ধন জন দেন, ঘোড়া রাজ্য পারে দিতে॥
এত শুনি কুমারী যে দৃঢ় ভক্তি কৈলো।
প্রসাদ পাইআ রামা কামনা করিলো॥
আর দিন যেই মত ভিক্ষা পাইআছিলো।
তাহার দ্বিগুণ ভিক্ষা সেই দিনে পাইলো॥
ঘরে আসি মাএ ঝিএ তারা দুই জন।
করএ শনির সেবা আনন্দিত মন॥
দৈব যোগে এক সাধু নামে চন্দ্রহাস।
শণির কপটে তার হৈল সর্ব্বনাশ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সনে সাধু সাগরে ডুবিলো।
জল মধ্যে সাধুসুত ভাসিতে আছিলো॥
দুই রাত্র একদিন ভাসিয়া ভাসিয়া।
মধুকর নারী ঘাটে লাগিলো আসিআ॥
মধুকরের নারী আইলো ভরিতে কলসী।
দেখিআ বোলিল সাধু শুন বৃদ্ধ মাসি॥
আমায় যদি তোল তুমি হস্তেতে ধরিআ।

* কোতায়—কোথায়।

গাইবো তোমার গুণ জগত ভরিআ॥
নারী বোলে শুন সাধু তবে আমি ধরি।
আমার ঘরেতে আছে পরম সুন্দরী॥
যদি বিহা কর সাধু সত্য কর তুমি।
পরম যতনে তোমায় উদ্ধারিবো আমি॥
সাধু বোলে শুন মাসি যদি ইহা পাই।
মানিআ আনন্দ আমি থাকি এই ঠাই॥
ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া মা (মাসি) তুলিলো সাধুরে।
পরম আনন্দে নিলো আপনার ঘরে॥
শণির কপটে সাধুর বুদ্ধি নাই সরে।
মধুকর ঘরে গিআ কন্যা বিহা করে॥
ইষ্ট মিত্র চলি গেল আপনার ঘরে।
বিবাহের অনুরূপে সেবা নাই করে॥
দৈবযোগে সেবা যদি মনেতে পড়িল।
শয্যা হৈতে উইঠে* রামা সেবা আরম্ভিল॥
সাধু বোলো কোন্ দেব সেবিলা নিশ্চয়।
এই দেবের সেবা কৈলে কোন্ ফল হয়॥
কন্যা বোলে এই সেবা যে জনে করএ।
মনের বাঞ্ছিত তাহা সর্ব্ব পূর্ণ হএ॥
হরিলে সে ধন পাএ মৈলে জীয়ে পুনি।
সাধু বোলে বহুধন হারিছি রমণি॥
এই সব ধন যদি ভাসিয়া উঠয়।
অর্দ্ধেক শণির সেবা করিমু নিশ্চয়॥
কথ দিন পরে সাধু মনে কৈল সার।
বাণিজ্য করিতে আমি যাবো পুনর্ব্বার॥
শাশুড়ীতে নিবেদিল সাধুর কুমার।
বাণিজ্যেতে যাই মাগো আজ্ঞা যে তোমার॥
শাশুড়ী শুনিয়ে বোলে হরসিত মনে।
শণির কৃপায় ধন তোলে তথক্ষণে॥
অর্দ্ধেক ভাঙ্গিআ শণি পূজিলো তথনে।
শণি দেব পূজা তুমি করহ যতনে॥
রমণীরে বোলে সাধু আনন্দিত মনে।
হাসিআ বিদায় মোরে করহ এথনে॥
এতেক শুনিআ রামা দিলেক উত্তর।
কুশলে বাণিজ্য করি আইস প্রাণেশ্বর॥

* উইঠে—উঠিয়া।

পুরী মধ্যে হইলেক মঙ্গল জোকার।*
উঠিলেক চন্দ্রহাস নৌকার মাজার॥
কাণ্ডারীকে বলিলেক সাধুর নন্দন।
উত্তরে গজেন্দ্র পাট করহ গমন॥
বিপদ হইলে মাত্র বুদ্ধি হয়ে নাশ।
হেলা করি শণিকে না পূজে চন্দ্রহাস॥
রাত্র দিবা দ্বাদশ দিবস বাহি গেলো।
ত্রয়োদশ দিবসে গজেন্দ্র রাজ্য পাইলো॥
গজেন্দ্র দেশের রাজা নামে কুচগীরি।
আচম্বিতে রাজার সর্ব্বস্ব হইলো চুরি॥
যেই ঘাটে ছিলেক সাধু চন্দ্রহাস।
চোরে তান ধন লৈয়া গেল তার পাশ॥
বহু মূল্য দির্ব্য (দ্রব্য) দেখিয়া সদাগর।
চন্দ্রহাস সেই দির্ব্ব (দ্রব্য) কিনিল সত্বর॥
প্রভাতে উঠিআ রাজা বসি সিংহাসনে।
কোতআলো আনি রাজা করিলো তর্জ্জন॥
রাজার আদেশে দূত চারি দিগে যায়।
শণির কপটে সাধু চোর ধরা খায়॥
বান্ধিয়া সাধুরে নিলো রাজার গোচরে।
বন্দি করি সাধুরে রাখিল কারা ঘরে॥ ১১৯

লাচারি।

করি হরি বিস্মরণ, (?) কান্দে সাধু নন্দন,
কেনে বিধি বিড়ম্বিলা মোরে।
ভূমণ্ডলে জনমিয়া, নানাবিধি দুঃখ পাইয়া,
ভালো বুদ্ধি না সরে আমার।
তুমি প্রভু (নিরঞ্জন), পতিত পাবনের ধন,†
তুমি প্রভু সংসারের সার।
অগতির গতি তুমি, বিশেষ অগতি আমি,
কৃপা করি করহ নিস্তার॥

পয়ার ছন্দ।

এই মতে সদাগরে করিলো স্তপন (স্তবন?)।
পুস্তক বাড়িআ যায়ে সঙ্ক্ষেপে রচন॥

* জোকার—জয়কার? জয়ধ্বনি।
† 'পতিত পাবনের' স্থলে সম্ভবতঃ 'পতিতের পাবন' হওয়ার ছিল।

সাধুর ক্রন্দনে দেবের দয়া উপজিলো।
রাজার অন্তরে গিআ প্রবেশ করিল॥
নিদ্রায়ে আছয়ে রাজা বিচিত্র আসনে।
স্বপ্নমতে কহে শনি নৃপতির কাণে॥
শুন শুন নরপতি আমার বচন।
আপনে গৃজিয়া (?) আছ আপনা মরণ॥
কল্য মুক্ত না করিলে সাধুর নন্দন।
বিপদ ঘঠিবে তোমার শুনহ বচন॥
এথেক বলি শনি গেলা নিজ স্থানে।
বর (?)* পাইআ কুচগীরি উঠে নিদ্রা হনে † ॥
কোতআল স্থানে আজ্ঞা কৈল নৃপবর।
সাধুরে লইয়া আইস আমার গোচর॥
রাজার আদেশে দূত গেলেক সত্বর।
কারাগার হৈতে সাধু আনিলো গোচর॥
রাজা বোলে সদাগর কহত সত্বর।
কি হেতু হইলো মর (মোর) এত অভ্যান্তর॥ ‡
এত শুনি সদাগরের হইল স্মরণ।
শনির কপটে আমার এথ বিড়ম্বন॥
রাজা বোলে কহ শুনি সেই উপদেশ।
উপদেশ পাইলে তোরে তুষিবো বিশেষ॥
দ্বিজ বিনোদ বোলে শুন নৃপমণি।
বহু মূল্য তুমি পাইবা দরশন শনি॥

রাজা বোলে কোতআল চলহ সত্বর।
রাজ্যেতে জানাঅ গিআ প্রতি ঘরে ঘর॥
সর্ব্ব রাজ্য মিলি কর শনির সেবন।
সাধুরে বিদায় কর দিআ বহুধন॥
সাধুকে বিদায় যদি করিলো রাজন।
চলিলেক চন্দ্রহাস আনন্দিত মন॥
সদাগর বিদায় করিআ নরপতি।
করিল শনির সেবা করিআ ভকতি॥

শনির কৃপায় রাজ্যের গ্রহপীড়া গেলো।
পূর্ব্ব হৈতে ধনবিদ্ধি (বৃদ্ধি) শতগুণ হৈল॥
কুচের নগরে শনি পূজে মাসে মাসে।
(আপনার গৃহে চলি আইল) * চন্দ্রহাসে॥
(শুভযোগে আনি) * নৌকা ঘাঠেত লাগাইল।
বার্ত্তা পাঠাইআ দিল শাশুড়ী নিকটে॥
মঙ্গল করি আইলো আনন্দিত মন।
(আশীষ করিয়া ?)* নৌকার খুলিলেক ধন॥
ঘরে আসি শনিকে পূজিল চন্দ্রহাস।
শনির প্রসাদে তার দুঃখ হৈল নাশ॥
মানিয়া শনির সেবা যেবা নাই করে।
সঞ্চিত যে ধন তাহার দিনে দিনে হরে॥
সকল গ্রহের মধ্যে প্রধান গ্রহ শনি।
সেবিলে সহস্র লাভ না সেবিলে হানি॥
এই পাচালি যেবা করে অবহেলা।
নিশ্চয় জানিয় সেই যম ঘরে গেলা॥
দ্বিজ বিনোদ বোলে শুন সাধু ভাই।
শনি দেব পরে আর অন্য দেব নাই॥
দণ্ডবত কর তবে সর্ব্ব ভক্তগণ।
শনির পাচালি কথা হৈল সমাপন॥ ১৩৯
"ইতি শনির পাচালি সমাপ্ত। শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মণ
হাল সাকিন নিলকান্দি এই পুস্তক।"

উক্ত 'নিলকান্দি' কোথায়?

শ্রীআবদুল করিম।

---

* 'বর' স্থলে সম্ভবতঃ 'ডর' হইবে।

† হনে—হইতে।

‡ 'অভ্যান্তর' না হইয়া সম্ভবতঃ 'অথান্তর' হওয়ার ছিল। (অথান্তর—বিপদ।) এই চরণস্থ 'মোর' স্থলে 'তোর' পাঠ হইলে অর্থের সঙ্গতি হইত।

* বন্ধনী মধ্যস্থ অংশগুলি পুঁথিতে কীটভুক্ত হইয়াছে।

সপত্নী।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্দ্ধমান রেল ষ্টেসনের নিকট প্রায় সারাদিনই গুল্‌জার। অনবরত ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী যাত্রী লইয়া আসিতেছে এবং নবাগত জনকে লইয়া যাইতেছে। রেলওয়ের সাহেব ও দেশীয় কর্ম্মচারিগণের যাতায়াতের বিরাম নাই বলিলেই হয়। ষ্টেসনের মধ্যে মুসাপিরখানায় প্রায় সকল সময়েই অনেক লোক; কেহবা পশ্চিমে যাইবে, কেহবা পূর্ব্বে যাইবে, সকলেই ট্রেণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেহ বা ছোট একটু শতরঞ্চি বিছাইয়া শয়ন করিয়াছে, কেহ বা মাল বোঝাই বস্তার উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে, কেহ বা একটা কাঠের সিন্ধুকের উপর ব্যাগ মাথায় দিয়া পড়িয়া আছে, কেহ বা প্রকাণ্ড একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে, কেহবা তামাক সাজিতেছে, কেহ বা তাহার কলিকার প্রসাদ পাইবার আশায় বলিতেছে,—"একটা ঠিক্‌রা কুড়াইয়া দিব কি? আপনার কাছে দিয়শলাই আছে?" একজন তামাক খাইতেছে দেখিয়া কেহ বা ব্যাগ্ হইতে নির্জ্জল হুঁকাটী বাহির করিয়া, ধূমপায়ীর নিকটে গিয়া বসিতেছে এবং বলিতেছে,—"কতদূর যাইতে হইবে, মহাশয়?" অপেক্ষাকৃত কোন ইতর লোক একটু দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—"বাবু কলিকাটী একবার দিবেন কি?" বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট কেহ কেহ সস্তা সিগারেট্ টানিতেছে, কেহ বা পানের দোনা বাহির করিয়া, পার্শ্বস্থ ব্যক্তি-বিশেষকে জিজ্ঞাসিতেছে, "মহাশয়! একটা খাবেন কি?"

একটু ফাঁকা জায়গায় একখানি কম্বল পাতিয়া চারিটি ভদ্রলোক বসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে ষ্ট্রাপ বাঁধা রেলওয়ের রগ্ জড়ান বিছানা আছে, বিলাতী ট্রাঙ্ক আছে, গড়-গড়া আছে এবং একজন ভৃত্য আছে। ভৃত্য বড় কলিকায় তাওয়া দয়া তামাকু সাজিয়া দিয়াছে, বাবুরা তাহা একে একে সেবন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন একখানি ষ্টেটস্‌ম্যান খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। দুইজন বিছানার বাণ্ডিলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলেন, চতুর্থ ব্যক্তি একটা ষ্টীল ট্রাঙ্কে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। অনুমান পঞ্চচত্তারিংশ বর্ষ বয়স্ক এক পুরুষ হুঁকা হাতে করিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিয়া মাটিতে বসিল, তাহার বস্ত্রাদি অতিশয় মলিন, পায়ের জুতা অনেক তালি-যুক্ত, বগলে একটি ভাঙ্গা ছাতা, বাম হস্তে গামছা জড়ান একটি ছেঁড়া ক্যাম্‌বিসের ব্যাগ্। লোকটির আকৃতি অতিশয় কৃশ এবং শরীরের ঊর্দ্ধভাগ সম্মুখের দিকে একটু নত, তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায় যে, সে অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া থাকে। ধীরে ধীরে সতৃষ্ণ নয়নে কলিকার পানে চাহিতে চাহিতে, এ ব্যক্তি বাবুদিগের নিকট আসিয়া বসিল। যিনি ট্রাঙ্কে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"তামাক খাইতে চাহ তুমি?"

আগন্তুক বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ! বড় ভাল তামাক, বেশ গন্ধ বাহির হইয়াছে।"

পূর্ব্ব বক্তা বলিলেন,—"খাইতে পার, কলিকা তুলিয়া লও।"

তখন সেই দরিদ্র অভ্যাগত অতি সাবধানে কলিকার নিম্নদেশ ধরিয়া তুলিয়া লইল এবং আপনার ছোট পাকা কুচ্-কুচে হুঁকাটির উপর বসাইয়া দিল। ঘোড়ার স্কন্ধে হাতীর মাথার মত বড় গরমানান হইল, তা হোক্, লোকটা চক্ষু বুজিয়া আস্তে আস্তে হুঁকা টানিতে লাগিল; তাহার হুঁকা বেশ কল-শুদ্ধ এবং তাহার ভিতরে একটু জল ছিল। ফরর্ ফরর্ শব্দে সে প্রাণ ভরিয়া তামাক খাইতে লাগিল। কিন্তু হায় বিধাতা কাহাকেও নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগ করিতে দেন না, পরমানন্দে অসুখের বিষ ঢালিয়া দেওয়াই বুঝি ভগবানের নিয়ম। সুখের গতি স্বল্পকালেই নিরোধ করা, বোধ হয়, জগতের ব্যবস্থা।

যিনি খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বড় ভয়ানক কাণ্ড, কলিকাতায় সদর রাস্তার উপরে একটা মেয়ে মানুষ খুন হইয়াছে।"

যাঁহারা চোক বুজিয়া বিছানা হেলান দিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন বলিল,—"কি রকম শুনি?"

অপর ব্যক্তি উঠিয়া বসিলেন। যিনি ট্রাঙ্ক হেলান দিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "ভাল করিয়া বল।"

কিন্তু এই সামান্য সংবাদ সেই দরিদ্র ধূমপায়ীর সমস্ত আরাম ও শান্তি অতি ভয়ানকরূপে নষ্ট করিয়া দিল। খুন হইয়াছে শুনিবামাত্র, সে এতই চমকিয়া উঠিল যে, কলিকা হইতে একটা জলন্ত গুল ছিট্‌কাইয়া তাহার মাথার উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে মাটিতে পড়িল, সে প্রাণপণ যত্নে চক্ষু বিস্তৃত করিল,—তাহার ওষ্ঠাধর পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া, এক বিকট গহ্বরের সৃষ্টি করিল। যে দুইটি বাবু বসিয়াছিলেন এবং যিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, এই হাস্যজনক দৃশ্য, সে তিন জনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

সংবাদপত্র পাঠকারী বলিতে লাগিলেন,—"একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে ছুরির আঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

একজন জিজ্ঞাসিলেন, "কে মারিল?"

সংবাদপত্র পাঠকারী বলিলেন,—"প্রকাশ নাই। হত্যাকারী ধরা পড়ে নাই।"

আর একজন জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় ঘটনাটা হইল?"

"টাকশালের কাছে, বড় রাস্তার উপর।"

"যাহাকে মারিল, তাহার কোন পরিচয় প্রকাশ আছে?"

"না।"

"বোধ হয় বেশ্যা?"

"না। তাঁহার হাতে লোহা, শাঁখা, সীঁথায় সিন্দূর, বেশ্যার কোন লক্ষণ বুঝা যায় না।"

"কোন লোক তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে?"

সংবাদপত্র পাঠকারী বলিলেন,—"না, বোধ হয় অন্য স্থানের লোক।"

যে আগন্তুক হাঁ করিয়া শুনিতে ছিল, সে হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সংবাদপত্র পাঠকারী বলিতে লাগিলেন,—"যখন পুলিশ তাহাকে রাস্তায় পতিত দেখিতে পায়, তখন সে মরে নাই। হস্‌পিটালে চালান দেওয়ার পর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মরিবার আগে সে দুই কথা বলিয়াছে,—"জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাম কুমুদিনী।"

যে লোক হুঁকা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে ভয়ানক চঞ্চল হইয়া উঠিল সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এই বাবু চারিজনকে তাহার যমদূত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

একজন বাবু জোরে বলিলেন,—"যাও কোথা? কলিকাটা দিতে হইবে না, বুঝি?"

লোকটা কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—"আজ্ঞে না। কোথাও যাই নাই, যাব কেন?"

সে কএক পদ চলিয়া গিয়াছিল, যেখানে গিয়াছিল, হুঁকা-কলিকা সেইখানে রাখিয়া দিয়া, দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, বিশেষতঃ বার বার পশ্চাৎ দিকে চাহিতে চাহিতে ষ্টেসন-ফটকের বাহিরে চলিয়া গেল।

বাবুরা পরস্পর এই লোকের কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন,—"লোকটা কি রকম বল দেখি?"

আর একজন বলিলেন,—"বোধ হয় একটু মাথা খারাপ।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—"নেশাখোর, চোর।"

সংবাদপত্র পাঠকারী বলিলেন,—"আমার তো মনে হয়, এই খুনের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে।"

আর একজন বলিলেন,—"অসম্ভব নহে!"

আর একজন বলিলেন,—"রকম দেখিয়া সেইরূপ মনে হয় বটে।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—"পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত ছিল।"

সংবাদপত্র পাঠকারী বলিলেন,—"কাজ কি ভাই গণ্ডগোলে? আমরা রাহাপীর লোক, আবার একটা বিভ্রাট বাধাইয়া কি লাভ?"

আর একজন বলিলেন,—"এখনও কিন্তু অনেক দূর যায় নাই।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—"দূর হউক ছাই, ও ভাবনায় আর কাজ নাই।"

লোকটা ষ্টেসনের ফটকের কাছে আসিয়া দেখিল, সম্মুখের বৃক্ষতলস্থিত দোকানে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া বেঙ্গল পুলিশের এক কনেষ্টবল বসিয়া রহিয়াছে। লোকটার পা কাঁপিতে লাগিল, শরীর পড়ে পড়ে হইল। অতি কষ্টে ফটকের প্রাচীর হেলান দিয়া সে প্রকৃতিস্থ হইল

তাহার পরে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া, নিঃশব্দপদে সে চলিতে লাগিল।

দোকান ছাড়াইয়া যাওয়ার পর সে চরণের বেগ বাড়াইয়া দিল। ক্রমে সে দৌড়িতে লাগিল বলিলেই হয়; কিন্তু তাহার বিপদ আরও গাঢ়তর হইল। সম্মুখে ফৌজদারী কাছারী, ইন্‌স্পেক্টার, দারোগা, জমাদার, কনেষ্টবল, চৌকীদার, আসামী, ফরিয়াদি সাক্ষী ইত্যাদি অনেক শ্রেণীর লোক গস্ গস্ করিতেছে। সে তখন ভয়ে মৃতকল্প হইল, কিন্তু বিপদে সাহসেরই প্রয়োজন, এই সুনীতি স্মরণ করিয়া, সে পশ্চিমমুখে রাস্তা অবলম্বনে আবার দৌড়িতে লাগিল। 'যঃ পলায়তি, স জীবতি।' এই হিতকথার মর্ম্ম সে সুন্দররূপে প্রণিধান করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

অনেক দূর যাওয়ার পর একটা ভাঙ্গা মসজিদ তাঁহার নয়নে পড়িল। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোন দিকেই লোক নাই। তখন সে সাহসে ভর করিয়া, সেই ভাঙ্গা মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত দিন লোকটা সেই জীর্ণ লতাগুল্মাবৃত পতনোন্মুখ ভজনালয়ে লুকাইয়া থাকিল। রাত্রি ১১টার পর অতি কষ্টে সে সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; এবং ধীরে ধীরে ষ্টেসনের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যখন সে ষ্টেসনে আসিল তখন রাত্রি ১২টা। বাহিরের একটা লোককে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে যে ট্রেণে যাইবে, তাহার এখনও দেড় ঘণ্টা বিলম্ব আছে। ষ্টেসনের মধ্যে সে গেল না। বাহিরে অন্ধকার-আচ্ছন্ন এক গাছতলায় বসিয়া রহিল।

যথাকালে টিকিটের ঘণ্টা হইল। গায়ে মোটা কাপড় দিয়া মুখের ভুরিভাগ সে ঢাকিয়া ফেলিল এবং টিকিট-ঘরের জনতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, অনেক কষ্টে সে বৈদ্যনাথ-জংসনের এক টিকিট কিনিল। যখন সে টিকিট কিনিতেছে, তখন কৌতূহলপরবশ আর এক ব্যক্তি সাগ্রহে তাহাকে দেখিতেছিল; লোকটার ভয়ের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গেল। টিকিটের দরুণ তাহার কএকটা পয়সা পাওনা ছিল, তাহা আর লওয়া হইল না। সে সেই দর্শকের নয়ন হইতে অন্তরালে যাইবার অভিপ্রায়ে কেবল টিকিট লইয়াই পলায়ন করিল।

যথাকালে ট্রেণ আসিলে, সে প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল, সেখানে অনেক আলোক জ্বলিতেছে। মুখের কাপড় টানিয়া টানিয়া, সে লজ্জাশীলা বঙ্গাঙ্গনার ন্যায় অবগুণ্ঠন-যুক্ত হইয়া পড়িল। তাহার এইরূপ বিসদৃশ ভাব দেখিয়া অনেকেই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

অনেক কষ্টে গয়া ও পাটনা জেলার ইতর লোক-পূর্ণ এক গাড়ীতে সে স্থান পাইল। লোকজনের কলরব কোলাহল কমিয়া আসিল, জলখাবার-ওয়ালারা ট্রেণের একধার হইতে অপরধার পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিতে লাগিল, পান, চুরট, দিয়াশলাই, হাঁকিতে থাকিল। টিকে, তামাক, কলিকা, গরম দুগ্ধ, ঘুঘ্‌নিদানা, মুড়ির-মোয়া বিক্রেতারা ডাকিতে লাগিল। ফার্ষ্ট-বেল হইয়া গেল। ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার সময় নিকট হইল, ঘণ্টা-ধ্বনির পর বিকটশব্দে ইঞ্জিন আপনার সজীবতা ঘোষণা করিল। গাড়ী চলিতে লাগিল, লোকটা তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা প্রায় ৯টার সময় মেদিনী কাঁপাইতে কাঁপাইতে ট্রেণ আসিয়া বৈদ্যনাথ জংশন ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। যাহাদের সেখানে নামিবার প্রয়োজন ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি নামিল, যাহাদের সেই ট্রেণে যাইবার প্রয়োজন তাহারা আরও তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিল। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বর্দ্ধমানাগত সেই লোকটিও ধীরে ধীরে নামিল, রেলের গাড়ীর মধ্যে সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল, গাড়ীর বাহিরে আসিতে তাহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল; চরণ চলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল,—তথাপি তাহাকে নামিতে হইল। সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে অন্যান্য লোকের সহিত সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; 'ওভার ব্রিজে'র নিকটস্থ হইলে, এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে "হরিশ হরিশ" বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। লোকটি ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল, সে পশ্চাতে ফিরিল না। কাহারও দিকে লক্ষ্য করিল না, বেগে 'ওভার-ব্রিজে'র উপর উঠিতে লাগিল।

আহ্বানকারী তাহার নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করিয়াও পারিয়া উঠিল না। সম্মুখে একটি বাবু কতকগুলি স্ত্রীলোক

ছেলেপিলে ও লটবহর লইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সেই লোকের নিকটস্থ হইবার সুবিধা আহ্বানকারীর হইল না।

'ওভার-ব্রিজ' হইতে নামিয়া যেখানে টিকিট দিতে হয়, সেখানে আহ্বানকারী ভীত-ব্যক্তির নিকটে আসিয়া পঁহুছিল। আহ্বানকারী দেওঘর যাইবে। যাহারা দেওঘরের যাত্রী তাহারা প্রায়ই, সেই স্থান পর্য্যন্ত টিকিট কিনিয়া আইসে; তাহাদিগকে এখানে টিকিট দিতে হয় না এবং এ দরজা দিয়া বাহির হইতে হয় না। লোকটা এখানে টিকিট দিয়া বাহিরে গেল দেখিয়া আহ্বানকারীও আপনার টিকিট দেখাইয়া বাহিরে আসিল, এবং তাহার অনুসরণ করিল।

লোকটা একটু বেগে যাইবে ইচ্ছা করিয়াছিল, অনেক পাণ্ডা তাহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল; কেহ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "মহাশয়ের নিবাস?" কেহ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আপনার নাম?" কেহ জিজ্ঞাসিল "আপনার পাণ্ডা কে?" নাম নিবাস বলিয়া ফেলিতে পারিলে হয় ত সে সহজে মুক্তি পাইত, কিন্তু কোন মতেই আপনার পরিচয় দিবে না, পাণ্ডারাও ছাড়িবে না। বালক অভিমন্যুবৎ এই নবাগত লোক পাণ্ডা-বৃহ ভেদ করিতে পারিল না।

আহ্বানকারী তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,—"হরিশ! কথা কহিতেছ না কেন? ডাকিলে উত্তর দাও না কেন? এখানে আসিয়াছ কেন?"

লোকটা কোন কথা কহিল না। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অচল মাটির সঙের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আহ্বানকারী ঘুরিয়া তাহার বদনের সম্মুখে আসিল এবং বলিল,—"একি হরিশ দাদা! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, ব্যাপার কি? আমরা ন্যাঙটা-কালের ইয়ার, এক গ্রামে এক দরজায় বাড়ী, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, তোমার হইয়াছে কি?"

আহ্বানকারী হরিশের হাত চাপিয়া ধরিল, তখন হরিশ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি কাহাকেও চিনিতে পারি না গো, কোথাও আমার বাড়ী নহে গো, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি চলিয়া যাই।"

আহ্বানকারী উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"দেখিতেছি তোমার বায়ুরোগ ঘটিয়াছে, নতুবা চিরকালের আত্মীয় রামদাসকে তুমি আজ চিনিতে পারিতেছ না কেন? এ বিদেশে তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি কোন মতেই ছাড়িতে পারি না; যত ক্ষতি হয়, অসুবিধা হয় হউক তোমার সঙ্গেই আমার থাকিতে হইবে।"

তখন হরিশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"রামদাস রে! তোর মনে এই ছিল, শেষে যমদূত হইয়া তুই আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে আসিলি? আমাকে ছাড়িয়া দে আমি পলাইয়া যাই।"

ভিড় আরও বাড়িতে লাগিল। রেলওয়ে পুলিশের দুই জন কনেষ্টবল এবং একজন জমাদার দেওঘর লাইনের প্লাটফর্ম হইতে আসিয়া মেন্ লাইনের প্লাটফরমে যাইতে ছিল। ষ্টেসনের ফটকের নিকট লোকের ভিড় দেখিয়া ও কলরব শুনিয়া তাহারা যে দিকে যাইতে ছিল সে দিকে না গিয়া গণ্ডগোলের দিকে ফিরিল। দূর হইতে লোকের ফাঁক দিয়া হরিশ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। তখন সে বুঝিল, পুলিশের লোকেরা তাহাকেই ধরিতে আসিতেছে, সে তখন কাণ্ডজ্ঞানহীনের ন্যায় ভিড় ঠেলিয়া আপনার গামছা জড়ান ব্যাগ ও ভাঙ্গা ছাতা ফেলিয়া প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল।

তখন জমাদার পাকড়াও পাকড়াও শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। দুই জন কনেষ্টবল এবং আরও কয়েক জন লোক হরিশের পশ্চাতে ছুটিল। অতি অল্পদূর যাওয়ার পরই কনেষ্টবলদ্বয় তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, হরিশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই ধর্ম্ম অবতার আমি খুন করি নাই। খুন করিতে বলি নাই, তোমাদের পায়ে-পড়ি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

ছাড়া দূরে থাকুক, তাহারা আরও কায়দা করিয়া হরিশকে ধরিল এবং জমাদারের নিকট টানিয়া আনিল। জমাদারের নিকট কাতরভাবে হরিশ বলিল,—"আপনি আমার বাবা! আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি খুন করি নাই।"

জমাদার দেখিল, এ একটা খাস্ত বটে। এরূপ শিকার কখনই ছাড়া যাইতে পারে না। রেলওয়ের পুলিশ সবইন্‌স্পেক্টার সে দিন জংশনে ছিলেন, জমাদার এ

ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া উচিত বোধে কনেষ্টবলদের বলিল,—"সাবধানে আমার সঙ্গে ইহাকে লইয়া আইস।"

জমাদার অগ্রে চলিতে লাগিল, রোরুদ্যমান হরিশকে কনেষ্টবলেরা পশ্চাতে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

সবইন্‌স্পেক্টার তখন প্লাটফরমের উপর একখানি চেয়ারে বসিয়া পুলিশ গেজেট পাঠ করিতে ছিলেন। হরিশকে সঙ্গে লইয়া জমাদার ও কনেষ্টবলেরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

দারোগা কাগজ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"এ কে! কাহারও পকেট হইতে কিছু চুরি করিয়াছে না কি?"

জমাদার বলিল,—"এ খুনী আসামী, হুজুর জিজ্ঞাসা করিলে সব জানিতে পারিবেন।"

তাহার পর জমাদার স্বয়ং গিয়া হরিশের হাত চাপিয়া ধরিল এবং কনেষ্টবলকে বলিল,—"বাহিরে ইহার ব্যাগ আর ছাতা পড়িয়া আছে, তুমি শীঘ্র গিয়া আন।"

হরিশ বলিল,—"ধর্ম্ম অবতার আপনি দিন দুনিয়ার মালিক, সূক্ষ্ম বিচারের কর্ত্তা, আমি খুন করি নাই, চরণের বড় বউ, রাখাল দাসী তাহাকে খুন করিয়াছে। আমি কিছু জানি না, তবু আপনারা কেন অন্যায় করিয়া আমার কষ্ট দিতেছেন?"

যে কনেষ্টবল ব্যাগ ও ছাতা আনিতে গিয়াছিল, সে তাহা লইয়া ফিরিল। দারোগা বুঝিলেন, হয়ত, একটা বড় খোসনামের কাজ সহজেই হইয়া যাইবে। কনেষ্টবলকে দোয়াত, কলম, কাগজ, আনিতে বলিলেন। হরিশকে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার মত লোক কখন খুন করিতে পারে না, ইহা আমরা তোমার চেহারা দেখিয়াই বুঝিতেছি, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি সকল কথা আমার নিকট সত্য করিয়া বল, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ছাড়িয়া দিব।"

হরিশ বলিল,—"আমি মিথ্যা বলিব না। মিথ্যা কথা আমি জানি না, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহারই সত্য উত্তর দিব।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"যাহাকে খুন করিয়াছে, তাহার নাম কি?"

হরিশ বলিল,—"কুমুদিনী। বামুনের মেয়ে, কাজেই দেবী বলিতে হয়।"

তখন দারোগার অনেক কথা মনে পড়িল, তিনি পুলিশ গেজেটের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটা স্থান মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"টাক্‌শালের কাছে ভোর বেলা পিঠে ছুরি মারিয়া ছিল, কেমন! তাহার বয়স ১৮ বৎসর, দেখিতেও সুন্দরী, হাতে শাঁখা ছিল, কেমন নয়, আমি সব ঠিক কথা বলিতেছি কি না?"

হরিশ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ। আপনি সবই জানেন, তবে আর আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন কেন?"

দারোগা বলিলেন,—"আমি সবই জানি, তবে দুই একটা কথা যদি আমার ভুল জানা থাকে, তাহাই তোমার মুখে শুনিয়া ঠিক করিয়া লইতে চাহি। তুমি লবঙ্গকে চেন?"

হরিশ বলিল,—"আজ্ঞে লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, যইত্রি, জায়ফল অনেক চিনি।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"লবঙ্গই তো কুমুদিনীকে কলিকাতায় আনিয়া ছিল?"

হরিশ বলিলেন,—"রাধাকৃষ্ণ। লবঙ্গই লোকে বাজার হইতে আনে, লবঙ্গ কাহাকেও আনিতে পারে কি?"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কুমুদিনীকে কলিকাতায় আনিয়াছিল কে?"

হরিশ বলিল,—"তাহার সহোদর ভাই শরৎ।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন, "সে শরৎ এখন কোথায়?"

হরিশ বলিল,—"সে ভগ্নীকে ভগ্নিপতির বাসায় রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছে।"

দারোগা বলিলেন,—"চরণবাবুর তবে দুই বিবাহ? রাখাল দাসী বোধ হয় তাঁহার ছোট স্ত্রী, তাঁহাকে লইয়াই তিনি কলিকাতায় থাকেন। বড় স্ত্রী কুমুদিনী বাপের বাড়ীতে থাকিতেন, কেমন?"

হরিশ বলিল,—"আজ্ঞে না, কথাটা উল্টা হইতেছে। বড় স্ত্রী রাখাল দাসীর সন্তান না হওয়ায়, কৃষ্ণগঞ্জে এক গরিব ব্রাহ্মণের কন্যা কুমুদিনীকে চরণবাবু বিবাহ করেন। বড় স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে বিবাহ হয়, বিবাহের অনেক দিন পরে, রাখাল দাসী খবর জানিতে পারেন।

বড় রাগী হিংশুক দুরন্ত মেয়ে মানুষ, বিবাহের খবর জানিতে পারিয়া স্বামীর সহিত বড় বউ তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দেন, ছোট বউর কাছে যাওয়া দূরে থাক, তাহার নাম করিতেও চরণবাবুর ক্ষমতা থাকিল না।"

দারোগা বলিলেন,—"বেশ কথা তুমি বলিতেছে, তোমার কথা এক বর্ণও মিথ্যা নহে। কিন্তু এখানে বাহিরে বসিয়া এ সকল কথায় কাজ নাই। আইস ভিতরে যাই।"

দারোগা অগ্রসর হইলেন। হরিশকে লইয়া জমাদার ও কনেষ্টবল চলিল, একজন কনেষ্টবল হরিশের ব্যাগ, ছাতা এবং লিখিবার সরঞ্জাম লইল। একটি খালি কামরার ভিতরে সকলে প্রবেশ করিলেন এবং আসন গ্রহণ করিয়া হরিশকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার নাম কি বাপু?"

হরিশ বলিল,—"আজ্ঞে হরিশ্চন্দ্র দাস দত্ত।"

"কোথায় নিবাস?"

"আজ্ঞে নিবাস আর নাই। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বাস ছিল, কিন্তু আমার কপাল-দোষে সকলই গিয়াছে। এখন চরণ বাবুর জোড়াসাঁকোতে থাকি, তিনি অতি মহাশয় লোক।"

"কিছু আহারাদি হইয়াছে?"

হরিশ বলিল,—"কাল মধ্যাহ্নে বর্দ্ধমানের এক হোটেলে চারিটি ভাত খাইয়াছিলাম, তাহার পর এ পর্য্যন্ত আর জলবিন্দুও মুখে দিই নাই।"

দারোগা একজন কনেষ্টবলকে দোকান হইতে চারি আনার জলখাবার আনিয়া দিতে বলিলেন।

হরিশ বলিল,—"এখন স্নান আহ্নিক হয় নাই, এখন কিছু খাইব না। আফিং খাওয়ার সময় হইয়া আসিল, ব্যাগে আফিংএর কৌটা আছে, অনুমতি করিলে একটু আফিং খাইয়া বাঁচি।"

দারোগার আদেশে কনেষ্টবল হরিশকে ব্যাগ দিল। হরিশ কোমরের ঘুন্‌সি হইতে একটি চাবি বাহির করিল এবং তদ্দ্বারা ব্যাগ খুলিল, ব্যাগ হইতে কেবল আফিংএর কৌটা বাহির করিয়াই সে ক্ষান্ত হইল না। একটি ছোট হুঁকা, কলিকা, কাগজ জড়ান একটু তামাক এবং শালপাতের ঠোঙা-মধ্যস্থ কয়েকখণ্ড ভাঙ্গা টিকা সে বাহির করিল। তাহার ব্যাগে এই সকল পদার্থ ব্যতীত একখানি ময়লা ধূতি ও একটি ছেঁড়া কোট ছিল।

হরিশ বলিল,—"বাবু, আফিং খাই, কাজেই তামাক খাওয়া বড় অভ্যাস। অনেকক্ষণ তামাক খাই নাই, যদি হুকুম দেন, তাহা হইলে একটু তামাক সাজি।"

দারোগা বলিলেন,—"খাবে বৈ কি! স্বচ্ছন্দে তামাক তৈয়ার কর। আমিও তামাক আনাইতেছি।"

দারোগা ভৃত্যদ্বারা তামাক আনাইতে কনেষ্টবল পাঠাইলেন।

হরিশ পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া টিকা ধরাইল এবং ছোট কলিকায় বিশেষ যুত করিয়া তামাক সাজিল, তাহার পর হুঁকা হাতে লইয়া ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শুক্‌না হুঁকায় একটু জল দিতে তাহার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কোথাও জলপাত্র নাই। দারোগার ভৃত্য একটা পিতলের গুড়্‌গুড়িতে একটা বড় কলিকায় তামাক সাজিয়া আনিল।

দারোগা বলিলেন,—"হুঁকাটায় জল দিলে ভাল হয়, নয় হরিশ? আমার চাকরের হাতে হুঁকা দাও এখনি জল পূরিয়া আনিবে।"

ভৃত্যের হাতে হুঁকা দিয়া হরিশ বলিল,—"আপনার জয় জয়কার হউক। আপনার মত সদ্বিবেচক লোক আমি আর দেখি নাই। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি অতি সামান্য লোক, জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না। আপনি——"

দারোগা বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ, কলিকাতার নিকট বরাহনগরে আমার বাসস্থান, আমার নাম শ্রীহরনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

হরিশ গলায় কাপড় দিয়া ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া দারোগাকে প্রণাম করিল, এবং বলিল,—"এ অধমেরা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আপনাদের সেবক।" বাস্তবিক দারোগা হরনাথ যথার্থ ভদ্রলোক, তিনি লেখা পড়ায় সাধারণ পুলিশ কর্ম্মচারীর ন্যায় অনভিজ্ঞ নহেন, আইন ও ন্যায় উভয়েরই মর্য্যাদা তিনি রাখিতে জানেন; অকারণ কখন কাহারও উপর তিনি অত্যাচার করেন না। অযথা প্রভুতা-বিস্তার করিয়া তিনি কাহাকেও উৎপীড়িত করেন না। দারোগার সম্মুখে আসিয়া হরিশের মনে হইয়াছিল যে, যমদূতেরা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া শমন-রাজের সম্মুখে হাজির করিল, সে তখনি স্থির করিয়াছিল, এখনি এ মহাত্মা তাহার ফাঁসি দিবেন। ভাবিয়াছিল, ফাঁসির দড়ি তাহার গলায় পরান হইয়াছে; কেবল তাহা লট্‌কাইতে বাকি।

ক্রমে দারোগার সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার আশঙ্কা তিরোহিত হইতে লাগিল। সে বুঝিল, এই মহাত্মার দ্বারা সে কখনই বিপদে পড়িবে না। যাহাদের বুদ্ধি একটু কম, তাহারা যখন যাহা বুঝে, সহজে তাহা ভুলে না ও ছাড়িতে চাহে না। হরিশ যখন বুঝিয়াছিল যে, তাহার বিপদ পদে পদে, তখন সে কারণে অকারণে কেবল বিপদেরই ছায়া দেখিয়া কাঁদিয়াছে। আবার এখন তাহার মাথায় সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নভাব প্রবেশ করিয়াছে, সে অতীত ব্যাপার ভুলিয়া গিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বুঝিয়াছে এবং নিশ্চিন্ত হইয়াছে। যাহারা স্বভাবতঃ একটু ভীত লোক, তাহারা যখন সাহস পায়, তখন প্রায়শঃপূর্ব্বের ভীতিভাব ভুলিয়া যায়। হরিশ দারোগা মহাত্মার কৃপায় ভয়ের কোন কথাই মনে স্থান দিতেছে না।

ভৃত্য হরিশকে জল ফিরান হুঁকা আনিয়া দিল। হরিশ হুঁকা হাতে করিয়া বুঝিল, তাহাতে জল বেশী হইয়াছে। সে হুঁকার জল একটু ঢালিয়া হাতের কালি ধুইয়া ফেলিল, তাহার পর কৌটা হইতে একটি আফিংএর বড়ী বাহির করিল। সেইটী মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া হরিশ হুঁকার উপর কলিকা বসাইল, এবং আস্তে আস্তে লম্বা লম্বা টান দিতে লাগিল।

দারোগা বলিলেন,—"এ বেলা আর কোন কথায় কাজ নাই, হরিশ! বেলা অনেক হইয়াছে, তোমায় স্নান আহার করিতে হইবে, আমার এখন অন্য কাজ আছে।" জমাদারকে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস, এখনি সে রিপোর্ট শেষ করিতে হইবে।" একজন কনেষ্টবলকে বলিলেন,—"তুমি এই ভদ্র লোককে সঙ্গে লইয়া যাও, ইনি মাষ্টার বাবুর বাসায় আহার করিবেন।" হরিশকে বলিলেন,—"মাষ্টারবাবুর বাসায় তোমার খাওয়া দাওয়া হইবে। তিনি কুলিন-কায়স্থ এবং বড় ভদ্র লোক। তোমার কোন ভয় নাই, হরিশ! আবার কিছুকাল পরেই আমি আসিতেছি।"

হরিশ বলিল,—"আমি ব্রাহ্মণের চরণে আশ্রয় পাইয়াছি আর কোন ভয় আমার নাই।"

দারোগা ও জমাদার চলিয়া গেলেন। হরিশ নয়ন-মুদিয়া প্রাণ ভরিয়া তামাক খাইতে লাগিল। তাহার অল্প তামাক শীঘ্রই শেষ হইল, তখন সে একবার কনেষ্টবলদের মুখপানে চাহিয়া দারোগাবাবুর গুড়্‌গুড়ি হইতে কলিকা উঠাইয়া লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ সময়ে দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি ডাকিতে লাগিল, "হরিশ! হরিশ দাদা!"

হরিশ ব্যস্ততা সহকারে বলিল,—"কেও রামদাস। এস ভাই ভিতরে এস, কোন ভয় নাই।"

রামদাস ভিতরে আসিলে দুই জনে সুখ দুঃখের অনেক কথা হইল, তাহার সহিত আমাদিগের আখ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই। সে বুঝিয়া গেল, তাহার হরিশদাদা বিশেষ কোন বিপদে পড়েন নাই এবং তাঁহার মাথাও বিগ্‌ড়াইয়া যায় নাই। রামদাস পদব্রজে দেওঘর চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ—

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

মহাপ্রয়াণ।

(কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।)

১

তন্দ্রাগত, অফেনিল, সম্মুখে সাগর,—
কোথাও নাহিক কেউ,
একটিও নাহি ঢেউ,
অনন্তের কায়া যেন, স্থির কলেবর;
নীরব—ধূসর সজ্জা,
নীরব—কল্লোল-বন্ধ্যা
অচঞ্চল অগাধ সে সলিলের থর;
কি জমাট নীরবতা,
বোধ হয় যেন তথা
শিরায় রুধির বহে করি ঘোর স্বর;
এ আলোক? না আঁধার?
স্পষ্ট করে বুঝা ভার;
কষ্টে অনুমেয় কোথা আকাশ ধূসর,
কোথা বা সাগর-বারি;
নাহিক বুঝিতে পারি
চক্রবাল বদ্ধ কি না নয়ন-প্রসর।

২

বিরাট বিটপি এক বেলার কিনারে ;
গগনে ঠেকেছে শির,
ঘন পাতা অতি স্থির,
নীচেতে নেমেছে বড় বহু পরিবারে ;
তার মেঘাভাস পর্ণে,
সন্ধ্যার মলিন বর্ণে,
পাশাপাশি মেশামিশি প্রায় একাকারে ;
অশথের মত তায়
অনুমানে বুঝা যায়,
দিঠি ত কুণ্ঠিত সেই আলো-অন্ধকারে।
এ ধূম্র বিজনে—এ কি ?—
শাখী পানে চেয়ে দেখি,—
পাখার ঝাপট যেন পাই শুনিবারে ;
অথচ ত অবিচল
অগণন পত্রদল,
পরশে নি শিহরণ একটি শাখারে !

৩

এক অগ্নি-আঁখি কাক ঘোর কৃষ্ণকায়,
ছাড়ি অশথের শাখা,
সঘনে ঝাপটি পাখা,
'কা—কা' তিন বার ডাকি বেগে উড়ে যায় ;
টোপে টোপে আঁখি হতে
পড়ে তার দ্রুত পথে
রকত বহ্নির ফোঁটা ধূম্র নভোগায়।
কিবা সে ভীষণ কাক,
কিবা শিহরাণো ডাক,
করাতে চিরিল যেন সে নীরবতায় ;
যুগল মঙ্গল গ্রহ
সম চক্ষুঃ ভয়াবহ
বরষে কি লোমহর্ষ, উল্কার প্রথায় !—
অঙ্গ করে ঝিম্ ঝিম্,
কাণে শব্দ রিম্ রিম্,
ধ্বনিত ওঁকারনাদ মথিত মাথায় !

৪

অচিরে হেরিনু যেন আলোর মতন ;
আলোক না বলা যায়,
অতনু আগুনপ্রায়
লোহিত-আভাস-মাত্র-আভার বরণ ;
পড়েছে তরুর শিরে,
পড়েছে বিজন তীরে,
পড়েছে রঞ্জিয়া মূক সাগর, গগন ;
সে সারা সন্ধ্যার দেশ
ব্যাপিয়া সে আলো-লেশ,—
ধূমাবতী-দেহে যেন রোষ-প্রকটন।
অথবা, গোধূলি ফিরি,
ছাড়ি উচ্চ-চূড় গিরি,
আসিল কি জানাইতে তপন-গমন ?
কিম্বা, দূর চিতা হতে
বৈশ্বানর এই পথে
চাহেন, ফিরায়ে তাঁর রক্তিম লোচন ?

৫

মিশালো সে আলো-লেশ বিশাল আকাশে।
সাঁঝ, কোলে চাঁদ ধরে',
যথা উষা অনুকরে,
তেমতি স্তিমিত দিবা তথা এবে ভাসে।
কিন্তু হেন মনে লয়,
মরতের ভাতি নয়,—
তা হলে পড়িত ছায়া অশথের পাশে ;
তা হলে কি সে কিরণ,
ভেদি মেদ-আবরণ
প্রবেশিত হৃদয়ের নিভৃত নিবাসে ?
তা হলে কি নর-চক্ষে,
সুদূর সাগর-বক্ষে,
আকাশ-জলধি-সীমা চক্রবাল নাশে ?
রোধিনু এ বিচারণা ;—
ওই দূরে দেখিছ না
ছায়াহীন মৃদুগতি কে মূরতি আসে ?

৬

ভ্রান্তি কি এ ?—ক্লান্তি যেন নেহারি বদনে ;
শরীর ঈষৎ খিন্ন,
হৃদিতটে ক্ষত চিহ্ন,
প্রতিহত আলো যেন কম্পিত নয়নে ;
সলিল-লাঞ্ছিত রেখা
দু কপোলে যায় দেখা,
স্ফুরিত অধর যেন স্মৃতির বেদনে।
থামিয়া ক্ষণেক তরে,
যেন কি আবেগ ভরে,
করুণ-কাতর-দৃষ্টি চাহিলা পিছনে ;
বক্ষদেশে বিলম্বিত
শুভ্র যজ্ঞ-উপবীত
কাঁপিল গভীর দীর্ঘশ্বাসের স্পন্দনে !—
কর চাপি পরে বুকে,
ফিরি সাগরাভিমুখে,
আসিলা অশথ-তলে। নমিনু ব্রাহ্মণে।

৭

মনে হলো, পরিচিত সে ছায়া-মূরতি ;
যেন দেখিয়াছি কোথা,

যেন শুনিয়াছি কথা,
গভীর, সঙ্গীতময়, উন্মাদন অতি।
ঠিক তা পড়ে না মনে ;
সন্দেহের এ বিজনে
অলস শিথিলীকৃত স্মৃতির পদ্ধতি।
নিজ ভাষা পর-দেশে
যথা পান্থ-কাণে এসে,
স্মৃতি আকুলিত করি, রোধে ক্লান্ত গতি ;
সুদূর পুরবী গান,
সুরে মাত্র অনুমান,
কথাহীন পশে কাণে, ব্যাকুলি যেমতি ;
চিনি চিনি করি, তথা,
মরমে পরম ব্যথা ;—
নতশিরে, মুদি আঁখি, করিনু প্রণতি।

৮

কতক্ষণ হেন মতে গেল যে, না জানি ;
খর-গতি ব্যথা নানা
করে হৃদে আনাগোনা,
মুহূর্ত্ত বিথার-দীর্ঘ তাহে, অনুমানি।
নতি-শেষে, হাত তুলি,
নিজ অবসাদ ভুলি,
আশীষিলা শিরোদেশে অদেহ-পরাণী ;
নিরোধি চঞ্চল মনে,
গ্রহিনু ভকতি সনে,
ইঙ্গিতে সূচিত পুণ্য আশীর্ব্বাদ বাণী।
পরেতে সৈকত-লগ্ন
তুলিয়া ললাট নগ্ন,
যা দেখিনু, কি বচনে তাহারে বাখানি !—
আঁখি ঠিকরিয়া যায়,
সে ভাতি পড়িলে তায়,
যে আলোকে প্লাবিয়াছে সেই তীর্থখানি !

৯

সন্ধ্যা বটে, কিন্তু যেন মধ্যাহ্ন উজল ;
প্রদীপ্ত নীরব তীর,
প্রদীপ্ত সাগর-নীর,
দীপ্তি-বিচ্ছুরিত উর্দ্ধে গগন-মণ্ডল,
অশথের প্রতি পর্ণ
ঝলসে উজ্জ্বল স্বর্ণ,
কাণ্ড, শাখাগুলি, যেন জ্বলন্ত অনল,
নাহি দাহ, শুধু ছটা ;
সে দিব্য আলোক ঘটা
বিতরে সন্ধ্যার শান্তি ভিতরে কেবল !
অচেত স্বপনাবেশে
গুপ্ত স্মৃতি যথা ভেসে
সুপ্ত-বুক স্ফীত করে নিঃশ্বাসে প্রবল,—
নিঃশ্বাসে একটি মাত্র
তথা উচ্ছ্বসিত-গাত্র
সমগ্র অনূর্ম্মিভগ্ন অম্বুনিধি-জল !

১০

সে শুভ্র উচ্ছ্বাস ভরে, কোথা হতে আসি
আচম্বিতে, ধীরে ধীরে
লাগিল সিন্ধুর তীরে
অপূর্ব্ব-সুন্দর তরী, মহানন্দে ভাসি।
দেখিনু তাহার তলে,
এখন তরঙ্গ জলে,
উথল আনন্দে যেন জলধির হাসি ;
দেখিনু উপরে তার,
কেতন ত্রিশূলাকার
খেলিছে বিপুল রঙ্গে, দামিনী প্রকাশি ;
দেখিনু তাহার মাঝে
অমরী তিনটি রাজে
তড়িত-নিবিড় তনু,—ঘন-চিৎ-রাশি।
অমর সে তরী পানে,
বিতরি বেদনা প্রাণে
চলিলা দেবতা, মর-বন্ধন বিনাশি।

১১

আর ত নহেক খিন্ন সে দিব্য শরীর ;
আর না চলন ক্লান্ত,
আর না নয়ন ভ্রান্ত,
মথে না হৃদয় আর ব্যথা পৃথিবীর।
গমনের সঙ্গে সঙ্গে,
খেলিছে বিজুলি অঙ্গে,
চমকিয়া চামীকরে তরঙ্গিত নীর !
যেন সে চরণ-ক্ষেপে
ছন্দে সন্ধ্যা উঠে কেঁপে,
বিকম্পি তাহার সনে সে বিজন তীর !
যেন সে কণ্ঠের মাঝে
বিজয়-দুন্দুভি বাজে,
অথবা বারিধি বুঝি গরজে গভীর !
যেন সে ললাটতলে
কল্পনার ভানু জ্বলে ;
ভাস্বর, রশ্মির মুখে, অনন্ত তিমির !

১২

আর না ফিরায়ে আঁখি দেখিলা ধরণী।
হরষ-মণ্ডিত আস্যে,
ঈষৎ গম্ভীর হাস্যে,
আরোহিলা ধীরে ধীরে অমর তরণী।
আলোক-রচিত মালা

শিরে যার, সেই বালা
নমিল চরণ-প্রান্তে, প্রশান্ত-নয়নী।
"কীর্ত্তি আমি, তব সুতা,
চলিনু, করুণা-সুতা,
গুরু-ব্যথা বসুন্ধরা রাখিতে সান্ত্বনি!"
ত্যজি সে বিজন-সীমা,
উজলিল সে মহিমা,
উদিতে ধরিত্রী-নভে নক্ষত্র-বরণী;—
কনকে হীরক-লেখা,
পড়ে তার গতি-রেখা
প্রদীপ্ত অম্বর-পথে, সহ শঙ্খধ্বনি।

১৩

কুন্দেন্দু-তুষার-কান্তি, শুভ্র-বাহু-লতা,
শ্বেতপদ্ম-সমাসীনা
কর-ধৃত-বর-বীণা,
অমরী চরণে, পরে, নমিলা দেবতা।
"দীর্ঘ প্রবাসের পরে,
এস, বৎস, এস ঘরে,"—
ঝরিল বাণীর বাণী অশ্রুকণা যথা।
ঝঙ্কৃত বীণার সনে,
ঘন-দীপ্তি সে গগনে
অন্তর্হিতা বীণাপাণি, না ফুরাতে কথা।
কে তুমি, সৌন্দর্য্য-সার,
বদনে গুণ্ঠন-ভার,
রুচির সরমে কণ্ঠে ঈষৎ-আনতা?—
কবির উরস-যোগ্যা
কাব্যলক্ষ্মী, কবি-ভোগ্যা?—
নিল কবি বক্ষে তাঁরে, ভুঞ্জি অমরতা!

১৪

একি দেখি হেন কালে ঝটিকা-উৎপাত!—
সেই সে বিজন পথে,
পৃথিবীর দিক হতে,
পুঞ্জীকৃত দীর্ঘশ্বাস বহে অকস্মাৎ!
প্রবল ঝটিকা-প্রায়
লাগিল তরীর গায়,
সাগরে ভ্রুকুটি রচি ফেনলেখা সাথ!
বিদীর্ণ বিমানতল,
শব্দে মহা কোলাহল,
শত অশনিতে যেন ঘাত প্রতিঘাত!
শ্রাবণের ধারা মত
বরষিল অবিরত
জ্যোতির্ম্ময় সুরভিত প্রসূন-প্রপাত!—

'কা-কা' রব বিঁধে কাণে,
মেলি আঁখি আলো পানে,
উঠিনু শয়ন ত্যজি,—হয়েছে প্রভাত!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

শোণিতপুর। *

পৌরাণিক ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, বাণ-রাজধানী শোণিতপুরে, হরি হরে যুদ্ধ, ঊষা অনিরুদ্ধের মিলন ও বিবাহ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাণ পরাজিত, ও হরিহরমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল। ঐ শোণিতপুর কোথায় ছিল,জানিবার উপায় নাই; তবে জনশ্রুতি বর্ত্তমান তেজপুরকেই প্রাচীন শোণিতপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বাস্তবিক তেজপুরের ধ্বংশাবশিষ্ট স্তূপরাশি কোন পরাক্রমশালী রাজার মহিমাই ঘোষণা করিতেছে। ঐ পরাক্রমশালী রাজা † বাণ ভিন্ন অন্য কেহ কি না তাহারও নিশ্চয়তা নাই। তবে তেজপুর যদি শোণিতপুর হয়, তাহা হইলে ঐ সকল স্তূপ বাণ রাজার কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ মাত্র তাহার আর সন্দেহ নাই। অতীতের ধ্বংশরাশিই অতীতের রাজ-সম্পদ, শিল্প-সৌন্দর্য্য ও স্থাপত্য-নৈপুণ্যের ইতিহাস অস্ফুটস্বরে ঘোষণা করিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

আর আছে, ভারতের পুরাণ প্রভৃতি। তাও কিন্তু ঐশ্বরিক লীলা খেলার অন্তর্গত। এই লীলা খেলার আবরণ উন্মোচন করিলে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া যায়।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস দেবাসুরের ইতিহাস! দেবতারা—সভ্যেরা, সমতলবাসী, আর অসুরেরা—অসভ্যেরা, পর্ব্বতবাসী।

এই স্বাধীনতাপ্রিয় পর্ব্বতবাসী অসুরগণের রাজ্যস্পৃহাও ছিল। তজ্জন্যই সময়ে সময়ে দেবরাজ্য গ্রাসে উদ্যত হইলে দেবাসুরে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। দেবতারা শক্তি প্রয়োগে অসমর্থ হইলে, বুদ্ধি প্রয়োগে অসুরদিগকে দমন করিতেন। বলিকে এই জন্যই পাতালে যাইতে হইয়াছিল। ভারতের ঐ দুই বংশ এখনও বর্ত্তমান। দেবতারা সমতলে, আর আকা, ডফলা, আবর মিশ্‌মি, খাম্‌টি, ভুটিয়া, খাসিয়া, নাগা, গারো, কুকি, মিরি, মিকির, কাছারী, সোলুং প্রভৃতি পর্ব্বতে ও অরণ্যে বাস করিতেছে। আদিম যুগের অসুরেরা দেবতাদের সমকক্ষ ছিলেন। অসুরে-দেবতায় আদান প্রদান প্রভৃতি সামাজিকতাও ছিল। এখনকার যুগে সেটা নাই; থাকিলে বোধ হয়, দেববংশের এত হীনদশা ঘটিত না। অসুরদিগের এখনও একটু আসুরিক ভাব আছে; এই আসুরিক ভাবটুকু থাকা চাই। দেবতাদিগের সেইটুকু নাই—নাই বলিয়াই দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে।

সে যাহা হউক,যথন দেখিতেছি,অসুরবংশীয়গণ এখনও বর্ত্তমান--এখনও আসামের কি পর্ব্বত, কি অরণ্য, সর্ব্বত্রই তাহারা বাস করিতেছে এবং প্রাচীনকালেও * নরক, ভগদত্ত, ঘটোৎকচ, † হয়গ্রীব, প্রলম্ব, বভ্রুবাহন প্রভৃতি এই আসামেই বাস করিতেন—তাঁহাদের রাজত্ব এই আসামেই ছিল। তখন অবশ্যই বলিব, বলিপুত্র বাণের রাজ্য এই আসামে ছিল। এবং তেজপুরই তাঁহার রাজধানী শোণিতপুর বলিয়া অখ্যাত হইত। আসামী ভাষায় শোণিতের অপর নাম তেজ, সুতরাং শোণিতপুরের নাম তেজপুরে পরিবর্ত্তিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

এখন কিছুই নাই—কেবলই ধ্বংশ। এই ধ্বংশরাশিই পূর্ব্বস্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে। ইঁহাদের যৎসামান্য পরিচয় নিম্নে প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র বিষয়টি শেষ করিলাম।

ভালুপাম বা ভালুপুং। *

তেজপুরের উত্তরে প্রায় ৩০।৩২ মাইল দূরে আকা পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের পাদদেশে ভালুপাম। ভালুপাম এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত। অসংখ্য কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরস্তূপ, প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্যদানের জন্যই পড়িয়া রহিয়াছে। আকাগণ বাণ-প্রৌত্র ভালুক রাজাকে আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং ভালুপুং দুর্গ ভালুক রাজার ছিল বলিয়া ঘোষণা করে।

বাণ দুর্গ। *

প্রবাদ, এখন যেখানে ডেপুটী কমিশনরের কাছারী ও মালখানা হইয়াছে, সেখানেই বাণ রাজার ভগ্নদুর্গ ছিল। এখানে এখনও যে সমুদায় সুন্দর প্রস্তর সকল পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়—মনে হয় যেন উহা চিরনূতন। ঐ সকল প্রস্তরের অধিকাংশই লোহিতাভ ও নীলাভ।

---

* শোণিতপুর, এতিয়ার তেজপুর। ইয়াত সুপ্রসিদ্ধ বলিরাজার বংশধর বাণরাজার রাজধানী আছিল। * * * * ।

রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর প্রণীত আসাম বুরঞ্জী ৬পৃঃ।

The meaning of Tezpur and Sonitapura is identical, and it is known that Tezpur was formerly known as Sonitapura.

Report on the progress of Historical Research in Assam
By E. A. GAIT, Esq., I.C.S.
Page 71.

† শিবে পূজি' পায় বাণ "মহাকাল" নাম।
মহাভারত ৭০ পৃঃ, ৺ রাজকৃষ্ণ রায়।

"শোণিতপুরত পাছে ভৈল বাণরাজা।
* * * *
সম্মুখ সংগ্রামে ত্রিদশকো নগণয়॥
* * * *
শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ ৩৩০ পৃঃ, ৺ অনন্ত কন্দলি।

* কালিকা পুরাণ, যোগিনী তন্ত্র মহাভারত ইত্যাদি।
* * * * * *
* * * * He (Naraka) made the Asura Hayagriva His Commander-in-Chief. * *

Kalika Purana.
Report on the progress of Historical Research in Assam.
By E. A. GAIT, Esq., I.C.S.
Page 45.

† প্রবাদ—হাজোর, হয়গ্রীব ভুটিয়া পর্ব্বত হইতে আসিয়াছিলেন। এজন্য হয়গ্রীবের পূজা, প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ভুটিয়াগণ করিয়া থাকে।

* At Bhalukpung on the northern boundary of the District in Balipara Mauza, are the remains of a fortress assigned to Bhaluka Raja the grandson of Bana Raja. Bhaluka Raja is claimed by the Akas as their proginetor.

* Bana Raja's fort is said to have been on the site now occupied by the Tezpur Cutchery, and numerous carved stones are still to be seen in the neigh bourhood, although most of them have been burried, with the object of making the locality appear "more tidy." A little more than a mile to the west is an old silted-up tank, called the Hazari Pukhari, which is ascribed to the time of Bana, while another tank in the same neighbourhood still bears the name of Kubhanda his Prime Minister. Bana is reported to have founded two temples, still to be seen in Mohabharde Mouza, to Siva and Durga respectively.

Report on the progress of Historical Research in Assam.
By E. A. GAIT, Esq., I.C.S.
Page 71.

উষার মন্দির।

বর্ত্তমান সহর হইতে দুই মাইল দূরে ধেনুখানা পাহাড়ের নিকট একটি ভগ্নস্তূপকে স্থানীয় লোকে উষার তাঁতশালা ও মন্দির বলিয়া থাকে। এই স্তূপের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। তথায় একটি গৃহের মেজে দেখিতে পাওয়া যায়। মেজেটি দেখিলে বোধ হয়, যেন এই নূতন বসান হইয়াছে, অথচ কত কাল চলিয়া গিয়াছে। মেজেটী একখানি ১১´×১১´×১৩॥০´ লোহিতাভ প্রস্তর। মেজেটির ন্যায় ছাদটিও একখানি প্রস্তর। তাহা প্রায় ১০ ফুট দূরে পড়িয়া আছে। এই ছাদে একটি প্রকাণ্ড পদ্মখোদিত আছে। প্রবাদ—এইখানেই চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া আনিয়া উষাসহ মিলন করিয়া দেয়।

হাজরা পুখ্‌রী।

উষার মন্দির হইতে ঠিক উত্তরে সিকি মাইল দূরে এই বৃহৎ জলাশয়। এক্ষণে ইহা ঘোড়দৌড়ের মাঠে পরিণত হইয়াছে।

টিঙ্গেশ্বর।

শিলডুবি পাহাড়ের উত্তরভাগে এই লিঙ্গ স্থাপিত। শিবরাত্রিতে এই বিগ্রহের পূজা হইয়া থাকে।

বুড়া গোঁসাই।

শিলডুবি পাহাড়ের পূর্ব্ব প্রান্তে একটি গহ্বরে এক-খানি পদচিহ্ন বুড়া গোঁসাই নামে অভিহিত হয়।

লম্বোদর গোসাই।

শিলডুবি পর্ব্বত হইতে সিকি মাইল পশ্চিমে লম্বোদর পাহাড়। এই পাহাড়ের উপরে একটি বৃহৎ শিলা-খণ্ডে প্রকাণ্ডকায় লম্বোদর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

হেন্দোলেশ্বর।

লম্বোদর পাহাড় হইতে উত্তরপূর্ব্বে অর্দ্ধ মাইল দূরে যে ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়াযায়, তাহারই এক অংশে হেন্দোলেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত।

শুণিতপুর বা শোণিতপুর।

তেজপুর হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে শুণিতপুর বিল। ইহার নিকটে যে সকল ধ্বংশাবশিষ্ট ছিল, তাহার দ্বারা অনেকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। জনশ্রুতি, এই থানেই বাণরাজার বিচারালয় ছিল এবং এখান হইতে সিঙ্গুরী পর্ব্বত পর্য্যন্ত বাণযুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছিল।

সাতপুখ্‌রী।

তেজপুর হইতে ৩॥০ মাইল দূরে উজাল গ্রামে ৭টি পুষ্করিণী আছে। ঐ সাতটি পুষ্করিণীর জলে উষাকে স্নান করাইয়া বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল এইরূপ কথিত হয়।

কুভাণ্ড পুখ্‌রী।

বাণমন্ত্রী কুভাণ্ডের নামে একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান।

মহাভৈরব বা বাণলিঙ্গ।

প্রবাদ বাণ রাজা এই শিব লিঙ্গ পূজা করিতেন। ইহা প্রকাণ্ড। বাণরাজ ইষ্টক ও প্রস্তরে এই মহা-ভৈরবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সম্প্রতি এই মন্দিরটি পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা তেজপুরের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত।

বামনী পাহাড়।

তেজপুর হইতে ২॥০ মাইল পূর্ব্বে এই পাহাড়। এই পাহাড়টি ১টি ভগ্নস্তূপ বিশেষ। অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। কেহ কেহ বলেন এই বামনী উষার উপাস্য দেবী ছিলেন। কিন্তু কোন মূর্ত্তি এখন এখানে নাই। গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ৫০৲ টাকা ইহার জঙ্গল কাটিবার জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন।

ভ্রমরাগুড়ি।

ভ্রমরাগুড়ি পর্ব্বত অতি রম্যস্থান। তেজপুর হইতে ৫॥০ মাইল পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বপ্রান্ত মগ্নগিরিতে রুদ্রপদ অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্রের জল কমিয়া গেলে শিবরাত্রিতে এখানে পূজা হইয়া থাকে। পর্ব্বতময় অসংখ্য ভগ্নস্তূপ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুজাতি।

বোম্বে-প্রেসিডেন্সি, মধ্যপ্রদেশের কোন কোন জেলায় এবং বেরারে মারাঠা-জাতি বাস করে; বেনা-রস এবং এলাহাবাদেও তাহাদের অসদ্ভাব নাই। মধ্য-প্রদেশের নাগপুর, বানদারা, চাঁন্দা, ওয়ারধা এবং বালাঘাত জেলার লোকে মারাঠি-ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। এ সকল জেলায় কোন কোন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দিতেও কথা বলে। *

বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে হিন্দুদিগের চারি প্রধান জাতির কথা আলোচিত হইবে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ বহুশাখায় বিভক্ত। ঋগ্বেদ মতাবলম্বীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) ঋগ্বেদী, (২) অশ্বালয়ন, † এবং (৩) অপস্তম্ভ। যজুর্ব্বেদীয়েরা—(১) কানাওয়া (২)মধ্যন্দীন প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন ভাগারি, মালাভি, নরবদি, সন্ন্যাসী প্রভৃতি শাখাও দৃষ্ট হয়।

ইহাদের মধ্যে আবার সম্প্রদায় আছে।—শিব উপা-সকদিগকে শৈব বলে, বিষ্ণু উপাসকদিগকে বৈষ্ণব বলে এবং যাহারা শক্তি বা দেবীর আরাধনা করে তাহা-দিগকে শাক্ত বলে। এক সম্প্রদায়ের গোঁড়ারা অপর সম্প্রদায়ীদিগকে ঘৃণা করে এবং বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে পরস্পরে পরস্পরের উপাস্যদেবতার উপর গালি বর্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

এই বিবাদ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে।—এক বৈষ্ণবের পুত্রের সহিত এক শৈবের কন্যার বিবাহ হয়। কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিয়া গৃহস্থালীর কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। একদা প্রাতঃকালে সে ঘর লেপিতেছে,—তাহার হস্ত দক্ষিণে ও বামে সঞ্চালিত হইতেছিল। অদূরে দাঁড়া-ইয়া তাহার শ্বশুর এই ব্যাপার দেখিলেন। তিনি ইহা অতিশয় পাপজনক বিবেচনা করিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া পুত্রবধূর মুখে প্রহার করিলেন। বালিকা একেবারে স্তম্ভিত হইল এবং কাতরভাবে তাহার ত্রুটির কথা জানিতে প্রার্থনা করিলে, শ্বশুর বলিলেন,—'যদিও তুমি শৈবের কন্যা, তত্রাচ তোমার স্মরণ থাকা কর্ত্তব্য যে, তুমি বৈষ্ণবের ঘরে বিবাহিতা হইয়াছ, এখানে বৈষ্ণবদিগের সমুদায় রীতিনীতি তোমাকে পালন করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই খাড়াখাড়িভাবে করিতে হয়, দক্ষিণে বামে নাড়িয়া কিছু করিতে হয় না।' এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পর, একদা পুত্রবধূ দেখিল যে, তাহার শ্বশুর দক্ষিণে ও বামে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া দন্তধাবন করি-তেছেন। পুত্রবধূ তাঁহাকে শিক্ষা দিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া, ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া তাঁহার বদনে ভীষণ চপেটাঘাত করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল যে, বৈষ্ণবের লম্বালম্বিভাবে সকল কাজ করিতে হয়।

এই সকল ব্রাহ্মণগণ মারাঠি ভাষায় কথা বলে এবং তাহাদের সাধারণ লেখাপড়া মারাঠি-লিপিতে সম্পাদিত হয়। কিন্তু পুস্তকাদি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দুইটি প্রধান বিভাগ আছে। এক বিভাগে—গৃহস্থ, অপর বিভাগে—ভিক্ষুক। পুরোহিত প্রভৃতি ভিক্ষুকগণ পরের বদান্যতার উপর নির্ভর করে। পারিবারিক পুরোহিতদিগকে উপাধ্যায় এবং জোসী বলে। উচ্চবংশের ক্রিয়াকলাপ উপাধ্যায়গণ সম্পন্ন করেন এবং সাধারণ লোকদিগের ক্রিয়া কলাপ জোসীর দ্বারা সম্পাদিত হয়।

তৎপরে ক্ষত্রিয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কোন কোন জাতীয় লোক ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। রাজপুত, মারাঠি, জাঠ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে। ভারতের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম অংশে রাজপুত ও জাঠগণ বাস

* মারাঠা-ভাষীহিন্দু ও অন্য হিন্দুর আচার ব্যবহারে প্রভেদ এই যে, (১) পূর্ব্বোক্তেরা মাতুল-কন্যা বিবাহ করিতে পারে, তবে কন্যার মাতা বরের পিতা অপেক্ষা বয়সে বড় হওয়া চাই। তাহারা শ্বশুরকে মামা বলে। (২) তাহাদের স্ত্রীলোকগণ শুদ্ধান্তে অবরুদ্ধ থাকে না। প্রথম আচারের সমর্থনার্থ তাহারা বলিয়া থাকে যে, দক্ষিণ দেশে লোকে মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করে, পশ্চিম দেশে লোকে চর্ম্মপাত্রে জল পান করে, (যেমন৹মাড়ওয়ারীগণ,) উত্তরে (কাশ্মীর) লোকে মহিষ-মাংস আহার করে এবং পূর্ব্বদেশের লোকে (বাঙ্গালী এবং উড়িয়া)মৎস্য ভক্ষণ করে।

† ঋগ্বেদী এবং অশ্বালয়নীয়া এক, ইহারা অপস্তম্ভদিগের সহিত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হয় এবং তাহাদের সহিত ও কানাওয়া এবং মধ্যন্দীনদিগের সহিত একত্র আহার করে। কিন্তু শেষোক্তদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হয় না।

করে। কিন্তু ইহাদের কতকাংশ মারাঠা-ভাষী লোক-দিগের মধ্যে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা মারাঠি-ভাষা প্রচলিত স্থানে আসিয়াছে, তাহারা উক্ত ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে দেশীয় রাজন্যবর্গের অধীনে তাহারা সৈনিকের কার্য্য করিত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশরাজের রাজত্বকালে তাহাদের অল্পসংখ্যক সৈনিক শ্রেণীভুক্ত, অবশিষ্টাংশ অন্য কোন কার্য্যে বা কৃষি-কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

মারাঠিগণ ইহাদের হইতে ভিন্ন এবং স্বাধীনজাতি। তাহারা বলে যে, পুরাতন ক্ষত্রিয় হইতে তাহাদের উদ্ভব। তাহারা সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্যে বাস করিত,—তাহারা যোদ্ধা। এক সময়ে তাহারা এতই শক্তিশালী হইয়াছিল যে, তাহাদের বাহুবল প্রায় সমগ্র ভারতের উপর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ছত্রপতি শিবাজীর নাম কে না জানে? কিন্তু তাহাদের সে গৌরব এখন কোথায়? তাহাদের বংশধরগণ সর্ব্বশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীর কোন এক অজ্ঞাত প্রান্তে বসিয়া অবশহৃদয়ের শুষ্কদিবসগুলি গণনা করিতেছে। শিবাজীর সময়ে তাহাদের বেশভূষা প্রভৃতি সরল ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহারা বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে। এই জাতির যাহারা নাগ-পুরে বাস করিতেছে; তাহারা প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সকল পেন্‌সন্‌, ইনাম প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা-রই উপস্বত্বদ্বারা দিনপাত করিতেছে। কিন্তু অধি-কাংশই দুর্দ্দশাগ্রস্ত—ঋণজালে বিজড়িত। ঋণের কারণ এই যে, এখনও তাহারা বিলাসিতা ত্যাগ করিতে পারে নাই। কেহ কেহ সরকারে কেহ বা অন্য ব্যক্তির কার্য্যে এবং কেহ বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত আছে। ব্রাহ্মণগণ যে সকল উৎসবের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও তাহা করিতে ইতস্ততঃ করে না। তাহারা অতি সমারোহে দশহরা উৎসব নির্ব্বাহ করে। বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে তাহাদের নাম-সর্ব্বস্ব-রাজা—হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও অসংখ্য অনুচর পরিবেষ্টিত এবং বাদ্য-সঙ্গীতে নগর প্রবুদ্ধ করিয়া 'রাজা বক্সির মারোতি' নামক দেবমন্দিরে যাত্রা করেন। মাংসাহার ও মদ্যপান করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। অপরিমিতরূপে মদ্যপান করিয়া তাহারা মাতাল হয়। সুরাদেবীর কল্যাণে অ[illegible]ক পরিবার ধ্বংস হইয়াছে।

ইহাদের কেহ কেহ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া রাজসরকারে চাকুরি করিতেছে। তাহারা মারাঠি-ভাষায় কথা বলিলেও ব্যাকরণ-শুদ্ধ কথা বলিতে পারে না—গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

তৎপরে বৈশ্য। বর্ত্তমান সময়ে সোণার, লোহার, ছুতার, গুভার—এই কয়জাতি লইয়া বৈশ্যশ্রেণী সংগঠিত।

সোণার সম্ভবতঃ স্বর্ণকারের অপভ্রংশ। তাহাদের কার্য্য স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করা। তাহারা সুনিপুণ শিল্পী,—তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য পূর্ব্বদেশীয় ও অনেকানেক পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রশংসিত হই-য়াছে। তাহাদের কেহ কেহ লেখা পড়াও জানে। কিন্তু তাহারা গুপ্তচোর বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিলে তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে অপহরণ করে।

লোহারজাতীয়েরা লৌহকার,—লৌহদ্রব্য প্রস্তুত করে। যাহারা পল্লীগ্রামে বাস করে, তাহারা অপরিষ্কার লৌহদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কৃষককুল ইহাদের নিকট সমধিক উপকৃত। চাষিদিগের নিত্য ব্যবহারোপযোগী লাঙ্গলের 'কাসা,' 'পাস,' 'এসিয়া,' 'ইন্‌তিয়া,' 'খাণ্ট,' 'দাভাঙ্গা,' 'কুদাল,' 'কাসালিয়া,' 'কুড়াল' প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে। যে সকল 'লোহার' সহরে বাস করে, তাহারা অপেক্ষা-কৃত ভাল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। আদকিতা (জাঁতি), কাত্রি (খুর), ছুরি, কাঁটা, শিকল, সিন্ধুক প্রভৃতি তাহারা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যখন কোন 'লোহার' পল্লীগ্রামে বিপণী খোলে, তখন সে নিজে লৌহ পিটে, তাহার স্ত্রী বা মাতা হাপর টানিয়া অগ্নিতে বাতাস করে এবং তাহার পুত্র বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা থাকিলে, তাহারা অগ্নিতে কয়লা প্রদান করে। কৃষকদিগের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিলে, তাহারা তদ্বিনিময়ে নগদ অর্থ কিছু পায় না। যখন জওয়ারি পরিপক্ক হয়, তখন তাহারই কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়। রবি ফসল কর্ত্তিত হইলে, তাহারা ক্ষেত্রে যাইয়া তাহাদের অংশ লইয়া আসে। এতদ্ব্যতীত তাহারা প্রত্যেক শস্যেরইকিয়দংশ প্রাপ্ত হয়। শস্য কাটা হইলে তাহারা 'দেমলা' এবং 'পেন্‌ধি' (বোঝা বা আটি বিশেষ) হিসাবে অংশ বুঝিয়া লয়। ইহাতেই তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া

থাকে। সমস্ত দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর আমোদ করিবার জন্য তাহারা দোকানে পাড়া প্রতিবেসিগণকে আহ্বান করিয়া গ্রাম্য-সঙ্গীত উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করে। গানের সময় তাহারা ঢোল, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপে চলিতে থাকে, তৎপর প্রতিবেশিগণ স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে। মদ্যপান তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে, কেহ কেহ ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়। তাহাদের প্রধান উৎসব—জিভ্‌তি এবং মাণ্ডু। এই দিন তাহারা পরিশ্রম করে না,—তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের অর্চ্চনায় দিবস অতিবাহিত হয়। প্রত্যেক গ্রামে একঘর করিয়া সূত্রধর আছে। তাহারা পাতিল বা মালগুজারদার (ভূম্যধিকারীর) সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন এবং তাঁহার অনুগ্রহ-লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টিত। গৃহস্থের এবং কৃষকদিগের প্রয়োজনীয় কাষ্ঠদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। তাহারা বকার, নানগার (লাঙ্গল) দৌর, দিনদা, ঠিকান, হালিস জু প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এতদ্বিনিময়ে তাহারাও পল্লী লোহারের ন্যায় নগদ মুদ্রা প্রাপ্ত হয় না। কেবল শস্য পায়।

শস্য কর্ত্তনের সময় তাহারা মাঠে যাইয়া প্রত্যেক শস্যের দুই বোঝা করিয়া লইয়া আসে। যদি তাহারা মাঠে না যায়, তবে গৃহস্থ তাহাদের জন্য ঐ পরিমাণ শস্য রাখিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত তাহারা 'হারদা', 'আম্‌-রিয়া' প্রভৃতি দুই 'কুদো' করিয়া পাইয়া থাকে। সূত্রধর বয়সে প্রবীণ হইলে গ্রামবাসিগণের নিকট সম্মান পাইয়া থাকে। দিনের বেলায় যখন তাহারা কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, অনেক কৃষক আসিয়া তখন তাহাদের কার্য্য সন্দর্শন করে এবং কার্য্য শেষে নানা রূপ খোস গল্প আরম্ভ করিয়া দেয়। যদি সঙ্গীতে অনুরাগ থাকে, তবে কর্ম্মকার-দিগের ন্যায় প্রথম রাত্রে সঙ্গীত চলে। গ্রামে যদি মালগুজারদার কি অন্য কোন ব্যক্তির ইক্ষুর আবাদ থাকে এবং সে যদি গুড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে, তবে সূত্রধর আখমাড়া কল (ঘাইন) প্রস্তুত করিয়া দিয়া, গুড় এবং আখ আদায় করে। এইত গেল পল্লীর সূত্রধরের কথা। সহরের সূত্রধরগণ তাহাদের পারি-শ্রমিকের মূল্য নগদ প্রাপ্ত হয়। তাহাদের হস্ত চাতুর্য্য আছে,—লোকের বাড়ী যাইয়া ঠিকা কাজ করে। কেহ কেহ সামান্য লেখা পড়াও জানে। নাগপুর এবং তন্নিকট-বর্ত্তী জেলাসমূহে সূত্রধরগণ ব্রাহ্মণের হস্ত ভিন্ন অন্য কোন জাতির হস্তে অন্নাদি গ্রহণ করিত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের এ বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে। তাহা-দের নিজের 'শঙ্করাচার্য্য' বা পুরোহিত আছে। তিনি মধ্যে মধ্যে শিষ্যের বাড়ীতে গমন করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। সূত্রধরগণ তাহাদের জাতীয় উপাধি ত্যাগ করতঃ 'সুক-য়াসি' ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। আজ কাল স্নান করার পর হইতে আহার পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহারা 'খুলা' (পট্টবস্ত্র) পরিধান করিয়া থাকে। মাংসাহার তাহাদের নিষিদ্ধ নহে; রাস এবং ঝুলনযাত্রায় তাহারা গ্রাম্য দেবতার সম্মুখে ছাগ শিশু উৎসর্গ করিয়া তন্মাংস ভক্ষণ করে।

তৎপর বৈশ্য বা 'কসার' জাতি, ইহারা কাংস এবং পিত্তল পাত্রের ব্যবসায় করে। সোণারদিগের সহিত ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহারা নিজে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে না, তাম্বুলকার (তামার)-দিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কিছু উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে। মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত নাগপুর এবং নরবদা ডিভিসনে ইহা-দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দুই ডিভিসনে ইহা-দের সংখ্যা সম্ভবতঃ অল্প। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুনা, পাণ্ডারপুর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ স্থানে ইহারা বাস করে।

অতঃপর 'গুরভ',—ইহারা নিজেই এই জাতির সৃষ্টি-কর্ত্তা। ইহাদের দুইটি শাখা আছে। এক শাখা শিব বা মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত থাকে,—বিল্বপত্র আহরণ শিব মন্দির পরিষ্কার ও ধৌত এবং দেবতার অর্চ্চনা করে। এই দেবতার নিকট লোকে যে সকল উপহার প্রদান করে, তদ্দারাই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অন্য-শাখা গীতবাদ্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

সোণার, লোহার, ছুতার, গুরভ প্রভৃতি যে সকল জাতি বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের পুরুষ সকল বিবাহের পর উপবীত ধারণ করে।

সর্ব্বশেষে চতুর্থ শ্রেণী—শূদ্র। অনেক জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম কুন্‌বি—কৃষক শ্রেণী। বর্ত্তমান সময়ে অনেক কুন্‌বি কৃষিকার্য্য করে, অনেকে মালগুজারদার বা পাতিলও হইয়াছে। তাহ[illegible]র মধ্যে তিরোলি, বাভুল

জেড প্রভৃতি অনেকগুলি উপশাখা আছে। তাহাদের অনেকে নিজেই ক্ষেত্র কর্ষণাদি করে। তাহারা নিজের বলীবর্দ্দদ্বারা (সময়ে সময়ে ভাড়া করিয়াও লয়) লাঙ্গল বহে। বলীবর্দ্দ ভাড়াকে 'খাণ্ড' বলে। যাহাদের বীজ-শস্য না থাকে, তাহারা গ্রামের পাতিলের নিকট হইতে 'সাভাই' (সুদের পরিমাণ) বন্দোবস্তে বীজ ধার করে। অনটনের সময় পোদ্‌গাও (খাদ্য শস্য) ধার করে। দিবসে তাহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া মাঠে কাজ করে। শস্য পরিপক্ক হইলে পুরুষে রজনীতে মালার (মঞ্চের) উপর থাকিয়া ক্ষেত্র পাহারা দেয়। দিবাভাগেও কাজ ফেলিয়া বাড়ী আসে না। পূর্ব্ব দিবসের রুটি তরকারী প্রাতঃকালে বাড়ী হইতে আহার করিয়া যায়, অথবা সঙ্গে লইয়া যাইয়া মাঠে আহার করে। দ্বিপ্রহরে স্ত্রী কিম্বা পুত্র মাঠে গরম রুটি, ডাল কি তরকারী দিয়া আইসে। দ্বিপ্রহরের খাদ্য লইয়া গেলে, তাহারা নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে অবগাহন করিয়া বৃক্ষমূলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করতঃ আহার করে,—এই অবসরে বলীবর্দ্দ মাঠে চরিতে থাকে। তৎপর পুনরায় কার্য্যে-প্রবৃত্ত হয়। সন্ধ্যার সময় গরু চরাইয়া বাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। পরে গরুকে আহারীয় দেয়। গৃহ-লক্ষ্মী তখন তাহাদের হস্তপদ ধৌত করিবার জন্য উষ্ণজল ও নৈশ-ভোজ্য আনয়ন করে। আহার শেষ হইলে, শীতকাল হইলে কিছুক্ষণ অগ্নিপার্শ্বে উপবেশন করে, তামাকু টানে, তাহার পর শয়ন করে। গ্রাম্য কুন্‌বিদিগের অবস্থা এইরূপ। কোন কোন কুন্‌বি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে,—চিনি, গুড়, নারিকেল, সুপারি, লবণ ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে। কেহ কেহ কাপড়ের ব্যবসায়ও করে।

ভোম্বের নামক আর এক জাতি আছে,—তাহারাও কৃষক। কুন্‌বিদিগের সহিত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তাহারা একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে। মারাঠি এবং হিন্দি-মিশ্রিত ভাষা তাহারা ব্যবহার করে। কেহ কেহ প্রাকৃত মারাঠিতেও বলে, কিন্তু শুদ্ধ করিয়া বলিতে পারে না।

শূদ্রদিগের মধ্যে 'তেলি' আর একটি জাতি। তাহারা স্বহস্তে নির্ম্মিত ঘানি গাছে তিসি প্রভৃতি নিষ্পেষিত করতঃ তৈল বাহির করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেকে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তেলিগণ নি… শ্রেণী বলিয়া পরিচিত।

তৎপর সিম্‌পি (দরজি) জাতি। ইহারা স্ত্রীপুরুষে কাপড় সেলাই করে। কেহ কেহ বড় বড় সহর হইতে কাপড় ক্রয় করিয়া আনিয়া গ্রামে বিক্রয় করে।

অতঃপর ক্ষৌরকার। ইহাদিগকে 'মাণি' বা 'নাভি' বলে। ইহাদের কার্য্য—কামানো। এতদ্ব্যতীত তাহারা প্রভুর বাড়ী পাহারা দেয়।

পরে রজক। ইহাদিগকে 'ধৌবি' 'পারিট' বা '…' বলে। ইহারা বস্ত্রাদি ধৌত করে। পূর্ব্বকালে লোকে রজক বাড়ী বস্ত্রাদি না দিলেও বর্ত্তমান সময়ে লোকে সে নিয়ম প্রতিপালন করে না।

ভোই,—ইহারা মৎস্য মারিয়া বিক্রয় করে।

গোভারি বা গোয়ালা। ইহারা পশ্বাদি পালন করে। ইহারা পূর্ব্বে বর্দ্ধিষ্ণু ছিল,—বহু সংখ্যক গরু এবং মহিষ রক্ষা করিত এবং এখনও অনেকে করে।

মাহার, ধিদ্, চামার, ম্যাঙ্গ। ইহারা অতি শূদ্র। মাহারা গ্রাম্য চৌকিদার (কোতোয়াল) ; ধিদ্ এবং ম্যাঙ্গরা 'সানাই' বাদ্য করে, ইহাদের আর একটি নাম—ওজানত্রি। চামার পাদুকা প্রস্তুত করে।

ওয়ানি বা বেণিয়া। নাগপুর এবং পশ্চিম নাগপুরের বৈশ্যদিগের সমতুল্য বলিয়া ইহারা পরিচয় দেয়।

চিৎগাভি বা পর্‌ভু। ভারতের কায়স্থদিগের সমতুল্য বলিয়া থাকে।

মিঃ বলরাম ডেস্‌মাক্ মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই সার সঙ্কলন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

নরহন্তা।

বিরাধ নগরে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। গৌর দীর্ঘ তনু-যষ্টি গৈরিকচ্ছদে মেঘগুপ্ত সূর্য্যাস্তের মত বড় সুন্দর ; অংসবিলম্বী কৃষ্ণকেশ তৈলনিষেক-চিক্কণ না হইলেও বুঝা যায় যে, অতি অল্পদিনই কেশ ও তৈলের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ, কিন্তু অতি পীন নহে। সন্ন্যাসীর যাচ্ঞা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই ; কিন্তু কেহ কিছু দান করিলেও তাহা প্রত্যাখ্যাত হইত না। যেখানে দরিদ্র সেখানে সন্ন্যাসীর স্কন্ধবিলম্বিত ঝুলি উন্মুক্ত হইয়া দরিদ্রের অজ্ঞাতে তাহার দারিদ্র্য মুছিয়া লইয়া যাইত ; যেখানে পীড়িত সেখানে সন্ন্যাসীর অটুট স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিত ; যেখানে আর্ত্ত সেখানে সন্ন্যাসীর প্রাণ আত্মবিস্মৃত হইত। এজন্য অতি অল্পদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসী সর্ব্বজনপরিচিত ও আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন ; দুইজন কেবল তাঁহাকে দেখিতে পারিত না। একজন—কুশীদ-জীবী বিশাখদত্ত, অপরজন—নগররক্ষী সুবন্ধু। সন্ন্যাসীর অজস্র প্রকাশ্য-গোপন দানে দরিদ্র পুরবাসী আর বিশাখ-দত্তের দ্বারস্থ হইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আত্মবিক্রয় করিত না, ইহাই তাহার রাগের কারণ। সন্ন্যাসী হইয়া অতুল ধনাধিকারী বলিয়া সুবন্ধুর বড়ই সন্দেহ, সন্ন্যাসী হয়ত ছদ্মবেশী দস্যুদলপতি।

সুবন্ধুর কার্য্যদক্ষতার বড় খ্যাতি। এ খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সুবন্ধু সন্ন্যাসীকে দস্যু প্রতিপন্ন করিবার জন্য বড় সচেষ্ট। বহু পুরবাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া সন্ন্যাসীকে সাবধান হইতে বলিল। সন্ন্যাসী একটু মধুর হাস্যে বলিলেন, "ভগবান তাহার মঙ্গল করুন।" নাগরিকগণ অবাক হইয়া রহিল।

কিছুদিন পরে এক দস্যুদল লুণ্ঠন-মানসে বিশাখ দত্তের বাড়ী আক্রমণ করিল। দরিদ্রের রক্তশোষক নরপিশাচ কুশীদজীবীর বাড়ী দস্যুগণ আক্রমণ করিলে জনপ্রাণী কেহ সাহায্য করিতে গেল না। দস্যুগণ দ্বারভগ্ন ও প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহ মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধ বিশাখদত্তের পুত্র এক তরবারি হস্তে দস্যুদলের সম্মুখীন হইল, একজনকে দশজনে আক্রমণ করিল। কুশীদজীবীর পুত্র কাপুরুষ না হইলেও হিসাবের খাতাপত্রের সহিতই অধিক পরিচিত, তরবারি চালনায় তাহার বিশেষ পটুতা ছিল না। সুতরাং আহত হইয়া শীঘ্রই ধরাশায়ী হইল। দস্যুরা বৃদ্ধ, শিশু এবং স্ত্রীগণকে আক্রমণ করিয়া লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, এক বিষম হুঙ্কার শুনিয়া দস্যুগণ থমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। সন্ন্যাসী তরবারি হস্তে পশ্চাতে দণ্ডায়মান।

সন্ন্যাসী একবার গণ্ডবিলম্বী কেশগুচ্ছগুলি মস্তক চালনা করিয়া পশ্চাতে সরাইয়া লইলেন ; ধীরে ধীরে দস্যুদের নিকটে আসিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "পরস্বাপহরণে এত আগ্রহ কেন ভাই ? বাহুতে বল আছে বোধ হইতেছে ; সৎপথে অর্থ উপার্জ্জন কি বড় কষ্টকর ?" দস্যুগণের বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অপগত হইয়া গেলে, সকলে ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে আক্রমণ করিল ; সন্ন্যাসী আত্মরক্ষা মাত্র করিতে করিতে ক্রমশঃ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দস্যুগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারসন্নিহিত হইল। তখন সন্ন্যাসী কৌশল করিয়া নিজে ফিরিয়া আসিয়া দস্যুদিগকে দ্বারের দিকে লইয়া গেলেন। তখন তিনি উচ্চরবে বলিলেন, "দেখ, এতক্ষণ আমি তোমাদের কিছু বলি নাই ; কিন্তু এখন যদি তোমরা সহজে গৃহত্যাগ করিয়া না যাও, তোমাদিগকে আঘাত করিতে আমি বাধ্য হইব।" এমন সময় বাহির হইতে একটা কিসের গোলমাল আসিতে লাগিল। দস্যুগণ ভীত হইয়া চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া আহত ও ভীতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বাহির দরজায় জোরে আঘাত পড়িল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ?' 'দ্বার খোল, আমি সুবন্ধু, নগররক্ষী।' সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া দিবার পূর্ব্বেই বিশাখদত্ত তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া সুবন্ধুর সম্মুখে কাঁদিয়া আছাড়িয়া পড়িল। সুবন্ধু গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, রক্তাক্ত কলেবর সন্ন্যাসী, লোহিতপুষ্প-সুশোভিত অশোক তরুর ত দিব্য সুন্দর, সহাস্যমুখে আহত যুবকের শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। সুবন্ধুর ক্রূরচিত্ত ক্ষণিকের জন্য সম্ভ্রমে পূর্ণ

হইল, পরক্ষণেই রূঢ়স্বরে বলিল, 'তুমি এখানে কেন?' সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, 'নগররক্ষীর নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব দেখিয়া।' এই শ্লেষবাক্যে নগররক্ষীর চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল, ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, 'তুমি ভণ্ড সন্ন্যাসী, তুমি দস্যুদলপতি, তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইব।' সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ শান্তমধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'আমায় ধরিয়া লইয়া যাওয়া তোমাদের সাধ্য নহে; কিন্তু তোমরা ন্যায়ের অনুচর। চল, আমি তোমাদের সহিত যাইব।' সুবন্ধু সন্ন্যাসীকে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

২

কারাগার জনস্রোতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পুরবাসিগণ সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে; সন্ন্যাসী কারাগৃহে অবরুদ্ধ থাকিয়াও তাহাদের হৃদয়ের রাজা। পুরবাসিদিগের মধ্যে কেহ কেহ রক্ষিদিগকে মারিয়া সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করিবার কল্পনা করিতে লাগিল। এ সংবাদ সন্ন্যাসীর নিকট পৌঁছিল। সন্ন্যাসী নাগরিকদিগকে বলিলেন, 'ন্যায়ের নামে আমি অবরুদ্ধ হইয়াছি, আমাকে ন্যায় ভিন্ন মুক্তি দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আমি তোমাদের সাহায্যে কারামুক্ত হইতে চাহি না, তোমরা বিরত হও।'

আজ সন্ন্যাসীর বিচার হইবে। বিস্তৃত দরবার বসিয়াছে। রাজার দক্ষিণে মন্ত্রী, তাঁহার দক্ষিণে নগররক্ষী সুবন্ধু, তাঁহার দক্ষিণে প্রাড়্বিবাক। রাজার বামে রাজকন্যা মন্দালিকা, তাঁহার বামে স্ত্রীরক্ষী। সেই বামদিকে একটু দূরে বন্দী সন্ন্যাসী, তাঁহার সম্মুখে দক্ষিণদিকে সাক্ষীবৃন্দ। বহু রক্ষী ও নাগরিকে গৃহ পরিপূর্ণ।

প্রথমে সুবন্ধু সন্ন্যাসীর অপরাধ বর্ণনা করিল; তৎপরে সাক্ষী বিশাখদত্ত শপথ করিয়া বলিল, 'সন্ন্যাসী দস্যুদলপতি, তিনিই আমার পুত্রকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে মারিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবন্ধু যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে', ইত্যাদি। সমস্ত জনসঙ্ঘ এই মিথ্যা ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হইয়া অশান্ত হইয়া উঠিল; সন্ন্যাসী আরক্ত ভ্রুকুটিকুটিল চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিলেন, সব[illegible]বার স্থির হইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সন্ন্যাসি, তুমি কি নরহন্তা দস্যু?' সন্ন্যাসী দৃঢ়গম্ভীর স্বরে কহিলেন; 'রাজন্, আমি নরহন্তা বটে, আমি দস্যু নহি'। রাজার বিচারে সন্ন্যাসীর দোষ প্রমাণিত হইয়া গেল, সন্ন্যাসীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইল। সন্ন্যাসী প্রশান্তচিত্তে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

৩

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর প্রাণ যাইবে। সন্ন্যাসী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়াছেন। আজ তাঁহার পূজাহ্নিকে বড় অধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছে। তৎপরে তিনি কয়েকখানি পত্র লিখিয়া সমাপ্ত করিলেন। তাঁহার গৃহের দ্বার মুক্ত হইল। দুই জন রক্ষী বর্ত্তিকা হস্তে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিল। সন্ন্যাসী রক্ষীদিগের হস্তে কয়েকখানি পত্র দিয়া বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর, আমার এই পত্র কয়খানি উপযুক্ত স্থানে পাঠাইয়া দিও।' কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে একটি রমণী আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীর বিস্ময় অপগত হইবার পূর্ব্বেই রমণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্ন্যাসী দেখিলেন, বিরাধনগরাধিপের কন্যা মন্দালিকা। সন্ন্যাসী অধিকতর বিস্মিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। রাজকন্যা ধীর-লজ্জানম্র-স্বরে কহিলেন, 'প্রভু, আপনি মুক্ত হইয়াছেন, আপনি প্রস্থান করুন।' সন্ন্যাসী বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, 'ছি রাজকুমারী, আমি এত নীচ নহি যে রাজাদেশ লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিব।' রাজকুমারী লজ্জায় একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আমি পলায়ন করিতে বলিতে পারি না; আমি আপনাকে মুক্তি দিতে আসিয়াছি।' এবার সন্ন্যাসীও একটু হাসিয়া কহিলেন, 'কিন্তু রাজকুমারি, আপনি মুক্তি দিবার কে?' রাজকুমারী হাসিয়া পশ্চাতে চাহিলেন, একজন পরিচারিকা অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাতে একখানা কাগজ দিল। রাজকন্যা সন্ন্যাসীকে কহিলেন, 'এই লউন মুক্তিপত্র।' সন্ন্যাসী খুলিয়া দেখিলেন, রাজার স্বাক্ষরিত মুক্তিপত্রই বটে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ইহা জাল নহে, ইহার প্রমাণ কি?' রাজকন্যাও হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, 'প্রমাণ আমার

সত্যবাদিতা। তাহাতে যদি কোন সন্দেহ করিয়া আপনি চলিয়া না যান, নগররক্ষী আপনাকে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিয়া আমার সত্যবাদিত্ব সপ্রমাণ করিবে।'

যখন রাজকন্যার শেষ কথা ক্ষীণ হইয়া কর্ণে আসিল, তখন রাজকন্যা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসী মুক্ত অথচ বন্দী; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। তিনি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সুবন্ধু উপস্থিত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, 'তুমি এখনো যাও নাই যে? তোমার বড় ভাগ্য ভাল যে রাজকন্যার তোমার উপর দয়া হইয়াছিল। আর শেষকালে বুড়া বিশাখদত্তের ধর্ম্মভাব গজাইয়া উঠিল; সে কাঁদিয়া কাটিয়া সব কথা বলিয়া ফেলিল। কিন্তু সুবন্ধুকে ফাঁকি দিয়া কতদিন কাটাইবে। যাও যাও, শীঘ্র চলিয়া যাও, আমার অন্য কাজ আছে।' সন্ন্যাসী হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে সে সন্ন্যাসীকে আর তথায় কেহ দেখিতে পায় নাই।

৪

হুমায়ুন বাদশাহের ভাগ্যবিপর্য্যয়কালে বহু হিন্দু-রাজা স্বাধীনতালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরাধীন জাতি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিলে, বিজেতা রাজার বিপদের সময়েও আপনাদিগের ভগ্নভাগ্যের সংস্কার করিতে পারে না। প্রাচীন ভারতের এ জ্ঞানটুকু ছিল। তাই যখন হুমায়ুন নিজের প্রবল শত্রুর সহিত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখনই এই বিরাধ নগর নিজের হৃত স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল। তৎপরে হুমায়ুন স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; তাঁহার মৃত্যু হইল; বালক আকবর বাদশাহ হইলেন। বিরাধ নগর নির্ব্বিঘ্নে অখণ্ড স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিতে লাগিল। তৎপরে আকবর সিংহাসন দৃঢ়ায়ত্ত করিয়া নষ্টরাজ্য পুনরাধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিরাধ নগরে সমরায়োজনের সমারোহ পড়িয়া গেল। চর আসিয়া সংবাদ দিল, যবনসৈন্য আগতপ্রায়।

যখন এই সংবাদ আসিল, তখনও রাজার সৈন্য নগর বাহিরে আসিয়া সমবেত হয় নাই। নগরবাসিগণ সবিস্ময়ে দেখিল, তরবারি হস্তে সন্ন্যাসী দ্রুতপদে রাজ-প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। তিনি রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন, সংবাদ যে লইয়া গেল, সে আর ফিরে না। সন্ন্যাসী রক্ষিদিগের বারণ না মানিয়া রাজার দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইয়া গম্ভীরোচ্চস্বরে বলিলেন, 'পুরদ্বারে শত্রু উপস্থিত, রাজন্ আপনার সৈন্য সংস্থান কৈ? স্বাধীনতা বড় দুরারাধ্যা দেবী, তাঁহার জন্য কায়মনপ্রাণ সমর্পণ না করিলে তাঁহার তুষ্টি হয় না। কই রাজা কই, স্বাধীনতারক্ষার আয়োজন কই?' বৃদ্ধ রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আমার আসন্ন-বিপদ দেখিয়া সেনাপতি ও নগররক্ষী সুবন্ধু যবনের সহিত মিলিত হইয়াছে। আর যুদ্ধ কে করিবে?' 'কেন আপনি করিবেন।' সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ হইল। বৃদ্ধ রাজা বলিলেন, 'আমি অক্ষম বৃদ্ধ।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'অক্ষম বৃদ্ধেরও স্বদেশ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ করা উচিত, আর দুই দিনের পরমায়ুর প্রতি এত আসক্তি কেন? কিন্তু যাক সে কথা, আপনি যদি অপারগ হন, আমাকে সেনাপতিত্বে বরণ করুন।' রাজা অশ্রু মুছিয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন. 'আমার বহু সৈন্য শত্রু সঙ্গে মিলিত, বহু পলায়িত, অবশিষ্ট হতোদ্যম হইয়াছে। তাহার উপায়?' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তাহার উপায়ও আমি করিব। শাস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত, অশিক্ষিত যে লোকের প্রাণে স্বদেশানুরাগ আছে, সেই আজিকার শ্রেষ্ঠ সৈন্য; যে মরিতে অকুণ্ঠিত সেই আজিকার শ্রেষ্ঠ সেনানী। আমি শুধু চাই ইচ্ছা, আমি শুধু চাই ঐকান্তিক আগ্রহ। আর বাক্যব্যয়ের সময় নাই। আমি চলিলাম।' সন্ন্যাসী রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে দেখিলেন, একখানি সুন্দর মুখের দুইটি চক্ষু তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে ও কাঁদিতেছে। সন্ন্যাসী চিনিলেন, 'রাজকন্যা মন্দালিকা।'

৫

নগরোপকণ্ঠে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। আত্ম-রক্ষা ও পরপীড়নের মধ্যে বিষম ব্যবধান; তাই আক্রমণ-কারী সুশিক্ষিত যবনসৈন্য, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সৈন্যের নিকট বার বার পরাজিত হইতে লাগিল। বেতনের খাতিরে যুদ্ধ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ এইরূপই হইয়া [illegible]ক। শিক্ষা, শাস্ত্রবল সব

হৃদয়ের আবেগের নিকট পরাস্ত হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে সুবন্ধু ও সন্ন্যাসী সন্নিহিত হইলেন। সুবন্ধু সন্ন্যাসীকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, সন্ন্যাসী তাঁহার তরবারির আঘাতে সুবন্ধুকে নিরস্ত্র করিয়া বলিলেন, 'যাও সুবন্ধু, আর পাপ করিও না। চিরকাল যাহার অন্ন খাইয়াছ, সেই প্রভুর আর বিরুদ্ধাচরণ করিও না।' সুবন্ধু মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিল, সন্ন্যাসীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল। আপনার হস্তভ্রষ্ট-অস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া যবনবধে প্রবৃত্ত হইল। এই সব কাণ্ড ঘটিতে যে একটু বিলম্ব, যে একটু অন্যমনস্কতা ঘটিয়াছিল, তাহাতে বহু যবনসৈন্য সন্ন্যাসীকে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। একজনের উপর শত খড়্গ পতনোন্মুখ, সন্ন্যাসী ও সুবন্ধু ক্ষিপ্রহস্তে সে সকল নিবারিত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের পদতলে শবস্তূপ হইতে লাগিল; একজন যবন সন্ন্যাসীর প্রতি বন্দুকের লক্ষ্য করিল, সন্ন্যাসীর সে দিকে দৃষ্টি ছিল না; সুবন্ধু শীঘ্র আসিয়া বন্দুকের গুলি নিজের বক্ষে গ্রহণ করিল। সুবন্ধুর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইল। সন্ন্যাসী দেখিলেন, সুবন্ধু তাঁহার পদতলে পড়িল; সন্ন্যাসীর চক্ষে জলধারা বহিল, সুবন্ধুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসীর পার্শ্বে এক পদার্পিতযৌবন কিশোর বড় যুদ্ধ করিতেছিল। কিন্তু যুদ্ধ ও আত্মরক্ষা অপেক্ষা সন্ন্যাসীর প্রতিই তাহার অধিক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হইতেছিল। যুবক যুদ্ধ করে, আর সন্ন্যাসীর দিকে চাহে; উভয়ের চোখে চোখে মিলিলে যুবক একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। এইরূপ সময়ে যবনসেনার মধ্যে তুমুল কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, সকলে কারণ নির্দ্ধারণে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। যবনগণ ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদিগকে যুদ্ধার্থী অপেক্ষা পলায়নপর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। যবনসেনার পশ্চাৎ হইতে ভীমরোলে শব্দিত হইল "হর হর। মহাদেও।" সকলে বুঝিল, একদল হিন্দুসৈন্য পশ্চাতে আক্রমণ করিয়াছে। তখন সম্মুখের হিন্দুসৈন্যও দ্বিগুণ উৎসাহে ধ্বংসক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত যবনসৈন্য ক্রমশঃ পাতলা হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় একজন যবন সন্ন্যাসীর প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিল। সেই কিশোর যুবক বন্দুকের মুখ ধরিয়া তাহা অন্যদিকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল; তাহাতে সন্ন্যাসীর জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু গুলি যুবকের পঞ্জরভেদ করিয়া গেল। ক্লান্ত কিশোর আপাদমস্তক রুধিরাপ্লুত, এ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পড়িয়া গেল, সন্ন্যাসী বামহস্তে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া হন্তা যবনের শিরশ্ছেদ করিলেন। এতক্ষণে রণস্থল যবনশূন্য; যুদ্ধের নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গে আহত হইলেও তাহা সংক্ষেপ করিলেন না। মাটিতে বসিয়া কিশোরকে কোলে করিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী যুবককে বলিলেন, 'তুমি বালক, তুমি আমার জন্য প্রাণ দিলে কেন? আমার প্রাণে তোমার কিসের জন্য মমতা?' যুবক শুধু হাসিল, একটা বড় দুঃখময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তৎপরে সন্ন্যাসী যুবকের ক্ষত বন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার অঙ্গাবরণী শিথিল করিতে চেষ্টা করিলেন। কিশোর ঈষৎ হাসিয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'বস্ত্র শিথিল করিবেন না, আমি রমণী।' সন্ন্যাসীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সন্ন্যাসী কহিলেন, 'তুমি রমণী? তবে তুমি এ রণক্ষেত্রে কেন?' রমণী হাসিয়া বলিল, তুমি সন্ন্যাসী, রণক্ষেত্র তোমারও ত উপযুক্ত স্থান নয়।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'স্বদেশ স্বাধীনতারক্ষার জন্য সন্ন্যাসীর অস্ত্রধারণ অন্যায় নহে।' 'স্বদেশ স্বাধীনতা রক্ষায় স্ত্রীলোকেরও তুল্যাধিকার বোধ হয়।' সন্ন্যাসী এবার হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন, 'আমি হা'র মানিলাম। কিন্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে, তোমার নাম কি?' রমণী হাসিয়া কহিল,—'অবন্তীশ্বর, তুমি সন্ন্যাসী হইয়া থাকিলেও আমি তোমায় চিনি, আমায় চিনিয়া তোমার কাজ কি?' সন্ন্যাসী ভাবিলেন, একি ভর্ৎসনা, না আত্মবিলোপ? পরক্ষণে তাঁহার মুখ বড় গম্ভীর হইয়া পড়িল, তিনি বাষ্পরুদ্ধচক্ষে কহিলেন, 'চিনিয়াছি, তুমি রাজকন্যা মন্দালিকা; তুমি আমায় চিনিলে কিরূপে?' মন্দালিকার চক্ষু মুদিত হইয়া গেল, লজ্জায় রক্তহীনকপোল আরক্ত হইয়া উঠিল, মন্দালিকা বলিল, ধীর স্থির কণ্ঠেই বলিল 'প্রেম অন্তর্য্যামী। হে অধীশ্বর, আমি জানি তুমি কি মহান চরিত্রের লোক। ভ্রমক্রমে তুমি একদিন নরহন্তা

হইয়াছিলে; তুমি রাজা, তুমি স্বাধীন, তবু তুমি আপনার ন্যায়াসনে বসিয়া আপনার বিচার করিয়াছ, আপনার প্রতি দণ্ডবিধান করিয়াছ। বার বৎসর অজ্ঞাতবাসে নিজ রাজ্য স্বজন পরিজন ছাড়িয়া দূরে একক অসহায় অবস্থায় লোকের হিত করিয়া বেড়াইয়াছ। আরও জানি, হে পবিত্র, তুমি কেমন অবহেলে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলে, জানি তুমি ভ্রান্তিকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুমি আপনার প্রতি কি কঠোর, তুমি পরের শত পাপের প্রতি কি উদার। আরও জানি হে পূজ্য, হে বন্দিত—না, আর বলিব না। তোমার পরিচয় আমি তোমার পত্র হইতে পাইয়াছি। যেদিন তোমায় মুক্তিসংবাদ দিতে যাই, সেই দিন তুমি রক্ষীর হাতে কতকগুলি পত্র দিয়াছিলে, মনে আছে। সে গুলি আমার বুকে রহিয়াছে। তারা তোমার মহত্ত্বের ইতিহাস বলিয়া আজ তাহাদিগকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছি। আমার মৃত্যু সন্নিকট,...একটা কথা শুনিবে?'

সন্ন্যাসীর চক্ষুও বর্ষার নির্ঝরের মত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, 'কি বল?' মন্দালিকা সন্ন্যাসীর কোলে মুখ লুকাইয়া বলিল, 'তুমি আগে বল......আমার অন্তিম অনুরোধ...রাখিবে।' সন্ন্যাসী কহিলেন, 'তোমার অন্তিম অনুরোধ রখিব।' মন্দালিকা এবার চোখ খুলিল, সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমি...মরিয়া গেলে...আমার...ললাটে একটি......সুন্দরীর মুখ হাসি লজ্জায় ভরিয়া উঠিল। প্রাণ সে সুন্দর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী তাহার রক্তরঞ্জিত ললাটে ধীরে একটি চুম্বন করিলেন। সন্ন্যাসী স্থির, অবিচল। এই সময় মন্দালিকার পিতা আসিয়া কন্যার বক্ষে আছাড়িয়া পড়িলেন। বহু বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার একমাত্র সন্তান, আমার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল ও সুখাশ্রয় বলি দিয়া, এ স্বাধীনতা, এ রাজ্য লইয়া আমার ফল কি?' সন্ন্যাসী ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'আপনাকে উৎসর্গ না করিলে দেবতার তুষ্টি নাই, আত্মপরের কল্যাণ নাই। আপনার কল্যাণও পরের কল্যাণে খুঁজিতে হইবে। হে বৃদ্ধ রাজন্, ভাবিয়া দেখ, আজ তোমার চেয়ে সুখী কে? আজ তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ বলি দিয়া স্বদেশ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছ। তোমার আদর্শ যুগে যুগে অনুসৃত হউক।' বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বুঝিলেন না; বিলাপ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'মানুষ সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখ মনে করিয়াই এত মনস্তাপ পায়।'

এই সময়ে যবনসেনার পশ্চাতাক্রমণকারী সৈন্যদল সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া দিল। এই দলের সেনাপতি আসিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, 'মলয়কেতু, তোমরা ঠিক সময়েই আসিয়াছিলে; মলয়কেতু বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রই আমরা যাত্রা করিয়াছি। মহারাজ, আর কতকাল আমরা অনাথভাবে জীবন ধারণ করিব?' অবন্তীর অধীশ্বর হাসিয়া বলিলেন, 'আমাব নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে, এখন আমি তোমাদের রাজ্যে ফিরিব।' 'মহারাজ, আমাদের রাজ্য!' সন্ন্যাসী-রাজা হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ রাজ্য তোমাদেরই, আমি তাহার রক্ষক ও তত্ত্বাবধারক মাত্র।' সন্ন্যাসী-রাজা বৃদ্ধ রাজা, ও অন্যান্য বিস্মিত-নাগরিক পরিবৃত হইয়া নগরে ফিরিলেন। মন্দালিকা, সুবন্ধু প্রভৃতি সকলের যথাবিহিত সংকার হইল। মরণকে আলিঙ্গন করিয়া স্বাধীনতা হাসিতে লাগিল।

৬

অবন্তীর অধীশ্বর বার বৎসর পরে স্বরাজ্যে ফিরিয়াছেন; কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করেন নাই। বিবাহও করিলেন না; কি এক গম্ভীর অব্যক্ত দুঃখে তাঁহার চিত্ত ব্যথিত, বদন কালিমালিপ্ত। ইহাতে রাজার অপত্যনির্ব্বিশেষে পালিত প্রকৃতিপুঞ্জ বড় ক্ষুণ্ণ। কিন্তু যেখানে আর্ত্ত ও দুঃখী সন্ন্যাসী-রাজা সেখানে সহস্রবাহু। যেখানে স্বাধীনতার জন্য রক্তপাত, সেখানে তাঁহারও রক্ত ক্ষরিত হইত। একতা আত্মীয়তায় সকল রাজার প্রাণে এক অদ্ভুত প্রীতি ও বল সঞ্চিত হইতে লাগিল। এই একতা বন্ধনের ফল আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল। ভারতে বহু স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী-রাজার সমস্ত সম্পত্তি স্বদেশ স্বাধীনতা আর্ত্ত দুঃখীর জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছিল। তিনি প্রায় বলিতেন,

পুত্রহীন রাজগণ দত্তকপুত্র লইয়া আপনাদের অর্থ-লালসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। নিজের জীবনান্তেও ধনসম্পত্তি দেশকে দিয়া যাইবে না, আমার পুত্র বলিয়া পরের পুত্রকে দিয়া যাইবে। কেন আমার স্বদেশ, আমার মা বলিয়া দেশের জন্য লালসাত্যাগ কি এত কষ্টকর। মরণের পরেও কি মায়া ত্যাগ করা যায় না। হায় হায়, এ প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের দেশে কবে হইবে?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা।

বেলা গেল সন্ধ্যে হ'ল
সূয্যি বসে পাটে;
সোণার বরণ অরুণ কিরণ
পড়্‌ছে পথে ঘাটে।
সন্ধ্যারাণী ঘোম্‌টা টানি
আড় নয়নে চায়;
সলাজ মুখে মনের সুখে
মুচ্‌কি হাসে তায়।
ডানাটী তুলি পাখিগুলি
যাচ্ছে সবে নীড়ে;
ছাড়িয়ে খেলা ছেলে মেয়েরা
আস্‌ছে ফিরে ঘরে।
হেরে গোধূলি ধেনুগুলি
ঘরের পানে যায়।
উড়ায়ে ধূলি বাছুরগুলি
পেছন পেছন ধায়।
সন্ধ্যা হেরি যতেক নারী
জ্বাল্‌ছে ঘরে বাতি;
তুলসীতলে দীপটী জ্বেলে
করিছে আরতি।
শঙ্খরব করে সব
প্রতি ঘরে ঘরে;
ধূনার ধোঁয়া জলের ছিটা
দিচ্ছে সব দ্বারে।
দিনের আলো নিভে গেল
এল বিভাবরী;
বস্‌লো ধ্যানে গৃহিগণে
ইষ্টদেবে স্মরি
ছেলের দলে দলে দলে
ক'রছে নিজ পড়া
সুর করিয়ে মেয়েগুলো
কাট্‌ছে কত ছড়া।
মায়ের কোলে শুয়ে ছেলে
ধ'রে মায়ের গলা;
কুন্দ দাঁতে কচি হাতে
ক'রছে হাসি খেলা।
সোহাগ ভরে মুখটী তুলে
চাঁদের পানে চায়;
বল্‌ছে খোকা আধস্বরে
"আয় রে চাঁদ আয়।"
শুনে সে কথা হাস্‌ছে মাতা
দিচ্ছে মুখে চুমো;
বলে খোকাধন মাণিক রতন
"ঘুমো রে যাদু ঘুমো।"
"খোকা ঘুম'ল পাড়া জুড়'ল"
বল্‌ছে এই কথা;
আদর করে বুকে ধরে
ঘুচিয়ে মনের ব্যথা।
ঘুমুল ছেলে মায়ের কোলে
মায়ের সোহাগ পেয়ে;
হেথা,
ঘুমু'ল ধরা, শ্রান্তিহরা
সন্ধ্যার কোলে শুয়ে।

শ্রীসুরবালা রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সমালোচনার্থ অনেকগুলি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু স্থানাভাব প্রভৃতি নানা কারণে এ পর্য্যন্ত আমরা তাহার সমালোচনা অথবা প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া উঠিতে পারি নাই। এজন্য গ্রন্থকারগণের নিকট আমাদের যথেষ্ট ত্রুটি হইয়াছে; এখন হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকারগণ আমাদিগের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

১। গৌরাঙ্গ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী-প্রণীত, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা। গৌরাঙ্গ খণ্ডকাব্যের কতক অংশ পূর্ব্বে গ্রন্থকারের 'আরতি' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন উহা সম্যক পরিবর্দ্ধিত ও পূর্ণাবয়বে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, যাঁহার নিরাবিল প্রেমের হিল্লোলে একদিন 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়' হইয়াছিল এই খণ্ডকাব্যে সেই প্রেমের অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জীবনীই প্রতিপাদ্য বিষয়। মিষ্ট রস যেরূপেই আস্বাদন করা যায় উহা ত চিরকালই মধুর। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে ভগবানের অবতাররূপে প্রতিপাদন না করিয়া স্বীয় অপ্রতিহতগতি 'নিরঙ্কুশ' কল্পনার সাহায্যে কবি তাঁহাকে মানুষী শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানবরূপে জগৎ সমীপে উপনীত করিয়াছেন। তিনি নিজ ছাপাই স্বরূপ ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার দুই এক পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত হইল—"বরেণ্য-ভক্ত-রচিত জীবনচরিতে গৌরাঙ্গে অতিপ্রাকৃত গুণগ্রামের আরোপণ ও ঈশ্বরত্ব স্থাপনা হইয়াছে। এ নগণ্য ভক্তের সামান্য জ্ঞানে চৈতন্য চন্দ্র অসামান্য মানুষী মহিমার সমুজ্জ্বল, জগৎপূজ্য ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরত্বের গুরুভার আরোপ করিলে, উহাকে ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্বই করা হয়। তাই, আমার গৌরাঙ্গ আমার ভাবেই চিত্রিত হইয়াছেন।"

আমরা কবি প্রমথনাথের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী তাই তাঁহার পরিপক্ক হস্তের ভাবময়ী কল্পনাপ্রসূত প্রত্যেক কাব্যোচ্ছ্বাস আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া আমরা আত্মহারা হইয়াছি। দুঃখের বিষয় স্থানাভাবপ্রযুক্ত পাঠকবর্গকে সে সৌন্দর্য্য সুখ উপভোগ করাইবার সুযোগ হইল না। আমরা সকলকে এ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কেহ কেহ আমাদিগকে একদেশদর্শী বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন কিন্তু তাহার উত্তরে আমরা এই বলিব যে, সংসারে অবিমিশ্র জিনিষ পাওয়া দুর্ঘট, দোষ গুণ, পাপ পুণ্য, আলো অন্ধকার ধর্ম্ম অধর্ম্মের সংমিশ্রণে জগৎ পূর্ণ। তবে এই দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির ন্যূনাধিক্য বশতঃ সংসারে প্রত্যেক বস্তুর তারতম্য হইয়া থাকে। এস্থলে খুটি নাটি দোষ ধরিয়া সমালোচনা করা আমরা সঙ্গত মনে করি নাই।

২। সেকালের লোক—বাইবেলের উপাখ্যান পাদ্রি জুশন সাহেব কর্ত্তৃক প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় প্রকটিত। বাইবেলের বাঙ্গালা বলিলে মনে যে ভাবের উদয় হয় এই পুস্তক পাঠে তাহা হয় না। ইহার ভাষা বেশ সরস ও সরল।

৩। রাধিকা—কবিতা পুস্তক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই-মূল্য এক টাকা। স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলেও গ্রন্থকার যে নীরস পুলিশ কর্ম্মচারীর কার্য্য সমাপন করিয়া সরস কবিতার আলোচনাচ্ছলে মাতৃভাষার সেবা করিতে সময় পাইয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রশংসার বিষয়।

গ্রন্থকার পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন, গ্রন্থের কতক লভ্যাংশ কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সাধু উদ্দেশ্য বটে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইলে আমরা সুখী হইব।

৪। স্ত্রী-শিক্ষা—ঢাকা মেডিকাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ঢাকা গেণ্ডারিয়া-যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷৶৹ আনা। এই পুস্তকে স্ত্রী পুরুষের শারীরিক মানসিক পার্থক্যের বিষয় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। কি প্রণালীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা বিধান করিতে হইবে তাহাও বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে জানিবার শুনিবার শিখিবার অনেক বিষয় আছে, ভাষাও মন্দ নহে।

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম'

(তিন ভাগে সম্পূর্ণ)

প্রতি ভাগ মূল্য ১৷৹। সমগ্র পুস্তক ৪৷৴।

Hinduism.
Scientific, Philosophic,
Theosophic.

অধ্যাত্মবিজ্ঞান, দর্শন ও জড়বিজ্ঞানের মতে হিন্দুধর্ম্মের অত্যাশ্চর্য্য ব্যাখ্যান ও ইহার স্বর্গীয়ভাব স্ফুরণ প্রথমভাগে মানবজীবনের কূট প্রশ্নের মীমাংসা। দ্বিতীয়ভাগে হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মরূপের বিশদ ব্যাখ্যান। তৃতীয় ভাগে হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক রূপের বিশদ ব্যাখ্যান।

লেখক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ এম, বি
পান্নাধিপতির ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার।
প্রদীপ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম দুই ভাগ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা গ্রাহ হইবেন তাঁহারা এখন নাম পাঠাইয়া গ্রাহক হউন পুস্তক প্রকাশিত হইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পাইবেন।

বিশেষ সুবিধা—এখন গ্রাহক হইলে তিন খণ্ড পুস্তক ৩৲ টাকায় পাইবেন।

প্রদীপ কার্য্যাধ্যক্ষ

৫৫ নং জানবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

রেণু

কবিতা পুস্তক

(যন্ত্রস্থ)

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা প্রণীত উৎকৃষ্ট বিলাতী কাগজে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

স্বদেশীয় শীতবস্ত্র।

কাশ্মীরা, দেশী তৈয়ারি খাঁটি উলের, প্রস্থে ২৭ ইঞ্চ, বিলাতী কাশ্মীরা অপেক্ষা নিঃসংশয়িতরূপে উৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি গজ উৎকৃষ্টানুসারে ১৲ টাকা ও ১৷৶৹ আনা।

কাশ্মীরি চাদর, দৈর্ঘ্যে ৩৷৹ গজ ও প্রস্থে ৫৯ ও ৬০ ইঞ্চ, সুন্দর কাশ্মীরি পাড়দার মূল্য ২৮৲ টাকা।

বিশুদ্ধ কাশ্মীরি আলোয়ান, ধূসর, খাকী, শাদা ও বাদামী রংএর ৫৫ ইঞ্চ প্রস্থে সকল আকারের, প্রতিগজ ৫৷৹ টাকা।

মলিদা চাদর—খুব গরম ও মোলায়েম, দৈর্ঘ্যে ৩৷ গজ প্রস্থে ৫৮ ইঞ্চ মূল্য ১৬৲ টাকা।

লাহোরী চুসা, দৈর্ঘ্যে ৬৷ গজ, প্রস্থে ৫৮ ইঞ্চ, অতি মোলায়েম ও গরম, মূল্য ২৫৲ টাকা।

র‍্যাপার দৈর্ঘ্যে ৩।০ গজ, প্রস্থে ৫৬ ইঞ্চ, মূল্য ৬৲, ৭৲ টাকা।

কোনও মাল কোনও গ্রাহকের মনোনীত না হইলে, আমরা উহা যাতায়াতের একদিকের মাশুল দিয়া ফেরত লইয়া থাকি।

আমির চাঁদ এণ্ড সন্,
শাল বিক্রেতা, লাহোর।

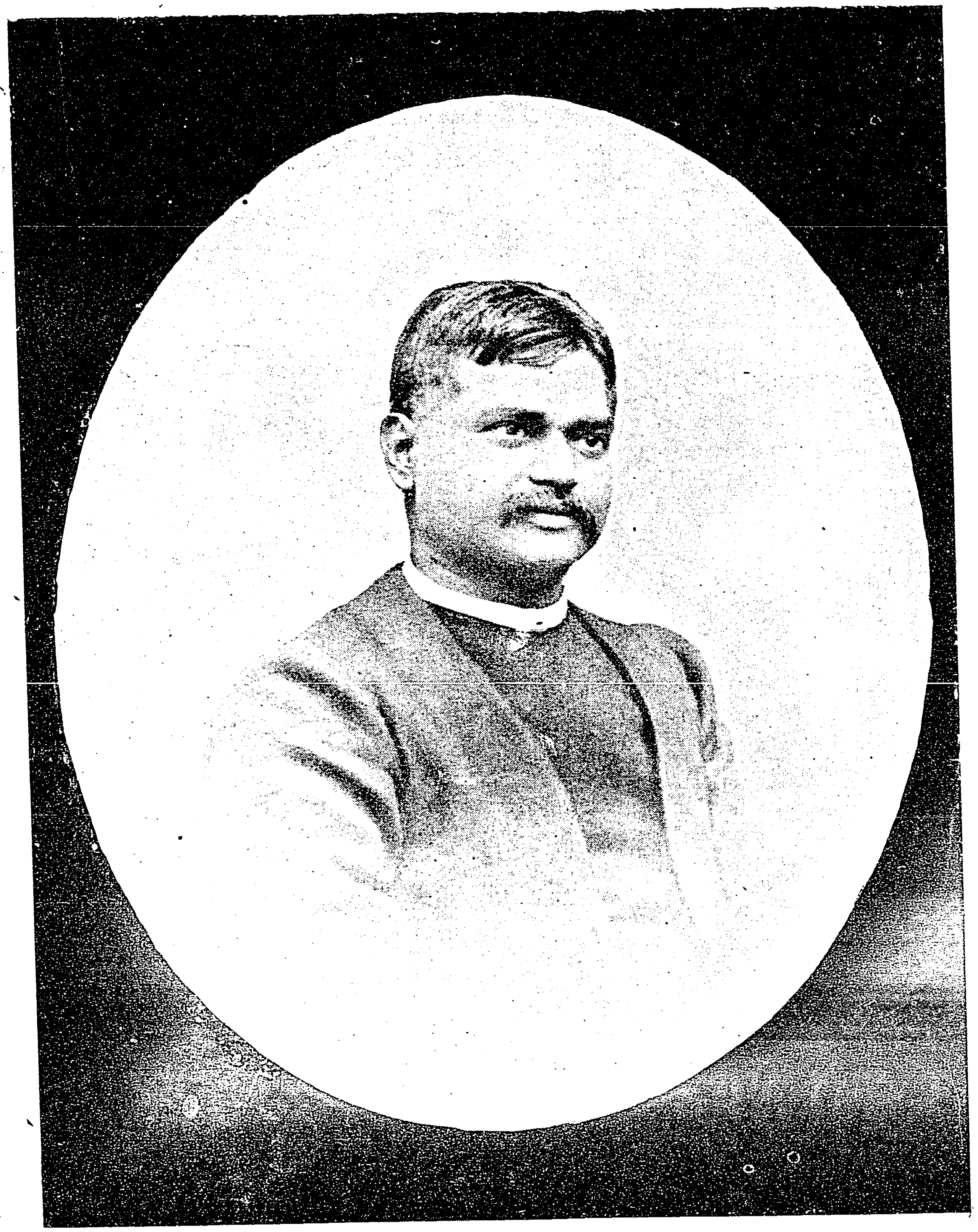

বঙ্গের সুসন্তান

শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী সরকার সি, আই, ই।

৬ষ্ঠ ভাগ। } পৌষ, ১৩১০। { ৯ম সংখ্যা।

বেদান্ত দর্শন।

মঙ্গলাচরণম্।

অথ সর্ব্বস্য বীজায় নিত্যায় হতপাপ্মনে।
ত্যক্তক্রম বিভাগায় চৈতন্য জ্যোতিষে নমঃ॥

যিনি সংসারতরুর বীজভূত, যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব-কালস্থায়ী, যিনি পাপহারী, সেই নিত্য-চৈতন্য-জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি।

অদ্যকার প্রতিপাদ্য বিষয় বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত দর্শন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা দুরবগাহ দর্শন। ইহা পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম স্বরূপও পরিগণিত হইতে পারে। অতএব ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে ইহার সহিত অন্যান্য দর্শনের তুলনা করা কর্ত্তব্য। কোন দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ব্যতিরেকে উহার বর্ণন করিতে হয়, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয় হইতে উহার পার্থক্য ও বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া প্রতিপাদন করিতে হইবে। পরে অন্বয়-মুখে উহার বর্ণন করা আবশ্যক, অর্থাৎ উহার লক্ষণ ও প্রতিপাদ্য কি, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।

সমুদায়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শন শাস্ত্রের সংখ্যা পঞ্চদশ। তন্মধ্যে ছয়টী প্রধান বলিয়া সাধারণতঃ পরি-গণিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ন্যায় ও বৈশেষিক, সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত। প্রথম চারিটী দর্শন প্রধা-নতঃ তর্ক ও যুক্তির উপর সংস্থাপিত; তথাপি উহার কোনটীতেও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত হয় নাই, প্রত্যুত অনেক স্থলে বেদার্থকে যুক্তির পৃষ্ঠপোষকরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, অধিক কি নিরীশ্বর সাঙ্খ্য দর্শনেও মধ্যে মধ্যে শ্রুতির সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে মীমাংসা ও বেদান্ত সম্পূর্ণ শ্রুতিমূলক, তবে এতদুভয়ে স্বমত সংস্থাপন ও পরমত খণ্ডনে জন্য তর্ক ও যুক্তির যথেষ্ট

সমাবেশ আছে। অধুনা যথাক্রমে ষড়্দর্শনের বর্ণন হইতেছে।

ন্যায়দর্শন।—ন্যায়দর্শনের মত আরম্ভবাদ। মহর্ষি গৌতম বা অক্ষপাদ ন্যায়দর্শনের প্রণেতা। পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে নিত্য সৎস্বরূপ পরমাণুরূপ কারণ হইতে অসৎ কার্য্যরূপ ঘটপটাদির উৎপত্তি হইয়াছে। আপাততঃ কারণ দুই প্রকার বলিয়া ধরা গেল।

উপাদান কারণ—যেমন মৃত্তিকা ঘটের, সুবর্ণ কুণ্ডলের। আর নিমিত্ত কারণ—যেমন কুলাল ঘটের, স্বর্ণকার কুণ্ডলের। ন্যায়দর্শনের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, আর পরমাণু উপাদান কারণ। আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ, আমি স্থূল, আমি কৃশ এইরূপে দেহে আত্মবুদ্ধি হয়; আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি খঞ্জ ইত্যাদি প্রকারে ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া জ্ঞান জন্মে। কিন্তু ঈদৃশ জ্ঞান মিথ্যা, কারণ আত্মাই অহং পদের অর্থ। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সেই মিথ্যা জ্ঞান অপগত হয়। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মিথ্যা জ্ঞানের কার্য্য, মিথ্যা জ্ঞান অপগত হইলে রাগ দ্বেষাদিও অপগত হয়; রাগ দ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির অবসান হয়, তন্নিবন্ধন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আর সঞ্চিত হইতে পারে না। এদিকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল দগ্ধ হইলে, জন্মান্তর পরিগ্রহ হয় না ও সুখ দুঃখও সম্ভবে না। আত্মা স্বভাবতঃ জড়, জীবদ্দশাতে মনঃসংযোগ বশতঃ আত্মাতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইত, ও আত্মাকে চেতন বলিয়া জ্ঞান জন্মিত। অধুনা মুক্তদশাতে শরীর নাই, ইন্দ্রিয় নাই, মনও নাই। মুক্তদশাতে আত্মার সহিত শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির কোন সম্বন্ধ না থাকাতে, যেমন দুঃখের অভাব হইবে, তেমনি সুখেরও অভাব, অধিক কি চৈতন্যেরও অভাব ঘটিবে। মুক্তির এই ছবিটী উপলক্ষ করিয়া, দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ চার্ব্বাকমুখে ন্যায়দর্শনের প্রণেতার প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা অতীব কৌতুককর। চার্ব্বাক বলিতেছেন যে, মহামুনি শাস্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে মুক্তি পাইলে আত্মা প্রস্তরের ন্যায় জড় হইয়া পড়ে, তিনি গৌতমই (শ্রেষ্ঠ গুরু) বটেন; তাঁহাকে যেরূপ বলিয়া জান, তিনি তদ্রূপই বটেন। ন্যায়মতে দুঃখের আত্যন্তিক অভাবকে মুক্তি বলে। চেতনা দুঃখভোগের কারণ, অতএব যেমন চেতনার অভাবে সকল দুঃখের অত্যন্ত অভাব হয়, তেমনি সকল সুখের ও সকল জ্ঞানের অপগম হইয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের বিরাম ঘটিবে। এরূপ অপবর্গ কোন্ বুদ্ধিমানের স্পৃহনীয় হইতে পারে? কিন্তু ন্যায়-ভাষ্যকার বলেন, অপবর্গ ভয়ানক নহে, ইহা শান্তির নিকেতন। কারণ অপবর্গ লাভে সকল দুঃখ ও সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। যেমন মধুসিক্ত অন্ন বিষসম্পৃক্ত হইলে অগ্রাহ্য হয়, তেমনি দুঃখানুসক্ত সুখও অনুপাদেয় হয়। দুঃখ জর্জ্জরিত ব্যক্তি যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া অচৈতন্য অবস্থা পর্য্যন্ত প্রার্থনা করে এবং তল্লাভে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে।

অনেক অবান্তর বৈলক্ষণ্য থাকিলেও বৈশেষিক দর্শন ন্যায়দর্শনের অনুযায়ী। বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি সাতটী পদার্থ, কিন্তু ন্যায়মতে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটী পদার্থ।

সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল।—সাঙ্খ্য দর্শন মহর্ষি কপিল কর্ত্তৃক ও যোগ দর্শন পতঞ্জলি মুনি কর্ত্তৃক প্রণীত। উভয়কেই সাঙ্খ্য প্রবচন বলে। পরিণামবাদ সাঙ্খ্য দর্শনের মূলভিত্তি।

সাঙ্খ্য নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু পাতঞ্জল ঈশ্বরবাদী। উভয় মতেই প্রকৃতি জড়স্বভাবা ও সত্ত্বরজতম এই ত্রিগুণময়ী। চেতনস্বভাব পুরুষের অর্থাৎ আত্মার ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতিই সৃষ্টি কার্য্য করিয়াছেন। আত্মা কেবল সাক্ষী স্বরূপ তদ্দর্শনে নিযুক্ত আছেন।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অতএব পরিণামশীলা। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মার অনেকগুলি বিশেষগুণ আছে। যথা,—ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, (অদৃষ্ট) সুখ ও দুঃখ। আর সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি কতিপয় সামান্য গুণও আত্মাতে আছে। কিন্তু সাঙ্খ্যমতে আত্মাতে কোন গুণ ও কোন ক্রিয়া নাই। আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই কেবল ভোক্তৃত্ব আছে মাত্র। সুতরাং আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ অপরিণামী ও অবিকারী। সাঙ্খ্যাচার্য্যদিগের মতে কার্য্য, কারণের পরিণাম মাত্র। সৎকারণে কার্য্য সূক্ষ্মরূপে সৎস্বরূপ বিদ্যমান থাকে। যেমন দুগ্ধে দধি। প্রকৃতির কার্য্য বুদ্ধি। বুদ্ধি প্রত্যেক পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন। বুদ্ধি

স্বয়ং জড় হইলেও চৈতন্যের আভাস বশতঃ চেতনবৎ বোধ হয়, যেমন জবা পুষ্পের আভাতে স্ফটিক মণিতে লোহিতবর্ণ প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ। বুদ্ধি বিষয় বৃত্তি হইলে, অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থের আকারে পরিণত হইলে চিন্ময় পুরুষের চিদাভাস বশতঃ তত্তৎ বস্তুর জ্ঞানলাভ হয়; সেই জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান। মিথ্যা জ্ঞান নিবন্ধন জীবকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখে নিপীড়িত হইতে হয়। দুঃখ প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিগত হইলেও পুরুষে আরোপিত হয়। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ, শরীরগত ও মানসসম্ভূত। ভূত, যক্ষ, রাক্ষসাদির আবেশ বশতঃ যে দুঃখ তাহা আধিদৈবিক; আর মানুষ, তির্য্যক্ স্থাবরাদি জনিত দুঃখ আধিভৌতিক। পুরুষ বাস্তবিক অসঙ্গ অর্থাৎ নির্লিপ্ত। ভিন্ন ভিন্ন শরীরে পৃথক পৃথক জীবাত্মাস্বরূপ পুরুষের অধিষ্ঠান আছে। বুদ্ধির প্রতিবিম্ব বশতঃ প্রকৃতির কার্য্য স্বরূপ যে জড়জগৎ তাহার সহিত প্রত্যেক পুরুষের সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। বিবেক জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান হইলেই মিথ্যা জ্ঞানের লোপ হয়, তন্নিবন্ধন মিথ্যা জ্ঞানের কার্য্য স্বরূপ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হওয়াতে নির্ব্বাণ হয়। বস্তুতঃ পুরুষের বন্ধমোক্ষ নাই, তবে প্রকৃতির কার্য্যবশতঃ বন্ধমোক্ষ আছে বলিয়া বোধ হয়। সাঙ্খ্যমতে পুরুষ লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা পদার্থ, যথা,—প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এই তিনটী অন্তরেন্দ্রিয়; চক্ষুঃ কর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত। সমস্ত জড় পদার্থই গুণত্রয়ের মিলিত অবস্থা, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। তবে গুণবিশেষের ন্যূনাধিক্য বশতঃ জড়জগতে এত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞান স্বরূপ, রজোগুণ দুঃখ ও ক্রিয়া স্বরূপ এবং তমোগুণ জড়দ্রব্য ও মোহস্বরূপ, এই তিনটীতে আত্মাকে বদ্ধবৎ রাখে বলিয়া ইহারা গুণ শব্দে উক্ত হয়।

প্রলয়কালে অদৃষ্টের অর্থাৎ কর্ম্মফলের অভাব প্রযুক্ত এই গুণত্রয় বিযুক্ত হইয়া স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তন্নিবন্ধন প্রকৃতির ক্রিয়ার লোপ হয়।

দুঃখের সমুচ্ছেদ শাস্ত্রোপদিষ্ট কারণবশতঃ সংঘটিত হয়, বিবেকজ্ঞানই সেই কারণ। বিবেকজ্ঞান অনায়াসসাধ্য নহে। বহু ক্লেশে বহু জন্মে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত শ্রবণ মননাদি শাস্ত্রবিহিত উপায় দ্বারা বিবেকজ্ঞান লাভ হয়। যদি জগতে দুঃখ না থাকিত, কেহই তন্মোচনের জন্য শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিতে উৎসুক হইত না। অতএব শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্রদ্ধা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাঙ্খ্য নিরীশ্বর বাদী। ঈশ্বর নাই এ কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট না হইলেও "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সাঙ্খ্য সূত্রটীর অর্থ এই ঈশ্বর যে আছেন তাহার প্রমাণ নাই। সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা বলেন, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ চিন্ময় ব্রহ্ম অপরিণামী, তাহার জড় জগদাকারে পরিণত হওয়া একান্ত অসম্ভব। পরন্তু জড়স্বভাব প্রকৃতি ঈশ্বরকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। এ কথাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, ঈশ্বর কি জন্য অধিষ্ঠান করিয়া প্রকৃতিকে সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত করিবেন? স্বার্থের জন্য নহে; তিনি পূর্ণকাম; এমন কোন বিষয় নাই, যাহা পাইবার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে।

পরন্তু পরদুঃখ পরিহারের জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব কোথায়, দুঃখ বা কোথায়? দুঃখ ত তাঁহার সৃষ্ট। কারুণ্য ঈশ্বরের সৃষ্টির কারণ হইলে তিনি প্রাণীকে সুখীই করিতেন, কাহাকেও দুঃখী করিতেন না। অতএব ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। অচেতন প্রকৃতিই সৃষ্টিকর্ত্রী। বৎসের জন্য গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণ আপনা হইতেই হয়, তদ্রূপ চেতন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়। যেমন গুটী পোকা আপনাকে আপনি বন্ধন করে, তদ্রূপ প্রকৃতি নিজের কার্য্য দ্বারা আপনারই বন্ধন সাধন করে। বস্তুতঃ পুরুষের বন্ধ মোক্ষ ও সংসার নাই। প্রকৃতির বন্ধ মোক্ষ ও সংসার পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। যেমন ভৃত্যগত জয় পরাজয় প্রভুতে আরোপিত হয়, তদ্রূপ। বিবেক জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, মুক্ত পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সৃষ্টি আর হয় না। পাতঞ্জল দর্শন সাঙ্খ্যের অনুরূপ, তবে উহা সেশ্বর, নিরীশ্বর নহে। পতঞ্জলি বলেন, সকল পদার্থের তারতম্য একস্থলে অবশ্যই বিশ্রান্ত হইবে। অর্থাৎ তারতম্যের চরমসীমা না মানিলে চলিবে না। মহৎ পরিমাণের তা বড় তা বড় করিয়া [illegible]ত থাকিলে, এক স্থানে

অর্থাৎ বিভুস্বরূপ আত্মাতে পর্য্যবসান মানিতে হইবে। আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, আত্মা হইতে মহৎ বস্তু দ্বিতীয় নাই। পরিমাণের ন্যায় জ্ঞানের তারতম্য ধরিতে গেলে ঈশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

শক্তির তারতম্য ধরিলে দুই জন সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। কারণ, অসীম ক্ষমতাশালী দুই ব্যক্তির ইচ্ছা সমানভাবে অপ্রতিহত হওয়া সম্ভাবিত নহে। একের ইচ্ছা অনুসারে জাগতিক ব্যাপার চলিলে, অপরের ইচ্ছা অবশ্যই সঙ্কুচিত হইবে, অনিয়ন্ত্রিত থাকিতে পারিবে না। অতএব স্থির হইল, ঈশ্বর এক।

জীবগণ কর্ম্ম জন্য ফল ভোগ করে, অর্থাৎ বুদ্ধিস্থিত ক্লেশাদি জীবাত্মাতেই আরোপিত হইয়া থাকে, ঈশ্বরে হইতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরের বুদ্ধি বিশুদ্ধ, কিন্তু জীবাত্মার বুদ্ধি মলিন, সুতরাং জীবাত্মাতেই ক্লেশাদির ভোগ হয়। যোগবলে বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তন্নিবন্ধন ক্লেশের আত্যন্তিক ধ্বংস হয়। তাহাই মুক্তিপদের প্রতিপাদ্য। যোগশব্দে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযুক্ত। ধ্যেয় বিষয়ে একতান চিত্তের নাম একাগ্রচিত্ত।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অশুদ্ধি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন অশুদ্ধির ক্ষয় হয়, তেমনি বিবেক জ্ঞানের দীপ্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যমের অন্তর্গত। শৌচ, স্বাধ্যায়,সন্তোষ, তপ, ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ-রূপ প্রণিধান এই কয়েকটী নিয়ম শব্দের অর্থ। পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন। শ্বাস প্রশ্বাসের রেচন ও পূরণ দ্বারা প্রাণায়াম হয়। বাহ্য বিষয় হইতে চিত্তের অপসারণের নাম প্রত্যাহার। শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তর দেশবিশেষে চিত্তের বন্ধনের নাম ধারণা। ধ্যেয় পদার্থে অবিচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তিপ্রবাহকে ধ্যান বলে। আর যখন কেবল ধ্যেয়াকার মাত্রের স্ফূর্ত্তি হয়, বিষয় বিষয়ী ও জ্ঞান এই তিনের পৃথক্ স্ফূর্ত্তি হয় না, তদবস্থাপন্ন ধ্যানই সমাধি। এইরূপ অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠানেই [illegible]বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় ও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়; তাহাতেই ক্লেশাদির ধ্বংস ও মোক্ষপ্রাপ্তি।

মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন।—পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা শব্দে এই দুই দর্শনের যথাক্রমে উল্লেখ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন জৈমিনি মুনি প্রণীত,ইহাতে কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় শ্রুতিগুলির ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্য করিবার জন্য নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রুতির প্রকৃত অর্থ স্থির করিতে না পারিলে শ্রুতিবিহিত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সম্যক্ প্রকারে সমাহিত হইতে পারে না, তাহা না হইলে তদনুষ্ঠান জন্য স্বর্গাদি ফললাভ সম্ভবে না। অতএব শ্রুত্যর্থের নিরূপণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কিন্তু কথা হইতেছে, যে স্বর্গাদি সুখ অচিরস্থায়ী, তাহা পরম পুরুষার্থরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। বেদবোধিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইতে পারে, চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান সম্ভবে না, এজন্য স্বল্পাধিকারীর পক্ষে প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড বিহিত হইয়াছে। গীতাতে যে "কর্ম্ম যোগোবিশিষ্যতে" এই উক্তি আছে, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির পক্ষে অনুষ্ঠেয় বলিয়া কর্ম্মের প্রশংসা কর্ত্তব্য, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগের উৎকর্ষ কীর্ত্তন করা উহার অভিপ্রেত নহে।

মীমাংসাদর্শন কর্ম্মকাণ্ড লইয়া এত ব্যস্ত যে, যাঁহার প্রীতির উদ্দেশে কর্ম্মকাণ্ড বিহিত হইয়াছে এবং যিনি কর্ম্মকাণ্ডের ফলদাতা, তাঁহার প্রতি সচরাচর তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে মীমাংসার আচার্য্যেরা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই জন্য কেহ কেহ মীমাংসা দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মীমাংসাদর্শনের আচার্য্যেরা ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের প্রতিষ্ঠাতাদিগের মত অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধি করিতে প্রয়াস পান না, কিন্তু এবিষয়ে অনুমানের অকিঞ্চিৎকরতা স্থির করিয়া কেবল শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই জন্য বোধ হয় মীমাংসা দর্শনকে নিরীশ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। কবি শিহ্লন শান্তিশতকের মঙ্গলাচরণে মীমাংসাদর্শনের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন, দেবগণকে কেন নমস্কার করিব? তাঁহারা ত পোড়া বিধাতার বশবর্ত্তী। তবে

বিধাতাকেই বন্দনা করি না কেন? কিন্তু তিনি কর্ম্ম অনুসারেই সর্ব্বদা ফলদান করেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে সুখদুঃখরূপ ফল কেবল কর্ম্মেরই আয়ত্ত, অতএব দেবগণকে নমস্কার করিয়া আর কি হইবে, বিধাতাকেই বা বন্দনা করিবার ফল কি? ধর্ম্মকেই নমস্কার করি। এ প্রস্তাবের উপসংহারে একটী গল্প উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য যোগী, সন্ন্যাসী ও বেদান্তের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, আর মণ্ডন মিশ্র ভোগী, সংসারাশ্রমী ও মীমাংসা দর্শনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উভয়ে বিচারার্থ উদ্যত হইলে শঙ্কর মণ্ডনের অঙ্গনা উভয়ভারতীকে মধ্যস্থ মানিলেন। তখন মণ্ডন-পত্নী উভয়ের গলদেশে মাল্য দিয়া শঙ্কর ও তদীয় বহুসংখ্যক শিষ্যগণের অতিথিসৎকারার্থ আয়োজন করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহুবিচারের পর জয় পরাজয়ের নিরূপণার্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অম্লানমুখে বলিলেন, যাঁহার গলদেশের মাল্য শুষ্ক হইয়াছে, তাঁহারই পরাজয় মানিতে হইবে। মণ্ডনমিশ্রের মাল্য শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারই পরাজয় স্থির হইল। তখন মণ্ডনমিশ্র আপনাকে শঙ্করের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন।

সম্প্রতি বেদান্তদর্শনের আলোচনা হইতেছে। যেমন ন্যায়ের ও বৈশেষিকের আরম্ভবাদ, যেমন সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জলের পরিণামবাদ, তদ্রূপ বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ, প্রপঞ্চ মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম, যেমন শুক্তিতে রজতের ভ্রম, তদ্রূপ সৎস্বরূপ আত্মাকে অসৎ জগৎ বলিয়া ভ্রান্তি [illegible] কিন্তু এ ভ্রান্তি ব্যবহারিক হইলেও পারমার্থিক নহে, অর্থাৎ [illegible] কাল না তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তত কাল প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া [illegible] জ্ঞান হয় ও তদনুসারে সংসারের ক্রিয়া কলাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজক বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান এ উভয়ই প্রপঞ্চের সত্যত্ব জ্ঞান সাপেক্ষ, কিন্তু প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জ্ঞান এতদুভয়ের বিরোধী। এসম্বন্ধে একটী গল্প আছে। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহামুনি বশিষ্ঠ দেব তাঁহাকে সর্ব্বদাই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতেন ও জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত প্রকটন করিতেন। তন্নিবন্ধন রামচন্দ্র রাজকার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইলেন। মন্ত্রিগণ তৎপ্রযুক্ত বিরক্ত হইয়া একদা রাজদ্বারে প্রবেশকালে একটা মত্ত হাতী বশিষ্ঠের দিকে প্রধাবিত করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে রাজগুরু পলায়ন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজগুরু বশিষ্ঠদেব রাজভবনে পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন দেখিয়া, রাজপুরুষেরা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মুনিবর আপনি ত সর্ব্বদা উপদেশ দেন, ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই অসৎ। অতএব হস্তীও অসৎ, তবে কেন আপনি ভয়ে পলায়ন করিলেন? বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, হাঁ সবই অসত্য বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যে পলায়ন করিয়াছিলাম, তাহা কি সত্য? বেদান্ত মতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ। মায়া সহিত পরমেশ্বর জগৎসৃষ্টির কারণ। মায়া ঈশ্বরের শক্তি, মিথ্যাত্ব প্রতীতির কারণ। তদ্রূপ অবিদ্যা ও মিথ্যাত্ব প্রতীতির কারণ। বিশেষ এই, মায়া ঈশ্বরগত ও অবিদ্যা জীবগত। মায়াপ্রভাবে ঈশ্বর অসৎ জগৎকে সৎ বলিয়া জীবের ভ্রম জন্মান। আর অবিদ্যা বশতঃ জীবের তাদৃশ ভ্রান্তি জন্মে। জীববিশেষের অবিদ্যা অপগত হইলে, তাদৃশ মিথ্যা জ্ঞান অপগত হয়, তখন মায়ার কার্য্য অন্যান্য জীব লইয়া প্রকটিত হয়। যখন কোন ঐন্দ্রজালিক নানাবিধ বাজী দেখায়, তখন সে ত জানে যে, তাহার বাজী বস্তুতঃ মিথ্যা, কিন্তু যাহাকে দেখায়, তাহার ত তৎকালে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয় না। তদ্রূপ ঈশ্বর মায়ার প্রভাবে জগৎকে সত্য বলিয়া দেখান, আর জীবগণ অবিদ্যা নিবন্ধন মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। অবিদ্যা না থাকিলে জীবের সেরূপ মিথ্যা জ্ঞান হইত না, অবিদ্যা ধ্বংস হইলেও জীবের সেরূপ জ্ঞান আর [illegible] সৃষ্টির প্রাক্কালে সমস্ত নাম ও রূপ যেমন পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। অমনি "ইহা করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জগতের সৃষ্টি করেন। তিনি প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্ট আকাশাদি পঞ্চ অবিমিশ্রিত, অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত মহাভূত তন্মাত্র বলিয়া পঞ্চতন্মাত্র নামে উক্ত হয়। মায়া পরমেশ্বরের শক্তি, সাঙ্খ্যদিগের প্রকৃতির ন্যায় [illegible] ত্রিগুণাত্মিকা। অতএব

মায়ার কার্য্যভূত আকাশাদিও ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণাত্মক হইলেও আকাশাদিতে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু সত্ত্বগুণের কর্ম্ম প্রকাশাদি লক্ষিত হয় না। তন্মধ্যে আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর নিজ গুণ স্পর্শ হইলেও, উহাতে কারণ অনুসারে স্পর্শও আছে। তেজের নিজ গুণ রূপ, উহাতে শব্দ ও স্পর্শ আছে, জলের নিজ গুণ রস, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ও বায়ুগত; পৃথিবীর নিজ গুণ গন্ধ; তদ্ব্যতীত শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস পৃথিবীতে সমাগত হয়। আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের সাত্বিক অংশ হইতে এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ আকাশ হইতে শ্রোত্র, বায়ু হইতে ত্বক, তেজ হইতে চক্ষু, জল হইতে রসনা এবং পৃথিবী হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশগুলি মিলিত হইয়া মন ও বুদ্ধিকে উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তির নাম মন ও নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তির নাম বুদ্ধি। অহঙ্কার মনের অন্তর্গত ও অভিমানাত্মক। চিত্ত বুদ্ধির অন্তর্গত ও অনুসন্ধানাত্মক। এই রূপে অন্তঃকরণবৃত্তি চতুর্ব্বা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। উহাদের কার্য্য যথাক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও স্মরণ। আকাশাদির রজোংশ হইতে যথাক্রমে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ্য, পায়ু ও উপস্থ। আকাশাদির রজোংশগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া প্রাণাদি পঞ্চ অভ্যন্তরীণ বায়ু উদ্ভূত হইয়াছে, যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। উর্দ্ধগমনশীল বায়ুর নাম প্রাণ, উহা নাসাগ্রবর্ত্তী; অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান, উহা পায়ু প্রভৃতি [illegible] স্থানবর্ত্তী; সর্ব্বশরীরবর্ত্তী বায়ুর নাম ব্যান; কণ্ঠস্থান[illegible] বায়ু উদান; সমান নাভিস্থানবর্ত্তী পরিপাককারী। আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের তমোহংশ হইতে যথাক্রমে [illegible] পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হইয়াছে। পঞ্চীকরণের অর্থ স্বকীয় অর্দ্ধাংশ ও অপরভূত চতুষ্টয়ের অর্দ্ধাংশের চতুর্থ অংশ মিলিত হইয়া ভূতবিশেষের উৎপত্তি। এই পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে জড়জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্চ মহাভূত হইতেই তদন্তর্গত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ নামক চতুর্বিধ স্থূল শরীরের এবং তদ্ভোগ্য অন্ন পানাদির উৎপত্তি হইয়াছে। স্থূল শরীরকে অন্নময় কোষ বলে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত বায়ু পঞ্চকের নাম প্রাণময় কোষ, জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মন মনোময় কোষ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ, সংসারের মূলীভূত অজ্ঞান আনন্দময় কোষ। তত্ত্বজ্ঞানহীন সাধক প্রথমে ক্রমে ক্রমে এই পঞ্চকোষগত বলিয়া আত্মার অনুসন্ধান করে, পরে বর্দ্ধনশীল জ্ঞানপ্রভাবে তন্ন তন্ন করিয়া চরমে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হয়। বিজ্ঞানময়কোষে জ্ঞানশক্তি আছে, উহা কর্ত্তা, মনোময়কোষে ইচ্ছা শক্তি আছে, উহা করণ, প্রাণময় কোষে ক্রিয়া শক্তি আছে, উহা কার্য্য স্বরূপ। পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় লইয়া সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর হয়। উহা অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে উদ্ভূত ও ভোগসাধন। এই সূক্ষ্ম শরীর মোক্ষদশা পর্য্যন্ত স্থায়ী।

প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য অবিদ্যাকৃত উক্ত পঞ্চকোষ কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পঞ্চ কোষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানের হেতু নহে। কিন্তু বিবেকবলে পঞ্চকোষের অনাত্মত্ব নিশ্চয় করিতে পারিলে, পরে প্রকৃত আত্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে। সে যাহা হউক, পরম সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলে মন্দাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, প্রত্যুত বিপরীতভাবে গ্রহণ করে। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি আখ্যায়িকা আছে। একদা দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্যরাজ বিরোচন প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। প্রজাপতি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, আমরা আত্মাকে জানিবার [illegible] আগত হইয়াছি। কারণ আত্মাকে [illegible] সমস্ত কামনা লাভ [illegible] চক্ষুতে যে দ্রষ্টা পুরুষ দৃষ্ট হয়, [illegible] যাঁহারা সমাধিনিষ্ঠ যোগী তাঁহারাই চক্ষুতে দ্রষ্টা পুরুষ দেখিতে পান। কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচন বুদ্ধিমান্দ্য প্রযুক্ত উল্টো বুঝিলেন। ভাবিলেন, চক্ষুতে দৃষ্ট ছায়া পুরুষই আত্মা, ইহাই প্রজাপতির তাৎপর্য্য। এরূপ বুঝিয়া তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! জলে বা আদর্শে যে প্রতিবিম্বাকার পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই কি আত্মা? ব্রহ্মা দেখিলেন, প্রশ্নকারীরা পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ বিপরীতই বুঝিয়াছেন। তখন

জলপূর্ণ শরীরে আপনাকে দেখিতে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি দেখিতেছ? তাঁহারা উত্তর করিলেন, হে ভগবন্! লোমনখাদিযুক্ত স্বস্ব প্রতিরূপ দেখিতেছি। প্রজাপতি পুনর্ব্বার বলিলেন, লোমনখাদি ছেদন পূর্ব্বক উত্তম বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত হইয়া আবার নিজ নিজ দেহ অবলোকন কর। তাঁহারা সেরূপ করিলে পর প্রজাপতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, অধুনা কি দেখিতেছ? তাঁহারা উত্তর করিলেন, সুবসনালঙ্কারযুক্ত নিজের প্রতিরূপ দেখিতেছি। প্রজাপতি বুঝিলেন, যে তাঁহাদের দুরিত বশতঃ বিপরীত জ্ঞান অপগত হইতেছে না, অতএব তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ আত্মতত্ত্ব উপদেশ করি, তাহাতে দুরিতরূপ প্রতিবন্ধ অপনীত হইলে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। তখন ব্রহ্মা পূর্ব্বোপদিষ্ট অক্ষি পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, ইহাই অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। নখলোমাদির ন্যায় বস্ত্রালঙ্কারাদি আগন্তুক মাত্র উহাদের ছায়াও আগন্তুক, স্থায়ী নহে। তদ্রূপ জলপাত্র ছায়াকার শরীরও আগন্তুক, স্থায়ী নহে। কিন্তু যে আত্মা সে স্থায়ী। এবার প্রজাপতির প্রতীতি জন্মিল যে ইন্দ্র ও বিরোচনের আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। বিরোচন হৃষ্টচিত্তে স্বভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অসুরদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, যে ছায়াকার দেহই আত্মা, প্রজাপতি বলিয়াছেন, অতএব দেহই পূজনীয়, [illegible] পারত্রিক সদ্গতি লাভ হয়। [illegible] ভাবিতে যাইতেছিলেন, শরী[illegible] হইলে, [illegible] নখাদিযুক্ত দৃষ্ট হয়, [illegible] ছায়াও তদ্রূপ দেখায়। শরীর [illegible] হইলে, ছায়াও বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত দেখায়। [illegible] শরীর অন্ধ হইলে, ছায়াও অন্ধ হয়, শরীর নষ্ট হইলে, ছায়াও নষ্ট হয়। অতএব ছায়াত্মার [illegible] কোন ফল দেখিতেছি না। এইরূপ সন্দেহ করিয়া দেবরাজ প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সন্দেহ অবগত হইয়া ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, যে স্বপ্নে নানা ভোগ করে, সেই আত্মা। ইন্দ্র বলিলেন, স্বপ্নে নিজের হনন দর্শন ও অপ্রিয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যে রোদনাদি করে, তাদৃশ আত্মার দর্শনের ফল কি? প্রজাপতি ইন্দ্রের কথা যথার্থ মানিয়া, পুনর্ব্বার বলিলেন, সুষুপ্তিপ্রাপ্ত পুরুষই আত্মা, কারণ তৎকালে কোন স্বপ্ন দর্শন হয় না। ইন্দ্র এবার হৃষ্টচিত্তে গমন করিলেন, কিন্তু শীঘ্র পুনর্ব্বার ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সুষুপ্ত পুরুষের দুঃখ নাই বটে, কিন্তু সে আপনাকে ও অন্যকে জানিতে পারে না, যেন মৃতবৎ থাকে। অতএব ঈদৃশ আত্মার দর্শনে কোন ফল দেখিতেছি না, তখন প্রজাপতি ইন্দ্রকে এই সার উপদেশ দিলেন। বিনাশী শরীর অবিনাশী আত্মার অধিষ্ঠান, শরীরাধিষ্ঠিত আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ রূপ রসাদির বিজ্ঞান হয়, কিন্তু অশরীর আত্মার সেরূপ হয় না। সশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয় সংস্পর্শ অপরিহার্য্য, কিন্তু অশরীর আত্মার উহা সম্ভবে না। এইরূপ প্রজাপতি ক্রমে ছায়াত্মা, স্বপ্নদ্রষ্টা ও সুষুপ্ত আত্মার বৃত্তান্ত বলিয়া সর্ব্বশেষে তুরীয় অবস্থাগত পরমাত্মার বিষয় বর্ণন করিলেন। এ বিষয়ে আর একটি গল্প আছে। ভৃগু পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে, বরুণ প্রথমতঃ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ ব্রহ্ম এরূপ মোটামুটি বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে তপস্যা করিবার উপদেশ দিলেন। ভৃগু কিছুকাল তপশ্চরণ পূর্ব্বক অন্ন ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া, পিতাকে জানাইলে, বরুণ পুত্রকে আবার তপস্যা করিতে [illegible]। ভৃগু পিতার উপদেশ মত কার্য্য করিয়া ক্রমে জানিতে লাগিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম ও বিজ্ঞান ব্রহ্ম। এইরূপে উত্তরোত্তর জ্ঞানোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশেষে [illegible] ব্রহ্মতত্ত্বে অধিকারী হইয়া উঠিলেন। স্থূল শরীরে [illegible] অংশ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবাত্মরূপে প্রকাশ [illegible], যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে নির্গত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন [illegible]কে প্রজ্জ্বলিত করে, তদ্রূপ। যেমন আকাশ [illegible] হইলেও ঘটাবচ্ছিন্ন, পটাবচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ পটাকাশরূপে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন শরীরগত, ও ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন হইয়া নানা জীবাত্মরূপে প্রকাশ পান, ও দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নানা নাম ও রূপ প্রাপ্ত হন। জীব নানা না হইয়া এক হইলে, এক ব্যক্তির সুখে বা দুঃখে জগৎশুদ্ধ সকল লোকের [illegible] দুঃখ হইত। একের

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হইলে, সকলেই মুক্ত হইত। অতএব এক ব্রহ্ম হইতে নানা জীবের উৎপত্তি হয়, স্বীকার করিতে হইবে। পরমাত্মা ত ভৌতিক নহে, পরমাত্মা বিভু ও অপরিচ্ছেন্ন। অতএব পরমাত্মার আবার অংশ কি? জীবাত্মাও পরমাত্মার ন্যায় অভৌতিক ও অপরিচ্ছেন্ন, অতএব জীবাত্মা কিরূপে অন্যের অংশ হইতে পারে? আর একদল দার্শনিকের মত যে, বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণ প্রধান, সুতরাং উহা স্বচ্ছ। উহাতে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্বই জীবাত্মরূপী। এখন পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন হইতে পারে, যে বিভুও অভৌতিক, তাহার আবার প্রতিবিম্ব কি? আর যে বিভুও অভৌতিক, তাহা কিরূপে অন্যের প্রতিবিম্ব হইবে? অতএব উভয় অবিচ্ছিন্ন বাদ ও প্রতিবিম্ব বাদ রূপক স্বরূপ কল্পিত হইয়াছে, স্বল্পাধিকারী ক্ষুদ্রমতি, তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রার্থ সুগম করিবার জন্য মাত্র। *

ক্রমশঃ।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়লঙ্কার।

কাব্যে কৃষক ও গ্রাম্য কৃষক। †

বাল্যকালে বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতাপুস্তকে পড়িতাম—

'জগতের তরে খাটে অনুদিন,
মুখে নাহি কথা
মনে নাহি ব্যথা
সরল কৃষক গর্ব্বহীন।

* * *

'সত্য সরলতাপূর্ণ সদা প্রাণ,
কিবা পুণ্যফলে
লভিলে ভূতলে
এহেন জীবন, বিধির দান।'

ইংরেজী স্কুলে Gray's Elegyতে মুখস্থ করিতাম—

'Some village Hampden, that with dauntless breast
The little tyrant of his fields withstood;
Some mute inglorious Milton here may rest,
Some Cromwell guiltless of his country's blood.'

তখন সংসার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলাম, এই সমস্ত পাঠ করিয়া ভাবিতাম বাস্তবিক বুঝি গ্রাম্য কৃষকবর্গ পবিত্রতা ও সরলতার আধার।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, গ্রামে কৃষকদিগের মধ্যে বাস করিয়া, উকিল ও বিচারকস্বরূপ তাহাদের সংঘর্ষে আসিয়া আমার এই ধারণা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বুঝিয়াছি, কাব্য ও বাস্তব জীবন এক নহে, সত্যকে বাষ্পাকারে উড়াইয়া না দিলে কাব্য জমিয়া আসে না।

অনেক দিন যাবৎ এবিষয়ে আমার মত লিপিবদ্ধ করিব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎসম্পর্কে গ্রাম্য-কৃষকদিগের সম্বন্ধে আরও কিছু অভিজ্ঞতা লাভের অপেক্ষায় বিলম্ব করিতেছিলাম। পরে যখন তাদৃশ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তখন আমার পূর্ব্বোক্ত মত দূরীভূত হওয়া দূরে থাকুক, আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

সেই মত [illegible] সংক্ষেপে জানাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য। কিন্তু বলা ভাল, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া কলম হাতে করিয়াছি। [illegible] কৃষকদিগের যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে [illegible] তাহার [illegible] কিছু লিখিতে গেলেই অনেক পাঠক [illegible] 'Little Tyrant' মনে করিয়া বসার [illegible] নিজের ঘাড়ে সেই দুর্নামের বোঝাটা [illegible] করিতে স্বভাবতঃই আপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আমাদেশীয় কবি ও ঔপন্যাসিকগণ দৈনন্দিন [illegible] না হইলেও লেখনীমুখে আলোচ্য কৃষকদিগের যথেষ্ট গুণগান করেন বটে, কিন্তু এই শ্রেণী নিরক্ষর, সুতরাং স্বহস্তে আমার সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে অক্ষম। অতএব ইহাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক, একতরফা যুক্তি যেন অতিরঞ্জিত না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

† গীতা সভায় পঠিত।

এখন ভূমিকা শেষ করিয়া বক্তব্যের অবতারণা করা যাউক। প্রথম দৃষ্টিতে কৃষকশ্রেণী সম্বন্ধে কাব্যোক্ত ধারণাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের সরলতা, স্বল্পে সন্তোষ ও ধর্ম্মপ্রাণতা এত স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় যে তাহা কতদূর খাঁটি, আমরা তাহা তলাইয়া দেখি না। কিন্তু যাঁহারা কিছুকাল উহাদের মধ্যে বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, যে উহাদের সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর মাত্র। সামান্য একখানি ছবি, ক্ষুদ্র একটি কল, একটি হারমোনিয়ম, ঘড়ি, এমন কি বিলাতী পুতুল দেখিয়া ইহারা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া যায়, দু'চারিটি ইংরেজী কথা শুনিলে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, একটি সহজবোধ্য নৈসর্গিক ঘটনায় ভীত ও চমকিত হয়, কিন্তু এতদ্দ্বারা তাহাদের সরলতা অনুমিত হইলে, কোন নাগরিকের প্রথম অটোমোবাইল (automobile) দর্শনে বিস্ময়কেও সরলতার পরিচায়ক বিবেচনা করিতে হয়। বস্তুতঃ যে যে বস্তু বা বিষয় অনভ্যস্ত, তাহা তাহার বিস্ময় উৎপাদন করিবেই, কিন্তু সেই বিস্ময়ের সহিত তাহার চারিত্রিক গুণগ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদের কৃষকগণ তাহাদের সাংসারিক কার্য্যকলাপের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে যথেষ্ট কুটিলতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি যতটুকু খেলে, সেই পরিমাণে প্রবঞ্চনা করিতেও অনেক সময় দ্বিধা করে না, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। আমাদের দেশে পুলিশের অত্যাচার প্রসিদ্ধ এবং সংবাদপত্রসমূহ [illegible] গভর্ণমেণ্টকে অনুযোগ দিয়া থাকেন, কিন্তু [illegible] কথা [illegible] হইলে ইহাও একেবারে [illegible] কথা ও প্রবঞ্চনায় নিম্নশ্রেণী [illegible] সময় অল্প বিস্তর অত্যাচার ব্যতীত [illegible] হওয়া অসম্ভব। সামাজিক হিসাবে [illegible] এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, [illegible] রমণীনিগ্রহ বা অন্যবিধ পাশবিক [illegible] ব্যক্তি ধৃত না হওয়া অপেক্ষা, পুলিশের যৎকিঞ্চিৎ কঠোরতা বাঞ্ছনীয়।

আমরা বিশেষ অবধান করিয়া দেখিয়াছি, গ্রাম্য ইতরশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক ও জমিজমা-সম্পর্কিত বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি কম এবং খণ্ড, সমগ্রভাবে কোন বিষয় ধারণা করিতেও তাহারা প্রায়ই সক্ষম নহে বলিয়া অনেক সময় বুদ্ধি খাটাইতে গিয়াও তাহারা ঠকিয়া যায়। নিজের ছোটখাট স্বার্থগুলিকে তাহারা জলোকার ন্যায় বেষ্টন করিয়া থাকে এবং তাহার একতিল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত হয় না, অথচ দায়ে পড়িলে আবার ভদ্রশ্রেণীসমূহ ইহাদের ন্যায় নির্ব্বিবাদে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হন না। অবশ্য তাহাদের সেই ছোটখাট বিষয়গুলিকে আমরা যতটা অকিঞ্চিৎকর মনে করি, তাহারা তদ্রূপ না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে, বহুদেশ ও বহুলোকের সহিত সংঘর্ষ না হওয়ায় তাহাদের সঙ্কীর্ণতা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে, অনুদারতা ও স্বার্থপরতা তাহাদের চিরসহচর থাকিয়া যায়। মানুষমাত্রই স্বার্থপর, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তির জ্ঞানালোকিত স্বার্থপরতা ও এই অন্ধ স্বার্থপরতায় প্রভেদ অনেক। আত্মসংযমের অনুশীলন ও আত্মবিশ্লেষণের অভাব হেতু তাহাদের কৃতকর্ম্মসমূহের ফলাফল, ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ ভাবিয়া দেখে না, এবং এইজন্য প্রথম ও প্রবলতম রিপুর অনুসরণ করিয়া অনেক সময় বিপদ্গ্রস্ত হয়।

কৃষকগণ স্বল্পে সন্তুষ্ট, ইহার কারণও তাহাদের অজ্ঞতা। তাহাদের মধ্যে সভ্যতাবিস্তার লাভ করে নাই, সুতরাং তাহাদের অভাব অল্প, অধিক সুখ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না, [illegible] কল্পনাতীত, সুতরাং এজন্যই তাহাদের বিলাসলালসা প্রবল হইতে পারে না। কিন্তু যে-অভাবগুলি তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে সাধারণ, সেগুলি সম্বন্ধে তাহারা [illegible] মত অনুভবশীল। প্রবাদ আছে, এক মজুর [illegible], 'আমি যদি রাজা হইতাম, তবে রাস্তায় গদি [illegible] ছাইয়া মোট বহিতাম।' এই কথাটির মূলে একটি [illegible] সত্য নিহিত আছে। স্বীয় অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে কাহারও কল্পনা আরোহণ করিতে পারে না, সুতরাং কৃষকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তাহার প্রাত্যহিক ঘরকন্না, জমিজমা, ক্ষেতখোলার উন্নতি, চাষবাসের সামান্য সুবিধা ইত্যাদিতেই নিবদ্ধ থাকে। এগুলি সম্বন্ধে সামান্য ইতরবিশেষ হইলে, তাহারা কিরূপ কলহ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে, তাহা গ্রাম্য ভদ্রলোকগণের অবিদিত নাই।

কৃষকদিগের ধর্ম্মপ্রাণ[illegible] মৌখিক মাত্র। যাহারা

ভগবানের নাম বেশী উচ্চারণ করে, তাহাদের মধ্যে ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনতৎপরতা বিপরীত অনুপাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার এক কারণ আছে। অন্ধভক্তি ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মধ্যে এক বৃহৎ ব্যবধান সৃষ্টি করে, ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এইরূপ মনে করে। ভক্তি ও সাধুতা এক নহে, অনেক সময় ভক্তি অসাধুতার দোষ স্খালনে নিয়োজিত হয়। গ্রাম্যকৃষকদিগের মধ্যে সংকীর্ত্তনের দলবদ্ধ মত্ততা এবং অবিশ্রান্ত নৃত্যগীতাদিসম্ভূত দৈহিক অবসন্নতাজনিত 'দশায় পড়া' বহুলরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার সহিত প্রকৃত অনুরাগ বা ভাবাবেশের সম্বন্ধ খুব কম, কারণ তৎপর দিবসই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, কিম্বা একমুষ্টি খড় ভক্ষণের অপরাধে প্রতিবেশীর গাভী খোঁয়াড়ে দিতে তাহাদিগকে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতে দেখা যায় না। ঈদৃশ ভক্তিপ্রবণতা আমাদের দেশে পাপকার্য্যের প্রতিষেধক না হইয়া পরিপোষক হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃষকের দৃঢ়বিশ্বাস যে অন্তিমকালে একবার কৃষ্ণনাম জপ করিতে পারিলে সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইবে এবং আপীলেশ্বরীর * নিকট জোড়া পাঁঠা দিতে পারিলে মিথ্যা মোকদ্দমায় তাহার জয়লাভও নিশ্চিত, সুতরাং ব্যাবহারিক জীবনে সাধুতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা সে আবশ্যক বোধ করে না। আবার আর এক প্রকার [illegible] বিশ্বাসও তাহাদের মধ্যে খুব প্রচলিত, তাহা অদৃষ্ট[illegible]। এই অদৃষ্টবাদ অনেক শোকদুঃখে, দারুণ বিপ[illegible] অস্মদ্দেশীয় দরিদ্র, হতভাগ্য কৃষককুলকে বিদ্রোহ [illegible] তীব্র অসন্তোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে, ইহাও স্বীকার [illegible] করিতে হইবে। ভারতীয় কৃষকজাতির এই [illegible] বশতঃই মুষ্টিমেয় ইংরেজ তাহাদিগকে করতলস্থ [illegible] বং বশীভূত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। [illegible] করিয়া তজ্জন্য শাস্তি পাইলে ইহাদের অনেকে [illegible] পাপের ফল বিবেচনা না করিয়া অদৃষ্টের ভোগ বলিয়া মানিয়া লয়। পাপের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা তাহাদের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা অনেক কৃষককে দেখিয়াছি, মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া জয়লাভ করিতে না পারিলে স্বীয় অদৃষ্ট বা বুদ্ধিহীনতাকে ধিক্কার দিয়াছে, কিন্তু কার্য্যটি ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার বিবেক তাহাকে মোটেই প্রপীড়িত করে নাই, তাহার প্রতিবেশী স্বজাতীয়গণও তজ্জন্য তাহাকে কোন অনুযোগ দেয় নাই—যেন ঐরূপ মিথ্যা আচরণই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাহাদের মধ্যে public opinion বা সাধারণ মত এরূপ শিথিল যে সামাজিক কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে নীতিবিগর্হিত কোন কার্য্যের নিমিত্ত তাহাদিগকে লোকগঞ্জনা ভোগ করিতে হয় না। তাহারা ঘোরতর প্রত্যক্ষবাদী, কৃতকার্য্যতাকেই তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের একমাত্র মাপকাঠি বিবেচনা করে।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের কৃষকবর্গকে অমিতব্যয়ী বলিয়া যে অনুযোগ দেন, তাহা কি নিতান্তই অসঙ্গত? এরূপ কি সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যাহার পীড়া হইলে এক মুদ্রা ব্যয় করিতেও ইহারা কাতর হয়, তাহারই শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঋণ করিয়া পঞ্চাশ মুদ্রা ব্যয় করিতে ইহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না? বস্তুতঃ এই দোষ কেবল তাহাদের মধ্যে কেন, বঙ্গীয় ভদ্রসমাজেও বিলক্ষণ প্রবল। আসল কথা এই যে, আমাদের কৃষকগণের ঘোরতর দারিদ্র্য, প্রবলভাবে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, তাহারা সমগ্র বৎসর [illegible] অভাব কষ্ট ভোগ করিয়া দু'একদিন আমোদ প্রমোদে [illegible] করে বলিয়া, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া [illegible] মনে হয়। আমরা যখন আমাদের নবো[illegible] [illegible] সংবাদ পত্রাদির সাহায্যে [illegible] বাহাদুরের সহিত মসীযুদ্ধ [illegible] অগ্র[illegible], তখন তাহাদের (এবং আমাদেরও) [illegible] চাগিয়া যাই, তখন বিদেশী বনাম স্বদেশী, কেবল [illegible] ভাবটি মনে জাগরূক থাকে এবং এই জন্য আমা[illegible] কৃষকদিগের গুণসমূহ উজ্জ্বলতর হইয়া আমাদের নেত্র সমক্ষে ভাসিতে থাকে। শিক্ষাভাব ও দারিদ্র্য এই দুইটী কারণ হইতেই কৃষকদিগের সমুদয় দোষ উপজাত হইয়াছে। "দারিদ্র্যদোষোগুণরাশি নাশী" এতদপেক্ষা অধিকতর সত্য কথা বোধ হয় কোন কবি কর্ত্তৃক উক্ত হয় নাই।

* আপীল (Appeal) + ঈশ্বরী = আপীলেশ্বরী। এই নামে ঢাকা নগরীতে বাস্তবিক এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় বহুভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। বলা উচিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিম্নস্তরস্থ ভদ্রলোক।

কৃষকদিগের যৌন নীতি সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, মুসলমান কৃষকদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের নিয়ম সুকর থাকায় এ বিষয়ে তাহাদের যথেচ্ছাচারিতা কিছু বেশী। তাহাদের কামক্রোধাদি রিপুও বোধ হয় শান্তিপ্রিয় হিন্দু-কৃষকদিগের অপেক্ষা প্রবল। হিন্দু-কৃষকগণ প্রায়ই একপত্নীক এবং তাহাদের যৌন নীতি মোটের উপর সমাজের অন্যান্য স্তর অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে। পক্ষান্তরে মুসলমান কৃষকদিগের সারল্য, ঐক্যবন্ধন ও অত্যাচারসহিষ্ণুতা অধিকতর প্রশংসার্হ।

কৃষকগণের যে সমুদায় দোষ উপরে বর্ণিত হইল, সেগুলির জন্য নিম্নস্তরস্থ গ্রাম্য ভদ্রলোকসমূহই যে প্রধানতঃ দায়ী, তাহাও আমরা স্বীকার করি। গ্রাম্য-পাটওয়ারিগণের ব্যবসায় নিকটস্থ তালুকদারের গোমস্তাগিরি এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য ইতরলোকদিগের মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করা, সত্যকে মিথ্যা করা, রামের ধন শ্যামকে দেওয়া ইত্যাদি। ইহারা যে কত অনিষ্টের মূল তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইহাদের ব্যবসায়বিশেষ এবং তদ্দ্বারা ইহারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা গ্রাম্যদেবতা নামে আখ্যাত হয়। [illegible] দলাদলি, রেষারেষী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, [illegible] বিরোধ, ইহাদের পরামর্শমতে [illegible] থাকে। [illegible] ইহাদের ফাঁদে পড়িয়া [illegible] বহ্নিমুখী পতঙ্গের ন্যায় পুনঃ পুনঃ [illegible] না করিয়া থাকিতে পারে না। [illegible] বেশী বুঝে বলিয়া এবং স্বীয় [illegible] উপর নির্ভর করিতে [illegible] ইহাদের কবলে আত্মসমর্পণ করে। [illegible] প্রতি তাহাদের যে সামান্য স্বাভাবিক [illegible] তাহা ইহাদের প্রলোভনে অতি সহজে [illegible] হইয়া যায়, 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' ইহার বিপরীত নীতিই [illegible], ইহা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না। এই গ্রাম্য[illegible]গণের সংস্পর্শে কৃষকগণের মন এত কলুষিত [illegible] যে, আমরা দেখিয়াছি মোকদ্দমা করিতে গিয়া, টাকা [illegible] বলিয়া, উকিলকে ন্যায্য আইন-খরচা দিতে অস্বীকার করিয়া, উপযাচক হইয়া ইহারা আমলাদিগকে ঘুষ দিয়া আসে। ইহা হইতেও তাহাদের সঙ্কীর্ণ দুষ্টবুদ্ধির বেশ একটু আভাষ পাওয়া যায়, কারণ ন্যায্য আইন-খরচা ব্যতীত মোকদ্দমা চলিতেই পারে না, এইটুকু তাহারা সহজে বুঝিতে পারে না, অথচ ঘুষ দিলেই মোকদ্দমা জিতিবে, তাহাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। ন্যায্য প্রাপ্যের জন্য মহাজন নালিশ করিয়াছে, দায়ীক দেনা অস্বীকার করিয়া জবাব দিয়াছে; অথচ প্রায় দেনার পরিমাণ টাকা তদ্বিরকারক ও খতলেখক সাক্ষীকে ঘুষ দিতে অগ্রসর—ঈদৃশ ঘটনা আইন আদালতে বিরল নহে। নৈতিক হিসাব ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসায়িক হিসাবেও এই অকিঞ্চিৎকর লাভ যে পরিণামে ক্ষতিজনক, এই সামান্য কথাটা তাহাদের দুষ্টবুদ্ধি আয়ত্ত করিতে পারে না। বস্তুতঃ মিথ্যা কথন ও মিথ্যা আচরণ গ্রাম্য নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে অত্যন্ত বেশী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রচলিত 'থিওরি' এই যে, ভদ্রশ্রেণী দরিদ্র কৃষকদিগের উপর অনেক অত্যাচার করিয়া থাকেন। একথা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা কিছুতে স্বীকার করিতে পারি না। ব[illegible]বিয়াগির ও তালুকদারগণ বাস্তবিকপক্ষেই জনবল ও ধনবলের সাহায্যে নিরীহ [illegible]দিগের উপর অনেক সময় অযথা অত্যাচার করিয়া [illegible]। কিন্তু রহস্য এই যে, প্রজাবর্গ তাঁহাদের সহিতই [illegible] করিয়া থাকে, তাঁহাদেরই গুণানুকীর্ত্তন করে [illegible] আবশ্যক হইলে তাঁহাদের পক্ষেই আগ্রহসহকারে [illegible] করিতে উদ্যত হয়, আর তাঁহাদের অত্যাচারের [illegible] করিতে হয় মধ্যবিত্ত গ্রাম্যতালুকদারদিগকে। [illegible] ভূম্যধিকারী আইনের প্রভাবে এই শ্রেণীর [illegible] প্রায়ই অত্যাচারী নহে, অত্যাচারিত। Village Hampdenগণই এ স্থলে tyrant। ঈদৃশ ভদ্রলোক ও তাহাদের প্রজাগণের মধ্যে সদ্ভাব দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে (এজন্য আইন, উকিল ও পাটওয়ারি এই তিন শ্রেণী দায়ী,) এবং ইহাদের বিরুদ্ধে প্রজাগণ কথায় কথায় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। খাজানার মোকদ্দমায় প্রজাপক্ষে যত জবাব দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে শত করা ৮০টিতে সত্য

অপেক্ষা মিথ্যার অংশ বেশী বলা যাইতে পারে। এবং আইন কিয়ৎ পরিমাণে প্রজার অনুকূল হওয়ায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ প্রায়ই প্রজাদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। পূর্ব্বে তাঁহারা ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে প্রজাদের যে শারীরিক সাহায্য পাইতেন, তাহা উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয় (বড় বড় জমীদারদিগের সম্বন্ধে ভিন্ন কথা)। তালুকদারগণ এখন প্রজাদিগকে বাৎসল্যভাবে দেখেন না এবং ইতরশ্রেণীর মধ্যেও এখন আত্মমর্য্যাদা বাড়িতেছে, এজন্যই হয়ত এরূপ হইতেছে। যাহা হউক, মোটের উপর ইহাকে ভাল লক্ষণই বলিতে হইবে। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত তালুকদারগণ যে পূর্ব্বকার (এবং এখনকারও) বড় বড় জমীদারগণ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত, ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় প্রজাভূম্যধিকারীতে মনোবাদ বৃদ্ধি যে কেবল তাহাদের দোষেই হইতেছে, ইহা বিবেচনা করা উচিত নহে।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকবর্গও অধিকতর ধূর্ত্ত হইতেছে, ইহাও একটি সঙ্গত অনুমান। ক্ষমতাশালী জমীদার এবং অপেক্ষাকৃত অক্ষম তালুকদারগণের সহিত প্রজাগণের আচরণের এই বিভিন্নতার হেতু De Toqueville সুন্দররূপে নির্দ্দেশ কর... প্র...িয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন মানবহৃদয়ের এই একটী ধর্ম্ম যে, অত্যাচারীকে আমরা আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (superior) ... করিয়া পারি না, শক্তিই যে যুক্তি, আমাদের ... বিশ্বাস এখনও আমাদের হৃদয়ের অন্ত... রহিয়াছে। দাসত্বের গুণ ও দোষগুলি সম্পূর্ণরূপে ... দের কৃষকবর্গের মধ্যে বর্ত্তমান। তাহারা পরি... সহিষ্ণু ও পরদুঃখকাতর। কিন্তু সহৃদ... অত্যাচারে তাহারা অধিক বশীভূত হয়। সরলতা, সত... নিষ্ঠা প্রভৃতি তাহাদের নিকট উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ ... না, তাহাদের প্রকৃতি যেরূপ বৈচিত্র্যশূন্য, তেজোবিহীন, একঘেয়ে, তাহাদের চিত্তও সেইরূপ অনুদার, কুটিল, অবিশ্বাসী, ভাল দিক অপেক্ষা মন্দ দিক দর্শনে পটু! পুরুষানুক্রমে জমীদারবর্গের অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে তাহারা মানব-প্রকৃতিতে সদ্‌গুণের সম্ভাবনা বিস্মৃত হইয়াছে, কেহ যে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে, এ কথা তাহা... সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না, ধূর্ত্ততা ও নীচতাকে তাহারা আদর্শরূপে পূজা ও অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। এমন কি, মনিব যে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও অত্যাচারী, এ কথা বলিয়া কোন কোন প্রজাকে শ্লাঘা করিতে শুনিয়াছি।

কাব্যে কৃষকগণ কিরূপ চিত্রিত হইয়া থাকে, প্রবন্ধের শিরোভাগে তাহার উদাহরণ দিয়াছি। সংসারাভিজ্ঞ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, ইহাদিগকে কি বর্ণে চিত্রিত করেন, এখন তাহার উদাহরণ দিব। অনুবাদে ভাবের যাথার্থ্য রক্ষা পাইবে না বলিয়া ইংরাজিতেই এই অংশ উদ্ধৃত হইল। C. H. Pearson তাঁহার National Life and Character গ্রন্থে কৃষকদিগের প্রকৃতিকে নিম্নলিখিত উপাধিতে বিশিষ্ট করিয়াছেন—

"An absolute concentration of the mind upon small economies, or it may be, small pilferings, and a thorough deadening of the moral sense." স্পেনীয় ঔপন্যাসিক Galdos তাঁহার Marianela নামক গ্রন্থে ইহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

"There has been much declamation against the mat...lism of cities......but there is a ... plague in the materialism ... villages ... ifies millions of human ... ble ambition in them ... them whithin the circle of ... brutal and gloomy existence. ... villages there is no moral ... notion of right. Under ... frankness is concealed a ... which for acuteness and ... perp... ...basses all that the cleverest ... mathe na... devised."

... ও কাব্যামোদদায়ক না... কি না, তাহা পাঠকবর্গের বিচারাধীন ... আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীঃ—

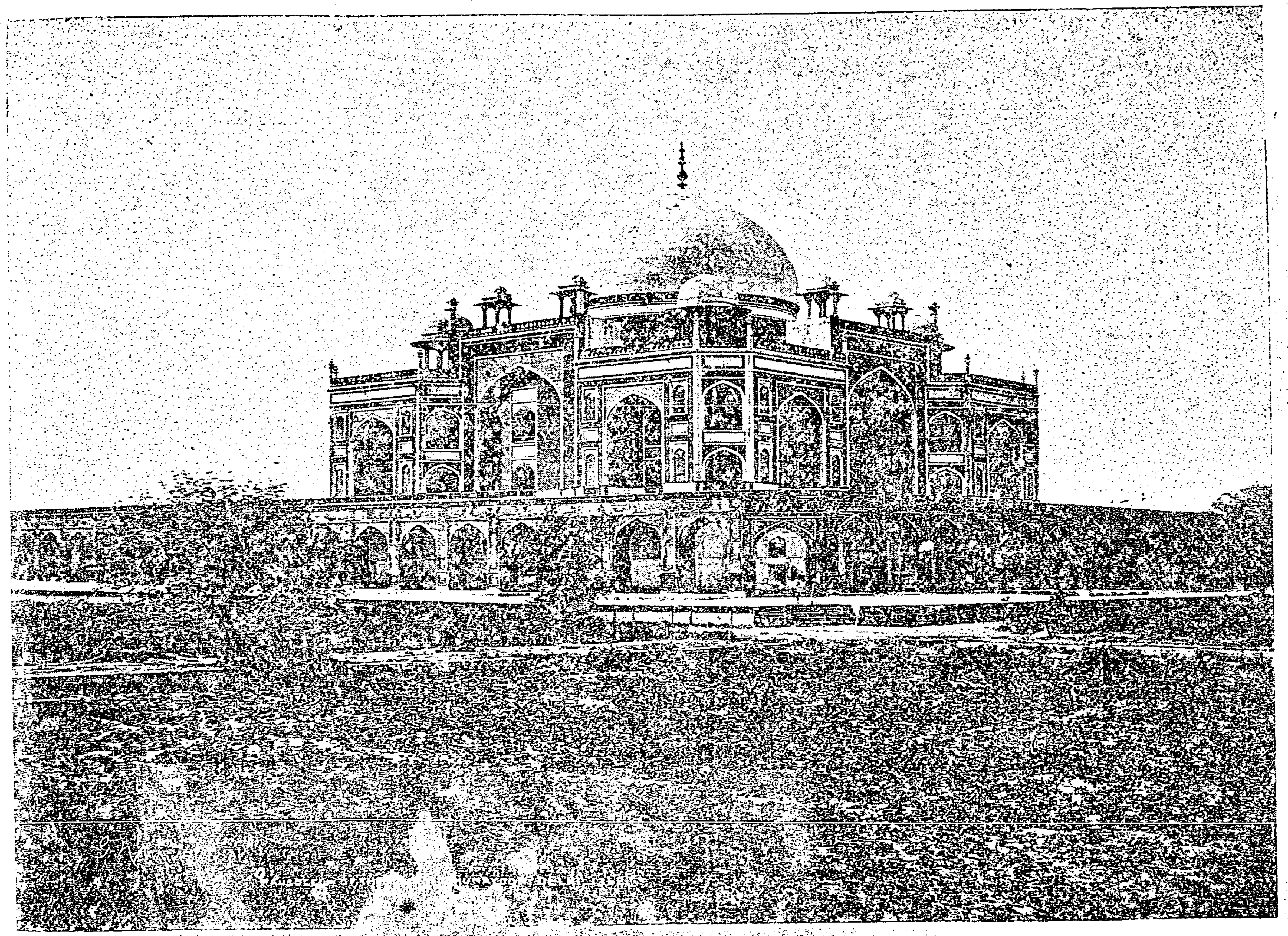

...র স... মন্দির)।

দিল্লীতে বাদশাহ হু... সমাধি মন্দিরে ...

১

প্রশান্ত মধুর সন্ধ্যা যমুনাসৈক...
সমীরণে চুম্বিত লহ...
নির্ব্বাপিত কোলাহল—... শান্ত গ...
ধীরি ধীরি আসে বিভাবরী।
প্রবাসে পাগলপারা, ভ্রমে চিত আত্মহারা।
কীর্ত্তির অরণ্য-ভূমি এ মহা শ্মশানে
ফুটিছে জ্বলন্ত-স্মৃতি যুগ ব্যবধানে।

২

অযত্নে শ্রীহীন এক শোভন উদ্যানে,
কি প্রাচীন শিল্পনিদর্শন।
ম...-গম্ভীর দৃশ্য!—জাগায় পরাণে
কি অদ্ভুত স্মৃতির স্বপন!
...ব্য কল্পনার; চক্ষে ভাতে অনিবার
সে অপূর্ব্ব জীবনের নাট্য অভিনয়,
শ্রেষ্ঠ সাধনার সিদ্ধি—রুধিরে প্রলয়!

৩

সমগ্র জীবনব্যাপী করাল কামনা,
রণরঙ্গে তাণ্ডব ভীষণ!
নিত্য জয় পরাজয়ে কি যে উন্মাদনা,
স্বতরাজ্য কা... ...াপন;

মৃত্যুরে শিয়রে রাখি, যশের কস্তুরি মাখি
লভি সাধনার ধন মহা সাধনায়,
বিজয়ী সম্রাট্! তুমি নিদ্রিত হেথায়!

৪

মর্ত্ত্যবাসে স্বর্গসম এ সৌধমন্দির,
প্রতিভার প্রথম সৃজন;
নিরখি সৌন্দর্য্য যার প্রখর মদির,
আত্মহারা কবি একজন।
শিল্পের বিকাশ নব, নিরখি বিমুগ্ধ ভব,
কি প্রেমপূর্ণিত বুকে উদ্দাম বাসনা,
ধরায় রাখিল স্মৃতি ফুটায়ে কল্পনা।

৫

কি শোভা শিখর শিল্পে বিচিত্র প্রাকারে,
ফুলদাম গ্রথিত ত্রিভুজে;
কি সুন্দর শিরোরত্ন শোভে চারিধারে,
মধ্যে রাখি বিরাট গম্বুজে!
চৌদিকে লতার প্রায়, সযুক্ত সোপানকায়,
বিন্যস্ত মর্ম্মর-কান্তি প্রাচীর মাঝারে;
ছড়ায় মাধুর্য্য কত সৌন্দর্য্য আধারে।

৬

কি স্তব্ধতা হর্ম্ম্যতলে!—নিবিড় আঁধারে
সংখ্যাতীত রচিত কবর;
ধরণীর গর্ভে চির-বিস্মৃতি আগারে
সুপ্ত শত রাজবংশধর;
কোথা যশঃ গুণগ্রাম! কালেতে মুছেছে
কোথা সে গৌরব-দৃপ্ত তেজ-তপ্ত-মুখ
রঞ্জিত-কৃপাণমুখে রক্তমাখা সুখ!

৭

যে প্রদীপ্ত বীর্য্য-বহ্নি জ্বলে রাগ ভরে,
আজো প্রাণ মোহি যশোবাসে;
রাখিল যে জলে স্থলে ঝঞ্ঝা-বজ্র ধরে',
কালজয়ী-কীর্ত্তি ইতিহাসে;
কি উর্দ্ধ আকাঙ্ক্ষা লয়ে মহাযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে,
বিজয়-লক্ষ্মীর শিরে সায়াহ্ন জীবনে
রতন মুকুট দিল রাজ্যাভরণে;—

৮

তারি কি জীবন্ত ছবি মানব-কেশরী,
রাখিয়াছ এ স্তব্ধ মন্দিরে;
কি সৌরভে মুগ্ধ দিল্লী ঐশ্বর্য্য-ঈশ্বরী,
অতীতের লক্ষ চিহ্ন ঘিরে।
হৃদয় সরসে হায়, চিন্তার তরঙ্গ ধায়,
জীবন-রহস্য কত সৌন্দর্য্যে উথলে,
ভাবের উজান বহে হিল্লোলে হিল্লোলে।

৯

রেখো এ তিলক-রেখা হে রাজ-রূপসী!
রাজটীকা প্রদীপ্ত ললাটে!
এ কাল-তামসে তব রূপ-পূর্ণশশী,
সমুজ্জ্বল, শূন্য রাজপাটে।
যে দিকে ফিরিয়া চাই, বিস্ময়ের অন্ত নাই,
মসীদ, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, উত্তুঙ্গ মিনার,
সোনায় রেখেছে গলে কীর্ত্তি-ফুলহার!

১০

... কি ... গ্রত চির গৌরব গরিমা!
... আত্মবিসর্জ্জন!
...কে রুদ্ধ সে মহিমা;
... আকিঞ্চন!
... সাধনার মহাস্মৃতি,
...কারে কাল সকলি নিবায়!
...গান্তে যার স্মৃতি রহি যায়!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

নৃশংস হায়দার।

গত কার্ত্তিক মাসের "প্রদীপে" লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিলের পত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মেল্‌ভিলের পত্র পাঠে মনে হয়, হায়দার আলি নিতান্ত নিষ্ঠুর ছিলেন এবং বন্দীকৃত ইংরাজদিগের সহিত নিতান্ত হৃদয়-হীনের ন্যায়, দয়ামায়া শূন্য অসভ্য বন্যজাতির ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

শুধু লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিল কেন, ইংরাজের ইতিহাসে আরও দুই একজন ইংরাজবন্দীর পত্রের উল্লেখ আছে; তাঁহারা সকলেই বলিতে চাহেন, হায়দার আলি এক-জন নৃশংস নবাব ছিলেন। হায়দার যে একেবারে "মৃদূনি কুসুমাদপি" ছিলেন একথা আমরাও বলি না।

হায়দার যখন প্রথমে কুর্গ প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, তখন কুর্গের রাজধানী মারকারায় উপ...ত হইয়া নাকি এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ...া ব্যক্তি একজন কুর্গ অধিবাসীর ছিন্ন-শির আনিয়া ...বে ...নি তাহাকে পঞ্চমুদ্রা পুরস্কার দিবে... সত্য, তাহা বলা যায় না; ... ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের ... শুনিতে পাওয়া যায়, হায়দা... ৭০০ শত কুর্গ-অধিবাসীর র... পদনিম্নে সংগৃহীত হইয়াছি...

ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ আ... পেশাওয়ারে ইংরাজ সৈন্য প... এমদল অশ্বারোহী সেনার নায়ককে ... ...রিয়াছিলেন। এই সেনানায়ক ... তাঁহার সেনাপতিকে পঞ্চাশজন ...ফ্রিদি... ছিন্ন-মুণ্ড উপঢৌকন দিতে প্রতিশ্রুত ...বলি... য়াই সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ দু... হইয়াছিলেন। হায়দারের জীবনচরি... সাহেব মনে করেন, যখন শিক্ষিত সভ...ত আভিটেবলও এইরূপ করিয়াছিলেন, ... যে কুর্গ-অধিবাসিদিগের ছিন্ন-মুণ্ড দেখিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি! *

একজন শিক্ষিত ইংরাজ সেনাপতি যাহা করিয়া-ছিলেন, অশিক্ষিত অসভ্য হায়দার আলি হয়ত তাহা না করিয়া থাকিতে পারেন; সুতরাং আভিটেবলের সহিত তুলনা করিয়া হায়দার আলির স্কন্ধে নৃশংসতার কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করা উচিত কি না, তাহা বিবেচনা-সাপেক্ষ।

ইতিহাসে নৃশংসতার পরিচয়ের অভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতে যখন সিপাহীবিদ্রোহানল প্রজ্ব-লিত হইয়াছিল, তখনকার ইতিহাস তাহার অন্যতম উদাহরণ। নিরপরাধ নাগরিকদিগকে বিনা কারণে হত্যার কথা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। † কিন্তু নবাব হায়দার আলির ইতিহাসে সেরূপ উদাহরণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

১৮৫৭ সালে বিদ্রোহী সিপাহিদিগের হস্ত হইতে দিল্লী উদ্ধার করিবার পূর্ব্বে উন্মত্ত ক্ষিপ্ত ইংরাজসৈন্যগণ যে ভীষণ হত্যাকাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিল, তাহা ইতি-হাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে দিন যে কত নিরপরাধ নাগরিকদিগের তপ্তশোণিতে শুষ্কভূমি সিক্ত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। হীনবল নিরপরাধ ন...বাসিগণ যুক্তকরে প্রাণ ভিক্ষা করিতে করিতে ...সৈনিকের বন্দুকের গুলির আঘাতে, কেহ বা ...ট বিদ্ধ হইয়া পথে ঘাটে পড়িয়া মরিয়াছিল, ...ত বৃদ্ধদিগের ছিন্ন-শির ধূলায় লুণ্ঠিত হই-... ...ংরাজ ঐতিহাসিক হোমস্ বলেন কেবল বালক ... মাত্র রক্ষা পাইয়াছিল।

* "Some authorities state that on his first appearance on ... frontier Haider, offered a reward of five rupees for the head of every Coorg which was brought to him, and that 700 heads were in consequence delivered. *This account may be true and is paralleled* by the conduct of General Avitable, who, when in command at Peshwar, actually gave a grant of two villages to a leader of Cavalry on condition that he brought in yearly the heads of fifty Afridis. The writer has a copy of this assignment of land."—*Bowring.* p. 66.

† History of the Indian Mutiny—*Holmes.*

তৎপর দিল্লীর নবাবপুত্রদ্বয়ের হত্যা! হড্‌সন্ সাহেব তাঁহাদিগের বিচার পর্য্যন্ত হইতে দিবার অবসর দিয়াছিলেন না। নবাবপুত্রদ্বয়কে হত্যা করিয়া বিজয়োন্মত্ত হড্‌সন্ তাঁহাদিগের মৃতদেহ কুক্কুর শৃগালের মৃতদেহের ন্যায় কোতয়ালির সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—এসকল কথাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে। ইংরাজ যখন ভারতবর্ষের নূতন অতিথি, যখন তাঁহারা নবাবের পদাশ্রিত বণিক, তখনও কেবলমাত্র লুণ্ঠনলোভেই হুগলীর নিরপরাধ নাগরিকদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদিগের গৃহদ্বার ভূমিসাৎ করিয়া নিতান্ত দস্যুতস্করের ন্যায় অর্থশোষণে ক্রটি করিয়াছিলেন না এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে—ইংরাজের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

হায়দার পররাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহা আপন করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া শোণিত-রঞ্জিত অসি হস্তে প্রভূত ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করিত—হায়দার আলি সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না; কোন কোন ঐতিহাসিক এই জন্য হায়দারের অন্তরে অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছেন।

কিন্তু স্যর আয়ার কুট বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে একবার যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা [illegible] করিলে [illegible] হয় [illegible] হায়দারের নৃশংসতার চিত্র অতিরঞ্জিত। [illegible] কুট একস্থানে লিখিয়াছিলেন—"হায়দার-বাহিনীর সাহস, [illegible] সুবন্দোবস্ত প্রভৃতির তাহারা (ইংরেজ সৈন্য [illegible] বর্ণনা করিতেছে, তাহা সত্যসত্যই [illegible] * * এই সকল ব্যক্তি (আর্কট [illegible] সৈনিক কর্ম্মচারিগণ) আমাকে এমন একটা সংবাদ দিয়াছেন যে তাহাই কর্ণাটকে [illegible] মূলে ভীষণ আঘাত করিতেছে। তাঁহারা [illegible] যে পেতা অধিকার করিয়াই হায়দার আলি, [illegible] দিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং [illegible] যাহাতে কোন ক্রমেই তাহাদিগের উপর কেহ অত্যাচার না করে বা তাহাদিগের ধন, রত্ন লুণ্ঠন না করে [illegible] তদ্বিষয়ে বিশেষ নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। [illegible] তাঁহার কতকগুলি সৈন্য প্রথমে লুণ্ঠনব্যপদেশেই নগর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহারা অবিলম্বে ধৃত হইল এবং অনেকেরই ছিন্নমুণ্ড ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। নগরবাসীদিগের জীবন ও ধনরত্ন রক্ষার্থ এমন সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং নগর হস্তগত হওয়ার পর কর্ণাটকের সুবাদারের পদ গ্রহণ এতদুভয় বিশেষ চিন্তার কারণ।" *

যে হায়দার আলি নিতান্ত নৃশংস বলিয়া সে কালে ইংরাজ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছেন, আমরা একালের লোক, স্যর আয়ার কুটের পত্র পাঠে কি মনে করিব বলিতে পারি না। আর্কটের ব্যাপার কি হায়দারের নৃশংসতার পরিচয় দিয়া থাকে? বিজীত নাগরিকদিগের উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল বলিয়া হায়দার যে তাহার আপন সৈন্য মধ্যে কাহারও কাহারও প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, ইহাই কি হায়দারের নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক!

ইংরাজ সরকার সত্যপ্রিয়। তাই ইংরাজের সরকারি দলিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৭৮১ সালের ৬ই জুলাই তারিখে স্যর আয়ার কুট বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে পুনরায় লিখিয়াছিলেন:—

"ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ২ সহস্র ৮ শত হইতে তিন সহস্রের [illegible] ধ্য আমাদেরই সিপাহী-সৈন্য হায়দার আলি [illegible] তিক হইয়াছে। আমাদিগের এই [illegible] কর্ণেল বেলির সহিত এবং কতক [illegible] ও বন্দীকৃত হইয়াছিল। একজন [illegible] নিকট হইতে এই সকল সংবাদ [illegible] তে বাধিতেই তিনি এখানে [illegible] হইতেও এইরূপ সংবাদই [illegible] লেফটেনান্ট মেল্‌ভিল যেরূপ বর্ণনা [illegible] হায়দার আলি যদি তাঁহার [illegible] হারই করিতেন, তাহা হইলে [illegible] আশীর্ব্বাদ না করিয়া তাঁহার [illegible] অভিভূত হইত, সন্দেহ নাই—[illegible] তাহারা সুযোগ পাইলেই হায় [illegible] ছাড়িত না।

---

* Lieutenant General Sir Eyre Coote to [illegible] Government; 10th November, 1780.

Lieutenant General Sir Eyre Coote [illegible] Government; 6th july 1781.

মানুষ চিরদিনই মানুষ—তাহাদিগের ভিতর দেবতার সংখ্যা নাই বলিলেই চলে, থাকিলেও সংখ্যায় অতি ক্ষুদ্র। অত্যাচারপীড়িত হইয়া, পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া কে কবে অত্যাচারকারীর পাদুকা লেহন করিয়া থাকে। সৈনিকগণ বীর—বীরের হৃদয়ে লাঞ্ছনা ও অপমান যেরূপ আঘাত করে অন্যের হৃদয়ে তেমন করে না।

কিন্তু কুটের পত্রে প্রকাশ যে কর্ণেল বেলির সহিত যে সকল সৈন্য হায়দারের বন্দী হইয়াছিল—সুতরাং লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিলের সহিত যে সকল সিপাহী হায়দারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহারা এবং অন্যান্য যুদ্ধে ধৃত সিপাহীগণ হায়দার আলির পতাকানিম্নে দাঁড়াইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। তাহারা সংখ্যায় একজন বা দুইজন বা শত জন বা দুই শতজন ছিল না—সিপাহীসংখ্যা ছিল প্রায় তিন সহস্র! এই তিন সহস্র সিপাহী যদি হায়দারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইত, তাহা হইলে প্রতিশোধের জন্য তাহাদিগকে অধিক চিন্তা করিতে হইত না।—অনায়াসেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন [illegible] ই সকল গোল মিটিয়া যাইত; অথবা সুযোগ বু[illegible] [illegible] হী বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেই ত তাহার [illegible] সম্যক্ প্রতিশোধ লইতে পারি[illegible]

কেহ কেহ বলিতে পারে[illegible] জের সিপাহী হায়দারের [illegible] সিপাহীগণ ইংরাজের পক্ষ হইয়া হায়দ[illegible] করিতে গিয়াছিল না। [illegible] হায়দার আলি বিস্মিত হই[illegible] দেখিয়াছিলেন। যখন সিপাহীগণ [illegible] অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হইতেছিল তখন[illegible] তখনও তাহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত—[illegible] ভীম-বেগে সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য [illegible] তাহারা শত্রুর অনল-বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া শত্রুমধ্যে [illegible] তোপমঞ্চ অধিকার করিবার জন্য ব্যাকুল।

সেই সিপাহী সৈন্য টলিল—যুদ্ধে পরাজিত হই[illegible] দারের বন্দী হইল—বন্দীকৃত সিপাহীগণ [illegible] আনীত হইল। শেষে অর্থের, বস্ত্রের, খাদ্যের, বি[illegible]র, ঔষধের, চিকিৎসার, পথ্যের প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের অসীম কষ্ট পাইয়া—হায়দারের কারারক্ষী কর্ত্তৃক পদে পদে লাঞ্ছিত ও হৃতগর্ব্ব হইয়া—চক্ষের উপর আপন আপন কাপ্তান, কর্ণেল, জেনেরলদিগের কষ্ট ও অপমান প্রত্যক্ষ করিয়া—ইংরাজের সিপাহী, যাহারা বীরাগ্রগণ্য বলিয়া সামরিক ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ, ইংরাজের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করিয়াছিল—অত্যাচারকারী হায়দার আলির পতাকানিম্নে সমবেত হইয়া অর্থের লোভে তাহারাই পাদুকালেহনে ব্যস্ত হইয়াছিল, একথা বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না—প্রবৃত্তিও হয় না।

এখন আর সে হায়দার আলি নাই—এখন আর সে মহীশূর-সমর নাই, সে কর্ণেল বেলি নাই, লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিল নাই—এখন সে সব কিছুই নাই—সেকালের ইংরাজও একালে আর নাই। সুতরাং লেফ্‌টেনেণ্ট-মেল্‌ভিলের বর্ণিত অত্যাচার-কাহিনী এবং হায়দার-চরিত্রের নৃশংসতার বিচার করিবার এতদিনে সুসময় আসিয়াছে।

কর্ণেল বেলির সহিত হায়দার আলির যে যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ যে যুদ্ধে লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিল বন্দী হইয়াছিলেন, তাহার কিছু দিন পরই (১৭৮২) কর্ণেল ব্রেথওয়েটের সহিত মহীশূরের আর একটা যুদ্ধ হয়; টিপু সেই [illegible] নায়ক ছিলেন। ব্রেথওয়েট পরাজিত হইয়া টিপুর [illegible] হইয়াছিলেন এবং মেল্‌ভিলের ন্যায় হায়দারের [illegible] নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

[illegible] ব্রেথওয়েট দুই মাস পরই মহীশূর-শিবির হইতে [illegible] কেল্লায় যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সে[illegible] [illegible] আলির নৃশংসতার কোন পরিচয় পাওয়া [illegible] না। [illegible] ইংরাজ ও হায়দারে মৈত্রী সম্ভাব্য হয়, তাহাই করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কর্ণেল ব্রেথওয়েট ফোর্ট উইলিয়মের কর্ত্তাদিগের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। জন ব্রেথওয়েটের সে পত্র অতিশয় দীর্ঘ, তাহারই এক স্থানে ছিল:—

"আমি বন্দী হইয়া অবাধ অসুখ ও দারুণ গ্রীষ্মে বড়ই কষ্ট পাইয়াছি। কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ 'বিহাণ্ডারের' *

---

* 'বিহাণ্ডার' (Behander) শব্দের অর্থ কি তাহা বলিতে পারি না।

কার্য্য করেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমি এতই সাহায্য ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি যে দিন দিন আমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। সরকার হইতে আমার জন্য অর্থ এবং বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে, ফরাসীবাজার হইতে আমি ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবারও অনুমতি পাইয়াছি। কিন্তু আমার উপর নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে বলিয়া আমি কোন সংবাদই জানিতে পাইতেছি না; আমাদের সৈন্যগণ কি করিতেছে তাহা না জানিতে পারিয়া আমি বড়ই অসুখী হইয়াছি।” *

পাঠকগণ গত কার্ত্তিক সংখ্যার প্রদীপে লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিলের পত্র পাঠ করিয়াছেন, সেই পত্রের সহিত বন্দী ব্রেথওয়েটের পত্রখানি মিলাইয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, হায়দার-চরিত্র কিরূপ ছিল। কেবল ব্রেথ-ওয়েট নহে আরও অনেক ইংরাজ সেনানায়কও নানা যুদ্ধে হায়দারের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু সিক্রেট সিলেক্ট কমিটির (The Secret Select Committee) রিপোর্টে তাহাদিগের কোন পত্রাদির উল্লেখ নাই। ইহাও কম আশ্চর্য্যের কথা নহে!

ইংরাজ-দূত শ্রীনিবাস রাও হায়দারকে একদিন বলিয়াছিলেন :—

“একটী কারণে আমার প্রভু বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন যে কর্ণেল বেলি [illegible] তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গ আপনার শিবিরে [illegible] পাইতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই [illegible] সন্তান। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহারা নাকি [illegible] খাদ্য প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের অত্যাবশ্যক [illegible] গুলিও পাইতেছেন না। তিনি বলেন যে, ব[illegible] এই ভাবে রাখা ইংরাজের রীতি নহে এবং [illegible] মহিমান্বিত নরপতিরও উপযুক্ত নহে। জাঁহাপনা [illegible] রূপ অযোগ্য ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া আমার প্রভু [illegible] বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।” †

ইংরাজ-দূতের কথার উত্তরে হায়দার আলি বলি-লেন :—

“কখনও তাহাদের বস্ত্র ও খাদ্যের অভাব নাই, তোমরা না হয় কেহ যাইয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আইস যে, ব্রেথওয়েটকে আমরা তাঞ্জোর প্রদেশে বন্দী করিয়াছিলাম তিনি এই শিবিরেই আছেন—তুমি ইচ্ছা করিলে স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার। প্রত্যেক দশ জন বন্দীকে প্রত্যহ একটী করিয়া মেষ দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। বন্দীদিগের মধ্যে কেহ কেহ, যাহারা তোমাদের বঙ্গে থাকিয়া কৃশ হইয়াছিল, এখন সেই বন্দোবস্তে অল্পে অল্পে স্থূলকায় হইতেছে। যিনি তোমাদিগকে এই সকল সংবাদ দিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। আর অন্যান্য দ্রব্যের কথা কহিতেছ—বন্দীরা নিশ্চয়ই সুন্দর সূক্ষ্ম পরিধেয় পাইবে না, তবে যথোপযোগী শ্বেত কার্পাস-বস্ত্র তাহাদিগকে দিয়াছি। তোমার প্রভুকে বলিও তিনি যেন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। যখন ইংরাজ ও আমার মধ্যে সকল গোল মিটিয়া যাইবে, তখন আমি সমস্ত বন্দীদিগকেই মুক্ত করিয়া দিব।” *

নবাব হায়দ[illegible] আলি ও শ্রীনিব[illegible] রাওয়ের মধ্যে [illegible] যে [illegible]থোপকথন [illegible] ছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত সর-[illegible] [illegible]খিতে পাওয়া যায়। ইংরাজই [illegible] [illegible]খন হইতেই হায়দারের সারল্য [illegible] [illegible]রিস্ফুট। † [illegible] কোন কথাই গোপন [illegible] সন্ধি, কি যুদ্ধ, কি মহারাষ্ট্রদিগের [illegible] নিজামের সহিত ষড়যন্ত্র—সকল [illegible] [illegible]টে প্রকাশ করিয়াছেন; [illegible] বন্দী সম্বন্ধীয় কথাও [illegible] বিশ্বাস করিবার যুক্তিপূর্ণ কারণ [illegible] হায়দার ও শ্রীনিবাস রাওয়ের কথোপ-[illegible] সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেই মেল্‌-[illegible] বলিয়া ধরিতে হইবে—এক [illegible] অপরাংশ অসত্য এরূপ বিশ্বাস করিবার [illegible] [illegible]লয়া বোধ হয় না। ইংরাজই বলিয়াছেন—

* State Papers: Letter of John Brathwait [illegible] 30th April, 1782.

† Secret Select Committee's Proceedings.

[illegible]ret Selec Committee's Proceedings.

[illegible] Introduction: State Papers. (Introduction by Ge[illegible] W. Forrest, Director of Records, Bombay.

The account of the interview between Hyder Ali and the envoy is of considerable interest, and raises our opinion of the frankness and determination of the Mysore Chief.

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

যমের জামাই।

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্মের অবতার।

“গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী-সমতুল।” ভাগীরথীর সেই বারাণসী-সমতুল পশ্চিম তীরে নগর গ্রাম অনেক আছে; পূর্ব্বেও অনেক ছিল। অনেক গ্রামেই অনেক ধনপতি সমাজপতির আধিপত্য ছিল। ইংরেজরাজত্ব এখন যেরূপ প্রবলপ্রতাপ হইয়াছে; তখন সেরূপ হয় নাই। তখনও চারিদিকে অশান্তি [illegible] ভাব প্[illegible] প্রায় বিরাজমান ছিল। সূর্য্যাস্ত এব[illegible] [illegible] যে সন্ধ্যার সঙ্কটে, আকাশ ঘোর[illegible] লোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছি[illegible] যোগ উপস্থিত হইয়াছিল [illegible] দস্যু ও দস্যুপোষকদিগের দর্শন পা[illegible] যে ভূভাগ হাবড়া, হুগলি, বর্দ্ধমান এবং [illegible] কয় জেলায় বিভক্ত, সেই [illegible] গ্রামে—দস্যুর উৎপাত [illegible] কোন কোন জমীদার দস্যুদলপতি [illegible] করিয়াছিলেন। জমীদার না হইয়া [illegible] ভদ্র-বংশধর দস্যুপোষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি[illegible], বৈদ্য, কায়স্থ সম্প্রদায়ের ভিতরও দস্যু [illegible] হল না। ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে অনেক গ্রাম নামজাদ[illegible] [illegible]য়া-ছিল। জলে স্থলে দস্যুর রাজত্ব চলি[illegible] ধন সম্পত্তি লইয়া, লোকের স্থানান্তরে যাওয়া [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল। কখন কখন সাহেব [illegible] দস্যু-হস্তে পড়িয়া লাঞ্ছনাভোগ করিতেন।

দুই একটা গ্রামের অপূর্ব্ব অবস্থা ব্যবস্থা দেখিয়া, অনভিজ্ঞ বৈদেশিককে অবাক্ হইতে হইত। প্রকাণ্ড সৌধ ভবন, ভবনের সম্মুখে সুন্দর সরোবর, সরোবরে বাঁধা ঘাট, পার্শ্বে উদ্যান। বার মাস জন মজুর খাটিতেছে, ঘর বাড়ী বার মাস মেরামত হইতেছে। নূতন ঘর দ্বারের কাজ লাগিয়াই আছে। বাগানে বারমাস কৃষাণ খাটিতেছে, বাড়ীতে বার মাস রাজমজুর কাজ করিতেছে। বাড়ীর কাছেই দেবালয়; দেবসেবায় কিছুমাত্র ক্রটি নাই; বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ। দান ধ্যানেরও অভাব নাই। অথচ গ্রামে ভয়ঙ্কর দস্যুভয়। স্থলে ডাকাত, জলে বোম্বেটে।

ঐ যে ঐ সৌধভবনসন্নিহিত উদ্যানের দিকে কৃষাণ খাটিতেছে, উহারা করিতেছে কি? এক একটা কৃষক যেন এক এক যমদূত; দেহে বল উপচিয়া পড়িতেছে, হাত পা যেন লোহায় গড়া। কিন্তু কাজ কৈ? কেহ একখানি কুদাল লইয়া আস্তে আস্তে, যেন নির্জীবের মত আস্তে আস্তে, মাটী কোপাইতেছে; কেহ বা এক জায়গায় বসিয়া একটী একটী করিয়া ঘাস তুলিতেছে; কেহ বা একটা শূন্য কলস লইয়া গাছের গোড়ায় জল-সেচনের অভিনয় করিতেছে; কেহ বা কোন স্থানে বসিয়া বেড়ায় বাঁধন [illegible]তেছে; কেহ বা আস্ত বেড়ার টাট্‌কা বাঁধন [illegible]য়া ফেলিতেছে, কেহ বা এক দিকের চারা তুলিয়া [illegible] লাগাইতেছে; কেহ বা উচ্চ বৃক্ষের উচ্চ শিখরে [illegible] দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

[illegible] দেখিতেছে, একগুণ কাজে দশগুণ লোক। [illegible]ন মজুর হইলে রক্ষা থাকে না, অথচ বাগানে [illegible]ন মজুর কাজ করিতেছে। জন মজুর ত নয়, ঠিক [illegible]ন যমদূত!

বাড়ীতে বার মাসই ইমারতী কাজ চলিতেছে। ছাদে বার মাস দাগরাজী হইতেছে, দেওয়ালে বার মাসই বালি ধরান হইতেছে; বার মাস পুরাতন প্রাচীর ভাঙ্গা হইয়াছে, বার মাস নূতন প্রাচীর গাঁথা হইতেছে; নূতন প্রাচীরও ভাঙ্গিয়া গড়া হইতেছে; প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহার ইটে ঘাট, প্রস্তুত করা হইতেছে, ঘাট ভাঙ্গিয়া প্রাচীর গড়া হইতেছে। রাজমিস্ত্রীর সংখ্যা করা ভার, মজুর, যোগাড়ে অগণ্য।

কার্য্য করেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমি এতই সাহায্য ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি যে দিন দিন আমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। সরকার হইতে আমার জন্য অর্থ এবং বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে, ফরাসীবাজার হইতে আমি ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবারও অনুমতি পাইয়াছি। কিন্তু আমার উপর নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে বলিয়া আমি কোন সংবাদই জানিতে পাইতেছি না; আমাদের সৈন্যগণ কি করিতেছে তাহা না জানিতে পারিয়া আমি বড়ই অসুখী হইয়াছি।" *

পাঠকগণ গত কার্ত্তিক সংখ্যার প্রদীপে লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিলের পত্র পাঠ করিয়াছেন, সেই পত্রের সহিত বন্দী ব্রেথওয়েটের পত্রখানি মিলাইয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, হায়দার-চরিত্র কিরূপ ছিল। কেবল ব্রেথওয়েট নহে আরও অনেক ইংরাজ সেনানায়কও নানা যুদ্ধে হায়দারের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু সিক্রেট সিলেক্ট কমিটির (The Secret Select Committee) রিপোর্টে তাহাদিগের কোন পত্রাদির উল্লেখ নাই। ইহাও কম আশ্চর্য্যের কথা নহে!

ইংরাজ-দূত শ্রীনিবাস রাও হায়দারকে একদিন বলিয়াছিলেন ঃ—

"একটী কারণে আমার প্রভু বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন যে কর্ণেল বেলি ... তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গ আপনার শিবিরে ... পাইতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ... সন্তান। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহারা নাকি পার... খাদ্য প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের অত্যাবশ্যক ... গুলিও পাইতেছেন না। তিনি বলেন যে, ব... এই ভাবে রাখা ইংরাজের রীতি নহে এবং ... মহিমান্বিত নরপতিরও উপযুক্ত নহে। তাঁহাপনা ... রূপ অযোগ্য ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া আমার প্রভু বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।" †

ইংরাজ-দূতের কথার উত্তরে হায়দার আলি বলিলেন ঃ—

"কথনও তাহাদের বস্ত্র ও খাদ্যের অভাব নাই, তোমরা না হয় কেহ যাইয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আইস যে, ব্রেথওয়েটকে আমরা তাঞ্জোর প্রদেশে বন্দী করিয়াছিলাম তিনি এই শিবিরেই আছেন—তুমি ইচ্ছা করিলে স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার। প্রত্যেক দশ জন বন্দীকে প্রত্যহ একটী করিয়া মেষ দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। বন্দীদিগের মধ্যে কেহ কেহ, যাহারা তোমাদের বঙ্গে থাকিয়া কৃশ হইয়াছিল, এখন সেই বন্দোবস্তে অল্পে অল্পে স্থূলকায় হইতেছে। যিনি তোমাদিগকে এই সকল সংবাদ দিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। আর অন্যান্য দ্রব্যের কথা কহিতেছ—বন্দীরা নিশ্চয়ই সুন্দর সূক্ষ্ম পরিধেয় পাইবে না, তবে যথোপযোগী শ্বেত কার্পাস বস্ত্র তাহাদিগকে দিয়াছি। তোমার প্রভুকে বলিও তিনি যেন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। যখন ইংরাজ ও আমার মধ্যে সকল গোল মিটিয়া যাইবে, তখন আমি সমস্ত বন্দীদিগকেই মুক্ত করিয়া দিব।" *

নবাব হায়দ আলি ও শ্রীনিবাস রাওয়ের মধ্যে যে কথোপকথন ... ছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত সর... ...খিতে পাওয়া যায়। ইংরাজই ... তখন হইতেই হায়দারের সারল্য ... রিস্ফুট। † ... কোন কথাই গোপন ... সন্ধি, কি যুদ্ধ, কি মহারাষ্ট্রদিগের ... কি নিজামের সহিত ষড়যন্ত্র—সকল ... টে প্রকাশ করিয়াছেন; ... বন্দী সম্বন্ধীয় কথাও ... বিশ্বাস করিবার যুক্তিপূর্ণ কারণ ... হায়দার ও শ্রীনিবাস রাওয়ের কথোপ... সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেই মেল্... বলিয়া ধরিতে হইবে—এক ... অপরাংশ অসত্য এরূপ বিশ্বাস করিবার ... বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজই বলিয়াছেন—

* State Papers: Letter of John Brathwait 30th April, 1782.

† Secret Select Committee's Proceedings.

* Secret Select Committee's Proceedings.

† Introduction: State Papers. (Introduction by G. W. Forrest, Director of Records, Bombay.

The account of the interview between Hyder Ali and the envoy is of considerable interest, and raises our opinion of the frankness and determination of the Mysore Chief.

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

যমের জামাই।

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্মের অবতার।

"গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী-সমতুল।" ভাগীরথীর সেই বারাণসী-সমতুল পশ্চিম তীরে নগর গ্রাম অনেক আছে; পূর্ব্বেও অনেক ছিল। অনেক গ্রামেই অনেক ধনপতি সমাজপতির আধিপত্য ছিল। ইংরেজরাজত্ব এখন যেরূপ প্রবলপ্রতাপ হইয়াছে; তখন সেরূপ হয় নাই। তখনও চারিদিকে অশান্তি ... ভাব প্রায় বিরাজমান ছিল। সূর্য্যাস্ত এব ... যে সন্ধ্যার সঙ্কটে, আকাশ ঘোর ... লোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছি... যোগ উপস্থিত হইয়াছিল ... দস্যু ও দস্যুপোষকদিগের দর্শন পাও... যে ভূভাগ হাবড়া, হুগলি, বর্দ্ধমান এবং ... কয় জেলায় বিভক্ত, সেই ... গ্রামে—দস্যুর উৎপাত ... কোন কোন জমীদার দস্যুদলপতি ... করিয়াছিলেন। জমীদার না হইয়া ... ভদ্র-বংশধর দস্যুপোষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি... , বৈদ্য, কায়স্থ সম্প্রদায়ের ভিতরও দস্যু ... হল না। ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে অনেক গ্রাম নামজাদ... ছিল। জলে স্থলে দস্যুর রাজত্ব চলি... ধন সম্পত্তি লইয়া, লোকের স্থানান্তরে যাওয়া ... হইয়া উঠিয়াছিল। কখন কখন সাহেব ... দস্যু-হস্তে পড়িয়া লাঞ্ছনাভোগ করিতেন।

দুই একটা গ্রামের অপূর্ব্ব অবস্থা ব্যবস্থা দেখিয়া, অনভিজ্ঞ বৈদেশিককে অবাক্ হইতে হইত। প্রকাণ্ড সৌধ ভবন, ভবনের সম্মুখে সুন্দর সরোবর, সরোবরে বাঁধা ঘাট, পার্শ্বে উদ্যান। বার মাস জন মজুর খাটিতেছে, ঘর বাড়ী বার মাস মেরামত হইতেছে। নূতন ঘর দ্বারের কাজ লাগিয়াই আছে। বাগানে বারমাস কৃষাণ খাটিতেছে, বাড়ীতে বার মাস রাজমজুর কাজ করিতেছে। বাড়ীর কাছেই দেবালয়; দেবসেবায় কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ। দান ধ্যানেরও অভাব নাই। অথচ গ্রামে ভয়ঙ্কর দস্যুভয়; স্থলে ডাকাত, জলে বোম্বেটে।

ঐ যে ঐ সৌধভবনসন্নিহিত উদ্যানের দিকে কৃষাণ খাটিতেছে, উহারা করিতেছে কি? এক একটা কৃষক যেন এক এক যমদূত; দেহে বল উপচিয়া পড়িতেছে, হাত পা যেন লোহায় গড়া। কিন্তু কাজ কৈ? কেহ একখানি কুদাল লইয়া আস্তে আস্তে, যেন নির্জীবের মত আস্তে আস্তে, মাটী কোপাইতেছে; কেহ বা এক জায়গায় বসিয়া একটী একটী করিয়া ঘাস তুলিতেছে; কেহ বা একটা শূন্য কলস লইয়া গাছের গোড়ায় জল-সেচনের অভিনয় করিতেছে; কেহ বা কোন স্থানে বসিয়া বেড়ায় বাঁধন দিতেছে; কেহ বা আস্ত বেড়ার টাট্‌কা বাঁধন ...য়া ফেলিতেছে, কেহ বা এক দিকের চারা তুলিয়া ... লাগাইতেছে; কেহ বা উচ্চ বৃক্ষের উচ্চ শিখরে ... দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

...খে দেখিতেছে, একগুণ কাজে দশগুণ লোক। ...ন মজুর হইলে রক্ষা থাকে না, অথচ বাগানে ...ন মজুর কাজ করিতেছে। জন মজুর ত নয়, ঠিক ...ন যমদূত!

বাড়ীতে বার মাসই ইমারতী কাজ চলিতেছে। ছাদে বার মাস দাগরাজী হইতেছে, দেওয়ালে বার মাসই বালি ধরান হইতেছে; বার মাস পুরাতন প্রাচীর ভাঙ্গা হইয়াছে, বার মাস নূতন প্রাচীর গাঁথা হইতেছে; নূতন প্রাচীরও ভাঙ্গিয়া গড়া হইতেছে; প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহার ইটে ঘাট প্রস্তুত করা হইতেছে, ঘাট ভাঙ্গিয়া প্রাচীর গড়া হইতেছে। রাজমিস্ত্রীর সংখ্যা করা ভার, মজুর, যোগাড়ে অগণ্য।

"সকলই লীলাময়ের ইচ্ছা! সংবাদ কি?" বক্তা পূর্ব্ব কথারই পুনরুক্তি করিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "মধুর হরিলীলা! আহা, কংসবধের পর কালীদহের কথা শুনিলে, ভক্তহৃদয় বিগলিত হয়।"

বক্তা নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন। পাঠক চিন্তা করিয়া দেখ, কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। ভক্তমুখে ব্যর্থ-বাক্য নিঃসৃত হয় না; হরিপুরের ঘোষবংশ আদর্শ ভক্তবংশ!

রাত্রি দেড় প্রহর হইয়াছে; কর্ত্তার ছুইটী নেত্রেই মধ্যে মধ্যে নিদ্রাবেশ হইতেছে, হরিনামের মালা ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যে মধ্যে থামিয়া যাইতেছে; মুখের হরিনাম স্থগিত হইয়া যাইতেছে, নাসারন্ধ্রে যেন "হর হর" শব্দ হইতেছে। লোকে বলে, নিদ্রা তন্দ্রায় কর্ত্তার নাক ডাকে। আমাদের বিশ্বাস, নাক-ডাকার ছলে হরিভক্ত হরিভজন মধ্যে মধ্যে "হর হর" বলিয়া থাকেন। ঐ সময়েই বোধ হয়, কর্ত্তা হরি-হরে অভেদ করিয়া থাকেন।

কাছারীতে লোক কম; ছয় পাণ্ডবই বসিয়া আছেন। আর সকলেই জাগিয়া বসিয়া, কর্ত্তার হর হর ধ্বনি শুনিতেছেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়া বলিল, "সকলই প্রভুর ইচ্ছা! ব্রজলীলার কি মাহাত্ম্য! আহা গোপের দল ... পসরা লইয়া উপস্থিত। বাঞ্ছাকল্পতরু বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

মধ্যম পাণ্ডব বলিলেন; "লীলা সাঙ্গ হইতে ... আছে। গোপকুলেই গোকুল পরিশোভিত! ... ধনের মধ্যে গোধন! প্রভু হে! কৃষ্ণধন ছাড়া ... সবই নিধন।"

পাঠক, বসিয়া বসিয়া, কি ভাবিতেছ? যাহা ... তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতেছ? চিন্তা কর, ... হইবে। কিন্তু চিন্তার ত সময় পাইলে না। ঐ দেখ, ছয় লোক তোমার সম্মুখে উপস্থিত। ছুইটী ভদ্রলোক, ... চারিজন ভৃত্য। ঐ যে ছুইজনের হস্তে ... দেখিতেছ, আকারে প্রকারে মনে হইতেছে: উহারা শরীর-রক্ষক প্রহরী। ছুই প্রহরীই বলবান্, অপর ছুই ভৃত্যও ছুর্ব্বল নহে। ভদ্র ছুই জনের একজন প্রবীণ, অন্য জন নবীন। ঐ দেখ, ভৃত্যদিগের মস্তকে লটবহর। এত রাত্রে এ পথে কেন? প্রভুর ইচ্ছা। অপেক্ষা কর, তৃতীয় অধ্যায়ে পরিচয় পাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

নফর ও গোবর।

এত রাত্রে বাড়ীতে অতিথি! কর্ত্তারই ঔৎসুক্য অধিক। অতিথিদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হইল। স্থানটী অন্দরেরই সংলগ্ন; কিন্তু মধ্যে প্রাচীর আছে। এইখানেই অতিথি-ভবন। আগন্তুকেরা বিশ্রাম করিতেছেন, শুনিয়া কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট একজন পরিচারক সঙ্গে লইয়া, হরিনামের ঝুলি হাতে করিয়া, হরিনাম করিতে করিতে, আস্তে আস্তে অতিথি-ভবনে উপস্থিত হইলেন। যথোচিত সম্ভাষণাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন? কোথায় যাইবেন? আমার অদ্য সুপ্রভাত, তাই আপনাদের মত লোকের পায়ের ধূলা দেখিতে পাইলাম।"

উত্তরে প্রবীণ অতিথি বলিলেন,—আমরাও কায়স্থ, আমাদের নিবাস কাল্‌না, আমরা মিত্রবংশের। কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় ছিলাম। বাড়ীতে বিবাহ আছে, কলিকাতা হইতে নৌ ... ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম। সে ... বৈষ্ণ... কিছুতেই কাল্‌না পর্য্যন্ত যাইতে ... অনুনয় বিনয়ে তাহারা আমা... ছিয়া গিয়াছে। আমরা নসরাই ... সঙ্গে ছুই জন চাকর আছে, ... বাড়ীর পা'কেরাই বিবাহের ... কলিকাতায় গিয়াছিল, সঙ্গে আসিয়াছে। ... গিয়াছে। আমাদের নসরাইগঞ্জেই থাকা ... রে এক দোকানে বসিয়া, ... লাম, হরিপুরে আসিলেই ... পারিব। সে দোকানী পরম ... হরিনাম। সেই আমাদিগকে ... পরামর্শ দিল। তাই আমরা উপস্থিত ...

... সন্তোষ সহকারে বলিলেন,—"আমার পরম ... প্রভুর ইচ্ছা। দোকানীটীকে চিনিতে ... বোধ হইতেছে, তিনি একটী ভক্ত ... অঞ্চলে বৈষ্ণব আছেন; সকলই তাঁহার ... কৃপা থাকিলে, পরও আত্মীয় হয়। অপরিচিত হইলেও, দোকানী আমাদের আত্মীয়। এরূপ অজ্ঞাতবন্ধু আমাদের অনেক আছেন।"

প্রবীণ আগন্তুক বলিলেন,—"তাত হইবারই কথা! আপনারা মহাশয় লোক।"

কর্ত্তা ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"সকলই প্রভুর ইচ্ছা। তা আপনাদের আহারাদি বাড়ীতেই হইবে; আপনারা মিত্র, আমরা ঘোষ। মহাশয়ের নামটী কি?"

প্রবীণ বলিলেন,—"আমার নাম কালিদাস মিত্র, আর ইনি আমার পুত্র, ইহার নাম ছুর্গাদাস।" পরম বৈষ্ণব হরিভজন ঘোষ, একটু নাক সিট্‌কাইয়াই, মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া রাখিলেন। হরিভক্তের ভবনে কালিদাস—ছুর্গাদাস—অতিথি; ভয়ঙ্কর ব্যাপার, অসহ্য অত্যাচার! কিন্তু চারা নাই, অতিথি তাড়াইবার যো নাই। বিশেষতঃ যেমন তেমন অতিথি নহে, ধনবান্ অতিথি। ধনের পরিচয় সমীপস্থ বাক্‌সে। নামের কথা ছাড়িয়া কর্ত্তা আহারের কথাই আবার কহিলেন। কালিদাস মিত্র বলিলেন,—"তাহাতে আপত্তি কিছুই নাই, আপনার বাড়ীতেই, আমাদের আহার হইবে।"

এই কথা শুনিয়া, কর্ত্তা গাত্রো... রলেন; নিজের ভৃত্যদিগকে অতিথি-সেবায় নিযু... অ...রের দিকে যাত্রা করিলেন। যাওয়ার ... মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইল; "প্র... নির্ভর দেখা যাইতে লাগিল ... একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কা... জন প্রভুর কাছেই থাকিল। পাইক ছুই ... বার বাহিরের দিকে গেল। ... চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছি... সেটাকে লক্ষ্য করেন নাই। ভৃত্য... করে নাই; হয় ত লক্ষ্য করিয়াও, বুঝি...

পাইকেরা একটু এদিক সেদিক ... কিন্তু ... প্রভু ও প্রভুপুত্র যে ঘরে বসিয়া ... সে ঘরে ... আসিল না; পার্শ্বের ঘরেই বসিয়া, তামকূট ... লাগিল। কালিদাস ও ছুর্গাদাসের যথেষ্ট ... বিশ্রামের সময়ে ছুই জনেরই একটু নিদ্রাবে... ছুইজনও বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল। ... অস্ফুট বাক্যালাপ কাহারই কর্ণগোচর হইল ...

পাইকেরা ছুই ভাই; ছুই সহোদর নহে, ছুই পিতৃব্যপুত্র। ইহাদের নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়, নাদনঘাট অঞ্চলে; ইহারা জাত্যংশে চাঁড়াল। ছুই জনেরই বয়স প্রায় সমান, ত্রিশ বত্রিশ। এক জনের নাম নফর, অন্য জনের নাম গোবর্দ্ধন। নফর সর্দ্দার গোবর সর্দ্দার সামান্য পাইক নহে; ঠগের কমিশনর বা হক সাহেবের ভয়েই ভদ্রলোকের আশ্রয় লইয়াছে। নফরার বাপ নাই, গোবরার পিতা রামধন বিদ্যমান। রামধন সর্দ্দারকে না চিনিত তখন এমন লোক, অতি অল্পই ছিল। নফরের পিতা রাধানাথও বড় সামান্য লোক ছিল না। হুগলি জেলায় প্রসিদ্ধ রাধানাথের প্রায় সমকক্ষই ছিল না। নফর ও গোবর আকার প্রকারে বংশের উপযুক্ত সন্তান। দীর্ঘ আকার, আজানুলম্বিত বাহু। দেখিলেই মনে হয়, দেহে অসামান্য বল। কর্ত্তা হরিভজন ঘোষ যে, ইহাদিগের দিকে একটু খর নজরে চাহিয়াছিলেন, কালিদাস ছুর্গাদাস তাহা দেখিতে পান নাই, ভৃত্যেরা কিছুই দেখিতে পায় নাই। কিন্তু নফর গোবর সব দেখিয়াছিল। যখন ঘোষ মহাশয় ইহাদের দিকে খর নজরে চাহিয়াছিলেন, তখন ইহারাও ঘোষ মহাশয়কে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়াছিল। নফর গোবর কাল্‌নার উত্তরে কখনও আসে নাই, হরিপুরের ঘোষদিগকে চিনিত না। পিতা পিতৃব্যের কাছেও কখনও ...দের কোন কথা শুনিবার অবসর পায় নাই।

...র এদিক ওদিক দেখিয়া আসিয়া, নফর গোবর ... কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, তাহা আর কেহ ... পান নাই। কিন্তু পাঠক, আমাদের অশ্রোতব্য ... কিছুই নাই। কথাবার্ত্তা আমরা শুনিতে পাই... আমরা শোন।

নফর—"ওরে ভাই, কেমন কেমন ঠেকলো যে! ...দিক ত আচ্ছা নয়। শালাদের হরিনামের ধূম দেখেই ভয় হয়েছিল। বড় বাবুকে বলেছিলাম, কোথাও থাকিয়া কাজ নাই, বরাবর চলিয়া গেলেই ঠিক হইত। বোধ হয় ত্রিবেণীতেই থাকা উচিত ছিল। গোবর তুই কি বলিস্?"

গোবর—"দাদা, তুমি যা ভেবেছ তাই ঠিক, তাই বটে! কিন্তু অনেক রাত্রি হয়েছে, এখন গোলমাল করা হবে না; গোলমাল করিলে হাঙ্গামা বাড়িবে। বাবুদেরও এখন কোন কথা বলা হইবে না। যদিই আমাদের

হদীশ ঠিক নাই হয়। আর বাবুরা ভয় খেয়ে গেলে, সব মাটী হবে। হুঁসীয়ার, দাদা হুঁসীয়ার!"

নফর—"তা আর বল্‌তে হবে না। গোবরা তুই বসে থাক, আমি একবার সব দিক দেখে আসি। খবরদার; কাতান দুইখানা ঠিক আছে ত?"

গোবর—"বড় কাতান ত সঙ্গে নাই, ছোট কাতান দুই খানাই আছে, ছোট বাবুর তোরঙ্গের ভিতর রাখিয়াছি। চাবী ভোলার কাছে আছে।"

নফর—"ভোলাকে কোন কথা বলা হবে না। ভোলাত ভোলা, এখনই হয় ত কান্না জুড়ে দেবে, দেখ্ দেখি ভোলার কোমর থেকে চাবিকাটী খুলে নিতে পারিস্ কি না?"

গোবর আস্তে আস্তে গিয়া একটু শব্দ করিল, তাহাতে কাহারও ঘুম ভাঙ্গিল না। তখন গোবর আস্তে আস্তে ভোলার কোমরে হাত দিয়া, চাবিকাটী খুলিয়া লইল।

নফর বলিল,—"গোবর, তুই কি কখনও সিঁধের কাজ করেছিলি? তোর চাবি খুলে [illegible] বাহাদুরী আছে?"

গোবর বলিল,—"দাদা সিঁধের কাজও শিখে রাখ্‌তে হয়, এটাও ত একটা বিদ্যে। আর ছেলে বেলায় দুই একবার যে একাজ করি নাই, এমন নহে। সিঁধেই হাতে খড়ি হয়েছিল; আমার যখন ছয় বছর বয়স, তখন আ[illegible] কোমর থেকে চাবী চুরি করিয়া দুই একটা প[illegible] কর্‌তাম।"

নফর বলিল,—"ঐ বিদ্যেটাই আমার শেখা হ[illegible] তা তুই কাতান দুইখানা বাহির করিয়া রা[illegible] আস্‌ছি, চাবিটা তোর কাছেই রাখ্ [illegible] পড়[illegible] ভোলা চাবিটা ভুলে বিছানায় ফেলিয়া দিয়াছিল, আ[illegible] কুড়াইয়া রাখিয়াছি।" এই কথা বলিয়া, নফর [illegible] গেল, কাতান দুইখানি লইয়া গোবর আপনা[illegible] [illegible] কোন [illegible] তলায় রাখিয়া দিল। কাতান হাতে পাইয়া গোবর্দ্ধন যেন [illegible] যেন ক[illegible] নিজ মূর্ত্তি ধরিল, তাহার বল বিক্রম শৌর্য্য সাহস [illegible] হই[illegible] হইয়া উঠিল, বুদ্ধিরও পূর্ণ বিকাশ হইল; কিন্তু গোবর মনের ভাব সামলাইয়া লইয়া, চুপ করিয়া, অতি শিষ্ট শান্ত [illegible] য[illegible] হইয়া বসিয়া থাকিল। গোবর বসিয়া থাকুক, চল পাঠক আমরা নিমেষের তরে একবার নফরের সঙ্গে যাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাসরে দোসর।

অন্ধকারে নফর বিড়ালের চক্ষু পাইয়াছে, নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তমনে পদবিক্ষেপ করিতেছে; আমাদিগকে অতি সাবধানে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হইতেছে। তাই ত! নফর যে, সদর ছাড়িয়া, খিড়কীর দিকে আসিয়াছে। বা! ঘোষ মহাশয়ও যে, দেখিতেছি, অতিথিদিগকে অন্দরের দিকেই বাসা দিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? অন্দর প্রাচীরে বেষ্টিত বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে ত দুর্লঙ্ঘনীয় নহে! চল চল, নফর সর্দ্দার ওখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল কেন, দেখিগে। হাঁ—হেতু আছে; নফর যেন খরগোষের মত কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে। হুঁ, ঐ যে, ঐ ঘরটার ভিতর কি ফিস্‌ফিস্ শব্দ হইতেছে; নফর তাই শুনিতেছে। এ যে, দেখ্‌ছি দুই গলার ঝিম আওয়াজ। তাই ত বটে, স্ত্রীপুরুষের কথা, ঘরের এদিকে জানালা নাই, ঐ যে, দুইটা ঘুলঘুলী আছে, উহার ভিতর দিয়াই আওয়াজ আসিতেছে। [illegible]র তন্ময় হইয়া শুনিতেছে, এসো আমরা[illegible] শুনি। পা[illegible] [illegible]পুরুষের কথাই বটে!

[illegible] স্মির্ন [illegible] একটা আকুণ্ডু কুণ্ডু বাধাইবে? [illegible] সদরে যাইও না; তবু সদরে [illegible]র দিকে গিয়াছিলে! মাথার [illegible]র পর বাহিরে যাইও না; [illegible] কণপাত কর না, তুমি বাহিরে গিয়া- [illegible] কাছে পর্য্যন্ত গিয়াছিলে! আবার রাত্রি [illegible] কি [illegible]নাশ করেছ! অদৃষ্টে কি [illegible]! কাকারা কি দাদারা যদি

[illegible]

[illegible]ত তিন চারি দিন আসিয়াছি, আর [illegible] দরজা পার হই নাই, বাবা! ঠিক [illegible] করে যে, তোমায় এ যমালয় [illegible]ইতে পারিব!"

[illegible]—"যমের বাড়ীই বটে, তুমি হয়েছ [illegible] কিন্তু কি যে বলিতে চাহিয়াছিলে?"

[illegible]ঝিলে, কাহাদের কথাবার্ত্তা? ঘোষ কর্ত্তার তাঁহার জামাতার কথা হইতেছে। আমরা

সকল খবর রাখি। বিবাহের পর জামাই বাবাজী আর কখনও আসেন নাই। স্ত্রী এখন যুবতী, জামাই বাবাজী তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহেন। ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা, আর কোন ভ্রাতার কন্যা-সন্তান হয় নাই। কিন্তু কন্যাকে শ্বশুরালয়ে না পাঠাইবার অন্য কারণ আছে, সেই কারণই গুরুতর। এখন মন দিয়া আবার কথাবার্ত্তা শোন।

যমের জামাই—"রাত্রি হইয়াছে, বিলম্ব করিলে চলিতেছে না; সব কথা তোমাকে বলি। দুইটী ভদ্রলোক এই যমালয়ে অতিথি হয়েছেন। দুই বাপ বেটা সঙ্গে দুই ভৃত্য আর দুই পাইক। পাইক দুই জনের জন্যই তোমার যম পিতার উদ্বেগ। কিন্তু যম দাদারা ও যম কাকারা অভয় দিয়াছেন। আহা! বিধাতার মনে এতও আছে!"

যমের কন্যা—"আমিও সব শুনিয়াছি। খুড়ীমারাও রাক্ষসের বাড়ীতে আসিয়া রাক্ষসী হইয়াছেন। বউ কয়জনেরও দয়া মায়া নাই! তাঁহারা হাসিতে হাসিতে গল্প করিতেছিলেন, তা সব শুনিয়াছি। রাত্রি বিশদণ্ডের সময়ে কাজ হাঁসিল হইবে। এমন সর্ব্বনাশ ত নূতন নহে! তবুও আমার আর সহ্য হয় না। আমরা কি কিছুতেই এ নরক হইতে পালাই[illegible]ব না?"

জামাই—"যাই থাকে অদৃষ্টে [illegible] এবা[illegible] স্থির করিয়াছি, ঐ কয়টী লোককে বাঁ[illegible] তোমাকে সাহসে ভর করি[illegible] করিতে হইবে। বৃথা লজ্জা [illegible] হইয়াছে, তখন তুমিই আ[illegible] ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আর এ[illegible] তা তোমার দোষ কি? [illegible] চ[illegible] নরকের দেবকন্যা, তুমি সত[illegible]

কন্যা—"তুমি যা বলি[illegible], [illegible] ভ্রূক্ষেপ করিব না। এ রাক্ষসের [illegible] আমাকে তুমি মুক্ত কর—পার ত[illegible]

জামাই—"ভদ্রলোক দুইটী ত[illegible] [illegible]সিবেন, আর বিলম্ব নাই। এই কলাপ[illegible] [illegible] পান কয়টা উঁহাদের একজনকে দিবে [illegible] তে দিও। দিবার সময়ে, 'প্রদীপ্তে দে[illegible] [illegible] থা বলিয়া দিও। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে [illegible] য়া পান খাইতে হয়।"

এই কথা শুনিয়াই, কামিনী বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, দেও, আমি যাই। ঐ পীঁড়ি-পাতার শব্দ হইল; উঁহারা এতক্ষণ অন্দরে আসিয়াছেন। পান ত দিয়া আসি; তারপর তুমি যা বলিবে, তাই করিব।"

জামাই—"তার পর উঁহাদিগকে পালাবার পথ দেখিয়ে দিব, আমরাও সঙ্গে পালাব; অন্যথা আর উপায় নাই।"

এই কথার পর, যম-তনয়া চলিয়া গেলেন; নফর সর্দ্দারও ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, বাবুরা অন্দরে আহার করিতে গিয়াছেন। নফর সকল কথা গোবরকে বলিয়া, কহিল,—"হায় হায়! বাবুরা যদি আর একটু বিলম্ব করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে, আমি সাবধান করিয়া দিতাম। যদি পানের কলাপাতখানা ফেলিয়া দিয়া আসেন! গোবর, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ভয়ঙ্কর ডাকাতের বাড়ী! এণ্ডা বাচ্চা মেয়ে পুরুষ সব ডাকাত! কেবল কর্ত্তার—ঐ যমরাজ বেটার মেয়েটী দেব-কন্যা; আর উহার সোয়ামী দেব-জামাতা। যাহাই হ'ক, উপায় হইয়াছে। কলাপাত খোয়া-গেলেও ভয় নাই; আঁচে মারিয়া দিয়াছি। ভাগ্যে বাহিরে গিয়াছিলাম।"

নফরে গোবরে নানাবিধ পরামর্শ হইল। ভৃত্য দুই জনকেও নফর সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিয়া সাহস দিল। বলিল, "দাদা ভাই রে! যদি ভড়্‌কে যাও, তাহা হইলে [illegible]নাশ। কেহই রক্ষা পাবে না। আমরা দুটো, আর ও [illegible]শো! আর হয় ত সকল দিকের পথ বন্ধ [illegible] গোবর দেখ্‌ত রে!"

[illegible] উঠিয়া গিয়া দেখিল, ঘরের বাহিরের দিকের [illegible]। নফর বুঝিল, পিশাচেরা বাহির দিকে কুলুপ [illegible] যে দরজা দিয়া নফর বাহিরে গিয়াছিল, সে [illegible] খোলা আছে; কিন্তু সে পথে বাহিরে যাইবার যো [illegible]ই, অন্দরে যাইবার গুপ্তদ্বার সে দিকে থাকিতে পারে।

বাহিরের দুইটা ঘর পাশাপাশি। পাশের ঘরে নফর গোবর বসিবার স্থান পাইয়াছে। ঐ ঘর ও অন্দরের মধ্যস্থলে একটা দরজা। ঘোষেদের এক সাধুপুরুষ ঐ দরজা খুলিয়াই, মিত্র মহাশয়দিগকে অন্দরে লইয়া গিয়াছেন। বড় আত্মীয়তা কি না!

কালিদাস ও দুর্গাদাসের আহার হইল, ভৃত্যদের ডাক

পড়িবার পুর্ব্বেই নফর সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, সকলেই বলিল,—"ভাত খাইব না, শরীর ভাল নহে; মুড়ী মুড়্‌কী হইলে ভাল হয়, না হয় রাতটা উপবাসেই কাটাইব।"

এ কথায় যমালয়ের কাহারও সন্দেহ হইল না। নফরের ভয় ছিল, আমরা আহারে গেলেই হয় ত বেটারা কি সর্ব্বনাশ করিবে। বড় বিষম সঙ্কট।

বাবুরা বাহিরে আসিলেন। দুর্গাদাস বাবু আসিয়াই প্রদীপের কাছে পানের দোনা খুলিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, স্পষ্ট লেখা। চুপি চুপি পড়িলেন।

"বিশ দণ্ডের পর ঈশান-কোণে যাত্রা, অন্যদিকে যাত্রা নিষেধ। কেননা, সম্মুখে যোগিনী। বিশ দণ্ডের পর যোগিনী অনুকূল; তখন যোগিনীর অনুগমন করিলে মঙ্গল।"

বুঝে কাহার সাধ্য? যমালয়ের কেহ যদি সন্দেহ করিয়া, যম-তনয়ার হাত হইতে পান লইয়া, কলাপাত পড়িত; তাহা হইলে মনে করিত, কে পাঁজী নকল করিয়াছে। আর যম-তনয়াও নিশ্চিতই, তাহা হইলে ঐরূপ কৈফিয়ত দিতেন। নফর যদি স্বকর্ণে যমের মেয়ে-জামাইয়ের কথাবার্ত্তা না শুনিয়া আসিত, তাহা হইলে, কালিদাস দুর্গাদাস কোন দাসই কলাপাতার কিছুমাত্র রহস্যভেদ করিতে পারিতেন না। কিন্তু "আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি।"

নফর সকল কথাই বাবুদিগকে খুলিয়া বলিল। জামাই বাবাজী যে যম-কন্যাকে লইয়া পলাইবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহাও ত নফর শুনিয়া আসিয়াছিল। সকলে সাবধান হইলেন। সকলেই বুঝিলেন, অন্দর ছাড়া পথ নাই; আট ঘাটের সাত ঘাট বন্ধ, এক ঘাট খোলা; ভয়ঙ্কর ঘাট, যমের অন্দর দিয়া ঘাট! এখন যা করেন ভগবান্, আর যা করেন যম-কন্যা,—সেই দেবী এবং তাঁহার দেবতুল্য স্বামী।

ক্রমে যমালয় একেবারেই নিস্তব্ধ হইল, সর্ব্বনাশের সময়ও ক্রমেই সন্নিহিত হইতে লাগিল। যথাকালে আসিয়া যম-তনয়েরা সর্ব্বনাশ করিবে; যমকিঙ্করেরা সঙ্গে থাকিবে। কালিদাস বাবুর পাইক দুইজনের অগ্রে মুণ্ডপাত হইবে। সঙ্কল্প স্থির, নিঃসন্দেহ। এদিকে যে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িয়াছে, যম-তনয়া পিতার প্রতিকূল হইয়াছেন, পাতা ফাঁদ মৃগযূথের নেত্রপথে পড়িয়াছে, তাহাত যমালয়ের কেহই বুঝিতে পারে নাই; যম-তনয়ার পান-দান-রহস্যও কাহারও বিদিত হয় নাই। কোন কথাই কেহ শুনিতে পায় নাই।

অভিনয়ের ভীষণতা এবং গাঢ়তা কিরূপ, সহৃদয় পাঠক বুঝিয়া দেখ; আর বড় বিলম্ব নাই। এরূপ অবস্থায় সময় কাটিতে চায় না সত্য, কিন্তু সময় ত না কাটিয়াও থাকে না!

কালিদাস দুর্গাদাস জাগিয়াও নিদ্রার ভান করিতে লাগিলেন, ভৃত্য দুইজনও নিস্তব্ধ মৃতবৎ পড়িয়া থাকিল। নফর গোবর বসিয়া রহিল। পাইক সর্দ্দারেরা সহজে নিদ্রা যায় না, তাহা যমালয়ের লোকে জানিত। আমরাও জাগিয়া থাকিব; আমাদিগকে এ অধ্যায়ে আর কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে না। ক্রমশঃ—

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

...ণান্তে।

...স্তাব।

...মজ্জা এবং মাংস ও ...রমণ্ডলে মানবরূপে আবির্ভূত ...ও সময় শেষের সেই নীরব ... অনন্তের অভিমুখে অগ্... সবিতার প্রতীচ্য পর্ব্বতে ...য় ধ্রুব সত্য; কিন্তু মায়ামুগ্ধ ... কেবল সরোবরস্থ সলিলোথিত ...করা যায়, তাহা হইলে নলিনী... ...ী মনুষ্যের তুল্য হতভাগা ... আর দ্বিতীয় নাই। কৈশোর ... হইতে প্রবীণ, প্রবীণ হইতে ...ত প্রবৃদ্ধ ও জরাবস্থা পর্য্যন্ত

মানবজ... রক্তবিন্দু... দলগত ... জীব... হইতে... বৃদ্ধ...

...রি + বি + অন) অর্থে প্রাণবায়ু।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

এই সুদীর্ঘকালের অসহনীয় শারীরিক ক্লেশ, অবর্ণনীয় মানসিক বেদনা, অনির্ব্বচনীয় আত্মিক কষ্ট এবং ঘোরতর আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিষাদ-সহিষ্ণুতার মধ্যে মানবেরা পরলোক সম্বন্ধীয় যে ক্ষীণাদপি ক্ষীণ আশার আনন্দময় আলোকে মন প্রাণ ও আত্মাকে সজীব রাখিয়া থাকে সেই ক্ষীণাদপি ক্ষীণ আশা যদি পরিণামে আকাশকুসুমের ন্যায় কেবল আশার কল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে মনুষ্য-জীবনের তুল্য হতভাগ্য জীবন বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু পরলোকের আশায় আশ্বাসিত হইয়া যাঁহারা ইহজীবনকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করেন, যাঁহারা সাংসারিক কর্ত্তব্যকে অসার মনে না করিয়া সেই অতুল আনন্দদায়ক অমৃতধামের দিকে অগ্রসর হয়েন, যাঁহারা "যদাৎ সত্যম্ ভবতি তত্রৈব মনাংসি নিধধ্বম্" এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের কল্যাণ কামনায় পবিত্র দেবমঞ্চে স্বকীয় প্রিয়তম স্বার্থপশুকে বলিদান-পূর্ব্বক দীনতায় [illegible] দর্শন করেন, যাঁহাদের লোক-পাবন চরিত্রে, নিঃস্বার্থ বিশ্বহিতৈষীতা [illegible] প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মো-পদেশে, জ্বলন্ত বিশ্বাসপূর্ণ জীবনে [illegible] ধর্ম্ম, [illegible] ও আত্মার মঙ্গলজনক মহাপুণ্য [illegible] সর্ব্বং তস্মাত্ত্বমস্ত শরণং" এই [illegible] দর্শন করিয়া পুলকে [illegible] কোন্ আশাসুন্দরী তাঁহ[illegible] প্রশস্তমার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর [illegible] "মৃত্যুর পরের" সুখময়ী আশা কেবল [illegible] অসার কুহক ভিন্ন আর কি [illegible] নির্ব্বাত-প্রদীপের গরুকণ [illegible] না হয়, তাহা হইলে চতুষ্পাদজনে এই [illegible] মুগ্ধ জীবন-শকটকে বহন করি[illegible] রমণী সহজে স্বীকৃত ও সম্মত [illegible] ধীরে ধীরে, বিনয়ে ও বিনম্র [illegible] লেই মরণ হয়, ইহা নিশ্চিত [illegible] হয়, তাহা বলিতে পার কি ?" [illegible] সকলই মিথ্যা অর্থাৎ মরণান্তে আর কি বা কিছুই হয় না," আমি তাঁহাদিগকে সমৃদ্ধি, আশা, ভরসা, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির [illegible] গণনা করি। এরূপ লোকেরা পৃথিবীর সুখ ও শান্তি-পথের ভীষণ কন্টকস্বরূপ। বাস্তবিক পরকালের সুখময়ী আশা হইতে আমাদিগকে যাহারা বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহারা জগতের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির মহা-বৈরী। আমি পুনরায় ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করি, পর-লোকে বিশ্বাস ভাল কি মন্দ ? "মৃত্যুর পরে কি হয় ?" এই মহাপ্রাচীন প্রশ্ন অতীব গুরুতর হইলেও অতীব প্রয়োজনীয়। সমগ্র মানবজাতির—সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের—বিশেষতঃ অধঃপতিত ভারতবাসিবর্গের পক্ষে এই প্রাচীন প্রশ্নের সদুত্তর নানা কারণে অত্যন্ত কল্যাণকর। প্রস্তাবের প্রথমেই পরিস্ফুট ভাবে বলিয়া রাখা আবশ্যক, আমি নিজে পরলোকে প্রগাঢ় বিশ্বাস করি। বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে যে প্রাজ্ঞপ্রবর মহর্ষি বলিয়াছেন, "হে গুরো ! তুমি আমাদিগকে কল্পনা হইতে সত্যের রাজ্যে লইয়া যাও, তুমি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, হে গুরো ! তুমি আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অনন্তের অমৃতধামে লইয়া চল," আমি সেই অক্ষয় অক্ষয়ানন্দভোগী যোগীরাজের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহারই কথার উপরে নির্ভর করতঃ মৃত্যুর পরে কি হয় বা না হয়, তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

[illegible]চিন্তাশীল পণ্ডিতচূড়ামণি বেকন, প্রাজ্ঞকুলপুঙ্গব [illegible] এবং তার্কিককুলতেজস্বী বাসুদেব সার্ব্বভৌম [illegible] বলিয়াছেন, "অতি প্রাচীনকাল হইতে যাহা [illegible]বাক্যের অন্তর্ভুক্ত তাহার কুফল বা সুফল আশু [illegible] না হইলেও তাহা যে অল্প বা অধিক পরি-[illegible]র সহিত সমাযুক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।" মৃত্যুর পরে উত্তম বা অধম, উচ্চ বা নীচ, [illegible] বা কোনও প্রকার অবস্থায় মনুষ্যকে উপনীত হইতে [illegible] পুরাকাল হইতে জনসাধারণের ধ্রুব বিশ্বাস। [illegible]শর, বিক্রমী রোম, গৌরবান্বিত গ্রীস, অধিক [illegible] বা অর্দ্ধসভ্য মেক্সিকো, পেরু, ফীণ, ল্যাপ [illegible] দেশেও এই বিশ্বাসের অভাব নাই। সিংহল, তিব্বত, তাতার, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি কোনও [illegible] এই বিশ্বাস কখনও তিরোহিত হয় নাই। পিথা-[illegible] আরিয়াণ (Arrian), প্লেটো, য়িহুদী রব্বাই,

পার্শীক মজ্জাই, বুদ্ধ শ্রমণ, জৈন যতি প্রভৃতি সকলেই এই প্রবাদ-হুতাশনে বিশ্বাস-সমীরণের সহায়তা দানে পৃষ্ঠপদ হয়েন নাই। ঋগ্বেদের প্রথম অংশের ১৬৪ মণ্ডলের ৩২ শ্লোকস্থিত "বহুপ্রজা" শব্দ পরলোকের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় বিশ্বাসের অতি প্রাচীন প্রমাণ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া থাকেন। শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, কৌষিতকী উপনিষদ, ঐত্তরেয় আরণ্যক প্রভৃতিতে পরলোকের কথা পুনঃপুনঃ পাঠ করা যায়। মনু প্রভৃতি ব্যবস্থাকর্ত্তাদিগের গ্রন্থে এবং তদ্ব্যতীত মহাপুরাণ, পুরাণ, উপপুরাণ ও ভক্তি-রস-প্রধান কাব্যাদিতে পরলোকের বিশ্বাসের কথা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। খৃষ্টানের বাইবেলে, য়িহুদীর তৌরং ও জব্বুরে, পার্শীকের জেন্দাবেস্তায়, মুসলমানের কোরাণে, গুরু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী মৌলবি ও পাণ্ডীর উপদেশে পরলোকের কথা যেন গার্হস্থ্য শব্দ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। পরলোকে হিন্দুর এমনই বিশ্বাস যে, হিন্দুজাতির সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে যদি পরলোকের বিবরণ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মরূপ অট্টালিকা বোধ হয় ভিত্তি-শূন্য হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ রূপে পতিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পারদর্শী আচার্য্য লশন সাহেব বলেন :—

"The belief in the next world enters so vitally into the whole genius of Hindoo philosophy and is so interwoven with the incite[illegible]ments to an ascetic and holy life giving rise to all the self-tortures of a devotee, that were this doctrine removed the religious structure of Hindooism would be hard to recog[illegible] and would have to be rebuilt."—*Es[illegible] metampsychocis by Professor Lawson.*

বিশ্বাস প্রাচীন হইলেই যে সত্য [illegible] হইবে তাহা আমি স্বীকার করি না। "পৃথিবী, সূর্য্যমণ্ডলের কেন্দ্র" ইহা একটি প্রাচীন বিশ্বাস, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই পুরাতন বিশ্বাসকে অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু যাহা সত্য, তাহা নবীন হউক আর প্রাচীন হউক, চিরকালই সত্য। অনেকে পরলোককে অনেকভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, সেই ভাবের সহিত অনেকের মত-ভেদ থাকিতে পারে—থাকাই সম্ভব—[illegible] বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভাব লইয়া আলোচনা করি নাই; ভাব যাহাই হউক, "পরলোক আছে" এই বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করিয়া এই বিশ্বাসের নৈতিক ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

প্রাচ্যদেশে ও প্রতীচ্যদেশে আত্মার স্বভাব লইয়া যে তারতম্য আছে, অনেকে তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আলোচনা করেন না। ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রে আত্মবোধসঞ্জাত জ্ঞানের (Self-conscious intelligence) উপরে আত্মিক নীতি নির্ভর করে, এই জন্য ইউরোপীয় দার্শনিকেরা মানবের মৃত্যু-যবনিকার অন্তরালে, হিন্দুপণ্ডিতের ন্যায়, কুকর্ম্ম-দুষ্ট-মনুষ্যকে সিংহ, ব্যাঘ্র, শশক বা সারমেয় রূপে পরিণত হইতে দেখেন না।

The religious philosophies of Europe are all founded on the principle of the self-conscious intelligence and *will* as their final cause and as their conception of soul. In Hindoo philosophy soul is the vital principle of nature—a purely negative principle without thought or emotion of any kind and can unite with the minds or bodies of each and every species of man or animal indifferently, and the [illegible] is the union of the individual soul [illegible] universal soul. হিন্দুদর্শন মতে, [illegible] এক অনাদি ও অস্পৃষ্ট পরমাত্মার [illegible] আত্মা (জীবাত্মা) পাপ ও [illegible] সমাযুক্ত থাকায়, সুকর্ম্ম [illegible] বা অধোগতি প্রাপ্ত হয়—সুতরাং [illegible] হইয়া থাকে—এই জন্য "কুকর্ম্মী মানব [illegible]যোনি প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় কর্ম্মের [illegible] বলেন "জন্ম জন্মান্তরীণ [illegible] পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, এবং [illegible] অভ্যাস, সাধনা ও কল্যাণকৃৎ কর্ম্ম-[illegible] ও সুফল, জ্ঞান ও অজ্ঞান,

[illegible] মতে ব্রহ্মহত্যাপরাধী মনুষ্য তাহার কুকর্ম্মের [illegible] বরাহ, গর্দ্দভ, বলদ, ছাগ, মেষ, সারমেয়, মৃগ, [illegible] পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শস্যাপহারী-[illegible] মশক, দুগ্ধচোর কাক, শণচোর ভেক, এবং বালিকা-অপহারিগণ ভল্লুকরূপে পরিণত [illegible] দ্বাদশ অধ্যায় দেখ)। অবশ্য এ সকল অবস্থা [illegible] বলিয়া শুনা যায়।

সুখ ও দুঃখ, এবং পাপ ও পুণ্য হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়।"

প্রকৃত কথা এই যে, জন্ম হইলেই মৃত্যু হয় ইহা নিশ্চয়, কিন্তু মৃত্যু হইলেই যদি পুনর্জন্ম হয়, একথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জন্ম হইলেই মনুষ্যেরা কর্ম্মের অধীন হয়; কর্ম্মের অধীন হইলেই দোষ ও গুণের সহিত সম্পর্ক থাকে; দোষ ও গুণের সহিত সম্পর্ক থাকিলেই সুখ ও দুঃখের উদয় হয়; সুখ ও দুঃখ জন্মিলেই পাপ ও পুণ্যের সমাবেশ না হইয়া পারে না। সুতরাং পুনর্জন্ম কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্যের "ভোগাভোগ" নহে, বরং নবজন্মের পাপপুণ্যের কারণের কারণও বটে। তাহা হইলে পাপ ও পুণ্য (সুতরাং "ভোগাভোগ") হইতে পরিত্রাণ কোথায়? তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ কোথায়? "ইহজন্মের পূর্ব্বে আমি নানাযোনিতে নানারূপে নানাস্থানে জীবনের ভার বহন করিয়াছি এবং ইহ জন্মের পরে অসংখ্য-যোনিতে অসংখ্যরূপে এবং অসংখ্যস্থানে আমাকে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে"। যদি [illegible] ভিনত্তে [illegible] করা যায়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও বিব[illegible]lution) একেবারে অবিচারের অগ[illegible] করাই প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়। "সমগ্র [illegible] মানবপ্রকৃতি—সমগ্র বিশ্বসংসারে কীটানু [illegible] দিকে অগ্রসর হইতেছে" এই প্রাচীন মহাশয় [illegible] হইলে আর ক্ষণেকের জন্য তিষ্ঠিতে সমর্থ হয় না। [illegible] যদি মনুষ্যের আত্মা ঊর্ণনাভের শরীরে প্রবেশ করিয়া [illegible] মনুষ্যকে ঊর্ণনাভ নামক প্রাণীতে পরিণত করিতে পারে [illegible] একথা সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, শরীরের গুণাগুণের সহিত আত্মার [illegible] সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে শরীর ভিন্ন মনুষ্যত্বে [illegible] সহিত প্রভেদত্বের কোন কারণ দেখা [illegible] thing is really human or animal except [illegible] in each case) কর্ত্তব্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, [illegible] প্রভৃতি যদি কেবল শরীরের প্রভাবের উপরে [illegible] তাহা হইলে এগুলি "গুণ" বলিয়া গণ্য হয় [illegible] বলিয়া পরিণত হয়। (They become [illegible]lly material qualities since they are the result, not of the soul's activity but of the influence upon it of the particular body inhabited for the time being.) তাহা হইলে ব্যক্তিগত পরিচয় (Personal identity) নষ্ট হয় না কি? যদি তাহা হয় তাহা হইলে পাপপুণ্যের কুফল ও সুফল বা "ভোগাভোগের জ্ঞান" কোথায় রহিল? যদি বল, আত্মা শরীরী নহে, সুতরাং ইহার একটা আধারের আবশ্যকতা আছে, অতএব ইহা আত্মাধারী মানবের কল্যাণকৃৎ কর্ম্ম বা অপকৃৎ কর্ম্মের গুণাগুণ অনুসারে একটা দেহকে অবশ্যই আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্ব শাস্ত্রোক্ত আমাদের এই "অদাহ্য, অস্পর্শ, অচ্ছেদ্য, অপচ্য, অনাদি, অমর" আত্মা কি তৈল, দুগ্ধ বা জলের সহিত তুলনীয় যে, উহার একটা আধারের আবশ্যকতা না হইলে চলে না? যদি আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হও তাহা হইলে তাহার সঙ্গে মানবের সূক্ষ্মশরীরের (Spiritual body) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য না হইবে কেন? সূক্ষ্ম-শরীরের (আধ্যাত্মিক দেহের) অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কথাটা বোধ হয় অতি সরল হইয়া উঠে, তাহা হইলে শাস্ত্র ও যুক্তির সামঞ্জস্য সমভাবে সংরক্ষিত হয়।

[illegible] যাঁহারা সুখদুঃখের অবতারণা করিয়া কুকর্ম্ম বা সুকর্ম্মের সংস্কারসঞ্জাত অদৃষ্টের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মকে অদৃষ্টের "কারণ" স্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনুষ্যের শিক্ষা, [illegible] স্বভাব, সংসর্গ, চরিত্র, অভ্যাস প্রভৃতির সহিত [illegible] তাহার সুখ দুঃখ এবং উন্নতি ও অবনতির ঘোর-[illegible] সম্পর্ক আছে তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। মনুষ্যের সুখশান্তি শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি যেমন তাহার নিজের স্বভাবের উপর অনেকটা নির্ভর করে অপরের স্বভাবের উপরেও তাহা অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। একজন মনুষ্য সাধুকর্ম্ম সম্পাদন করিলে দশজনের তাহাতে কল্যাণ সাধিত হয়, একজনের অপকর্ম্মে তদ্রূপ দশজনের অমঙ্গল না হইয়া যায় না। মনে কর একজন পাষাণপাপীর (Stone-hearted sinner) হস্তস্থিত অগ্নিপ্রয়োগে একটা বিপণি জলিয়া

উঠিল, ক্রমে ঐ অগ্নি বিস্তৃত হইয়া সমুদায় বাজারকে ভস্মাবশেষে পরিণত করিল। ইহাতে বাজারের লোকদিগের অপরাধ ছিল কি? ইহাতে ঈশ্বরের উপরে পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করিতে পার কি? কিন্তু বাজারের লোকেরা এই দুষ্ট পাষাণপাপীর সংসর্গ রাখিয়াছিল বলিয়া অথবা তাহাকে বাজারে স্থান দিয়াছিল বলিয়া কুসংসর্গজনিত নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহারা ধনে প্রাণে ধ্বংস হইল। এই সংসার যতই অসার হউক ইহা চরিত্র-গঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় (God puts the earthy man on trial to form a character and to enable him to pave the way to *Moksa.*) কিন্তু সংসার পাপপুণ্যের বা ন্যায়ান্যায়ের সম্পূর্ণ বিচারালয় নহে। প্রত্যেকে যদি নিজের দায়িত্ব ও নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুসরণ করে তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুখদুঃখের কার্য্যকারণ সম্বন্ধজনিত তর্ক লইয়া আমাদিগকে আর মস্তিষ্কালোড়ন করিতে হয় না। সুখ দুঃখ, সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের ফলাফল বটে, কিন্তু এই জগৎ পরীক্ষার প্রশস্তক্ষেত্র বলিয়া একজনকে দুঃখ ও দারিদ্র্যের কঠোরতায় নির্য্যাতিত এবং আর একজনকে সুখ ও শান্তির [illegible] লতায় আনন্দসমাযুক্ত দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

পরী রাজ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—রবিবার প্রাতঃকালে কয়লাঘাট হইতে জাহাজে উঠিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। কলিকাতার পরবর্ত্তী স্থানগুলির দৃশ্য জাহাজ হইতে বেশ সুন্দর। বিবিধ বৃক্ষাদি পরিশোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম; মধ্যে মধ্যে সুবৃহৎ কলঘর। কোনও থানে বা ঠিক নদীবক্ষে সুন্দর সু-উচ্চ সৌধ সকল অধিকারীর ধনগৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এইরূপ নানাপ্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা ১২টার সময় আমি স্বীয় নির্দ্দিষ্টকক্ষে প্রবেশ করিলাম। প্রাতঃকালে খানিকটা চা ও কয়েকখানা কেক্ ভিন্ন আর কিছুই উদরস্থ হয় নাই। তজ্জন্য বেশ একটু ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল।

হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা বিলক্ষণ কর্ম্মভোগ। বিশেষতঃ বর্ম্মাযাত্রীর পক্ষে ইহা বিলক্ষণ কষ্টকর বলিয়া মনে [illegible] জাহাজে [illegible] পাওয়া যায় বটে। কিন্তু অন্ন-[illegible] পক্ষে চারিদিন লুচি খাইয়া থাকা [illegible] তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে [illegible] খানা খাইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে [illegible] নিতান্ত আরামজনক। আমার বোধ হয়, [illegible] মনের মতন সহযাত্রী পাওয়া যায়, [illegible] সমুদ্রভ্রমণের ন্যায় সুখকর ভ্রমণ [illegible] আহারাদির পর ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, যাত্রীরা আপন আপন রুচি ও ক্ষমতা-[illegible]নানাপ্রকার আমোদে লিপ্ত হই-[illegible] চলিতেছে, আশে পাশে [illegible] উভয়পক্ষে নানাপ্রকার মতা-[illegible] কোথাও বা সঙ্গীতালাপ [illegible] কেহ বা আরাম কেদারে অঙ্গ ঢালিয়া [illegible] করিয়াছেন। আবার হয়ত [illegible] যাত্রী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নদীর শো[illegible] উপভোগ করিতেছেন। রেলগাড়ীতে যেম[illegible] উপবিষ্ট থাকিয়া, হয় নীরবে নতুবা

তন্দ্রামগ্ন থাকিতে হয়, জাহাজে তাহার সম্ভাবনা নাই। দিব্য খোলা জায়গা। যাহার যেখানে যতটুকু স্থানের প্রয়োজন, অধিকার করিয়া, নিজ নিজ মনোমত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে পারেন।

বর্ম্মাগামী জাহাজে তিনটি শ্রেণী থাকে। প্রথম, দ্বিতীয় ও ডেক। নিম্নতম শ্রেণীতে কষ্ট অনেক। সমুদ্রে ঝড় বৃষ্টি হইলে যাত্রীগণের সমূহ বিপদ। তাঁহারা যদি ঝড়ারম্ভের অগ্রেই সাবধান না থাকেন, তবে অনেক সময় প্রাণটা পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি পড়ে। ডেক সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা খোলা আকাশ ও নীলসমুদ্রের অবাধসৌন্দর্য্য উপভোগের প্রয়াসী, তাঁহারা উপরের ডেকে আশ্রয় লয়েন। আর যাঁহারা আবদ্ধগৃহে থাকিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা নিম্ন ডেক অধিকার করেন। দেখিতে গেলে উপর ডেকে সুবিধা অনেক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী তাঁহারা নীচের ডেকই পছন্দ করেন। শীতকালের ত কথাই নাই, ভীষণ গ্রীষ্মের সময়ও উপরের খোলা ডেকে রাত্রিকালে [illegible] শীত অনুভব হয়। তদ্ব্যতীত প্রধান বিপদ [illegible] ঝড় বৃষ্টির সময় সেখানে থাকা আর সমুদ্রগর্ভে [illegible] করা প্রায় সমান। কারণ ঝড়ের সময় আকাশস্পর্শী প্রবাহ সকল ঐ ডেকের উপর উপস্থিত হইয়া, [illegible] কিছু থাকে সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যায়। [illegible] হইতে ঝড়ের কথা জানা থাকিলে [illegible] যাত্রীদিগকে ঐ স্থান হইতে সরাইয়া দেন।

কলিকাতা হইতে যখন জাহাজে [illegible] তখন অনেকের হাতে এক একটা সুবৃহৎ [illegible] দেখিয়া আমি চিন্তিত হইয়াছিলাম। শুনিলাম, জাহাজে [illegible] পানীয় জল দেওয়া হয় না। যদি [illegible]

Water, water every[illegible]

But nowhere water [illegible]

এখন দেখিতেছি জাহাজে পানীয়জলের [illegible] দিনের মধ্যে দুইবার 'মিঠাপানী'র কল খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন সকলে ইচ্ছামত জল লইতে পারেন। কিন্তু এ প্রকার সুযোগসত্ত্বেও হিন্দুস্থানী ভায়া[illegible] বড়ই কড়াকড়ি দেখিলাম। তাহারা সঙ্গের যে জল [illegible]-য়াছিল, তাহা ভিন্ন জাহাজের একবিন্দু জল স্পর্শও করিল না। অনেকের দেখিলাম দুইদিনের পর সঙ্গের জল ফুরাইয়া গেল। ভায়ারা, তখন দাঁতে দাঁত লাগাইয়া স্বচ্ছন্দে পড়িয়া রহিল, কিন্তু ম্লেচ্ছের জল লইল না। ভায়াদের হিন্দুয়ানীর বাহাদুরী আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অনক্ষর পশ্চিমবাসীরা অতি সামান্যবিষয়ে যেমন ধরা বাঁধা করেন, এইরকম যদি প্রত্যেক বিষয়ে করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আজ তাঁহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম জাতি হইয়া, সেই জগৎবিশ্রুত মহাভারত রামায়ণ বর্ণিত আর্য্যসন্তান হইয়া অতি হেয় ও নিকৃষ্টভাবে অবস্থান করিতে হইত না।

আমাদের এই জাহাজে সর্ব্বসমেত একুশজন বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী প্রাচীনা বিধবা ভিন্ন আর কাহাকেও পানীয়সম্বন্ধে আদৌ বাঁধাবাঁধি করিতে দেখিলাম না। এ সম্বন্ধে আমাদের বঙ্গীয় সমাজ আজ কাল অনেকটা স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন। এক দিন ছিল, যখন এই সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বঙ্গদেশে হুলস্থূল পড়িয়াছিল। ঐ সময়ে কয়েকজন স্বনাম-প্রসিদ্ধ বঙ্গের সন্তান পর্য্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। কিন্তু আজ কালকার অবস্থা ভাবিলে, তাঁহাদের বিফল আস্ফালন মনে হইয়া হাসি পায়। এখন দেখিতেছি বঙ্গীয় সমাজ প্রত্যেক বিষয়েই স্বাধীনতা দিতেছেন। এখন আর বিলাতে গেলে, ইংরাজের হোটেলে খাইলে বা ব্রাহ্ম হইলে বড় একটা জাতি যায় না। ইহা যে নিতান্ত সুখের কথা তাহাতে আর সন্দেহ কি। স্বদেশে জীবিকা অর্জ্জন দিন দিন যেপ্রকার দুরূহ হইতেছে, তাহাতে আমাদিগকে এখন বর্ম্মা, এডেন, আফ্রিকা, চায়না, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে অগত্যা যাইতে হইবে। তাহার পর ইংরাজরাজ যখন কোনমতেই এদেশে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রচলিত করিবেন না, তখন আমাদিগকে নিশ্চয়ই তাঁহাদের দেশে যাইয়া সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এইরূপ নানাপ্রকার কারণে আমাদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা, ও আহারে স্বাধীনতা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় আমরা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইলাম। আমাদের জাহাজ "পাণ্ডুয়া" জাহ্নবীর

দক্ষিণকূল ঘেঁসিয়া নোঙ্গর ফেলিয়াছিল বলিয়া আমরা সঙ্গমস্থানের দৃশ্য পূর্ণ উপভোগ করিলাম। সেই কলিকাতার গঙ্গার আর এই গঙ্গার আকাশ পাতাল প্রভেদ। এইস্থানে নদীর বিস্তৃতি প্রায় পাঁচ মাইল। দুরবীণ ভিন্ন অপর কূল দৃষ্টিগোচর হয় না। সহসা দেখিলে নবাগত যাত্রী স্থানটী সমুদ্র বলিয়া মনে করিতে পারেন। প্রভেদের মধ্যে— এস্থানে জলের রং ঘোর কর্দ্দমময়।

সঙ্গমস্থানে প্রত্যেক বৎসর মকরসংক্রান্তির সময় তিন-দিন ব্যাপী মেলা বসে। ঐ সময়ে দেশদেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র হিন্দুযাত্রীর সমাবেশ হয়। মেলাস্থানে একটী ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলাম। সে স্থানে যাত্রীদিগকে অবতরণ করিতে দেওয়া হয় না বলিয়া, আমার অদৃষ্টে তাহার দর্শন ঘটিল না। অভিজ্ঞব্যক্তির মুখে শুনিলাম, মধ্যে মন্দির মহর্ষি কপিলের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মেলার সময় ভিন্ন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকে।

সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সেই দিন রাত্রে আমরা সমুদ্রে পড়িলাম। অন্ধকার রাত্রে খোলা ডেকের উপর বসিয়া আসা বিশেষ প্রীতিজনক নহে। সেই জন্য সে রাত্রি আর সমুদ্র দর্শন ঘটল না। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম,

"আকাশ চাহিয়া থাকে সাগরের পানে,
সাগর আকাশে চায় অবাক নয়নে।"

আমার জীবনে এই প্রথম সমুদ্রদর্শন। নানাপ্রকার ইংরাজি সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার পুস্তকে সমুদ্র সম্বন্ধে অতি উচ্চ অঙ্গের প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। মনে করিতাম সাগর, সৃষ্টিকর্ত্তার এক মহান্ সৃষ্টি। কিন্তু তাহা যে কতদূর মহান্, কিরূপ বিশাল তাহা আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। তখন মনে হইল ইহার মহত্ত্ব বিশালতা গাম্ভীর্য্য সামান্য মানবিক ভাষায় প্রকাশ হইবার নহে! আমি বহুক্ষণ ধরিয়া অবাক হইয়া সেই অনন্ত মহানের মহত্তম সৃষ্টির পানে চাহিয়া রহিলাম। নিজের ক্ষুদ্রত্ব সসীমত্ব ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইলাম। দূর দূর—অতিদূর যতদূর দৃষ্টি যায়—সেই অনন্ত নীলাম্বর পানে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম যেথানে আমার দৃষ্টির সীমার শেষ সেখানে নীলবারিধি ও অনন্ত-নীল অম্বরের সোহাগ সম্মিলিত হওয়াতে সমগ্র সংসার যেন নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বুঝিলাম এই অনন্তের রাজ্যে আমাদের জাহাজস্থ কয়েকটী প্রাণী ব্যতীত আর কোন প্রাণী নাই। তখন আমরা সমুদ্রকূল হইতে প্রায় আটশত মাইল দূরে দূরে (অবশ্য উত্তরদিকে দক্ষিণদিকে ভারতমহাসমুদ্র। তাহার সীমানা কতদূরে বলা দুঃসাধ্য ব্যাপার) যাইতেছিলাম বলিয়া কোনও প্রকার সামুদ্রিক পক্ষীও দেখিতে পাইলাম না। কেবল মধ্যে মধ্যে উড্ডীয়মান মৎস্য আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছিল। আর কিছু না পাইয়া তাহাদিগের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

ইহাদিগকে উড্ডীয়মান মৎস্য না বলিয়া লম্ফমান মৎস্যনামে অভিহিত করা বিধেয়। ইহাদের পাখা আদৌ নাই। সাধারণ মৎস্যের যেমন থাকে ইহাদেরও অবিকল সেইরূপ আছে। তবে সাধারণ হইতে ইহাদের বিস্তৃতি কিছু অধিক বলিয়া ইহারা তাহার সাহায্যে জল হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া হাত তিন চার গমন করিতে পারে। তাহার পর ক্লান্ত হইয়া জলে পড়িয়া যায়। শুনিতে [illegible] প্রাণি-তত্ত্ববিদেরা বলেন এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য [illegible] সামুদ্রিক বৃহত্তর মৎস্যসমূহদ্বারা আক্রান্ত হয়। [illegible] করুণাময় জগদীশ্বর ইহাদের আত্মরক্ষার্থ এই নূতন ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। এই অতলসাগরে এই [illegible] মৎস্যের অস্তিত্ব যে নিতান্ত অলৌকিক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

[illegible] দিবস প্রাতঃকালে সমুদ্রের এক নূতন ভাব। সাগরের সে নীলবর্ণ আর নাই। এখন সমুদ্রমূর্ত্তি গভীর [illegible]। ভারতবাসীরা সাগরের এই [illegible] ও ভূগোলে ইহাকে 'ভারতমহাসমুদ্র' [illegible] করিয়া থাকে। ইহার অধিকাংশ [illegible] বলিয়া ইহার বর্ণ এক প্রকার পাথুরে [illegible]। এস্থানে কোনপ্রকার মৎস্য [illegible] সামুদ্রিক জীব দেখিতে পাইলাম না।

[illegible] দিবস প্রাতঃকালে আমরা আরাকানস্থ পর্ব্বত[illegible] দেখিতে পাইলাম। ইহা আমাদের জাহাজ হইতে প্রায় চারিশত মাইল দূরবর্ত্তী বলিয়া

ঐরূপ অস্পষ্ট দেখাইতেছিল। ঐ দিবস বেলা তিনটার সময় বেসীন নগরস্থ আলোকস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। ঐ স্থানে অনেকগুলি জাহাজ জলমগ্ন পর্ব্বতকবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে ঐ লোকহিতকর অমরকীর্ত্তির সংস্থাপনা করিয়াছেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় আমরা রেঙ্গুন খাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী হইলাম। সন্ধ্যার পর খাড়ীর মধ্যে প্রবেশ নিষেধ বলিয়া সে দিবস আমাদিগকে জাহাজেই রাত্রিবাস করিতে হইল।

ভাগীরথীর ও রেঙ্গুন খাড়ীর মধ্যে প্রভেদ বিস্তর।* প্রথমটীর দৈর্ঘ্য প্রায় নব্বই মাইল। অপরটি পনর মাইলের অধিক নহে। যাঁহারা কখনও সমুদ্রগামী জাহাজে আরোহণ করিয়া 'গঙ্গাসাগর' পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে জাহাজ কখনও গঙ্গার এ কিনারা কখনও ও কিনারা, আবার কখনও বা মধ্যস্থান দিয়া গমন করিতেছে। এই খাড়ীর গভীরতা সর্ব্বত্র সমান নহে বলিয়া জাহাজ ঐরূপভাবে গমন করে। হিসাবের সামান্য এদিক ওদিক হইলেই জাহাজ মৃত্তিকায় লাগিয়া যাইতে পারে। কিন্তু রেঙ্গুনের দৈর্ঘ্য নিতান্ত অল্প ও গভীরতাও প্রায় সর্ব্বত্র সমান।

এই স্থানে আর একটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা আবশ্যক। জাহাজ চালাইবার জন্য সচরাচর দুই জন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। ইঁহাদের মধ্যে একজন পাইলট্ ও অপর জন কাপ্তেন। নদীর মধ্যে জাহাজ পাইলটের হাতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জাহাজ সমুদ্রে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ কাপ্তেনের কোনই প্রয়োজন নাই। সমুদ্রে জাহাজ চালান অপেক্ষা গঙ্গার খাড়ীর মধ্যে চালান কঠিনতর বলিয়া বর্ম্মাগামী জাহাজে পাইলটের বেতন অধিক হয়।

পর দিবস বেলা সাতটার [illegible] রেঙ্গুন বন্দরে প্রবেশ [illegible] ব্যক্তিগণের নিকট [illegible] রেঙ্গুন কলিকাতা হইতে শ্রেষ্ঠ [illegible] ঠিক সমুদ্রের উপর হওয়াতে সভ্যজাতির সমস্ত জাহাজই এখানে উপস্থিত হয়।

এতাধিক জাহাজের সমাবেশ ভারতবর্ষে এক বোম্বাই ভিন্ন কুত্রাপি দেখা যায় না। ইংরাজ এইজন্য ইহাকে "বন্দরের রাণী" নামে অভিহিত করেন। জাহাজ হইতে সহরের যতটুকু অংশ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে ইহা বিলক্ষণ সুন্দর বলিয়া বোধ হইল।

রেঙ্গুনে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। 'কোথায় যাইব' 'কি করিব' তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আমি জাহাজের রেলিং ধরিয়া দিব্য নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী সহযাত্রীবন্ধু কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন?" আমি উত্তর দিলাম যে, যখন এ সহরের কাহাকেও আমি চিনি না, তখন খুব সম্ভবতঃ আমি কোনও দোকানে যাইয়া আশ্রয় লইব। বিশেষ আমাকে যখন উত্তরব্রহ্মে যাইতে হইবে, তখন দুই এক দিনের জন্য কোনও বাসা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "ইহা ভারতবর্ষ নয়! এখানে দোকানে থাকিবার প্রথা একেবারে নাই। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার বাসায় যে কয়দিবস ইচ্ছা থাকিতে পারেন।" বলা নিষ্প্রয়োজন আমি নিতান্ত আনন্দিতচিত্তে তাঁহার সেই অযাচিত প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কথায় কথায় শুনিলাম, আমাদের পশ্চিমভারতবর্ষের স্বজাতি ভায়ারা এখানে একটি সাধারণ দেবীমন্দির স্থাপনা করিয়াছেন। প্রভেদ এই যে সেখানে এপ্রকার মন্দিরে সর্ব্বত্র 'করালবদনা লোলজিহ্বা কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর এখানে সৌম্য-দর্শনা দশভুজা মূর্ত্তি। বিশেষতঃ এখানে ঐ সকল 'কালী বাড়ীর' ন্যায় প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের থাকিবার জন্য কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই।

এই সময়ে ভারতে প্লেগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। তজ্জন্য জাহাজ হইতে নামিয়া আমাদিগকে বেশ একটু যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছিল। কুলীরা আমাদের সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া একটা ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া গেল, তথায় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল প্রতীক্ষা করিবার পর আমাদের ট্রাঙ্ক প্রভৃতি খুলিবার [illegible] হইল। এই নূতন ধরণের আদেশের

* [illegible] খাড়ীর একটু বর্ণনার প্রয়োজন [illegible] সাগর পর্যন্ত ভাগীরথীর [illegible] সেইরূপ সমুদ্র হইতে রেঙ্গুন সহর [illegible] নদী, তাহাকে সচরাচর [illegible]

কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম যে, আমাদের সমস্ত দ্রব্যাদি 'ডিস্ইন্ফি ক্টিং-ধূম' দ্বারা 'ধূমিত'(?) করা হইবে। অবশ্য এসম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ আপত্তি সত্ত্বেও, অবশেষে আমাকে সম্মত হইতে হইল। 'ধূমিত' হইবার পর দেখিলাম, আমার নূতন খরিদ করা ট্রাঙ্ক ও দিব্য বাসি করা ধূতি, সার্ট প্রভৃতি এক অদ্ভুত বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দ্রব্যাদি যে সমস্ত আবার আস্ত ফিরিয়া পাইলাম, তাহাই পরম সৌভাগ্য এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেস্থান ত্যাগ করিলাম।

এই স্থানে আনুষঙ্গিক দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। জাহাজের যে সকল যাত্রী রাজবেশ (অর্থাৎ হ্যাটকোট এবং নেক্‌টাই) পরিধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার মত 'ধূমিত' হইবার নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে 'ডেক্ প্যাসেঞ্জার' ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজবেশ তাঁহাদিগকে কি প্রকার সাহায্য করিল দেখিয়া আমার মত নেটিব-পোষাক-পরিহিত সেকেন-ক্লাস-যাত্রীর চৈতন্য হওয়া উচিত! কিন্তু নিতান্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, জাহাজের উপর কর্ত্তৃপক্ষ নেটিব ও গৌরাঙ্গের বড় পার্থক্য রাখেন না। তথায় ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত যথেষ্ট সুব্যবহার করা হয়। এমন কি তথায় শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদিগকে পর্য্যন্ত যথেষ্ট ভদ্র বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা অনেক সময় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 'কালা' যাত্রীর সহিত বেশ প্রাণ খুলিয়া আলাপ পরিচয় করেন। ইহা সামুদ্রিক বায়ুর গুণ বা ভারতের মাটির দোষ, তাহা বলিতে পারি না।

জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া এক নূতন দৃশ্য দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। জাহাজ-ঘাটে যে প্রায় আড়াই-শত কুলি যাত্রীদিগের মোট লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে সকলেই ভারতবর্ষীয়। শুনিলাম বর্ম্মার দরিদ্র অধিবাসীরা ভিক্ষাদ্বারা প্রাণধারণ করিবে তাহাও স্বীকার, তথাচ কুলিগিরি করিবে না। বিশেষ, ভারতবাসীর নিকট তাহারা প্রাণান্তেও কুলিগিরি করিতে সম্মত হয় না। ইহার জন্য ইংরাজ নানাপ্রকার কৌশল ও [illegible] অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা কো[illegible] মতে সফলমনোরথ হয়েন নাই। শুধু যে রেঙ্গুনে এইরূপ ব্যাপার, তাহা নহে। বর্ম্মায় সর্ব্বত্রই তাহারা এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হায় ভারতবাসি! তোমার মত দরিদ্র জগতে বুঝি আর কেহই নাই। মারীচ, নেটাল, সিংহল, আণ্ডামান, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ভারতের দরিদ্র ও হতভাগ্য অধিবাসীরা কুলিগিরি করিতে গমন করে। তাহারা স্বদেশ, স্বজাতি ও পরিবারবর্গের মায়া কাটাইয়া সামান্য একমুষ্টি অন্নের জন্য বৈদেশিকগণের অনির্ব্বচনীয় ও অমানুষিক অত্যাচার স্বচ্ছন্দে সহ্য করে। বিশাল ভারতে তাহাদের জন্য একমুষ্টি অন্ন নাই। শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

নবাবিষ্কৃত একখানি বিদ্যাসুন্দর।*

(বঙ্গ-সাহিত্যে ৬ষ্ঠ 'বিদ্যা-সুন্দর' কাব্যের আবিষ্কার)।

গত বৎসর নিধিরাম কবিরত্ন নামক কবির রচিত একখানি নূতন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আবিষ্কার হইয়াছিল। তাহা "বঙ্গ-সাহিত্যের" "পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর"। তদ্বিবরণ, বঙ্গীয়পাঠকবৃন্দের নয়নগোচরে উপস্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর একখানি প্রাচীন 'বিদ্যাসুন্দর' আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন হইলেও, উহার 'নূতন' আখ্যা প্রদানে আমাদের অধিকতর অধিকার আছে। কেননা, উহার অধুনা অস্তিত্ব, এইমাত্র সপ্রমাণ হইতেছে। এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান অবলম্বনে যথাক্রমে যে পাঁচ জন উচ্চদরের বাঙ্গালার কাব্যকার, "বিদ্যাসুন্দরের" রচনা করেন, তাঁহাদের নাম :—

(১) কৃষ্ণরাম।
(২) রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন।
(৩) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
(৪) প্রাণরাম।
(৫) নিধিরাম।

কৃষ্ণরাম—১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে, রামপ্রসাদ—১৭২৩ ও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ-মধ্যে কোন সময়ে, ভারতচন্দ্র—১৭৫২ খৃষ্টাব্দে, নিধিরাম—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বা ভারতের "বিদ্যাসুন্দর" রচনার পঞ্চ বৎসর পরে, তাঁহাদের নিজ নিজ কাব্য রচনা করেন। আমাদের অদ্যকার আলোচ্য-কাব্যখানি কখন প্রণীত হয়, তাহার নিরূপণ সহজ কাজ নহে। কেননা, পুরাতন পদার্থ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। কিন্তু, ইহার যে পাণ্ডুলিপিখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহার লিপি-কালই এগার শত ষোল "মঘি" অর্থাৎ ১৭৫৪—৫৫ খৃষ্টাব্দ। মূল গ্রন্থখানি যে ইহার অন্ততঃ কিছু পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও, এক প্রকার চলে। সুতরাং, আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি, ইহা অন্ততঃ "ভারত," "নিধিরাম" এবং "প্রাণরামের" "বিদ্যাসুন্দরের" পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভাষাদি আলোচনা করিলেও, আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ মিলিবে। খুব সম্ভব—এই 'বিদ্যাসুন্দর'-খানিই বঙ্গ-সাহিত্যের তৃতীয় গ্রন্থ; কিন্তু সময়-ক্রম বাদ দিয়া বলিতে গেলে, ইহাকে বঙ্গ-সাহিত্যে "ষষ্ঠ বিদ্যাসুন্দর" বলিলে নিতান্ত নিন্দনীয় বিষয় বলিয়া, বাঙ্গালী-পাঠক মহলে বিবেচিত না হইবার কথা।

কালিকা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশ্যেই বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানের সৃষ্টি। তাই ঐ সকল কাব্যের প্রায়শঃ একই নাম। বিভিন্ন দেশবাসী-কবিগণের মধ্যে গ্রন্থের নামকরণ বিষয়ে এরূপ সৌসাদৃশ্য, একটু বিস্ময়াবহ বটে! "কৃষ্ণরাম," "রামপ্রসাদ," "নিধিরাম"—এই তিন কবিরই গ্রন্থের নাম এক,—"কালিকা মঙ্গল"। ভারতচন্দ্র "[illegible]" কাব্যখানি, তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলের' অন্তর্গত।* "প্রাণরামের" গ্রন্থেরও ঐরূপ একটা নাম হইবার সম্ভাবনা। সমালোচ্যমান গ্রন্থখানি, কবির 'কালিকা মঙ্গল' নামক কাব্যের অন্তর্গত একটি অংশবিশেষ।

এই 'কালিকা মঙ্গল' একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। উহা পুঁথির আকারে ১৪৭ পত্রে সমাপ্ত।* উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। কাগজ তাম্রকূট পত্রের (তামাক গাছের পাতার) ন্যায় দেখায়। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দেবরাজ্যে দেবী মাহাত্ম্য প্রচার। দ্বিতীয় ভাগে 'সুরথ' রাজা ও 'সমাধি' বৈশ্যের উপাখ্যান। তৃতীয় ভাগে বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান। চতুর্থ ভাগে আমাদের অদ্যকার বর্ণনীয় বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান, সুন্দররূপে বর্ণিত।

৭৮ পত্রে গ্রন্থের ১ম ভাগ, ৯৫ পত্রে ২য় ও ৩য় ভাগ, আর ১৪৪ পত্রে ৪র্থ ভাগ সম্পূর্ণ। অবশিষ্ট কয়টি পত্রে 'অষ্ট-মঙ্গলার' কথা।

ইহার রচয়িতার নাম "গোবিন্দ দাস।" গ্রন্থের এক স্থলে তাঁহার এই সামান্য পরিচয়টুকু আছে :—

"আত্র (আত্রেয়) গোত্র দাস কুল,
জন্ম মোর আদি মূল,
চিরকাল নিবাস দিআঙ্গে।"

উক্ত দিআঙ্গের (দেয়াঙ্গের) প্রকৃত নাম 'দেবগ্রাম'। ইহা চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী একটি গ্রাম ও চাক্‌লারও নাম বটে। কি কারণে জানি না, এখন উভয়েরই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'আনোয়ারা' হইয়াছে।

'আত্রেয়' গোত্রীয় কায়স্থগণ, বর্ত্তমান সময়ে 'আনোয়ারা' হইতে উঠিয়া গিয়া, 'সাতকানিয়া' থানার অন্তর্গত 'ধর্ম্মপুর' ও 'আমিলাইস্' গ্রামদ্বয়ে বাস করিতেছেন। তাঁহারা কবির অধস্তন বংশধর কিনা, অনুসন্ধানে আজও জানিতে পারি নাই। তদ্বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, পশ্চাৎ সাহিত্য-সমাজের গোচর করিতে পারিব, আশা আছে। চট্টগ্রামে প্রচলিত 'বাইশ কবি মনসা' পুঁথিতেও গোবিন্দ দাসের [illegible] ভণিতা অবলোকিত হইতেছে।

এই প্রোক্ত 'সুন্দরের' বাসস্থানের নাম "কাঞ্চন

* এই প্রবন্ধ [illegible]-সন্দর্ভ-লেখকের অধুনা স্বর্গগত পূজ্যপাদ পিতৃদেব গো[illegible] বেদরত্ন-চূড়ামণি গোস্বামী মহোদয়ের সংগৃহীত পুঁথি [illegible] ও তাঁহার প্রদত্ত [illegible] উপদেশ [illegible]। [illegible] উক্ত [illegible] বিদ্যাসুন্দর" ৯ম বর্ষের 'পূর্ণিমার' ১০ম ও ১১শ সংখ্যায় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ [illegible] "পরিষৎ-পত্রিকার" ১৩০৯ সালের ৪র্থ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

* ভারতের বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কালিকা মঙ্গল' [illegible] সম্প্রতি জানা গিয়াছে। [illegible] ভাগ প্রথম সংখ্যক 'পরিষদের' "বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণে" ২০৮ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।

* ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ১৩০৯ সালের "পরিষদের" ২য় [illegible] সংখ্যায় "পুঁথির বি[illegible]" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

নগর," পিতার নাম 'গুনিসার,' মাতার নাম 'কলাবতী,' মালিনীর নাম 'সুলোচনা'।

অপর কোন কোন স্থলেও ভারতচন্দ্রাদির সহিত কিছু কিছু পার্থক্য আছে। হস্তলিখিত পুঁথির আলোচনা করা বড়ই আয়াস-সাধ্য। সেজন্য আমাদিগকে সংক্ষেপেই কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে।

ইহাতে সুন্দর ও বিদ্যার জন্মবৃত্তান্ত ও বাল্যলীলা পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত মাত্রায় বর্ণিত। পূর্ব্ব জন্মে "সুন্দর" 'পুষ্পদন্ত' ও "বিদ্যা" 'হেমমালি' ছিলেন। কাব্যে মাধব ভট্টের ঘটকালীটা আছে। মালিনীর সহিত "সুন্দর" সুন্দর প্রণালীতে মিলিত হইলেন; কিন্তু, 'ভারত'-বিবৃত হাট বাজারের 'বেসাতির' কোন 'লেখাজোখা' নাই। মালিনীর নিকেতনে অবস্থান-কালে সুন্দর কর্ত্তৃক গৌরী দেবীর আরাধনায় ও তাঁহার আরাধ্যা গৌরীর বরে :—

"শুষ্ক কাষ্ঠে মঞ্জুরি হৈল মন্ত্রের প্রতাপে।"

এবং

"এবার বৎসর হৈল, যে বৃক্ষে অঙ্কুর না হৈল,
তাহে পুষ্প গন্ধ মনোহর।"

সুন্দর মালা গাঁথিয়া দেন। মালিনী তাহা লইয়া বিদ্যাকে দেয়; কিন্তু, মালিনীর এ চাতুরী ধরিতে বিদ্যার বিলম্ব হইল না। বিদ্যার জোর জবরদস্তিতে অগত্যা মালিনী, সুন্দরের পরিচয় বলিতে বাধ্য হয়। যেই পরিচয়—অমনিই দরশনাভিলাষ! কিন্তু দেখা হয়—কিরূপে? কথা হইল—নারায়ণকে ফুলদোলে চড়াইয়া ভ্রমণ করান হউক। উদ্দেশ্য এইরূপ যে—তাহাতে কীর্ত্তন, বাদ্য-বাদনাদি চলিবে। নানা লোকের মধ্যে সুন্দরও থাকিবেন। কিন্তু :—

"এই চিন (চিহ্ন) থাকে যেন কুমার সুন্দর।
শঙ্খ ঘণ্টা করেতে যেন দিব্য চামর॥"

রাজকুমার এবম্বিধ অভিলাষ—সেই সাধ পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে কেন? তার পর 'বিদ্যার' মন্দিরে যাতায়াতের ব্যাপার। কালিকার বরে সুড়ঙ্গের প্রয়োজনীয় পথ প্রস্তুতীকৃত হইল। [illegible] ন "বিদ্যা"-উৎ-কণ্ঠিত চিত্তে সখীগণ-সঙ্গে "সুন্দরের" আগমন-প্রতীক্ষায় 'পথিদত্তনেত্রা' হইয়াছিলেন,—

"হেন হি সময়, নৃপতি-তনয়,
গেলেন মন্দির-মাঝে।
দেখিয়া স-চকিত, কুমারী লজ্জিত,
লুকাএ সখীর সমাজে॥"

চোর ধরিবার কৌশলটি ঠিক 'রামপ্রসাদ' ও 'নিধিরাম কবিরত্নের' অভিব্যক্ত সমস্ত কৌশলের মত। সেই কৌশল সকল, অপর কিছুই নহে—কেবল 'বিদ্যার' মন্দিরের কপাটাদিতে সিন্দুর মাখিয়া দেওয়া। তাহার পরের কার্য্য, অত্যন্ত আশ্চর্য্য। যথা—রজককে বলিয়া রাখা হইল—সিন্দুর মাখা কাপড় পাইলেই, যেন সে—রাজ-সরকারে সন্দেশ প্রেরণ করে। কাপড় ধরা পড়িলে কোটালগণ মালিনীর বাড়ী বেষ্টন করিয়া লয়। "সুন্দর" স্ত্রীবেশে "বিদ্যার" গৃহে থাকিলেন। নাছোড়বান্দা কোটাল, আর এক ফাঁদ পাতিল। গর্ত্ত খনন করিয়া বিদ্যার সখীদিগকে তাহা পার হইতে বলা হয়। তাহাতেই সুন্দর ধরা পড়েন। কোটাল-সমীপে বিদ্যার অনেক বিফল বিলাপ-রোদন ব্যাপারের বিষয় আছে। কিন্তু মালিনীর প্রতি কোনই ব্যবস্থা করা হয় নাই। আর আর বিষয়ে 'ভারতচন্দ্রে'র সহিত কোন অনৈক্য নাই। তবে এই গ্রন্থে সেই সমস্তই, কথঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিব্যক্ত।

আদিরসের ছড়াছড়িতে 'ভারতচন্দ্র' আপন গ্রন্থ কলুষিত করিয়াছেন। সেই বিষয়ে "গোবিন্দ দাস" একরূপ নিষ্কলঙ্ক। ইহাতে 'চৌর পঞ্চাশতের' মূল শ্লোকগুলি নাই; কিন্তু ভাবানুবাদ আছে। 'ভারতচন্দ্র' চৌত্রিশাক্ষরে কালিকা স্তুতি করিয়াছেন। "গোবিন্দ দাস" কর্ত্তৃক সেই বিষয়, "বিদ্যার" রূপ বর্ণনায় পরিণত। পাঠক-পাঠিকারা, "চৌত্রিশার" একটু নমুনা দেখুন :—

"[illegible] খগেন্দ্র সমান নাসা নিন্দি খঞ্জন নয়নী।
[illegible] কুন্তল বিদ্যার লোটাএ ধরণী॥
[illegible] এ রসিক রাজা কহে থরতর।
[illegible] খণ্ড খণ্ড কর কুমার সুন্দর॥

গজেন্দ্রগামিনী বিদ্যা গন্ধ চন্দনে।
গৌর দেহ কান্তি গুণী কথ গুণে॥
গগনের শশী জিনি মুখের মণ্ডল।
গলে গজমতি বিদ্যার করে ঝলমল॥" ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে বিদ্যার "বারমাস্যা"র বর্ণনাভাব।

"ভারতচন্দ্রের" কবিত্ব-মুগ্ধ পাঠকগণের নিকট এই গ্রন্থের কবিত্ব-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা বৈ আর কিছুই নয়। "ভারতচন্দ্র" পূর্ব্বতন কবি সকলের মস্তকে হাত বুলাইয়া নিজে যে বাহাদুরী মারিয়া লইয়াছেন, তাহার নিকট অন্য সকলকেই হার্ মানিতে হইবে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি আমাদের এই কবি, "ভারতের" পূর্ব্ববর্ত্তী এবং "কৃষ্ণরাম" ও "রামপ্রসাদ" কবিরঞ্জনের পরবর্ত্তী। বোধ করি, তিনি পশ্চাদুক্ত দুই কবির রচিত গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাহা হইলে, তাঁহার কাব্যখানি, ভিন্ন বেশে বাহির হওয়ার পক্ষে আমরা কোন বাধা দেখিতেছি না। তিনি তেমন উচ্চ ধরণের কবিত্বসম্পদ-সম্পন্ন না হউন, নিতান্ত হীনও ছিলেন বলিয়া বলিতে পারি না। তিনি যে সুশিক্ষিত ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে পদে পদেই তাহার পরিচয় বিদ্যমান। তাঁহার "কালিকা-মঙ্গলের" প্রথমাংশ, বিবিধ ছন্দের ঝঙ্কারে মুখরিত এবং লালিত্যে ও মাধুর্য্যে অতি উপাদেয়। উক্ত অংশের স্থানে স্থানে এমন রচনা আছে, যাহা পাঠ করিলে, তাঁহাকে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি 'গোবিন্দ দাস কবিরাজ' বলিয়া ভ্রম হয়। এখন কালিকা-মঙ্গল হইতে কয়েক স্থান দেখাইবার ইচ্ছার অপ্রতিহত গতিরোধে আমাদের অসামর্থ্য। প্রস্তাব্য বিষয় এই খানেই উপন্যস্ত হউক :—

(১)

"রঙ্গ-নাথ লোক-পাল, অঙ্গ-রাগ বাঘ-ছাল,
ব্যোমকেশ শেষ মাল, ভালে ইন্দুমোহিনী॥
সঙ্গে ভৃঙ্গী নন্দী তুঙ্গ, গলে মাল শ্যাম-অঙ্গ,
ভূত প্রমথ যূথ যূথ, নন্দী নন্দ গায়নি।
সেবি' চন্দ্রচূড়, লোভ-মোহ-ক্ষোভ দূর
লাখ লাখ নাগ-ভাগ, তার ধিক্ মাননি।
অতুল চরণে সার, প্রণতি-ভকতি বার বার,
দাস দাস আশ, "গোবিন্দ দাস" গায়নি॥"

(২)

"চামুণ্ডা প্রচণ্ডা কালী, সংগ্রামে প্রচণ্ডা ভালি,
সংহারি' অসুর-মুণ্ড মাল পিন্ধহি।
খড়্‌গ-খট্টা-রঙ্গ-ধারী, দেবরাজ-বৈরী মারি'—
অট্ট অট্ট হাসি হাসি,' ঢুলি' ঢুলি' গিরহি॥"
—ইত্যাদি।

(৩)

"অরুণ পঙ্কজ, পূজিত পদ-তল,
চারু-চন্দন-চর্চ্চিতা।
বিরিঞ্চি-আধার, রুদ্র ঈশ্বর,
সকল-সুর কুল-সেবিতা॥"
—ইত্যাদি।

(৪)

"অভয় বরদ দক্ষিণ পানি,
শিব-শব-রূপ-বাহিনী,
ভুবন-তুলন খাবর-পূরণ,
বৈরি-রুধির পিবনি।
"গোবিন্দ দাস," ভকতি-আশ,
পরম সানন্দ গায়নি।
অভয়-চরণে, মাগহু শরণ,
দেহি পতিত-পাবনী॥"

এরূপ নানা ছন্দোবদ্ধ অংশ, আরও অনেক পরিমাণে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু "কালিকা-মঙ্গল" আমাদের অদ্যকার আলোচ্য নহে; সুতরাং অধিক উদ্ধৃতি কি অতীব অনাবশ্যক নয়? গ্রন্থ-মধ্যে কবিপ্রবর স্বীয় বাসস্থানের উল্লেখ না করিলে, তাঁহাকে উক্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি "গোবিন্দ দাস" বলিয়া অবধারিত করিতে সম্যক্ সঙ্কোচ হইত কি না, বলা যায় না। তিনি এরূপ সুকবি হইলেও, তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" আশানুরূপ হয় নাই কেন? এই এক জিজ্ঞাসা। পূর্ব্বের অনুমিতি ব্যতীত ইহার আরও একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে। তিনি কালিকা-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গ্রন্থ লিখিতে বসিয়াছিলেন; সমালোচ্য কাব্যখানি লিখিতে বসেন নাই—এই কথাগুলি ভুলিয়া না গেলে, তাঁহার এই কাব্যরচনার ত্রুটি বহু-পরিমাণে লঘু হই[illegible]ঠ না কি? বিদ্যাসুন্দরের আখ্যানটি

বর্ণনা করা যে তাঁহার পক্ষে প্রাসঙ্গিক মাত্র, কিন্তু মুখ্য লক্ষ্য নহে, তাহাতে আর সংশয় কোথায়?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থে সবই সামান্য মাত্রায় বর্ণিত। নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলিতে পাঠকগণ, তাহার প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার।

"রাণী বোলে কি হইল, কি প্রমাদ পড়িল,
প্রতিজ্ঞা করিলা কি কারণ।
হৈল বড় কলঙ্কিনী, প্রতিজ্ঞা করিলা কেনি,
কোন হেতু হৈল কোন্ কাজ?
তোর চিত্তে নাহি ভয়, শোন্ দুষ্ট পাপাশয়,
জগত ভরিয়া থুইলে লাজ॥"

* * *

"মুখ্যা রাণী বোলে ঝি গো তোমার তরে বলি
কেমেন নাগর-সঙ্গে কৈলা রস-কেলি॥
এই অন্তঃপুরী-মধ্যে কার গতাগতি!
বিবাহ নহি হয়ে তোর হইলি গর্ভবতী॥"

বিদ্যার উত্তর ঃ—

"বিদ্যা বোলে মা গো! আমি কিছু নহি জানি।
আচম্বিতে শরীরেতে কি বাড়ে দিনে দিনে॥
প্রাণ ছট্ ফট্ করে মুখে উঠে বাও।
না জানি শরীরে মোর পূরি আছে আও (আয়ু)॥"

'সুন্দর'কে গ্রেপ্তার করিবার সময়ে ঃ—

* * *

"দেখিবারে আইলেক নগরী-সকল॥
হার গাথিবারে ছিল কোন রমণী।
করে মালা লইয়া সে চলিল অমনি॥
কোন রমণীএ (ছিল) আঁচুড়িতে কেশ।
দেখিতে চলিল সে সুন্দরের বেশ॥
কোন সিমন্তিনী ছিল বালক লৈয়া কোলে॥
সুন্দর দেখিতে সেই ওই রঙ্গে চলে॥
যেবা যেই রীতে ছিল, যেমত সন্ধানে।
সেরূপে দেখিতে যায় নৃপতি-নন্দনে॥"

কথাগুলি পড়িয়া, শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী আহির রমণীগণের ছবি মানসপটে অঙ্কিত হয় ন[illegible]? বৈষ্ণব কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইলে, এই কবি সাহিত্য-সংসারে নিঃসন্দেহে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইতেন। নিম্নোদ্ধৃত গীতে আমাদের এই কথা কতকটা সপ্রমাণ হইবে। "সুন্দর" স্বদেশ গমনোদ্যত হইলে "বিদ্যা" গাহিয়াছিলেন ঃ—

সুহি (সুহই)।

"সজনি সই, প্রাণ-বন্ধু যাইবেন মধুপুর।
ছাড়িব গোকুল-বাস, জীবনের কিবা আশ,
বধ-ভাগী হইল অক্রূর॥ ধ্রু।
এই সেই বৃন্দাবন, কেলি কৈলা অনুক্ষণ,
বসিয়া গাঁথিল পুষ্পমালা।
যথ * সখিগণ এই, প্রাণ-সুন্দর কই,
কথ † না সহিব দেখ জ্বালা॥
আর না দেখিব কানু, আর না শুনিব বেণু,
আর না করিব লাস-বেশ।
এমন বেথিত ‡ থাকে, বন্ধুরে বুঝাইয়া রাখে,
বিধি বিনু নাহি উপদেশ॥
ছাড়িব গোকুল-চন্দ্র, প্রাণে না জীবেক নন্দ,
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ দৈবে, অনুমান করি সবে,
সবের আগে মরিবেক রাধা॥
মথুরার নারী যথ, হর আরাধিল কথ,
জিনিতে কামের ফুল-ধনু।
'দাস গোবিন্দ'-বাণী, বন্ধুর গমন শুনি'—
যমুনাএ ছাড়িব গিয়া তনু॥"

নিম্নের কথাগুলি, ভারতচন্দ্রেও পরিদৃষ্ট হয় ঃ—

"চোর দেখিতে রাজা তুলিলেন মাথা।
রাজা বোলেন এই আমার চোর জামাতা॥
করাঙ্গুলি দিয়া সুন্দর সবা সাক্ষী করে।
সুন্দরের কথা সবে বুঝিলা অন্তরে॥"

চৌর পঞ্চাশতের শ্লোকের মর্ম্ম এই ঃ—

মল্লার।

"বিদ্যার কেশের বেশ শোভে সিন্দূর
তিলক শোভে ভালে।

* "যথ" অর্থাৎ 'যত'। † "কথ"—'কত'। ‡ "বেথিত"—ব্যথিত।

সৌরভে বে-আকুল * ভ্রমিয়া মধু-কর,
বকুল-মালের মালে।
শ্রবণে শুনিতে, নয়নে দেখিতে,
মনেতে লাগিল ধান্দা।
বিদ্যা গুণবতী, সুন্দরে চাহে রতি,
প্রেমে রাখিয়াছে বান্ধা॥
বিদ্যা বিচক্ষণ, নবীন যৌবন,
রূপে বিনোদিনী গৌরী।
রস-অনুভব, জানিয়া বিদ্যার,
মরমে ঝুরিয়া মরি॥
বিদ্যার রভস-কেলি, প্রেমেতে আগলি,
মরমে পরশ সমান।
'কালিকা-মঙ্গল,' শ্রবণে সুমঙ্গল,
"দাস গোবিন্দ রস গান॥"

গ্রন্থের সমাপ্তিতে "বিদ্যাসুন্দরের" স্বর্গ-গমন বর্ণিত হইয়াছে। সে অংশটি এই ঃ—

"চরণে পড়িয়া যম করিলা স্তবন।
যমেরে প্রসাদ দিয়া ভবানী গমন॥
ব্রহ্মা সম্ভাষিয়া যম গেলা নিজ-ঘরে।
সুরেন্দ্র-ভুবনে গেলা বিদ্যাসুন্দরে।
দুই জনের জীউ লইয়া আইলা কৈলাসে।
দুই জন জীয়াইলা অমৃত-পরশে॥
মান-সরোবরে ছিল দিব্য-রত্ন-পুরী।
সেইখানে থুইলা বিদ্যা-সুন্দর ঈশ্বরী॥
বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী সমর্পণ করি।
হর বিদ্যমানে তবে গেলা মহাকালী॥"

এখন আমরা গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়াস প্রকাশ করিতেছি। "কালিকা-মঙ্গলের" প্রথম ভাগের ভাষা, অনেক স্থলে 'ব্রিজবুলি' (ব্রজবুলি) মিশ্রিত হইলেও, সর্ব্বত্রই মূল ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। কর্ত্তৃ-কারকে সপ্তমী, উত্তম পুরুষে নাম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার প্রভৃতি একরূপ সাধারণ। দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক মনে করি। নিম্নে কয়েকটা অপ্রচলিত প্রয়োগও শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ঃ—

১।—করন্তি।—পশ্চাৎ প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। যথা,—

"এক দুই তিন মাস করন্তি গমন।
ছয় মাসে নিজ দেশে দিলা দরশন॥"

২।—উলা—অবতরণ করা। প্রমাণটী নিম্নে দেখুন,—

"দূরে থাকি দেখি রাজা কুমার সুন্দর।
রথ হোঁতে ভূমিত কুমার উলিল সত্বর॥"

৩।—'উলা'—চট্টগ্রামে 'উদয় হওয়া' অর্থেই বেশী ব্যবহৃত হয়। যথা,—"চন্দ্র উলিয়াছে"। প্রথমোক্ত অর্থে ইহার ব্যবহার "গোকুলমঙ্গলে"ও দৃষ্ট হয়।

৪।—আছউক—(আছুক) থাকুক।

"এ সকল বিবরণ, নাহি জানে প্রজাগণ,
আছউক আপনে নহি জানি।"

৫।—চলোঁ—চলোম্, চলি।

"কোটয়ালে বোলে রাজা এই লইআ চলোঁ।
সুন্দরে বোলে কোটয়াল খানিক রহ বলোঁ॥"

এইরূপ পড়োঁ=পড়ম্, ধরোঁ=ধরম্ ইত্যাদি।

৬।—ডেয়াইতে—ডিঙ্গাইতে, অতিক্রম করিতে।

হেনকালে সুন্দর করেন বিমরিষ।
খন্দক ডেয়াইতে মুই জে করে জগদীশ॥

৭।—তোকাই—তালাস করি।

"ঘর দ্বার তোকাইয়া চাহিলা সকল।
চোর লাগ না পাইলা হইলা বিকল॥"

৮।—গদ্য করে—ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

"কন্যা বসি' করে সুখ, আমা সভাকার দুঃখ।
বারেক লাগ পাইব চোরে।
কার কার মুখে হাস্য, কার কার রহস্য,
যুবকে বসিয়া গদ্য করে॥"

৯।—ধিক্—অধিক।

"তোমার সাক্ষ্যাতে আর কি বোলিব 'ধিক্'।"

কবি আলাওলও বহুস্থলে এই অর্থে উহার ব্যবহার করিয়াছেন।

১০।—ঠেঠা—কূটতর্কযুক্ত।

"রাজা বোলে কাট নিয়া দারুণ দুষ্ট চোর।
ঠেঠা কথা কহি বেটা প্রাণি নিল মোর॥"

১১।—ধাউর—শঠ।

"ধর ধর করি রাজা ডাকে সকোপিত।
ধাউর [illegible] ধর ঝাটে কাট নি তুরিত॥"

* "বে-আকুল"—ব্যাকুল।

১২।—'ধাউরালী' বলিয়া একটী শব্দ 'গোকুলমঙ্গলে' পাওয়া গিয়াছে।

১৩।—চতুরা—চত্বর ? *

"তার বাহিরে চৌতুরা, চৌখণ্ডি চৌমুরা,
দিব্য সিংহাসন তার মাঝে।
রাজ্য অমরাবতি, তুলনা নাহিক ক্ষিতি,
যেন শোভে ইন্দ্র দেবরাজে॥"

১৪।—অথান্তর—বিপদ্।

১৫।—তমু বা তভো—তবুও।

১৬।—ফাফর—কাতর।

১৭।—মার্গ—গুহ্যদেশ।

১৮।—কথা—কোথা।

১৯।—য়াম্মারা—আমরা।

২০।—মেলানি—বিদায়।

২১।—বিহন্দ মহল।

২২।—ছল ছুতা—ছলনা।

২৩।—থান বা খন্দক—গড়খাই। ইত্যাদি।

আর কয়েকটি কথা বলিয়াই, এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিবার ইচ্ছা। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা ভাষা-ইতিহাসের উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য যতটা প্রয়োজনীয় অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাহা ততটা আবশ্যক বলিয়া, আমার মনে হয় না। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই, আমরা বঙ্গের প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থরাজির উদ্ধার সাধনে ব্যাপৃত। এইরূপ আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থেরই মুদ্রাঙ্কন, নিতান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয়, বঙ্গের দুইটি "সাহিত্য-সভাই" এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কোন কোন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি, স্বতন্ত্রভাবেও প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশিত করিতেছেন। তথাপি আবিষ্কৃত গ্রন্থরাজির সংখ্যা-তুলনায় এই সকল উদ্যম নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রভৃতি বঙ্গের ধনী সম্প্রদায়, এদিকে কৃপাদৃষ্টি করিলেই, প্রাচীন সাহিত্যের শীঘ্রই একটা কিনারা হইতে পারে; কিন্তু, এ হতভাগ্য দেশে সেই শুভদিনের আবির্ভাব হইবে কি? আলোচ্যমান গ্রন্থের সংগ্রাহক চট্টগ্রাম—সাধনপুরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনিলাম,—'কালিকা মঙ্গল খানি' "বসুমতী" পত্রিকার কর্তৃপক্ষেরা প্রকাশ করিতে মনন করিয়াছেন। ঘটনা সত্য হইলে, নিতান্তই সুখের বিষয়, এ কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

* বাহির বাড়ীকে চট্টগ্রামে 'চতুরা' ব[illegible] 'হরি' ঘর বলে।

কবিতা-গুচ্ছ।

নিরুপমা।

সুন্দর হ'তো শরত ইন্দু তাহারি মতন ঠিক—
তাহা—সজীব হইত যদি!
তাহারি মধুর কণ্ঠ স্বরে তুলিত হইত পিক
যদি—গাহিত সে নিরবধি!
চপলা হইত তুলিত তাহার মধুর হাস্য সনে—
যদি গগনে থাকিত থির!
তারি চঞ্চল আঁখি অনুকারি, হরিণী ফিরিত বনে—
যদি—হানিতে পারিত তীর।
শীতল হইত মলয় সমীর, তাহারি পরশ সম—
যদি—বহিত সে চিরদিন!
নির্ম্মল হ'তো নীল অম্বর তাহারি হৃদয়োপম—
যদি—না হইত সীমাহীন!
তাহারি মতন অতি পবিত্র হইত ভাগীরথী—
যদি—না ছুঁইত ধরাতল!
তারি সমতুল গম্ভীর হতো অতল অম্বুনিধি—
যদি—না থাকিত বাড়বানল!
হিম গিরিবর হইত তুলিত, তারি উচ্চতা সনে—
যদি—পাষাণে না হতো গড়া!
তাহারি মতন সহিষ্ণু হতো—ভীষণ ভূকম্পনে—
যদি—অটল বহিত ধরা!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

চির বসন্ত।

অয়ি শুভে, কবে তুমি হ'লে শোভাময়ী
নব মঞ্জরীর স্নিগ্ধ শ্যাম সুষমায়,
কুসুম পেলব অই অমল আননে
সচন্দ্রা যামিনী হাসে আলোক বিভায়!
চুমিতে ঊষারে, তার রক্তিমা পরশে
হয়েছে সুন্দর বুঝি বিমল অধর,
গোলাপ কুসুম আভা কে দিল কপোলে?
নয়নে ফুটিয়া হাসে চারু ইন্দিবর!
চূর্ণ কুন্তলদল ভ্রমরের শ্রেণী
অলস আবেশে তব মুখ পানে চায়,
নিশ্বাসে মলয় বহে, কণ্ঠে পিক ধ্বনি
সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিয়া গেছে কুসুম-বন্যায়।
সৌন্দর্য্য প্রবাহ আজ কুলে কুলে ভরা,
অচির বসন্ত শুভে পড়েছে কি ধরা?

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

একটি তারকার প্রতি।

জ্যোতি বসনে লো তুমি সুচারু-হাসিনী,
নিত্য সন্ধ্যা আগমনে উজলি অম্বর,
মৃদু হাসি পরকাশি কহ লো ভামিনী,
দেখা দাও তুষিবারে কাহার অন্তর?
কার লাগি তব প্রেম উছলিয়া উঠে
কহ সুহাসিনী? কার লাগি প্রতি নিশি
স্নাত হয়ে নীহারেতে উঠ তুমি ফুটে
হে সুরসুন্দরী! উজলিয়া দশ দিশি।
তব হৃদি প্রেমে ধনী হেরি ভরপুর;—
স্বর্গের জানালা খুলি জাগো কি লো তাই
গাহি নিতি আনমনে সকরুণ সুর,
ধরার কাঙ্গাল কবি তোমারে সুধাই।
তব প্রেম কণা যাচে কাঙ্গাল এ কবি,
না পুরা'লে আশা তার বৃথা হ'বে সবি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মিত্র।

প্রেমাঞ্জলি।

বৃথা নয় প্রেম বৃথা নয়,
যত দিবে উপহার
যুগল চরণে তার
শোভিবে সে প্রেমাঞ্জলি চয়!

নাহি ভয়, নাহি কোন ভয়;
হো'ক বা না হো'ক দেখা
প্রেমে পড়িবে গো লেখা
অকথিত কথা সমুদয়।

বৃথা নয়, প্রেম বৃথা নয়;
দূরে রহে অতি দূরে
দেবতা অমর পুরে
তবু হেথা তাঁর পূজা হয়।

ভকতেরে হইয়ে সদয়
তাহার পূজার শেষে
অজানিতে আসিয়ে সে
কর পাতি পুষ্পাঞ্জলি লয়;
বৃথা নয় প্রেম বৃথা নয়।

শ্রীনিশিকান্ত সেন।

অশ্রু জল।

আহা! বিন্দু অশ্রু জল!
তার মাঝে কত ব্যাকুলতা,
তার মাঝে কি গভীর ব্যথা,
কি দরুণ বেদনা অনল।

আহা! বিন্দু অশ্রু জল!
তার মাঝে কত অভিমান,
কত শত আকুল আহ্বান,
হৃদয়ের বাসনা প্রবল।

আহা! বিন্দু অশ্রু জল!
তার মাঝে কত প্রেমাভাস,
প্রীতি স্নিগ্ধ প্রণয়-উচ্ছ্বাস,
কি [illegible]র সুন্দর সরল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পুরী যাইবার পথে।—ডাক্তার চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর, এম, বি, এফ, সি এস, সঙ্কলিত, সাহিত্য সভায় পঠিত-প্রবন্ধ—পুস্তকাকারে মুদ্রিত। মূল্য ৶০ আনা, রায় বাহাদুর পুরী ভ্রমণে যাইয়া পুরী যাইবার পথে যাহা কিছু দর্শনযোগ্য আছে, তাহা সরস এবং সরল ভাষায় সুন্দররূপে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়গুলি নূতন না হইলেও লিখনভঙ্গী এবং বিষয়-সমূহের যথাযোগ্য সমাবেশে ইহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছি, এই প্রবন্ধের শেষাংশও অচিরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত দেখিতে ইচ্ছা করি।

সঙ্গীত কুসুম।—শ্রীরামজয় বাগচি প্রণীত, সরস ভাবযুক্ত সঙ্গীত-পুস্তক। বাগচি মহাশয় একজন ভাবুক ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার ভাবময়ী রচনার প্রতি কথায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্গীত-কুসুমের অনেকগুলি গান সাধন ভজনের উপযোগী এবং সমধিক চিত্তাকর্ষক। বাগচি মহাশয় রাজসাহীর একজন সুবিখ্যাত মোক্তার, তিনি বিনামূল্যে এই পুস্তক বিতরণ করিয়া থাকেন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা সঙ্গীত-কুসুমের দুই একটি গান উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। সুর-তাল-লয়যোগে স্বরচিত সঙ্গীতের ২।১টী তাঁহার নিজ কণ্ঠে গীত হইতে শুনিবার সুযোগ হইলে আমরা সুখী হইতাম।

লহরী।—সামাজিক উপন্যাস, ভারতমিহিরযন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৮০ আনা, গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার এই পুস্তকে পাপপুণ্য উভয় চিত্রই সুন্দর রূপে আঁকিয়াছেন, পতিগত প্রাণা লহরীর সুন্দর চিত্র, নরপশু সুকুমারের কলুষিত চরিত্র এবং যণ্ড খুড়ার পবিত্র মূর্ত্তি কৃতিত্বের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, পুস্তকখানি মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

চল্লিশ বৎসর।—কাউণ্ট টলষ্টয় এবং নিকোলাস্ কষ্টোমারফ্ বিরচিত ক্ষুদ্র রুষ উপন্যাস, শ্রীচণ্ডীচরণ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত, বেঙ্গল প্রেসে [illegible] মূল্য ৮০ আনা। বিভিন্ন ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যতই অনূদিত হইয়া মাতৃভাষার কলেবর পুষ্ট করে ততই মঙ্গল। চণ্ডীবাবু অনুবাদে সিদ্ধহস্ত, তাঁহার ন্যায় প্রবীণ সাহিত্য-সেবীর নিকট আমরা বহুই আশা করি। বিধাতা তাঁহাকে যে শক্তি ও সুযোগ দান করিয়াছেন তিনি তাহা এইরূপে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে নিয়োজিত করুণ ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দেওঘর রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের বার্ষিক বিবরণী।—দেওঘরের এই কুষ্ঠাশ্রম স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু এবং দেওঘর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অক্ষয়কীর্ত্তি। অনেক কুষ্ঠরোগী এই আশ্রমে আশ্রয়লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছে, বর্ত্তমান পরিচালকবর্গও সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন। এই আশ্রমের প্রতি সাধারণের সদয় সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

জয়ন্ত।—একখানি ক্ষুদ্র নাটক, শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহা না-টক না মিষ্ট; এ শ্রেণীর পুস্তকের প্রচার যত কম হয় ততই ভাল।

শ্রীমতী সংকীর্ত্তন।—শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে কৃষ্ণ ও গৌরলীলা সম্বন্ধীয় কীর্ত্তন-পুস্তক, বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দের আদরণীয় হইবে, আশা করা যায়।

পূর্ব্বাভাষ।—শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্যের উল্লেখ নাই। ইহা "গৌর লীলার পূর্ব্বাভাষ" পদ্যে রচিত। স্থানে স্থানে কবিত্ব-কুসুমের মৃদু সৌরভ অনুভূত হয়।

ভ্রাতৃবিলাপ।—এ, এম্, এম্, এইচ্ আলি প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। পদ্যে রচিত। ভ্রাতৃবিয়োগে ভ্রাতার শোকোচ্ছ্বাস; সুতরাং মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

গাথা।—কবিতা পুস্তক; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সিংহ প্রণীত, মূল্য ॥৶০ আনা। সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের রাজ পরিবার বাঙ্গালায় সুবিখ্যাত; গাথার গ্রন্থকার সেই বংশ সম্ভূত। কমলার পুত্রগণ অধুনা বাণীর সেবায় রত হইয়াছেন; এ দৃশ্য অতি সুন্দর। প্রথম রচনায় যে যে দোষ থাকে এ পুস্তকেও তাহা আছে; তথাপি স্থানে স্থানে রচনা মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। চেষ্টা ও চর্চ্চা থাকিলে গ্রন্থকারের কবিত্ব-সৌরভ কালে দেশব্যাপ্ত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

বিভিন্ন ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যতই অনূদিত হইয়া মাতৃভাষার

৬ষ্ঠ ভাগ।] প্রদীপ। [১০ম—১১শ সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(সুখ্যাতি ও দক্ষতার সহিত হাইকোর্টের জজিয়তি করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।)

৬ষ্ঠ ভাগ। মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১০। ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

বেদান্ত দর্শন।

(শেষ প্রস্তাব)

কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি সুখ লাভ হয়, কিন্তু স্বর্গাদি সুখ অস্থায়ী, স্বর্গাদি পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান বা সগুণ সাকার উপাসনা অল্পাধিকারীর পক্ষেই বিহিত। যাঁহারা উচ্চাধিকারী আত্মসাক্ষাৎকারার্থ তৎপর, তাঁহারা প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ও সগুণ উপাসনা দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি লাভ করিবেন, পরে গুরুমুখ হইতে শ্রুতি-বোধিত অর্থের শ্রবণ, অনন্তর যুক্তি অনুসারে উহার অনুধ্যান দ্বারা মনন, পরিশেষে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান ধারণা করিবেন। তৎপরে শম দম বৈরাগ্য প্রভৃতির অনুসরণ পূর্ব্বক নির্গুণ উপাসনা পরায়ণ হইয়া একাগ্র-মনে সর্ব্বদা কেবল ইহাই চিন্তা করিবেন, যে "ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।" এইরূপে বহু কালের, বহু জন্মের সাধন ফলে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীব ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, এবং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারাই ব্রহ্মে লীন হইয়া কৈবল্যরূপ মুক্তিলাভ করেন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস মুক্তিরূপে পরিগণিত হয়, কিন্তু বেদান্ত মতোক্ত মুক্তি তাদৃশ নীরস নহে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে সাযুজ্য প্রাপ্তিই মুক্তি, উহা কোন্ হৃদয়বান্ তত্ত্বদর্শী পুরুষের পক্ষে স্পৃহনীয় না হইবে। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের প্রতি কাহার না শ্রদ্ধা জন্মিবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বহু জন্মের সাধন ফলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। পশু পক্ষী তমোগুণময়, মনুষ্য রজোগুণ প্রধান, আর দেবতা সত্ত্বগুণ প্রধান। পশু পক্ষী সদসৎ জ্ঞানের অভাব, বশতঃ স্বকৃত কর্ম্ম ফলে অধোগতি বা উন্নতি প্রাপ্ত

হইতে পারে না। ভোগ দ্বারা তাহাদের কর্ম্ম ক্ষয় হইলে, তাহারা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, পরিশেষে দুর্লভ মানবজন্ম প্রাপ্ত হয়। মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া জীব সুকৃতি বশতঃ উত্তরোত্তর জন্মে উন্নতি লাভ করিয়া, পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতির ধ্বংস হয় না, সাধনার ফল অবিকৃতই থাকে। পর পর জন্মে সাধনার সমষ্টি হইতে থাকে। পরিশেষে জীব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। আত্মসাক্ষাৎকার স্বর্গাদি ফলের ন্যায় অস্থায়ী নহে; উহা অনন্ত আনন্দ স্বরূপ। এবংবিধ আত্মসাক্ষাৎকার কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির স্পৃহনীয় না হইবে? আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, ইহলোকে পুত্র কলত্র ধনৈশ্বর্য্য সকলই আত্মার জন্য। কিন্তু এ সকলই দুঃখ-বহুল ও ক্ষণ-ভঙ্গুর। অতএব ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আনন্দস্বরূপ আত্মার সহিত চিরসহবাস লাভ করিতে পুরুষ মাত্রেরই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শ্রুতি বলেন, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম," "তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অসার" অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, ও আনন্দ স্বরূপ, অনন্ত সত্য জ্ঞানই ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে এ বিষয়ে অন্য উপায় নাই ইত্যাদি "তৎত্বমসি," "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অনুশীলনে দ্বৈতভাব পরিবর্জ্জন করিবে। কারণ, ব্রহ্মই জীব, জীবই ব্রহ্ম। "যতেবাইমানি ভূতানি জাতানি, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব শ্বেতকেতো, তৎ ব্রহ্ম স আত্মা" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা শ্বেতকেতু পিতা আরুণির নিকট হইতে উপদেশ পাইতেছেন, যাহা হইতে এই ভূতসমূহ জন্মিয়াছে, যাঁহা দ্বারা জাত হইয়া জীবিত থাকিতেছে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তৎস্বরূপে লীন হইতেছে, হে শ্বেতকেতু! তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা। "দ্বিতীয়াৎ বৈভয়ম্" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, যত দিন "দ্বিতীয়" বলিয়া জ্ঞান থাকে তত দিনই সংসার নিবন্ধন ভয় যায় না। অতএব দ্বিতীয় জ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক ভব ভয় হইতে মুক্ত হইবার জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমান্ পুরুষমাত্রেরই উচিত। দৈনন্দিন [illegible]ক ব্যবহারেও অন্য ব্যক্তিকে দ্বিতীয় না ভাবিয়া আত্মীয় জ্ঞান করিবে, তবে আর তাহা হইতে ভয় থাকিবে না। কোন ব্যক্তির কি আত্মা হইতে ভয় সম্ভাবিতে পারে, অথবা কেহ কি আপনই নিজের অনিষ্ট সংঘটন করিতে তৎপর হয়? অতএব কবি ঠিকই বলিয়াছেন. "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সকল প্রাণীকেই আত্মতুল্য দেখেন, তিনিই জ্ঞানী।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পরব্রহ্মই এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। পরমাত্মা নিত্য ও আনন্দস্বরূপ। তবে জগতে এত বৈষম্য হইল কেন? কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞান, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুন্দর, কেহ কদাকার, কেহ অন্ধ, কেহ চক্ষুষ্মান, কেহ বধির, কেহ পঙ্গু, ইত্যাদি। ইহাতে কি পরমেশ্বরের পক্ষপাত ও দ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে না? যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি পরম কারুণিক, তিনি জগতকে কি সুখের আলয় করিতে পারিতেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতবর্ষীয় ঈশ্বরবাদী দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা একবাক্যে বলেন, মায়া সহিত ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বটেন, কিন্তু অদৃষ্টই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। জীব স্বকৃত পাপ পুণ্য (অদৃষ্ট) নিবন্ধন বিভিন্ন দশা প্রাপ্ত হয়, যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সুখী, যে অসৎকর্ম্ম করে, সে দুঃখী হয়। উক্ত আছে "না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।" ভোগ ব্যতীত শত কোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, সদসৎ কর্ম্মের ফল স্বরূপ সুখ দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন কর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, "জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন।" অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অগ্নি সর্ব্বকর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী কয়জন মিলে? দার্শনিকেরা আরও বলেন. সংসার অনাদি ও অনন্ত। অতএব কর্ম্মফলরূপ অদৃষ্ট সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল, প্রলয়ের পরেও থাকিবে। এই সিদ্ধান্তটী কিন্তু সকলের নিকট, বিশেষতঃ অদার্শনিকের নিকট সমীচীন বোধ হইবে না। সকল দর্শনের মতে পরমেশ্বরই অনাদি ও অনন্ত। বেদান্ত মতে এক ব্রহ্মই বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগত ও সৎ। প্রপঞ্চ মিথ্যা, মায়াশক্তিসম্পন্ন পরমে-

শ্বরের কার্য্য মাত্র। যাহার কারণ আছে, তাহা নিত্য হইতে পারে না, অতএব কার্য্য ভূত সংসার কিরূপে অনাদি ও অনন্ত হইতে পারে? সৃষ্টির পূর্ব্বে অদৃষ্ট কোথায়, কিরূপে ছিল যে তন্নিবন্ধন সৃষ্টিকার্য্যে ঈদৃশ বৈষম্য ঘটিবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া উচিত। কিন্তু ইহা অতীব দুরূহ। এ সম্বন্ধে আমার এরূপ প্রতীতি হয় যে, সৃষ্টিকালে পরমেশ্বর সকল পদার্থকেই সমান অবস্থাপন্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, প্রথমে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রভেদ বা বৈষম্য ছিল না। সৃষ্টকালে সমান অবস্থাপন্ন হইলেও, সকলেরই তুল্যরূপ স্বাতন্ত্র্য ছিল। তন্নিবন্ধন উত্তরকালে ক্রমশঃ পার্থক্য ঘটিয়াছে, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, উন্নতি ও অধোগতি সাধিত হইয়াছে। অতএব সৃষ্টিকালে অদৃষ্ট ছিল না, থাকিতেও পারে না। কিন্তু স্থিতিকালে অদৃষ্টের বৈচিত্র বশতঃ সর্ব্বত্র বিষম বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। পরে প্রলয় কালে ভোগ প্রযুক্ত অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে পর আবার সকলই সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইবে। এই মীমাংসাতেও আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু এরূপ মীমাংসা হইতে দৈব (অদৃষ্ট) ও পুরুষকার উভয়েরই কার্য্যকারিতা ও সামঞ্জস্য সম্ভবিতে পারে এবং সংসারের পুণ্য পাপ ও তৎফল সুখদুঃখের বৈষম্য সম্বন্ধে একপ্রকার যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক সার কথা এই সংসারকে অনাদি ও অনন্ত মানিবার প্রয়োজন রাখে না। ত্রিগুণময়ী মায়ার কার্য্য বলিয়া সংসারে এত বৈষম্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই চলে। মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও আরোপিত শক্তি। অবিদ্যা বশতই মায়া ঈশ্বরকে আবরণ করে ও জগতকে বৈষম্যময় দেখায়। কিন্তু এরূপ বৈষম্য-জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব জগতে বাস্তবিকই বৈষম্য নাই, বৈষম্য প্রতীতি পারমার্থিক নহে, ব্যাবহারিক মাত্র। অতএব তন্নিবন্ধন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে পক্ষপাত ও নিষ্ঠুরতা আরোপ হইতে পারে না। সম্প্রতি প্রলয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উক্ত হইতেছে। প্রলয় সৃষ্টির বিপরীত ভাবে সাধিত হয়। পৃথিবী জলাকারে, জল তেজের আকারে, তেজ বায়ুর আকারে পরিশেষে বায়ু আকাশাকারে পরিণত হয়, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কার অজ্ঞানে বিলীন হয়। ইহাই প্রলয়ের প্রণালী ও সৃষ্টিক্রিয়ার বিপরীত।

প্রলয় চারি প্রকার। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। সুষুপ্তির নাম নিত্য প্রলয়। সুষুপ্তি প্রাপ্ত পুরুষের পক্ষে সমস্ত কার্য্যই স্থগিত থাকে, কেবল প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বসাদি লুপ্ত হয় না। সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের সহস্র পরিবর্ত্তনে ব্রহ্মার এক দিন, ব্রহ্মার রাত্রিও তাবৎ পরিমাণ। ব্রহ্মা দিনে জগৎ সৃষ্টি করেন ও রাত্রিতে সংহার করেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় মন্বাদি সংহিতাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়।

ব্রহ্মার আয়ুকাল দ্বিপরার্দ্ধ (বৎসর) পরিমিত। তদন্তে সমস্ত সচরাচর জগৎরূপ কার্য্য ব্রহ্মার প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াতে লয়প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয়।

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জন্য সর্ব্বজীবের মুক্তির নাম আত্যন্তিক প্রলয়। দুই একটি করিয়া জীবগণ মুক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এইরূপ সমস্ত জীব মুক্ত হইলে, একটিও বদ্ধ থাকিবে না। ইহাই আত্যন্তিক প্রলয়।

সমুদয় দর্শনই আত্মাকে লইয়া, এ পর্য্যন্ত আত্মার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা পর্য্যাপ্ত বোধ হইতেছে না। অতএব অধুনা এতদ্বিষয়ে যে দুই একটি বক্তব্য উল্লিখিত হইতেছে।

ভারতীয় দর্শনের মতে আত্মা ও মন দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তদ্রূপ, এ দেশীয় এক দল চার্ব্বাকেরাও মনকেই আত্মা বলেন, পৃথক আত্মা মানেন না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতীয় দর্শনে মন মানা হইল কেন? এককালে অনেক ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে পারে না। এই জন্য সূক্ষ্ম অণুপরিমাণ মনঃস্বরূপ একটী ভৌতিক দ্রব্য মানা আবশ্যক। মন জ্ঞানের করণ, কর্ত্তা নহে, কর্ত্তা আত্মা। আত্মার সহিত মনের সংযোগ; মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ, এই তিন প্রকার সংযোগে জ্ঞান হয়। আত্মা সর্ব্বগত ও বিভু বলিয়া, এককালে অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত ও অনেক বিষয়ের সহিত আত্মার সংযোগ আছে, অতএব যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয় দ্বার বহু বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারিত। কিন্তু তাহাত হয় [illegible] যৎকালে দর্শন হইতেছে তৎ-

কালে শ্রবণ হয় না। যৎকালে স্পর্শ হইতেছে, তৎকালে আস্বাদ হয় না। কারণ মন অণুপরিমাণ বলিয়া এক কালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং একদা অনেক ইন্দ্রিয় জন্য অনেক জ্ঞান জন্মে না। একটী সুকোমল সুগন্ধি সুস্বাদু পিষ্টক হস্তে ধারণ করিয়া ভোজন করা যাইতেছে, ও ভোজনকালে উহার সদ্গন্ধে আমোদিত হইতেছি। এই ধারণ, দর্শন, ভোজন ও সদ্গন্ধ সেবন সমকালীন বলিয়া প্রতীত হইলেও, বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে হইতেছে যুগপৎ নহে। শত পদ্মপত্র একত্র উপরি উপরি থাক দিয়া রাখিয়া যদি সূচী দ্বারা বিদ্ধ করা যায়, মনে হইবে যে শতপদ্মপত্রই এককালে বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহাত বাস্তবিক নহে, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে পরপর পৃথক পৃথক পদ্মপত্রগুলি বিদ্ধ হইয়াছে, অতি শীঘ্র শীঘ্র বিদ্ধ হওয়াতে বোধ হয় যেন যুগপৎ এই ভেদন ক্রিয়া সম্পাদিত হইল, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত পিষ্টকের স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন ও আঘ্রাণ পৃথক্ পৃথক্ ক্ষণে হইতেছে, এক ক্ষণে নহে। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ স্বরূপ অণুপরিমাণ মন মানিতে হইবে। কারণান্তরেও মন মানিতে হয়। দেখিতে পাই যে, সকল প্রকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান যেমন কর্ত্তৃ সাপেক্ষ, তেমনি করণ সাপেক্ষও বটে। দর্শন জ্ঞানে আত্মা কর্ত্তা, চক্ষু করণ, শ্রবণে শ্রোত্র করণ, আঘ্রাণে নাসিকা করণ, স্পর্শনে ত্বক করণ ও আস্বাদনে জিহ্বা করণ। তদ্রূপ অভ্যন্তরীণ সুখ দুঃখাদির জ্ঞান ও স্মরণ করণ সাপেক্ষ হওয়া উচিত। সে করণ কিনা মন। আর ন্যায় দর্শন মতে মন নিরবয়ব অণুপরিমাণ দ্রব্য বিশেষ। বেদান্ত মতে অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ। সঙ্কল্প ও বিকল্পের কারণ ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আচ্ছা মন ত মানিলাম, পৃথক আত্মা আর কি জন্য মানিতে হইবে? আত্মা হইতে অভিন্ন হইলে জ্ঞানের ক্রমিক না হইয়া যৌগপদ্য হইয়া পড়ে, তাহাত যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

মন জ্ঞানের করণ, কিন্তু আত্মা জ্ঞানের কর্ত্তা। মন আত্মা হইতে পৃথক না হইলে কর্ত্তা ও করণ এক হইয়া পড়ে। তাহাত যুক্তি ও অনুভবের বিরুদ্ধ। স্বপ্নে নানা বস্তুর দর্শন হয়। তাহা মনের কার্য্য। স্বপ্নাবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়গণ সুপ্ত থাকে বটে, কিন্তু মনও তদানীং সুপ্ত হইয়া ব্যাপার শূন্য হয় না। মন আত্মা হইলে অবশ্যই সংবোধন মাত্রেই নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া উচিত ও স্বপ্ন দৃষ্ট সমস্ত বস্তুর উপলব্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এরূপ ত সর্ব্বদা দেখা যায় না।

বালকেরা সামান্য কারণে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। সুতরাং যুবকের ন্যায় বালকের মন পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট নহে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে শরীরের ন্যায় মনও পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল মন আত্মা হইলে "সোঽহং" "আমি সেই আছি" এরূপ তাদাত্ম্য বোধ কিরূপে সম্ভবিতে পারে!

এখন স্থির হইল মন আত্মা নহে, তবে প্রাণ আত্মা হইবার বাধা কি? আপত্তি এই, সুষুপ্তকালে প্রাণ সুপ্ত থাকে না, তখনও শ্বাস প্রশ্বাসাদি রূপ প্রাণের ক্রিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু সুষুপ্তকালে ইন্দ্রিয়গণ ও মন সুপ্ত থাকে। যখন পুরুষ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়, তখন তাহাকে সংবোধন করিলে উত্থিত হয় না, কিন্তু তথাপি তৎকালে প্রাণের ক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

প্রাণ আত্মা হইলে অবশ্যই সুপ্ত পুরুষ উত্থিত হইত, কারণ তদানীং প্রাণও সুপ্ত না হইয়া অব্যাহতভাবে নিজের ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদি সাধন করিতেছে।

এ সম্বন্ধে উপনিষদে দুই একটী গল্প আছে—প্রাণ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কে বড় এই কথা লইয়া বিবাদ হওয়াতে পিতা প্রজাপতিকে সকলে মধ্যস্থ মানিলে, প্রজাপতি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্ন হইলে শরীর মৃত হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতি এই কথা বলিলে, প্রথমে বাগিন্দ্রিয়, তৎপরে চক্ষুরিন্দ্রিয়, অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয়, পরিশেষে মন নিষ্ক্রান্ত হইল; কিন্তু তাহাতে শরীর বিনষ্ট হইল না। সর্ব্বশেষে প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করিল, তন্নিবন্ধন বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইতে লাগিল, শরীরপাতের আশঙ্কা হইল। তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ প্রাণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভগবন্ গমন করিবেন না, গমন করিবেন না আপনিই শ্রেষ্ঠ।" প্রাণ শ্রেষ্ঠ হইলেও এবং মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তকালে প্রাণের ক্রিয়া থাকিলেও প্রাণে চেতনা নাই, অতএব প্রাণ আত্মা নহে, প্রাণ বায়ুস্বরূপ ভৌতিক পদার্থ। একদা গর্ব্বিত গার্গ্য মুনি কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট

আসিয়া শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ প্রভৃতি অমুখ্য ব্রহ্মের বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ দিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "এ সকলই আমি জানি, এবং ইহাদিগের গুণও উপাসনার ফল পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করিতে পারি। আপনি এতদপেক্ষা অধিক কি জানেন, বলুন।" গার্গ্য অধিক কিছু বলিতে না পারিয়া মৌনাবলম্বী হইলেন। তখন অজাতশত্রু তাঁহাকে এক নিভৃত স্থানে একজন সুপ্ত পুরুষের নিকট লইয়া গেলেন। রাজা উপস্থিত হইয়া প্রাণের কতিপয় বৈদিক নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই সুপ্ত পুরুষকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই সুপ্ত পুরুষ গাত্রোত্থান করিল না। তখন অজাতশত্রু গার্গ্যকে বলিলেন, "প্রাণ ভোক্তা নহে, তাহা হইলে অবশ্যই উচ্চারিত নামগুলি ভোগ অর্থাৎ অনুভব করিতে পারিত. প্রাণ বোদ্ধাও নহে, তাহা হইলে ঐ নাম সকল বুঝিতে পারিত। অতএব যে ভোক্তা ও বোদ্ধা নহে, সে আত্মা নহে।"

সিদ্ধ হইল প্রাণ আত্মা নহে, এখন ইন্দ্রিয় কেন আত্মা হইবে না? আমি বধির, আমি অন্ধ, আমি পঙ্গু ইত্যাদি জ্ঞান ত সর্ব্বদাই হইতেছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই ইন্দ্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় গ্রহণ করে। চক্ষু রূপের, কর্ণ শব্দের, ত্বক্ স্পর্শের, নাসিকা গন্ধের, এবং জিহ্বা রসের গ্রহণ করে। একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা একটী মাত্র বিষয়ের জ্ঞান সাধন হয়, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা একাধিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। তবে কিরূপে তাদাত্ম্য বুদ্ধি ঘটিতে পারে, যে আমি রাত্রিতে চন্দ্র দর্শন করিয়াছি, সে আমি দিবসে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছি, এরূপ জ্ঞানদ্বয়ের যে কর্ত্তা এক, তাহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইন্দ্রিয় যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের কর্ত্তা ভিন্ন হইয়া পড়ে, অর্থাৎ চক্ষু চন্দ্র দর্শনের কর্ত্তা ও কর্ণ সঙ্গীত শ্রবণের কর্ত্তা হইয়া উঠে। যে আমি দেখিয়াছি, সেই আমি শুনিতেছি এরূপ এক কর্ত্তৃকত্বের প্রতীতি সম্ভবপর হয় না। যে পূর্ব্বে প্রাতে একটী গোলাপ ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছিল, সে অপরাহ্ণে তাদৃশ আর একটী পুষ্প দেখিয়া, পূর্ব্ব দৃষ্ট পুষ্পের সৌরভ স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া মানিলে, যে আঘ্রাণ করিয়াছিল, সে ত স্মরণ করিতেছে না। এক ব্যক্তির অনুভবে অপরের স্মরণ কিরূপে সম্ভবে! ইন্দ্রিয় নানা, সুতরাং ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে, এক শরীরাবচ্ছেদে পৃথক্ পৃথক্ ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু অনেক ইচ্ছার যুগপৎ উদ্রেকে শরীর উন্মোথিত বা নিষ্ক্রিয় হইবার সম্ভাবনা। ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে একদা এক শরীরগত ইন্দ্রিয়গণের বিরুদ্ধ কার্য্যে অভিনিবেশ বশতঃ মহা গোলযোগ ঘটিতে পারে। অতএব ইন্দ্রিয়াত্ম বাদ নিরাকৃত হইল। এখন দেহাত্ম বাদে আপত্তি কি তাহার আলোচনা করা যাউক। সাধারণ লোকে এই দেহকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে. ইহা ভ্রম হইলেও সহজে প্রতীতি জন্মে না। "আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ, আমি কৃশ, আমি সুন্দর, আমি কদাকার, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি প্রভু, আমি ভৃত্য, এরূপ প্রতীতি সর্ব্বদাই হইতেছে। অতএব দেহই আত্মা।'' যখন অনেক স্থলে দেহকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, তখন ''আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি বিজ্ঞ, আমি অজ্ঞ," প্রভৃতি স্থলেও দেহকে তত্তৎ প্রতীতির লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করাই ভাল। এরূপ অনুমান হইতে পারে বটে, কিন্তু দেহাত্মবাদের নিরাসের জন্য অনেক প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ দেহের নানা অবয়ব আছে, চৈতন্যের কার্য্য দেহের সর্ব্বাংশেই লক্ষিত হয়। তবে কি দেহের অবয়ব নানা বলিয়া, চৈতন্যও নানা হইবে? কিন্তু এক দেহাবচ্ছেদে নানা চৈতন্য থাকিলে, এক কালে দেহে বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, তন্নিবন্ধন দেহ হয় উন্মোথিত বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ—পূর্ব্বে যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহারই স্মরণ হইয়া থাকে। কিন্তু দেহের ত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে। বাল্যে যে দেহ ছিল, যৌবনে সে দেহ নাই। বার্দ্ধক্যে আবার পৃথক দেহ হইয়াছে। যে আমি বাল্যে পিতামাতার যত্নে পালিত হইয়াছি, সেই আমি যৌবনে পুত্র কন্যার লালন পালন করিতেছি। এইরূপ একাত্মজ্ঞান সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল শরীর আত্মা হইলে, ঈদৃশ প্রতীতি সম্ভাবিতে পারে না। তৃতীয়তঃ—যদি চেতনা শরীরের স্বাভাবিক গুণ হইত, তবে শরীরে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু তাহাতে হয় না, জীবৎ শরীরে চেতনা আছে, কিন্তু মৃত শরীরে তাহার অভাব ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

অতএব চেতনা শরীরে অধ্যক্ষভূত দ্রব্যান্তরের ধর্ম্ম বলিতে হইবে। সে দ্রব্যান্তর কিনা আত্মা, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ও দেহ হইতে আত্মা অতিরিক্ত বলিয়া সিদ্ধ হইল। অধুনা আত্মা নিত্য কি অনিত্য, তাহার আলোচনা করা যাউক। আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত সকল শাস্ত্রে ও প্রধান প্রধান দর্শনে আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। দেহের উৎপত্তি ধ্বংস ধরিয়া আত্মার অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইতে পারে না। তবে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, দেহবিশেষের সহিত প্রথম সম্বন্ধই জীবের জন্ম, ও দেহবিশেষের সহিত বিচ্ছেদই জীবের মৃত্যু। কিন্তু এরূপ প্রতীতিও ভ্রম মাত্র, কারণ জীবাত্মা এবং নিত্য, পরমাত্মা হইতে বস্তুতঃ পৃথক নহে। অবিদ্যা বশতই পার্থক্যের ভ্রম হয়, তত্ত্বজ্ঞানে সে ভ্রমের নিরাস হয়। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।" জ্ঞান স্বরূপ আত্মার জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই এই শ্রুতিবাক্য জীবাত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। আর এক কথা এই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কর্ম্মই ফলশূন্য নহে। কোন কর্ম্মের ফল শীঘ্র ফলে, কোন কর্ম্মের ফল বা বিলম্বে ফলে। কি লৌকিক কর্ম্ম, কি অলৌকিক কর্ম্ম, সকল কর্ম্মেরই ফল অবশ্যম্ভাবী। ভোজন প্রভৃতি লৌকিক কর্ম্মের ফল শীঘ্র দেখা যায়, কিন্তু কৃষি, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি অন্য প্রকার লৌকিক কর্ম্মের ফল বিলম্বে হয়।

অলৌকিক কার্য্যের অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল ইহকালে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য পরকাল মানিতে হইবে। আমরা নিজের সুকৃত দুষ্কৃত নিবন্ধন যে সুখ দুঃখ ভোগ করি, তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সংঘটিত হয়। এই জন্য জন্মান্তর অবশ্য মানিতে হইবে। জন্ম জন্মান্তরে আত্মা একই থাকে, যে পর্য্যন্ত না অবিদ্যার ধ্বংসে মুক্তি হয়, সে পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শরীর রহিয়া যায় ও কর্ম্ম ফলের ভোগ সম্পাদিত হয়। অতএব আত্মার নিত্যত্ব না মানিলে চলিবে না।

এখন আত্মা-পরিমাণ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পরিমাণ ত্রিবিধ, অণু, মধ্যম ও মহৎ। কেহ বলেন যে পরমাত্মা বিভু, কিন্তু জীবাত্মা অণু। যখন উভয়ে বস্তুতঃ অভিন্ন, তখন উভয়েরই পরিমাণ এক, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, সুতরাং বিভু। জীবাত্মার অণুত্ব ঔপাধিক, বুদ্ধির অণুত্ব জীবাত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। জীবাত্মার মধ্যম পরিমাণ সম্ভবে না, উহা কেবল শ্রুতি বিরুদ্ধ নহে, যুক্তিরও বিরুদ্ধ বটে। শরীর ভেদে কি আত্মা বাড়ে না কমে? যে বস্তু নিত্য, কাল ভেদে তাহার পরিমাণের তারতম্য সম্ভবে না। অতএব আত্মা মধ্যম পরিমাণ নহে, সুতরাং মহৎ পরিমাণ, অর্থাৎ বিভু। বেদান্ত মতে আত্মাই একমাত্র বিভু, বৈদান্তিকেরা আকাশ কালাদিকে বিভু বলিয়া মানেন না।

বেদান্ত মতে গুণ ও গুণীর মধ্যে ভেদ নাই। অতএব যে আত্মা নিত্যজ্ঞান স্বরূপ তাঁহাকে আবার জ্ঞাতা বলিতে কোন বাধা নাই। তদ্রূপ আত্মা আনন্দ স্বরূপও বটেন। আবার সুকৃত জন্য জীবাত্মার সুখ ভোগ হইয়া থাকে। তাদৃশ সুখ বস্তুতঃ বুদ্ধিগত, আত্মাতে ঔপাধিক ভাবে আরোপিত হয় মাত্র। অতএব তন্নিবন্ধন আত্মাকে সুখী বলিবার বাধা কি?

ইতি পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইবে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বস্তুতঃ ভেদ নাই। তথাপি অদ্বৈতবাদীরা প্রতীয়মান দ্বৈতপ্রপঞ্চের অপলাপ করেন না। তাঁহারা বলেন পরিদৃশ্যমান দ্বৈত প্রপঞ্চ মায়াময়, উহার ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতই পারমার্থিক ও সত্য। অদ্বৈতবাদীরা শাস্ত্র মানেন, গুরু শিষ্য ভাবে শাস্ত্রের অনুশীলনও করেন। তাঁহারা চিত্তশুদ্ধির জন্য বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ও চিত্তের একাগ্রতা জন্য শম-দমাদি সাধন পূর্ব্বক উপাসনাও করিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতমতাবলম্বীরা উপাসক ও উপাস্যভাবে জীব ব্রহ্মের ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করেন এবং আত্মসাক্ষাৎকার জন্য যোগমার্গের পথিক হন।

যেমন স্বপ্নে নানা পদার্থের প্রতীতি জন্য প্রতিভাসিক সত্তা মানা যায়, তেমনি জাগ্রদবস্থাতে নানা পদার্থের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। ব্যবহার দশায় আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে মিথ্যা প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া বোধ হয়। তাদৃশ জ্ঞান বুদ্ধিগত, বুদ্ধির স্বচ্ছতা নিবন্ধন আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে মাত্র। উহার পারমার্থিক সত্তা নাই। ষড় দর্শনের যেরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণন হইল, তাহাতে প্রতীতি হইবে যে তত্ত্বং

দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যিনি সাধক তিনি অনুমান দ্বারা আত্মার পুনঃ পুনঃ মনন পূর্ব্বক আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম পুরুষার্থ মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। সকল দর্শনের উদ্দেশ্যে এক হইলেও মত ভেদ দৃষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যখন সকল দর্শনই ভ্রম-প্রমাদ-বর্জ্জিত ঋষির প্রণীত, তখন এত অনৈক্য ও বৈপরীত্য কিরূপে ঘটিল!

এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ অধিক বাক্য ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ এই যে ইহাতে অধিকারী অর্থাৎ পাত্র ভেদে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। যিনি স্বল্পাধিকারী তাঁহার জন্য সুগম উপায় বিহিত, যিনি মধ্যমাধিকারী, তাঁহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুরূহ পথ উদ্ঘাটিত, আর যিনি উচ্চাধিকারী তাঁহার নিমিত্ত অতি সূক্ষ্ম দুরবগাহতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। ইহা হিন্দুদিগের বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা, যে নিতান্ত অজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি তাহাকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল মনে করেন। তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ পাইলে, তাদৃশ ব্যক্তির চিত্ত বিভ্রম ও সর্ব্ব কার্য্যের লোপ হইতে পারে। তদপেক্ষা বরং ঈদৃশ লোকের পক্ষে আমকাষ্ঠাদির দেবতা জ্ঞানে তদুপাসনা করাই ভাল। ক্রমে উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ হইলে উত্তরোত্তর উপাসনা ও ধ্যান ধারণা বিষয়ে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করা সুগম হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ষড় দর্শনের মধ্যে অধিকারীভেদে তথাবিধ তারতম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে সাধারণ লোকের সংস্কার অনুযায়ী আত্মার জড়ত্ব ও সগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে শরীরাদিতে আত্মা বলিয়া যে সর্ব্বদা ভ্রম জন্মে তাহার অপনয়ন করাও হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে কারণ কার্য্য ভাবে, ঘট পটাদির অবয়ব। যে বিভাব, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের সত্যতা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বিষয়গুলির সমাবেশ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সম্বন্ধে যথোচিত যুক্তিও প্রদত্ত হইয়াছে। সামান্য অধিকারীর পক্ষে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে যথেষ্ট জ্ঞানগর্ভ যুক্তি বিন্যস্ত হইয়াছে। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শন তদপেক্ষা উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে, ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। সাঙ্খ্যেরা বলেন আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, জড় স্বভাব নহে। আত্মার কর্তৃত্ব নাই, কেবল ভোক্তৃত্ব আছে, বিবেক জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে আত্মাতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা বুদ্ধিগত ও মিথ্যা, ঔপাধিক ভাবে আত্মাতে তাহার আরোপ হয় মাত্র। সৃষ্টি কার্য্য স্বত্বরজতমোগুণময়, জড় স্বভাবা প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপগত হইলে, অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি হয়। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত মত বেদান্তের কাছাকাছি গিয়াছে। ইহা পূর্ব্বেই অল্প বিস্তর ভাবে এ প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে, অতএব এস্থানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বোক্ত দর্শনগুলি যুক্তিরূপ কৃতিদ্বারা সংবেষ্টন পূর্ব্বক কুতর্ক ও নাস্তিক্য, নিরাস ও বেদান্তের মর্য্যাদা রক্ষা জন্য প্রণীত হইয়াছে। যেমন কণ্টকাবৃতি দ্বারা ক্ষেত্রের শস্য গো মহিষাদি হইতে সুরক্ষিত করা হয় তদ্রূপ। শ্রুতির দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত বলিয়া বেদান্তের উৎকর্ষ ও উপাদেয়তা অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে সমধিক। অধিকন্তু যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হওয়াতে বেদান্ত সর্ব্বত্র সাদরে গ্রাহ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য দর্শনের অনেক প্রতিপাদ্যের মধ্যে, আত্মা অন্যতম, কিন্তু বেদান্ত দর্শনের প্রধান ও মুখ্য প্রতিপাদ্য আত্মা।

ফরাসিক তত্ত্ব জ্ঞানী কুঁজে বলিয়াছেন, "উপনিষদ্ যেমন তাঁহার জীবনে শান্তিদায়ক হইয়াছে মরণেও তদ্রূপ শান্তিদায়ক হইবে।" প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত সোফেন হায়ার, মোক্ষমূলার প্রভৃতি কুঁজের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আমাদের স্বদেশীয় শ্রীমান্ বিবেকানন্দ স্বামী, স্বামী রামতীর্থ প্রভৃতি মনীষিগণ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বেদান্ত মত প্রচার পূর্ব্বক কিরূপ যশস্বী হইয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহাদের উপদেশের সুফল ফলিবার লক্ষণ ইতি পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইতেছে। যে বেদান্ত দর্শনে জড় স্বভাব জ্ঞান সুখাদি বর্জ্জিত আত্মাতে লীন হওয়াকে মুক্তি না বলিয়া আনন্দঘন ও চিদ্‌ঘন ব্রহ্মে সাযুজ্য প্রাপ্তিকেই মুক্তি বলে, সেই বেদান্ত শুদ্ধ দর্শন শ্রেষ্ঠ নহে, উহা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মরূপে সর্ব্ব জনের নিকট আদরণীয় হইবার যোগ্য। বেদান্ত ধর্ম্মমতে আত্মাই একমাত্র প্রতিপাদ্য, অতএব উহাতে সম্প্রদায় ভেদে চির অনৈক্য ও পার্থক্য ঘটিবার

সম্ভাবনা অতি অল্প। বেদান্তকে প্রশস্ত রাজনীতিও বলা যাইতে পারে, কারণ যাহাতে সমস্ত জগৎকে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মময় রূপে দৃষ্টি করিবার উপদেশ আছে, তাহা অবলম্বিত হইলে পৃথিবীতে সর্ব্বত্র শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। সংগ্রাম, পরধর্ষণ, পররাষ্ট্রাপহরণ প্রভৃতি নিবারিত হইবে, এরূপ আশা করিতে পারা যায়। বেদান্ত পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতিও বটে। যাহাতে সর্ব্বভূতে আত্মবৎ দর্শন বিহিত হইয়াছে, তদনুশীলনে মনুষ্যবর্গের মধ্যে পরস্পর প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া বিশ্বজনীন মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইবার বাধা কি?

ঈদৃশ পরমোৎকৃষ্ট কিন্তু সর্ব্বথা দুরবগাহ বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা মাদৃশ যৎকিঞ্চিদ্‌জ্ঞ অনাত্মদর্শীর পক্ষে ধৃষ্টতার কার্য্য সন্দেহ নাই। কেবল সাধারণের সুগম করিবার নিমিত্ত স্থূল স্থূল বিষয়গুলি প্রকটন করিবার দুরাশাগ্রস্ত হইয়া যে সাহস করিলাম, তাহাতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট অপরাধী হইব, সন্দেহ নাই। যাহা হউক পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; দুই এক স্থলে যে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছি, তাহা হয় প্রকৃত শাস্ত্রার্থে অনবধান নিবন্ধন, না হয় পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনা জন্য। ভরসা করি সুধীগণ মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি পুণ্যাত্মা স্বর্গগত ৺শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহোদয়ের অর্থ সাহায্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পুস্তকগুলির নিকট আমি যথেষ্ট ঋণী হইয়াছি। অধুনা শ্রীমদ্ভাগবতীয় মঙ্গলাচরণার্থ প্রযুক্ত বেদান্তানুযায়ী শ্লোকটি পাঠ করিয়া অস্মদীয় প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

যিনি এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বপ্রকাশ, যিনি আদি কবি ব্রহ্মার নিকট যোগিগণেরও দুরবগাহ বেদার্থ মনে মনে প্রকটন করিয়াছিলেন, যেমন তেজে মরীচিকার ভ্রম [illegible] যেমন কাচরূপ মৃত্তিকাকে তৈজস দ্রব্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তদ্রূপ যাঁহাকে অধিষ্ঠান পাইয়া মিথ্যা জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, যিনি নিজ মহিমায় সর্ব্বদা মায়া জন্য মিথ্যা জ্ঞান নিরস্ত করিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে ধ্যান করি।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়।

রামচন্দ্র খান কৃত অশ্বমেধপর্ব্ব।

জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব্বে কতকগুলি আষাঢ়ে গল্প আছে। ব্যাসের অশ্বমেধপর্ব্ব অপেক্ষা জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব্ব, এই জন্য বাঙ্গালীর ভাল লাগে। এই জন্য জৈমিনির ভারত অবলম্বন করিয়া রঘুনাথের অশ্বমেধপাঞ্চালী ও রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধপর্ব্ব রচিত হইয়াছে। এইখানি যেন অপেক্ষাকৃত পুরাতন। গ্রন্থের শেষভাগে কবির পরিচয় আছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে; যথা:—

রাঢ়াদেশে বসতি আছয়ে পুণ্য স্থানে।
দণ্ডশিমলিয়া ডাঙ্গা সর্ব্বলোকে জানে॥
কায়েত কুলেতে জন্ম দণ্ডত পদ্ধতি।
কাশীনাথ জনক, জননী পুণ্যবতী॥
গুরুর কৃপাতে কিছু ভাল হৈল মন।
রামচন্দ্র খান কৈল পাঞ্চালী প্রবন্ধ রচন॥
সপ্তদশ পর্ব্ব কথা সংস্কৃত বন্ধ।
মূর্খ বুঝাইতে কৈল প্রকৃতের ছন্দ॥
ইতি জৈমিনি ভারত কথা সপ্তদশ।
শাকেন্দু বেদাম্বুনিধে যুগান্তে পুরাণ॥

......মালোক্য প্রকৃতি যথা প্রচারঃ সমাপ্ত। লোকবোধকৃত ছন্দ। অশ্বমেধ কথা সমাপ্ত মহাবেদ সুধাময় বন্দ॥ শুনিলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। অশ্বমেধ পুরাণ সমাপ্তি॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ ভাগের অর্থবোধ হইল না। আমরা যে পুস্তক পাঠ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি তাহা ১১৩৮ সনে লিখিত। মোটের উপর বুঝিতে পারা গেল

যে গ্রন্থকারের নাম রামচন্দ্র খান। পিতার নাম কাশীনাথ, মাতার নাম পুণ্যবতী। রামচন্দ্র কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। রাঢ় দেশের অন্তর্গত দণ্ডশিমলিয়াডাঙ্গায় রামচন্দ্রের বাস ছিল। অন্য স্থানে আছে:—

কঙ্কগ্রাম স্থান আছে মধ্য রাঢ়াদেশে।
গঙ্গার নিকটে গুরু সর্ব্বকাল বৈসে॥
সেহি গুরুর প্রসাদে ধর্ম্মেতে হয় মন।
অশ্বমেধ কথা কহোঁ শমন দমন॥

উদ্ধৃত অংশে জানা যায়, গঙ্গার নিকটবর্ত্তী কঙ্কগ্রামে রামচন্দ্রের গুরুর বাস ছিল। রামচন্দ্রের প্রাথমিক জীবন ভাল ছিল না, গুরুর প্রসাদে তাঁহার মন ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়। বৈষ্ণব-গ্রন্থে একজন রামচন্দ্র খানের নাম পাওয়া যায়, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেন। সেই রামচন্দ্র খান এই গ্রন্থের রচনাকারী কি না তাহা জানা যায় না। এক রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুর উৎকল গমনের সময় ছত্রভোগ নগরে ছিলেন, তিনি চৈতন্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও উৎকল গমনে সাহায্য করেন। কাশীনাথ দাস ও রঘুনাথের রচনা অপেক্ষা রামচন্দ্র খানের রচনা উৎকৃষ্ট নয়। রামচন্দ্রের গ্রন্থে পয়ারকে পদবন্দ, ত্রিপদীকে দীর্ঘছন্দ বলা হইয়াছে। নয়, দশ বা একাদশ অক্ষরে একরূপ ছন্দ রচিত হইয়াছে, তাহাকে খর্ব্বছন্দ বলা হইয়াছে। মিলের দিকে রামচন্দ্রের অধিক মনোযোগ ছিল না। যথা:—

(ক) এতেক ভীমের দর্প ব্যাস মুনি শুনি।
ভীমকে বলেন বহু পুরস্কারকারী॥
(খ) সন্ধ্যাকাল উপস্থিত সূর্য্য অস্ত গেল।
নিজঘরে আইলেন ব্যাস ঠাকুর॥
(গ) গোসাঞি বোলেন বাপু বৃষকেতু হে।
তোমা বিনে আনুশাল্ব ধরিবে হেন আছে কে॥

(ঘ) অন্ত্যবর্ণের মিল না হইলেও স্থানে স্থানে শুনিতে বেশ মিষ্ট হইয়াছে:—

সীতাধর্ম্ম সীতাকর্ম্ম সীতা মোর মা।
সীতা যদি সতী হয় বাণ কাটা যা॥

পুস্তকের কোন কোন অংশ অনন্ত দাসের রচিত বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার আপনাকে অনন্তদাস বলিয়াছেন কি না, জানা যায় না; যথা:—

অনন্ত দাসের গীত........বিশ্বাঘাতের চরিত্র......
সভাই শুনহ গাও সুখে। বোধ হয়, রামচন্দ্র খান রামোপাসক ছিলেন। যথা:—

জানকীজীবন রামচরণে শরণে।
অশ্বমেধ কথা কহে রামচন্দ্র খানে॥

এখন রচনার বিশেষত্ব সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা যাইতেছে:—

(ক) টি বা টা প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে "ট" লিখিত হইয়াছে। টি বা টাএর মূল "ট" কি না ভাষা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবেন। যথা:—

ঘোড়াট পাথর বড় অনুপায়।
অর্জ্জুন চিন্তিত হৈল হেট মাথে রয়॥

(খ) পরিনাতি শব্দটী নূতন। উহার অর্থ নাতির পুত্র। যথা:—

নাতি পরিনাতি রাজার দুর্জ্জয় ভুবনে॥

(গ) পুংলিঙ্গের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ, যথা:—

অন্তর্যামিনী ভগবান জানিল সকল।
দয়ার সাগর নাথ ভকত বৎসল॥

(ঘ) তবু স্থানে তমো, যথা:—

তমোরথ স্থির নহে কৃষ্ণ চিন্তা পাইল।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ তথনে বাজাইল॥

(ঙ) ইবারে প্রত্যয় স্থানে ইবাক, যথা:—

আকাশ গমনে ঘোড়া উড়িবাক চায়।

(চ) কে বিভক্তির স্থানে কখন কখন "ক", যথা:—

ঘোড়াক বাতাস করে শতেক চামর।

(ছ) তে বিভক্তির স্থানে কখন কখন "ত", যথা:—

তুমিত ভূমিত আমি মত্ত গজ পৃষ্ঠে।

(জ) সে কালের বাঙ্গালায় ইলাম প্রত্যয় স্থানে ইলাঙ ব্যবহৃত হইত। গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে বেশ রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। যৌবনাশ্ব নিজের মাতাকে গঙ্গা স্নানে যাইতে ও হরি দর্শন করিতে বলিলে, বুড়ী বলিল:—

মাএর তরে যৌবনাশ্ব বোলে প্রিয়বাণী।
ধর্ম্মরাজার যজ্ঞস্থলে চলহ আপনি॥
গঙ্গা স্নান করিবে মাতা হবে বড় ধর্ম্ম।
গোবিন্দ [illegible]খিবে মাতা হবে বড় ধর্ম্ম॥

বুড়ি বোলে কিবা কার্য্য গোবিন্দ দেখিঞা।
কিবা কার্য্য গঙ্গাস্নানে যজ্ঞস্থানে গিঞা॥
ধর্ম্ম কার্য্যে গৃহকার্য্য সব নষ্ট হৈব।
ধান্য গোধূম শস্য কেবা সম্বরিব॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত তৈল সব নষ্ট হৈব।
বধূগণ দাসীগণ সব ভ্রষ্ট হৈব॥
সকল সম্পদ যাবে কথায় মন দেহ।
না পাবো যাইতে পুতা আর না বলিহ॥

গ্রন্থ হইতে একস্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম :—

পূর্ব্বে উদ্দালক মুনি ছিলা এই থানে।
চণ্ডী নামে তার স্ত্রী আছিল নিজ স্থানে॥
তার বিভাকালে বহু বিপ্রগণ আইল।
যজ্ঞের সময় তাক নীত শিখাইল॥
স্বামী জপ স্বামী তপ স্বামী বড় ধর্ম্ম।
পতি সেবা ছাড়ি নারীর নাহি অন্য কর্ম্ম॥
না করিহ নিজ পতির বচন লঙ্ঘন।
চণ্ডীকেই সব ধর্ম্ম কহে বিপ্রগণ॥
ইসব শুনিয়া চণ্ডী বোলে সত্যবানী।
কদাচিৎ স্বামার বাক্য নাহি আমি শুনি॥
এসব কহিল চণ্ডী সভার বিদিত।
স্বামীর বচন সেবা ধরে কদাচিৎ॥
স্বামী এক কাজ বোলে চণ্ডী করে আর।
স্বামী করি তিল মাত্র ভক্তি নাহি তার॥
কতো দিন বহি বিপ্র চণ্ডীকেত কয়।
যজ্ঞ কৈলে সর্ব্বসুখ সম্পদ বাঢ়য়॥
চণ্ডী বোলে ব্রাহ্মণ মুখে নাহি লাজ।
কি কাজ যজ্ঞে মোর সম্পদে কিবা কাজ॥
মুনি বোলে কমণ্ডল ভরি দেহ পাণি।
আছাড়িঞা কমণ্ডল ভাঙ্গিল ব্রাহ্মণী॥
সকালে রান্ধিতে যদি উদ্দালক কহে।
দুই প্রহর রাত্রিতে রন্ধন করহে॥
যে দিবস উদ্দালকে ক্ষুধা নাহি লাগে।
বিহানে রন্ধন করি স্বামার তরে ডাকে॥
উদ্দালক মুনি যত কহে চণ্ডীর [illegible]রে।
এ[illegible]াল নাহি ধরে অন্য ব[illegible]রে॥
হেট মাথে চিন্তে মুনি মন দুঃখ করি।
ধর্ম্মবিদ্বেষী হৈল নারী দুঃচালি॥
শাণ্ডীল্য মুনি আইল শিষ্যগণ লৈঞা।
উদ্দালকের ঘর আইল আনন্দিত হৈঞা॥
শাণ্ডীল্য বোলে কহ উদ্দালক মুনি।
তোমার কুশল লইতে আইলাঙ আপুনি॥
নিজ দুঃখ উদ্দালক সব গোচরিল।
পুনরপি শাণ্ডীল্য মুনি প্রশ্ন করিল॥
কহহ মুনি তোমার কন্যা পুত্র কত।
কেমত ব্যবহার কহি দেহতত্ত্ব॥
বিরস দেখিএ মন সতত দুঃখিত।
বড়ই দুঃখিত দেখি প্রবল চিন্তিত॥
এত শুনি উদ্দালক কৈল হেটমাথা।
ধীরে ধীরে কহি দিল চণ্ডীর ব্যবস্থা॥
যে কাজ করিতে কহি তাহা নাহি করে।
বিশেষে আইল মোর পিতৃ বাসরে॥
কেমতে হৈব শ্রাদ্ধ হৈল বড় ভার।
শুনিঞা শাণ্ডিল্য মুনি হাসিল অপার॥
শাণ্ডীল্য কহিল তবে উদ্দালক স্থানে।
না করিনো শ্রাদ্ধ কহ চণ্ডী বিদ্যমানে॥
বিধি কর্ম্ম করিতে অবধি দিও কহি।
সকল সম্পন্ন হৈব মনে চিন্তা নাহি॥
আমিতো গৌতমী তীর্থে করিবো গমন।
প্রভাতে আসিঞা করিব কর্ম্ম অবেক্ষণ॥
এসব কহিঞা গোসাঞী শাণ্ডীল্য চলিল।
অমৃত কথাএ উদ্দালক সুখী হৈল॥
উদ্দালক কহেন চণ্ডীর বরাবর।
আসিব শাণ্ডীল্য মুনি কালি মোর ঘর॥
আসন ভক্ষণ তাক কিছুত না দিহ।
আদর গৌরব তাক কিছু না করিহ॥
শ্রাদ্ধ করিব কালি আমার পিতার।
সমাবেশ নাহি শ্রাদ্ধ নারি করিবার॥
শ্রাদ্ধ করিঞা মোর কোন প্রয়োজন।
কি কার্য্যে করিব ব্যয় সঞ্চিত ধন॥
চণ্ডী বোলে ব্রাহ্মণ তুমি থাক চুপ হৈঞা।
করাব শ্বশুরের শ্রাদ্ধ সুন্দর করিঞা॥

শাণ্ডীল্য মুনির তরে যতনে রাখিব।
পাদ্য অর্ঘ্য আভরণে মুনিকে পূজিব॥
শ্বশুরের শ্রাদ্ধ মোর অবশ্যকরণ।
ভাল ভাল বিপ্র আনি করাব ভোজন॥
নানা ধন বস্ত্র দিব রজত কাঞ্চন।
সানন্দিত হয় যেন শ্বশুরের মন॥
উদ্দালক মুনি বোলে রাত্রিত যাইব।
কাণা খোড়া কাণা কুজা বিপ্রকে আনিব॥
ভ্রষ্ট মুখ নষ্ট মুখ বৈদ্যবৃত্তি জনে।
অপুত্রক অপবিত্র এ সব ব্রাহ্মণে॥
দ্যূত ক্রীড়া করে বিপ্র পরদার করে।
আনিবো এ সব বিপ্র শ্রাদ্ধ বাসহরে॥
ছি ছি বোলেন চণ্ডী এ কথা শুনিঞা।
আনিবো উত্তম বিপ্র আপনে যাইঞা॥
মুনি বোলে করাবে শ্বশুরের শ্রাদ্ধ কাজ।
যে সকল দ্রব্য চাহি কর তার সাজ॥
লীলা মাষকলাই আর মসুরি।
আউসের মলিন চেষ্টা করহ সুন্দরি॥
আর এক দ্রব্য যত্নে করহ তুমি চণ্ডী।
কুটিঞা মলিন চাউল কর তুমি গুণ্ডি॥
লসুন পিয়াজ শাক কলম্বী সুর্ব্বরি।
কুষ্মাণ্ড কাকরি লকুচ আহরিঞা আনি॥
কাল বস্ত্র দিব শ্রাদ্ধে অন্ধকূপের জল।
পাতের পুড়াতে দ্রব্যাদি কুচ্ছিত স্থল॥
এ সকল কথা যদি কহে মুনিবর।
সক্রোধ হইঞা চণ্ডী দিচ্ছেন উত্তর॥
তোমার বচন মুঞি না শুনিব কাণে।
করাব শ্বশুরের শ্রাদ্ধ দেখিহ নয়ানে॥
সুগন্ধি হেমন্ত চাউল গোধূম চূর্ণ করি।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ভাণ্ড যত ভরি॥
নারেঙ্গ চিনি আম্র কাঠাল।
নারিকেল ক্ষিরি গুবাক অপার॥
সন্দেশ লড্ডুক আর রম্ভা সুরঙ্গ।
বসিঞা দেখহ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের যত রঙ্গ॥
বাস্তুক হেলঞ্চা আর ললিতার শাক।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব শ্বশুরাক॥
ধবল পুষ্প গঙ্গাজল তাম্রপাত্রে ভরি।
প্রাঙ্গনে করিঞা স্থল চান্দোয়া উপরি॥
বিপ্রগণে ভোজন করাইতে কহে মুনি।
শ্রাদ্ধ করিঞা রন্ধন করিবো আপুনি॥
চণ্ডী বলে মুনি সব দেখহ বসিঞা।
বিপ্র ভুজাইব আমি রন্ধন করিয়া॥
স্বামীর বচন চণ্ডী একো না রাখিল।
বিধিমত শ্বশুরের শ্রাদ্ধ করাইল॥
ভুঞ্জাঞা সভাকে দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
সভার পীরিতি চণ্ডী করিল অপার॥
ভ্রমে উদ্দালক কহে চণ্ডীর তরে।
উত্তম স্থানে পিতার পিণ্ড থুইবারে॥
গোবরের কুণ্ডে চণ্ডী পিণ্ড ফেলাইল।
বড় মনে দুঃখ পাঞা চণ্ডীকে সাঁপিল॥

রচনার মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, তবে প্রাচীন বলিয়া গৌরব হওয়া উচিত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

মধ্য-এসিয়ার প্রাচীন বিবরণ।

'পিটার দি গ্রেটে'র সময় হইতে রুষ ধীরে ধীরে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা ভারতবাসীদিগের পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ না হইলেও, ভারতের বর্ত্তমান অধীশ্বর ইংরাজগণের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। রুষ যখনই আপনার ক্ষমতা বিস্তারের জন্য সামান্য চেষ্টা করেন তখনই ইংরাজদিগের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। এসিয়াখণ্ডে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল শান্তিভঙ্গ ঘটিয়াছে, তাহা কেবল মাত্র রুষাতঙ্কের পরিণাম।

ভারতাভিমুখে রুষের প্রতিপদক্ষেপ ইংরাজগণ অতি-তীব্রদৃষ্টিতে দেখেন। ইহারই কারণ প্রতি বৎসর সীমান্তে

সৈন্য শিবির সংস্থাপিত এবং শান্তিরক্ষার জন্য বহুল অর্থ ব্যয় করা হয়। ইহারই জন্য আফগানিস্থানের আমীর বার্ষিক ১৭ লক্ষ টাকা উপঢৌকন পান এবং ইহারই কারণ হিরাটের কেল্লা সদা সর্ব্বদা রণসজ্জায় সজ্জিত থাকে। পাছে রুষিয়া সমস্ত এসিয়া করতলগত করিয়া ফেলেন, এই আতঙ্কে ইংলণ্ড জাপানবাসিদিগের সহিত এসিয়াখণ্ডের শান্তিরক্ষার জন্য এক অপূর্ব্ব সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন।

রুষিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত মধ্য-এসিয়া গ্রাস করিয়াছেন। কিরূপে এই ভূভাগ রুষিয়া আত্মসাৎ করিলেন, তাহা আমরা এই প্রবন্ধে বলিব। প্রথমে, মধ্য-এসিয়ার পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠককে প্রদান করিব, পরে সেখানে এখন কিরূপে রুষিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহা জানাইব।

মধ্য-এসিয়ার প্রাচীন বিবরণ মানবজাতির শৈশবাবস্থার ইতিহাস। যিনি এই বিবরণ অসম্বদ্ধ প্রবাদ-বাক্য হইতে নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাকে বিবিধ জাতির প্রাচীন জনশ্রুতি একত্র করিয়া পরিশেষে কল্পনার সাহায্যে এক চিত্র গঠন করিতে হয়। আজকাল ইউ-রোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহার যে অনেক অংশ কল্পনা-প্রসূত, তাহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কিছুই জানা নাই বলিয়া যে কল্পনাপ্রভাবে এবং ভাষার মাধুর্য্যে একটা জানিবার মতন ইতিহাস গঠন করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা লিখিয়া জানাইবার আবশ্যকতা নাই।

বর্ত্তমান মধ্য-এসিয়া উত্তরে এবং পূর্ব্বে সাইরদরিয়া নদী এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বত দ্বারা, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সমুদ্র দ্বারা এবং দক্ষিণে পারস্য এবং আফগান রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। চলিত ভাষায় মধ্য-এসিয়াকে তুর্কিস্থান কহে। তুর্কিস্থানের উল্লেখ আমরা ইরেনিয়ার প্রাচীন কাব্যে দেখিতে পাই। বোধ হয়, এই কারণ ইতিহাসবেত্তাগণ এই স্থানকে মানবজাতির জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাইরদরিয়া বা অকৃস্‌স্ নদী এবং পেরোপেমিস্‌স্ (পামির) পর্ব্বতের মধ্যস্থিত ভূভাগ পুরাকালে বকৃট্রিয়া নামে জ্ঞ ছিল। বেহুস্থানে যে সকল প্রস্তর-ফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, যে বকৃট্রিয়া খৃঃ অব্দের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে পারস্য রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তখন দ্বিতীয় দেরায়স্ পারস্য রাজ্যের অধীশ্বর। আরও জানিতে পারা যায় যে, প্রথম সাইরস্ এই স্থান অধিকার করেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ইতিহাসবেত্তা সিটিসসের মতে, বকৃট্রিয়া প্রথম সাইরসের দ্বারা অধিকৃত হয়। এই স্থান অধিকার করিয়া পারস্য রাজ্যের প্রতি-ষ্ঠাতা সাইরাস্ তাঁহার বিজয়িনী সেনা আমুদেরিয়া বা জাকৃজারটিস্ নদী পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। এই নদীই তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্ত। তৎকালে আমু-দেরিয়া নদীর পরপারে মেসাজেটি রাজ্য বিরাজ করিত। ইহারই নিকটে সাইরস্ প্রসিদ্ধ ক্রাইসপলিস্ নগর স্থাপিত করেন। বকৃট্রিয়া পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় তৎপার্শ্ববর্ত্তী তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য সাইরস্ অধিকৃত করেন। পারস্য রাজ্যান্তর্গত হইলেও, বকৃট্রিয়া মারজিয়ানা, খোরাজমিয়া এবং সোঘদিয়ানা আত্মশাসনে বঞ্চিত হয় নাই। ইহারা কেবল মাত্র পারস্য রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে পারস্য রাজ্যের পরাধীন ছিল না।

মেসিডানের মহাবীর আলেকৃজাণ্ডার যখন পারস্য রাজ্য ধ্বংস করেন, সেই সময় ইতিহাসে পুনরায় বকৃট্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বতীর হইতে পারস্যরাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত জয় করিতে আলেকৃজাণ্ডা-রের প্রায় চারি বৎসর লাগিয়াছিল। আলেকৃজাণ্ডার যখন এসিয়াখণ্ড জয় করিবার জন্য মেসিডান হইতে যাত্রা করেন তখন পারস্য-সিংহাসনে দ্বিতীয় দেরায়াস্ সমাসীন। প্রথমে ইসাসের যুদ্ধে আলেকৃজাণ্ডার দেরায়াস্‌কে পরাভূত করেন। পরে আরবেলার মহাযুদ্ধে পরাভূত হইয়া দেরা-য়াস্ স্বকীয় রাজধানী পারসিপলিস্ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। আরবেলার মহাসমরে পারস্যরাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়। বহু সৈন্যসামন্ত সহিত দেরায়াস্ মিডিয়া রাজ্যের রাজধানী একবেটানা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এই স্থানে শান্তিলাভ করিবার অনতিবিলম্বে, বক্-ট্রিয়ার শাসনকর্ত্তা বেসাস্ দেরায়াস্‌কে ধৃত এবং বন্দী করিয়াছিলেন। অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বেসাস্ এই কার্য্য সমাধা করেন। এই কার্য্যের

প্রধান কারণ বিজয়ী আলেকৃজাণ্ডারের হস্তে দেরায়াস্‌কে সমর্পণ করা। বেসাস্ এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ জানিতেন যে আলেকৃজাণ্ডারের নিকট তাঁহাদিগের পরাজয় অবশ্য-ম্ভাবী। সেই কারণ মেসিডান মহাবীরের উচ্ছেদ হইতে ত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, দেরায়াস্‌কে বন্দী করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারিলে তাঁহার রোষ কথঞ্চিৎ উপশম হইবে, এই মানসে তাঁহারা এই নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আরবেলার যুদ্ধের পর আলেকৃজাণ্ডার পারস্যের রাজ-ধানী পারসীপলিস লুণ্ঠন করিয়া পলাতক দেরায়াসের পশ্চাদ্ধাবন করেন। কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে উপনীত হইয়া তিনি সৈন্যগণের বিশ্রাম হেতু কয়েক দিবস তথায় অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে বেসাসের বিশ্বাসঘাতকতা এবং দেরা-য়াসের বিপন্ন অবস্থার কথা তাঁহার নিকট পৌঁছিলে, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া বকৃট্রিয়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বেসাসের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল লইবার জন্য এবং দেরায়াস্‌কে বিপন্ন অবস্থা হইতে সত্বর উদ্ধার করিবার জন্য তিনি ত্বরায় বকৃট্রিয়ায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আলেকৃজাণ্ডারের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বেসাস্ দেরায়াস্‌কে তাঁহার সহিত পলায়ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বিশ্বাসঘাতকের কথায় আস্থা স্থাপন না করায় বেসাস্ দেরায়াস্‌কে নিহত করিয়া বকৃট্রিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করেন। আলেকৃজাণ্ডার বকৃ-ট্রিয়ায় উপনীত হইয়া দেরায়াস্‌কে জীবিত দেখিতে পান নাই। যেখানে দেরায়াসের রক্তাক্তকলেবর ভূমিশায়ী ছিল, সেখানে আসিয়া পারস্যরাজ্যের সম্রাটের দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন। পরিশেষে মহা সম্মানের সহিত তাঁহার মৃতদেহ কবরশায়ী করিয়াছিলেন। দেরা-য়াস্ অতি মহৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। আলেকৃজাণ্ডার ব্যতীত সে সময়ে তাঁহার ন্যায় উচ্চশ্রেণীর যোদ্ধা এবং বীর ছিল না। স্বয়ং বীর বলিয়া আলেকৃজাণ্ডার দেরায়াসের ন্যায় বীরকে বীরোচিত সম্মানের সহিত কবরে শায়িত করেন। দেরায়াসের সমাধির পর আলেকৃজাণ্ডার বর্ত্তমান খোরাসান, সিস্‌টান, বেলুচিস্থান, কান্দাহার এবং আফ্-গানিস্থান যেখানে বিরাজ করিতেছে সেই সকল স্থান অধি-কার করিয়াছিলেন। আলেকৃজাণ্ডার বকৃট্রিয়া পরিত্যাগ করিলে বিশ্বাসঘাতক বেসাস্ পুনরায় রাজধানীতে আগমন করিয়া চতুর্থ আরটাজারাকৃসিস্ নামে নিজেকে অভিহিত করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে অল্প-কাল আলেকৃজাণ্ডার পূর্ব্বদেশ সকল অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, বেসাস্ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৩২৯ অব্দে আলেকৃজাণ্ডার পুনরায় হিন্দুকুস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ড্রপিসাকা (বর্ত্তমান এণ্ডারব) নগরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে এরোনস্ (বর্ত্তমান ঘোরী বা খুলুম) এবং বকৃট্রিয়া পুনরায় অধিকার করেন। আলে-কৃজাণ্ডারের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বেসাস্ অক্ষুনদ পার হইয়া নৌ টাকা (বর্ত্তমান সারিসারাজ) নগরে পলায়ন করেন। জলযানের অভাবে কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া আলেকৃজাণ্ডার পশুচর্ম্মনির্ম্মিত একপ্রকার ভাসমান দ্রব্যের সাহায্যে অক্ষুনদ পার হন। বেসাস্ অত্যন্ত ভীত হইয়া স্পিটমেনিস নামক জনৈক বীরের সাহায্য গ্রহণ করেন। কিন্তু স্পিটমেনিস তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলেকৃজাণ্ডারের নিকট প্রেরণ করেন। আলেকৃজাণ্ডার বিশ্বাসঘাতককে যথোচিত শাস্তি বিধান করিবার জন্য বেসাস্‌কে একবেটা-নায় প্রেরণ করেন। তথায় বেসাসের শেষলীলা সংবরণ হয়।

বেসাসের পরাজয় সমাধা করিয়া আলেকৃজাণ্ডার সোখড়িয়ানার রাজধানী মারকাণ্ডা (বর্ত্তমান সমরখন্দ) অধিকার করেন। এই নগর আয়ত্তে রাখিবার জন্য তথায় প্রভূত সৈন্যবল রাখিয়া আলেকৃজাণ্ডার অন্যান্য দেশ ধ্বংস করেন। পরে জাকৃজারটিস্ নদীর তীরে উপনীত হন। জাকৃজারটিস্ পুরাকালে সিহুন নদী নামে বিখ্যাত ছিল। এখন অনেকে অনুমান করেন যে, আলেকৃজাণ্ডার জাকৃজারটিস্ নদীর তীরস্থিত যে নগরে উপনীত হন, তাহা বর্ত্তমান খোজেণ্ড। খোজেণ্ডে তিনি একটি নগর স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সোখড়িয়া এবং বকৃট্রিয়া নগরে বিদ্রোহ ঘটিলে তিনি এই সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহ দমনার্থ ত্বরিত পদে জাকৃজারটিস্ নদীর তীর পরি-ত্যাগ করেন। বিদ্রোহীদলকে অনতিবিলম্বে দমন করিয়া তিনি জাকৃজারটিস্ নদী পর্য্যন্ত আপনার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। জাকৃজারটিস্ নদীর পর পারে সিথি-য়ানেরা বিদ্রোহী হ ,তিনি নদী পার হইয়া তাহাদিগকে

পরাজয় করেন এবং তথায় আলেক্‌জাণ্ড্রীয় নামে একটি নগর স্থাপন করেন। এই নগর প্রায় ২ ক্রোশ ব্যাপী এক প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। স্পিটামেনিস পুনরায় মার্কাণ্ডা নগরে বিদ্রোহী হইলে, তিনি তথায় বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সেনাদল পলিটিমেটস্ নামক গিরিসঙ্কটে বিদ্রোহীদলের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। পরাজয়ের পর অনেক যোদ্ধা বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক হত হয়। এই পরাজয়বার্ত্তা আলেক্‌জাণ্ডারের নিকট পৌছিলে তিনি মার্কাণ্ডাভিমুখে যাত্রা করেন এবং তথায় চতুর্থ দিবসে আসিয়া উপনীত হন। আসিয়া দেখেন, বিদ্রোহীদলের কর্ত্তা স্পিটামেনিস বক্‌ট্রিয়ায় পলায়ন করিয়াছে। আলেক্‌জাণ্ডার পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শত্রু ধৃত করা অসম্ভব বুঝিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন এবং মার্কাণ্ডানগরের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান জনশূন্য করেন। খৃঃ পূঃ ৩২৯ অব্দের শীতকালে আলেক্‌জাণ্ডার জরিয়স্ নগরে অবস্থান করেন। এখানে অবস্থান কালে স্বদেশ হইতে ১৯০০০ সৈন্য আসিয়া পৌছায়, তাঁহাদিগের দ্বারা তিনি মারজিয়ানা অধিকার করেন। মারজিয়ানা অধিকার হইলেও তথাকার পেট্রাঅক্‌সিয়ানা নামক একটি স্থান দুই বৎসর যাবৎ অরিমেজস্ নামক জনৈক সোথডিয়ান বীরের উত্তেজনায় মত্ত হইয়া ভুবনবিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের ক্ষমতাকে বাধা দিয়াছিল। অবশেষে আহারাদির অভাব হইলে এই স্থান বিজিত হয় এবং অরিমেজস ও তাঁহার পরিবারবর্গ আলেক্‌জাণ্ডারের হস্তে প্রাণত্যাগ করে।

আলেক্‌জাণ্ডার মারজিয়ানা অধিকারের পর তাহার দক্ষিণে (অর্থাৎ বর্ত্তমান সারাকস্ এবং মেরুচাক) দুই কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। পরে যখন তিনি বক্‌ট্রিয়াভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন বর্ত্তমান মিসেনা, অন্তকু, সাবুরগান এবং সরিপুল যে যে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে, তথায় চারিটি সেনানিবেশ স্থাপিত করেন। বক্‌ট্রিয়া হইতে আলেক্‌জাণ্ডার মার্কাণ্ডায় উপস্থিত হন। এই স্থানে আসিবার কিছুদিন পরেই তিনি তাঁহার পুরাতন শত্রু স্পিটমেনিসের বিদ্রোহের কথা জানিতে পারেন। বক্‌ট্রিয়া এবং সোথডিয়ানায় যে সমস্ত সৈন্যসামন্ত তিনি তথাকার শান্তিরক্ষার জন্য রাখিয়া [illegible]সেন, তাহারা স্পিটামেনিসের বিদ্রোহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু শীঘ্রই স্পিটামেনিস হত হইলে, তথাকার শান্তি পুনঃ স্থাপিত হয়। স্পিটামেনিসের শিরচ্ছেদ করিয়া আলেক্‌জাণ্ডারের নিকট প্রেরিত হয়। শান্তিস্থাপনের পর আলেক্‌জাণ্ডার নটাকা নগরে শীতকাল অতিবাহিত করেন। এই স্থানে আলেকজাণ্ডার তাঁহার পরম বন্ধু ও মন্ত্রদাতা ক্লিট্‌স্‌কে হত করেন। এই ঘটনা আলেক্‌জাণ্ডারের চরিত্রের একটি কলঙ্ক। বিশ্বাসী বন্ধুর প্রাণবধ করার অভিসন্ধি ইতিহাসবেত্তারা কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। সেই কারণ কলঙ্ক-কালিমাও আলেক্‌জাণ্ডারের চরিত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেক্‌জাণ্ডার ভারত আক্রমণে ১০,০০০ পদাতিক এবং ৩০০০ অশ্বারোহী চতুরঙ্গ সঙ্গে লইয়া বক্‌ট্রিয়া পরিত্যাগ করেন। আলেক্‌জাণ্ডারের মধ্য-এসিয়ার কার্য্যকলাপ তথাকার জাতীয়-জীবনে চিরকালের জন্য বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। দুই হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে, কত রাজা ও আক্রমণ তথাকার জাতীয় ভাবের উপর উঠিয়া প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডারের কীর্ত্তিকলাপ আজিও জাতীয় সঙ্গীতে, জাতীয় ভাবে এবং জাতীয় ভাষায় সজীব রহিয়াছে। প্রতিদিন মধ্য-এসিয়ার পথে, মাঠে, ঘাটে, পর্ব্বতশিখরে, বনমাঠে, গিরিগহ্বরে সেই কীর্ত্তিকলাপ আজিও গাহকগণ গাহিয়া গাহিয়া প্রতিধ্বনিত করিতেছে। মুসলমান ধর্ম্মপুস্তক কোরাণে তাঁহাকে ধর্ম্মবীর জুলকারনেইল বলিয়া থাকে।

২

আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু সময়ে বক্‌ট্রিয়া এবং সোথডিয়ানা প্রদেশদ্বয় তাঁহার সেনাধ্যক্ষ এমিনটাসের শাসনাধীন ছিল। উক্ত প্রদেশদ্বয়ে মেসিডোনিয়ার যে সকল সৈন্যসামন্ত আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু সময়ে অবস্থিত ছিল, তাহারা মৃত্যু সংবাদে উত্তেজিত হয়, কিন্তু বিদ্রোহ শীঘ্রই প্রশমিত হয়। ইলিমসের ফিলিপ্‌স্ এমিনটস্‌কে রাজ্যচ্যুত করেন। এক বৎসর পরে ফিলিপস্ পারথিয়া রাজ্যে গমন করেন। এবং ষ্ট্রেশানর বক্‌ট্রিয়া শাসন করিতে আরম্ভ করেন। খৃঃ পূঃ ৩০১ অব্দ পর্য্যন্ত ষ্টেসানর বক্‌ট্রিয়া রাজ্য শাসন করেন।

পরে প্রথম সেলুকস্ তাহা হস্তগত করেন। আলেক্‌জাণ্ডারের আয়ত্তীকৃত প্রায় সমুদায় দেশ সেলুকস্ আয়ত্তাধীনে আনয়ন করেন। খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে সেলুকস্ চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা পরাভূত হইয়া সিন্ধুনদী হইতে পারেপেমিসস্ পর্য্যন্ত ভূভাগ জেতাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। খৃঃ পূঃ ২৮০ অব্দে সেলুকস্ তাঁহার একজন কর্ম্মচারী দ্বারা হত হন। তৎপরে প্রথম এন্টিওকাস সিংহাসন অধিরোহণ করেন। খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে দ্বিতীয় এন্টিওকাসের রাজত্বকালে ডাইওডেট্‌স্ বিদ্রোহী হইয়া এন্টিওকাসের বশ্যতা অস্বীকার করেন এবং গ্রিসোবক্‌ট্রিয়ান রাজ্যের প্রবর্ত্তন করেন। ঐতিহাসিক পালিবিয়সের মতে ডাইওডেট্‌স্ ইউথিডেসস্ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। ইউথিডেসস্ এন্টিওকাস দি গ্রেটের দ্বারা পরাভূত হন, কিন্তু বিজিত বিজেতার অনুকম্পায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিজেতা মহান এন্টিওকাস পুনরায় ইতিথিডেসস্‌কে স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করেন।

খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে ডেহিসিথিলিয়ান দলের নেতা আরকেসি নামক জনৈক যোদ্ধা অক্ষুনদীর সমীপে বসবাস করিত। আরকেসি ক্রমে বলবান হইয়া পারথিয়ার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা এণ্ড্রাগোরাসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তথায় আরোহণ করেন।

পারথিয়ার আরমাকিডি বংশের তিনি স্থাপনকর্ত্তা। পারথিয়া রাজ্যের ইতিহাস বস্তুতঃ আরমাকিডি বংশের বিবরণ মাত্র। এই বংশের প্রবর্ত্তক দুই বৎসর রাজ্য করিয়া যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতা তিরিডেটস্ পারথিয়া রাজ্যের ক্ষমতা অনেক বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের পঞ্চম রাজা মিথ্রিডেটস্ খৃঃ পূঃ ১৯০ অব্দে সিংহাসন আরোহণ করিয়া হিমালয় এবং ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত পারথিয়া রাজ্য বিস্তার করেন। খৃঃ পূঃ ১৭০ অব্দে তিনি বক্‌ট্রিয়ার রাজা ইউক্রেটাডসকে তাঁহার রাজ্যের এক অংশ পারথিয়া রাজ্যান্তর্গত করিতে বাধ্য করেন। বহুসম্মানের সহিত কয়েক বৎসর রাজ্য করিয়া তিনি খৃঃ পূঃ ১৪০ অব্দে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার ভ্রাতা ফ্রাটেস্ তাঁহার পর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে সিরিয়ার সেলুসিডি বংশ ধ্বংস হয়। সেই কারণ পারথিয়ার সেলুসিডিদিগের আক্রমণ-ভয় এ সময় হইতে দূরীভূত হয়। যদিও পারথিয়া এক শত্রুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল বটে, কিন্তু অন্য এক ভীষণ বিপদ তাহাকে শীঘ্রই পূর্ব্বদিক হইতে আক্রমণ করে। চীনদেশের ইতিহাসের [illegible]স নামক যে সিথিয়ানদলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহারা খৃষ্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জাক্‌জারটিস্ নদীর প্রান্তর প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রায় সমস্ত ভূভাগ ধ্বংস করে, তাহারাই এই সময়ে পারথিয়া রাজ্য আক্রমণ করে। গ্রীক্ লেখকগণ যে শাকি জাতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে সালিবাহন রাজা যাহাদিগকে পরাজয় করিয়া শকাব্দা সংস্থাপন করেন, তাহারাই এই জাতি। ফ্রাটেস্ এই জাতির একদলকে সিরিয়ার এন্টিওকাসের সহিত যুদ্ধের সময় আপনার সাহায্যার্থে আহ্বান করেন। কিন্তু তাহারা এত বিলম্ব করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় যে তাহাদিগের সাহায্য ফ্রাটেস্ অনাবশ্যক মনে করেন এবং তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহারা ফ্রাটেস্‌কে নিহত করে। তাহার পর তাহার ভ্রাতা দ্বিতীয় আরটাবেনস্ অল্পদিন রাজত্ব করিয়া যোগরিদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মিথ্‌রিডেটিস্ পারথিয়ার কীর্ত্তি পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা পান। তিনি পুনঃ পুনঃ শকদিগকে পরাজিত করিয়া বক্‌ট্রিয়ার অনেক অংশ করতলগত করেন। কিন্তু পরিশেষে যখন তিনি রোমানদিগের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন এক বহুকালব্যাপী সমর আরম্ভ হয়। এই সমরে দ্বিতীয় মিথ্‌রিডেটিস্ পরাজিত হন এবং রোম রাজ্য এসিয়া মাইনরে স্থাপিত হয়। খৃঃ পূঃ ৮৮ অব্দ হইতে ৬৩ অব্দ পর্য্যন্ত মিথ্‌রিডেটিস্ এরূপ সৎসাহসের সহিত পৃথিবীর ভাবী বিজয়ী রোম রাজ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন যে, রোমান সেনাগণ মহাত্মা হানিবলের ক্ষমতার সহিত তাঁহার ক্ষমতা তুলনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে বিংশতি বৎসর যুদ্ধের পর তিনি রোমের ক্ষমতা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার দুর্দ্দমনীয় তেজে রোমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া জীবন যাপন করা ঘৃণিত জ্ঞান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে পম্পী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি ককেসস্ দেশস্থ বস্‌ফোরস্ নগরে আত্মরক্ষা করেন। তথায় রোমের ক্ষমতাকে বাধা দিবার জন্য তিনি সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ

করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রের বিদ্রোহে সমস্ত উপায় ব্যর্থ হয়। পুত্রের অমানুষিক ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁহার যশোগান এখনও ক্রিমিয়া এবং ককেসস্ প্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সময় হইতে খৃঃ অব্দ ২২৬ পর্য্যন্ত পারথিয়ার ইতিহাস কেবল মাত্র গৃহ বিচ্ছেদের ঘটনা মাত্র। এই গৃহ-বিচ্ছেদই ক্রমে ক্রমে পারথিয়া রাজ্যের ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া উহাকে রোমের অধীন করিয়াছিল।

৩

যে সকল জাতি বকট্রিয়া রাজ্য ধ্বংস করে, তাহাদিগের বিবরণ আমরা চীনদেশের ইতিহাসে উল্লেখ দেখিতে পাই। খৃঃ পূঃ ১১২২ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত চীনদেশে চৌ নামক রাজবংশ রাজত্ব করেন। তাহার পতনের পর চীনদেশ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং সমগ্র দেশের রাজার ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। পরে যখন টিসিন রাজা হন, তখন তিনি দেশস্থ সমস্ত স্বাধীন রাজাদিগকে আয়ত্তে আনয়ন করিয়া চীন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এই কার্য্য সমাধা হইতে এক মহান গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই গৃহ-যুদ্ধের সময়ে টিসিন চি হোয়ান টি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। একাদশ লুই ফরাসিদেশে যে মহান কার্য্য সাধিত করিয়া ফরাসি জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, টিসিন সেইরূপ চীনদেশের রাজতন্ত্র শক্তিকে উজ্জ্বলিত করিয়া চীনদিগের কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। দেশ মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া তিনি সীমান্তের উপদ্রব নিবারণার্থে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। হিয়ংনু নামক এক প্রবল সীমান্ত শত্রুর দমনার্থ তিনি বহু সৈন্য গোবী মরুভূমি পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন। হামি বা খামিলনগর যাহা বর্ত্তমান কুলজানগর হইতে প্রায় ৭০০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত রহিয়াছে, তিনি স্থাপন করেন। পশ্চিম হইতে যাহাতে আর কোন প্রবল শত্রু আসিয়া চীনদেশের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে, এই মানসে তিনি চীনদেশে যানহি গিরিসঙ্কট হইতে আরম্ভ করিয়া চীন উত্তরসীমান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইলব্যাপী বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। হিয়ংনু জাতি চিনজিস এবং টাইমুরের মোগল সেনার ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিত। চীনের বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ হইলে হিয়ংনু জাতি চীন-আক্রমণে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের আক্রমণের গতি পশ্চিমাভিমুখে চালাইতে বাধ্য হয়। চীনের শৈলসম প্রাচীর যৎকালে প্রস্তুত হইয়া হিয়ংনু জাতির পরাক্রম একেবারে নষ্ট করে, তখন পামীরে পূর্ব্বদিকে হেক্সাপলিসে শক জাতির অবস্থিতি ছিল। এবং উসুন জাতি নবহ্রদের দক্ষিণদিকে ইউগুর জাতির দ্বারা বিভক্ত হইয়া বাস করিত। খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে ইউএচি (টুংনু) রাজ্য উত্তরে মুজটাগ্ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে দক্ষিণে কিউনলু পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে যাংহাইস্থিত হোয়াংহো হইতে পশ্চিমে কোচী এবং খোটান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে ইউএচি (টুংনু) এবং হিয়ংনু জাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মোথি, হিয়ংনু জাতির রাজা, টুংনু জাতিকে হঠাৎ আক্রমণ করেন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ইউএচি জাতিকে তাহাদিগের রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দেন। ইউএচি জাতি ইলি নদীর পারে পলায়ন করে। এবং মোথি পশ্চিমে ভল্‌গা নদী ও পূর্ব্বে চীনের সীমান্ত দেশ পর্য্যন্ত জয় করেন। সম্রাট কাওটসু যিনি সমগ্র চীনরাজ্য অধিকার করেন, মোথির বিজয়ে ভীত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। চীন সম্রাটের সৈন্যদল মোথি সানসিদেশের উত্তরে ঘেরিয়া পরাস্ত করিলে চীন সম্রাট সন্ধি করিয়া আপনার সৈন্যদল পুনরায় চীনদেশে ফিরাইয়া লইয়া যান। চীন রাজাকে এইরূপে পরাজয় করিয়া মোথি টারটারী প্রদেশ আক্রমণ করেন। পঞ্চাশ বৎসর অবধি হিয়ংনু জাতি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হইয়া অবিরত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকে। তাহারা ক্রমান্বয়ে ইউএচি জাতিকে পরাজিত করিলে পর তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই দলের একটি তিব্বত দেশে আছে। অন্যান্য দল সমুদয় ইলিনদীর পশ্চিম পারে আসিয়া কতককাল যাপন করে, কিন্তু উসুন জাতি তাহাদিগকে পুনরায় উত্যক্ত করিলে তাহারা দক্ষিণদিকে পলায়ন করিয়া ক্যাশ্‌গার, ইয়ারখণ্ড খোটান প্রদেশে আসিয়া অবস্থান করে। খৃঃ পূঃ ১৬৩ অব্দে ইউএচি

জাতি শকজাতিকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করে। শকজাতি সোকৃডিয়ানা হইতে বিতাড়িত হইয়া বকট্রিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলে, গ্রীকদিগকে শক এবং পারথিয়ান জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়। গ্রীক জাতির দ্বারা পরাজিত হইয়া শকেরা পামীর এবং টিন্‌সান প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন ইহারা তিনদলে বিভক্ত হইয়া একদল মুঙ্গেরিয়ার দিকে পলায়ন করে এবং অপরদল হেক্সাপলিস্ প্রদেশে বাস করিয়া উগুর জাতির সহিত বন্ধুতা স্থাপন করে। তৃতীয় দল ইয়ারখন্দ দরিয়ার উত্তর উপত্যকায় স্থান লাভ করে। তাহাদের মধ্যে একদল সেরিকুল এবং মুগ্‌নাম্ দেশ জয় করে এবং আর এক দল কারোকোরম পর্ব্বত পার হইয়া ভারতে আসে।

এই সময়ে চীনবাসীরা হিয়ংনু জাতির বন্দিগণের নিকট হইতে পশ্চিম এসিয়ার সমস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হয়। এই হিয়ংনু জাতির বন্দিগণের প্রমুখাৎ হুনজাতি কর্ত্তৃক ইউএচি জাতির পরাজয় বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া হুনজাতি কি প্রকারে বকট্রিয়া এবং ট্রান-অক্সিয়ানা হস্তগত করে এবং পারথিয়ার বাধা সত্ত্বেও কিরূপে খোরাসান অধিকার করিতে সমর্থ হয়, তাহাও জানিতে পারে। চীন সম্রাট উটী তাঁহার প্রবল শত্রু হিয়ংনু জাতির বিরুদ্ধে ইউএচি জাতির সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার মানসে সেনাপতি চাংকিন্‌কে একশত সৈন্য সমভিব্যাহারে ইউএচি জাতির রাজার নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যখন চীন সেনাপতি হুনদিগের দেশ অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা হুনদিগের হস্তে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হন। কারাগার হইতে অব্যাহতি পাইয়া তাঁহারা ইউএচি জাতির সহিত মিলিত হন। যখন চীন সেনাপতি ইউএচি জাতির সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন, তখন ইউএচি জাতি শকদিগকে সোকৃডিয়ানা প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিতেছিল। চীন সেনাপতি ইউএচিদিগের যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন এবং দুইজন মাত্র সৈন্য সঙ্গে করিয়া চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মধ্য-এসিয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত চীন সেনাপতির নিকট শ্রবণ করিয়া চীন সম্রাট্ বিশেষ প্রীতিলাভ করেন এবং চাংকিনকে উচ্চপদ প্রদান করিয়া তাঁহার সাহস ও পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করেন। চীনদেশের সহিত মধ্য-এসিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধ এই ঘটনার পরিণাম এবং চাংকিনের প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতেই চীন মধ্য-এসিয়ার সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। হুনজাতি কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে এই বাণিজ্যের গতিরোধ হইলেও চীনের মধ্য-এসিয়ার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ অপ্রতিহত ভাবে চলিয়াছিল।

চীনদেশের ইতিহাস পাঠে আমরা নিঃসন্দেহে অবগত হই যে খৃঃ পূঃ ১৬৩ অব্দে গ্রীকেরা সোকৃডিয়ানার শাসনে বঞ্চিত হন। এবং কিছুকাল পরে শকেরা ও পারথিয়ানেরা গ্রীকদিগকে বকট্রিয়া এবং মারজিয়ানা হইতে বিতাড়িত করে। এই সময় হইতে এসিয়াখণ্ডে গ্রীকরাজ্য কেবল মাত্র ককেসস পর্ব্বতের দক্ষিণ উপত্যকায় বিরাজ করিত। গ্রীকদিগের শাসন এসিয়াখণ্ড হইতে লুপ্ত হইলেও গ্রীকসভ্যতার ফল এসিয়াখণ্ডে অনেক কাল বিরাজিত ছিল। শকদিগের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া বকট্রিয়ান জাতি তাহাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে বোখারার সীমান্ত প্রদেশে বাস করে। শকেরা বকট্রিয়া অধিকার করিয়া অধিক দিন তথায় কালযাপন করিতে পারে নাই। খৃঃ পূঃ ১২০ অব্দে শকেরা পুনরায় ইউএচি জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বকট্রিয়া হইতে বিতাড়িত হয়। ইউএচি জাতি শক এবং অবশিষ্ট গ্রীকদিগকে বকট্রিয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া মধ্য এসিয়ার টোখারিস্থান নামক প্রদেশে অবস্থান করে। শক জাতিও দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়া কিপিন, সোকৃডিয়ানা, এরাখোসিয়া (বর্ত্তমান কান্দাহার) এবং দ্রানগিয়ানা (বর্ত্তমান সিস্থান) অধিকার করে। শক জাতি কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ ইউএচি জাতির উপদ্রবের পরিণাম। ইউএচিরা বকট্রিয়াকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলপতিকে প্রদান করেন। যদিও প্রত্যেকের ভিন্ন রাজধানী তথাপি সকলেই যুদ্ধ সময়ে এক স্থানে আসিয়া মিলিত হইত। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে বর্ত্তমান বাসিয়ান প্রদেশে এই মিলনের স্থান ছিল।

প্রায় একশত বৎসর ইউএচিরা এইভাবে বকট্রিয়া রাজ্য শাসন করিলে, খৃঃ পূঃ ৩০ অব্দে তাহাদের একটি দল বিশেষ শক্তিশালী হইয়া অপর চারিদলের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া সমস্ত জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন

করে। তখন সমগ্র ইউএচি জাতি কুইস্বয়াং নামে পরিচিত হইল। পরে তাহারা কুইস্বয়াং নামের পরিবর্ত্তে কুসাং নাম গ্রহণ করে। খৃঃ পূঃ ৭১ অব্দে চীনের সম্রাট ইউএচি জাতির প্রবল শত্রু হিয়ংনু জাতি এবং হুনজাতি উভয়কেই বিশেষরূপে পরাজিত করিলে ইউএচিরা তাহাদের রাজ্য দৃঢ়বদ্ধ করিবার অবকাশ পায় এবং তুর্কিস্থান, পূর্ব্ব ইরাণ ও আফগানিস্থান জয় করে। ইউএচিরা প্রবল শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া কাবুল অধিকার করে। কাবুল তৎকালে শক এবং আরসেডিগণের অধিকৃত ছিল। ইউএচিরা কাবুল অধিকার করিলে শকেরা কিপিন * হইতে পলায়ন করে।

মধ্য-এসিয়ায় কুসাং জাতি এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়াছিল যে রোমানেরা তাহাদিগকে রাজোচিত সম্মানের সহিত ব্যবহার করিত। মার্ক এণ্টোনি বক্‌ট্রিয়ায় দূত প্রেরণ করিয়াছিল, এবং রোমে কুসাং জাতির দূত অবস্থান করিত। ট্রোজান এবং এড্রিয়ানের সময় রোম কুসাং জাতির সহিত বন্ধুতাসূত্রে মিলিত হইয়া প্রবল পারথিয়ানগণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার প্রস্তাব করেন। খৃঃ পূঃ ৯৮ অব্দে কুসাং বা ইউএচি জাতি চীন সেনাপতি পানযাওকে অতি সম্মানের সহিত আহ্বান করেন এবং চীন সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, বাৎসরিক উপঢৌকন দিবার বন্দোবস্ত করেন। ইউএচি জাতির ক্ষমতা অধিক দিন অক্ষতভাবে ছিল না। খৃষ্ট তৃতীয় অব্দের শেষভাগে কাশ্মীর লইয়া পামীরের দক্ষিণভাগের সমুদয় প্রদেশ তাহারা হারাইয়াছিল এবং ৪৩০ খৃষ্টাব্দে তাহারা হুনজাতি কর্ত্তৃক বক্‌ট্রিয়া হইতে বিতাড়িত হয়। কিটোনো কুসাং জাতির শেষ রাজা। তিনি কান্দাহার অধিকার করেন, এবং তথায় তাঁহার পুত্রকে প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া, স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পুত্র নবরাজ্যের রাজধানী পেশবার নগরে স্থাপিত করিয়া কিছুকাল রাজত্ব করিলে পর, হুনজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কান্দাহার হইতে তাড়িত হন। ৪৩০ খৃষ্টাব্দে বক্‌ট্রিয়া যে হুনজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহারা ইউএচি জাতির একটি সম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায় ন্যাপ্‌থালাইটস্‌, হয়াথিলা, ইএথা প্রভৃতি বিবিধ নামে ইতিহাসে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হুনজাতি চীনবাসীদিগের নিকট ইএথা নামে বিশেষরূপে পরিচিত, কারণ চীনদেশের ইতিবৃত্তে ইএচি এবং ইএথা জাতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বর্ণনা পাওয়া যায়। ইএথা জাতি তাতার জাতি সম্ভূত। ইহারা প্রথমে চীনদেশের বৃহৎ প্রাচীরের উত্তরে বাস করে, পরে খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাহাদিগের নিবাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। দক্ষিণ প্রদেশে বসবাসের সময় তাহারা জুয়েন রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করে। পরে উক্ত রাজ্যের অধীনতা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য তাহারা পারস্য রাজ্যের সীমান্ত হইতে, কিপিন খরাসর ক্যাশগার এবং খোটান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। খৃষ্ট ৪২৫ অব্দে ইএথা জাতি ট্রান্স-অক্‌সিয়ানা অধিকার করিলে তাতার জাতি মধ্য-এসিয়ায় আগমন করে। ৩৬০ খৃষ্টাব্দে জুয়েন রাজ্য সমস্ত তাতার রাজ্য করতলগত করে। জুয়েনদিগের এক জন রাজা কোরিয়া হইতে ইউরোপের পূর্ব্বসীমা অবধি রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। জুয়েন জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া হুনজাতি তাহাদের স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হয় এবং ৪২৫ খৃষ্টাব্দে এক দল ট্রান্স্‌-অক্‌সিয়ানায় আসে এবং অপর দল খৃষ্ট ৪৩০ অব্দে এটিলার নায়কত্বে ইউরোপে উপস্থিত হয়। অক্ষু নদী তীরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ, হুনজাতি কুসাংগণের নিকট হইতে হরণ করে, কিন্তু কুসাং জাতিকে একেবারে মধ্য-এসিয়া হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয় নাই। কুসাংজাতি মধ্য-এসিয়ায় অবলীলাক্রমে পাঁচ শত বৎসর আধিপত্য করিয়াছিল। তাহাদিগের পর হুনজাতি ১৫০ বৎসর মধ্য-এসিয়ায় রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময় পারস্য রাজ্যে সাসানাইড-বংশীয়গণ বিরাজ করে।

৪

মধ্য-এসিয়ার ইতিবৃত্ত পারস্যের ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধ। ২১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরবদিগের আক্রমণ পর্য্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর পারস্যের সিংহাসনে

---
* কিপিন বর্ত্তমান কান্দাহার।

সাসানাইড্‌ বংশ আরূঢ় ছিল। সাসানাইড্‌ বংশীয়দিগের কার্য্যকলাপ অনেক পরিমাণে মধ্য-এসিয়ার তৎকালীন ঘটনাসমূহকে পরিচালিত করে। খৃষ্ট তৃতীয়াব্দে পারস্যের অবস্থা একাদশ লুইএর সময়ের ফরাসীদেশের অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সে সময় পারস্য রাজাদিগের ক্ষমতা নাম মাত্রের অধিক ছিল না। সমস্ত রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল জাতি পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে বাস করিয়া সাসানাইড্‌ বংশের একাধিপত্যকে বিশেষরূপে হীন করে। পরিশেষে ইহারা ক্ষমতাবান হইয়া অন্যান্য জাতিকে বশে আনয়ন করে। পাপক দ্বারা এই কার্য্য সমাধা হয়, তিনি সিরাজ নগরের পূর্ব্বস্থিত একটি নগরে প্রথমে বাস করিতেন, আর দেমার নামক তাঁহার এক পুত্রের সাহায্যে তাঁহার দলের নায়ককে পরাজিত করিয়া ফারস্‌ প্রদেশ অধিকার করেন। পাপকের মৃত্যুর সময় তিনি আর দেমারকে অধিকৃত রাজ্য না দিয়া সাপুর নামক অন্য পুত্রকে দিয়া যান। আর দেমার তাহার ভ্রাতা সাপুরকে বিষ-প্রয়োগে নিহত করিয়া পৈতৃক-সিংহাসনে আরূঢ় হন। রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য আরদেমার সমীপবর্ত্তী সমুদয় রাজ্য আক্রমণ করেন। একটি একটি করিয়া সকলগুলি আয়ত্তে আনিয়া তিনি কিরমান, সুসিয়ানা এবং সমস্ত পূর্ব্বদিকস্থিত প্রদেশের একাধিপতি হন। প্রভূত ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া তিনি পরিশেষে পারস্য রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন পারথিয়ান বংশের শেষ রাজা আরডাভান পারস্যের সিংহাসনে সমাসীন। ২১৮ খৃষ্টাব্দে বেবিলোনিয়ার যুদ্ধে পারস্যের রাজা আরডাভান পরাজিত এবং হত হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই আরদেসার পারস্যরাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি ইস্‌টাখর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সিটিসিপন নগরে বাস করেন। আরদেসার নিজে কতটা পৈতৃক রাজ্য বৃদ্ধি করাইয়া ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। ইতিহাসে এই মাত্র জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্য এক দিকে ইউফ্রেটিস্‌ হইতে অপর দিকে খারওয়াজাম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। আরদেসার জ্ঞানী ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক অংশ নেপোলিয়নের জীবনের ন্যায়। অতি হীনাবস্থা হইতে তিনি পরিশেষে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। যে সকল প্রদেশ বহুকালাবধি অরাজকতায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে তিনি শান্তি স্থাপন করেন। ২৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন এবং তাঁহার পুত্র প্রথম সাপুর সিংহাসন পান। তাঁহার রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর তিনি রোম রাজ্যের সহিত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। ২৬০ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট্‌ ভেলেরিয়ান তাঁহার হস্তে বন্দী হইলে যুদ্ধ থামিয়া যায়। যে মুদ্রা এখন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রথম সাপুর খোরাসানের পূর্ব্বপ্রদেশ, নিসাপুর এবং পারস্যের উত্তরে সাপুর অধিকার করেন। ২৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্র হরমাজ, সিরিয়া, এসিয়া মাইনর এবং আরমেনিয়া লইয়া রোমের সহিত যুদ্ধ করেন। পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। বরাসগুড় খৃষ্টানদিগকে উত্যক্ত করে এবং রোমের সহিত যুদ্ধ করে। রোম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। তজ্জন্য তিনি খৃষ্টান এবং জোরোয়াস্‌ট্রিয়ানদিগকে সাম্যতা দানে স্বীকৃত হন। ককেসস্‌ পর্ব্বতের ডেরিয়েল নামক গিরিসঙ্কটের দুর্গাদির ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য রোম রাজা বাৎসরিক কর দিতে স্বীকৃত হয়। এই কার্য্য দ্বারা উভয় রাজ্যই উত্তরস্থিত অসভ্যজাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। রোমরাজ্যের সহিত সন্ধির পর বরামগুড় বক্‌ট্রিয়া আক্রমণ করিয়া এপ্‌থেলাইট বা শুভ্র হুনজাতিকে পরাস্ত করে। তৎপর বরাম সাত হাজার সৈন্য সহিত রজনীযোগে টর্কিদিগকে আক্রমণ করে। টর্কিরা পরাজিত হয় এবং তাহাদের দলপতি কাকান বরাম হস্তে প্রাণত্যাগ করে। অক্ষু নদী পার হইয়া বরাম পূর্ব্বদিকস্থিত জনগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ৪৩৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেদিজাড্‌ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এপ্‌থালাইটসদিগের দ্বারা তিনি অত্যন্ত উত্যক্ত হয়েন। আর মেলিয়া এবং খোরাসান প্রদেশ লইয়া তাঁহাকে হুনজাতির সহিত বহুকালব্যাপী বিবাদে লিপ্ত থাকিতে হয়। উনিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র, তৃতীয় হরমজ এবং পিরুজের মধ্যে

সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। জেদীজাড্ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে রাজ্য লইয়া মনোমালিন্য উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় পিরুজকে সেস্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। পিতার মৃত্যুর পর যখন পিরুজ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন এবং ভূম্যধিকারীগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি অক্ষুনদী পার হইয়া হুনজাতির দলপতিকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। হুনেরা স্বীকৃত হইয়া পিরুজের সাহায্যে ৩০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। এই প্রভূত সৈন্যবল সহকারে পিরুজ পারস্য আক্রমণ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া অন্য তিন জন আত্মীয়ের সহিত হত করেন। এই রাজা কর্ত্তৃক পারস্যের অনেক হিতকর কার্য্য সাধিত হয়। সাত বর্ষব্যাপী এক দুর্ভিক্ষ ইনি দমন করেন। তাবারি ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, অনাহারে এক প্রাণীও এই দুর্ভিক্ষে জীবন শেষ করে নাই। পিরুজ হুনজাতির নেতা কাকালের সাহায্যে পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হন। ৪৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কাকালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারীকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করেন। জোসেপ্ ষ্টাইলাইট এই অকৃতজ্ঞতা রোমানদিগের ষড়যন্ত্রের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নোলডেকের মতে ইহা হুনজাতি কর্ত্তৃক অত্যধিক দাবির পরিণাম মাত্র। হুনেরা পিরুজকে যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহার জন্য অত্যধিক অর্থ দাবি করিলে পর পিরুজ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। যে কারণে হউক না কেন, হুনজাতির সহিত পিরুজের বিবাদে পারস্য রাজ্যের অত্যন্ত অহিত ঘটিয়াছিল। পিরুজের পুত্র কোবাদেকে হুনজাতির নিকট দুই বৎসর কাল জামিন স্বরূপ থাকিতে হয়। পরিশেষে হুনেরা পিরুজকে কারারুদ্ধ করে। ৪৮৪ অব্দে হুনদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহাদিগের হস্তে পিরুজ জীবন ত্যাগ করেন। তাঁহার এক কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া কাকান পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। হুনজাতি কর্ত্তৃক পারস্য রাজ্য অশান্তি-ছায়ায় আবৃত হইলে, সুখ্রা নামক জনৈক ভূম্যধিকারীর চেষ্টায় পারস্য পুনরায় শান্তিময় হইয়া উঠে। হুনজাতিরা যৎকালে পারস্য আক্রমণ করে, সে সময় সুখ্রা আরমেনিয়া প্রদেশে এক বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত থাকেন। ত্বরিতপদে পারস্যের রাজধানীতে অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়া হুনদিগের গতিরোধ করেন এবং পিরুজের ভ্রাতা বলাস্‌কে পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বলাস্ হুনদিগকে অর্থ দিয়া আক্রমণ হইতে বিরত করাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে সে কার্য্য সমাধা করিতে পারেন নাই। রাজ্য মধ্যে অশান্তি বিদ্যমান থাকায় তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন তিনি এমন কোন প্রবল ভূম্যধিকারীর সাহায্য পান নাই। পরন্তু, তিনি ক্ষমতাপন্ন পুরোহিতদিগের কোপে পড়িয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। পুরোহিতেরা বলাসের দুইটী চক্ষু দৃষ্টি ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলে পর, তাঁহাকে রাজত্ব হইতে বঞ্চিত করেন। পিরুজের পুত্র কোবাদ তাহার পর সিংহাসন অধিকার করেন। ইতিবেত্তা তাবারি বলেন যে, সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যখন হুনজাতিদিগের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন নিসাপুরে কয়েকদিন বাস করেন। তথায় তিনি এক ভূম্যধিকারীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইনিই প্রসিদ্ধ অনুসিরওয়ানের জননী। কোবাদ হুনজাতির সাহায্যপ্রার্থী হইয়া চারি বৎসর তাঁহাদের সহিত বাস করেন। অবশেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর কাকান তাঁহাকে সৈন্য সামন্ত দ্বারা সাহায্য করেন। সিমাপুরে অবস্থানকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কোবাদ রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব সুখ্রার হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু যখন সাবালক অবস্থায় উপস্থিত তখন কোবাদ রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব স্বীয় হস্তে লইতে ইচ্ছুক হন, তখন প্রজাগণের ভালবাসা সুখ্রার উপর সম্পূর্ণরূপে ছিল। প্রবল মন্ত্রীকে হত না করিলে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইবার উপায় না দেখিয়া তিনি সুখ্রার প্রাণ বিনাশ করেন।

কোবাদের রাজত্বকালে মাজ্‌ডাক্ নামক এক ধর্ম্মবীর পারস্যে অভ্যুত্থিত হইয়া সাম্যধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার মতে আর্থিক পার্থক্য এবং সামাজিক সাম্যহীনতা ধর্ম্ম বিগর্হিত। সকলেরই সমান ভাবে বিষয় ভোগ দখল করিবার ক্ষমতা আছে। একজন প্রভূত অর্থ ভোগ করিবে, এবং অপর একজন ভিখারী হইয়া জীবন যাপন করিবে, ইহা একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ। মাজ্‌ডাক্ নিজে অতি পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। কোবাদ এই নূতন ধর্ম্মনীতি অতি আগ্রহের সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই ধর্ম্মনীতি প্রজাবর্গের মধ্যে প্রচারিত হইলে অনেক পরিমাণে রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হইবে। কিন্তু জগতের গতি সকল সময় হিতকর কার্য্যের দিকে ধাবিত হয় না। পরিশেষে তাঁহার কার্য্য বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল। পুরোহিতেরা ভূম্যধিকারিগণের সহিত মিলিত হইয়া কোবদাকে সিংহাসনচ্যুত ও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তৎপরিবর্ত্তে কোবাদের ভ্রাতা জামাস্‌প পারস্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হন। কোবাদ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া পুনরায় হুনজাতির সাহায্যপ্রার্থী হন। ৫০২ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদের সহিত বাস করেন, পরে বহু সৈন্যের সহিত পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করেন। কোবাদ দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর রোমের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে উভয়পক্ষই হীনবীর্য্য হইয়া পরিশেষে অসভ্য জাতিদিগের আক্রমণে মুমূর্ষু অবস্থায় পরিণত হন। ৫০৬ খৃষ্টাব্দে রোমের সহিত পারস্যের এক সন্ধি স্থাপিত হয়, কিন্তু এই সন্ধি দ্বারা কোবাদের রাজ্যের অশান্তি নিবারিত হয় নাই। তৎপরে কোবাদ হুনদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত হন। এই বিবাদের পরিণাম জানা যায় না। ৫২৮ অব্দে তিনি ধর্ম্মবীর মাজ্‌ডাক কর্ত্তৃক একত্রিত এক বৃহৎ সেনার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য তিনি বহু চেষ্টা পাইলেও এবং দুষ্টলোকদিগকে দমনের জন্য অনেক কঠোর কার্য্য করিলেও শান্তিরাজ্য স্থাপিত করা তাঁহার পক্ষে সহজ হয় নাই। এই হিতকার্য্য আরম্ভ করিয়া তিনি তিন বৎসরের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম খসরু অথবা ন্যায়পরায়ণ অনুসিরওয়ান প্রাচীন পারস্য ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে তাঁহাকে জ্ঞানী এবং দয়ালু শাসনকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন, পরে হুনদিগকে দমন করেন। টার্ক জাতি কর্ত্তৃক হুনেরা একেবারে মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়। টার্ক জাতির প্রথম উল্লেখ সাসানাইড বংশের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীন ইতিহাসে টার্ক জাতি টুকিউই নামে অভিহিত হইয়াছে। ৫৫০ খৃষ্টাব্দে টার্ক জাতি দুই ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। (১) পূর্ব্ব-টার্ক জাতির রাজ্য ইউরাল পর্ব্বত হইতে মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত (২) পশ্চিম-টার্ক জাতি অথবা টুকিউই মধ্য-এসিয়ার আল্টাই পর্ব্বতশ্রেণী হইতে জাকজারটিস্ নদী পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ড শাসন করিত। ৫৫০ খৃষ্টাব্দে টার্কদিগের দলপতি (কাকান) টুমেন তাতার জাতির উপর বিজয়লাভে অহঙ্কৃত হইয়া জুয়েন জাতির দলপতি টিউপিংএর (কাকানের) কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইবার প্রস্তাব করেন। অবজ্ঞাসূচক প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইলে টুমেন জুয়েন জাতিকে আক্রমণ করেন। তিনি চীন সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে এই সূত্রে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া টিউপিংকে পরাস্ত করেন। টুমেন ইল খাঁ (প্রজাদিগের খাঁ) নামক উপাধি গ্রহণ করিয়া টুকিন পর্ব্বতশ্রেণীর অভ্যন্তরে এবং ঔরটিস্ নদীর উৎপত্তি স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। নবাধিকৃত রাজ্য তাঁহাকে অধিকদিন ভোগ করিতে হয় নাই, ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র কোলো রাজা হন কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ মোকান খাঁ তাঁহার পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে মোকান খাঁ ন্যায়পরায়ণ অনুসিরওয়ানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। যদিও অনুসিরওয়ান জুয়েন জাতিকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বহু বিস্তৃত রাজ্য স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত করেন, তথাচ তিনি চীনসাম্রাজ্যের ক্ষমতায় ভীত হওয়ায় পূর্ব্বদিকে অগ্রসর না হইয়া পশ্চিমদিকের প্রদেশ সমুদয় জয় করেন। টার্ক জাতি জাকজারটিস্ নদী পার হইয়া বালাক্‌সানে উপনীত হন। তথায় তাঁহারা প্রথমে হুনজাতির সহিত নির্ব্বিবাদে বাস করেন।

টার্কদিগের সাহায্যে অনুসিরওয়ান হুনদিগের রাজ্য কত পরিমাণে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। ৫৬০ খৃষ্টাব্দে হুনজাতির সমুদয় প্রদেশ টার্ক এবং পারস্যদিগের দ্বারা দখলীকৃত হয়। টার্কঃ জাতি ট্রান্স্ অকসিয়ানা এবং পারসিকের... স্ এবং

টোথারি স্থান অধিকার করে। অক্ষুনদী উভয় রাজ্যের সীমাস্বরূপ বিদ্যমান ছিল। কিছুদিন পরে বক্‌ট্রিয়া পারস্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুসিরওয়ান টার্কদিগের নায়কের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সখ্যতা বদ্ধমূল করেন। রোমরাজ্য টার্কদিগের সহিত পারস্যরাজের সখ্যতা হিংসার চক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন, এমন কি যাহাতে টার্ক-জাতি অনুসিরওয়ানের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ না হয় তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হয়। পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেও টার্কজাতির উপর অনুসির-ওয়ানের বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি তাহাদের আক্র-মণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সীমান্তে দারবন্দ নগরে এক বৃহৎ কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। এই কেল্লা নির্ম্মাণের পর টার্কদিগের উপদ্রব হইতে অনুসিরওয়ান নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাঁহার জীবনের শেষ সময় কুশল-ময় শান্তিতে অতিবাহিত হয়। ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে অনুসির-ওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার টার্কজাতির নায়কের কন্যা-গর্ভজাত পুত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার নাম চতুর্থ হরমাজ। তাহার রাজত্বকালে রোম এবং টার্ক উভয়জাতিই পারস্য আক্রমণ করে। টার্কদিগের রাজা সাব তিনলক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে বাদঘীস্ এবং হিরাট পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। রোম সম্রাট ৮০,০০০ সৈন্যের সহিত সিরিয়ার মরুভূমে হরমাজকে আক্রমণ করেন। খাজারজাতির রাজা দারবন্দদুর্গ আক্রমণ করে এবং আরব সেনাপতি দুজন ইউফ্রেটিস্ নদীর উপত্যকাভূমি গ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা পান। সাব পারস্য আক্রমণে উদ্যত হইলে, হরমাজ বরাম চুবিন নামক একজন ভূম্যা-ধিকারীকে ১২,০০০ যুদ্ধবিশারদ সৈন্য দিয়া টার্কদিগের গতিরোধ করিতে পাঠান। বরাম ত্বরিতপদে গমন করিয়া টার্কদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে। টার্করা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয় এবং সাব বরামের দ্বারা নিহত হয়। সাবার পুত্র বন্দী হন এবং বরাম ২৫,০০০ উষ্ট্র বোঝাই করিয়া লুণ্ঠনদ্রব্য হরমাজকে পাঠাইয়া দেন। পরে হরমাজ তাঁহার বিজয়ী সেনাপতিকে মধ্য-এসিয়ার রোমসম্রাটের গতিরোধে পাঠান। রোমানদিগের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারায় হরমাজ বরামকে সেনাপতিত্ব হইতে চ্যুত করেন। সেই কারণ বরাম বিদ্রোহী হইয়া হরমাজকে ৫৯০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন চ্যুত করেন। বরাম এক অসাধারণ যোদ্ধা। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ পারস্য-সঙ্গীতে অহরহ গীত হই-তেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহার কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ করিলাম, কারণ বরামের বীর্য্যকাহিনী পারস্যের ইতি-হাসের অংশ। মধ্য-এসিয়ার ইতিহাসের সহিত তাহার যতটুকু সম্বন্ধ ছিল—তাহাই আমরা পাঠককে জানাইলাম।

হরমাজের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় খসরু, ইতিহাসে বিজয়ী পারভিজ্ বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া তাঁহার খুল্লতাত বেনডোকে, হত্যা করেন। বিসটাস্ নামে অপর এক খুল্লতাত, পলাইয়া টার্ক এবং দেলামজাতির সাহায্যে ছয় বৎসর কাল পরে পারভিজের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করেন। পরিশেষে বিসটাস বিশ্বাসঘাতকের প্রাণবধ করেন। ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ডামাস্কাস্ এবং ৬১৪ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেম্ নগর অধিকার করেন। এক সময় ইহা প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, পারভিজ কর্ত্তৃক বিধ্বংসিত রোমরাজ্য পারস্যরাজের অন্তর্ভুক্ত হইবে, কারণ পারভিজ এক বিশেষ প্রবল পরাক্রান্ত এবং কর্ম্মিষ্ঠ রাজা ছিলেন, কিন্তু আরবদেশের মরুত্যকায় ধীরে ধীরে যে শক্তি সঞ্চারিত হইতেছিল তাহা কিয়ৎকালের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া পারস্যের প্রাচীন সভ্যতা এবং ধর্ম্মকে প্রবল বন্যায় বিধৌত করিয়া অনন্তকালের-গর্ভে নিহিত করে। এই মহা-শক্তির সমক্ষে রোমরাজ্য নত এবং পৃথিবীর ইতিহাসের গতি নবভাব ধারণ করে। *

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল।

* এই প্রবন্ধের উপকরণ সমূহ প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত এফ. এইচ. স্ক্রাইন (Mr. F. H. Skrine I. C. S.) এবং কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই. ডি. রস্ (Dr. E. D. Ross. Ph. D.) কর্ত্তৃক সম্পাদিত *Heart of Asia* নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে লর্ড কর্জ্জন কৃত *Russia in Central Asia* নামক পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

উদয়পুর ভ্রমণ।

১

আজ আমরা যে পুণ্যক্ষেত্রের বিবরণ প্রদীপের পাঠক-দিগকে উপহার প্রদান জন্য অগ্রসর হইতেছি, তাহা মহারাণা উদয় সিংহ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত মিবারের রাজধানী উদয়পুর নহে। এই স্থানে প্রাচীনকালে ত্রিপুরার রাজ-ধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল; ইহার পুরাতন নাম "রাঙ্গামাটিয়া"। পুরাকালে, দেবোপম ত্রিপুর-নৃপতিবৃন্দের বিমল-কীর্ত্তি-ভাতিতে এই স্থান সতত উদ্ভাসিত থাকিত। সেই অতুল-নীয় কীর্ত্তির কণিকামাত্র কুড়াইয়া, রবীন্দ্রনাথের "রাজর্ষি" উপন্যাস ও "বিসর্জ্জন" নাটকের উন্মেষ হইয়াছে।

ত্রিপুর রাজ্যে বিষয় কর্ম্মে প্রবেশলাভের পর হইতে, উদয়পুর দর্শনের বাসনা সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরুক থাকিত। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর কৃপায়, অল্পকালের মধ্যেই সে সুযোগ উপস্থিত হইল,—কর্ত্তৃপক্ষের অনুজ্ঞামতে, রাজস্ববিভাগের তদানীন্তন সহকারী (Assistant) স্বর্গীয় কিশোরীমোহন ঠাকুরের উদয়পুর যাত্রায় আমি সহগামী হইলাম। ইহা ১৩০৩ ত্রিপুরাব্দের (১৩০০ বাং) কথা। অতঃপর ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে দ্বিতীয়বার উদয়পুর-দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছে। প্রথমবারের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সহিত আবশ্যক মতে দ্বিতীয়বারের সংগৃহীত বিবরণও সংযোজিত হইবে।

আমাদের প্রথমবারের যাত্রাকালে 'আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে' লাইন খোলা হয় নাই। আমরা পূর্ব্বদিন আহারান্তে রওয়ানা হই, এবং হস্তী আরোহণে অতি কষ্টে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, পর দিবস অপরাহ্ণে কুমিল্লা নগরীতে পৌঁছিয়াছিলাম। তথা হইতে স্বাধীন ত্রিপুরার উপবিভাগ (Sub-Division) সোণামুড়ায় যাওয়া হয়। এই সব-ডিবিসন কুমিল্লার পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী, —খরস্রোতা গোমতী নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। এই স্থানকে কুমিল্লা হইতে ত্রিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিবার সিংহদ্বার বলা যাইতে পারে।

ব্রিটিশসীমা অতিক্রম করিবার অব্যবহিতকাল পরেই "গাজির কোট" নামক উচ্চ ও সুদৃঢ় মৃণ্ময় প্রাচীর এবং প্রশস্ত পরিখা আমাদের নয়নগোচর হইল। প্রাচীর বা আইলের উপর নানাবিধ বৃক্ষগুল্মাদি উৎপন্ন হওয়ায় এখন তাহা একটী সংকীর্ণ পর্ব্বত রেখার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা সমসের গাজির* এই অতুলনীয় কীর্ত্তি ও বীরত্বের জ্বলন্ত-চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া, তৎসম্বন্ধীয় নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে প্রাচীর অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম।

দিবা অবসান কালে সোণামুড়ায় পৌঁছিলাম। এখান হইতেই প্রকৃতির মনোহর দৃশ্যাবলী নবাগত ব্যক্তিবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। সোণামুড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি প্রকৃতির রম্যকুঞ্জ! এখানকার আফিস গৃহ, ডাক্তারখানা, জেল ও হাকিমের বাসা ইত্যাদি একটী অনুন্নত পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। পাদদেশ-প্রবাহিতা ক্ষুদ্র গোমতীকে এই পর্ব্বত পৃষ্ঠ হইতে রজত-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে! গোমতী-বক্ষ হইতে গৃহাদি সুশোভিত ক্ষুদ্র পর্ব্বতটী যে কত সুন্দর দেখায়, তাহা বলিয়া বা লিখিয়া বুঝাইবার নহে—একমাত্র সৌন্দর্য্যপ্রিয় হৃদয়ের উপলব্ধির বিষয়। আমরা নদীসহ এই স্থানের ছবি লইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অধিক দূরত্ব নিবন্ধন কেমেরায় অতি সূক্ষ্ম ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল, এজন্য তাহা গৃহীত হয় নাই।

সোণামুড়ায় পাঁচ দিবস অবস্থান করিয়া, তথাকার আবশ্যকীয় কার্য্যাদি সম্পাদনান্তে ষষ্ঠ দিনের মাধ্যাহ্নিক আহারের পর, নৌকারোহণে, নদীপথে উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের নৌকা খুলিবার অব্যবহিত কাল পরেই আফিসের ঘড়িতে 'ঢং ঢং' করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। সঙ্গে চারিখানা নৌকা ছিল, নদী অপ্রশস্ত অথচ চড়াময়, এজন্য নৌকাগুলি অগ্রপশ্চাৎভাবে সারি বাঁধিয়া চলিতে লাগিল। কিছুকাল নদীর উভয় তীরে, দূরে দূরে "কপোত কপোতির উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধা নীড়ে"র ন্যায় সাধারণ রকমের দুই একখানা লোকালয় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। পশ্চাদ্ভাগে, অনুন্নত পর্ব্বত-পৃষ্ঠস্থিত দূরবর্ত্তী সব-ডিবিসনের দৃশ্য তখনও চিত্রপটের

* সমসের গাজি একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোক। আমরা সময়ান্তরে তাঁহার বিবরণ প্রকাশ করিতে যত্নবান রহিলাম।

ন্যায় নয়নপথে পতিত হইতেছিল। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া শান্ত গম্ভীর প্রকৃতির অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিলাম।

ইহা ফাল্গুন মাসের শেষভাগের কথা—বসন্তের যৌবরাজ্য! এই সময়ে আমাদের "বসন্তে বন ভ্রমণের" বন্দোবস্তটা এক রকম মন্দ হইয়াছিল না। যিনি বসন্তের অপরাহ্ণে একবারমাত্র গিরি-কাননের অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন,তিনিই জানেন, বিপিনে বসন্ত সমাগমে কত মধুরে মধুর সমাবেশ হইয়া থাকে! সেই নদীর উভয় তীরবর্ত্তী তরঙ্গায়িত শৈলমালা,—সেই অপরাহ্ণের রবিকর-রঞ্জিত, মন্দ বসন্তানিলান্দোলিত, শাল তমালাদি বিটপিদল পরিশোভিত, মাধুর্য্যময় বনভূমির মধুরচিত্র আজও যেন হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে! নীল আকাশ তলে—স্নিগ্ধ শ্যামল পর্ব্বত ছায়ায়—নৌকা বক্ষে বসিয়া বসিয়া মুগ্ধের ন্যায় বসন্তের লীলাভূমি সেই বনভাগের উন্মুক্ত শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম। সৌরভবাহী মলয় পবন মৃদু মন্দ ব্যজন করিয়া, আমাকে স্নিগ্ধ করিতেছিল। কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল ঝিল্লীর তানপুরা সহযোগে নানাবিধ মধুময় আলাপন দ্বারা আমার বিমুগ্ধ হৃদয়কে অধিকতর মোহিত করিয়া তুলিল! দয়েল ও শ্যামাগণ পাতার আড়াল হইতে মাঝে মাঝে তান জারি করিয়া, সেই মধুময় সঙ্গীতের মাধুর্য্য যেন আরও বৃদ্ধি করিতেছিল। এমন সময় দূরবর্ত্তী বনান্তরাল হইতে সুমধুর বালককণ্ঠে ভাটিয়ালি রাগিণীতে গীত হইল:—

"বিরলে কইও দূতী বঁধুর লাগ্ পে'লে,—

* * * *

আমি নইলে এই করিও—
না ভাসাইও—না পুড়িও—
বেঁধে রেখো তমালেরি ডালে।"

ইত্যাদি।

ইহা রাখাল বালকের গান। গীত শুনিয়া মনে হইতেছিল, যেন সেই শতযুগ গতা কুঞ্জচারিণী শ্রীরাধিকার বিরহকাতরমর্ম্মোচ্ছ্বাস আজও বনভূমি প্লাবিত করিয়া, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঘাত করিতেছে! কিয়ৎকালের নিমিত্ত যেন আত্মবিস্মৃতি ঘটিল! সেই সময়ের অনন্ত চিন্তা সে কালের অনির্ব্বচনীয় ভাবের একটী বিন্দুও আমার দুর্ব্বল ভাষায় প্রস্ফুটিত হইবার নহে।

পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী অপ্রশস্ত বক্রনদী পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া কল কল নাদে প্রতিকূল তরঙ্গ ঠেলিয়া ধীরে ধীরে আমাদের নৌকাগুলি ভাসিয়া চলিল। কিয়দ্দূর অগ্রসরের পর দেখা গেল, কালবর্ণের মুখ ও ঈষদ নীলের আভাযুক্ত কটালোম বিশিষ্ট বৃহদাকারের বহুসংখ্যক বানর সুদীর্ঘ লাঙ্গুল ঝুলাইয়া বৃক্ষ ডালে সারি সারি উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহারা আমাদের প্রতি বারম্বার গম্ভীর দৃষ্টিপাত করিল মাত্র; কেহই নড়িল চড়িল না, অথবা স্বভাব সুলভ চপলতা দেখাইল না। আমি যে নৌকায় ছিলাম, সেই নৌকার মাঝি শ্রীমান গদাধর মল্ল একটু গঞ্জিকাপ্রিয় লোক ছিল; লোকটা কিছু খোলা অন্তঃকরণের অথচ রসিক। সে নেশার ঝোঁকে কুলচার্য্যের ন্যায় অনেক বক্তৃতা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিল, এই সকল বানরই বীরচূড়ামণি পবননন্দন হনুমানের বংশধর। ইহার আগ্রহপূর্ণ-বক্তৃতা শ্রবণে এবং কপিকুলের আকার প্রকার দর্শনে, অগত্যা আমরা বুঝিয়া লইলাম, ইহারা হনুমানের বংশধর না হইলেও ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি হওয়া খুবই সম্ভবপর! কিছু অগ্রসরের পর আবার নীলবানরের বংশোদ্ভব কতিপয় প্রাণীর সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। ইহারা কালবর্ণের লোমাবলীতে আবৃত এবং লাঙ্গুলবিহীন। বোধ হয়, বিবর্ত্তনবাদী ডারউইনের মত সমর্থন জন্য ইহারা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা একটু দূরে থাকিতেই মহাত্মাগণ অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া গেল। ইহাদের এবম্বিধ অভদ্রতার ভাব দেখিয়া চিন্তা করিতেছিলাম, অগ্রে কোনরূপ সংবাদ না পাঠাইয়া হঠাৎ ইহাদের সমক্ষে উপস্থিত হওয়া আধুনিক 'এটিকেট' বিরুদ্ধকার্য্য বলিয়া মনে করিল কি?

কিয়ৎকাল পরে শ্যামল পর্ব্বতশৃঙ্গ কনকবিভায় বিভাসিত হইয়া উঠিল। শ্রমক্লান্ত মরীচিমালী সহস্রকর প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া, ধরার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপরদিক হইতে স্নিগ্ধ শ্যামলা সন্ধ্যাদেবী ত্রয়োদশীর চাঁদের টিপ পরিয়া, নব বঙ্গবধূর ন্যায় সলাজ চরণক্ষেপে ধীরে ধীরে আগমন করিলেন। তাঁহার অঙ্গের সৌরভে ভুবন আমোদিত, মৃদু মধুর হাসিতে ধরা

স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত! ঝিল্লিকার রুণুঝুণু রব তাহার মুখরিত নূপুর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি হইল; তখন আর নৌকা চালাইবার সুবিধা রহিল না। নিকটে লোকালয় অথবা নৌকার বন্দর ছিল না—তাহা থাকাও অসম্ভব। নিবিড় অরণ্য মধ্যে আমাদিগকে নৌকা রাখিতে হইল। কূলে নৌকা রাখিলে হিংস্রজন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে, এজন্য নদীর মধ্যস্থলে নৌকা রাখা হইল। কিন্তু নদী অতি অপ্রশস্ত অথচ চড়াময়। নদীতীরস্থ অরণ্য হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া, কিম্বা হাঁটিয়া জল পার হইয়া, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণী নৌকায় আসিবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল। তদ্ব্যতীত বন্য হস্তী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ও কম ছিল না। এই সময় মনে স্ফূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ভয়ের সঞ্চার হইল। আমাদের সঙ্গে একজন হাবিলদার ও চারিজন সিপাহী ছিল। সিপাহীগণ বোঝাই বন্দুকের শিরে সঙ্গীন চড়াইয়া, পর্য্যায়ক্রমে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিল। তদ্ভিন্ন সঙ্গীর একটী বন্দুকের উভয় নালে টোটা পূরিয়া, প্রস্তুত রাখা হইল। আমরা অল্প কিছু আহারের পর শয়ন করিলাম। এহেন শঙ্কটাপন্ন স্থানে বন্দুক অথবা প্রহরীর ভরসায় আমার ন্যায় বাঙ্গালী বীরের প্রাণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। ভয়ে ভয়ে সারাটি রাত্রি নিদ্রা হইল না; অনেক চেষ্টার পর,শেষরাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল,গেঁজেল গদাধরের বিকট নাসিকা-গর্জ্জনে অল্পকালের মধ্যেই সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বিরক্ত হইয়া মাঝিকে ডাকিলাম; সে অমনি চমকিয়া উঠিয়া ভীতস্বরে বলিল,—"বাবু কি হইয়াছে?" পাহারার সিপাহী তখন একটু মিষ্টি হাসিয়া, রসিকতার ভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষায় বলিল,—"তোমহার নাকের ভেতর একটা শের হামাইছে!" ইহার পর গদাধরচন্দ্র ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, এক 'ছিলিম' গাঁজার সার্থকতা সম্পাদন করিল এবং নেশার আবেশে প্রাণ খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাইতে লাগিল:—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে,—
আমি আর বাইতে পারি না।
আমি জন্মাবধি মৈলেম বে'য়ে রে
তরী ভাইটায় বই আর উজায় না;—
আমি আর বাইতে পারি না।" ইত্যাদি।

তাহার কণ্ঠস্বর নেহাৎ নিন্দনীয় নহে। সুর তালেও মোটামুটি জ্ঞান আছে, সে সময়ের জন্য গানটী মন্দ লাগিয়াছিল না।

কিছুকাল পরেই উষা নিকটবর্ত্তিনী বলিয়া আভাস পাওয়া গেল। পাখিকুল সুললিতস্বরে মঙ্গল আরতি গাইয়া আমাদের মনে ভরসা জাগাইয়া দিল। তখন আশ্বস্তচিত্তে ভগবানের নাম স্মরণ করিলাম। অল্পকাল পরেই একটু ফর্ষা হইল; তখন আর মনে স্ফূর্ত্তি ধরে না! আমার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ গান করিতে পারিতেন, এমন কথা আমার জানা নাই। আমি কুলের কুসন্তান হইলেও এ বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষগণের পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে এতদিন কোন রকম ত্রুটি করি নাই! কিন্তু আজ যেন আমি সে কথা ভুলিয়া, হঠাৎ গায়ক হইয়া উঠিলাম। মনের আনন্দে গুণ্ গুণ্ স্বরে গাইলাম:—

"অয়ি সুখময়ি উষে, কে তোমারে নিরমিল!"

একটু ফর্ষা হওয়ার পর, আমাদের নৌকাগুলি আবার ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে চলিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বাহ্ণ ৮ঘটিকার সময় নৌকা যে স্থলে পৌঁছিল, তাহার নাম "ঝর্‌ঝরিয়া"। এই স্থানের সম্বন্ধে ত্রিপুররাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় দীনবন্ধু ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"—অদ্য প্রাতে সোণামুড়া হইতে রওয়ানা হইয়া, অপরাহ্ণ ৫টার সময় পথে একটী ঝরণা দেখা গেল। নদীগর্ভ হইতে প্রায় ২৫।৩০ হাত উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর হইতে এক হস্ত পরিমিত বিস্তৃত স্থান দিয়া কলকল ধ্বনি করিয়া, অবিরাম গতিতে প্রবলবেগে নদীগর্ভে জল পতিত হইতেছে। * * * কোথা হইতে এই জল আসিতেছে, দেখিবার এবং ঐ মনোজ্ঞ স্থানের একটী ফটোগ্রাফ উঠাইবার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছিল। বেলা অবসান হওয়ায় ঐ কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার উপায় হইল না। নদীর উভয়তীরস্থ পাহাড় নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যময়। পার্ব্বতীয় লোকের বাচনিক জানা গেল, উক্ত স্থানের নাম 'ঝর্‌ঝরিয়া'। বোধ হয়, ঝর্‌ঝর্ শব্দ করিয়া ঐ স্থান দিয়া অনবরত জল পড়িতেছে বলিয়াই ঐ স্থান ঝর্‌ঝরিয়া নামে অভিহিত হইয়াছে।"

প্রধান মন্ত্রীর রিপোর্ট—পৃঃ ২—১[illegible] ত্রিপুরাব্দ।

আমার ভাগ্যেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রাতে আলোক না পাওয়ায়, ঐ মনোহর দৃশ্যের ফটো লইতে পারিলাম না। ফিরিয়া আসিবার সময়ও বেলা অবসানে ঐ স্থানে পৌছিয়াছিলাম। উপরোদ্ধৃত বাক্য আলোচনায় জানা যায়, ১২৯০ ত্রিপুরাব্দে (১২৮৭ বঙ্গাব্দ) এই ঝর্ণার পরিসর একহস্ত পরিমিত ছিল। আমরা দেখিলাম, এখন তাহা তিন কি চারি হস্ত পরিমাণ বিস্তৃত হইয়াছে। বহু উচ্চ স্থান হইতে ঘন ঘন স্তর বিশিষ্ট প্রস্তরের উপর দিয়া, প্রবলবেগে জল গড়াইয়া পড়িতেছে। আমরা এখানে নৌকা রাখিয়া, কিয়ৎকাল এই প্রস্রবণের অতুল সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম। পরে অতি কষ্টে ও সন্তর্পণে ক্রমান্বয়ে এক প্রস্তর-স্তরের উপর পদ স্থাপন করিয়া, তদুপরিস্থ অন্য প্রস্তর-স্তর ধরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম। কোথা হইতে জল আসিতেছে এবং উপরের স্থানটা কি রকমের, তাহা দেখাই উপরে উঠিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া এত ঘন খাগড়া বন ছিল যে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার অথবা দূরবর্ত্তী স্থান দৃষ্টি করিবার সুবিধা ছিল না। যতটুকু দৃষ্টি চলিল, সমস্ত স্থানই জলমগ্ন দেখিলাম। আমরাও জলের মধ্যেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। স্থানের অবস্থা ভাল রকম দেখা সহজসাধ্য নহে বলিয়া, অগত্যা ভগ্নমনোরথ হইয়া নৌকায় প্রত্যাগমন করিলাম। এই প্রস্রবণের জল অতি পরিষ্কার ও শীতল, কিন্তু তাহাতে গন্ধকের গন্ধ আছে।

নৌকাতেই আমাদের মধ্যাহ্নের রন্ধন ও আহারাদির ব্যবস্থা হইল। মাঝিগণ অবিশ্রান্ত ভাবে নৌকা বাহিয়া অপরাহ্ণ ৪॥০ টার সময় আমাদিগকে উদয়পুরের বাজারের ঘাটে পৌঁছছাইয়া দিল। এই বাজার নদীর দক্ষিণপারে অবস্থিত। নৌকা লাগিবার পর তীরে উঠিয়া মোটামুটি রকমে স্থানের অবস্থাটা একবার দেখিয়া লইলাম। এই স্থান একটি সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা। নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া চারিদিকে যতদূর দেখিতে পাইলাম, তাহার সমস্তই সমতল ভূমি। আমরা যে পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখানে দাঁড়াইয়া তাহার কোনও আভাস পাইলাম না। অথচ চতুর্দ্দিক দৃঢ় ও উন্নত পর্ব্বত-প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। স্থানটি দৃষ্টি-গোচর হওয়া মাত্রই বুঝা যায়, ইহা রাজধানীর প্রকৃত উপযোগী। যত প্রবল শত্রু হউক না কেন, বাহির হইতে এই স্থান আক্রমণ করা কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য নহে; অথচ পর্ব্বত পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া শত্রুদিগকে নির্য্যাতন করিবার বিলক্ষণ সুবিধা আছে।

এখানকার বাজারের নাম "গোলাঘাটি বাজার।" বাজারটী খুব বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী। সর্ব্বাপেক্ষা ধান, চাউল এবং পর্ব্বতজাত তিল, কার্পাস ও কাষ্ঠাদি এই বাজারে অধিক পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এত দিন এই স্থানে একটী পুলিশ থানা ও একটী সেনা নিবাস সন্নিবিষ্ট ছিল, অল্পদিন হইল একটী সব ডেপুটী আফিস খোলা হইয়াছে। আমরা বাজার ও থানা ইত্যাদি দেখিয়া, সন্ধ্যার সময় নৌকায় প্রত্যাগমন করিলাম।

আমাদের রাত্রির আহার থানায় দারোগাবাবুর বাসায় হইল। তাঁহার আদর ও যত্নে বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। আমরাও অশিষ্ট নহি, সুতরাং ষোড়শোপচারে ভোজন করিয়া, দারোগাবাবুকে আপ্যায়িত করিতে ভুলিলাম না। আহারের পর কিছুকাল উদয়পুর সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত হইল, তৎপরে নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। বাজারের ভিতর দিয়া আসিবার সময় দেখিলাম, সারাদিনের পরিশ্রমের পর দোকানদারগণ নানাবিধ আমোদজনক ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত রহিয়াছে। কোন দোকানে সুর সহযোগে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ হইতেছে, কোন কোন গৃহে তাস বা পাশা খেলা হইতেছে, কোথাও বা গল্প চলিয়াছে। একখানা ঘরে কতিপয় ব্যক্তি খঞ্জনী বাজাইয়া সমস্বরে গাইতেছে:—

"আমি অচল পয়সা হ'লেম রে গৌরাঙ্গের বাজারে।
ঘৃণা কৈরে ছোঁয় না মোরে রে——
রসিক দোকানদারে॥"

গানটী শুনিয়া হঠাৎ যেন আমার চমক ভাঙ্গিল। বুঝিলাম, ব্যবসায় অনুসারে লোকের মনোবৃত্তি গঠিত হইয়া থাকে, এবং গানের দ্বারা তাহা পরিব্যক্ত হয়। রাখাল বালকের বিরহসঙ্গীত, নাবিকের নৌ-চালন সম্বন্ধীয় গান, এবং দোকানদারগণের অচল পয়সা সম্বন্ধীয় গীত, একথার সাক্ষী স্বরূপ আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নাবিক এবং দোকানদার পরমার্থ-বিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যেও আপনার ব্যবসায়ের সঙ্গে যেটির সম্বন্ধ আছে, সেইটী বাছিয়া লইয়াছে। এই সকল গানের রচক ও এই রচকের ব্যবসায়ী হওয়া অসম্ভব নহে।

উদয়পুর কেবল রাজধানী বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এমন নহে। এই স্থান তন্ত্রোক্ত পীঠস্থান বলিয়াও বিখ্যাত। পীঠমালা তন্ত্রে, শিবপার্ব্বতী সংবাদে একপঞ্চাশৎ বিদ্যোৎপত্তিতে উক্ত হইয়াছে:—

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।
ভৈরব ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বভিষ্ট ফলপ্রদঃ॥"

"ত্রিপুরা দেশে সতীর দক্ষিণপদ পতিত হওয়াতে তথায় পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরী এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

আমাদের নৌকা যে স্থানে ছিল, তথা হইতে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর বাড়ী পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিন্ন্যূন এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পর দিবস সকাল বেলা দেবালয় দর্শনে যাওয়ার বাসনা হৃদয়ে লইয়া শয়ন করিলাম এবং পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রাহেতু অল্পকালের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলাম। ক্রমশঃ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

মরণান্তে।

(শেষ প্রস্তাব)

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সম্প্রতি "পুরুষপরম্পরার বীজ" (Heredity of germ-plasm) নামে এক মহা বৈজ্ঞানিক নীতির অবতারণা বা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা এতই প্রয়োজনীয় যে ইহা জানিবার ও আলোচনা করিবার যোগ্য। ইউরোপের উষাকাল হইতে বর্ত্তমান যুগের বিবিধ বৈজ্ঞানিক সত্য সমাযুক্ত সময় পর্যন্ত এই পুরুষপরম্পরার বীজ-নীতি বড় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। আমরা পৃথিবীর সর্ব্বজাতি এবং সর্ব্বদেশ মধ্যে সমভাবে এই বীজ-নীতির প্রাবল্য দেখিতে পাইতেছি। ইস্রায়েলীয়ের ঈশ্বর বলিয়াছেন (Old Testament) "তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পাপের প্রভাব বিস্তৃত হয়, কিন্তু ধর্ম্মের প্রভাব অনন্ত পুরুষপরম্পরায় বর্ত্তমান থাকে।" মহর্ষি বেদব্যাস বলেন, "পুণ্য কর্ম্মের মহাবলে পাপের প্রকোপ হইতে পাপিপুঞ্জ পরিত্রাণ পাইতে পারে অথবা পূর্ব্বপুরুষকৃত অপরাধ পরবর্ত্তী পুরুষের পুণ্যকর্ম্মজনিত ফলে মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু পুণ্যের সুখময় ফল হইতে মানবের কোনও পুরুষই বঞ্চিত হয় না।" সভ্য জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, প্রত্যেক জাতি এই মহানীতির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বর্ত্তমান। (The continuity and solidarity of every race is a terrible reality.) মানবের জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষ, অতীতের অমৃতময় অথবা অতীতের অতীব অপদার্থ ফল। আমরা সকলেই অতীতের সুফল বা কুফল; আমরা সকলেই পূর্ব্বপুরুষের কুকর্ম্ম বা সুকর্ম্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ। পূর্ব্বপুরুষদিগের নৈতিকচরিত্র, ধর্ম্মজ্ঞান, বিদ্যাবত্তা অথবা দুর্নৈতিক স্বভাব, অধর্ম্ম কর্ম্ম এবং মূর্খতা আমাদের সুখ দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে; পূর্ব্বপুরুষের রোগ ও অভ্যাস অতীত হইতে বর্ত্তমানে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে। উপদংশ ও শোথ রোগ, পরবর্ত্তী বহুবংশ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়। ফরাসী দেশে যত উন্মাদ দেখা যায়, তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যা হইতেও অধিক লোক কেবল তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের উন্মাদত্বের উত্তরাধিকারী। যে সকল কারণে কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি হয়, তাহা অণুমাত্র বর্ত্তমান না থাকিলেও অনেকের দেহে গলিত কুষ্ঠ হইয়া থাকে, ইহা তাহাদের নিজের দোষ নহে, ইহা তাহাদের নিজের সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্মের "ভোগাভোগ" নহে, ইহা দুর্নৈতিক চরিত্রশালী পিতৃপুরুষের দোষ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে "কঞ্জর" নামক হিন্দুজাতির নীচত্ব, সুরাপানাভ্যাস, কন্যা-বিক্রয়প্রথা, বেশ্যা-ব্যবসায় প্রভৃতি তাহাদের নিজের অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফল নহে, ইহা পুরাকাল হইতে তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে অভ্যাস করিয়াছে এবং পুরুষপরম্পরায় এই কুপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সত্য, ধর্ম্ম ও সুশিক্ষার বলে সুকর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্বপুরুষকৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা আছে, পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্মের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই; অতএব

কর্ম্মের বৈধতা ও অবৈধতাই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ, জন্মবাদ ইহার ভোগাভোগের কারণ নহে। সুতরাং কুষ্ঠ, খঞ্জ, বা চিরদরিদ্র, ইহারা স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করে অথবা পিতৃপুরুষের কু-অভ্যাস বা কুকর্ম্মের জন্য সুখ দুঃখের অধিকারী হয়। যাহারা পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্ম মানে না, তাহারাও ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম এবং "পুরুষপরম্পরাগত বীজ" নীতির ফলাকল মান্য করিতে বাধ্য। তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সুখ ও শান্তি, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ, কেবল জাতি বা বর্ণ বা সম্প্রদায় বিশেষের "অধিকার" বা পৈত্রিক-সম্পত্তি" নহে, ইহা কেবল ব্রাহ্মণের বা সৈয়দের অথবা পাদ্রির এক চেটিয়া জিনিষ নহে ; ইহা প্রত্যেক ভক্তের প্রত্যেক ব্রহ্মজ্ঞানীর, প্রত্যেক কল্যাণকৃৎ কর্ম্মকারীর সাধারণ সম্পত্তি। সুতরাং জন্মান্তরবাদের পক্ষপাতীরা কাহাকেও এই মোক্ষ হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পাইলে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে পণ্ডিত, বৃথা কূটতর্কজাল পাতিত করিয়া চণ্ডালজাতীয় ভক্তাধিক ভক্ত সাধু মহাত্মাকে, মৃত্যুর পরে অমৃতধামের অধিকারী হইতে দেয় না, তাহার মত মূর্খ ও ধর্ম্মবৈরী বোধ হয়, আর দ্বিতীয় নাই। (Priest-craft, the cause of all religions, makes religion a calamity.)

মৃত্যুর পরে পশু বা তির্য্যকযোনিতে মনুষ্যের আত্মার প্রবেশ হওয়ার কথাটা বোধ হয় অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পাশবযোনি বা তির্য্যকযোনির প্রসঙ্গের অর্থও অন্যরূপ, সেই গুপ্ত অর্থ (Esoteric teaching) অনেকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট জীবশ্রেষ্ঠ মানব, মৃত্যুর পরে অপরাধ বা মহাপাপ বশতঃ তরু লতা গুল্ম প্রস্তর পশু পক্ষী কীট কীটাণু প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া যায়, এই কথাটা সৎবুদ্ধি সঞ্জাতা যুক্তি কিম্বা জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে আইসে না। মানবের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, মানবের বিদ্যা ও ধর্ম্মবুদ্ধি সঞ্জাত জ্ঞান, মানবের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং ঈশ্বরোপাসনা জন্য তাহার প্রবৃত্তি, পৃথিবীর অপর শ্রেণীর প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মানবের দেহ, মানবের আত্মার উপযুক্ত ; পশু ও পক্ষীর শরীর তাহাদের স্বভাবজ জ্ঞানের ও অভ্যাসের (Instincts and habits) উপযুক্ত ঐন্দ্রিয়িক (organic) এবং অনৈন্দ্রিয়িক (Inorganic) জগতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাহারা কাল ও পুরুষপরম্পরায় স্ব স্ব শ্রেণীজ স্বভাব ও প্রকৃতিরই অধিকারী হইয়া থাকে। গজেন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তুরঙ্গের শীঘ্রতা, শশকের চাঞ্চল্য, শার্দ্দূলের ভীষণতা অথবা মানবের বাক্‌শক্তি তাহাদের পুরুষ-পরম্পরায় প্রচলিত। সুতরাং জন্মান্তরে মনুষ্যের পশু, পক্ষী, কীট বা প্রস্তর হওয়ার কথাটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হয় না কি ? প্রকৃতির অতি সুন্দর শৃঙ্খল এবং অতি সুন্দর নিয়ম সহজে ভগ্ন হয় না এবং ভগ্ন হইতে পারে না। তাহাতেই বলিতেছি, মানুষ যদি পশু হয়, পশু যদি পাখী হয় অথবা হস্তী যদি শার্দ্দূল কিম্বা শার্দ্দূল যদি মৃগ হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম একেবারেই ভগ্ন হইয়া পৃথিবীকে এক মহা ভীষণ ও মহাকঠোর ক্লেশাগারে পরিণত করিতে পারে। কোনও নিম্নশ্রেণীর জীবকে (পশু পক্ষী অথবা কীটকে) পরীক্ষা করিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই যে, পূর্ব্বজন্মে ইহাদের কেহ মানবদেহধারী জীব ছিল, অথবা "কুকর্ম্মের ফলে জন্মান্তরে অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে" ; বরং অন্য দিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, মনুষ্য মধ্যে যে চিন্তা, উদ্বেগ, উদ্যম, ক্লেশ, প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, পশু বা পক্ষীতে তাহা নাই, সুতরাং "পাপের ভোগাভোগ" কথাটা কেমনে খাটিতে পারে ? শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা নিম্নশ্রেণীর জীবে কথনও মানবের আত্মার লক্ষণ দেখিতে পান নাই। মানবমাত্রেই হাস্য করিতে পারে, কিন্তু মানব ভিন্ন আর কোন প্রাণী হাসিতে পারে না। আর এক কথা এই যে, প্রকৃতি সর্ব্বদাই উন্নতিশীলা, প্রকৃতির গতি উন্নতির দিকে, ইহা কথন আবর্ত্তনশীল নহে। (The march of nature is progressive not self-revolving) প্রকৃতি কখনও ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সরোবরের সশল্য সলিলের ন্যায় স্থিতিশীল নহে। (Nature never halts ; retrogression she resists and so with man's moral and spiritual being) সুতরাং মানুষ দেবতা না হইয়া যদি পশু বা পক্ষী হইল, এই শিক্ষা ও পরীক্ষার মহাক্ষেত্র স্বরূপ

সংসার মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া যদি সর্প, সজারু, সারমেয় বা পিপীলিকায় পরিণত হয়, তাহা হইলে বিবর্ত্তনবাদ কোথায় থাকিতেছে ? তাহা হইলে প্রকৃতির উন্নতিশীলতার আর প্রশংসা করি কেন ?

মানবের স্মৃতিশক্তি তাহার উন্নতির অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ পূর্ব্বজন্মের সহিত বর্ত্তমান জন্মের এবং বর্ত্তমান জন্মের সহিত ভবিষ্যকালের স্মৃতির কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না। যদি স্মৃতিই বিভ্রষ্ট হইল, তাহা হইলে সুখ দুঃখ ভোগের——পাপপুণ্যের ফলাফলের ভোগাভোগের——জ্ঞান কোথায় থাকে ? তাহা হইলে মৃত্যুর পরে জন্মের পূর্ব্বের ভোগাভোগের কথাটা যেন একটা প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। পৌরাণিক বলেন, মনুষ্যের যতবার জন্ম হয় ততবার মৃত্যু হয়, প্রত্যেকবারের মৃত্যুর সময়ে আত্মার সহিত "মানস" বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বোধাবোধ (Consciousness of personal identity) না হইলে তাহার আত্মার আত্মত্ব লোপ হইয়া যায়। (The soul exhibits such a unity of constitution that if any part or faculty is taken away, such as memory or perception or consciousness of personal identity, it is not the same being. it ceases to be the *same* soul.) যদি স্মৃতিশক্তি এবং ব্যক্তিগত বোধাবোধ রহিত হয় তাহা-হইলে পাপ বা পুণ্যের নাম, সংজ্ঞা, প্রকৃতি, গুরুত্ব, দায়িত্ব, ঘটনার স্থান, দণ্ডের পরিমাণ, পশ্চাত্তাপ, ঘৃণা বা আনন্দ বোধ প্রভৃতি লোপ না পাইবে কেন ? তাহা হইলে আর পুরস্কার বা দণ্ডের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কোথায় রহিল ? যে বালক বহুবর্ষ পূর্ব্বে অপরাধ করিয়াছিল, এখন যাহার নাম পর্য্যন্ত তাহার মনে নাই, সে বালককে বৃদ্ধাবস্থায় দণ্ডাবস্থার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, অসহনীয় অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন পাপের জ্ঞান নাই, যখন পাপের স্মৃতি, পাপের জন্য মনস্তাপ নাই, তখন পাপের জন্য দণ্ড-ভোগ, অমস্তকী মানুষের মাথাব্যথার জন্য ঔষধ প্রয়োগ, একই কথা। যেখানে পাপের বোধাবোধ নাই, সেখানে পাপের কথা ভাবা বোধ হয়, Positive moral harm—নিশ্চয়ই নৈতিক হীনতা।

যাহাকে আমরা শাস্ত্র বলি, তাহাতে দেখিতে পাই, এক যুগের পাপ অন্য যুগে বর্ত্তমান থাকে না। সত্যযুগের পাপ ত্রেতায়, ত্রেতার দ্বাপরে এবং দ্বাপরের পাপ কলিতে থাকে না। তাহা হইলে আর পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যের ভোগাভোগ কোথায় থাকিল ? এই যে লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অস্থিচর্ম্মসার ভারতবাসী এক মুষ্টি অন্নের জন্য চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে স্ত্রীপুত্রকে বিক্রয় করিয়া উদর পূরণের চেষ্টা করিতেছে, এই যে বঙ্গীয় সাহিত্য-জীবী পুরুষেরা দুই বেলায় দুই মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছে, এই যে কুলি-শ্রেণীর লোকেরা ইংরাজের পদাঘাতে নিত্য নিত্য ভবপারের ভাবনা হইতে বিমুক্ত হইতেছে, এই যে লক্ষ লক্ষ হতভাগিনী বিধবার ক্রন্দনে ভারতভূমি রসাতলে যাইতেছে, এই সকলও কি পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল ? পাপের ফল কিনা, সে বিষয়ে তর্ক করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই, কিন্তু এই দুষ্ট তর্কে আমাদের অনেকটা ক্ষতি করে, ইহা আমি স্বীকার করি। It may be one of the strongest traits of the Hindu characters, and one of the greatest charms is to enjender apathy and unconcern. * * It deprives a Hindoo of the sense of present duty and the power to struggle energetically with difficulties and misfortunes, ceases to overcome them in a distinctive feature of the west. It is inimical to national progress, it acts as a barrier to the alleviation of human maladies, এই তর্ক বহু যুগ ব্যাপিয়া চলিয়া আসিতেছে কিন্তু সত্য হইতে কলি যুগ পর্য্যন্ত জাতীয় উন্নতি হইয়াছে কি ? জন্মান্তরবাদ অনেকে ভাল করিয়া বুঝেন নাই, ইহার অর্থে ভ্রম আছে, আইস, গুপ্ত রহস্যের উন্মেষণ করিয়া সেই ভ্রমের নিরাকরণ করি। এই ভ্রমে সত্য আছে নিশ্চয়, এবং সেই জন্যই এখনও সমাজ তিষ্ঠিতে সমর্থ হইয়াছে। Every error will line as long, and only as long, as its share of truth remains unrecognised.

বর্ত্তমান প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেক বিশিষ্ট হিন্দু হয় ত এই অভিমতকে হিন্দুত্বহীন বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু এই সন্দেহ ভ্রমাত্মক। শাস্ত্রাভিজ্ঞগণের মনোমধ্যে এরূপ সন্দেহ আদৌ জন্মিতে পারে না। আমার এই অভিমত সম্পূর্ণ শাস্ত্র সম্মত। আমি শাস্ত্রকে পুনঃ পুনঃ সহায় স্বরূপে অবলম্বন করিয়াছি।

"যথা দিকনির্ণয়ে চুম্বকো মুখ্য সাধকং।
তথাহি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সত্যং সত্যং সর্ব্বযুগে॥"

প্রকৃত কথা এই যে, ভগবানের বরাহ অবতার হওয়ার কথাটার বাস্তব মর্ম্ম যদি কেহ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে মনুষ্যের শূকরযোনিতে প্রবেশ অথবা শূকরের মনুষ্য-যোনিতে প্রবেশের অর্থও তিনি বুঝিতে অক্ষম হয়েন, কিন্তু সে কথা বুঝাইবার সময় নাই। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের দশটি বিষয় সকলের স্মরণ রাখা উচিত। (১ম) পরলোক আছে, (২য়) পরলোকের বিশ্বাসে জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয়, (৩য়) পরলোকের নৈতিক বিশ্বাসে আধ্যাত্মিক উন্নতি জন্মে, (৪র্থ) মৃত্যুর পরে বৌদ্ধের নৈস্বর্গিক অবস্থা অবৈজ্ঞানিক ও অসঙ্গত, (৫ম) মৃত্যুর পরে তুমি যাহাই হও, কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রত্যেক মানবের উন্নতির প্রধান কারণ। কর্ম্ম পরিত্যাগ, মূর্খতা ও অলসতার প্রমাণ, (৬ষ্ঠ) পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্মের তর্ক লইয়া বর্ত্তমান জন্মের কর্ত্তব্য ভুলিতে পারি না, (৭ম) এই সংসার যতই অসার হউক, ইহা শিক্ষা ও পরীক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। সংসার অসার সত্য কিন্তু অসার ভাবিয়া কর্ত্তব্য হইতে বিমুখ হইতে পারি না। কর্ত্তব্যের নাম ধর্ম্ম, (৮ম) যাহারা মৃত্যুর পরে অমৃতধামের অধিকারী হয়, তাহাদের শিক্ষা বা পরীক্ষার অবস্থা আইসে না, তাহারা পরীক্ষাতীত, (৯ম) যাহারা অমৃতধামের অধিকারী হইবার উপযুক্ত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা শিক্ষা ও পরীক্ষার অবস্থা বলিয়া গণ্য হয়, (১০ম) সংসার সর্ব্বদা "অসার" বিশেষণে উপাধিত, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এই সংসারে কিছুই অসার নহে, গুণগ্রাহী ও সারগ্রাহী পুরুষের নিকটে সমুদয়ই সারবান। জন্মবাদ লইয়া অদৃষ্টবাদের তর্কে নিরাশাগ্রস্ত না হইয়া সকলে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক অমর অমৃতধামের দিকে অগ্রসর এবং অক্ষয় অক্ষয়ানন্দ ভোগের চেষ্টা কর।

হিন্দুশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন, কেবল নিষ্কামী পুরুষেরাই অনন্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া "অমর" হয়েন—কেবল নিষ্কামী পুরুষেরাই অমৃতধামের একমাত্র অধিকারী। যিনি স্বর্গের কামনা করেন না, যিনি মনোমধ্যে নরকেরও প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি পোষণ করেন না, সেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধরহিত "মহাপুরুষ" অখণ্ডানন্দের একমাত্র অধিকারী। মানবের সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গেলে মানব"কামনা" শূন্য হইয়া নিষ্কামী হয়, তখন তাঁহার আর কামনা থাকে না। এবম্প্রকার অবস্থায় কেবল "শুদ্ধ চিদানন্দ" থাকে এখন স্বয়ং "আনন্দ" রূপে মহানন্দে বিরাজ করেন, ইহা শিব-মূর্ত্তির লক্ষণ। শাস্ত্রে এই অবস্থার নাম সাযুজ্য মোক্ষ। মৃত্যুর পরে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, ইহার উর্দ্ধতর অবস্থা পৃথিবীর কোনও শাস্ত্রে নাই। ইহাই গ্রীকদিগের য়োপ্পিত্ত, য়িহুদীদিগের জোন, কোরীশ, প্রাচীন আরব্যদিগের বেহেস্তো-এ-আলা, মুসলমান্‌দিগের নেজাৎ, পার্শীক ও রোমকদিগের পারাদী (Paradise) এবং হিন্দুর পরামুক্তি। পরমারাধ্য পরমেশ্বর যে জীবের চরমোন্নতির জন্য এরূপ অবস্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শিক্ষা সাধনা ও পরীক্ষা দ্বারা সেই জীব ক্রমশঃ উন্নতির পবিত্র ও প্রশান্তমার্গাভিমুখে অগ্রসর না আবার শূকর, শশক, শার্দ্দূল প্রভৃতি জীবের অধোগতিক অবস্থায় অবনত হয়, এ কথা বিশ্বাস করিতে স্বভাবতঃ হৃদয়ে বড়ই ব্যথা জন্মে। এ কথা শাস্ত্র, যুক্তি, বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্বের বিপরীত।

এখন কথা এই যে সন্তানসন্ততি কি প্রকার গুণ, কি প্রকার প্রকৃতি, বা কি প্রকার দেহ প্রাপ্ত হইবে, ইহা না জানিয়াও কি লোকে বিবাহ করেন না? মৃত্যুর পরে কি হইবে ইহা না জানিয়াও আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইব কেন? "মৃত্যুর পরে আমি কি হইব?" এরূপ প্রশ্ন—এরূপ অনুসন্ধান—সকামীর কর্ম্ম; "মৃত্যুর পরে আমি যাহাই হই, আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাই" ইহাই নিষ্কামীর ধর্ম্ম। অতএব "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের দুঃখভোগ করিতেছি বলিয়া পরজন্মেও দুঃখ ভোগ করিতে থাকিব" এইরূপ কল্পনা কেবল পাগলের মনেই শোভা পায়। দুঃখ যে আমাদের মহাশিক্ষক ইহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল
তুলিতে।
দুঃখ বিনা সুখ কভু হয় কি
মহীতে?"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

—:*:—

যমের জামাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাখী উড়িল।

সঙ্কেতের সময় আগতপ্রায়। নফর, কাণ খাড়া করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা নহে, নিদ্রার ভান। সে অবস্থায় ত কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রা হয় না। নফর মধ্যে মধ্যে কিসে কারণে চমকিয়া উঠিতেছে, কতবার মনে করিল, দরজায় শব্দ হইল; কতবারই তাহার আশা বিফল হইল! এরূপ সময়ে এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু নফর একেবারে হতাশ হইবার লোক নহে। রাক্ষসপুরীর দেবী যদি উদ্ধার না করেন—না করিতে পারেন, তাহা হইলেও নফর অন্য পথ দেখিবে।

টুক্‌টুক্‌ শব্দ হইল; নফর বুঝিল, দরজায় ঘা পড়িল। দরজার খিল খুলিয়া, কে নফরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নফর প্রথমে ভয়ে চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণে অভয় পাইয়া একটু স্থির হইল। নফর দেখিল, মূর্ত্তি পোষাকে পুরুষের মত, কিন্তু পুরুষ নহে; ঘোষ-তনয়া পুরুষবেশে উপস্থিত। মাথায় কাপড়ের পাগড়ী, তাহাতে খোঁপা ঢাকা পড়িয়াছে। কাপড় পুরুষের মত মালকোঁচা মারিয়া পরা, গায়ে একখানা চাদর জড়ান।

কর্ত্তব্য পূর্ব্বাহ্নেই স্থির হইয়াছিল। কালিদাস দুর্গাদাস দুই ভৃত্য এবং নফর গোবর, ছয় জনই ঘোষ-তনয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। লট-বহর পড়িয়া থাকিল; কেবল যে থলিয়ায় টাকা কড়ি ছিল, সেইটাই নফর নিজে লইয়া সাবধানে কোমরে বাঁধিল। আর সে নিজে একখানি কাতান লইল, অন্যখানি গোবরের হাতে দিল। নফর থাকিল সকলের আগে, গোবর থাকিল সকলের পশ্চাতে।

যে পথে নফর অন্দরের পশ্চাতে গিয়া, ঘোষ-তনয়া ও তাঁহার স্বামীর গুপ্ত কথা শুনিয়াছিল, সেই পথেই যাইতে লাগিল। নফর যে পর্য্যন্ত গিয়াছিল, ঘোষ-তনয়া সে পর্য্যন্ত গিয়া থামিলেন না; তিনি একটু ঘুরিয়া অন্যদিকে গেলেন। খানিক দূর গিয়াই নফর দেখিল, একটা গুপ্তদ্বার। অন্দরের দ্বার ঐরূপ স্থানে কেন, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ঐ দ্বার দিয়া একটা গুপ্তপথে গঙ্গা-তীরে যাওয়া আসা চলে; গঙ্গায় যাহা ইচ্ছা ফেলাও চলে। সকলে যখন ঐ গুপ্তদ্বারের কাছে উপস্থিত হইলেন, তখনই আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া, আর এক মূর্ত্তি বাহির হইলেন। নফর বুঝিল, ইনিই যমের জামাতা;—কিন্তু এখন দেবীর দেবপুরুষ। গুপ্তপথে গঙ্গাতীরের দিকে গিয়া, দেবী দিক্ পরিবর্ত্তন করিলেন। নফর দেখিল, ঈশানকোণ বটে। তখন কলাপাতের সহজেই ব্যাখ্যা হইল। ঈশানে যাত্রা শুভ, যোগিনী অনুকূল; ঘোষ-তনয়াই যোগিনী।

দৈব অনুকূল না হইলে, কেহই অনুকূল হইতে পারে না। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে যমালয় পার হইলেন। ঈশান-কোণের পথটা দুর্গম, মধ্যে মধ্যে বন। কিন্তু পথে কোন বিঘ্ন হইল না, সকলেই গিয়া সদর রাস্তায় পড়িলেন। নফর দেখিল, সকলেই আসিয়াছেন।

যোগিনী উত্তরমুখে না গিয়া দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন। মিত্র মহাশয়েরা রাত্রে যে পথে হরিপুরে আসিয়াছেন, আবার সেই পথেই প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহাতে একটু ইতস্ততঃ হইবার কথা; কিন্তু যোগিনী যে দিকে লইয়া যাইবেন, সকলকেই সেই দিকে যাইতে হইবে। কাজেই সকলেই দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। যোগিনী বরাবর সদর রাস্তা ধরিয়াই চলিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, এরূপ সময়ে সদর রাস্তা ধরিয়াই চলা উচিত। বন জঙ্গলের পথেই ভয় অধিক; যম পিতার কিঙ্করেরা যদি থাকে ত বন জঙ্গলেই লুকাইয়া আছে, রাজপথের উপর সন্দেহই কম। যোগিনী বুদ্ধিমতী।

যমালয়ে তখনও কাহারও কোনরূপ চাঞ্চল্য হয় নাই। পাখী খাঁচায় পড়িয়াছে, পলায়নের পথ বন্ধ হইয়াছে; কাজেই সন্দেহের অবসর হয় নাই। নিজের কন্যা ও জামাতা যে খাঁচা খুলিয়া পাখী সঙ্গে করিয়া লইয়া পলাইবে, ইহা যম স্বপ্নেও ভাবেন নাই, কন্যার উপর এতদূর অকৃতজ্ঞতার আরোপ করিবার হেতু তিনি কখনও দেখিতে পান নাই; বরং জামাতাকে কন্যার হেপাজাতে দিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন।

হরিপুর হইতে নসরাই অধিকদূর নহে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন নসরাইয়ে কুন্তীর উপর পুল হইয়াছিল; সুতরাং পলায়নে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। যে দোকানী কালিদাস বাবুকে হরিপুরে আশ্রয় লইতে পাঠাইয়া দিয়াছিল, সে যে যমেরই ভক্ত অনুরক্ত শিষ্য—তাহারই আশ্রিত, তাহা শেষে কালিদাস বাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যমের কাছারীতে যে সকল ব্রজলীলার কথা চলিয়াছিল, এখন সে গুলির তাৎপর্য্য কালিদাস বাবু বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। যমকিঙ্কর দস্যুদিগের মধ্যে কে কোথায় আছে, কি করিতেছে, কোথায় কিরূপ যোগাড় যন্ত্রের সম্ভাবনা আছে, ইত্যাদি সংবাদই যে ব্রজলীলাব্যপদেশে প্রদত্ত হইয়াছিল, কংসবধের মধ্যে যে নরহত্যার সম্বন্ধ আছে; তাহা এখন কালিদাস বুঝিয়াছেন, দুর্গাদাসও বুঝিয়াছেন।

দোকানীকে বড় ভয় ছিল। ভয় ছিল, পাছে সে এখন দেখিতে পায়। দেখিতে পাইলেও হয় ত কিছু করিতে পারিত না, হয় ত যমকরের কাতানেই তাহাকে কুন্তীর গর্ভস্থ হইতে হইত। কিন্তু একটা হৈ চৈ হাঙ্গামার ত ভয় ছিল। আর যদিই তাহার সহচর অনুচর থাকিত। যাহাই হউক, দৈব এখন খুব অনুকূল। যোগিনী সকলকেই নির্ব্বিঘ্নে নসরাই পার করিয়া লইয়া আসিলেন।

আর বড় অধিকদূর আসিতে হইল না; এইবার চন্দ্রহাটী। তখন চন্দ্রহাটীর মজুমদার মহাশয়দিগের সমৃদ্ধিকাল। বড় মজুমদার মহাশয় কলিকাতায় কোম্পানির একজন বড় কর্ম্মচারী, সল্টবোর্ডের নায়েব-দেওয়ান, মজুমদার মহাশয় তখন হুগলি জেলার একজন প্রধান পুরুষ। বাড়ীতে লোক জন অনেক; পাইক সর্দ্দারে বাড়ী পূর্ণ। বাড়ীতে বিবাহ বলিয়া, বড় মজুমদার কলিকাতা হইতে বাড়ী গিয়াছেন। রাত্রি-শেষে বিবাহ-বাড়ীতে লোকজন উঠিয়াছে। দেউড়ী বন্ধ!

যোগিনী নিজেই দেউড়ীতে ঘা দিলেন। দুই তিন বার পর একজন চৌকিদার সাড়া দিল। হিন্দুস্থানী চৌবে তেওয়ারীদিগের তখনও প্রতিপত্তি হয় নাই। বাঙ্গালী পাইকেরাই প্রহরিকার্য্যে অদ্বিতীয় ছিল। মজুমদার ভবনের দেউড়ীতে দুই চারি জন পাইক নিয়তই থাকিত; রাত্রিকালে ৮।১০ জনকে থাকিতে হইত। দস্যুভয় তখন সকল হৃদয়েই বিরাজ করিত। দরজায় আঘাত হইবামাত্র, একজন পাইক জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও?"

তখন জামাতা বলিলেন,—"বিপন্ন পথিক, সঙ্গে একটী কুলকামিনী আছেন, আমরা ভদ্রলোক। শীঘ্র দরজা খোল, নতুবা আবার বিপদে পড়িব।"

চৌকিদার আরও দুই একটা প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু কালবিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, কালিদাসবাবু অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছেন। তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "দরজা খুলিয়া আশ্রয় দেও, আমি কাল্‌নার কালিদাস মিত্র। পরিচয় পাইলেই মজুমদার মহাশয় বুঝিতে পারিবেন।"

অনুকূল দৈব আরও অনুকূল হইলেন। ঠিক এই সময়েই বড় মজুমদার শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন। খড়মের শব্দেই দেউড়ির পাইকেরা বুঝিল, কর্ত্তা এইদিকে আসিতেছেন। দরজায় আঘাত বা যম-জামাতার কথা তিনি শুনিতে পান নাই, কিন্তু কালিদাসবাবুর কথা শুনিতে পাইলেন। ক্ষিপ্রপদে আসিতে আসিতেই, মজুমদার মহাশয় বলিলেন,—"এখনও দেউড়ি খুলিস্ নাই, শীঘ্র দরজা খুলিয়া দে। আপনারা আসুন, ভয় নাই, এখানে যমেরও প্রবেশ নিষেধ।"

পাইক দরজার বৃহৎ হুড়কা টানিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট ভিত্তিগাত্রস্থ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ-পথে প্রবিষ্ট করিয়া দিল, খিল ঝাঁক প্রভৃতি খুলিল; গুলমারা ভারী কপাট জোরে টানিয়া খুলিয়া দিল। বাহিরের সকলেই ভিতরে প্রবেশ করিলেন, পাইক আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

কিন্তু অভয়-দানে সঙ্কট বাড়িল কেন? ঘোষ-তনয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইলেন কেন? সহৃদয় পাঠক হেতু সহজে বুঝিতে পারিবেন। দেউড়িতে একটা হৈ চৈ লাগিয়া গেল। পঞ্চম অধ্যায়ও এইখানে সমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চন্দ্রহাটীর দেবালয়।

চন্দ্রহাটীর মজুমদার ভবনে ত পাঠক এখন আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবে না, আপাততঃ এখানে বিলম্ব করিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। বিপদে মধুসূদন সহায়, মধুসূদন মজুমদারও মহাত্মা লোক। পুরুষবেশী যোগিনী এতক্ষণ মনের আবেগে হৃদয়ের তাড়নায় যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত অসূর্য্যম্পশ্যা যুবতী ধনী-তনয়ার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। যিনি কখনও অন্তঃপুরের বাহির হন নাই, তিনি সেই ঘোর নিশাকালে, সেই ভীষণ সঙ্কটে, সেই অনির্ব্বচনীয় আতঙ্কের মাঝখানে, বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া, দুর্গম গুপ্তপথে রাস্তায় পড়িয়াছেন, দ্রুতপদে অবিশ্রান্তে ক্রমাগত প্রায় তিন ক্রোশ পথ চলিয়াছেন। কেবল শারীরিক কষ্টই তাঁহার পক্ষে একান্ত অসহ্য, তাহার উপর তাঁহার মানসিক কষ্টের বিষয় একবার অনুভব করে দেখি। প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশের ভয়, পলকে পলকে প্রলয় সম্ভাবনা। ঐ বুঝি যম-জনকের রাক্ষসকিঙ্করেরা অনুধাবন করিতেছে, ঐ বুঝি কোন যম-পিতৃব্য আসিয়া পড়িল, ঐ হয়ত যম-তনয় যমালিক সহোদর বা পিতৃব্য-পুত্রেরা পশ্চাতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিল! এই ভয়ে যোগিনী হরিবালার মন যে পথের মাঝেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া যায় নাই, হরিবালা যে পথেই মূর্চ্ছা যান নাই, ইহাই বিচিত্র! বস্তুতঃ কেবল দৈব অনুগ্রহ। দৈত্যবংশে প্রহ্লাদ জন্মিয়াছিলেন, রাক্ষস-বংশে বিভীষণ জন্মিয়াছিলেন, হরিপুরের পিশাচ-বংশে হরিবালা জন্মিয়াছেন, ভণ্ড পিশাচের মধ্যে হরিবালা প্রকৃত হরিপরায়ণা। জননী ও পিতৃব্য-পত্নীরাও পিশাচসংসর্গে পিশাচী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের স্বভাবকোমল রমণীহৃদয়ও পৈশাচিক তাপে পুড়িয়া পুড়িয়া কঠোর হইয়া গিয়াছে। হরিবালা কিন্তু পিশাচ পিশাচীর ভিতর দেবী। হরি তাহাকে বাছিয়া লইয়াছেন, লোক শিক্ষার জন্য প্রভু পিশাচ-তনয়াকে দেবী করিয়াছেন। ঘন নিবিড় দুস্তর পাপ-পঙ্কে পঙ্কপলাশলোচনই পদ্মিনী ফুটাইয়াছেন।

কেবল দেবতুল্য হৃদয়ের প্রণোদনেই হরিবালা এতক্ষণ সজীব ছিলেন, পথে মূর্চ্ছা ঘটিলে যোগিনী বিপন্ন অতিথিদিগকে বাঁচাইতে পারিতেন না। দেবী নিজের দেবাদিদেব পতিকেও বিপদ-সাগরে ডুবাইতেন, পিশাচ পিতার প্রবল পিশাচ সৈন্যের হস্ত হইতে অদ্ভুতকর্ম্মা নফর গোবরও কাহাকেই বোধ হয় রক্ষা করিতে পারিত না। তাই হরি বিপদে হরিবালার সহায় হইয়াছিলেন, পথে ভয়ভঞ্জন মধুসূদনই হরিবালাকে ঠেলিয়া আনিয়াছিলেন, চন্দ্রহাটীর মধুসূদনের আশ্রয়ে হরিবালাকে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া দিয়া যান। যাই তিনি হরিবালাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন, অমনই তাঁহার মূর্চ্ছা হইল!

তখন হরিবালার স্বামীকে দুই কথায় আত্মপ্রকাশ করিয়া মজুমদার মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইতে হইল। তিনি বলিলেন, "আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হইল, ইনি আমার হৃদয়েশ্বরী। মজুমদার মহাশয়! ইনি পিশাচ-তনয়া হইয়াও দেবী, হরিপুরের দস্যুপতি হরিভজন ঘোষের একমাত্র দুহিতা এই হরিবালা—আমার সহধর্ম্মিণী হরিবালা—পিশাচকুলের দেবী। ঐ কাল্‌নার কালিদাস মিত্র মহাশয়, তাঁহার পার্শ্বেই তদীয় পুত্র শ্রীমান্ দুর্গাদাস, ঐ দুই পাইক তাঁহারই, দুই ভৃত্যও তাঁহার। কলিকাতা হইতে কাল্‌না যাইবার সময়ে পথে নৌ-বিভ্রাটে পড়িয়া ইঁহারা নসরাই হইতে পদব্রজে চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অদৃষ্টের ফেরে, যেমন ত্রিবেণীতে নামিয়াছিলেন, চন্দ্রহাটীতে নামিয়া ত মহাশয়ের এই পবিত্র দেবভবনে অনায়াসে আশ্রয় লইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া ইঁহারা নসরাইয়ে একটা পিশাচাধমের পরামর্শ লইয়াছিলেন। সে সে, হরিপুরের অন্যতম যম কিঙ্কর, দোকান পসারের ভাণ করিয়া, পৈশাচিক কার্য্য করিতেছে; বারাণ ছায়া নসরাইয়ে কুন্তীতীরে বসিয়া আছে, নিরীহ মানবকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়া দিতেছে, তাহা ইঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, অনেকেই ত ঐ পিশাচ-দূতের কুহকে পড়িয়া প্রাণে মারা যায়! মিত্র মহাশয়েরা যখন হরিপুরে গিয়া হরিভজন ঘোষের কাছারীতে—সেই পাপাশয় পিশাচ মন্দিরে উপস্থিত হন, তখন আমি হঠাৎ একবার অন্তঃপুর হইতে পিশাচ-রক্ষকদিগের অজ্ঞাতসারে সেই দিকে গিয়াছিলাম, দেখেই বুঝিয়াছিলাম, রাত্রে সর্ব্বনাশ হইবে, সর্ব্বনাশের আয়োজনও হইয়াছিল। অতিথিদিগের আদর অভ্যর্থনার একশেষ করিয়া রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে মশান ঘরেই বাসা দিয়া-

ছিল, ঐ ঘরে যে কত লোকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন। পিশাচেরা পলায়নের পথও বন্ধ করিয়াছিল, আমার কাছে সন্ধান পাইয়া আমার স্ত্রী যদি উপায় না করিতেন, তাহা হইলেই ছয়টা নিরীহ লোকের হত্যা ত হইয়াই গিয়াছিল। আমার স্ত্রীই অপূর্ব্ব সাহসে ও অদ্ভুত কৌশলে নিভর করিয়া যে পাতে পান মোড়া ছিল, সেই কলাপাতে সঙ্কেত করিয়া আহারের পর দুর্গাদাস বাবুর হাতে সেই সঙ্কেতযুক্ত কলাপাত-মোড়া পান দিয়া সকলকে সাবধান করিয়াছিলেন। নিজেই যে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া সকলকে রক্ষা করিলেন, আমাকেও সেই পিশাচপুরী হইতে বাহির করিয়া নিজেও সেই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিলেন. এ সব অসাধ্যসাধন সঙ্কল্প হরিবালাই মুহূর্ত্ত মধ্যে করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দৈবানুগ্রহে তাঁহার সকল সঙ্কল্পই সিদ্ধ হইয়াছে, হরির কৃপায় এবং হরিবালার কল্যাণেই আমরা আসিয়া আপনার কাছে অভয় পাইয়াছি। অসাধ্যসাধনের পর কিন্তু হরিবালা আর সামলাইতে পারে নাই, পুরুষবেশে এতক্ষণ তিনি যে অসাধারণ পৌরুষ দেখাইয়া ছিলেন, এখানে আসিবার পরেই তাহা তিরোহিত হইয়াছে, কোমলা দৈবাদেশে কঠোরা হইয়াছিলেন, এখন আবার কোমলা। আপনি আমার পিতৃস্থানীয় পূজ্য মহাপুরুষ, আমি দিগ্মুই সরিষার মিত্রবংশীয়, আমার নাম হরবিলাস মিত্র, আমার পিতা শিবদাস মিত্র স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তিনি না বুঝিয়া হরিপুরের ঘোষ বাড়ীতে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি পিশাচকুলে দেবী পাইয়াছি, আজ সেই দেবীই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া এখন নিজে অচৈতন্য! আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হইল।” মজুমদার মহাশয় হরবিলাস মিত্রকে অভয় দিয়া তৎক্ষণাৎ দাসীদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন, দুই তিন জন দাসী দৌড়িয়া আসিল. তখন ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিতা, পুংবেশী হরিবালাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল, মজুমদার মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে গেলেন, গোলমালে বাড়ীর সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। বাড়ীতে একজন কবিরাজ থাকিতেন, তিনি দেউড়ীতেই উপস্থিত ছিলেন, মজুমদার মহাশয়ের ইঙ্গিতে প্রবীণ কবিরাজ মুকুন্দরাম সেনও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, যাইবার সময়ে মজুমদার মহাশয় হরবিলাসকে বলিলেন, “বাবা কিছু ভয় নাই, ভয়ঙ্কর মানসিক উদ্বেগেই মূর্চ্ছা হইয়াছে, এখনই চৈতন্য হইবে, আর সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি সঙ্গে যাইতেছেন, তোমাকে একটু পরে ডাকিয়া পাঠাইব, আপাততঃ তোমরা সকলেই নির্ব্বিঘ্নে নির্ভয়ে ঐ বৈঠকখানা ঘরে বিশ্রাম কর, মধুসূদন মজুমদার প্রতিকার করিতেছেন। হরিপুরের পিশাচকুলকে নির্ম্মূল করিব, এতদিন যে ঔদাসীন্য করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এইবার করিব। এজন্য যদি আমাকে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে হয়, আমি তাহাও করিব। কাল্নার মিত্রবংশে আমার করণ কার্য্য হয় নাই, সে সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, দিগ্মুই সরিষার মিত্রবংশ আমার পরিচিত, আমার মাতামহবংশের সহিত মিত্রবংশের সম্বন্ধ আছে, প্রকৃতই হরবিলাস বাবু তুমি আমার পুত্র স্থানীয়।”

এই কথা বলিতে বলিতেই মজুমদার মহাশয় অন্তঃপুরে গেলেন, কবিরাজ মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে গিয়া রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিলেন। মানসিক উদ্বেগের মূর্চ্ছা, সামান্য মুষ্টিযোগেই দূর হইল। হরবিলাসও একবার অন্তঃপুরে আদৃত হইলেন, দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া একটু স্থির হইয়া বৈঠকখানায় কালিদাস বাবুর পুত্র দুর্গাদাস বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কালীদাস একান্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, নিদ্রা দেবী ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন।

পাঠক চল, এই অবসরে একবার সেই পিশাচপুরে চল। সেখানে পিশাচকুলে কি প্রলয় ব্যাপার উপস্থিত, তাহাতে একবার দেখিতে হইবে। শীকার পালালে বাঘ জলকে তোলপাড় করিয়া থাকে, মুখের মানুষ ডাঙ্গায় উঠিলে, কুম্ভীরও প্রাণের ভয় না করিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া তাহাকে তাড়া করে, চল দেখিবে, হরিপুরের পিশাচলীলা!

সপ্তম অধ্যায়।

পিশাচপুরে প্রলয়।

মৃগযূথ বিবরে আবদ্ধ, পলায়নের পথ রুদ্ধ; ব্যাঘ্র পরিবার নিশ্চিন্ত। কাল সমুপস্থিত, আর বিলম্ব নাই, ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছে, পিশাচপুরের পিশাচপুঙ্গবেরা পাপের পন্থা পূর্ব্বাহ্ণেই দেখিয়া রাখিয়াছে।

পিশাচরাজ হরিভজন ঘোষ সকল পিশাচকেই উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। যথাকালে কার্য্যারম্ভ হইল। অন্তঃপুর হইতেই মৃগয়া যাত্রা হইবে, এইরূপই সিদ্ধান্ত ছিল। সিদ্ধান্ত অনুসারেই কার্য্যারম্ভ হইল। পিশাচপতির তিন সহোদর, এক পুত্র এবং দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বিবরদ্বারে উপস্থিত হইল, বাছা বাছা অষ্টাদশ পিশাচ কিঙ্কর পশ্চাতে অবস্থিত। অন্তঃপুর ও অতিথি-প্রকোষ্ঠের যে দ্বার দিয়া কালিদাস মিত্র ও তাঁহার পুত্র আহারার্থে অন্তঃপুরে নীত হইয়াছিলেন, যে দ্বার খুলিয়া শেষে পিশাচপুত্রী দেবকন্যা হরিবালা অতিথি-বিবরে আসিয়া অতিথিদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন; পিশাচদিগকে সেই দ্বার খুলিয়া অতিথি-প্রকোষ্ঠে আসিতে হইবে। মধ্যম পিশাচই প্রথমে দ্বার খুলিয়া অগ্রসর হইলেন, হাত দিয়া দেখিলেন, হুড়কা দেওয়া নাই; উপরের খিলে হাত দিলেন, খিল খোলা। হুড়কা খোলা, উপরের খিল খোলা। মধ্যম পিশাচ একটু বিস্মিত হইয়া, নীচের খিলে হাত দিলেন, সে খিলও খোলা! একটু যেন হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিলেন. “কি আশ্চার্য্য, আমি নিজে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছি। এ দ্বার ত কাহারই খুলিবার অধিকার নাই। তবে কি আমারই ভুল! আমিই কি অন্যমনস্ক হইয়া দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছি! হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেই বা ক্ষতি কি? পাখী ত আর অন্তঃপুরের ভিতর দিয়া পলাইতে পারে না। দ্বার আমিই বন্ধ করিতে ভুলিয়াছি নিশ্চিত।”

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মধ্যম পিশাচ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অতিথি-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, ঘর নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। মধ্যম পিশাচ মনে করিলেন, “ভালই হইয়াছে, পাইক দুই বেটাকেই ভয়, দুই বেটাই নিদ্রায় অভিভূত! নিদ্রিত অসুরকেও সহজেই আয়ত্ত করা যায়।”

নফর গোবর যেখানে শয়ন করিয়াছিল, পিশাচেরা আসিয়াই সেখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। দুই জনেরই গলায় ছুরি দিতে হইবে, দুই পিশাচের সিদ্ধহস্তে ছুরিকা। পলকমাত্রও বিলম্ব হইবে না। কিন্তু ছুরি দিবে কাহার গলায়? কম্বল শয্যা পড়িয়া আছে, মানুষ নাই। তবে সকলে এক ঘরে ঘুমাইয়াছে? তাহাই হইবে। পিশাচেরা পরবর্ত্তী ঘরে উপস্থিত হইল। ঘর জনশূন্য না হইলে এত নিঃশব্দ হয় না! ছয়টা লোক এক ঘরে ঘুমাইতেছে, নিঃশ্বাসের শব্দও ত কর্ণগোচর হইবে? কৈ——নিঃশ্বাসেরও ত শব্দ নাই। পিশাচেরা চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিল। কি সর্ব্বনাশ! এ ঘরও ত শূন্য!

এতক্ষণের পর উদ্বেগ উপস্থিত হইল। বহির্ব্বাটীর দিকের দরজা যেমন রুদ্ধ ছিল, সেইরূপ রুদ্ধ আছে। সে দ্বারের যে বাহির দিকে কুলুপ লাগান। তবে পাখী কোথায় গেল? একটা নয় দুইটা নয়, ছয়টা! পালাবে কোথায়? যে দ্বার দিয়া নফর অন্দরের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া হরিবালা ও তাঁহার স্বামীর গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়া রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিল, যে দ্বার দিয়া হরিবালা অতিথিদিগকে ঈশানকোণের পথে লইয়া গিয়াছিল, পিশাচেরা সেই দ্বার দিয়া বাহির হইয়া ঈশানকোণের পথে উপস্থিত হইল। সেই খানে গিয়া অন্তঃপুরের সেই গুপ্তদ্বার—যে দ্বার দিয়া হরিবালার স্বামী হরবিলাস বহির্গত হইয়া পলায়মান অতিথিদিগের সহিত দেখা দিয়াছিল সেই দ্বার পরীক্ষা করিল। দেখিল, দরজা খোলা, কপাট ভেজান আছে! এতক্ষণের পর পিশাচদিগের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। মধ্যম পিশাচ ও তাহার দুই পুত্র দ্রুতপদে অন্তঃপুরে গিয়া প্রথমে এদিক সেদিক গলি ঘুঁজি অন্ধি সন্ধি বেশ করিয়া দেখিল। অনন্তর এক জন গিয়া হরিবালার ঘরের দরজা ঠেলিল। দেখিল দরজা বন্ধ। ডাকিল, সাড়া নাই। হাঁসকলে হাত দিল, শিকল দেওয়া। সন্দেহ এখন বিশ্বাসে পরিণত হইল। এতক্ষণও অন্ধকারে কাজ চলিতেছিল, এইবার আলোক আসিল। সকলেই দেখিল, হরিবালার ঘর জনশূন্য। আর বুঝিতে বাকি রহিল না। মধ্যম পিশাচ এইবার আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, “সেই সময়েই দাদাকে বলিয়াছিলাম। জামাইটাকে বাড়ীতে স্থান দিও না। ‘যম জামাই জন তিন নয় আপন।’ শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যা হয়? বেটা কিরূপে আমাদের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত জানিতে পারিয়াছিল। সে-ই সর্ব্বনাশ করিয়াছে! দাদাকে বলিয়াছিলাম, হরিবালা আমাদের বংশ ছাড়া। তাহাকে বিশ্বাস নাই, বেটী—আমাদের কাজে বিরক্ত হইত। একমাত্র কন্যা বলিয়া দাদা, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কত দিন বলিয়াছি, দাদা মেওয়ার বাগানে বিষের গাছ রাখিতে নাই। দাদা

আমার কথায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। এখন ফল হাতে হাতে! বেটাকে যদি তখন আপনিই নিকাশ করিয়া ফেলিতাম, তাহা হইলে ত আর কোন বিপত্তিই ঘটিত না। জামাই বেটা কিন্তু ঘোর শত্রুতা করিল। মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল, সে কাজের কাজী নয়. তাহাকে স্থান দেওয়া মহাপাপ! এখন উপায়? শীকার পলাইয়াছে বলিয়া চিন্তিত নহি। শীকার পাওয়া যাইবে। ভয় যে আপনাদের পরিণাম ভাবিয়া। একেত ত কাল বড় বিষম। হক্ সাহেবের অত্যাচারে তিষ্ঠান ভার। তার পর, শীকারের দুই বেটা ভদ্রলোক। আবার ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়েছেন! বেটারা নিশ্চিতই হুগলি গিয়া হক্ সাহেবকে খবর দিবে। এইবার দেখ্‌ছি, দামুঘোষের দশা হরিঘোষের ঘটিবে। কন্যা নয় ত কুলাঙ্গার! রুক্মিণীর জন্য দামুঘোষ সবংশে গিয়াছিলেন, হরিবালার জন্য হরিঘোষকে সংবংশে যাইতে হইবে।"

পিশাচপুরে প্রলয় উপস্থিত। পিশাচ পিশাচী সকলেই জাগিয়াছে। অন্তঃপুরে পিশাচ সভা বসিয়া গিয়াছে। হরিভজন উপস্থিত। তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন, "কাপুরুষের মত চিন্তা করিলে ফল নাই। এতক্ষণ যে পাখী ধরিবার উদ্যোগ হয় নাই, ইহাই দোষের হইয়াছে। বেটারা নিশ্চিত কাল্‌নার দিকে পলাইয়াছে। সময় পাইয়াছে যথেষ্ট। অন্ততঃ তিন ঘণ্টা হইল পাখী পলাইয়াছে। উপযুক্ত লোক পাঠাও। মায়া মমতায় কাজ নাই, হরিবালা হরবিলাস কাহারই প্রাণের মায়া যেন কেহ না করে। বাক্স পোরা টাকা! দেখিলে কি বাক্স তোরঙ্গ সব পড়িয়া আছে? খানকতক কাপড়চোপড় আছে বই ত নয়! আসল মাল বেটারা লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন যে চিন্তার সময় নহে। আত্মচিন্তা প্রধান চিন্তা আর বিলম্ব করিও না।"

মধ্যম পিশাচ বলিলেন,—"তখন বিলম্ব করা ভুল হইয়াছিল, আহারের পরেই কাজ হাঁসিল করিলে ঠিক হইত, লোক গিয়াছে, ভাল ভাল লোকই পাঠান হইয়াছে। তাহারা এতক্ষণ বলাগড়ে পার হইল।"

কর্ত্তা এতক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন, "উত্তরের দিকে লোক পাঠাইয়াছ কি?"

মধ্যম বলিলেন,—"না সেদিকে লোক যায় নাই, কিন্তু বেটারা ত সেদিকে যায় নাই, গেলে এতক্ষণ খবর পাইতাম, নসরাইয়ের ঘাটীতে আমাদের লোক আছে।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"তা বটে, কিন্তু বিশ্বাস নাই, ঘাটে আমাদের একটা লোক আছে বৈ ত নয়, পাইক দুই বেটা যে, দশ বিশ জনের মোহড়া লইতে পারে, সেই দুই বেটার জন্যই ত সজাগ হরিণ শীকার করিতে পারি নাই, লোক পাঠাও, ভাল লোক পাঠাও, সন্ধান লইয়া আসুক, যেন ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যায়। আর দেখ চন্দ্রহাটীর মজুমদার বেটাদের উপর সন্দেহ হইতেছে! দুইটা মজুমদার বংশ আমাদের পরম শত্রু। ত্রিবেণীর মজুমদার বেটারাই ত দেশের সর্ব্বনাশ করিল। হক্ সাহেবের প্রধান মোসাহেব রায় শালা—ঐ পাটপাড়ার রায় শালা যে ত্রিবেণীর মজুমদার বেটাদের আত্মীয় কুটুম্ব, শালা যে হরি মজুমদারের বেহাই, হরিনামেই কলঙ্ক! ত্রিবেণীর মজুমদার বেটারা গোয়েন্দা হইয়াছে। চন্দ্রহাটীর মজুমদার বেটাও পরম শত্রু, বেটা মধুসূদন নামটাকে মাটী করিয়াছে! হবে না? দুই বেটা যে আবার বড় লোক, দুই বেটাই কলিকাতায় থাকে, বড় বড় সাহেবের কাছে কাজ করে। হাজার হাজার টাকা রোজগার করে, শালারা যে এত টাকা রোজগার করিতেছে, তাহাতে ত আমরা হিংসা করি না। আমরা পৈত্রিক ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেছি, দশটা লোকের প্রতিপালন করিতেছি, দেশের সাহসী বলবান্ লোকগুলাকে উৎসাহ দিতেছি, আমাদের কাজে বেটার শত্রুতা করা কেন? আরে আমার ধার্ম্মিক! এক বেটা বেগ্‌রাম কোম্পানির ধনে ধনবান, আর এক বেটা কোম্পানীর নেমক মহলে বেইমান! তখন অধর্ম্ম নাই, আর যত অধর্ম্ম আমাদের কাজে। আমাদের কাজ যে, বীর পুরুষের কাজ, রাজা রাজড়ার কাজ, তাহা বেটারা বুঝিবে কিরূপে? আমাদের কাজে কত মান, কত সম্মান, তাহা কাপুরুষে বুঝিবে কি করিয়া? স্বরূপগঞ্জের বিশ্বনাথ। এই কাজের গুণেই ত বিশে বাগদী এখন বিশ্বনাথ বাবু, তাহার হাজার ফৌজ! আমরাও ত নেহাত কম নয়, আমিও দুই শত ফৌজ রাখিয়া থাকি, এইবার বুঝিয়া লইব, হরে মধো দুই বেটাকে নির্ধন আর নির্ব্বংশ করিব, আর বিলম্ব করিও না; এখনই লোক পাঠাও, পাখীর

সন্ধান চাই, বেটারা যেখানে আশ্রয় পাইয়াছে, অদ্য রাত্রেই আমাকে সসৈন্যে সেখানে যাইতে হইবে, হরিভজন ঘোষ প্রাণের ভয় করে না।"

মধ্যম বলিলেন,—প্রাণের ভয় করে, এমন কাপুরুষ হরিপুরের ঘোষ বংশে নাই।"

প্রধান কর্ম্মচারী কৃষ্ণপদ বিশ্বাস সভায় উপস্থিত ছিলেন, "হরিপুরের ঘোষবংশের কর্ম্মচারীদিগের ভিতরও এমন নিমকহারাম কাপুরুষ কেহ নাই যে, নিজের প্রাণ দিতে বা শত্রুর প্রাণ লইতে কুণ্ঠিত হয়।"

উত্তরের দিকে দশ জন উপযুক্ত লোক প্রেরিত হইল, যাহারা প্রাণের ভয় করে না, মানুষ মারায় আর ছারপোকা মারায় যাহাদের সমান কষ্ট, যাহারা নানাবিধ বেশে লোককে ভুলাইতে পারে, যাহারা বহুরূপী—সন্ন্যাসী, ফকির, ভিখারী, গোঁসাই, ভেল্‌কিওয়ালা, ফেরিওয়ালা, প্রভৃতি রূপে অগম্যস্থানে গমন করিতে পারে, রাজবাড়ীরও খবর আনিতে পারে, যাহারা কোন কাজে বিমুখ হয় না, যাহাদের পক্ষে কোন কাজই অসাধ্য নহে, এইরূপ বাছা বাছা দশ পিশাচ উত্তরের দিকে প্রেরিত হইল। রাত্রি গিয়াছে, দিবা আসিয়াছে, নির্জীব জগৎ সজীব হইয়াছে, হরিপুরে প্রলয়। দশ পিশাচ ত্রিবেণীর দিকে প্রেরিত হইল। যাহারা পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা ফিরিল, স্থির হইল, পাখীর দল দক্ষিণে যায় নাই, নিশ্চিতই উত্তরে গিয়াছে। এসো পাঠক তোমরাও আবার আমার সঙ্গে উত্তরে এসো।

অষ্টম অধ্যায়।

ধর্ম্মের কল।

হরিবালাকে চন্দ্রহাটীর মজুমদার ভবনে—মধুসূদনের দেবালয়ে—রাখিয়া পাঠক নিশ্চিন্ত আছ। একবার সেখানে আগমন কর, দেখিবে, ধর্ম্মের কল ভগবান্ কিরূপে পাতিয়া দিতেছেন। হরিবালা সুস্থ হইয়াছেন। হরবিলাস নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কালিদাস ও দুর্গাদাস অভয় পাইয়া আদরে গৌরবে তৃপ্ত হইয়াছেন। ভৃত্যদ্বয় আনন্দিত। পাইক নফর ও গোবর বলবিক্রম দেখাইতে না পারায় একটু ক্ষুণ্ণ। মনে মনে কতদূর ক্ষুণ্ণ বলিতে পারি না। মুখে খুবই ক্ষুণ্ণ, নফর বলিতেছে, "বাবুরা বিরত না হইলে, আমি একাই ভূতের বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিতাম," গোবর বলিতেছে, "আমিও পেছ পা হইতাম না।"

মজুমদার মহাশয় প্রাতঃকালেই বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে পাইক চৌকিদার সঙ্গে দিয়া হুগলি পাঠাইয়াছেন। সল্টবোর্ডের নায়েব দেওয়ান ম্যাজিষ্টর সাহেবের পরিচিত এবং বন্ধু। মধুসূদন মজুমদার হরিপুরের নূতন পৈশাচিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ম্যাজিষ্টরকে পত্র লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু নিজেও সাবধান হইতে ছাড়েন নাই। সুলতানপুর তালুকের বাগ্দী লাঠিয়ালদিগের মধ্যে বাছা বাছা চব্বিশ পঁচিশ জনকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহারা আগতপ্রায়। বাড়ীতেও দশ বার জন পাকা পাইক বিদ্যমান। কালিদাস বাবুর মুখে নফর গোবরের ক্ষমতার কথা শুনিয়া মজুমদার মহাশয় আনন্দিত হইলেন। হরিপুরের পিশাচদিগকে তিনি বেশ চেনেন, বুঝিতে পারিয়াছেন, নরাধমেরা চুপ করিয়া থাকিবে না, রাত্রে একটা হাঙ্গামা করিবে। ততক্ষণ হুগলির পশ্চিমে সিপাহীও আসিয়া উপস্থিত হইবে।

বেলা এক প্রহরের সময়ে দুইটা ভিক্ষুক আসিয়া দেউড়ীতে গান ধরিল কেন? বড় মানুষের বাড়ীতে ভিখারী ফকিরের আমদানী হইয়া থাকে। বাড়ীর দুইটা দাসীর সহিত ভিখারীরা কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে? কাহারও ত সন্দেহ হইল না। বাড়ীতে যে বিবাহের উদ্যোগ আছে, তাহা পাঠক ভুলেন নাই। বিবাহের জন্য মধুসূদন বাড়ীতে গিয়াছেন।

ভিখারী জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহ কাহার?" দাসীও মুক্তকণ্ঠে সব কথা বলিয়া দিল। ভিখারী চলিয়া গেল। ভিক্ষা না লইয়া ভিখারী চলিয়া গেল! তথাপি কাহারও সন্দেহ হইল না!

চন্দ্রহাটীর ভবনে আপাততঃ আর কোন গোলযোগ নাই। মজুমদার মহাশয় অতিথিসেবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, বাড়ীর ভিতর যাওয়া আসা চলিতেছে। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, দাসীরা কর্ত্রীকে বলিতেছে,—"বড় মা, দুইটা ভিখারী আসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, তোদের

বাড়ীতে একটা অল্পবয়সী মেয়ে মানুষ আসিয়াছে, তাহার সোয়ামী সঙ্গে আছে, বিবাহ পর্য্যন্ত থাকিবে কি? আমি ভয়ে বলিলাম থাকিবে। ভিখারী এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিল বড় মা?" বড় মা বলিলেন, "তা কেমন করিয়া জানিব?" মধুসূদন বাবু কিছু শুনিয়াই সব বুঝিলেন, বুঝিলেন, ভিখারী নহে, হরিপুরের যমদূত! স্ত্রীলোকদিগকে গোপন কথা বলা উচিত নহে। মধুসূদন বাহিরে আসিয়া কালিদাস ও হরবিলাসকে সকল কথা বলিলেন। আর বলিলেন, "পিশাচেরা আজ কিছু করিবে না। বিবাহের রাত্রে হাঙ্গামা করিবে। মধুসূদন থাকিতে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। ম্যাজিষ্টর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছি, পিশাচপুরী ছারখার করিব তবে নিশ্চিন্ত হইব। আপনাদের হঠাৎ যাওয়া হইবে না, পথে বিপত্তি ঘটিবে। কাল্‌নায় লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনার বাড়ীর বিবাহ এখন স্থগিত থাকুক, আহারান্তে পত্র লইয়া লোক কাল্‌না রওনা হইবে, পত্র লিখিয়া রাখুন, কোন ভয় নাই।"

পত্র লইয়া কাল্‌নায় লোক গেল। এদিকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হুগলি হইতে লোক ফিরিল। মধুসূদন ম্যাজিষ্টরের পত্র পাইলেন, তিনি অভয় দিয়া লিখিয়াছেন, চব্বিশ জন সিপাহী অবিলম্বে রওনা হইবে। হক্‌সাহেবের সহকারী নিজে সমর সজ্জা করিতেছেন, হরিপুর যাত্রা করিবেন।

চন্দ্রহাটীর বাটীতে পাঠক পলটনের হাট বসিল। ঠিক যেন দুর্গরক্ষার বন্দোবস্ত হইল। দিন কাটিয়া গেল, রাত্রিও কাটিয়া গেল। রাত্রে পিশাচেরা আসিয়া কোনরূপ গোলযোগ করিল না, দেখিয়া মধুসূদন বলিলেন, "নরাধমেরা মনে করিয়াছে, বিবাহের দিন সুযোগ পাইবে, আমিও স্থির করিয়াছি, আমার বাসার বিবাহের পূর্ব্বে হরিপুরে চিতা জ্বলিবে। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িবে, মা বাসুকি আর সহ্য করিবেন না।"

রাত্রি গেল, আবার দিন আসিল। মজুমদার মহাশয়ও সংবাদ পাইলেন, হুগলি হইতে নানাবেশে জলে স্থলে পুলিশ পলটন যাত্রা করিয়াছে। সহকারীর উপর ভার দিয়া হক্‌ সাহেব নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। নিজেও যাত্রা করিয়াছেন।

মজুমদার ভবনে আনন্দ উৎসব, বিবাহের দিন আরও দুই দিন পরে। বাড়ীর সকলেই আনন্দিত, সকলেই উৎফুল্ল। হরিবালার কিন্তু উল্লাস নাই, তিনি দিবারাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। নির্জ্জন স্থান পাইলে অশ্রুবর্ষণও করিতেছেন। হরিবালা বুঝিয়াছেন, হরিপুরের ঘোষবংশ এইবার ছারখার হইবে। ভীষণ পাপের এইবার ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অন্যের আহ্লাদ, কিন্তু হরিবালার দুঃখ। হরিবালার পিতৃভক্তি—মাতৃভক্তি—স্বজনানুরাগ হরিবালারই উপযুক্ত। পিশাচ পিতাও ত তার পিতা। সহোদর ও পিতৃব্য ছাড়িয়া পিশাচ-বংশের সমস্তও তাঁহার পরমাত্মীয়। পিতৃব্যেরা পিশাচ বটে, কিন্তু তাঁহারা ত পিতৃব্য। বাড়ীতে জননী আছেন! খুড়ী মায়েরা আছেন! হরিবালা অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিবেন কিরূপে? কেবল হায় হায় করিতেছেন! কেনই বা পিতৃবংশের এরূপ পাপে মতি হইয়াছিল! হরিবালার যাতনা হরিবালা বুঝিলেন, হরিবালা অবসর পাইলেও হরবিলাসকে কোন কথা কহিলেন না। তিনি জানিতেন, "আমার পৈতৃক-পিশাচবংশের প্রতি আমার পতির দয়ামায়া নাই, সহানুভূতি নাই।" যাহার কাছে যে কথার সহানুভূতি পাওয়া না যায়, সে কথা তাহার কাছে কহিতে নাই।

পাঠক আর হরিপুরে অপেক্ষা করা চলে না। হক্‌ সাহেবের দ্রুতগামী বোট হরিপুরের ঘাটে উপস্থিত হইয়াছে। জলে স্থলে পলটন গিয়া হরিপুরের ঘোষ বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। যে সকল পিশাচ-কিঙ্কর পূর্ব্বে মুখের দাপটে ত্রিভুবন জয় করিতেছিল, ঘোষ পরিবারকে অভয় দিয়া আকাশে তুলিতেছিল, তাহারা সব পলাইয়াছে. পিশাচদিগের গুপ্তচর চারিদিকে ছিল, হুগলি হইতে হক্‌ সাহেবের যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই গোয়েন্দারা হরিপুরে খবর দিয়াছিল।

হরিভজন ঘোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবার সত্যই ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িয়াছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত। হুগলির সংবাদ পাইয়াই তিনি বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, বাড়ীর বধূরা স্ব স্ব পিত্রালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন। কর্ত্তার সহোদর ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ পলাইয়াছেন, কেহ কেহ পলাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। হরিবালার জননী পতিকে ছাড়িয়া যান নাই, হরিভজনও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত দেখিব—কাপুরুষের মত পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইব না। এত পাপী এত প্রবীণ হরিভজনের মনে এত বল, ইহা একান্ত বিচিত্র! আর সকলে কাপুরুষতার পরিচয় দিল, হরিভজন কিন্তু এক তিলের তরেও কাপুরুষতার পরিচয় দিলেন না।

পলটন পুলিশ প্রভৃতি সহায়ে হক্‌ সাহেব হরিপুরে উপস্থিত ছিলেন, পিশাচপুরীর চারিদিকে পলটন পুলিশ কড়া পাহারা দিতে লাগিল। পিশাচপুরে তখন রহিয়াছেন, হরিবালার জনক হরিভজন, হরিবালার জননী, হরিবালার দুই পিতৃব্য, তাহার তিন সহোদর, দুই পিতৃব্যপুত্র, হরিভজনের প্রধান কর্ম্মচারী, আর চারি পাঁচজন পুরাতন চাকর। কর্ত্তা ও গৃহিণীকে লইয়া পলাইবার জন্য ইহারা অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াছিল, কর্ত্তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, "আমি কাপুরুষের মত পলাইব না। বৃদ্ধ হরিভজন মৃত্যুর ভয় করে না।" কর্ত্তা পলাইলেন না, গৃহিণীও প্রতিজ্ঞা করিলেন, "তাঁহার যে দশা আমারও সেই দশা!"

বৃদ্ধ দম্পতির ধৈর্য্য স্থৈর্য্য দেখিয়া সকলেই হতবুদ্ধি হইল। ঘোষ ভবন নিস্তব্ধ, হক্‌ সাহেব গিয়া ঘাটে উঠিলেন, ঘোষ ভবনে উপস্থিত হইলেন, কর্ত্তা ও কর্ত্রী ছাড়া আর সকলে আসিয়া অম্লানবদনে আত্মসমর্পণ করিল, হক্‌ সাহেব বিস্মিত হইলেন, মনে মনে দুরভিসন্ধির সন্দেহ করিয়া খুব সাবধান হইলেন, বন্দুকধারী প্রহরীরা তখন তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিতে লাগিল, হক্‌ সাহেবের সহকারীও কৌশল শুনিয়া অবাক হইলেন, এত নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। যাহারা আত্মসমর্পণ করিল, তাহাদিগকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রহরীর জিম্মায় দেওয়া হইল, সকলেরই হাতে হাতকড়ী পড়িল। এখন পিশাচদিগের ভারী ভয়! সে মন নাই, সে দেহে সে ভীষণতা নাই, সে স্পর্দ্ধাও নাই! হরিবালার পিতৃব্য দুইজন বলিলেন,—"সাহেব, যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন পলাইবার কল্পনাও করিব না, ইচ্ছা থাকিলে পলাইতে পারিতাম। সে ইচ্ছা নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব বলিয়াই প্রস্তুত হইয়াছি। দেখিবেন, যেন কর্ত্তা ও কর্ত্রীকে অকারণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে না হয়।"

লাঞ্ছনা ভোগ তাঁহাদিগকে করিতে হইল না। পৈশাচ জীবন পৈশাচ মরণে সাঙ্গ হইয়াছে, হক্‌ সাহেব গিয়া দেখিলেন, একটা ঘরে বৃদ্ধ হরিভজন গলায় দড়ী দিয়া ঝুলিতেছেন, পাশের প্রকোষ্ঠে কর্ত্রী পড়িয়া আছেন, যে ঘরে হরিভজন অতিথি কালিদাস প্রভৃতিকে বাসা দিয়াছিলেন, যে ঘরে তাঁহাদিগকে হত্যা করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, সেই ঘরে পিশাচপতি আত্মহত্যা করিয়াছেন। যে ঘর দিয়া হরিবালা পুংবেশে অতিথিদিগকে লইয়া পলাইয়া ছিলেন, সেই ঘরে হরিবালার জননী পড়িয়া আছেন।

কি আশ্চর্য্য, হরিবালার জননীরও প্রাণবায়ু বাহির্গত হইয়া গিয়াছে! কর্ত্তা গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছেন, দেখিয়াই কর্ত্রী ভূমি শয্যায় পড়িলেন, আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ-বায়ু উড়িয়া গেল! ভয়ঙ্কর মানসিক কষ্টে এরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে। কর্ত্তা যখন গলায় দড়ী দেন, কর্ত্রী তখন অন্যদিকে ছিলেন, আসিয়া দেখিলেন, কর্ত্তার এই দশা! অমনই পড়িলেন আর মরিলেন। স্বভাবকোমল মহিলার হৃদয় যাহার জন্য পাপকঠোর হইয়াছিল, সেই পতি অপঘাতে মরিলেন, কঠোর প্রাণ আবার কোমল হইল, কোমল হৃদয় ফাটিয়া গেল।

ঘোষ-ভবন প্রহরী বেষ্টিত থাকুক। হক্‌ সাহেবের সহকারী মহাশয়ের আদেশে অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা হইল; পিশাচপুরী ছারখার হইল। পাঠক তোমার আর হরিপুরে থাকিয়া কাজ নাই, পাপপুরে আর পদার্পণ করিও না। ঘোষ বংশের সংবাদ আর লইও না। কিছুদিন পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, ঘোষ বংশ ক্রমে ক্রমে নির্ব্বংশ হইয়া গেল, যাহারা পলাইয়াছিল, তাহাদিগকে পুলিশের হাতে পড়িতে হয় নাই, রাজদ্বারেও দণ্ডভোগ করিতে হয় নাই, কিন্তু তাহাদের কেহই অধিক দিন জীবিত থাকে নাই, কেহ কেহ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কর্ত্তার মত আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ কেহ অপঘাতে মরিয়াছে, দুই একজন অল্পদিন পরেই ভয়ঙ্কর রোগ ব্যাধিতে পড়িয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। তাদের বধূরাও অকালে চলিয়া গিয়াছে, দুই একজন অপঘাতে মরিয়াছে, দুই একটা নবযুবকের শোচনীয় দশাও ঘটিয়াছিল। অনুচর উপচরদিগের ভিতর কেহ কেহ পরে দস্যুবৃত্তি করিয়া

ধরা পড়িয়াছিল, কেহ কেহ কারাগারে গিয়াছিল, দুই এক জন সাবধান হইয়া গিয়াছিল, কেহ কেহ ভিক্ষায় দিনপাত করিয়াছিল। এখন আর কাহারও নাম গন্ধ নাই।

নবম অধ্যায়।

উপসংহার।

বন্দীদিগকে সঙ্গে লইয়া হক্ সাহেবের সহকারী, পুলিশ পলটন পরিবেষ্টিত হইয়া হুগলি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হক্ সাহেব চন্দ্রহাটী যাইয়া, মজুমদার মহাশয়কে সমাচার দিয়া, হুগলি ফিরিলেন। মকদ্দমা মামলা তখনকার দিনে যেরূপ হইত, সেইরূপ হইল। সকল আসামীরই দণ্ড হইল। ঘোষবংশের কয়জনকে যাবজ্জীবন দীপান্তর যাত্রা করিতে হইল। অবশিষ্ট কয় জনের পাঁচ সাত বৎসর করিয়া কারাদণ্ড দিয়া দায়রার জজ কাজ সারিলেন। ঘোষ পক্ষে কলিকাতায় বড় আদালতে নেজামতে আপীল হইয়াছিল। আপীলে ফল হয় নাই, হরিপুরের ছারখার সংবাদে কেবল হুগলি জেলা নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ আনন্দিত হইয়াছিল, হরিপুরে অনেক স্থানের অনেককে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

হরিবালাকে হরিই রক্ষা করিলেন, ধর্ম্মপ্রাণা হরিবালাকে ধর্ম্মই রক্ষা করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা হরিবালা প্রাণের জন্য পতিকেও ধন্যবাদ করিতে বাধ্য। হরবিলাস যদি হরিবালাকে দিয়াই ধর্ম্মের রহস্য না দেখাইতেন, তাহা হইলে হরিবালা হরির পাদপদ্ম ভাবিয়া, ঘোর অভিনয়ে হরিকেই মূল অভিনেতা বলিয়া হয়ত মনে করিতে পারিতেন না। আর হরিগতপ্রাণা না হইলেও হরবিলাসগতপ্রাণা হইয়াও হরিবালা জ্বলন্ত হুতাশনে জ্বলিয়া সহজে শান্তিলাভ করিয়া স্থির হইতে পারিতেন না। হরিবালাকে পৈতৃক পিশাচপুরী হইতে মুক্ত করিলেন হরবিলাস, অশান্তির হুতাশন হইতেও তাঁহাকে মুক্ত করিলেন হরবিলাস।

মজুমদার ভবনে বিবাহোৎসবের আরম্ভ হইল। মজুমদার মহাশয়ের পৌত্রীর বিবাহ, রাজসূয় ব্যাপার! এবার আত্মীয় কুটুম্বসকলে চন্দ্রহাটী পূর্ণ হইতেছে। হরিপুরের ভয়ে উত্তরের আত্মীয়বন্ধুদিগকে বড় সশঙ্ক থাকিতে হইয়াছিল, সকলে চন্দ্রহাটী আসিতে সাহস করিতেন না। এবার শুভ সংবাদে শুভ সংবাদ। বিবাহ সংবাদে হরিপুরের ধ্বংস সংবাদ। এবার উত্তরের যত আত্মীয় কুটুম্বই চন্দ্রহাটীর মজুমদার ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন অনেকে করিতেছেন। এরূপ মহোৎসবে মজুমদার মহাশয় যে মুক্তহস্ত হইয়াছেন, ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। বিবাহোৎসবের রাত্রে প্রকৃতির গাঢ়তা ও উজ্জ্বলতা পাঠকের সহজেই অনুভূত হইতেছে। বর্ণনার বাহুল্যে আখ্যানের বৃদ্ধি করিব না।

কিন্তু এরূপ উৎসবেও হঠাৎ বিঘ্ন ঘটিল, যে পাত্রের সহিত পৌত্রীর বিবাহ, তাহার পিতামহের হঠাৎ মৃত্যু হইল, মজুমদার মহাশয় শুনিয়া অন্ধকার দেখিলেন। সমস্ত উদ্যোগ পত্র হইয়া গিয়াছে, সামাজিক বিতরণ আরম্ভ সম্পন্ন হইয়াছে, দূর দূরান্তরে নিমন্ত্রণ হইয়াছে, দূরাগত আত্মীয় বন্ধুরা সপরিবারে আসিয়া চন্দ্রহাটী ভবন আলোকিত করিয়াছেন, বাড়ীর দুই ফটকে দুই সম্প্রদায় নহবৎ বসিয়াছে। ভিয়ানশালায় ভিয়ান চড়িয়াছে। মিষ্টান্নে ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে। ত্রিবেণীর ময়রা সকলেই সন্দেশের যোগান দিতেছে। নানাবিধ পেয় ভোজ্যে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। বিবাহ ত স্থগিত হয় না।

স্থিরবুদ্ধি মজুমদার অধিকক্ষণ অন্দরে থাকিবার লোক নহেন, কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছেন, হরবিলাসের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একেবারেই কালিদাস মিত্রের দুইটী হাত ধরিয়া বলিলেন,—"আমাকে আপনার রক্ষা করিতেই হইবে, শ্রীমান দুর্গাদাস বাবাজীর বিবাহকাল উপস্থিত, আমার পৌত্রীকে আপনি পুত্রবধূ করুন, একাজ আপনাকে করিতেই হইবে, পৌত্রী সুরূপা সগুণা।"

সল্টবোর্ডের নায়েব দেওয়ান, অতুল ধনের মালিক, হুগলি জেলার অশীতিপর লোক স্বয়ং মধুসূদন মজুমদার কালিদাস মিত্রের পুত্রকে পৌত্রী দিবার জন্য জিদ করিতেছেন, কালিদাস মিত্র নিজেও মহাশয় লোক। মজুমদারকে "আপনি আমাদের প্রাণদাতা। আপনার মত মহাশয় লোক এদেশে বিরল, আমার ভাগ্য হঠাৎ যে এত সুপ্রসন্ন হইবে, তাহা ত আমি কোন কালে স্বপ্নেও ভাবি নাই! ভগবানের লীলা বুঝা ভার, তিনি যে, এত সুখের জন্য আমাকে এত বিপদে ফেলিয়াছিলেন, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আমার পুত্র আপনার হস্তে সমর্পিত হইল।"

আনন্দের সীমা রহিল না, কাল্‌নায় আবার লোক গেল। কালিদাস বাবুর পরিবারবর্গ এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলকেই চন্দ্রহাটী আসিতে লিখিলেন, তাঁহাদের জন্য মজুমদার মহাশয় বাগানের প্রশস্ত প্রাসাদে স্থান স্থির করিলেন। উৎসব আনন্দে হর্ষ প্রমোদ উৎসাহে তৃপ্তি চরমে উঠিল। বিবাহ বাটীতে গাঢ় লোকারণ্য গাঢ়তর হইয়া উঠিল। বিবাহরাত্রে প্রবল রাজসূয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল।

হরবিলাসের অবিরত উপদেশে হরিবালার মন আবার শান্তিসলিলে সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। বিবাহোৎসবে হরিবালাও যোগ দিতে ত্রুটি করিলেন না। কালিদাস বাবু বরকর্ত্তা, মজুমদার মধুসূদন কন্যাকর্ত্তা। এ বিবাহে উভয়েই উভয় কর্ত্তা। বিবাহের পূর্ব্বেই বন্ধন হইয়াছে। ঠিক যেন স্বগৃহের কার্য্য হইতেছে, যেন খৃষ্টান মুসলমানের বিবাহ। ইংরাজ মুসলমানেরই ত পরমাত্মীয় যুগলের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটে, ভাই ভগিনীর দাম্পত্য মিলন হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বৃদ্ধির সকল কার্য্য একত্র হইল। বর কন্যার অন্নপ্রাশন মধুসূদনের দেবভবনে সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর বাগান-বাড়ীতে ফুলশয্যা হইল। মধুসূদন কালিদাসকে খরচ পত্র করিতে দিলেন না। পাকস্পর্শের ব্যয়ও মধুসূদন সমস্ত করিলেন। কালিদাসও অসম্পন্ন নহেন, কিন্তু মধুসূদনের জিদ, কালিদাসকে এক পয়সা খরচ করিতে দিবেন না। খরচ করিতেও দিলেন না, কালিদাসকে নির্ব্বাক দেখিয়া, মধুসূদন বলিলেন, "ভাবনা কেন? পরে যত ইচ্ছা খরচ করিও। কাল্‌নার বাড়ীতে গিয়া ভাণ্ডার লুটাইয়া দিও।"

এরূপ বিবাহের বরাভরণ কন্যাভরণের কথা কহিতে হইবে না। যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা বহুমূল্য, যাহা সুন্দর, যাহা মধুসূদনের উপযুক্ত, সল্টবোর্ডের নায়েব দেওয়ান—দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহকারী—মধুসূদন যে তাহারই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই বিবাহের ঘটার কথা এখনও চন্দ্রহাটী, গহরপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি গ্রামের প্রবাদে বিরাজ করিতেছে। মধুসূদন মজুমদারের পৌত্রীর নাম তারাসুন্দরী। তাঁকের বিবাহ হইল, লোকে এখনও বলে, যেন "চাঁদের হাটে তারার বিবাহ।"

কলিকাতা, হুগলি, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানের অনেক বড় বড় লোকের সমাগম হইয়াছিল। সল্টবোর্ডের অনেকেই চন্দ্রহাটী গিয়াছিলেন। হুগলি হক্ সাহেবের আফিসের কেহই বাদ পড়িল না। যত আফিসেরই আমলা উকিল মোক্তার প্রভৃতির শুভাগমন হইয়াছিল। মজুমদার ভবনে সাহেব বিবিরও অভাব হয় নাই, ত্রিবেণীর মজুমদার ভবনে সর্ব্বদা অতিথি সমাগম হইত। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভবনে বহুপূর্ব্বে কলিকাতার জজেরাও যাইতে ভাল বাসিতেন। সার উইলিয়ম্ জোন্‌স যাঁহার শিষ্য ছিলেন, তাঁহার ভবনে যে জজ সমাগম হইত, তাহা বিচিত্র নহে। চন্দ্রহাটীর মজুমদার ভবনেও পূর্ব্বেই সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল। এবার যাহা হইল, তাহা কিন্তু কোনকালে হয় নাই। হরিপুরী অভিনয়ে যোগ দিয়া মধুসূদন যে সকল গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে মধুসূদন যত সাহেব বিবির অধিকতর আদরভাজন হইয়াছিলেন।

কিন্তু হরিবালা ও হরবিলাসের সম্মান মর্য্যাদা আদর দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোককে বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। বিবিরা হরিবালাকে দেখিবার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া মজুমদারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হরিবালাকে দেখিতে পাইলেন না বলিয়া সাহেবেরা আক্ষেপের একশেষ করিলেন। কিন্তু হরিবালার হরবিলাসই সাহেবদিগকে হরিবালা দর্শনলালসা পূর্ণ করিলেন। পত্নীদর্শনের অভাব পতিদর্শনে পূর্ণ হইল।

উৎসব সাঙ্গ হইল, হরবিলাস হরিবালাকে লইয়া দিগ্‌ মুই যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার আত্মীয় স্বজনও চন্দ্রহাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কালিদাস মিত্র পুত্রবধূ প্রভৃতি লইয়া কাল্‌না যাত্রা করিলেন। বিবাহের আত্মীয়তা সম্পর্কে প্রগাঢ় হইল। হরবিলাস, কালিদাস ও মধুসূদন—তিন মহাপুরুষের—তিন পরিবার যেন একত্র হইয়া গেল।

হরিপুর ক্রমে ক্রমে অরণ্যে পরিণত হইল। পিশাচ-

পুরের এখনও চিহ্ন আছে। ইষ্টকস্তূপ এখনও ভূতের বাসা দেখাইয়া দিতেছে।

চন্দ্রহাটীর সে ঐশ্বর্য্য নাই, ম্যালেরিয়ায় সর্ব্বনাশ করিয়াছে। মজুমদার-বংশ টিম্‌টিম্ করিতেছে, কালুনার কালিদাস-বংশ এখন বিদ্যমান। দিগ্‌মুই সরিষার হরবিলাস ও হরিবালা পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, পুত্রদিগকে ম্যালেরিয়ায় অকালে মরিয়া যাইতে হইয়াছে, পৌত্রদিগের মধ্যে দুই একটী আছেন।

কালিদাসের সেই ভৃত্যদ্বয়ের কথা বলিতে পারি না। কিন্তু নফর সর্দ্দার ও গোবর সর্দ্দার যে কালিদাস বাবুর কার্য্যেই জীবনযাপন করিয়া গিয়াছে, তাহা আমরা জানি। মধুসূদন তাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন। প্রভূত পুরস্কারেও পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। নফরের বুদ্ধিকৌশলেই যে মুক্তিপথ প্রশস্ত হইয়াছিল, তাহা মধুসূদন কালিদাস প্রভৃতি সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

হরিবালাকে হুগলির ম্যাজিষ্টর যে হার দিয়াছিলেন, হরবিলাসকে যে ঘড়ী চেন দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বংশে এখনও বিরাজ করিতেছে কি না, বলিতে পারি না। আর অনুসন্ধানের আশাতেও প্রবন্ধ বাড়াইতে পারি না, অতএব, উপসংহার।

যম-তনয়া হইয়াও হরিবালা যে দেবীর আসনে বসিয়াছিলেন, জমের জামাই হরবিলাস যে নরসমাজে দেববৎ পূজ্য হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের বিদিত আছে। বোধ হয়, পাঠকেরও বিদিত হইল। বিচিত্র কিন্তু প্রকৃত আখ্যান কেন "যমের জামাই" নামে অভিহিত হইল তাহাও ত পাঠকের অবিদিত রহিল না।

সমাপ্ত।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

মহাপ্রস্থান।

(ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম, ডি, ডি, এল, সি, আই, ই, মহোদয়ের মৃত্যু উপলক্ষে।)

হে পূজ্য! হে নরদেব! আজি ফুরাইল তব কাজ,
জীবন-সমরে জয়ী ধন্য বীর ধন্য তুমি আজ!
আসিয়া ভারত মাঝে দীনবেশে হে সত্যসহায়,
উঠেছিলে উন্নতির অতি উচ্চ চরম সীমায়।
জ্ঞান-শৈলে চন্দ্রসম নীরবেতে উথান তোমার,
তবুও জলধিপারে বিকীর্ণ ও কিরণ অপার।
তুমি দূরে যেতে সরি' হে ঋষি, ত্যজিয়া কোলাহল,
তোমার সাথেতে যেত কার্য্যময় এ মহীমণ্ডল।
চাহিতে লুকাতে তুমি যূথীসম পাতার মাঝার,
সুযশসুরভি তব ছড়ায়ে পড়িত চারিধার।
হে উচ্চ অনুচ্চ ভাব পাপের মূরতি বিমোহন,
সভয়ে সরিয়া যেত হেরি তব বিশাল নয়ন।
তোমার হৃদয়-সরে জাগিত ভাসিত অবিরল
সত্য শিব সুন্দরের সুপবিত্র মূরতি বিমল।
ভীমকান্ত হে সুভগ! জানি তব বক্ষের মাঝার
নীরবে বহিত হায় ফল্গুসম দয়া অনিবার।
বৈদ্যনাথে কুষ্ঠাশ্রম অতরল তব আঁখিজল,
অশুষ্ক, অমর সেও তব সম হে চিরসরল!
বিপদে অসীম ধৈর্য্য, বজ্রবৎ কার্য্যে সুকঠিন,
বিনয়ে বেতসসম, কর্ত্তব্যে উন্নত চিরদিন।
সত্যের সাধন ব্রতে ভয়হীন অদম্য অটল,
স্নেহের কোমল স্পর্শে কুসুম সমান সুকোমল।
তোমার চরিত্র দেব! ভারতের আদর্শ মহান!
ভারতের শেষ ঋষি আজি স্বর্গে করিলে পয়াণ
মনে পড়ে সেই দিন অন্নহীন তুমি বীর যবে,
ধনপ্রদ এলোপ্যাথি ঠেলি পায়ে চমকিলে সবে!
সহিয়া বিদ্বেষ শত শত ঘৃণা শত অপমান,
সত্য জানি নবপথে আপনি হইলে আগুয়ান;
বিজ্ঞান-আলোক হেরি মহানন্দে আপনা ভুলিয়া,
স্বদেশ নিবাসিগণে প্রথমেতে আনিলে ডাকিয়া,

৬ষ্ঠ ভাগ।] প্রদীপ। [১০ম—১১শ সংখ্যা।

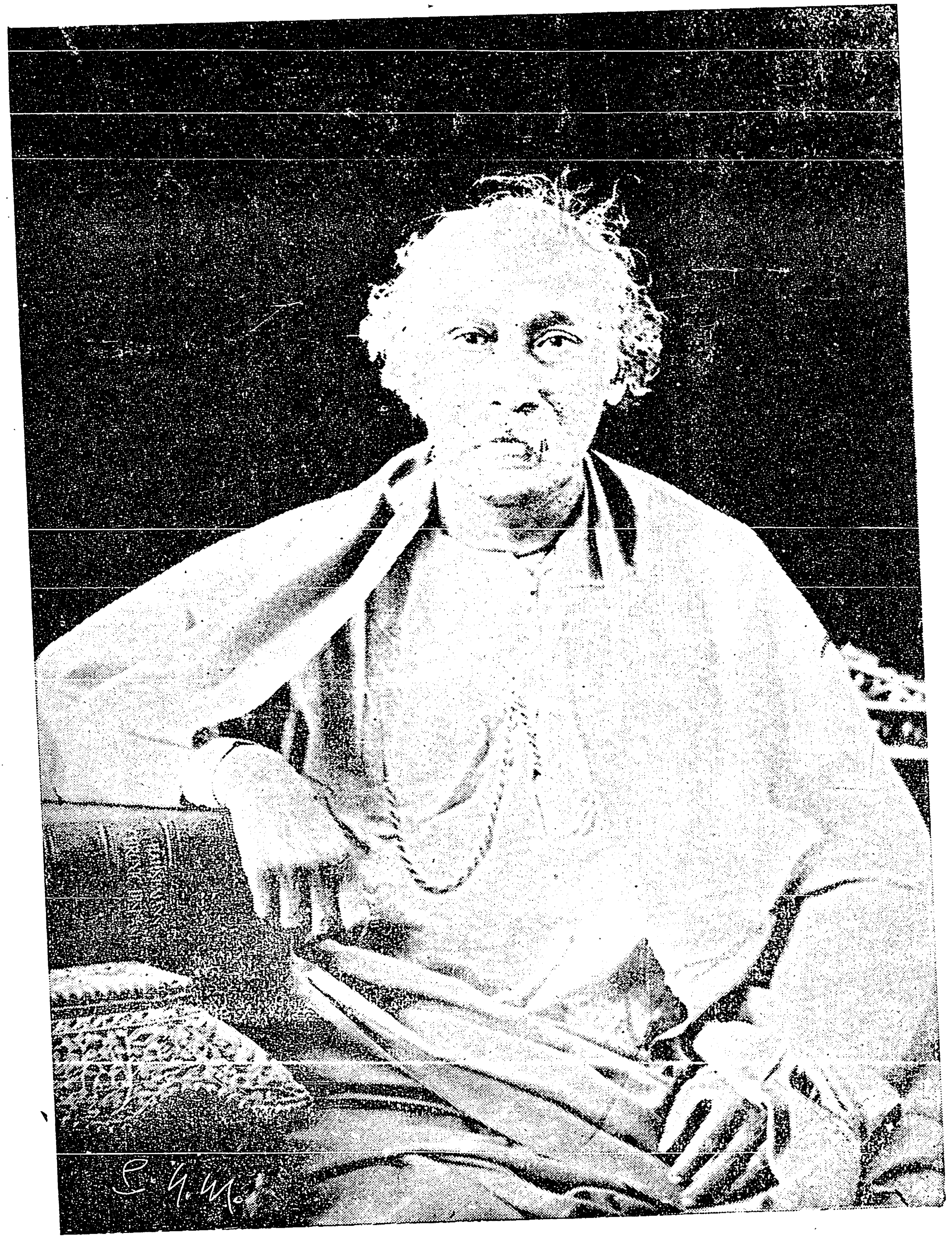

স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকার।

সে ত আজ বহুদিন ; তবু জাগিতেছে স্মৃতিপথে,
কীর্ত্তি ছোঁয় নাই কাল, তোমারে লয়েছে ধরা হ'তে।
হে সৌম্য, তোমার মৃত্যু, চৈত্র বৈশাখীর উষাসম,
বিষাদ-মধুর অতি, অতি স্নিগ্ধ অতি মনোরম।
পার্থিব জীবন-নিশি যদিও পোহাল আজি হায়,
আরম্ভ জীবন নব বৈশাখের প্রভাতের প্রায়।
নাশিতে পারেনি তোমা যুগ্ম-প্রাণ দিয়াছে শমন,
এ পারে অমরকীর্ত্তি ও পারেতে নবীন জীবন।
এখন ত্রিদিবে তুমি তবু দেব দেখ একবার,
স্নেহের বাঁধন তব কাঁদে সেই বিজ্ঞান-আগার।
সে তোমার পুত্রাধিক, সে তোমার প্রাণেরও যে প্রাণ,
স্বরগেও তার চিন্তা তব হর্ষ করিবে যে ম্লান!
*　　*　　*　　*
হে অধীর বঙ্গবাসি! হে ভারতবাসী সুধিগণ!
প্রস্তর মূরতি তাঁর হবে নাক করিতে রচন ;
সে অমর মৃত্যু নাই, স্মৃতি স্তম্ভ গেছে গড়ি' তার,
তার অস্থি, তার রক্ত সবই ওই বিজ্ঞান-আগার।
জীবনে দাওনি যাহা, মরণে কি থাকিবে তা ভুলে,
অনাথ বিজ্ঞান-সভা আজি তারে লহ কোলে তুলে।
মুছ অশ্রু, বাঁধ বুক, যথাশক্তি এস সবাকার,
রাখি সে বিজ্ঞান-সভা পিতৃহীন সন্তান তাঁহার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কাব্য।

বঙ্গ-সাহিত্যে অপরাপর অঙ্গাপেক্ষা কাব্য-চর্চ্চা অধিক ; অথচ কাব্যের স্বরূপ নির্ণায়ক পথপ্রদর্শক এবং উৎকর্ষ-সাধক অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি নব্য-শিক্ষিতের বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা যায় না। সাহিত্য ও কাব্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মাধীন না হইলে ভাষার নির্ণীতাবস্থা বলা যায় না। বঙ্গভাষা এখনও নির্ণীতাবস্থায় উপনীত হয় নাই সত্য, কিন্তু তথাপি যে বঙ্গভাষায় দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে, তাহাতে অলঙ্কার ব্যাকরণের চর্চ্চা না হইতে পারে এমত নহে। ফলতঃ বঙ্গভাষায় অলঙ্কার-শাস্ত্র আলোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

কাব্য-সংজ্ঞা।

কাব্য-সংজ্ঞা নিরূপণ অতিশয় দুরূহ। কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার অনুভব ও আস্বাদন হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা তাহার সম্যক প্রকাশ করা বা তাহার যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। সৌন্দর্য্যবোধে প্রীতিলাভ মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কাব্য পাঠে বা শ্রবণে রসজ্ঞের মন আনন্দ-রসে স্বভাবতঃ আপ্লুত হয়, কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় প্রীতি বা আনন্দ ভাষা দ্বারা ব্যাখ্যা বা সম্যক্ প্রকাশ হয় না। প্রাচীন আলঙ্কারিক যথার্থই বলিয়াছেন,—"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্"। শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন "যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কাব্য ত অনেক পড়ি প্রকৃত কবি কে, তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব? তদুত্তরে আমি বলি—কোনও কবির কাব্যের কোন অংশ পাঠ কর, পাঠ করার পরেও যদি মনে হয়, ইহাতে কবিত্ব আছে কিনা, তবে খুব সম্ভব, তাহার মধ্যে প্রকৃত কবিত্ব নাই।"

কাব্য-সংজ্ঞা নিরূপণের দুরূহতা প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও অনুভব করিয়াছেন এবং সংজ্ঞা নিরূপণে তাঁহারা এক মত হইতে পারেন নাই। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন, রসাত্মক বাক্যমাত্রই কাব্য। কিন্তু বামনসূত্র, কাব্যপ্রকাশ রসগঙ্গাধর প্রভৃতির মতে রসাত্মক বাক্য হইলেই কাব্য হয় না, কাব্যমাত্রেই সৌন্দর্য্যাশ্রয়। বামনমতে গুণালঙ্কারযুক্ত শব্দার্থ কাব্য। মম্মঠ ও প্রভাকর মতে আবার তাহা "অদোষ" হওয়া আবশ্যক। ভোজমতে অদোষ গুণালঙ্কারযুক্ত রসবৎ বাক্য কাব্য। যগন্নাথ মতে রমণীয়ার্থ শব্দ কাব্য। Dr. Blair বলেন "Poetry is the language of passion or enlivened imagination formed most commonly into regular numbers." যগন্নাথ প্রদত্ত সংজ্ঞা অতি সরল; তদ্দারা স্পষ্টতঃ এবং সাহিত্য-দর্পণকার প্রদত্ত সংজ্ঞা ব্যতীত অপরাপর সংজ্ঞা দ্বারা অভিপ্রায়তঃ কাব্য-লক্ষণে সৌন্দর্য্য সূচিত হইতেছে।*

* ফলতঃ অলঙ্কার-শাস্ত্র নামেই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইতেছে। এখানে অলঙ্কার শব্দ উপমা যমকাদি প্রচলিত অর্থে পর্য্যবসিত নহে; অলঙ্কার শব্দের অর্থই সৌন্দর্য্য। বামন সন্দর্ভে লিখিত

এই সকল সংজ্ঞার সার সঙ্কলনে দেখা যায়, রমণীয়ার্থ বা সৌন্দর্য্যাশ্রিত রসবৎ বাক্য কাব্য। বলা বাহুল্য অদোষ গুণবৎ রীতি, regular numbers বা ছন্দঃ ইত্যাদি কাব্যের নিত্য লক্ষণ নহে এবং তাহা কাব্য সংজ্ঞার অঙ্গীভূত হইতে পারে না। কেহ কেহ সাহিত্য-দর্পণকারের এবং Dr. Blairএর মত অনুসরণ করিয়া বলিতে পারেন "রমণীয়ার্থ বা সৌন্দর্য্যাশ্রিত" না হইলেও রসবৎ বাক্যমাত্রই কাব্য ; সৌন্দর্য্য কাব্যের অলঙ্কার বা উৎকর্ষসাধক মাত্র, কাব্যের নিত্যলক্ষণ নহে অথবা "রসবৎ" এই কথা দ্বারাই সৌন্দর্য্য সূচিত হইতেছে, সুতরাং "সৌন্দর্য্যাশ্রিত" শব্দটী পুনরুক্তি মাত্র। এই তর্কের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, কাব্যের অভিপ্রায় কি। সুধিগণের মতে কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের অবতারণাদ্বারা চিত্তবিনোদন। লোকশিক্ষা সমাজে সুনীতি স্থাপন ইত্যাদিও কাব্যের অভিপ্রেত বটে, কিন্তু গৌণভাবে। কাব্যদ্বারা মনোবৃত্তিসমূহের কোমলতা সম্পাদন হয়, রাম যুধিষ্ঠিরাদি মহৎ জীবনের মাহাত্ম্য প্রদর্শনে লোকের মন ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত হয় এবং মানবের মনে উন্নতভাবের ও উন্নতচিন্তার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কাব্যের এই সকল প্রথমতঃ লক্ষ্য নহে, ইহা কাব্যের আনুষঙ্গিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল। "কাব্যং......সত্যপরা নিবৃত্তয়ে কান্তা সম্মিততয়া উপদেশ যুজে" এই বাক্যেও কাব্যের প্রধানতঃ চিত্তবিনোদনের ভাব সূচিত হইতেছে। কান্তা সম্মিততয়া এই কথার ধ্বনিতে উপদেশ বা শিক্ষা-কল্পেও আদৌ কোমলতা এবং চিত্তবিনোদনের ভাব আসিতেছে এবং সূচিত হইতেছে। কাব্যের ফল প্রথমতঃ চিত্তবিনোদন ও আনুষঙ্গিক ফল লোকশিক্ষা। এখন কথা হইতেছে, সৌন্দর্য্যের অবতারণা ব্যতীত কেবল রসবৎ বাক্যে চিত্ত বিনোদন হয় কিনা। রসাত্মক বাক্যদ্বারা সৌন্দর্য্য অনেক সময় সূচিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বদা নহে। যেখানে সৌন্দর্য্য সেখানে রসের আবির্ভাব একথা সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য রসের নিত্য সঙ্গী নহে। আবার রসবৎ বাক্যে স্থলবিশেষে আমাদের মনে উৎকট দুঃখাদির উপজয় হয়, তাহা কিছুতেই সুখকর নহে। তার্কিক এই অবসরে বিয়োগাত্মক কাব্যের উল্লেখ করিয়া বলিতে পারেন, তাহা সুখকর ও চিত্তবিনোদক কিসে এবং তাহা উক্ত লক্ষণানুসারে কাব্য হয় কিরূপে ? অনেকেই জানেন কাব্যপাঠে আমরা যে সময় সময় দুঃখ অনুভব করি, তাহা কোমল বিষাদ মাত্র ; আপাত দুঃখের নিম্নস্তরে সুখের স্তর আছে, সুতরাং বিষাদকাব্যও মূলতঃ সুখকর ও চিত্তবিনোদক বটে। আর যদি রসাত্মক বাক্যমাত্রই কাব্য হয়, তবে পুত্রশোকবিহ্বলা রোরুদ্যমানা জননীর অসম্বদ্ধ বিলাপ-বাক্যও কাব্য, কারণ তাহাতেও শ্রোতার মনে করুণার সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বিলাপ কল্পনা ও সৌন্দর্য্য বিরহিত হওয়ায় কাব্য নহে। সত্য বটে, মানুষের ভাষা হৃদ্গত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি মাত্র, হৃদয় যখন যে ভাবে আলোড়িত হয়, অনুভব প্রখর হইলে ভাষাও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি কাব্যে প্রকৃতি ও কল্পনাকে এরূপ কৌশলে মিশ্রিত করিতে হইবে যে, তাহাতে পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয় কবি-হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া প্রীতি ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিবে। সৌন্দর্য্য লক্ষ্য রসবৎ বাক্যাবলি সুকল্পনা বিরহিত হয় না, কিন্তু রসাত্মক বাক্যাবলি মাত্রেই এই কথা বলা যায় না।

সৌন্দর্য্য যদি কাব্যের একটী প্রধান উপকরণ স্থির হয়, তবে এখন দেখা আবশ্যক, সৌন্দর্য্য কি। সৌন্দর্য্য কি তাহা বিশ্লেষণ দ্বারা সম্যক নিরূপণ সুকঠিন, অথচ ভাবুক ও রসজ্ঞমাত্রেই সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদে অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। অরুণোদয়ে সীমন্তের রক্তিমশোভা দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই, নক্ষত্রখচিত আকাশতল দর্শনে প্রীতিলাভ করি এবং কৌমুদীচুম্বিত লহরীমালার শোভায় প্রফুল্ল হই ; কিন্তু কেন এই আনন্দলাভ করি, তাহা ভাষায় সম্যক প্রকাশ করিতে পারি না। কিন্তু যদিও সৌন্দর্য্যের তর্কশাস্ত্রসম্মত অনন্যবৃত্তি সংজ্ঞা নিরূপণ দ্বারা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা দুরূহ, কিন্তু তথাপি সৌন্দর্য্যের স্বরূপ নির্ণায়ক কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ; এবং যদিও সমাজ ও রুচি-

আছে কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ...সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ। অলঙ্কৃতিরলঙ্কারঃ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, অলঙ্ক্রিয়তে অনেনেতি করণব্যুৎপত্তি নিষ্পন্নো যমকোপমাদি বোধকো নায়মলঙ্কার শব্দঃ কিন্তু অলঙ্কৃতিরলঙ্কারঃ ইতি ভাবব্যুৎপন্নো...সৌন্দর্য্যপরঃ তৎপ্রতিপাদকত্বা দেব অস্যালঙ্কার নাম্না ব্যপদেশঃ।

কাব্য প্রকাশের ভূমিকা।

ভেদে সৌন্দর্য্যবোধেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তথাপি সৌন্দর্য্যের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে, যাহারা সৌন্দর্য্যের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, যথা :—

১। সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে সাধারণতঃ দেশ-কালাদি অবস্থানুসারে শক্তি, যোগ্যতা উপযোগিতা এবং ফলোপধায়কতার ভাব নিহিত থাকে। মানবশরীরে যে সমস্ত অবয়ব রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক অঙ্গের উক্তরূপ যোগ্যতাদি নিহিত রহিয়াছে, অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় অঙ্গে সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়া থাকে। অবয়বী মাত্রেই এই কথা খাটে। প্রত্যেক অবয়বের সুস্থতা ও শক্তিমত্তা অবয়বী-মাত্রেরই সৌন্দর্য্যের প্রধান কারণ।

২। অবয়বীর প্রত্যেক অঙ্গ যেমন সুস্থ ও শক্তিযুক্ত হইবে, তেমন আবার তাহাতে যথাযথ পরিমাণ, সংস্থান ও সুবিন্যাস থাকিবে। অবয়বসমূহ সুসংস্থিত সুপরিমিত ও সুবিন্যস্ত না হইলে বক্রদর্পণে-ফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় কুৎসিত মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৩। অবয়বীও সমস্ত অঙ্গের মধ্যে পরস্পর একটী সাপেক্ষ ভাব এবং সর্ব্বাঙ্গীন একটী ঐক্যের ভাব নিহিত থাকা আবশ্যক। প্রকৃতি মধ্যে সর্ব্বত্র বৈষম্য ও বৈচিত্র, অথচ তন্মধ্যে একটী সাম্য ও ঐক্যের ভাব রহিয়াছে। তদ্রূপ অবয়বীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে এবং সর্ব্বাঙ্গীন একটী ঘনিষ্ঠ সমবায় সম্বন্ধে নিবদ্ধ থাকা আবশ্যক। ফলতঃ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি পরিণতি ও সামঞ্জস্য নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে।

৪। বর্ণ সৌন্দর্য্যের এক প্রধান উপকরণ। পীত লোহিতাদি বর্ণ অবস্থাভেদে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে এবং বৈচিত্রগুণে ও পরস্পর সাপেক্ষভাবে অবস্থান সম্ভূত তুলনায় উক্ত সৌন্দর্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ হইয়া থাকে।

৫। অবস্থাভেদে স্থিতি অপেক্ষা গতি অধিকতর শোভা ও সৌন্দর্য্যের কারণ। অশ্বের গ্রীবাভঙ্গি, বালকের চপলতা, বিদ্যুতের বক্রগতি, চন্দ্রালোকে লহরিলীলা অতিশয় সুন্দর।

৬। সৌন্দর্য্য প্রকৃতিগত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। অবয়বের সুবিন্যাস ও সুসংস্থানে যেমন অবয়বীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অবস্থানের (Situation) সুবিন্যাসের গুণে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন হয়, এবং তাহার অন্যথায় সৌন্দর্য্য হানি হয়। যুধিষ্ঠিরের নিষ্ঠা ও ধর্ম্মবুদ্ধির 'ইতি গজত্বে' পরিণতি, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের গুপ্তভাবে বালিবধ, প্রশান্ত সাগর-বক্ষে কুমুদকহ্লার পরিশোভিত উপবনে অধিষ্ঠিতা ষোড়শী রূপসী কমলে কামিনীর হস্তীগ্রাস ইত্যাদি স্বাভাবিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য জ্ঞানের ব্যাঘাতক ও সৌন্দর্য্যের হানি-কারক।

সৌন্দর্য্য যদি কাব্যের এক প্রধান উপকরণ হইল, তবে দেখা যাউক, উহার ক্রিয়াস্থল কোথায়। সৌন্দর্য্যের ক্রিয়াস্থল শ্রোতার হৃদয়ে।

আনন্দ ও সুখ সৌন্দর্য্যের নিত্য সহচর। সৌন্দর্য্য-মাত্রেই মানবমনে সুখের উদ্রেক করে ও তাহাতে মানব-মনে হর্ষ বিস্ময়াদি ভাবের উপজয় হয় ; অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের ক্রিয়াস্থল মানবের মন। সৌন্দর্য্য এবং মানবমনে হর্ষাদি ভাব পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ। সুতরাং কাব্যলক্ষণে একদিকে যেমন সৌন্দর্য্য অপর ভাবে দেখিতে গেলে তেমন হর্ষাদি ভাব। এই হর্ষাদিভাব অলঙ্কার শাস্ত্রে অবস্থাভেদে রস ও স্থায়ীভাব নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক লীলা-জনিত সৌন্দর্য্য আমরা দুই প্রকারে অনুভব করি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। আমরা কখনও স্বয়ং প্রাকৃতিক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া হর্ষ বিস্ময়াদি অনুভব করি ; কখনও বা সমবেদনা ও সাংদৃষ্টিক ন্যায় অনুসারে অন্যের অনুভূত হর্ষাদিভাবের অনুভব করিয়া থাকি। রাধার বিরহ, রামের বনবাস, কর্ণের বীরদর্প ইত্যাদির চিত্র বা আখ্যায়িকা মাত্রে উক্তরূপে আমাদের শোকাদি ভাবরাশির উদয় হয়। কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমুদ্র বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সমুদ্র দর্শন না করিয়াও তৎপাঠে হর্ষাদি সুখানুভব করিয়া থাকি। তদ্রূপ স্বয়ং হিমালয় না দেখিয়াও আমরা চিত্রকর অঙ্কিত হিমালয়দর্শনে সুখানুভব করি এবং আমাদের মনে হর্ষাদি ভাবের উদ্রেক হয়। অর্থাৎ আমরা প্রাকৃতিক লীলা অনুভব না করিয়া কোন প্রখর অনুভূতি-পরায়ণ কবি বা চিত্রকরে অনুভূত ও সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া হর্ষাদিভাবে আপ্লুত হই। ফলতঃ উন্নততর সৌন্দর্য্য প্রায়শঃই আমরা এই শেষোক্তরূপে অনুভব করি। অনুভব

প্রখরতা এবং তন্ময়তার অভাবে উন্নততর সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ ভাবে কল্পনা ও তাহার রসাস্বাদ করা অতি অল্প লোকেরই সাধ্যায়ত্ত; কিন্তু রসজ্ঞ ভাবুকের অনুভূত সৌন্দর্য্য বাক্যে বা চিত্রে প্রকটিত হইলে তাহা অনুভব করা অনেকের সাধ্যায়ত্ত বটে। ইহা হইতেই কাব্য ও চিত্রাদি অনুকৃতিমূলক বিদ্যার উৎপত্তি।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, সৌন্দর্য্য লক্ষ্যতায় কাব্য সূক্ষ্মশিল্পের সমধর্ম্মী এবং কাব্য ও সূক্ষ্মশিল্প উভয়ই সৌন্দর্য্যাত্মিকা বিদ্যার অন্তর্গত। সৌন্দর্য্য প্রকটন দ্বারা মনোমুগ্ধ করা সৌন্দর্য্যাত্মিকা বিদ্যার সাধারণ ধর্ম্ম, কিন্তু ইহাতে কাব্যের সাধন ভাষা এবং চিত্রাদির সাধন বর্ণ ইত্যাদি। ভাষা মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়; মানবের ইহা একটী দুর্লভ শক্তি। এই সাধনের উৎকর্ষগুণে কাব্য সূক্ষ্মশিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্মশিল্প মাত্র বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্যের অনুকরণে সমর্থ। সত্য বটে, চিত্রে এবং ভাস্কর-খোদিত মূর্ত্তির মুখাবয়বে ভাবের সন্নিবেশ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা অন্তরের ভাবোত্থিত ক্ষণিক রেখাপাৎ মাত্র অন্তর্জ্জগতের রহস্য তাহাতে সম্যক প্রীতিভাত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ সূক্ষ্মশিল্প মাত্র স্থিতিশীল সৌন্দর্য্যের অনুকরণে সমর্থ গতি ও ক্রিয়া প্রদর্শনে সমর্থ নহে।* কিন্তু স্থিতি ও গতি অন্তঃ ও বহিঃ এবং উভয়ের ঘাত প্রতিঘাতে ভাব বিপর্য্যয় ইত্যাদি নৈসর্গিক লীলা মাত্রই কাব্যের আয়ত্ত্বাধীন।

দেখা গেল, নৈসর্গিক লীলা-সৌন্দর্য্যে সহৃদয় কবির হৃদয় আন্দোলিত হয় এবং তাহার মনে ভাবলহরী খেলিতে থাকে; তখন তিনি অনুরূপ (তরঙ্গায়িত) ভাষা অবলম্বনে নিজ হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া রসজ্ঞ শ্রোতার মনে হর্ষ বিস্ময়াদি ভাবরাশির উদ্রেক করেন। এই উদ্রিক্ত ভাবরাশি "রস" ও অবস্থা বিশেষে স্থায়ীভাব নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে আমরা কাব্যের তিনটী উপকরণ পাইলাম (১) সৌন্দর্য্য (২) সৌন্দর্য্য ক্রিয়া-জনিত মানবমনে সঞ্চারিত হর্ষাদি ভাব বা "রস" (৩) কাব্যের সাধন ভাষা বা অর্থযুক্ত শব্দ। কিন্তু ভাষা বা বাক্য কি? শব্দ বোধ কিসে জন্মে?

প্রকৃতি প্রত্যয় সাধিত শব্দ বিশেষের নাম পদ। সঙ্কেত ও লক্ষণদ্বারা পদের বৃত্তি বা অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, অন্যথা মাত্র শব্দোচ্চারণে শব্দার্থ বোধ হয় না। "বারি" এই শব্দে বৃদ্ধ ব্যবহারাদি জনিত সঙ্কেত দ্বারা দ্রব দ্রব্য বিশেষে শক্তিগ্রহ না থাকিলে "বারি আনয়ন কর" শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র জল আনয়নের অভিপ্রায় উপলব্ধি হইবে না। আবার স্থলবিশেষে মাত্র সঙ্কেত দ্বারা বক্তার অভিপ্রায় উপলব্ধি হইবে না। সেখানে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। "তিনি গঙ্গাবাস করিতেছেন" এস্থলে গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ জলপ্রবাহ মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ অসম্ভব প্রযুক্ত বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে গঙ্গাপদটীকে তীর লক্ষক করিতে হইবে। তদ্রূপ "কাকেভ্যো দধি রক্ষতাং" সন্নিকৃষ্ট কাক দর্শনে কর্ত্তা এই আদেশ করিলে ভৃত্য কেবল কাক সম্বন্ধে সতর্ক হইবে এমত নহে, পরন্তু লক্ষণা-দ্বারা দধিভক্ষক কাক কুক্কুর শৃগালাদি অপচয়কারী মাত্র সম্বন্ধেই সতর্ক হইবে।

পদ সমষ্টি অর্থ যুক্ত হইলে বাক্য হয়। পদ সমষ্টি আসত্তি, যোগ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষা এই ত্রিবিধ গুণাশ্রিত না হইলে অর্থযুক্ত হয় না। আসত্তি অর্থে শব্দ সমষ্টি মধ্যে সন্নিকট উচ্চারণজনিত বোধের অবিচ্ছেদ ভাব। অদ্য উচ্চারিত বায়ু শব্দের সহিত দিনান্তরে উচ্চারিত বহিতেছে শব্দের নিকট উচ্চারণ-জনিত বোধের অবিচ্ছেদ ভাব নাই, সুতরাং তাহাতে অর্থগ্রহ হয় না। সুতরাং তদ্রূপ উচ্চারিত শব্দ সমষ্টি বাক্য নহে। আবার নিকট উচ্চারিত পদসমূহ মধ্যে যদি পরস্পর আকাঙ্ক্ষার ভাব না থাকে তবে উক্তরূপ পদসমষ্টিও বাক্য হয় না। যে শব্দ ব্যতীত যে শব্দের অন্বয়ের অনুপপত্তি বা শ্রোতার প্রতীতির অভাব সে শব্দ অপর শব্দের সাকাঙ্ক্ষ। "বায়ু বহিতেছে" এখানে শব্দদ্বয় পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ। "অশ্ব নদী" এই শব্দদ্বয় মধ্যে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং এই শব্দসমষ্টি বাক্য নহে। তৃতীয়তঃ পদসমষ্টি মধ্যে যোগ্যতা অর্থাৎ অর্থ প্রকাশ সম্বন্ধে পরস্পর স্বাভাবিক বাধা বা অসঙ্গতি রহিতত্ব থাকা আবশ্যক। অগ্নিদ্বারা সিঞ্চন পদ দ্বারা

* গতি ও ক্রিয়া কাব্যে কেমন উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে, নিম্ন শ্লোকে তাহা প্রকাশ পাইবে।

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধ দৃষ্টিঃ।

ইত্যাদয় শকুন্তলে।

লক্ষণে ইত্যাদি পদসমষ্টি মধ্যে অর্থগ্রহ সম্বন্ধে স্বাভাবিক বাধা বা অসঙ্গতি রহিয়াছে সুতরাং অর্থ প্রকাশের উপযোগিতা অভাবে উক্ত পদসমষ্টি বাক্য হইতে পারে না।

দেখা গেল, কাব্যের সাধন ভাষা বা অর্থযুক্ত শব্দ বা বাক্য। কাব্যের উপযোগিতার অনুরোধে উহা সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু ছন্দঃকাব্যের নিত্য সঙ্গী নহে। সহজ কথায় কাব্যে গদ্য পদ্য দুই প্রকার রচনাই চলিতে পারে। সুতরাং যেমন মেঘনাদবধ কাব্য, তেমন চন্দ্রশেখরও কাব্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী কথা আছে। ভাষা হৃদ্গত ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র; হৃদয় যখন যে ভাবে আলোড়িত হয়, অনুভব প্রখর হইলে ভাষাও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রখর অনুভূতি পরায়ণ কবির হৃদয়াবেগ উত্থিত ভাবরাশির অনুসরণে তাহার ভাষাও তরঙ্গায়িত হইবে এবং তাহাতে ভাষার শব্দ যোজনা প্রণালীর কথঞ্চিৎ বিপর্য্যয় ঘটিবে। শোক-বিহ্বলা রোরুদ্যমানা বঙ্গীয় মহিলার আবেগময়ী-বিলাপ রচনাতে বোধ হয়, অনেকেই এই বৈলক্ষণ্য অনুভব করিয়াছেন। আর একটী কথা; পূর্ব্বে কবিতা মাত্রেই গীতোদ্দেশ্যে রচিত হইত, সভ্যতার উন্নতিসহ কবি ও গায়ক প্রায়শঃ পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং কবিতা ও গীতির মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ রহিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি কাব্যে একটা লয়ের ভাব বা তাল বোধ দ্বারা কাব্যের ভাষা নিয়মিত হয়, সুতরাং গদ্য কাব্যের উচ্ছ্বাসময়ী বাক্যাবলী ও উদ্বেলিত হৃদয়ানুসরণে প্রচলিত ভাষাপেক্ষা ভিন্নরূপে ধারণ করিবে এবং তাহা তালবোধ বা পরিমাণ জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত হইবে। উপরে যাহা বিবৃত হইল তাহার সার কথা এই;—

প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের আধার, সৌন্দর্য্য বোধ এবং সৌন্দর্য্য অনুভবে প্রীতিলাভ মানব আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সৌন্দর্য্য কি তাহা যদিও তর্কশাস্ত্রসম্মত সংজ্ঞা দ্বারা সম্যক নিরূপণ করা সুকঠিন, তথাপি সৌন্দর্য্য যে সকল নিয়মাধীন তাহার আলোচনা দ্বারা তাহার সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ স্থির করা যাইতে পারে। পরে দেখা গিয়াছে, কাব্য ও সূক্ষ্মশিল্প সৌন্দর্য্যাশ্রয়তায় সমধর্ম্মী; উভয়ই সৌন্দর্য্যাত্মিকা বিদ্যার অন্তর্গত; কাব্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সাধনে এবং কাব্যের সাধন ভাষা বা অর্থযুক্ত শব্দ। আসত্তি যোগ্য আকাঙ্ক্ষা এই তিন গুণাশ্রিত হইলেই পদসমূহ অর্থযুক্ত হয়।

অনুভূতি পরায়ণ স্বয়ং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে তাহা অনুরূপ ভাষায় প্রকাশ করেন; তাহার তন্ময়তাজনিত বাক্যাবলি যাদুমন্ত্রের ন্যায় শ্রোতার মনে হর্ষাদি ভাব বা "রসের" সঞ্চার করে। উক্তরূপ আলোচনায় দেখা যায়, সৌন্দর্য্য, রস ও বাক্য এই তিন কাব্যের উপকরণ—এতৎসহ কাব্যের অভিপ্রায়াদি আলোচনা করিয়া কাব্যের এই সংজ্ঞা স্থির হইল!—কাব্য সৌন্দর্য্যাশ্রয় রসবৎ বাক্য; তাহা ছন্দোবদ্ধ অথবা তাল বা পরিমাণ জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা।

বঙ্গদেশের ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গামা একটী সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে বঙ্গদেশের মধ্যে রাঢ়ীয়াঞ্চল এই দারুণ দুর্ঘটনা দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ইহাতে বড় বড় গৃহস্থ নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছিল, গরিব দুঃখীর ত কথাই নাই—এদেশের জমীদার, মহাজন, ধনশালী কৃষক, সকল শ্রেণীর, সকল অবস্থাপন্ন লোকেরই দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল—বর্গীর হাঙ্গামায় কত বড় বড় সম্পত্তির দলিল দস্তাবেজ ভস্মীভূত হইয়াছে, কত কবির কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, কত লোকের পুত্র কন্যা হারাইয়াছে, কত সতীর সতীত্বাপহৃত হইয়াছে—নানা প্রকারে নানা জনের নানা ক্ষতি হইয়াছে, সেই ক্ষতির পরিমাণ হয় নাই, পরিপূরণ হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।—বঙ্গদেশকে জঙ্গিস খাঁর অত্যাচার সহিতে হয় নাই, নাদির সাহের নরহত্যার শোণিতস্রোত বক্ষে বহিতে হয় নাই—তৈমুর লঙ্গের পদভরেও অস্থির হইতেও হয় নাই; কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামার কষ্ট কখন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। এই বর্গীর হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে, তাহা

পূর্ণাঙ্গ নহে। তাই আমরা আজ বঙ্গের অতীত দুঃখ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের সুগোচর করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। বর্গীর হাঙ্গামার কথা আজও বঙ্গের প্রতি গৃহে শুনিতে পাওয়া যায়—জননী দুরন্ত শিশুকে বর্গীর ভয় দেখাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, বর্গীর হাঙ্গামা এককালে আবাল বৃদ্ধবনিতার ভীতি সমুৎপন্ন করিত, গ্রাম্য-ছড়ায় বর্গীর হাঙ্গামা-কাহিনী স্থান পাইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়েরাই এদেশে বর্গী নামে প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সুপ্রতিষ্ঠিত সেনাপতি রঘুজী ভোঁসলা মধ্যপ্রদেশের বিরার রাজ্যের অধিপতি, নাগপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। শিবজীর সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা মস্তকোত্তলন করিয়া দিল্লীশ্বরের অমিত বিক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে যারপরনাই বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া আসিতেছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবই তাঁহাদিগের সমকক্ষতা করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর মোগল সম্রাটগণ কেবলমাত্র গৃহবিবাদ ও বিলাস-ভোগবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য লালায়িত হইয়া পূর্ব্বগৌরব হারাইতে বসিয়াছিলেন, দিল্লীর পূর্ব্বপ্রতাপ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, অধীন রাজ্যগুলির উপরেও তাদৃশ প্রাধান্য ছিল না, অনেকেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে সমুৎসুক, সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই অশান্তির সূত্রপাত এবং সাম্রাজ্যশক্তিও ছায়ামাত্র অবশিষ্ট ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে মহম্মদ সা দিল্লীর সম্রাট, তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে অস্থির হইয়া তাঁহাদিগকে রাজস্বের চতুর্থাংশ করস্বরূপ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খৃঃ ১৭৪৬ অব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন হয়েন, দিল্লীর সম্রাট অপেক্ষা তিনি স্বপদে সমধিক সুপ্রতিষ্ঠ এবং ভুজবীর্য্যে বা বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিতে কোনমতে হীন ছিলেন না—তাঁহাকে অন্যান্য সুবাদারের ন্যায় সম্রাটের মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই—মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাহুবল ভারতের নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা বঙ্গদেশে প্রসারপ্রাপ্ত হয় নাই—বঙ্গদেশ প্রকৃতির লীলাভূমি, ধনধান্যে পরিপূর্ণ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলিয়া পূর্ব্বাপর প্রবাদ আছে, এরূপ স্থানে প্রাধান্য বিস্তারে ও ইহার সুখৈশ্বর্য্যের অংশ গ্রহণে বিরত থাকা মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক। অতঃপর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি রঘুজী ভোঁসলা তাহারই জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী সেনা সঙ্গে দিয়া আপনার সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিতকে বঙ্গদেশাধিকারে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের কথা—এই বৎসর বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আমেদ খাঁর বন্দীত্ব মোচন ও কটকে শান্তি স্থাপন করিয়া উল্লাসিতচিত্তে আপন সহধর্ম্মিণী ভ্রাতুষ্পৌত্র ও পোষ্যপুত্র সিরাজ উদ্দৌলা প্রভৃতি পরিজনবর্গের সহিত শিকার করিতে করিতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি মারহাট্টাদিগের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র জৈনউদ্দিন আহম্মদ বিহার হইতে এই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন,—প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁহাকে এইমাত্র লিখিলেন—"স্বচ্ছন্দে আপনার কাজ কর্ম্ম করিতে থাক, মারহাট্টারা আসিলে, তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার পক্ষে যত্নের ত্রুটি হইবে না।" ইহার পর তিনি ক্রমে ক্রমে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কটক অভিযানের পরে তিনি আপনার সেনাগণের অনেককেই বিদায় দিয়াছিলেন, কেবলমাত্র ছয় সহস্র সৈন্য তাঁহার সঙ্গে ছিল। মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী কোন রমণীয় স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া মনে অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছিলেন, এরূপ সময় একদিন তথায় এক জন বিশ্বস্ত রাজস্ব-সংগ্রাহক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে মারহাট্টাগণ সেখান হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুতগমনে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, সম্ভবতঃ পরদিন সায়ংকালে, অথবা সেই দিন রাত্রি প্রভাতেই সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, এই সংবাদ অতি প্রয়োজনীয় বোধে তিনি স্বয়ং ইহা আনয়ন করিয়াছেন। তখন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত—নবাব নমাজ করিতেছিলেন, আপনার সৈন্য সংখ্যা অল্প বলিয়া বিন্দুমাত্র ভীতি, চিত্তচাঞ্চল্য বা উদ্বেগের লক্ষণ না দেখাইয়া সংবাদদাতাকে বলিলেন, "বিধর্ম্মীরা কোথায়? আর এমন জায়গাই বা কোথায়, যেখানে আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিতে না পারি?" এই অসাধারণ নির্ভীকতা দেখিয়া বার্ত্তাবহ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া বঙ্গদেশ প্রবেশের সুগম পথ না পাইয়া ভাস্কর পণ্ডিত সসৈন্যে পঞ্চকোট দিয়া এদেশে আসাই সুবিধাজনক মনে করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ মোবারক মঞ্জিলের নিকটবর্ত্তী সাত্রা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাইলেন যে, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পঞ্চকোট অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমান আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। নবাব ভাবিলেন, যে তাঁহার সঙ্গে তিন চারি হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার বন্দুকধারীর বেশী সৈন্য নাই, এরূপ অবস্থায় বর্দ্ধমান যাত্রাই কর্ত্তব্য। বর্দ্ধমান বঙ্গদেশের মধ্যে সমধিক ধনধান্য সম্পন্ন এবং জনাকীর্ণ নগর। এখানে নানাপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা—অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি মোবারিক মঞ্জিল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, পরদিন ঐ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন—শত্রুরা বর্দ্ধমান সহরে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, নগরবাসিদিগের ঘরবাড়ী ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহাদের সকলেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে, কেহ কেহ আপনাদের সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, কেহ কেহ বা তাহা না করিয়াই স্ত্রীপুত্র পরিজনসহ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যে যেদিকে সুবিধা হইতেছে, সেইদিকেই চলিয়া যাইতেছে—কেহ কেহ পুত্রকলত্রাদির অপেক্ষা না করিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্বেষণ করিতেছে, গরিব দুঃখীরা যে যাহা পারিয়াছে, আপনাপন ঘটী বাটী পরিধেয় বস্ত্র লইয়া ছুটিতেছে—মাতা পুত্রের মুখ চাহিতেছে না, স্বামী সহধর্ম্মিণীর দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে না, ভদ্রাভদ্র ভেদ নাই, সকলেরই এই দশা, বালক বালিকা, সুরূপা কুরূপা বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী সকলেই পলায়নপর, সকলেরই প্রাণ ও মানের ভয়, বড় বড় ঘরের ঘরণী আজি যেন জন্মের ভিখারিণী, কি দুর্দ্দিন—কি দুঃসময়! কৃষক মাঠে লাঙ্গল ফেলিয়া পলাইতেছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পথে বাহির হইয়াছিলেন, বর্গীর তাড়া পাইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে ছুটিতে স্কন্ধের পৈতা, মাথার শিখা বাঁশের কঞ্চিতে জড়াইয়া—যেমন জড়াইছে, অমনি ছিঁড়িল—তাহাতেই ঝুলিতে লাগিল, ব্রাহ্মণঠাকুর ছুটিতে ছুটিতে কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আশ্রয় খুঁজিতেছেন। কত দুগ্ধ-পোষ্য শিশু পথে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, কত অন্ধ আতুর অনাশ্রয় হইল, কত ব্রাহ্মণের ফুলের সাজি, কত যোষিতের জলের কলসী পথে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, যাহারা পলাইবার সুবিধা না পাইয়াছে, তাহাদের কেহ কেহ পুষ্করিণীর জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া মাথায় হাঁড়ি চাপা দিয়া আত্মগোপন করিল। বর্দ্ধমানে বর্গী আসিয়াছে শুনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী উপনগর ও গ্রাম পল্লীবাসিরা আপনাপন সঞ্চিত অর্থ মাটিতে পুতিয়া, জলে ডুবাইয়া, কেহ বা কোমরে বাঁধিয়া লইয়া সময় থাকিতে সরিয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে বর্গীরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিল, গৃহস্থের ঘর বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিল, সিন্দুক পেটরা খুলিল, ধন অর্থ যাহা পাইল লুণ্ঠন করিল, পলায়নপর গ্রামবাসিদিগের মধ্যে যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহার নিকট যাহা দেখিল তাহাই কাড়িয়া লইল, গৃহস্থের ঘরের মেজেয় ঘোড়া প্রবিষ্ট করিয়া দিল, যে ঘরের মেজের ভিতর শূন্য মনে করিল, তাহাই খনন করিয়া যাহা পাইল লইয়া, ধানের মরাই ভাঙ্গিল, ধান ছড়াইল, ছড়ান ধান ঘোড়াকে খাওয়াইল, চাউল কলাই যাহা মিলিল, আপনাদের খাদ্যের জন্য সঞ্চয় করিল, যে গৃহে কিছুই না পাইল, তাহাতে আগুন লাগাইল, ইহাতে কত গৃহস্থ নিরন্ন হইল, চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উঠিল। দেশ ধনশূন্য, শস্যশূন্য দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইল।

বর্দ্ধমানের উপকণ্ঠে নবাবসৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া এবং আলিবর্দ্দি খাঁর বিপুল বলবিক্রম ও অধ্যবসায়ের বিষয় অবগত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত একবারেই বহু প্রাণহানিকর যুদ্ধের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন না। নবাবের নিকট যাহা কিছু পান, তাহাই লইয়া সরিয়া পড়িবার ইচ্ছা করিলেন, তদনুসারে দূত দ্বারা তাহার প্রস্তাবও করা হইয়াছিল। দূত আসিয়া নবাবকে বলিল—"মারহাট্টারা অনেক দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, এবং পথ-

শ্রমে তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব তাঁহাদের ইচ্ছা দশলক্ষ টাকা পাইলেই সন্তুষ্টচিত্তে দেশে চলিয়া যান, অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে উপঢৌকনস্বরূপ সংকৃত করিবার পক্ষে উহাই তাঁহারা প্রচুর জ্ঞান করিবেন।” নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, আত্মসম্মানে আঘাত বোধ করিলেন—কেবল তিনিই নহেন, তাঁহার সেনাপতি মুস্তফা খাঁও তদ্রূপ সন্তপ্ত হইলেন। মুস্তফা সন্ধি কাহাকে বলে জানিতেন না, যুদ্ধ বিগ্রহ নরহত্যাদিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল, তিনি ঐ সকল কাজেই কৃতিত্ব বোধ করিতেন এবং তাহা না হইলে সৈনিক গৌরব রক্ষা পায় না বলিয়া বুঝিতেন। নবাব মুস্তফা খাঁর ভুজবীর্য্যের ও প্রভূত পরাক্রমের পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই পাইয়াছিলেন, তিনি অবজ্ঞার সহিত শত্রুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে—“সাহস হয়, তাহারা অগ্রসর হউক!” ইহাতে উভয়পক্ষেরই যুদ্ধস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, উভয়পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নবাবের ইচ্ছা যে গরু, গাড়ী, তাঁবু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া হইবে না, কারণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্যদিগকে অনেক সময় বিব্রত হইতে হয় সাজ সরঞ্জাম সঙ্গে না লইলে অনেক ঝঞ্ঝাট কমিয়া যায়, অতএব তাহাই করিতে হইবে, এই রকমে একদিন যুদ্ধ করিয়া দেখা যাউক। পরদিন প্রভাতকালে নবাব অশ্বারোহণ করিয়া তদ্রূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া বলিয়া দিলেন, চাকরবাকর কেহই যেন সিপাহী শান্ত্রীদের সঙ্গে মিশিয়া যায় না, যে যাইবে তাহারই গুরুতর দণ্ড হইবে। কিন্তু সে কথা কেহই শুনিল না, সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে না হইতে তাহারা প্রাণভয়ে সৈন্যসম্প্রদায়ে মিশিয়া গেল, সৈন্যগণও তাহাদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। শত্রুদিগের ইহাই বাঞ্ছনীয়—মুহূর্ত্ত মধ্যে মারহাট্টাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক আক্রমণ করিতে লাগিল, বঙ্গীয় সেনা নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল—কাটাকাটি, খোঁচাখুঁচি বেশ চলিতে লাগিল, উভয়পক্ষেই বীরত্বের পরিচয়—কেহ কাহাকেও হঠাইতে পারিল না—তুমুল সংগ্রামের মধ্যে ওমর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোসাহেব খাঁ শত্রুবেষ্টিত ও নিহত হইলেন। মোসাহেব খাঁ এক জন অল্পবয়স্ক যুবক, সমরাঙ্গনে তাঁহার বিপুল বলবিক্রমের প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছিল। এরূপ হইলেও নবাব-সৈন্য অগ্রসর হইয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল। সেনাপতি মুস্তফা খাঁ, সমশের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ নবাবের নিকটেই যুদ্ধ করিতেছিলেন, নবাব তাঁহাদিগকে হঠাৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তাঁহারা হঠিবার ব্যক্তি নহেন—ঈদৃশ ব্যবহার তাঁহাদিগের স্বভাববিরুদ্ধ, ইহা হইতেই নবাব নিশ্চয় করিলেন যে, তাঁহারা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, যুদ্ধের আর সুবিধা হইবে না। এই সময়ে তিনি আপন শিবির হইতে দূরে এবং শত্রুদিগের নিকট হইতে অধিকতর দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল, সঙ্গে এতাধিক সৈন্য নাই যে, নবাব শত্রুশিবির আক্রমণ করেন বা আপন শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারেন। আপনার বলহীনতা উপলব্ধি করিয়া তিনি অভীতচিত্তে সেই স্থানেই রাত্রিযাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন—ইতিপূর্ব্বে বারিবর্ষণ জন্য সেখানকার মৃত্তিকার পিচ্ছিলতা তখনও অপনীত হয় নাই। চলিবার চেষ্টা করিলে পড়িয়া যাইতে হয়। নিম্নভূমি প্রায়ই জলা, অগত্যা উহারই মধ্যে একটু উচ্চ জায়গা দেখিয়া, সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র তাঁবু ছিল, তাহাই খাটাইয়া লওয়া হইল। এই স্থান বর্দ্ধমান হইতে ছয় সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ভৃত্যগণের মধ্যে যাহারা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিল তাহারাই জীবিত, অপর সকলকে শত্রুগণ নিহত করিয়া খাদ্য ও ধনসম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সমস্তই কাড়িয়া লইল। উপরি উক্ত আফগান সেনাপতিগণ বিগড়াইয়া যাইলেও যাঁহারা নবাবের পক্ষে ছিলেন, তাঁহারাও চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত—নিশান্ধকারেও শত্রুগণ নিরস্ত নহে, যেখানে পাইল, সেইখানেই আক্রমণ করিতে লাগিল। অতঃপর যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই রহিল—রাত্রির অন্ধকার আকাশ অবনী আচ্ছন্ন করিল। শান্তিদায়িনী নিশা নবাবকে শান্তিদানে অসমর্থ হইল—চারিদিকে আহতের আর্ত্তনাদ ও ক্ষুধিতের ক্রন্দনে সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না। মুস্তফা খাঁ, সমশের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ এবং অন্যান্য আফগান সেনাপতিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন মিলিত হইয়া পরামর্শ যুক্তি করিতে লাগিলেন—নবাব ডাকিয়া

কোন কথা কহিলে সকলেই বিমর্ষভাবে, মস্তক অবনত করিয়া মৌনাবলম্বন করেন, ভাল করিয়া উত্তর দেন না—বস্তুগত্যা তাঁহাদের মনোমালিন্যের অনেক কারণ ছিল, তন্মধ্যে যুদ্ধায়োজন কালে যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করা হয়, সেই যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া বড়ই গর্হিত, এরূপ রীতি কোনমতে প্রশংসনীয় নহে, এতদ্দ্বারা অনেক সেনাপতিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও হৃতসম্মান হইতে হয়, তাঁহাদের উৎসাহ হানি হয় এবং সৈন্যগণের মধ্যে একটা মহা আশঙ্কা ও অসন্তোষের সূত্রপাত হইয়া থাকে। এরূপ প্রথা নূতন নহে—দুই তিন বার অবলম্বিত হইয়াছে। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে কটকাভিযান হইয়া গিয়াছে, তাহাতেও সেইরূপ ব্যবহার দেখা গিয়াছে। মুস্তফা খাঁ তাহার অনুপানকালেই বলিয়াছিলেন যে “আপনি কয়েকবার প্রভূত পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবামাত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা যে দুঃখকষ্ট ভোগ করিল, তাহার কোন পুরস্কারই হইল না, তাহাতে কত উপযুক্ত সেনাপতির প্রতি অবিচার করা হইল, কত সৈনিক পুরুষ উপেক্ষিত হইল, তাহা ভাবিয়াও দেখিলেন না—আমি নিজের জন্যই যে কেবল বলিতেছি তাহাও নহে, সকলেরই জন্য, অতএব এবারে যেন সেরূপ না হয়। আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রতিজ্ঞাপালনে মনোযোগী হয়েন।” যাহাতে ভবিষ্যতে আর তাঁহাদিগকে এরূপ অনুযোগ না করিতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ তৎকালে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সকল সেনাপতিই যাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা করিবার পক্ষে কোন ক্রুটী হইবে না, একথাও তিনি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি কটকাভিযানে যে সমস্ত নূতন সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদের একজনকেও রাখা হইল না, নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্ধারসাধন হইতে না হইতেই এবং মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে মুস্তফা খাঁ প্রভৃতির মনে বড়ই বেদনা জন্মিয়াছিল, অভিমানও দেখা দিয়াছিল, না দিয়াই থাকিতে পারে না—ইহা স্বাভাবিক। সাধারণ সৈনিকগণেরও মনে একটা ঘোর অসন্তোষের সূত্রপাত হইয়াছিল। তথাপি তাহারা বিন্দুমাত্র অবাধ্যতা প্রদর্শন না করিয়া মারহাট্টাদিগের সম্মুখীন হইতে অগ্রপশ্চাৎ করে নাই—যখন সেনাপতিগণ দেখিলেন মোসাহেব খাঁ রণশায়ী তখন তাঁহারা বিচলিত হইলেন, সেনাপতির শোক নবাবের অসদ্ব্যবহারের স্মৃতিকে বলবতী ও নৈরাশ্যের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিকে মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিল, নিরুৎসাহের জড়তা উপস্থিত হইল—তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আর প্রাণ পূরিয়া কাজ করিতে পারিলেন না, ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁও যারপরনাই অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন—যুদ্ধ বিগ্রহ যাঁহাদের জীবনের নিত্য ঘটনার মধ্যে পরিগণিত, তাঁহাদের পক্ষে সৈনিক বা সেনাপতির মনে বিরাগ সঞ্চার করা বড়ই বিপত্তিজনক—বিশেষতঃ তিনি বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব, তাঁহার পদমর্য্যাদার পরিসীমা নাই, তাঁহার আদর্শচরিত্রই বাঞ্ছনীয়; তাঁহার বহিরন্তর সমান হওয়া উচিত। তিনি মুখে যাহা বলিবেন, কাজেও তাহা করিবেন, তাদৃশ ব্যক্তির বাগ্বৈপরীত্য ঘটিলে তাঁহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অপচয় হয় ও বিশ্বাসহানি জন্মে। রাজার কথার সত্যতা সম্বন্ধে যদি সাধারণের সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহার পক্ষে তাহা অপেক্ষা সাংঘাতিক আর কিছুই নাই, সে যাহাই হউক, উপস্থিত ক্ষেত্রে তদ্দ্বারা অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অনুতপ্ত হইতে ও কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল।

মুস্তফা খাঁর প্রতি আলিবর্দ্দি খাঁ আর একটী গুরুতর অত্যাচার করিয়াছিলেন,—ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে মৃজাবাকিরই আলিবর্দ্দি খাঁর মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আমেদ খাঁকে কটকের সিংহাসনচ্যুত ও সপরিবারে বন্দী করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বন্দীত্বমোচন জন্য আলিবর্দ্দিকে স্বয়ং কটক যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই কটকাভিযানের কথা এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের রাজা উক্ত মৃজাবাকিরের প্রতি বিলক্ষণ আনুগত্য রাখিতেন বলিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ কটকের পথে ময়ূরভঞ্জে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে নিরাপদে আপন রাজ্য অতিক্রম করিতে দেন নাই। তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাবের বিলক্ষণ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে ময়ূরভঞ্জের রাজা নবাব

সৈন্যের উপর বিলক্ষণ অত্যাচারও করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ প্রত্যাগমন কালে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিবার সঙ্কল্প করিয়া যান—কটক হইতে ফিরিবার সময় নবাব ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য রাজা আপনার আসন্নবিপদ সূচনা করিয়া মুস্তফা খাঁর শরণ গ্রহণ করেন। মুস্তফা শরণাপন্নকে রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যবর্ত্তীতায় সুফল ফলিল না; তিনি নবাব কর্ত্তৃক বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরেই নবাব মিরজাফরকে হুকুম দিলেন যে, রাজা সাক্ষাৎ করিতে আসিলেই যেন তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রাজা সেনাপতি মুস্তফার শরণ লইয়া কোন উপকার পাইলেন না, বরং অপকারই হইল দেখিয়া আপনিই নবাবের সাক্ষাৎকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। সাক্ষাৎ গৃহে মিরজাফর কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিক রাখিয়া দিয়াছিলেন—রাজা গৃহ প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা রাজাকে আক্রমণ ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল—রাজার অনুচরগণের অনেকেই প্রহৃত ও নির্য্যাতিত হইল। ইহাতেই প্রতিহিংসার পর্য্যবসান হইল না, ময়ূরভঞ্জ রাজ্য লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইল। এরূপ ব্যবহারে মুস্তফা খাঁর মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখ জন্মিয়াছিল। আফগান সেনাপতি মাত্রেই তাঁহার দুঃখে সুদুঃখিত হইলেন—এমন কি, তাঁহাদের অধীন সেনাগণও তদ্রূপ মনঃকষ্ট অনুভব করিল। তাঁহারা সকলেই আপনাপন অনুগত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্য্যত্যাগের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এ কথা তাঁহারা গোপন করেন নাই। সুতরাং অবিলম্বেই তাহা নবাবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তজ্জন্যই মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধে তাঁহাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া তিনি তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এই মহা বিপত্তির সময় সেনাগণের মনোমালিন্য দর্শনে নবাবের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, কর্ত্তব্যতাজ্ঞানও লোপ পাইয়াছিল। মুস্তফা খাঁ যে কেবল মাত্র তাঁহার সেনাপতি তাহা নহে, পুরাতন ও বিশ্বস্ত বন্ধু, সকল সেনাপতি অপেক্ষা সাহসী, দুঃসাহসিক কার্য্যে সমধিক অগ্রসর—তাঁহার সৈন্য সমষ্টির অর্দ্ধেক আফগান, সেই সকল আফগানের উপর মুস্তফা খাঁর অসাধারণ আধিপত্য। আফগান সেনা ও সেনাপতিগণের সাধারণ অসন্তোষ যে সত্বর ও সহজে নিবৃত্তি পাইবে, তাহাও নিতান্ত অসম্ভব, এবং নবাব যে স্থানে ও যে অবস্থায় অবস্থিত তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইলে তাঁহাকে শত্রু দ্বারা টুকুরা টুকরা হইতে হইবে। বিপদ বড় কম নহে। বেশী দিন তদবস্থায় থাকিতে হইলে, অনশনে তনুত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ণ বিপদ বুঝিয়া নবাব অন্যের মধ্যবর্ত্তীতায় মারহাট্টা সেনাপতির সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন—যে ব্যক্তি মধ্যস্থ হইলেন, তাঁহার নাম মীর খায়ের উল্লা খাঁ—দাক্ষিণাত্য তাঁহার জন্মস্থান, দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়াই পরিচিত, তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজার সেনাদলে বেতন বণ্টনের কাজ করিতেন। তাঁহার প্রভুই যেন নবাবের সহিত সন্ধির প্রস্তাব" করিতেছেন, এই ভাবেই তিনি প্রেরিত হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিত সহজসাধ্য ব্যক্তি নহেন, তিনি সর্ব্বাগ্রেই সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন—সম্মুখ সংগ্রামে নবাবকে নিঃস্ব করিয়াছিলেন। বার্ত্তাবহকে বলিলেন—"তোমার প্রভুকে বলিবে, বাঙ্গালার নবাবের এখন কিছুই নাই, সমস্তই আমরা কাড়িয়া লইয়াছি, আমার সৈন্যগণ তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে, তাঁহার পরিত্রাণের কোন উপায়ই নাই—এরূপ অবস্থায় তুমি কিরূপে সন্ধির প্রস্তাব করিতে চাহ। যাহাই হউক, তিনি সমগ্র ভারতের মধ্যে একজন মহান রাজা, তাঁহার পদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। তবে কথা এই যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইলে, আমাদিগকে নগদ এক কোটী টাকা, এবং তাঁহার সমস্ত হস্তীগুলি দিতে হইবে। ইহাতে সম্মত হইলে আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব এবং তিনি আপন রাজধানীতে চলিয়া যাইবেন।" এই সংবাদ সমধিক অপমানজনক, কিন্তু হইলে কি হয়, সিংহ আনায় মধ্যগত, ঘোর বিপদ! যৎকালে এই উত্তর পাওয়া গেল, তৎকালে নবাবের সমধিক বিশ্বস্ত ও সুবুদ্ধি মন্ত্রী জানকীরাম নিকটে ছিলেন। তিনিই প্রধান মন্ত্রীত্ব করিতেন। আর্থিক অবস্থা সকলই তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। নবাব এ যাবৎ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, কেহই কোন কথা কহিতে সাহসী হয় নাই, পরিশেষে জানকীরাম বলিলেন,—"উপস্থিত যে কয়জন লোক অবশিষ্ট আছে, তাহাদের সকলেই সর্ব্বস্বান্ত ও

এরূপে শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত যে একদিনের খোরাকী জুটাইবার বা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবার কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না, সময় গতিকে শত্রুদের প্রস্তাবে সম্মতি না দিলে চলিতেছে না, হাতী কিন্তু যে একটা অসাধারণ সামগ্রী আমাদের পক্ষে তাহা নহে—রাজবাটীতে ইহাদের অপেক্ষা অনেক ভাল ভাল হাতী আছে, নবাব সরকারের অনেক কর্ম্মচারী ও অন্যান্য লোকের আস্তাবলেও বহু সংখ্যক মিলিবে, বৎসর বৎসর অনেক হাতী আপনার রাজ্যে ধরাও হইয়া থাকে। টাকা এক কোটী সম্বন্ধে চল্লিশ লক্ষ খাজনাখানায় মজুত আছে, বাকী ষাইট লক্ষের ব্যবস্থা আমিই করিয়া দিব।"

এই পরামর্শ শুনিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ আমি এরূপ অপমানের কাজে সম্মত হইতে পারি না—আমার এখনও যে মুষ্টিমেয় সৈন্য আছে, তাহাদিগকে লইয়া আমার বাহুবলের সম্মান রক্ষা করিয়া আমি সেই পরস্বাপহারী লুণ্ঠনকারীদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিবার আশা ভরসা রাখি, আর শত্রুকে এতাধিক অর্থ দিয়া কেন তাহাদের বলবৃদ্ধি করিব? বরং যাহারা আমার জন্য পূর্ব্বাপর সম্মুখসংগ্রামে মাথা পাতিয়া দিয়া আসিয়াছে, এবং এযাবৎ কাল আমার সঙ্গে রহিয়াছে, তাহাদিগকে সেই টাকা দি না কেন, সেতো আরও ভাল।" কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া তিনি পুনরায় তাঁহার মন্ত্রীকে বলিতে লাগিলেন—"তোমার হাতে যে এত টাকা আছে শুনিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল, সেই টাকা হইতে দশ লক্ষ পৃথক রাখিবে, তাহা আমি আমার বিশ্বস্ত ও সমধিক সাহসী সৈনিক ও সেনাপতিগণের মধ্যে বিতরণ করিব।"

এই সকল কথাবার্ত্তায় দিন কাটিয়া গেল, রাত্রির নিবিড় অন্ধকার আসিয়া জগৎ আচ্ছন্ন করিল, নিকটের মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হইল না, এই সুবিধা পাইয়া নবাব-শিবিরের অনুচরগণের মধ্যে যাহারা হৃতসর্ব্বস্ব ও প্রভুর সাক্ষাৎকার লাভে বঞ্চিত, তাহারা শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিল। নবাবের পক্ষে রহিল কেবল প্রধানপক্ষীয় ব্যক্তিগণ, সেনাপতিগণ, পদস্থ কর্ম্মচারিগণ, আর সৈনিকের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠাপন্ন ও বিশেষ পরিচিত। সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনাপন অর্থপিপাসা মিটাইবার চেষ্টা দেখিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মীর হবিব নামে এক জন পদস্থ ব্যক্তি আলিবর্দ্দি খাঁর প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি গোপনে শত্রুদিগের সহিত কথা চালাচালি করিতেছিলেন, আর নবাবের পক্ষ পরিত্যাগের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে মারহাট্টাগণ প্রকাশ্য স্থানে দুইটী নিশান উড়াইয়া দিয়া চীৎকার-স্বরে বলিতে লাগিল—"যে কেহ ধনপ্রাণ বাঁচাইতে চাও, এদিকে আইস"—এই কথা শুনিয়া যাহাদের বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা জ্ঞান বা লজ্জা-ভয় ছিল না, তাহারাই সেই দিকে যাইতে লাগিল—যাইবার সময় যাহার যাহা ছিল, সে তাহাই সঙ্গে লইয়া গেল, শত্রুরা সমস্তই কাড়িয়া লইল, তাহা দেখিয়া আর কেহই সেদিকে মুখ ফিরাইল না।

নবাব বড়ই প্রমাদ গণনা করিলেন, নিশীথ সময়ে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র সিরাজ উদ্দৌলার হস্ত ধারণ করিয়া, পদব্রজে মুস্তফা খাঁর শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং মুস্তফা খাঁকে জাগ্রত করিয়া "আমার কিছু বলিবার আছে, একবার বাহিরে আইস" বলিয়া ডাকিলেন।" সেনাপতি দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং শিবিরের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"কি আজ্ঞা হয়?" নবাব প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"ভাই মুস্তফা খাঁ, মনুষ্যের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই, কিন্তু এখন আমার এরূপ অবস্থা যে যত শীঘ্র হয় তাহা ত্যাগ করাই শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, অতএব আমার নিষ্কৃতির জন্য তোমাকে আর কোন দূরবর্ত্তী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না, এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার জন্য তুমিও আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত। আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর সিরাজ উদ্দৌলাকে লইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি, আমাদের সঙ্গে কেহই নাই—এখন এক এক গুলিতেই আমাদের দফারফা শেষ করিয়া তোমার মনের দুঃখ মিটাও। কিন্তু যদি দীর্ঘকালের বন্ধুতা এবং আমার নিকট প্রাপ্ত উপকারের কৃতজ্ঞতা-স্মৃতি তোমার মনে অদ্যাপি স্থান পাইয়া থাকে, আর আমার যথেচ্ছার মার্জ্জনা করিতে পার, অধিকন্তু আমার এই আসন্নকালে আমার সহায় হইতে ইচ্ছা কর, তাহা

হইলে আমার সঙ্গে নূতন করিয়া বন্দোবস্ত কর, আর প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, যে আমাকে ছাড়িবে না, আমাকে নিরুদ্বেগ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়, আর মারহাট্টা-দিগের সম্বন্ধে কি করিব তাহারও উপায় চিন্তা করিবার অবসর দাও—কারণ তাহাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা আমি সকল দিক ভাল করিয়া দেখিতে চাই।” সেনাপতি অকস্মাৎ এরূপ সম্ভাষণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার অবকাশ না পাইয়া উত্তর করিলেন—“আমি একাকী এই সকল কথার উত্তর দিতে পারিতেছি না, আমার স্বদেশবাসী অন্যান্য সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া আপনার সুগোচর করিব।”

আলিবর্দ্দি খাঁ এইরূপ তীব্র উত্তর পাইয়া বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না, এই মাত্র বলিলেন—“আমার কোন আপত্তি নাই, তবে তাহাই কর।” মুস্তফা খাঁ সমস্ত আফগান সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠাইলেন; তাঁহারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নবাবকে বলিলেন—“আপনার সিপাহীর নিকট এই মাত্র যাহা বলিলেন, তাহা এই সকল সেনাপতিকে বলুন।” আলিবর্দ্দি তাহাই করিলেন। সকলেই নীরবে তাহা শ্রবণ করিলেন। কিন্তু কেহই কোন উত্তর করিলেন না—মুস্তফা খাঁ স্বয়ং তখন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“ভাই সকল, উত্তর করিতেছ না যে,—তোমাদের মনে যাহা আছে বল।” সমশের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ সকলের হইয়া বলিলেন,—“মুস্তফা খাঁ আমাদের সকলেরই প্রধান, জাতির মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই তাঁহাদের আপনাদের ন্যায় গণ্য হইবে। অতঃপর মুস্তফা খাঁ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—“বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে অকপটচিত্তে বলিতেছি যে, এ পর্য্যন্ত আমার মনে যাহা ছিল, তাহা আর নাই; উপস্থিত আমার এবং আমার পরিজনবর্গের ধন মান প্রাণ যাহা কিছু সমস্তই আমার প্রভু ও প্রতিপালকের পদে সমর্পণ করিয়াছি, যতক্ষণ আমার দেহে এই মস্তক সংলগ্ন থাকিবে, ততক্ষণ তাহা আলিবর্দ্দি খাঁর, তাঁহার পুত্র কন্যাগণের এবং তাঁহার পরিজনবর্গের জন্য দেওয়া আছে। যতক্ষণ মুস্তফা খাঁ জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ নবাবের সামান্য ভৃত্যের অশ্বপদে তাহার মস্তক সংলগ্ন থাকিবে। আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই—আমাদের প্রবাদবাক্য তোমাদিগকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না—যে চল্লিশখানি তরবারি একত্র হইলে একটী রাজ্যলাভ করা যাইতে পারে।” এখনও আমাদের তিন হাজারেরও বেশী অশ্বারোহী সেনা আছে, কেন আমরা যুদ্ধ না করিব, এ অবস্থায় ভীত ও হতাশ হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য, আমি আশা করি যে, ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা সেই বিধর্ম্মিগণকে বিধ্বস্ত করিয়া জয়লাভ করিবই। মহাশয়গণ, আমি আপনাদিগকে আমার নিজের কথা বলিলাম, আপনারা এখন আপনাপন মনের ভাব আপনারা বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহাই করুন।” অতঃপর তিনি যাহাতে আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন, তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে বসিলেন, সকলেই তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। নবাব তাহা দেখিয়া আপন শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু গোলাম আলি খাঁকে আফগান সেনাপতিগণের মনোভাব বুঝিবার জন্য তাঁহাদিগের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। গোলাম আলি খাঁ কিছুদিন আজিমাবাদের দেওয়ানী করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র ইসফ আলি খাঁ সরফরাজ খাঁর এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া আফগান সেনাপতি মুস্তফা খাঁর সহিত বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা রাখিতেন।

তিনি মুস্তফা খাঁর শিবিরে গিয়া কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত কথোপকথনের পর বিদায় লইবেন, এমন সময় সমশের খাঁর প্রেরিত এক ব্যক্তি আসিয়া জানাইল যে—“গত কল্যকার চুক্তি অনুসারে মারহাট্টাদের নিকট যে পতাকা ও নিশানা চাহিয়া পাঠান হইয়াছিল, তাহা আজ আসিয়া পঁহুছিবে, তিনি জানিতে চাহিলেন যে সে সম্বন্ধে এখন কি করা যাইবে।” মুস্তফা খাঁ গত রাত্রির সমস্ত কথা বলিয়া শেষে এই বলিয়াছিলেন যে—“যে কোন আফগান সন্তান গত রাত্রির বন্দোবস্ত মত কাজ করিতে কৃতনিশ্চয় হইবে।” গোলাম আলি খাঁ এই কথা শুনিয়া আলিবর্দ্দির শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমস্ত কথাই তাঁহাকে অবগত করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দমনে শত্রুর সহিত

সংগ্রাম করিতে সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন। কিয়ৎকাল যুক্তি-পরামর্শের পর স্থির হইল যে এ যাত্রা মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ—সেখানে কয়েক দিন বিশ্রামের পর পুনরায় নূতন বল সঞ্চয় করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইবেন। সমস্ত দিন এইরূপেই অতিবাহিত হইল, পুনরায় সূর্য্যাস্ত হইল পুনরায় নৈশান্ধকারে প্রকৃতির প্রফুল্লবদন মলিন হইল। মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদের লুণ্ঠিত কামানটী একটী বৃক্ষে বাঁধিয়া অনবরত তোপধ্বনি করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে নবাব-শিবিরে চীৎকার ও ক্রন্দনধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইল না। বর্দ্ধমানাধিপের দেওয়ান মাণিকচাঁদ শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, নৃশংস নরহত্যা ও নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দৃশ্যে ভীত হইয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না, কেবলই দিবাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সকাল হইলেই পলাইয়া আপন প্রভুর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। গভীর নিশীথ সময়ে মারহাট্টাগণ নবাব-সৈন্যকে পুনরায় আক্রমণ করিল, সেই আক্রমণ এতই আকস্মিক যে প্রতিপক্ষের অস্ত্রগ্রহণের সময় ও সুবিধা হইল না, মহারাষ্ট্রীয়েরা একবারে নবাব-সৈন্যের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মীর হবিব অপর সকল অপেক্ষা একটু বেশী অসতর্ক ছিলেন, সহজেই শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া বিলক্ষণ আহত ও বন্দী হইলেন। পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে মারহাট্টাদের চাকুরি স্বীকার করিতে হইল। নবাবের পক্ষে হাইদার আলি খাঁ বড়ই ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তোপখানার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার সুকৌশলে বহুল শত্রুসেনার বিনাশসাধন হইল।

অন্য দিকে মুস্তফা খাঁ, সমশের খাঁ, ওমর খাঁ, সর্দ্দার খাঁ ও রহিম খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিগণ বিপুল বিক্রমে যথাতথা শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। অসংখ্য শত্রুসেনা সমরক্ষেত্রে শয়ন করিল, বড় বড় মারহাট্টা বীর প্রাণ হারাইল দেখিয়া, বিপক্ষের মনে ভীতিসঞ্চার হইল, পূর্ব্বে যেমন তাহারা যেখানে সেখানে আক্রমণ করিতেছিল, অতঃপর তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া দলবদ্ধ হইতে লাগিল—তাহাতে বঙ্গীয় সেনা স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ত্যাগের অবসর পাইল এবং আর বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে কাটোয়ার পথে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের যাহা কিছু ছিল সকলই গেল, দ্বিতীয় পরিচ্ছদ রহিল না, পান ও ভোজন পাত্রও ছিল না, সঞ্চিত খাদ্যের ত কথাই নাই। দুই তিন সহস্র অশ্বারোহী বুভুক্ষু অশ্বপৃষ্ঠে ছয় হাজার পদাতিক ক্ষুধাতৃষ্ণা ও পথশ্রমে কাতর যুদ্ধ করিতে করিতে পূর্ণ গতিতে চলিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যও তাহাদিগকে আহার ও বিশ্রাম গ্রহণের অবসর না দিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল এবং অবিরাম আক্রমণ দ্বারা বিব্রত করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সেই সকল স্থানের ও সেই সময়ের কি বিকট দর্শন—ভাবিলেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়ার পথ ভীতিসঙ্কুল—মারহাট্টা ও মুসলমান সৈন্যে পরিপূর্ণ, পথে ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে নরশোণিতের ছড়াছড়ি—স্থানে স্থানে সিপাহীর শব, কোনটা ছিন্নকণ্ঠ, কোনটা চূর্ণশীর্ষ, কোনটা বা দ্বিখণ্ডিত,—শবের সংখ্যা হয় না, আঘাতেরও বর্ণনা করা যায় না—শকুনি, গৃধিনীর মেলা, কুক্কুর শৃগালাদি মাংসাদ জন্তুগণের আনন্দ কোলাহল। গ্রাম পল্লী নীরব নিষ্পন্দ, সকলেরই গৃহদ্বার বন্ধ—কেহ পথে বাহির হয় না, পথিক পথ চলে না, স্নাতক ঘাটে নাহে না, অনেকেরই অন্তঃপুর আবদ্ধ, দূরে বিকট বজ্রধ্বনির ন্যায় অনবরত তোপধ্বনি,—সেই শব্দে জননীর কোলে শিশু শিহরিল, বৃদ্ধের হৃৎকম্প হইল, যুবাজনে চমকিয়া উঠিল. সেকালে গ্রামে অনেকে বন্দুকের শব্দ শুনে নাই—সকলেই আপনাপন গৃহমধ্যে বসিয়া বিপত্তিকালে মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিল—উচ্চৈঃস্বরে কথাটি কহিতে কাহারও সাহসে কুলায় না—দোকানদারের দোকানপাট বন্ধ, কুম্ভকার-গৃহে হাঁড়ি পিটিবার শব্দ নাই, কম্মকারশালা নীরব, তাঁতির তাঁত চলে না, শিব শালগ্রামের নিত্যসেবা বন্ধ—কৃষক মাঠে যায় না, গরু চরিতে পায় না, নিঃসম্বল গৃহস্থের উনান জ্বলে না—খাইতে না পাইয়া ছেলেও কাঁদে না। এরূপ দুঃসময় দুর্দ্দিন বাঙ্গালী গৃহস্থের কোন কালে ঘটে নাই। ঘোর বিপত্তির সময়। সকলেই যেন “প্রাণ হাতে” করিয়া বসিয়া আছে।

কাটোয়ার পথে মুসলমান ও মারহাট্টার যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহার চিত্র অনেক দিন পর্য্যন্ত তদ্দেশবাসীদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। বঙ্গীয় সেনা এরূপ অনাহার ও উপবাসেও অস্থির হয় নাই—সেনাপতিগণের রণোন্ম-

স্তুতা, তাহাদের সকলকে সকল অবস্থাতেই উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাঢ় অঞ্চলের পুণ্যপিপাসু ব্যক্তিরা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সঙ্কুচিত করিয়া মাঠের মধ্যে যে বড় বড় পুষ্করিণী দীঘি সরোবরাদি খাত করিয়া পিপাসিতের জন্য জলদান করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল জলাশয় দ্বারা বঙ্গীয় সেনার যথেষ্ট উপকার সাধিত হইল। সেই সকল জলাশয়ের চতুঃপার্শ্বে বড় বড় "পাড়"—তাহাতে নানা-জাতীয় ফলকর গাছ; সমস্ত দিনের পথশ্রম ও রণক্লান্তির পর সন্ধ্যার সময় ঐ সকল জলাশয়ের তীর আশ্রয় করিয়া গাছের ফলপাতা, মাঠের শাক ও ঘাস খাইয়া তৃণশয্যায় অঙ্গস্থাপন করিয়া তাহারা নিদ্রা যাইত। ছোট বড় সকলেরই এই দশা—কাহার জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না—মারহাট্টাদিগের দিন রাত্রি ভেদ ছিল না, তাহারা সকল সময়েই যুদ্ধ করিত, দিনের ন্যায় রাত্রি-কালেও নবাব সৈন্যকে বেষ্টন করিয়া থাকিত, কিন্তু নিকটে ঘেঁসিত না। প্রভাত হইলেই তাহাদের আংশিক সৈন্য দলে দলে বিভক্ত হইয়া দশ বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করিত, শেষে তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া গ্রামান্তরে প্রবেশ করিত। এইরূপে প্রতিদিন বহুগ্রাম ভস্মীভূত হইত। এজন্য বঙ্গীয় সেনার খাদ্যাভাব ঘুচিত না। এইরূপ অনশন ও উপবাস ক্লেশ সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে তাহারা বন্দুক ধরিবার শক্তি হারাইতে বসিল; বৃক্ষের বল্কল পত্র এবং পিপীলিকা ও তজ্জাতীয় কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া কষ্টে স্বষ্টে কোন রকমে জীবন ধারণ করিয়া রহিল; এ সময়ে তাহারা যে অসাধারণ কষ্টভোগ করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। ইউসল আলি খাঁ এই মারহাট্টা যুদ্ধের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না—বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়ার পথে তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছিল, এই তিন দিনের মধ্যে তিনি বহুকষ্টে এক দিন তিন পোয়া ওজনে খেচরান্ন জুটাইয়া পলান্ন কালিয়াভুক্ সাতটি সম্ভ্রান্ত সেনাপতি মিলিয়া তাহাই আহার করিয়াছিলেন। এক দিন সাতখানি মালপো জুটিল, তাহাও সেইরূপে ভাগ করিয়া ভক্ষণ করা হইল, আর এক দিন আধ সের আন্দাজ পচা মাংস পাওয়া গেল, তাহাই উপাদেয় জ্ঞানে সকলে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু যখন তাহা পাক করা হইতেছিল, তখন আরও কয়েক জন আসিয়া এক এক গ্রাস খাইতে চাহিল, না দিয়া কে থাকিতে পারে—তদ্দ্বারা "চটকস্য মাংসং ভাগ শতং" এই মহাবাক্য সার্থক হইল; এক দিন টাকা দিয়াও খাদ্য মিলিল না—অপরের কথা নহে, বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-সেনাপতিদিগের কথা। ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় কি আর আছে। এইরূপেই বঙ্গীয় সেনার দুঃখের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল দেখিয়া সেনাপতিগণের বড়ই ক্রোধ জন্মিল—একদিন সায়ংকালে মুস্তফা খাঁ সেনাগণকে বলিলেন—মুসলমান ধর্ম্মের লজ্জা, আফগান জাতির অপমান যে নীচ দাক্ষিণাত্যবাসীরা দিবারাত্র তোমাদিগকে বেষ্টন করিয়া তাড়া করিবে, আর তোমরা সেই সকল বিধর্ম্মীর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পরাঙ্মুখ হইয়া অনাহার, অনশনে শুকাইয়া মরিবে।" সেনাপতির এই তেজস্বিনী বক্তৃতা ব্যর্থ হয় নাই—যাহাদিগকে তিনি সম্বোধন করিয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন, বাস্তবিকই যাঁহারা নিতান্ত নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য ছিল না, তাহাদের বল বিক্রম অনেকবার পরীক্ষিত হইয়াছিল, সকলে মিলিয়া উত্তর করিল,—আপনি আমাদের নেতা, আপনি যেরূপে আমাদিগকে পরিচালিত করিবেন, আমরা সেইরূপেই চলিব।

এই কথা শুনিয়া মুস্তফা খাঁ ঢাল তরবারি লইয়া বাহির হইলেন, কতকগুলি সৈনিক বেড়াইতে যাইবার ভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সেনাপতি অনুচরগণকে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি সেনা যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদির আয়োজন অনুষ্ঠান করিতেছে, কতকগুলি বা ডাইল রুটী পাকাইতেছে। ক্ষুধাক্লিষ্ট শীর্ণদর্শকগণের নিকট কোন অপকারের আশঙ্কা না করিয়া তাহারা নিশ্চিন্তমনে আপনাপন কাজে অভিনিবিষ্ট ছিল, তাহাদের অসতর্কতার সুযোগে সানুচর মুস্তফা খাঁ আপনাদের তরবারি বাহির করিয়া তাহাদের অনেককেই কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। খাদ্যদ্রব্য যাহা কিছু সম্মুখে পাইলেন, সমস্তই লুটিয়া লইয়া আসিলেন, প্রস্তুত খাদ্য, চাউল ডাইল অনেক পাওয়া গেল—তিন দিন উপবাসের পর সকলেই উদরপূর্ণ করিয়া

খাইয়া দুর্ব্বলদেহে বল পাইল! অতঃপর মহারাষ্ট্রীয়দিগের চৈতন্য হইল, তাহারা আর এরূপ আতঙ্কিত হইল না। এইরূপ দুর্দ্দশান্বিত হইয়া বঙ্গীয় সেনা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ইতিমধ্যে একদল মহারাষ্ট্রীয়েরা ঊষার আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ এরূপভাবে নবাব সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইল যে তাহাদের কাহারও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবার সুবিধা হইল না, দলবদ্ধ হইবার ত কথাই নাই—যে যেখানে ছিল, তাহাকে সেইখানে থাকিয়াই শত্রু-সম্মুখীন হইতে হইল, কাহারও কাহাকে সাহায্য করিবার উপায় রহিল না, কে কি করিতেছে দেখা গেল না—সকলকেই একাকী যুদ্ধ করিতে হইল,—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ বা নবাব স্বয়ং কে কোথায় কি করিতেছেন—কিছুই জানা গেল না,—সকলেই একাকী যুদ্ধে প্রবৃত্ত। যারপর নাই দুর্ঘটনা, বড়ই দুর্দ্দৈব! নবাবও সেইরূপে একাকী শত্রুবেষ্টিত হইয়া অস্ত্র চালনা করিতেছিলেন—নিকটে আপনার বলিতে কেহই ছিল না! তাঁহার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া আসিল, এরূপ সময়ে আশ্চর্য্যরূপে দৈব সুপ্রসন্নতা লাভ হইল—ঈশ্বর স্বয়ং যেন সেদিন বিপন্নের সহায় হইলেন। সেই অত্যাশ্চর্য্য দৈব ঘটনার কথা বোধ হয় আলিবর্দ্দি খাঁর যাবজ্জীবন স্মৃতিমন্দিরে জাগরূক ছিল।

নবাব হস্তীপৃষ্ঠে ছিলেন—নবাবের হস্তীর পুরোভাগে দুইটী করিয়া হস্তী রাজকীয় পতাকাদি বহন করিয়া যাইবার রীতি ছিল, ঐ দুই হস্তীর দন্তের উপর ভারী ভারী লৌহ শৃঙ্খল থাকিত। গজের মন্থর গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই লৌহ শৃঙ্খলের সঞ্চালনজনিত একপ্রকার শ্রুতিমধুর শব্দ হইত, হস্তীগণ সেই শব্দ শুনিয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইত। এই দুইটী হস্তী আপনাদের নিকটে এতাধিক অদৃষ্টচর ব্যক্তিকে দেখিয়া যেন কোন দৈবাজ্ঞা পালনার্থী এরূপ কৌশলে আপনাদের দশনদ্বয় সঞ্চালন করিতে লাগিল যে তদুপরিস্থ শৃঙ্খল যাহারই অঙ্গে প্রহৃত হইল তাহারই শমন সাক্ষাৎকার ঘটিল; এইরূপে হস্তীযুগল বহু অশ্ব ও অশ্বারোহীর প্রাণ সংহার করিল। মারহাট্টাগণ এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না, দূরে পলায়ন করিল, এই সুযোগে নবাব সৈন্য তাহার উদ্ধারার্থ নিকটবর্ত্তী হইল এবং আপনারাও সুব্যবস্থিত হইল। ইহার পর তাহারা সকলে মিলিত হইয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিবার অবসর পাইল, এই বারে অনেক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য প্রাণ হারাইল,—এইরূপ ও অন্যরূপ নানা বিঘ্ন বিপত্তি ভোগ করিয়াও নবাব সৈন্য যে সমূলে বিনষ্ট হয় নাই—সাম্প্রদায়িক সম্মান রক্ষা করিয়াই জীবিত ছিল ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। অবশেষে তাহারা মুর্শিদাবাদ হইতে দক্ষিণে দুইদিনের পথ দূরে কাটোয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল। কাটোয়া একটী বাণিজ্যপ্রধান নগর, সেখানে নবাবের একটী দুর্গ ও অনেক কর্ম্মচারী থাকিতেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

পাহাড়ী বাবা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"গুরুদেব, আমার দশা কি হ'বে?"

"কোন ভয় নাই মা! তারা—তারা।"

গললগ্নীকৃতবাসা এক বিধবা সাশ্রুনয়নে গুরুর চরণে প্রণত হইয়া করযোড়ে প্রশ্ন করিল "গুরুদেব, আমার দশা কি হইবে?"

আর বিধবারই সম্মুখে যে রক্তবস্ত্র-পরিহিত দীর্ঘকায় মহাপুরুষ দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি সেই প্রণত-শিষ্যার মস্তক আপন চরণাঙ্গুলির দ্বারা তিনবার স্পর্শ করিয়া উত্তর করিলেন—"কোন ভয় নাই মা। তারা—তারা।"

বিধবা তাড়াতাড়ি একখানি আসন পাতিয়া দিল। গুরুদেব সেই আসনে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তবে বিধবার নয়নাশ্রু নীরবে পতিত হইলেও, তাহার সুদীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। অবশেষে গুরুদেব কহিলেন,—"আমার শিবনাথ যে এ দেহ পরিত্যাগ ক'রে শীঘ্রই স্বর্গে চ'লে যাবে, এ কথা আমি অনেক পূর্ব্বেই জেনেছিলাম, আর তার জন্যে প্রস্তুতও হ'য়েছিলাম। তারা—তারা!"

বিধবা চক্ষের জল মুছিয়া কহিল,—"আপনি সর্ব্বজ্ঞ—আপনি সকলই জানতে পারেন।"

গুরুদেব পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তবে মৃত্যুটা বড়ই আকস্মিক হয়েছে। তুমি মা, এরূপ বিপদের জন্য কিছুই প্রস্তুত হ'তে পার নাই। সেই কারন, স্বামী-শোকে তোমায় বড়ই অধীর দেখ্ছি। দেখ মা, বিপদের সময় এরূপ অধীর হ'লে চলে না। জন্ম হ'লেই মৃত্যু আছেই। মৃত্যুর আর অন্য অর্থ কি? একখানা জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে, অন্য একখানা নূতন বস্ত্র পরিধান করা বই ত নয়? তবে আর এর জন্যে বৃথা শোক করা কেন মা? তারা—তারা।"

বিধবা। গুরুদেব, এ পৃথিবীতে আমার যে আর কেউ নাই। এ বিজন পাহাড়ে যার মুখ চেয়ে আমি সকল কষ্ট ভুলেছিলাম, তিনি আমায় বড় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন। তিনি—"

কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে প্রথমে বিধবার সে নীরব ক্রন্দন উচ্চ ক্রন্দনে পরিণত হইল। তার পর সে কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হইয়া গেল—বিধবা আর কোন কথা কহিতে পারিল না—কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। গুরুদেব তখন বিধবাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—"দেখ মা, তোমার স্বামী স্বর্গে গিয়েছেন। তুমি এরূপ শোকে অধীর হ'লে, তাঁর সেই স্বর্গসুখে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তুমিও আমার শিষ্যা—তুমি যদি আমার সম্মুখেই এরূপ শোকাতুরা হও, তা হ'লে আমি মনে করবো, তুমি আমার উপযুক্ত শিষ্যা নও।"

গুরুদেবের এই কথায় বিধবার সেই দুর্ব্বল হৃদয়ে যেন কিঞ্চিৎ বল সঞ্চার হইল। বিধবা যেন জোর করিয়া সেই অস্থির হৃদয়কে কথঞ্চিৎ সুস্থির করিল। তার পর ধীরে ধীরে কহিল,—"গুরুদেব, আমি বড় হতভাগিনী। তিনি যদি দশ দিন বিছানায় পড়ে থাকতেন, আর আমি যদি মৃত্যুকালে প্রাণপণে তাঁর সেবা করতে পেতুম, তা হ'লে বোধ হয়, আমার এত কষ্ট হ'তো না। আমার স্ত্রী-জন্ম বৃথা হয়েছে—আমি তাঁর সেবায় বঞ্চিত হয়েছি।"

গুরু। কেন মা, তোমার ত সে ক্ষোভের কোন কারণই নাই! আমি শিবনাথের মুখেই শুনেছি—তোমার বিবাহের দিন থেকে তুমি এক দিনের জন্যেও স্বামী ছাড়া হও নাই। সে বিষয়ে তুমি ত ভাগ্যবতী বল্তে হ'বে। আমি শুনেছি—যখন সিমলায় শিবনাথের প্রথম চাকুরী হয়, তখন বিদেশে স্বামী সঙ্গে পাঠাতে তোমার পিতা-মাতার আদৌ মত ছিল না, কিন্তু তুমি সে মত উপেক্ষা করে, এই সুদূর পাহাড়ে দেশে স্বামী সঙ্গে চলে এসেছিলে। তোমার স্বামীসেবার আবার কি ক্ষোভ আছে মা? তারা—তারা।

বিধবা। আমার কিন্তু মনে হয়—আমি তাঁর কোন সেবা করতে পারি নাই। বিশেষতঃ মৃত্যুকালে—

বলিতে বলিতে আবার কোথা হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দু আসিয়া বিধবার নয়নপ্রান্তে দেখা দিল। আবার বিন্দুর পর বিন্দু ঝরিতে আরম্ভ করিল। বিধবা বস্ত্রাঞ্চলে সে অশ্রু-বিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া আবার হৃদয়কে দৃঢ় করিল। তার পর বলিতে লাগিল—"তিনি আমায় বড় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছেন। গুরুদেব, তোমার সাক্ষাতে বল্ছি,—কেবল মহামায়ার জন্যই এ প্রাণ রেখেছি, তা নইলে এ তুচ্ছ প্রাণ ত্যাগ করে, আমিও হাস্তে হাস্তে তাঁর অনুগামিনী হতুম।"

মহামায়ার নাম মাত্র শুনিয়া গুরুদেব ঈষৎ চমকিয়া উঠিয়া আগ্রহের সহিত কহিলেন,—"আমার মহামায়া কোথায়? তারা—তারা।"

বিধবা। এ ঘটনা হ'য়ে পর্য্যন্ত আমি মহামায়াকেও পূর্ব্বের মত যত্ন করতে পারি না। লোহিয়াই তাকে ভুলিয়ে নিয়ে রেখেছে।

গুরু। সে বালিকা পিতৃশোকে অধীর হয় নাই ত? তারা—তারা।

বিধবা। সেই ঘটনা থেকে মহামায়া যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছে। সে আর পূর্ব্বের মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায় না—পাহাড়ী মেয়েদের সঙ্গেও আর খেলা করে না। তবে লোহিয়া তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে—আর সেই ত তাঁকে মানুষ করেছে। লোহিয়া আছে বলেই,—আমি মহামায়ার ভাবনা বড় ভাবি না। তবে মহামায়ার সম্বন্ধে আমার অন্য ভাবনা অনেক আছে। এতদিন সে সকল ভাবনা আমার ভাব্বার আবশ্যক ছিল না—যার ভাবনা সেই ভাবিত। এখন আমি কি করবো—সেই জন্যই আপনার শরণাগত হয়েছি।

গুরু। সে সম্বন্ধে কি স্থির করেছ মা?

বিধবা। আপনি ত অন্তর্য্যামী—সকলই মনে মনে জানতে পাচ্ছেন। তবে আমায় এ ছলনা কেন প্রভু?

গুরু। তুমি ত দেশে যেতে মনস্থ করেছ মা। তারা—তারা।

বিধবা। তা ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় কি? যাঁর জন্যে দেশত্যাগী হয়ে—এই নির্জ্জন পাহাড়ে থাকা—তিনি ত আর নাই।

গুরু। সেখানে ত তোমার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই না, সেখানে তোমায় কে দেখ্বে? তারা—তারা।

বিধবা। সেখানে দুর্গাদাস বাবু আছেন—আমি তাঁরই ভরসায় দেশে যাচ্ছি।

গুরু। দুর্গাদাস বাবু কে?

বিধবা। তিনি আমার স্বামীর বন্ধু—প্রতিবাসী—পরম আত্মীয়। একত্রে অনেক দিন উভয়ে কাজকর্ম্মও করে ছিলেন।

গুরু। হাঁ—হাঁ—শিবনাথের নিকট তাঁর নাম অনেকবার শুনেছি বটে। তিনি ত পেশোয়ারে থাকেন নয়? তারা—তারা।

বিধবা। পূর্ব্বে থাকতেন বটে, কিন্তু আজ সাত আট বৎসর কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে তিনি ভবানীপুরেই বাস করছেন।

গুরু। তোমার ভবানীপুরের বাড়ীর ভাড়া দেওয়া আছে—তুমি কোথায় থাকবে?

বিধবা। সে বাড়ীতে এখন কোন ভাড়াটিয়া নাই। আমি সেই বাড়ীতেই থাকবো।

গুরু। আর তোমার এ বাড়ীর কি বন্দোবস্ত করবে? এ বাড়ীর যে ভাড়া হয়, সে ত আমার মনে ধারণা হয় না। তারা—তারা।

বিধবা। এ বাড়ী আমি লোহিয়াকে দান করবো।

শিষ্যার কথা শুনিয়া গুরুদেব কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। একবার দৃঢ় কটাক্ষে শিষ্যার মুখের দিকে চাহিলেন। সে কটাক্ষে অসন্তোষের চিহ্ন দেখিয়া শিষ্যা ভীতা হইয়া কহিল—"প্রভু, যদি এ দানে আমার অধিকার না থাকে, কিম্বা যদি এ দান আপনার অভিপ্রেত না হয়, তবে আমায় ক্ষমা করুন। এ বাড়ীর সম্বন্ধে আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন, করবেন। আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে—আমার মন বড়ই অস্থির! কন্যাটিকে নিয়ে দেশে যেতে আমায় অনুমতি করুন।

গুরুদেব অনেকক্ষণ নীরব—নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিষ্যার সে কাতরোক্তি যেন গুরুদেবের কর্ণে গিয়া আদৌ পৌঁছছিল না। ক্রমে গুরুদেবের সেই আরক্তিম বড় বড় চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল। গুরুদেব কিছুক্ষণ মুদ্রিতনেত্রে নির্ব্বাত-প্রদেশের নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যেন একজন মহাযোগী হঠাৎ যোগমগ্ন হইয়া পড়িলেন। গুরুর এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিধবার প্রাণেও কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল। দণ্ডাজ্ঞার অপেক্ষায় অপরাধী যেরূপ ব্যাকুলপ্রাণে বিচারপতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বিধবাও সেইরূপ কম্পিতহৃদয়ে যোগীবরের ধ্যাননিমজ্জিত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে যোগীবরের সে ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি অপেক্ষাকৃত গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"মা বিমলা, তোমায় একটি কথা বলি—তুমি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে, এখন আর দেশে যেও না। গেলে তোমার শুভ হ'বে না। তারা—তারা।"

কি সর্ব্বনাশ! গুরুদেবের মুখে এই কথা! এর চেয়ে পতিহীনা বিমলার পক্ষে যে প্রাণদণ্ড সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। গুরুদেবের সে নিদারুণ আজ্ঞায় ছিন্নমূল-তরুর ন্যায় বিমলা গুরুদেবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল—"প্রভু, দাসীর প্রতি এরূপ কঠোর আজ্ঞা কখনই করবেন না। এ অবস্থায় প্রভুর ঐ আজ্ঞা পালনে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ—কেন আমায় মহাপাতকে নিমগ্ন করবেন?"

গুরু। তুমি শোকাকুলা স্ত্রীলোক—তুমি বুদ্ধিমতী হ'লেও হিতাহিত জ্ঞান এখন তোমার না থাকাই সম্ভব। মা বিমলা, আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই এই কথা বল্ছি। মা, মহামায়ার বয়ঃক্রম এখন কত হয়েছে? তারা—তারা।"

গুরুদেবের প্রশ্নে কন্যার বয়ঃক্রমের কথা তৎক্ষণাৎ জননীর স্মরণ হইয়া গেল,—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি ঘৃতাহুতি পাইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হৃদয়ের সে জ্বালা চাপিয়া রাখিয়া বিমলা কহিল,—"মহামায়া তের উত্তীর্ণ হ'য়ে, এখন চৌদ্দ বৎসরে পড়েছে।"

তখন ঈষৎ হাসিয়া গুরুদেব কহিলেন,—"তবে এখনও আরও সাত বৎসর কাল তোমার এই গৃহে অবস্থিতি কর্‌তে হ'বে।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য একবার বিমলা গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিল। এই সময় হঠাৎ তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল—"সে কি প্রভু, তবে কি আমার কন্যার বিবাহ হ'বে না!"

বজ্রধ্বনির ন্যায় গুরুগম্ভীরকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ নিনাদিত হইল—"না!"

বিমলা নিদ্রিত না জাগ্রত? স্বামীশোকে বিমলার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই ত? বিমলা তাহার ভবসাগর-পারের একমাত্র কাণ্ডারী স্বয়ং ইষ্টদেবের সহিত কথা কহিতেছিল নয়? বিমলা আপন ইন্দ্রিয়কেও আর বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেই কারণ পুনরায় কহিল—"গুরুদেব, আমার কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে—এমন কি তার শাস্ত্রমত বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।"

গুরুদেব কহিলেন,—"সে কথা আমার অবিদিত নাই,—আমি তা বিলক্ষণ জানি।"

বিমলা। আমি সেই জন্যেই দেশে যেতে এতদূর ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।

গুরু। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি মা, তোমার কন্যার অদৃষ্টে বিবাহ নাই। তারা—তারা।

বিমলা। সে কি প্রভু, আমার যে একমাত্র কন্যা।

গুরু। এ কথা কি আজ আমি নূতন জান্‌লাম মা, এ কথা ত আমি বরাবরই জানি। তারা—তারা।

বিমলা তখন নিরাশহৃদ[illegible] [illegible]দেবের চরণ দুইটি ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল—"[illegible] শোকে তাপে আমার মন এখন বড়ই অস্থির হ'য়েছে। আমায় পরিষ্কার করে সকল কথা খুলে বলুন। প্রভুর কথা আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

গুরুদেব কিন্তু নীরবে রহিলেন, সে কাতরপ্রাণে বিন্দুমাত্র [illegible]বারিও ব[illegible] হইল না। কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসি দেখিয়া বিমলা বড়ই ভীত হইল। সে হাসিতে যেন মুহূর্ত্ত পরে বজ্রাঘাতের সংবাদ দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। বিমলার সেই কোমলহৃদয়ে আবার বজ্রাঘাত হইবে না কি?

গুরুদেব কহিলেন—"তোমার কন্যার বিবাহ আমি হ'তে দিব না—কেবল সেই উদ্দেশেই তোমার এইখানে অবস্থিতি কর্‌তে বল্‌ছি।"

বিমলা শ্রবণেন্দ্রিয়কে তখন আর অবিশ্বাস করিতে পারিল না। এই সময় তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া গেল—"সে এখনও নির্ব্বোধ বালিকা। কি অপরাধে প্রভু তার প্রতি এরূপ কঠিন দণ্ড বিধান কর্‌ছেন? কি অপরাধে জ্ঞানহীন বালিকাকে চিরদুঃখিনী কর্‌ছেন? কি অপরাধে তাহার সেই আশাপূর্ণ বালিকাজীবনকে নিরাশসাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছেন—কেন তার নারীজন্মকে নিষ্ফল কর্‌ছেন?"

শিষ্যার মুখের এরূপ কথায় গুরুদেব তখন উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট নই—সন্তুষ্ট। এ আমার দণ্ড নয়—সেই সন্তোষেরই পুরস্কার। তার চিরসুখই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তার নারীজন্ম নিষ্ফলে যা'বে না—বরং সার্থকই হ'বে।"

গুরুদেবের সে উত্তেজিত-কণ্ঠের আশ্বাশবাণীতে কিন্তু স্নেহময়ী জননীর প্রাণ শীতল হইল না। কন্যার অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া জননী কহিল—"কিরূপে গুরুদেব?"

গুরুদেব সেইরূপ উত্তেজিত-স্বরেই কহিলেন,—"তোমার কন্যা হ'তে তার গুরুর গুরু সিদ্ধকাম হ'বে,—তোমার কন্যার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে।"

তখন অকস্মাৎ বিমলার হৃদয়ে যেন এককালীন [illegible] বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল। সে জ্বালায় অস্থির হইয়া বিমলা কহিল,—"প্রভু, আমি অতি জ্ঞানহীন অবলা, তায় অল্পদিনমাত্র আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীকে হারিয়েছি। সেই শোকে আজও আমার মন বড়ই অস্থির রয়েছে। আর প্রভুও আমায় কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। আমি প্রভুকে কেবল গুরুদেব মনে করি না—জন্মদাতা পিতার চক্ষে দেখি। তবে সকলেই আপনাকে 'পাহাড়ী বাবা' ব'লে ডাকে ব'লে, আমি সে নাম এত দিন গ্রহণ করি নাই। কিন্তু আজ এখন আর আপনি আমাকে গুরুর চক্ষে দেখ্‌বেন না—একবার স্নেহময় পিতার চক্ষে দেখুন। বাবা, তোমার কথায় আমি বড়ই একটা সংশয় দোলায় দুল্‌ছি—এত তোমার শিষ্যার

ভক্তি পরীক্ষার সময় নয়, বাবা! কৃপা করে, আমার সেই সংশয় দূর করে দাও বাবা। আমার মনের এ অন্ধকার দূর করে দাও, যেন তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য আমি বুঝ্‌তে পারি বাবা।"

পাহাড়ী বাবা তখন প্রফুল্ল মনে কহিলেন—"দেখ মা, আমি তোমার মহামায়াকে আমার মহামায়ার কার্য্যে উৎসর্গ করেছি। যত দিন না আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন মহামায়াকে কুমারী থাকৃতে হবে। স্মরণ রাখিও মা, মহামায়া এখন আর তোমার নয়, মহামায়া দেবীর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কি! মহামায়া আমার নয়—মহামায়া দেবীর! কথাটা একবার মুহূর্ত্তের জন্য বিমলার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিল বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে কথার আর এক গূঢ় অর্থ বিমলার হৃদয়ঙ্গম হইল। মহামায়া দেবীরই ত। ভূচর খেচর জলচর প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাণী মাত্রেই ত দেবীর। আর দেবীর অনুগ্রহেই ত বিমলা মহামায়াকে [illegible]। বিমলা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পাহাড়ী বাবা কহিলেন,—"দেখ মা, মহামায়া যদি দেশে যেতে ইচ্ছা করে, তবে তাকে আমি নিবারণ কর্‌তে পার্‌বো না। তোমার দেশে যাওয়া না যাওয়া এখন মহামায়ার উপর নির্ভর কর্‌ছে। তারা—তারা।"

গুরুদেবের এই কথায় বিমলার আশঙ্কা দূরের সঙ্গে সঙ্গে নিরাশ-প্রাণে আশারও সঞ্চার হইল। বিমলা তখন একটা বালির বাঁধ বাঁধিল। গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিল। গুরুদেব কহিলেন—"মহামায়ার কি মত জান্‌তে আমি আবার আস্‌বো—তবে এখন আসি মা?—তারা—তারা।"

এই কথা বলিয়া গুরুদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিমলা পুনরায় গললগ্নীবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিল। শিষ্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর তিনি সে বাড়ীর প্রাচীর-দ্বার অতিক্রম করিয়াই একবার চারিদিক চাহিলেন। দেখিলেন—সম্মুখে পার্ব্বতীয় বসন্ত বিরাজমান! বড় বড় পত্রহীন পার্ব্বতীয় বৃক্ষ সকল একবারে পুষ্পময় হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। যেন সে বৃক্ষের শাখা নাই—পত্র নাই—কেবল ফুল! শ্বেত, লোহিত, হরিদ্রা—সকল বর্ণের ফুল! এ কি ফুল?—না মদনের ফুলশর! পার্ব্বতীয় প্রদেশে বসন্তের কি পরাক্রম! পত্রোদ্গমের এখনও বিলম্ব আছে—কিন্তু ঋতুরাজ বসন্ত যখন আসিয়াছেন—তখন তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অভ্যর্থনা করিতেই হইবে। আবার অন্যদিকে সময়ের কি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম দেখুন। পুষ্পোদ্গমের সময় হইয়াছে,—এখন কার সাধ্য সময়ের সে গতিকে রোধ করিতে পারে?

পাহাড়ী বাবার চক্ষু চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কেন? এই পার্ব্বতীয় বসন্তের সেই অপূর্ব্ব শোভায় তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল না কেন? পাহাড়ী বাবা পাহাড়ের সেই উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া নিশ্চয়ই কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। যাহাকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এইবার তাহাকে বুঝি পাইয়াছেন। পাহাড়ী বাবা তখন সেই পাহাড়ের 'চড়াই' হইতে নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পার্ব্বতীয় পথ সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, বিমলার বাড়ী উঠিবার পথটিও সেইরূপ আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছিল। এ পথে উপর হইতে নীচে নামিতে কোন কষ্ট নাই। আবার নীচে নামিবার গতি স্বভাবতঃই দ্রুত হইয়া পড়ে। কিন্তু পাহাড়ী বাবা তাহা অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আর অধিক নিম্নে যাইতে হইল না। হঠাৎ কে বামের 'খড়' হইতে ডাকিল—"পাহাড়ী বাবা!"

পাহাড়ী বাবা বামে ফিরিয়া দেখিলেন—লোহিয়া। তখন তিনি সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। লোহিয়া পাহাড়ী বাবাকে দেখিয়া আহ্লাদে একটা [illegible] করিয়া উঠিল। পথ বাহিয়া আসিতে তাহার আর [illegible] সহ্য হইল না। হরিণ-শিশুর ন্যায় [illegible] গাত্র বাহিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে [illegible] উচ্চ স্থানে আসিয়া পাহাড়ী বাবার চরণে প্রণাম করিল। লোহিয়া দেখিয়া পাহাড়ী বাবার মনও যেন প্রফুল্লিত দেখা গেল। পাহাড়ী বাবা লোহিয়ার মস্তকের উপর, আপন দক্ষিণ পদ তুলিয়া দিলেন। লোহিয়া তাহাতেও

না হইয়া স্বহস্তে পুনরায় তাঁহার পদধূলি গ্রহণ জিহ্বাগ্রে ও মস্তকে ধারণ করিল। পাহাড়ী বাবা —"লোহিয়া, আমি মহামায়ার জন্য বড়ই ত হ'য়েছি।"

লোহিয়া করযোড়ে কহিল,—"পাহাড়ী বাবা, তুই মহামায়ার লেগে কিছু ভাবনা করেস্‌নে, পাহাড়ী বাবা। বাবাজী মর্ গিয়েছে—হামি আছে।"

পাহাড়ী বাবা। তুমি মহামায়াকে প্রাণের সহিত যে ভালবাস, তা আমি জানি।

লোহিয়া। ভাল বাস্‌বে না—হামি ত উহারে মানুষ করেছে, পাহাড়ী বাবা। মহামায়া হামার কলিজা মহামায়া হামার জান।

পাহাড়ী। কিন্তু—

এই কথা বলিয়াই পাহাড়ী বাবা যে কথা বলিতে যাইতেছিলেন—সেকথা বলিতে থামিয়া গেলেন। লোহিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল,—"ইথে কিন্তু কি আছে—পাহাড়ী বাবা?"

পাহাড়ী। তোমার মা জী যে মহামায়া নিয়ে দেশে চলে যাচ্ছেন। তারা—তারা।

পাহাড়ী বাবার এই কথায় লোহিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে একবার তাঁহার মুখের প্রতি চাহিল! বিস্ময়ে লোহিয়ার সর্ব্বাঙ্গ যেন ফুলিয়া উঠিল! লোহিয়া কহিল,—"মা জী তা পার্‌বে না—মা জী তা পার্‌বে না—বাঘী ক'বি তার লেড়কীকে ছোড়বে না।"

পাহাড়ী। দেখ লোহিয়া, মহামায়া যদি দেশে যেতে চায়, তাকে জোর করে এখানে রাখ্‌লে, সে মরে যেতে পারে। তাকে—

পাহাড়ী বাবার কথায় বাধা দিয়া লোহিয়া কহিল,—মহামায়া মর্‌বে! হামি এমন কাজ ক'বি কর্‌বে না। হামি তা পার্‌বে না। মহামায়া দেশে যাবে, হামি তার সাথে সাথে যাবে।

পাহাড়ী। এখন আর এক কাজ কর। মহামায়া যাতে দেশে যেতে না চায়, সেই চেষ্টা আগে কর, তারা—তারা।

লোহিয়া। হামি কর্‌বে—পাহাড়ী বাবা—হামি কর্‌বে।

পাহাড়ী। মহামায়া দেশে গেলে, তোমার আর এক বিপদ আছে। মহামায়া দেশে গেলে যদি তার বিবাহ হয়ে যায়, তবে তুমি দেশে গিয়েও তাকে আর কাছে রাখ্‌তে পার্‌বে না। যে বিবাহ কর্‌বে, সে তোমার কাছ থেকে মহামায়াকে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। তারা—তারা।

ক্রোধে লোহিয়ার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। চিবুকের সঞ্চিত রক্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন শ্বেতমুখে ছড়াইয়া পড়িল। লোহিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে কহিল—"পার্‌বে না—হামার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পার্‌বে না। পাহাড়ী বাবা, হামি তাকে মার্‌বে—হামি তাকে খুন কর্‌বে, পাহাড়ী বাবা।"

পাহাড়ী বাবা এই সময় একবার বিস্ফারিতনেত্রে লোহিয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ-কটাক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"লোহিয়া!"

লোহিয়ার সে ভীষণ রাক্ষসীমূর্ত্তি আর নাই! প্রজ্বলিত অগ্নিতে বারি সেচনের ন্যায় সে তীক্ষ্ণ-কটাক্ষের কি মোহিনীশক্তি, আমরা জানি না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে লোহিয়ার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। লোহিয়া এখন আর সে তেজস্বিনী লোহিয়া নয়—লোহিয়া পাহাড়ী বাবার মন্ত্রবশীভূত সর্পিনী অথবা হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র। পাহাড়ী বাবা গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"লোহিয়া, আমার পদস্পর্শ করে শপথ কর্।"

প্রভুর আদরে কুক্কুরী যেমন প্রভুর পদপ্রান্তে ছুটিয়া আসিয়া পড়ে, লোহিয়াও সেইরূপ পাহাড়ী বাবার চরণতলে পড়িয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল। পাহাড়ী বাবা কহিলেন,—"শপথ করে বল, মহামায়ার বিবাহ যাহাতে না হয়—সে পক্ষে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

তখন শুদ্ধ উচ্চারণে—পাহাড়ী বাবার কণ্ঠস্বরের অনুকরণে স্পষ্ট স্পষ্ট ভাষায় সেই পাহাড়ী লোহিয়া কহিল, "মহামায়ার বিবাহ যাহাতে না হয়, সে পক্ষে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

পাহাড়ী বাবা এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"বল, এ কার্য্যে চুরি, ডাকাতী ও খুন করিতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।"

লোহিয়া তৎক্ষণাৎ পাহাড়ী বাবার কথারই অবিকল

স্পষ্ট প্রতিধ্বনি করিল—"এ কার্য্যে চুরি, ডাকাতী ও খুন করিতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।"

পাহাড়ী। বল—কালী মায়ী কা জয়! বল—তারা মায়ী কা জয়।

পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তর কম্পিত করিয়া তৎক্ষণাৎ লোহিয়া বজ্রনাদ করিল,—"কালী মায়ী কা জয়—তারা মায়ী কা জয়।"

তখন দূরে সঙ্গে সঙ্গে অমনি প্রতিধ্বনি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণশব্দে জয়ধ্বনি করিল—"কালী মায়ী কা জয়—তারা মায়ী কা জয়।" সে শব্দ আকাশে মিলাইতে না মিলাইতেই পুনরায় অতিদূরে ক্ষীণতর শব্দে ধ্বনিত হইল,—"কালী মায়ী কা জয়—তারা মায়ী কা জয়।"

দেখিতে দেখিতে সে আকাশের শব্দ আকাশে ডুবিয়া গেল। চারিদিক নীরব ও নিস্তব্ধ হইল। নিদ্রাভিভূত লোহিয়ার নিদ্রা যেন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। লোহিয়া ধড়ফড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পাহাড়ী বাবা স্নেহসূচক বাক্যে ধীরে ধীরে কহিলেন—"লোহিয়া, তোমার আজকার এ শপথ স্মরণ থাকবে?"

লোহিয়াও ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে পুনরায় স্বাভাবিক স্বরে ও স্বাভাবিক উচ্চারণে কহিল—"হামি ভুল্‌বে না। হামি মহামায়াকে বশ্ করে রাখ্‌বে—মহামায়ার সাধি হামি ক'বি দিতে দিবে না। এর লেগে হামি চুরি কর্‌বে—রাহাজানি কর্‌বে—খুন্ বি কর্‌বে।"

বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে লোহিয়ার মস্তক অবনত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে লোহিয়া স্থির হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। লোহিয়া যখন পুনরায় মস্তক উন্নত করিল—তখন পাহাড়ী বাবা আর তথায় নাই! লোহিয়া আকুল প্রাণে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রগতিতে পাহাড়ের একটা উচ্চস্থানে উঠিল। তারপর উচ্চে—আরো উচ্চে—নিম্নে—আরো নিম্নে চারিদিক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কোন স্থানে পাহাড়ী বাবার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইল না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লোহিয়া তখন বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে বিমলার গৃহপথে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। বিষণ্ণ মনে বিমলার সন্নিকটে আসিয়া কহিল,—"মা জী, তুই, হামাদের ছোড়ে দেশে চলে যাবে না কি?"

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"হাঁ লোহিয়া, আর কার জন্যে এ পাহাড়ে দেশে পড়ে থাকবো মা? আমার মন বড় অস্থির হয়েছে,—আর এখানে তিলার্দ্ধ থাকতে ইচ্ছে করে না।"

লোহিয়া। তুই দেশে যাবে—মহামায়া তোর সঙ্গে চলে যাবে—তো হামি কোথায় থাক্‌বে?

বিমলা। লোহিয়া, এই বাড়ীখানি আমি তোমায় দিয়ে যাব। এ বাড়ী তোমার হ'বে—তুমি এই বাড়ীতেই থাক্‌বে।

লোহিয়া। তোরা ছোড়ে গেলে, হামি এ বাড়ীতে থাক্‌বে না। হামি এ বাড়ী নিয়ে কি কর্‌বে?

বিমলা। লোহিয়া, তুমি ইচ্ছে কর্‌লে এ বাড়ীতে থাকতে পার্‌বে, না ইচ্ছে কর—এ বাড়ী ভাড়া দিবে—না হয়, বিক্রী কর্‌লেও তোমার অনেক টাকা হ'বে—তোমায় আর দাসীবৃত্তি কর্‌তে হ'বে না।

লোহিয়ার চক্ষু দুইটি ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল। লোহিয়া সকরুণস্বরে কহিল,—"হামি বাড়ী চাইবে না—হামি টাকা চাইবে না—হামি মহামায়াকে চাইবে। মাহামায়া ছেড়ে গেলে, হামার পরাণ ফাটি যাবে—হামি বাঁচবে না। হামি———"

বলিতে বলিতে লোহিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। বিমলার নয়নপ্রান্ত হইতেও সেই সময় দুই বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। বিমলা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিল—"কি বল্‌বো মা, তোকে ছেড়ে যেতে আমারও প্রাণ কাঁদে। কিন্তু এখন আর আমার অন্য উপায় কিছুই নাই। লোহিয়া, আমি আবার আসবো।"

লোহিয়ার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল—"তোর সঙ্গে মহামায়া আস্‌বে না?"

বিমলা। সে কথা এখন আমি কেমন ক[illegible] না?

লোহিয়া তখন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—"শুনো মা জী,—হামার কথাটা শুনে রাখো। মহামায়া দেশে যেতে চাবে, তো হামি ছোড়্‌বে—নইলে ছোড়্‌বে না। মহা-

মায়া দেশে যাবে—তো হামি বি তার সাথে সাথে যাবে—ছোড়্বে না।"

বিমলা উভয়সঙ্কটে পড়িল। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। তার পর কহিল, "আচ্ছা লোহিয়া, তাই হ'বে। মহামায়ার ইচ্ছার উপর আমিও নির্ভর করলুম।"

মনে মনে কহিল,—"মহামায়া কি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন না—মহামায়া কি আমার উপর এত নির্দ্দয় হবেন?"

তখন মহামায়ার জন্য বিমলার মহাপ্রাণী আকুল হইয়া উঠিল। বিমলা আগ্রহের সহিত কহিল,—"লোহিয়া, আমার মহামায়া কোথায়? তাকে অনেকক্ষণ দেখি নাই, একবার তাকে ডেকে দে।"

লোহিয়ারও প্রাণ তখন মহামায়ার মায়ায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। লোহিয়াও আর সে স্থানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দ্রুতগতিতে কোথায় অদৃশ্য হইল। বিমলা অনেকক্ষণ একাকী মহামায়ার প্রতীক্ষায় সেই স্থলে বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া বিমলা অকূলচিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল। বিমলা অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল। কিন্তু কিছুতেই সেই অকূলচিন্তাসাগরের কূল পাইল না। এমন সময় কে পাশ্চাৎ হইতে ডাকিল—"মা।"

বিমলা চম্‌কিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল,—"মহামায়া।"

আহা! সে অমৃতময় মা শব্দ স্বামিশোকে সন্তাপিত জননীর মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চারিত করিল। বিমলার নিরাশপ্রাণে আবার আশাবীজ অঙ্কুরিত হইল। বিমলা সস্নেহে কন্যার চিবুক ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। মহামায়া অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিয়া আধ আধ স্বরে কহিল—হাঁ মা, পাহাড়ী বাবা এসেছে না কি?"

বিমলা উত্তর করিল,—"হাঁ মা, পাহাড়ী বাবা এসেছেন।"

মহামায়া। তিনি কোথায় গেল মা?

বিমলা। তিনি বোধ হয়, তোমাকেই খুঁজ্‌তে গেছেন মা।

মহামায়া। না মা—লোহিয়া বল্‌ছিলো তুমি দেশে যাবে বলে, পাহাড়ী বাবা রাগ করে কোথায় চলে গেছে। তা তুই দেশে কেন যাবি মা? তুই দেশে থাক্ গে। এখান থেকে যেতে আমার কেমন মন সরে না। সে কথা শুনে লোহিয়া কাঁদে, মোনিয়া কাঁদে, আর সুমেরু ত তাই শুনে পাহাড়ের উপর থেকে আছাড় খেয়ে পড়্‌তে গেল মা। তাই দেখে আমারও প্রাণটা বড় কাঁদ্‌ছে মা। তুই যাস্‌নে মা—তুই যাস্‌নে মা।"

বলিতে বলিতে বালিকার নয়নপ্রান্ত শিশিরবিন্দুশোভিত প্রস্ফুটিত কমলের শোভা ধারণ করিল। বিমলা আপন বস্ত্রাঞ্চলে কন্যার চক্ষু মুছিয়া দিয়া কহিল—হাঁ মা, তোর পাহাড়ীদের জন্যে প্রাণ কাঁদে, আর আমার জন্যে একটু প্রাণ কাঁদে না? তুমি মা যাথার্থই পাষাণী মহামায়া।

মহামায়া। না মা, তোরও জন্যে আমার প্রাণ বড় কাঁদে মা।

বিমলা। আমি যদি চলে যাই, তুই লোহিয়া, মোনিয়া আর সুমেরুর সঙ্গে এখানে থাক্‌তে পারবি?

মহামায়া। তুই কেন যাবি মা, তোকেও এখানে থাক্‌তে হ'বে।

বিমলা। আমি কি চিরকালই তোর কাছে থাক্‌বো? আমি যদি আজ মরে যাই, তুই কি আমায় ধ'রে রাখ্‌তে পারবি? তখন তোর দশা কি হ'বে বল্ দেখি মা। আমি তোর একটা যা হয়—গতি করে, কাশীবাসী হ'বো।

মহামায়া। আমার কি গতি করবি মা?

বিমলা এইবার চুপি চুপি কাণে কাণে কহিল—"আমি তোর একটা বিয়ে দিতে পারলেই এখন নিশ্চিন্ত হই।"

সে কথা কাণে কাণে বলিতেও যেন বিমলার হৃদয় গুর্‌গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিমলা একবার সচকিত-নেত্রে চারিদিক চাহিয়া দেখিল। মহামায়া সে কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। সে কথায় তাহারও প্রাণের ভিতরটা মুহূর্ত্তের জন্য একবার গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল। মহামায়া কহিল—"বিয়ে—বিয়ে—হাঁ মা, বিয়ে যদি আমি না করি?"

বিমলা এদিক ওদিক চাহিয়া পুনরায় কন্যার কাণে কাণে কহিল—"অমন কথা বল্‌তে নাই মা, মনে করলেও পাপ হয়।"

মহামায়া আর কোন কথা কহিল না। কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টে জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। জননী

পুনরায় অনুচ্চস্বরে কহিল—"দেখ মা, স্ত্রীলোকমাত্রেরই সকলের বিয়ে হয়। ঐ দেখ, মোনিয়ার বিয়ে হয়েছে—সুমেরুর সঙ্গে। লোহিয়ারও এক সময় বিয়ে হয়েছিল—এখন ওর স্বামী বেঁচে নাই। অমন কথা কি বল্‌তে আছে মা?"

মহামায়া। আচ্ছা মা, সুমেরু ত মোনিয়াকে লোহিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে চলে যায় নাই। লোহিয়া বল্‌ছিল—আমার যার সঙ্গে বিয়ে হ'বে, সে না কি আমার তোর কাছ থেকে—লোহিয়ার কাছ থেকে, কেড়ে নিয়ে চলে যাবে?

বিমলা। না মা, আমি তোর তেমন বিয়ে দেবো না মা। তুমি আমার অন্ধের যষ্টি—নয়নের মণি। আমি তোকে ছেড়ে কাশী গিয়েও থাক্‌তে পারবো না মা। যাতে তুই আমার কাছ ছাড়া না হ'স্, আমি এমনি বরে তোর বিয়ে দেবো মা।

মহামায়া এই সময় কি কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথাটা কি জানি কেন—মুখে আট্‌কিয়া গেল। মহামায়া অন্য কথা পাড়িল—"হাঁ মা, আমরা দেশে গেলে লোহিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে?"

বিমলা। হাঁ মা, লোহিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে।

মহামায়া। কিন্তু মোনিয়া আর সুমেরুর তাতে আরো কষ্ট হ'বে যে।

বিমলা। কি করবো মা? আমি ত লোহিয়াকে রেখে যেতেই চেয়েছিলুম। কিন্তু সে যে কিছুতেই আমাদের ছেড়ে থাক্‌তে চায় না।

মহামায়া। তবে ওদের সকলকে নিয়ে দেশে যাই চল্ মা। মা ও মেয়েতে অন্যমনস্কভাবে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময় গৃহের মধ্যে গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল—"বিমলা, মহামায়াও যখন দেশে যেতে ইচ্ছুক হয়েছে, তখন দেশে যাও, কিন্তু মহামায়ার বিবাহের কোন চেষ্টা করো না। স্মরণ রেখো—মহামায়া তোমার নয়, মহামায়া মহাদেবীর।" ভয়বিহ্বলচিত্তে মাতা ও কন্যা চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে স্বয়ং গুরুদেব—পাহাড়ী বাবা!

নষ্ট পজা।

হে সুন্দর শুভঙ্কর, আনন্দ অনুপ!
কোথা তব, কোথা তব সেই শান্ত রূপ?
বিষম কঠোর ঝঞ্ঝা সহিছে জীবন,
পলকে পলকে আনে নিকট মরণ।
অন্ধকারে মৃত্যু তলে শিহরি শিহরি,
উঠিতেছি, কেহ নাই চলে হাত ধরি'!
তোমার পূজার অর্ঘ্য বহিয়া আনিয়া
সহসা প্রলয় মুখে পড়েছি আসিয়া।
কেমনে তোমারে দেব! না পূজিয়া ফিরি?
কেমনে চলিব আগে,—পথ আছে ঘিরি'
কাল-সম অন্ধকার!—ওগো প্রাণ ল'য়ে
কেমনে ফিরিব তোমা অর্ঘ্য না সঁপিয়ে!—
পূজায় এ অর্ঘ্য নাথ! নষ্ট কি-গো হবে?—
হ'তে নাহি দিব,—না-না, কেমনে তা' সবে!
নিরুপায়, বলহীন অবসন্ন প্রাণ,—
আর ত পারি না নাথ!—ফিরে' লও দান,
ফিরে লও ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলি তোমার!—
অক্ষম নিতান্ত দীন হতসর্ব্বসার!
সকলি আমার গেল!—সবি গেল নাথ!—
থাক্ সব!—তুমি ক্ষম, হয় প্রাণপাত।
এই ঝঞ্ঝা এই ঘাত আর না সংহর!—
কোথায় মন্দির দূর?—হেথা ধর-ধর
আমার মৃত্যুর তটে এ শেষ অঞ্জলি
অনুপায় নষ্ট প্রাণ—অসম্পূর্ণ বলি!—
তব্ ধন্য হ'ক অর্ঘ্য, ধন্য হ'ক প্রাণ;—
অর্দ্ধপথে ঝঞ্ঝাতলে ব্রত অবসান!!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

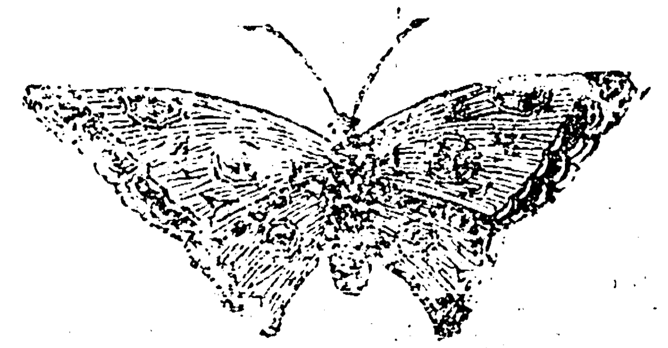

গ্রন্থের প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সিট পঞ্জিকা।—আমরা শ্রীযুক্ত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং এবং গোলাপফুল মার্কা তাম্বুল বিহারের আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল জৈনী মহাশয়ের নিকট হইতে সচিত্র সিট-পঞ্জিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

রসায়ন-পরিচয়।—শিবপুর কলেজের কৃষি-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, এবং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। বেঙ্গল কেমিকাল ষ্টীম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত এবং ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৲ এক টাকা। পুস্তকখানি নূতন ধরণে লিখিত। আমাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য রসায়নশাস্ত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে অশেষ মঙ্গলজনক। কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে রসায়নসম্মত অবশ্যজ্ঞাতব্য সার কথাগুলি মোটামুটি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সার কি? সারের মূল্য নিরূপণ এবং সারপ্রয়োগপ্রণালীর আলোচনা এবং খাদ্যদ্রব্য-বিশ্লেষণ তালিকা প্রকাশ করিয়া নিবারণ বাবু পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এরূপ পুস্তকের বহুলপ্রচার একান্ত প্রার্থনীয়।

সেকালের কথা।—প্রাচীনকালের জীবজন্তুর কাহিনী সম্বলিত সচিত্র শিশুপাঠ্য পুস্তক। বিখ্যাত আর্টিষ্ট শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা, ভারত মিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের প্রীতিকর পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা এদেশে অতি অল্পই আছে। উপেন্দ্র বাবুর ন্যায় কৃতী লেখক যে সে অভাব মোচন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তিনি সুন্দর সুন্দর ১৭ খানি চিত্র এই পুস্তকের জন্য বিশেষভাবে অঙ্কিত করিয়া ইহার শোভা আরো বর্দ্ধিত করিয়াছেন। উপখ্যানগুলি সরল এবং অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ ইহা পাঠে বিশেষ আমোদ উপভোগ করিবে।

কবিতা বিলাস।—কবিতা পুস্তক শ্রীনন্দলাল গোস্বামী এবং শ্রীকানাইলাল গোস্বামী প্রণীত। নিউ হেরাল্ড প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে কমবেশ চব্বিশটী কবিতা আছে। ২।১টী কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে, চর্চ্চা থাকিলে লেখকগণের লেখা উৎকৃষ্টতর হইবে, আশা করা যায়।

অশ্রুধারা।—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ফ্যাক্টরি প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।৵০ আনা। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের অনুকরণে লিখিত। অনুকরণ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের শোকোচ্ছ্বাস প্রকৃত শোকার্ত্ত হৃদয়ের প্রতিধ্বনি আর ইহা কাল্পনিক; সুতরাং ভাষা ভাব ও লিখনভঙ্গী মনোহর হইলেও প্রাণহীন। আমাদের দেশে কেহ কেহ নাকি জীবিতাবস্থায়ই নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করিয়া থাকে। অনুকূল বাবুও জীবিতা পত্নীর বিয়োগ কল্পনা করিয়া সেই কাল্পনিক শোকের আবেগে হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

যোগেশকাব্য।—কবিবর হেমচন্দ্রের ভ্রাতা স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। চব্বিশ বৎসর পরে নূতন আকারে নূতন ও মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। যোগেশ-কাব্য নিজগুণেই সর্ব্বত্র পরিচিত তাহার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক।

বিষাদ গাথা।—শ্রীবিপিনেশ্বর সরকার প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। স্বর্গীয় ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার বিয়োগে কবিতার শোক প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষত্ব কিছুই নাই।

সুরমা।—ক্ষুদ্র উপন্যাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। এই শ্রেণীর পুস্তক প্রচারিত না হওয়াই সমধিক বাঞ্ছনীয়।

করিয়াছেন। এই প্রাচীন, পবিত্র ও প্রশস্ত তীর্থক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রবীরের সৌভাগ্য সূর্য্য

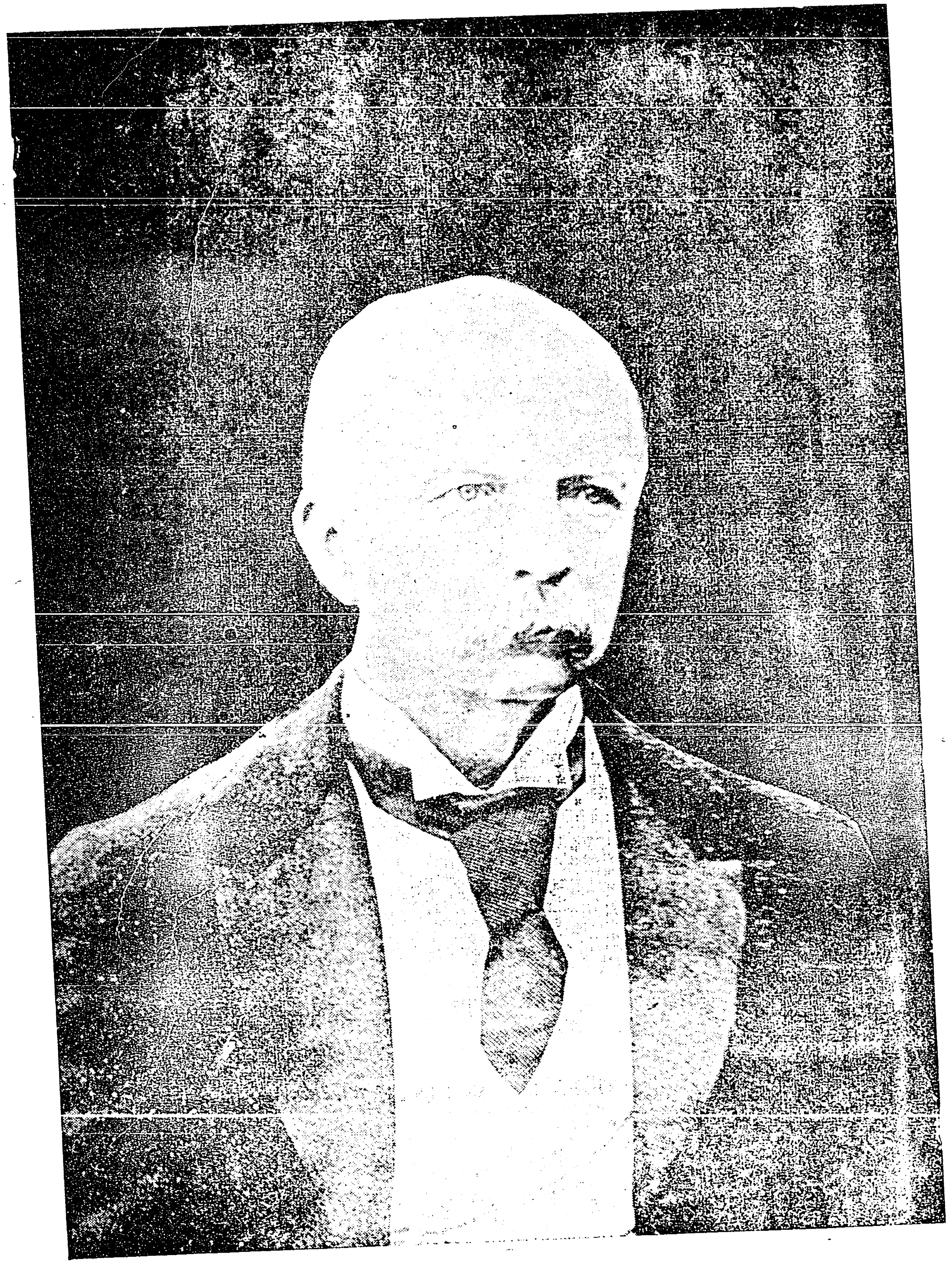

ছোট লাট সার্ এন্‌ড্রু ফ্রেজার মহোদয়।

৬ষ্ঠ ভাগ। | চৈত্র, ১৩১০। | ১২শ সংখ্যা।

কুরুক্ষেত্র।

প্রথম প্রস্তাব।

পঞ্জাব প্রদেশে হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্রের নাম কুরুক্ষেত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষতঃ হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ও সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্জাবের কুরুক্ষেত্র নানা কারণে প্রসিদ্ধ। এই প্রাচীন ও পবিত্র ক্ষেত্র দেখিবার যোগ্য; ইহা একদিকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের মনোহর উৎস, অন্যদিকে বহুল ঐতিহাসিক ঘটনার প্রশস্ত লীলাক্ষেত্র। জাবালি, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, "যদ নু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং।" ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বেদব্যাস শ্রীমৎ ভগবৎ গীতার প্রথমেই কুরুক্ষেত্রকে "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রাচীন, পবিত্র ও প্রশস্ত তীর্থক্ষেত্রে ঋষিপ্রবর বেদব্যাস তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বহুবর্ষ কালযাপন করিয়াছিলেন। এই পতিত-পাবন মহাক্ষেত্রে যোগিরাজ ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়া পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া ছিলেন। দাতাশ্রেষ্ঠ এবং কুবের-শ্রেষ্ঠ মহারাজা কর্ণ, কুরুক্ষেত্রে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের ধন রক্ষা করিতেন এবং পুরাণ প্রসিদ্ধ রাজা সুরথ এই স্থানেই "বলি" দান করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। ভুবনবিখ্যাত মহাভারতীয় সমরে কুরু ও পাণ্ডববীরগণ ভারতের তৎসাময়িক প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান নরপতি ও যোদ্ধেচ্ছুগণের সহিত সমবেত হইয়া আপনাপন বীরত্ব ও প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পুণ্যময় প্রাচীনক্ষেত্রে পৃথিবীর পণ্ডিতদিগের নিকট পরিচিত শ্রীমৎ ভগবদ্গীতার জন্ম হয়, এই স্থানেই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম সখা ও অনুচর শ্রীমৎ অর্জ্জুনকে গীতাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রবীরের সৌভাগ্য সূর্য্য

অস্তমিত হইয়াছে; পানিপথের প্রান্তরে মহারাষ্ট্রীয় বীরবরগণ মুসলমানদিগের সম্মুখে অটুট শৌর্য্য, অদম্য সাহস, অতুলনীয় বীরত্ব, দিগ্বিজয়ী বিক্রম এবং সনাতন হিন্দুশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যে দিন ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য এবং স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই মহারাষ্ট্রীয় শক্তি আর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। কুরুক্ষেত্রে মুসলমানেরা হিন্দুকে হারাইয়াছিল, কিন্তু বিধির আশ্চর্য্য বিধি অনুসারে এই মহাক্ষেত্রেই মোগলের সর্ব্বশেষ পতন! কুরুক্ষেত্র মোগল-সাম্রাজ্যের জন্মদাতা এবং মোগল স্বাধীনতার বিলোপের অমর সাক্ষী! পাঠক মহাশয়! আসুন আমরা একবার কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

ইংরাজী ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র একটা বিস্তৃত জেলা ছিল; ম্যালেরিয়া, প্লেগ প্রভৃতির জন্য ১৮৭৮ অব্দে কর্ণাল নগরকে জেলা রূপে পরিণত করিয়া কুরুক্ষেত্রকে ইহার অধীনে সামান্য তহশীল মধ্যে গণ্য করা হয়। ইহা এক্ষণে কর্ণাল জেলার অন্তর্গত। দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র অর্দ্ধশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী; আম্বালা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় চতুর্দ্দশ ক্রোশ। নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম থানেশ্বর, প্লাটফরম হইতে কুরুক্ষেত্র অর্দ্ধক্রোশের কিছু অধিক। গীতায় লিখিত আছে, মহাভারতীয় সমর সময়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা, শত সহস্র রথী, মহারথী, অশ্ব, গজ, বীর, রাজা, পণ্ডিত এবং ভারতের প্রায় সমুদায় নরপতিগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন; ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, সেকালে কুরুক্ষেত্র একটা বিশাল হইতে বিশালতর ক্ষেত্ররূপে প্রশস্ত ছিল। মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া কুরুক্ষেত্রকে পুনঃ পুনঃ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল; মুসলমান-শাসন বিলোপ হইবার পরে ইংরাজের রাজত্বকালে যাহা কিছু বর্ত্তমান ছিল, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, দরিদ্রতা, জলকষ্ট প্রভৃতি বশতঃ তাহাও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এখন কুরুক্ষেত্র নগর ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত, ইহার চারিদিকে "পতিত ক্ষেত্র" এবং অদূরে নিবিড় জঙ্গল। প্রাচীন গ্রামের অভ্যন্তরে নানা স্থানে শূন্য আবাসগৃহ এবং অতীত গৌরবের নানা চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। কলিকাতা হইতে কুরুক্ষেত্রের তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া চতুর্দ্দশ রৌপ্য মুদ্রা।

সমগ্র কুরুক্ষেত্রের প[illegible]ণ প্রায় ৪৫ ক্রোশ। ইহার উত্তরে সীয়া সহর, দক্ষিণে [illegible]জাতলাও, পূর্ব্বদিকে মিরাবন্দ এবং পশ্চিমে পিণ্ডারী খাদের ভগ্নাবশেষ। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র গ্রামের একদিকে থানেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশন, অন্যদিকে বালুকাময় ভূমি, তৃতীয় দিকে সনানীর পুকুর এবং চতুর্থদিকে দ্বৈপায়ন হ্রদ ও রাজবর্ত্ম। গ্রামে মুসলমানের সংখ্যা অতি কম, এই মুষ্টিমেয় মুসলমানগণ সামান্য দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। গ্রামে কুড়িখানি মন্দির, তিনটি মুসলমান দরগা এবং তিন শত ত্রিশটি দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্র দর্শন করিতে গিয়া হিন্দুযাত্রিগণ নিম্নলিখিত স্থানসমূহ প্রায়ই দেখিয়া থাকেন।

স্থানের নাম	কুরুক্ষেত্র গ্রাম হইতে দূরত্ব।
ব্রহ্মকূপ	অর্দ্ধ ক্রোশ
সনানীর	ঐ ঐ
দ্বৈপায়ন হ্রদ	১ ঐ
কুরুক্ষেত্র হ্রদ	১ ঐ
ভদ্রকালী	॥ ঐ
জ্যোতিশ্বর	৪॥ ঐ
আমীন	২॥ ঐ
নরকাটারী	১॥ ঐ
সরস্বতী নদী	১॥ ঐ
রাম হ্রদ	১ ঐ
বাণ গঙ্গা	ঐ ঐ
অর্জ্জন তাল	ঐ ঐ
কর্ণবেড়	আড়াই মাইল
শাঙ্খব্যাপী	৭॥০ ক্রোশ
পরীক্ষিতপুর	২১ ঐ
ধর্ম্মপুর	১২ ক্রোশ
লক্ষীকুণ্ড	১॥ মাইল
যুগপুর	৫ ক্রোশ
কুকুন্ত	৪ ক্রোশ
মীনহ্রদ	১৫ ক্রোশ

কুরুক্ষেত্র গ্রামের বহির্দ্দেশে ভদ্রকালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহা হিন্দুর অন্যতম মহাপীঠ। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুচ[illegible] তাঁহার শরীর ৫১ অংশে বিভক্ত হইয়া যে যে স্থানে [illegible]তিত হইয়াছিল, সেই স্থান এক একটি পীঠস্থান না[illegible] প্রসিদ্ধ। পীঠস্থানের মধ্যে যেগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ সেগুলি মহাপীঠ নামে প্রখ্যাত। হিংগলাজে ব্রহ্মরন্ধ্র, শর্করায় তিনচক্ষু, জ্বালামুখীতে জিহ্বা, সুগন্ধায় নাসিকা, ভৈরব পর্ব্বতে উর্দ্ধ ওষ্ঠ, অট্টহাসে অধঃওষ্ঠ, প্রভাসতীর্থে উদর, জনস্থানে চিবুক, গোদাবরী তীরে বামগণ্ড, গণ্ডকী নদীতীরে দক্ষিণগণ্ড, শুচিদেশে উর্দ্ধদন্তপাতি, পঞ্চসাগরে অধোদন্ত, করোতোয়া তটে বামতল্প, শ্রীপর্ব্বতে দক্ষিণতল্প, কর্ণাটে কর্ণ, বৃন্দাবনে কেশ, কালীঘাটে মুণ্ড, কিরীটেশ্বরে কিরীট, শ্রীশৈলে গ্রীবা, নলহাটীতে নলা, কাশ্মীরে কণ্ঠ, রত্নাবলীতে দক্ষিণস্কন্ধ, মিথিলায় বামস্কন্ধ, চট্টগ্রামে দক্ষিণহস্তার্দ্ধ, মানবক্ষেত্রে বামহস্তার্দ্ধ, উজানী নগরে কনুই, মণিবন্ধে করগ্রন্থী, প্রয়াগে অঙ্গুলি, বেহুলায় বামবাহু, জলন্ধরে প্রথম স্তন, রামগিরিতে দ্বিতীয় স্তন, বৈদ্যনাথে হৃদয়, উৎকলে নাভি, কাঞ্চিদেশে কঙ্কাল, কালমাধবে দক্ষিণ নিতম্ব, শোণ নদে বাম নিতম্ব, কামরূপে মহামুদ্রা, নেপালে জানুদ্বয়, মগধে দক্ষিণ জঙ্ঘা, জয়ন্তিতে বাম জঙ্ঘা, ত্রিপুরায় দক্ষিণ চরণ, ক্ষীরগ্রামে দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ, বক্কেশ্বরে ভ্রূমধ্য, যশোহরে পাণিপদ্ম, নন্দীপুরে হার, কাশীধামে কুণ্ডল, কন্যাশ্রমে পৃষ্ঠ, লঙ্কায় নুপুর, বিরাটে পাদাঙ্গুলি, বিভাসকে বামগুল্‌ফ, ত্রিস্রোতায় বামপদ এবং কুরুক্ষেত্রে দক্ষিণপদের গুল্‌ফ পতিত হইয়াছিল। দেবী স্থানু ভৈরব অশ্বনাথ লইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

কুরুক্ষেত্রের ভদ্রকালী মন্দিরকে পঞ্জাবের বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ভক্তি ও মান্য করে। ইহার বর্ত্তমান মন্দির পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রস্তর নির্ম্মিত "পদগুল্‌ফ" এই মন্দিরে রক্ষিত আছে। আমি যখন প্রথম কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে একটিও বাঙ্গালী ছিল না। কিন্তু সে দেশের কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডা বাঙ্গালা ভাষায় এমন আশ্চর্য্য অধিকার লাভ করিয়াছিল যে, তাহাদের কথোপকথন শুনিয়া অনেক বাঙ্গালী তাহাদের সহিত শুদ্ধভাবে কথা কহিতে সাহসী হইত না। আমি যে পাণ্ডার বাটীতে ছিলাম, বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার এক প্রকার মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ইহারা অন্তঃপুরেও বাঙ্গালা কহিতে ভালবাসিত, অথচ ইহারা সকলেই খাঁটী পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ। পাণ্ডারা বলে, "রেল হওয়ার পর হইতে আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। এখন যাত্রীরা একদিন বা দুইদিন অবস্থান করিয়াই রেলগাড়ীর সহায়তায় অন্যত্র চলিয়া যায়, তখন তাহারা মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত আমাদের বাটীতে অবস্থান করিত, সুতরাং আমাদের পরস্পর সখ্যতা জন্মিত এবং বিশিষ্ট আয় হইত। আমরা বাঙ্গালীর অন্নেই প্রতিপালিত, বাঙ্গালীর প্রদত্ত অর্থেই আমরা পুষ্ট; হিন্দুস্থানী বা পঞ্জাবী ইহারা কৃপণ ও দরিদ্র। কিন্তু এখন আর সে দিনও নাই, আর সে বাঙ্গালীও নাই।"

ভদ্রকালীর মন্দির দর্শন করিয়া আমি আমীন নামক স্থানে গেলাম। এই স্থানে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সপ্তরথী বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখানে এক্ষণে একটি ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নরকাটারী নামক স্থানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভীষ্মদেব শরশয্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। নরকাটারী এক্ষণে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, ইহার চারিদিকে বন এবং তৎপরেই মরুভূমি। কর্ণবেড় নামক স্থানে রাজা কর্ণের দুর্গ, তপস্যার স্থান ও ধনভাণ্ডারের চিহ্ন দেখিলাম। ধর্ম্মপুর নামক গ্রামের পার্শ্বস্থ প্রাচীন ও প্রশস্ত হ্রদ "ধর্ম্মহ্রদ" নামে প্রসিদ্ধ। প্রথিত আছে, এই হ্রদের তটে ধর্ম্মদেব বকবেশে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এই হ্রদতটে ধর্ম্ম প্রশ্ন করিয়াছিলেন. "হে যুধিষ্ঠির! পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা গরিয়সী, লঘুতর, দ্রুতগামী এবং শ্রেষ্ঠতম কাহারা?"

প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠির কহিয়াছিলেন, "মাতা, ভিক্ষুক, মন এবং ধর্ম্ম।" পরীক্ষিতপুরে রাজা পরীক্ষিতের সুবৃহৎ সর্পযজ্ঞ হইয়াছিল। রামহ্রদে পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত ক্ষত্রিয় বীরদিগের শোণিত প্রোথিত আছে বলিয়া শুনা যায়। আদি গয়া নামক স্থানে কিছুকাল ব্যাপিয়া গয়াসুর বাস করিয়াছিলেন। থানেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে "জ্যোতিশ্বর" নামক স্থান, ইহাই কুরুক্ষেত্র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম। এই পুণ্যময় ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের

সম্মুখে গীতাতত্ত্ব উন্মোচন করিয়া পৃথিবীকে অধ্যাত্মজ্ঞানে আলোকিত করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীমৎ ভগবত গীতার জন্মস্থান, এই স্থানেই গীতা প্রকাশিত (Revealed) হইয়াছিল। এই গীতার জন্যই শতপথ ব্রাহ্মণের ঋষি লিখিয়াছেন, "কুরুক্ষেত্র ভূতলে অতুল; ইহা ভূতলে স্বর্গক্ষেত্র।" ভাগবতে লিখিত আছে, "কুরুক্ষেত্রে যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করেন, তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন।" কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্য-নামক গ্রন্থের শ্লোকসমূহ পাঠ করিলে বুঝা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতে কুরুক্ষেত্র পবিত্র ও প্রসিদ্ধ। মাহাত্ম্য-লেখক কহিয়াছেন, "কুরুক্ষেত্র মুক্তির দ্বার, ইহা সাধনার শ্রেষ্ঠস্থল, ইহা অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধান আকর।" এই জন্যই বোধ হয়, ক্ষত্রিয়াধিক ক্ষত্রিয় এব বীরাধিক বীর শ্রীমৎ অর্জ্জুন যোদ্ধেচ্ছু হইয়া আগমন করিয়াও, স্থান-মাহাত্ম্যবশতঃ তমোগুণ বিচ্ছিন্ন এবং সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বসন্ত সম্ভাষণ।

বসন্ত, শুনিলাম তুমি আসিয়াছ; সুতরাং যদি ছুটো আলাপ না করি, একটু খোঁজ না লই, তবে সকলে আমাকে নিতান্ত বেরসিক বলিবে, তাই সেই অপবাদ এড়াইবার উদ্দেশেই একটু আলাপ করিতে আসিলাম। অজ্ঞাতকাল হইতেই তুমি রাজা উপাধি পাইয়া আসিতেছ, কন্দর্প ঠাকুরের খাতিরে পড়িয়া সেকেলে অর্ব্বাচীন গুলো তোমাকে ঋতুগণের রাজা বলিয়া একেবারে কাগজে কলমে স্বীকার করিয়া তোমার একটা মস্ত দলিল করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাকেও বাধ্য হইয়া তোমাকে রাজ সম্বোধনই করিতে হইতেছে, নতুবা তুমি সেই সব পুরাণ পচা দলিল পেশ করিয়া আমার নামে দশটা মানহানির নালিশ চড়া[illegible] দিবে। আর চটিয়া যে লাল হইবে, আমাকে যে মূখ[illegible]াণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানবিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহা তো[illegible]ঝাই যাইতেছে! কিন্তু তোমার রাজত্বজ্ঞাপক কোন চিহ্নই তো আমি দেখি না? কোন গুণে তোমাকে রাজা বলিব, বল দেখি? তবে একটা কথা আছে বটে, যে আমাদের উদারহৃদয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় আজ কাল আমরা ভূমিশূন্য, রাজত্বশূন্য, তকৃমাধারী, অনেক পোষাকী রাজা দেখিতেছি এবং বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকেও রাজাই বলিতেছি! তাঁহাদিগকেও রাজা না বলিলে তাঁহারা চটিয়া লাল! সুতরাং তোমারই বা অপরাধ কি যে তোমার যুগানুক্রমিক উপাধিটি হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিয়া তোমার মুখ ছোট করিয়া দিব? তুমি রাগ করিও না—"ক্রোধং সংহর, সংহর!" এই তোমাকেও আমি 'ঋতুরাজ' বলিয়া সম্বোধন করিতেছি,—মনের রাগ সাম্য কর! তবে ভায়া একটা কথা তোমাকে বলিয়া রাখি, আমাদের 'রাজা'রা সব দেশে সব ভাষাতেই 'রাজা' তদন্য আর কিছু নহেন; ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও রাজা কিন্তু তাঁহাদের ভাষায় তাঁহারা কেহ King, কেহ Sovereign, কেহ Emperor, ইত্যাদি কিন্তু তাঁহাদের কৃত অস্মদীয় রাজগণ এরূপ পরিবর্ত্তনশীল নহেন, তাঁহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ভাষাতেও সেই Raja, সেই Moharaja—King or Emperor এ পরিবর্ত্তিত হইবার নহেন। ইহার যা কিছু রহস্য তা তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, নিজেই বুঝিয়া লইবে এবং এরূপ রাজো-পাধি লোভনীয় কি না বিবেচনা করিও; আর যদি নির্বুদ্ধিতা তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে আর আমি কি বলিব,—"দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যঃ দেবতারাধনং কুরু!"

তা যাক্, বলিতেছিলাম যে তুমি রাজা, সুতরাং প্রাচীন সনাতন প্রথানুসারে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে স্তুতিপাঠ বা আশীর্ব্বচন-সূচিকা গীতিকাতেই তোমার সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণটা হওয়া পদ্ধতি, কিন্তু আমি তাহা করি নাই। মনে করিও না আমি সে বিষয় অজ্ঞ, আমি ব্যবহারবিদ্ নহি! তাহা নহে, আমি অনেক ফুট-নোট, অনেক হেডিং, অনেক মটো, নানা প্রকার ভেদাজ্, উপনিষদাজ্, কত কি-ই অগস্ত্য গণ্ডূষের ন্যায়

শোষণ বা পবননন্দন ক[illegible] সূর্য্যের ন্যায় কুক্ষিগত করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডি[illegible]পতি হইয়াছি। কিন্তু কি করিব, নানা কারণে [illegible]ৎ বাধ্য হইয়া এবারকার মত আমাকে নিরস্ত থাকিতে হইতেছে। পাণ্ডিত্যটা ফলাইয়া তোমাকে ও আর আর অজ্ঞ দশজনকে স্তম্ভিত এবং বিজ্ঞকে হসিত করিতে পারিলাম না বলিয়া আমার যে কি ক্ষোভ হইয়াছে, তাহা আমার ডাইরিটা দেখিলে বুঝিতে পারিবে। তুমি হয়ত বলিবে ওসব খোঁড়া ওজর মাত্র, তাই দুই একটি কারণের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য তোমাকে জানাইতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর :—

১। প্রথমতঃ দেখ আজকাল সংস্কৃতে তোমার স্তুতি-পাঠাদি হইতে পারে না, কারণ সেটা মৃতা ভাষা। মড়া-ঘাঁটা কাজটা আজকাল মেথর ও ডাক্তারি শিক্ষার্থীগণেরই একচেটে; ভাষার রাজ্যেও সেইরূপ দলের লোক যাঁরা আছেন, সে কাজ তাঁহাদেরই। কেউ বা মড়াঘেঁটে তার রক্তমাংস সব ধুয়ে মুছে শাদা ধব্‌ধবে কঙ্কালগুলি আমাদের সামনে এনে হাজির কচ্ছেন, আর তা ক্রেতাগণের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় ক'রে বাহবা নিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ চোকা চোকা ছুরি, কাঁচি, চিম্‌টে নিয়ে মড়ার অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে তার সব শিরা ধমনী ও অন্যান্য যন্ত্রাদির অব[illegible] বিষয় শিক্ষা ও আলোচনা কচ্ছেন। অঘোর পন্থী ব'লে আর একদলও আছে তারা শুধু মড়া ঘাটে না, তা[illegible] তার রক্তমাংস সব খাইয়া হজম করিয়া ফেলে, কিন্তু ইহাদেরও কোন দলই সেই মড়ার রক্তমাংস নিয়ে তারি চেহারায় কিছু বড় গঠন করে না সুতরাং সংস্কৃত গীতিকা কি করিয়া রচনা করি, বল দেখি! তুমি বলিবে ভাল বাঙ্গালাতেই কেন করিলে না? তার উত্তর দুই নম্বরে দেখ।

২। আজকাল বঙ্গে কবিতার উন্নতির ইতিহাসের বোধ হয় তুমি কোন খোঁজ রাখ না! সেই সেকেলে ঋতু সংহারাদির ভাবই বুঝি তোমার মনে আছে? সেটা তোমার একটা মস্ত ভুল। ভায়া, সে কাল আর নাই। কাব্যপ্রকাশ আর কাব্য প্রকাশে সমর্থ নহে। দর্পণেও এসব কবিতার কোনও প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে না। এখন কবিতার নবং বয়ঃ, কান্তং বপুঃ, নব বেশ, নূতন লক্ষণ! সে সব পুরাতনদলের আর এখন "কল্‌কে চাটাই"ও পাইবার সম্ভাবনা নাই; বাঁধা হুকো ফরাস বিছানা তো দূরের কথা! আধুনিক কবিতার লক্ষণের একটু নমুনা শুনিবে?

গ্রাম্যা ছন্দোরহিতা চ যদৃচ্ছা শব্দসংযুতা।
দুর্ব্বোধা ভাব গাম্ভীর্য্যাৎ কিমন্যেষাং কবেরপি।
অনুভূতি প্রধানাস্যাং সর্ব্বদা ভাবদ্যোতিকা।
অচেতন কথা শ্রোত্রী চন্দ্রজ্যোৎস্নাদিকান্বিতা।

* * * *

কবিতা কথিতা জ্ঞাতা প্রাপ্তস্পৃহা প্রকাশিকা॥

এই একটু সংক্ষেপে বলিলাম। লক্ষণ শুনিয়াই বুঝিতেছ যে, আজ কালকার কবিতা মনোরঞ্জিনী হওয়া কত কঠিন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তথাপি বঙ্গে ছেলে বুড়ো সবাই কবি। কবিতা তরঙ্গে বঙ্গদেশ টলমল! শুনিয়াছি কবিতার দেবতা কোন শুভক্ষণে শূন্যমার্গে যাইতে যাইতে গোটা কবিতার রসের ভাণ্ডটাই এই বঙ্গদেশের উপর বৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই রস যেখানে যেখানে পড়িয়াছে, সেই সেই স্থানেই ফাটিয়া রক্তবীজের বংশের মত এক এক ভূঁই ফোঁড় কবি দেখা দিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা স্বভাবকবি; বিদ্যা বুদ্ধির কোন ধার ধারেন না। হয় ত বিদ্যা শিশুশিক্ষা, ষত্ব ণত্বের ত্রিসীমাতেও কখন পদার্পণ হয় নাই, তথাপি সেই সব দৈবানুগৃহীত স্বয়ং সিদ্ধ ঊর্দ্ধদৃষ্টি কবিগণ যদৃচ্ছা অক্ষর বসাইয়া অতি চমৎকার উৎকট কবিতামালা রচনা করেন; আহা কিবা তার পদলালিত্য, কিবা তার অর্থগৌরব! তা সব দেখিয়া তোমার কালিদাসাদিও তটস্থ হন। অন্যে পরে কা কথা! তার ভাব গাম্ভীর্য্যের কথা আর কি বলিব? স্বয়ং কবিই অনেক সময় তাহার 'ভাবাববোধ কলুষ' হইয়া থাকেন! দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও মাদৃশ হতভাগ্য আর দু-চারি জন সেই রসবৃষ্টির সময় বোধ হয় কোন সুকোমল শয্যায় চম্পকাঙ্গুলি তাড়ন সহ্য করিতেছিলাম; তাই সে রস আমার কোন অঙ্গেই স্পৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং সেরূপ হঠাৎ কবি হওয়ার ভাগ্যটাও আমার ঘটে নাই—আমি নেহাৎ গদ্য। এজন্য অমন সুন্দর কবিতা আমার ঘটে আসে না; তাদৃশ মৌলিক ভাব ও ভাষা সৃষ্টি আমার দ্বারা হয় না—কি করিব বল! তার পর ৩য় দফা।

আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তোমার সঙ্গে আলা-

পটা না করিলে নয়, তাই কেবল কষ্টে স্বষ্টে আসা। আর জানই তো, আমরা সেই সেকেলে স্কুলের কবি! মৌলিকত্ব জোগাড় করিতে আমাদের বড় দেরি হয়। বিদ্যা বুদ্ধি কম কি না? তাই এরূপ শরীরে সে কল্পনা ত্যাগ করিলাম। এবারকার মত ভাষাতেই সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ করি তুমি বেঁচে থাক (আছ কি না সে বিষয়েই বলবৎ সন্দেহ! চটিও না, তা পরে বল্‌ব)। আর জন্মভূমি ভগবানের কৃপাগুণে কান্তিপুষ্টি ও সমৃদ্ধিলাভ করুন, আগামী মরসুমে এই আসরেই তোমার আগমনী পালা অশ্রুতপূর্ব্বছন্দে ও ভাবে গান করিয়া তোমার ক্ষোভ মিটাইব এবং জনগণকে স্তম্ভিত করিয়া দিব! অশ্রুতপূর্ব্ব বলিলাম কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ বুঝি? ভায়া হে, বঙ্গ কবিতারাজ্যে বড়ই কাঠিন্য! যদিও বা কষ্টে স্বষ্টে দুটো কবিতা অঙ্গুলি গণনায় অভিধান সাহায্যে কোনও রূপে মিলাইয়া দিব, তার এক প্রধান অন্তরায় ছন্দ, এখন তো আর সেকেলে সহজ সহজ মালিনী, শালিনী, শার্দ্দূল, স্রগ্‌ধরা, মানবক-ক্রীড়, রথোদ্ধতা, বিয়োগিনী, ইন্দ্রবজ্রা ইত্যাদি ছন্দ নাই যে, সোজাসুজি দুই চারি গৎ গাহিয়া দিব! এখন প্রত্যেক কবির ছন্দও মৌলিক! কৃত্তিবাসী বা কাশীদাসী বা ঘনরামী, বা কবিকঙ্কণী, কি ভারতচন্দ্রী ছন্দও এখন আর প্রতিপন্ন নহে! দেখ সব কবিতাগ্রন্থ—কোন কবিতা প্রশস্ত পাতার উপর চতুরক্ষরযুক্ত চরণসহ একটি রেখার ন্যায় বহিয়া গিয়াছে। কেহ বা ৮, কেহ ১০, কেহ ১২, কেহ ১৮, কেহ ২২, কেহ ২৫, অক্ষরযুক্ত চরণবিভূষিত! কোথাও বা দ্রুত মিল, কোথাও বা বিলম্বিত মিল, কোথাও বা অমিল! কোথাও বা কবির ইচ্ছাক্রমে হ্রস্বে দীর্ঘত্ব ও দীর্ঘে হ্রস্বত্ব আরোপিত! এইরূপ মৌলিকত্বের দিনে আমি কোন্ সাহসে আমার সেই পুরাতন একঘেয়ে ছন্দ সাধারণ্যে বাহির করিব, বল দেখি? তাই এখন হইতে সংযতচিত্তে বিল্বপত্র ও হরিতকী ভোজন পূর্ব্বক হেটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে জপতপানুষ্ঠান করিতে থাকি, এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে আগামী মরসুমে অভূতপূর্ব্ব ৩০।৪০ অক্ষর সমন্বিত নানা মিলালঙ্কৃত এক নবছন্দ সৃষ্টি করিয়া তোমাকে গান শুনাইব; কিছুমাত্র ক্ষোভ করিও না!

এতক্ষণ তো কেবল কৈফিয়তের গৌরচন্দ্রিকাই গাহিলাম—এতে আর কাজ নাই, কারণ আমার শরীরও অসুস্থ, সময়ও কম! দুটো কথা বল্‌তে হবে—তাই এখন আসল কথায় এস! গোড়াতেই বলেছি "শুনিলাম তুমি আসিয়াছ।" এ কথায় তুমি হয় ত বড়ই রাগ করিয়াছ! "কি আমা হেন একটা 'সাগর ডাগর নাগর রাজা' আসিল, আর তুমি শুনিলে মাত্র? আমার আসার কোন পরিচয়ই কি তুমি পাও নাই? আমার নকীব এসেছে, দূত এসেছে, ঘরবাড়ী সব সজ্জিত হয়েছে, এসব কি দেখ নাই?" ভায়া হে ঐ বিষয়টা নিয়েই তোমার সঙ্গে আমার একটু বিতণ্ডা আছে—তাই এ অসুস্থ শরীরেও আমার আবির্ভাব! নতুবা আসিতাম না! হাঁ, শুনিলাম বৈ কি? দেখি নাই—এখনও শুনিতেছি মাত্র—দেখিতেছি না, তবে যে এ সম্ভাষণ ইহা কতক পূর্ব্ব স্মৃতির অভ্যাসবশে ও কতকটা উদ্দেশ্যে! দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে অনেক সময় দেখার কাজ সুধু শোনার দ্বারা হয়, আকৃতি প্রকৃতি সবই শোনাদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, 'শুনিলাম।' তোমার নকীবগণের মধ্যে তো এক কোকিল, তিনি সেদিন কোথা থেকে একটু 'হুকু' 'কুহু' বলিয়া উৎটা সোজা ঝঙ্কার দিয়াছিলেন; শুনেই তাঁর খোঁজে বাহির হইলাম, তোমার কথাটা একটু বিশেষ করিয়া শোনা আর 'কবে আসবে' তাও জানাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আর দেখা নাই, কোথায় যে পালালেন, কি ভেবেই বা অদেখা হলেন, তা তিনিই জানেন; আমার কেবল পণ্ডশ্রম—আর ভাই সুধু আমি কেন, অনেকেই তাঁর দেখা পান না—বিলাতী একজন পাগ্‌লা কবি বাল্যকাল হইতে তাঁকে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে খুঁজে খুঁজে পরিশ্রান্ত হয়ে, শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, ওটা শব্দসমষ্টি মাত্র, তার পৃথক একটা অস্তিত্ব নাই!

আর তোমার নকীব বড় বেয়াদবও বটে, শুধু যে এই সময়ই সে তান ছাড়ে তা নয়, মধ্যে মধ্যে বেটা শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন প্রভৃতি অসময়ে কোথা থেকে তান ছাড়িয়া মনে বিভ্রম লাগায়! অকালে তার ডাক শুনিয়া প্রাণটা যেন চমকিয়া উঠে, পূর্ব্বকালের একটা ভয়ানক স্মৃতি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে, সেই যে ছাই ভস্মের কথাটা মনে পড়িয়া যায়। ওঃ! সে দারুণ কথা আর তুলে কাজ নাই!

এই তো তোমার [illegible]বের অবস্থা! তাকে দেখা পাওয়া যায় না, সুতরাং [illegible]ও শ্রুতমাত্র। তার পর তোমার ভ্রমরাদি দূতেরা তো একেবারেই অদৃশ্য এবং এমন কি অশ্রুত। পূর্ব্বে তুমি ভ্রমরগুলিকে তোমার সখার শর পুঙ্খে নামাবলী রচনায় নিয়োগ করিতে, আজ কাল ছাপাখানা হওয়ায় নাম ছাপিয়া দাও বুঝি? নতুবা ভ্রমর দেখি না কেন? বাল্যকালেও বেশ কাল কাল ভ্রমর সব দেখিতাম—তখন এত রস ও মধু বোধ হয় নাই, কেবল দেখিতাম মাত্র; কিন্তু এখন বুঝি ক্রমোন্নতি দর্শন বলে সে বংশ নির্ব্বংশ? সে পদে তুমি কাহাকে নিযুক্ত করিয়াছ, তাহারও কিছুমাত্র বিজ্ঞাপন দাও নাই, সুতরাং কেমন করিয়া জানিব বল? এখন যত ভ্রমর সব কলিকাতার থিয়েটার অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে আশ্রয় লইয়া বেশ দু পয়সা উপার্জন করিতেছে!

তার পর তোমার প্রিয় সঙ্গী মলয়ানিল! তার কথা আর বলিও না—সে জ্বালাতন করিয়া ছাড়িল! সে কালের মলয়ানিলটা যেন বেশ একটু মৃদু উষ্ণ গুণযুক্ত ধীর ললিত গোছ ছিল, কিন্তু দিক্ দক্ষিণার বিরহক্রমেই বেশী গুরুতর হওয়ায় তথা দক্ষিণ-দেশীয়া যুবতীগণের অধিকাংশেরই স্বামিগণ স্বর্বৃত্তির খাতিরে বিদেশে 'গন্তুং প্রবৃত্ত' হওয়ায় সকল উষ্ণ নিশ্বাসের সমবায়ে সে অনিল আজ কাল বড় বেশী উষ্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং বেগও বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সে অনিল দুপ্রহরে গায় লাগিলে ফোস্কা পড়ে, এত তার ঝাঁজ! তাই ভয়ে ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকি, সে বেটা বাহির থেকে বাঁশ বনগুলি ভাঙ্গে, সোঁ সোঁ করিয়া কেমন পাগ্‌লা উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছুটে ছুটে বেড়ায়, আর দেওয়ালে, দরজায়, জানালায় মাথা ভাঙ্গে! তার প্রবাহেরই কি ঠিক আছে? কখন পশ্চিম, কখন উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকেও বহে! আর সেও ঝুর ঝুর করিয়া কি? একেবারে ঝড় মূর্ত্তি! এই কি সেই মলয়ানিল? কি জানি ভাই, কেমন করিয়া তা জানিব বল!

তার পর ঘর বাড়ী পরিষ্কার করার কথা যে বলেছ তা কই ভাই? ঘর বাড়ী পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করার ভার বোধ হয়, তোমার মলয়ানিল ভায়ার উপর ছিল, তাঁর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারণাটা বোধ হয়, আজকালকার বিজ্ঞানযুক্তির বিপরীত, তাই তিনি খয়ের খাঁ চাকরের মত যত রাজ্যের ধূলো তুলে এনে এনে তোমার পল্লবাস্তরণ, কুসুম শয়ন আদি যা দু একটা ভাঙ্গা খাট বিছানার শয্যা ছিল তা সব পূর্ণ কচ্ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বেচারাদের ঘর বাড়ী, বিছানা পত্র এমন কি খাদ্যাদিতে পর্য্যন্ত সে রাজপ্রসাদ বণ্টন ক'রে রাজভৃত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইতেছেন।

মধ্যে মধ্যে ঝড় মূর্ত্তিতে তোমার সাধের নবপল্লবিত বৃক্ষ ও নবকুসুমিতা লতাবলীকে নাস্তা নাবুদ করিয়া ছাড়িতেছেন। বেটার রসবোধ একেবারে নাই, নতুবা এরূপ করিয়া কোমলা অবলাগণকে জ্বালাতন করে; একটু বাহিরে আসিলে তাহারা নিজ বস্ত্র সংযমনেই ব্যতিব্যস্ত! তার পর তিনি এতেই সন্তুষ্ট নহেন, তিনি শিশিরাঘাত জর্জ্জরিত অগ্নি ভায়ার সহিত বেশ ভাব করিয়া লইয়া স্বতেজে তাহাকে সবল করিয়া লইয়াছেন, এবং সময় সময় সুবিধা মত তাঁহাকে আকাশমার্গে গমনের কৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন

"সম্মুখে দেখিলে খড়ো বাড়ী ধাম
শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম।"

সুতরাং দিন নাই ক্ষণ নাই এই সব গরীব আমাদের ঘর দ্বার অগ্নিদেবের আসন স্থানীয় হইয়া একেবারে স্বদেহ ত্যাগ ক'রে আমাদিগের বিশেষ সন্তোষ উৎপাদন কচ্ছে। অনেক গৃহস্থ তাঁর কৃপায় একেবারে ফকির হয়ে যাচ্ছে, সে সর্ব্বভুকের হস্তে নিস্তার কোথায়? এ দিকে ইন্দ্রদেব যিনি স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য তোমাদের কত খোসামোদ করেছিলেন, এখন তিনিও পথে ঘাটে জল দেওয়া একেবারে বন্ধ করেছেন। সূর্য্যবাবু ছাড়িবেন কেন? তিনিও তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য স্বীয় তীক্ষ্ণ রশ্মিজাল প্রেরণ করেছেন। তাদের ঝাল সহ্য করা ভাই বড় সহজ কর্ম্ম নহে।

এ দিকে যমরাজের নিকট অনুমতি লইয়া তোমার প্রিয় মিত্র বসন্ত তাঁহার বন্ধু ওলাউঠা সমভিব্যাহারে আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, এবং এই সব যমের special দূতেরা যাহা যাহা কচ্ছেন তা চিত্রগুপ্ত মহাশয়ের খাতায় জমা আছে। যমরাজ এতকাল ঐ দুই জনকেই প্রধানতঃ তোমার অভ্যর্থনাকল্পে এত দিন

পাঠাতেন, কিন্তু তাহাদের কৃতকার্য্যতায় বোধ হয় তাঁর তেমন সন্তুষ্টি হয় নাই, এজন্য সম্প্রতি প্লেগ নামক অতি সুচেহারার শিষ্ট শান্ত এক জন দূত পাঠাইয়াছেন, তিনি জাহাজে বোম্বাই নামিয়া রেল সহযোগে মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ইত্যাদি দেখিয়া বেড়াইতেছেন এবং আমাদের বঙ্গেও মধ্যে মধ্যে পদার্পণ দ্বারা দেশকে ধন্য ও পূত করিতেছেন। এখানে পাল মুন্‌সী মহাশয়ের বাটীতে তাঁর বাসা। যমরাজ নিশ্চয়ই তাঁহাকে নূতন ব্রতী করিয়া "no conviction, no promotion" এই মন্ত্র কাণে দিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তিনি স্বীয় কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না। তাঁর সৌজন্যও এমন অসাধারণ যে যার সঙ্গে তিনি একবার দেখা ও আলাপ কচ্ছেন সেই তাঁর গুণে বদ্ধ হইয়া একেবারে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া বসবাস করিতেছে, সুতরাং তোমার অভ্যর্থনার ঘটা খুব! মলয়ানিল ভায়ার আর কোন কাজ নাই, কেবল এর কথা ওর কাছে, এর কুৎসা ওর কাণে চালান কচ্ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কুলোর বাতাস কচ্ছেন!

তুমি রাজা—তাও আবার যে সে রাজা নও, রিপুরাজ মহাবাবু বিলাসী কামদেবের প্রিয় সহচর সুতরাং তোমার বাবুগিরি ও বিলাসিতা আমাদের রাজাদের মোসাহেবগণের ন্যায় আরও বেশী, সেটা নিশ্চয়, সুতরাং তোমার পটমণ্ডপাদি যে এরূপে পরিষ্কৃত হয় তা কেমন করিয়া জানিব? তোমাদের পরিচ্ছন্নতার দৈব idea আমাদের নরলোকের মাথায় আসিবে কেমন করিয়া?

যেমন পরিষ্কার করার ব্যবস্থা, তেমনিই সজ্জিত হওয়ারও বন্দোবস্ত। সূর্য্য মহাশয়ের করজালের অভ্যর্থনার চোটে প্রায় অনেক বৃক্ষ লতাই পরিশুষ্ক এবং নীরস! শাসকের প্রতিনিধিগণ মফঃস্বল আসিলে গরীব প্রজাগণ তাঁহাদের ও তাঁহাদের অধীনস্থগণের উদর স্বতঃ পরতঃ পূর্ণ করিতে এইরূপ অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। কর মহাশয়দের উদর পূর্ণ করা বড় সহজ নহে, তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য সব প্রজাবর্গই নিজদেহ রক্ত দান করিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যে সব বৃক্ষ লতা বিশেষ ধনশালী ও রসভাবপূর্ণ, তারাই কর মহাশয়দিগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিয়া দুই চারিটা নবপল্লব পুষ্পাদি ভূষিত হইয়াছে মাত্র, তাদে[illegible] তেমন স্ফূর্ত্তি নাই সর্ব্বদাই যেন কেমন ভীত ভীত [illegible]!

অনেকেই মলয়ানিল ও কর মহাশয়দের কৃপায় মস্তকাদি পর্য্যন্ত মুণ্ডন করিয়া গরীবানা ভাব দেখাইতেছে সুতরাং তোমার শয্যা আর বিশেষ কই? এ তো দেখিতেছি সেই শকুন্তলার সময়ের অবস্থার মত? মনে আছে ত? সুতরাং কেমন করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলিব যে তুমি আসিয়াছ? তোমার পূর্ব্বকালের সশরীরে আগমনের যে ইতিহাস আমরা পাঠ করি তাহাতে তোমার আধুনিক আগমন সম্বন্ধে বলবৎ সন্দেহ হইবারই ত কথা! তখন নাকি কেমন একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত, সে বড় সাধারণ ব্যাপার নহে। প্রকৃতি তোমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নব সাজে সজ্জিতা হইতেন, নববেশ পরিধান করিয়া নব অলঙ্কারে দেহশ্রী বৃদ্ধি করিতেন, অলকা তিলকা দ্বারা অঙ্গরাগ ও স্রক্ চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গের শোভা সম্পাদন করিতেন। আকাশমণ্ডল সুনির্ম্মল হইত, কবোষ্ণ মলয়ানিল ঝুরু ঝুরু করিয়া বহিয়া বিরহিনী রমণীগণের হৃদয়ের মর্ম্ম স্থানে পীড়ন করিত। তখন মানুষ তো মানুষ তির্য্যক জাতির মধ্যে পর্য্যন্ত একটা নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দিত! পলাশ তোমার সম্ভোগ চিহ্ন প্রকাশ করিয়া অশোক ডালে মূলে ফুটিয়া উঠিত, সকল বৃক্ষতলায় কোমল ও সুন্দর পুষ্প পত্রাবলী ফুটিয়া উঠিত, বিহঙ্গের অব্যক্ত মধুর কাকলিতে প্রাণ মন মুগ্ধ হইত; তখন তোমার 'চূতাঙ্কুরাস্বাদ-কষায়কণ্ঠ' কোকিলের কুহুতানে মনস্বিনীগণের মান ভাঙ্গিয়া যাইত! চূতাঙ্কুরটা এখনও হয় বটে এবং সেই তোমার আগমনের একমাত্র নিদর্শন বলিলেই হয়; কিন্তু কোকিল ভায়ার তদাস্বাদপটুতা ও তদ্দরুণ কণ্ঠে কষায়ত্বের বিষয় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না, বরং এখন কোকিল ভায়া যে অনেক সময় লুক্কায়িতভাবে বর্ষাকালেও এদেশের পক্কজম্বু ফল প্রত্যাশী হইয়া আসিয়া থাকেন এবং তদ্রস পানে তাঁহার স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় এরূপ সাক্ষ্য অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি প্রদান করিয়াছেন। তারপর কোকিলের স্বরে মনস্বিনীদের মান ভাঙ্গার কথা?—হা! হা! হা! সে কথা ভুলেও আর বোলো না, লোকে পাগল বলিবে আর সম্মার্জ্জনী নামক বঙ্গীয় ললনাকুলের [illegible]স্ত্রবিশেষের ভয়ও সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট বর্ত্তমান; তাই স[illegible]ন করিয়া দিতেছি। ভায়া আজ কালকার মনস্বিনী[illegible]ণ এত তরলমতি, বা বোকা নহেন যে সামান্য একটা পাখীর ডাকেই তাঁরা মান ভাঙ্গিবেন আর তাঁহাদের মানও এত ভঙ্গপ্রবণ নহে যে এত অল্পতেই তাহা ভাঙ্গিবে। এখনকার মান কোকিল বসন্তে আর ভাঙ্গে না, ভায়া! কোকিল কেন তার আসল প্রভু পর্য্যন্ত এবিষয়ে অপারগ! এখন কি আর পাখীর ডাকে মান ভাঙ্গে তা হলে 'বৌ কথা কও' বৃথা এতকাল এত উচ্চরবে করুণ চীৎকারে গগনমণ্ডল ধ্বনিত করিত না। আহা বেচারা পূর্ব্বজন্মে দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিবার জন্য শত চেষ্টা করিয়াও শেষে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পক্ষী জন্ম লাভ করিয়াও রমণীহৃদয়ের কাঠিন্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে—ঐ দেখ একদিকে বেচারী পাখীর চীৎকার অন্যদিকে পদপ্রান্তে পেচকবৎ উপবিষ্ট স্বামীর কাতর সাধ্য সাধনা তথাপি 'বৌ' কথা কহিল না, গৃহলক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন না—অপরাধ? এসেন্স একশিশিও আনা হয় নাই, হা হতভাগ্য স্বামিন্, স্বীয় দেহরক্ত দান করিয়া দেখ; তোমার ইষ্ট দেবতার প্রসন্নতা লাভ হয় কি না!

এখনকার মান বোম্বাই সাড়ী, সাটীন বডি, আতর এসেন্স, সোণার জড়োয়া অলঙ্কার, ইত্যাদিতে কতকটা ভাঙ্গে বটে! ওসব ফাঁকা আওয়াজে কিছু হয় না। তোমার প্রিয়বন্ধুর কারিগরীও এ বিষয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে! প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি এখন অনেক নিম্নে, স্বার্থই এখন প্রধান পদস্থ! বসন্তই আসুক, আর অনঙ্গই আসুক, তাঁদের মান তাঁরা না ভাঙ্‌লে কারও বাবারও সাধ্য নাই যে ভাঙেন! তা যদি না হইবে তো এই তো সময়, এ সময় নাকি তির্য্যক্ জাতিরা পর্য্যন্ত "কাষ্ঠাগত স্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং" কার্য্যদ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু কই ভায়া তাতো প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ হয় না। এই তো চক্ষের উপর একজন আছেন; তিনি তাঁহার দেহরূপ কাষ্ঠাগত সুগন্ধি স্নেহানুবিদ্ধ দ্বন্দ্বভাব প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু সেটা দ্বন্দ্বের অন্য অর্থে! তাহা অনুভব করিতে করিতে কাণ ও প্রাণ একত্রেই জীর্ণ হইতেছে। এরূপ দ্বন্দ্বভাব বেশী দিন স্থায়ী হইলে এ গরীবের যে চির-বসন্তময় প্রদেশে প্রবেশের পথ খোলসা হইবে, তাহা নিশ্চয়!

আরও শুনি তোমার আগমনে মানবের মন নাকি কিছু উৎসুক উৎসুক থাকে, আজ কালকার কবিতার মত 'কি যেন' 'কোথা যেন' করে। প্রোষিতভর্ত্তৃকাগণ নাকি এ সময় আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল খাঁটি অশ্রুজলে বক্ষ ভিজাইয়া ঠাণ্ডা করিতে চায়! আর কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতিকে খুব করিয়া গালাগালি করে। তাদের রবে নাকি চমকিয়া উঠে, হায় হায় করে! ভায়া হে, বলিলে নিজ বুজরুকির পশার হানি হয় বলিয়া রাগ করিবে, কিন্তু বাস্তবিকই কথাটা একেবারে শাদা মিছে কথা! আমি অনেকরূপ বিশ্বস্ত প্রমাণের বলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমি বেশ জানি ওরূপ কিছুই তাঁহাদের হয় না! পূর্ব্বে তোমার আগমনে মুনিগণের চিত্তও নাকি বিচলিত হইত, তাঁহারাও নাকি তোমার প্রবৃত্তি দেখিয়া কষ্টে সৃষ্টে মনটাকে বাগাইয়া রাখিয়া 'কথঞ্চিৎ মনের ঈশ্বর' হইতেন কিন্তু ভায়া হে, আজ কালকার মনস্বিনীগণ মুনিগণকেও পরাস্ত এবং অধঃপাতিত করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সর্ব্বনেশে 'কালের 'কপালে আগুণ' বেটার মত একেবারে "নির্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং" নির্ব্বিকার ও অচঞ্চল! তোমার বন্ধুর জারিজুরি একেবারেই ভাঙিয়া দিয়াছেন অথবা তোমার বন্ধু বোধ হয় তাঁহাদের নেত্ররাগচ্ছটা এবং মুখ জোরের ঘটা দেখিয়া পূর্ব্বভাব স্মরণ করিয়া ভয়ে তাঁহাদের কাছে বড় একটা ঘেঁসেন না! কারণ কই? তাঁহারা অন্য কালেও যেমন এখনও তেমনি! সেই চিঠি পত্র লেখা, উল মোজা বোনা, নাটক নবেল পড়া, কেশ বেশ ও শয্যাপরায়ণতা, সেই পরচর্চ্চা ও পরকুৎসা, কষ্টে সৃষ্টে দৈনিক চারিবার আহার এবং দিবারাত্র সুনিদ্রা এ সব তো বেশ সমভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবেই দেখিতে পাই! উৎকণ্ঠারও কোন লক্ষণ দেখি না, প্রফুল্লতারও কোন কমি নাই! সুতরাং কেমন করিয়া বলিব তুমি আসিয়াছ? কার্য্যকারণ পরম্পরায় তো তাহা সিদ্ধ হয় না! তবে কি তাঁরা তির্য্যকজাতিরও অধম? বাপ্! তোমার সাহস থাকে, তাহা তাঁহাদিগকে বলিয়া আসিও—আমার একটার অধিক প্রাণ নহে সেও আবার মর্ত্ত্য প্রাণ আমি সে সাহস করিতে পারিব না!

তোমার বন্ধুর প্রধান অস্ত্র চূতাঙ্কুর দেখা দিয়াছে বটে,

কিন্তু সে ভোঁতা! কোনই ধার নাই! তাহার কোন প্রভাবই দেখি না! পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই চূতাঙ্কুরেরই বা কত সম্মান ছিল! লোকে এতদ্দ্বারা তোমার ও তোমার বন্ধুকে আবাহন করিত, এবং ইহাকেও কত আদর করিয়া 'আতম্র হরিঅ পণ্ডুর বসন্তমাসস্ম জীঅ সর্ব্বস্ম' ইত্যাদি এবং "তুমং সি চূতাঙ্কুরো দিণ্ণো" ইত্যাদি দ্বারা মাঙ্গল্য ভূষিত করিত এবং কপোত হস্তক করিয়া তোমাদিগকে উপহার দিত। সে সব কি মনে আছে? তখনকার সময় তোমার কত মান্য, কত আদর! তোমার উৎসবে তখন কত ঘটা! রত্নাবলী সাগরিকার কথা মনে আছে কি? স্বয়ং রাজা রাজ্ঞী পর্য্যন্ত তোমার উৎসবে মাতিয়া পড়িতেন! কি উৎসাহ, কি প্রফুল্লতা! কোন কারণে সে উৎসব বন্ধ হইলে লোকের কত কষ্ট, কত ক্ষোভ! মনে কর দেখি, সেই শকুন্তলার সময়কার ব্যাপারটার কথা!

আর এখন তার কি আছে বল দেখি! সেই ত চূতাঙ্কুর এসেছে, কিন্তু কেউ কি ভুলেও জিজ্ঞাসা করে? যা কিছু একটু মনে করে সে চূতের জন্য তোমাদের জন্য নহে। যদি সেটা তোমার জন্য বলিয়া ভাবিয়া থাক তবে বড় ভুল হইয়াছে, নিশ্চয় জানিও।

সুতরাং ভাই আমি যে শুনিলাম বলিয়াছি তাহাতে আমার অপরধ কি? তোমাকে দেখিবার এখন কি আছে বল দেখি যে তাই দেখিয়া বুঝিব তুমি এসেছ? সেই মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে," সেই 'শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং,' সেই 'অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং' সেই "দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি" ইত্যাদি কিছুই তো নয়নগোচর হয় না ভাই! প্রকৃতির শয্যার বিবরণও তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি! "কাষ্ঠাগত স্নেহরসানুবিদ্ধা" ভাবেরও কোন পরিচয়ই নাই! আমারও একটা কাঠের প্রাণ আছে তারও তো কোন বৈলক্ষণ্য দেখি না!

নকীবও মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দেন, আমের মুকুলও দেখি, অনিলও যে মধ্যে মধ্যে গায় না লাগে তা নয়, তথাপি তো সে সব হুলস্থূল ব্যাপার কিছুই হয় না। প্রাণও হুহু করে না, খালি খালিও বোধ হয় না, কোকিলের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধারের জন্য ব্যাধজীবন কামনা হয় না, চন্দ্রকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য অথবা গ্রাস করিবার জন্য রাহুত্ব প্রাপ্তিরও ইচ্ছা হয় না, ভ্রমরকেও কমলোদরবন্ধ-নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না, উ[illegible] চন্দন অনুলেপন প্রয়োজনও অনুভব করি না! তু[illegible] বলিবে "তোমার নীরস প্রাণ তাই হয় না!" ভাল ব[illegible]সবারই কি প্রাণ নীরস? নতুবা কোথাও তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতাম? যে দুই একজন পেশাদারি 'হু হু' 'হা হা' করে সে কেবল বাহ্যিক, আন্তরিক একবিন্দুও নহে, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। আর আমিই বা নীরস কিসে? সেরূপ অভিযোগ স্ত্রীপুরুষ কেহই কখন আমাকে করে নাই সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য! আদত কথা তোমার আগমনের যেরূপ আড়ম্বর প্রাচীন ইতিহাসে দেখি, এখন তার কিছুই নাই—দেখি না—তাই বলি তুমি আসিয়াছ তাহা বুঝিতে পারি না! তোমার এই সব প্রভাব সামার্থ্যগুলি যে কোন কবির উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র এ কথা বলিয়া তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় না! Theseus এর সঙ্গে সঙ্গে

As imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name."

এ কথা বলিতেও মাথার ভয় রাখি! সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে তুমি এসব দেশে আইস না! পাহাড় পর্ব্বতে যাও কি না জলধর বলিতে পারেন, কারণ সে সব স্থানে তাঁহার সর্ব্বদা গতায়াত আছে, বন জঙ্গলে যাও কি না তাহা বনবিহারীগণই বলিতে পারেন, গৃহবিহারী আমি তাহা কি জানিব?

তবে এই সব স্থানে যাহা সব দেখি তাতেই বলি যে অন্ততঃ এই বঙ্গদেশে তোমার আগমন এখন হয় না! অথবা হইলেও তোমার সে সব প্রভাব প্রতিপত্তি বুজরুকি, আর এই সুসভ্য শিক্ষিত বিজ্ঞানালোকোদ্ভাসিত বঙ্গের উপর খাটে না। সেই ইন্দ্রজালের মোহ প্রভাব টুটিয়া গিয়াছে। বঙ্গে এখন রমণীগণও বিদুষী, বিজ্ঞানযুক্তিনিষ্ণাতা, কবিত্বে 'অতি নদীষ্ণা' তাঁহারা তোমারও বুজরুকিতে ভুলিবার নহেন! সেকেলে "ষষ্ঠী মাখাল" পূজোওয়ালা নিরক্ষর অন্ধ বিশ্বাসানুবর্ত্তিনীগণের প্রতি বুজরুকি দেখাইয়া ভারি বাহাদুরী লইতে, আর ভাবিতে তোমাদের ক্ষমতা যেন কতই, নিজের ওজন পাইতে না, এখন তেমনি

জব্দ! বঙ্গে আর কোন [illegible]বই খাটে না তুমি তো তুমি, তোমার বন্ধুর অজেয় পর[illegible]ও পরাস্ত হইয়াছে; রমণীগণ এখন সর্ব্বজয়া হ[illegible]ছেন। তাই বলিয়াছিলাম, শুনিলাম তুমি আসিয়াছ! বড় অপরাধ হয়েছে, কি ভাই?

যা হোক্, কৈফিয়ৎ দিতেই আজকার দিনটা গেল! বেলা বড় বেশী হইয়াছে, সুতরাং আজকার মত আসি! তোমাকে আর একদিন এসে দুটো হিত কথা বলিব, পরামর্শ দিব। তুমি রাজা—তা হইলেই বা, গরীবের কথা শুনিতে আর দোষ কি? রাখা না রাখা সেটা তো তোমার হাত! আমি বলিয়া যাইব মাত্র! বিশেষতঃ আমার কিঞ্চিৎ গলকণ্ডুতি ও করকণ্ডুতি রোগ আছে, তাই গলাবাজি ও কলমবাজি সময় সময় না করিলে শরীর সুস্থ থাকে না—সুতরাং গ্রাহ্য হউক বা না হউক, কেহ শুনুক বা না শুনুক, পড়ুক বা না পড়ুক, আমার বক্তৃতাটা করা বা লেখাটা চাই—আজকাল আমার ঐ একমাত্র বল, ঐ একমাত্র জীবনোপায়, ইহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না তা'হলে মরিয়া যাইব! আমার অন্য কোন কাজ নাই, এমন কি খুড়া পর্য্যন্ত নাই যে তাঁহার গঙ্গাযাত্রার বিধান করিব, সুতরাং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতায় হিতকথা না বলিলে আমার দিনই বা চলে কি ক'রে তাই বল দেখি,—অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই অথবা কৃপণতা আছে, স্বার্থসিদ্ধি আছে, ভয়টা বিলক্ষণই আছে, সুখ স্বচ্ছন্দতা বোধও বিশেষই আছে অথচ দশজনের উপকারটাও করা চাই, এরূপ নিখরচায় হিতৈষী নাম গ্রহণ করা এক বক্তৃতা ভিন্ন আর কিসে হয় বল? অতএব দোহাই তোমার আমি আবার যাহা বলিব তাহা তুমি শুনিও, অথবা বলিও হাঁ শুনিয়াছি, সেই যথেষ্ট।

তবে আজ একটা কথা তোমাকে সমজাইয়া দিতেছি যে যদি তুমি আসিয়াই থাক, তবে সেটা তোমার বড়ই ভুল হয়েছে! তোমার পূর্ব্বের সে সম্মান, সে প্রতিপত্তি কই? সে তো এখন স্মৃতিগত! "তে হি তে দিবসাঃ গতাঃ।" এখন রমণীগণ পর্য্যন্তও যখন তোমাকে একটুও গ্রাহ্য করে না, আদর করে না, জিজ্ঞাসা করে না, তখন কেন এরূপ রবাহুতের ন্যায় অনাহ্বানে অসম্মানে তোমার আসা? অপমান বোধ হয় না কি? যাও কিছুদিন এস্থান ত্যাগ করিয়া তোমার বন্ধুর সহিত হিমালয়ের নিভৃত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক এই অপমানের প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার উপায় চিন্তা কর গিয়া—নূতন নূতন কৌশল, অস্ত্র ইত্যাদি আবিষ্কারের পথ উদ্ভাবন কর গিয়া! ছি! একটু পূর্ব্ব গৌরব, আত্মসম্মানের বোধ থাকা কর্ত্তব্য। তোমরা সব দেবতা, তোমারাও যদি আমাদের মত শত বার পদাঘাত সহ্য করিয়াও আবার সেই পদে হস্তাবমর্ষণ করিতে আইস, তবেই ত সব হইয়াছে!

যাও দেখি, এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও, এই অপমানের প্রতিবিধানের চেষ্টা কর; আমিও সে বিষয় দু,চারিটি পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছি! তারপর নব বলে, আশ্চর্য্য কৌশলে এবং নব অস্ত্রে ভূষিত হইয়া আসিয়া বীরদর্পে নিজ সম্মান আদায় করিও, আজ যাহাদের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেছ, তাহাদিগকে পদানত করিও, আবার দেখিও তোমাদের জয় জয়কার হইয়াছে, পূর্ব্ব মান সম্মান ফিরিয়া আসিয়াছে! নতুবা যেখানে একদিন রাজ সম্মান এবং অখণ্ড প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছ, সেইখানে এরূপ অগ্রাহ্য ভাবে, নগণ্য ভাবে লাঞ্ছিত হইতে কি তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না! এতই তোমরা আত্মসম্মান বিস্মৃত হইয়াছ? এতই তোমরা সেই প্রাচীন সুখ ও প্রভুত্বের স্বপ্নে মুগ্ধ হইয়া অপ্সর রাজ্যে বিচরণ করিতেছ? তাই যদি হয় তবে ধিক্ তোমাদের দেবহৃদয়ে, ধিক্ তোমাদের মনোবৃত্তিকে, ধিক্ তোমাদিগের বিলাসিতায়! তা'হলে বুঝিব কন্দর্প ঠাকুরই বা কি, আর তুমিই বা কি, তোমাদের অতীত গৌরবের কথা, তেজের কাহিনী প্রতিপত্তির ইতিহাস বাস্তবিকই কবির কল্পনা মাত্র! তাহাতে কিছুমাত্র তথ্য নাই।

ভায়া, বড়ই বোধ হয় রাগ করিতেছ, যে আমি সামান্য একজন নগণ্য ব্যক্তি হইয়া তোমাকে এত কথা বলিলাম, এত তিরস্কার করিলাম! ভাই রাগ করিও না, তোমারই রাজ্যে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের আবেগে তোমারই ভালর জন্য বলিয়াছি! কথা গুলি একটু কর্কশ, একটু অপ্রিয় বোধ হইলেও উদ্দেশ্য বুঝিয়া তোমার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের ইহাতে রাগ করা উচিত নহে; কারণ এটা সকলেই বিশেষ অবগত আছেন যে সংসারে, "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।" ইতি—

শুভার্থী "বসন্ত বিলাসী।"

প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধার।

২। চৈত্র-মাহাত্ম্য।

এই গ্রন্থের নাম 'চৈত্র-মাহাত্ম্য' হইলেও ফলতঃ ইহা একখানি ক্ষুদ্র চণ্ডী-কাব্য। মোট ১৩৬টি পদ সাহায্যে চণ্ডী-কাব্যের সমস্ত ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে উক্ত উপাখ্যানের আদি গ্রন্থ বা প্রথম উত্তম ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। এরূপ স্থলে ইহার 'চৈত্র-মাহাত্ম্য' নামের সার্থকতা কি, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

চণ্ডী-কাব্যের কবি কতজন, ঠিক আজও কিছু বলা যায় না। কবি দ্বিজ জনার্দ্দন যে চণ্ডীর উপাখ্যান রচনা করেন, তাহা একখানি ছোট খাঁট ব্রত-কথা মাত্র। সমালোচ্য কাব্যখানিও ঐরূপ একখানা ব্রত-কথা বই কিছুই নহে। ক্রমান্বয়ে বলরাম, কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম এইরূপ ব্রত-কথার আশ্রয় করিয়াই তাঁহাদের নিজ নিজ বৃহৎ কাব্য প্রণয়ন করেন। এগুলি ব্যতীত আমরা মুক্তারাম সেন রচিত 'সারদা-মঙ্গল' নামধেয় একখানি চণ্ডী-কাব্যের উদ্ধার করিয়াছি। কিন্তু উহাকে কোনরূপে প্রথম উত্তমের ফল বলিয়া অবধারিত করা যায় না।

'চৈত্র-মাহাত্ম্যে'র রচয়িতা কে, গ্রন্থ হইতে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। অন্য কোনরূপেও যে তাহা জানা যাইবে, সে আশা নাই। মালী যিনিই হউন না কেন, আমরা যে এই বনফুলের মালা পাইতে পারিয়াছি, ইহাই কি আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য-সূচক নহে?

যখন মালাকারই অজ্ঞাত, তখন মাল্য-গ্রন্থনের কাল জানা যাইবে, সে আশা ত বিড়ম্বনা মাত্র! সাহিত্য-জগতে আমরা এই দুর্ল্লভ পদার্থের প্রচার করিয়া দিলাম; ইহার আলোচনাদি দ্বারা কোন সত্যাবিষ্কার সম্ভব হইলে তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীই করিবেন। সে বিষয়ে আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের প্রয়াস পাওয়া ধৃষ্টতা বই আর কিছু নহে।

এই পুঁথির প্রতিলিপিখানি চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত 'মোহাম্মদপুর' গ্রামে রামগতি আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহ[া] আজ ৭৯ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু মূল গ্রন্থের রচ[না কা]ল যে উহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা বোধ হয়, আর বলিয়া [দি]তে হইবে না। গ্রন্থ পাঠে ইহাকে চট্টগ্রামী-সম্পত্তি বলিয়া আমরা নিশ্চিত করিয়াছি।

এই গ্রন্থের সমালোচনা আমাদের উদ্দিষ্ট নহে; সুতরাং ইহার দোষগুণ সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না। বিশেষতঃ কাব্য-সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনার্থ ইহা প্রচারিত হইতেছে না। কাব্য-জগতে ভাববিকাশের পর্য্যায় লক্ষ্য করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহাদের নিকট ইহা খুব আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। আর বৃথা বাগ্বাহুল্যে পাঠকগণের সময় নষ্ট না করিয়া আমরা এখানে পুঁথিখানি প্রকাশিত করিলাম।

পাঠোদ্ধারে অনেক স্থানে প্রাচীন বর্ণবিন্যাসপদ্ধতির অনুসরণ করা হইল। দ্বিতীয় প্রতিলিপির অভাব বশতঃ গ্রন্থ মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটী বা প্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়ার খুব সম্ভাবনা।

চৈত্র-মাহাত্ম্য।

জয় দুর্গা।

প্রণমোহ পরম দেবতা আত্মা দেবী।
ব্রহ্মা হরিহর থাকে যার পদ সেবি॥
সত রজ তম।তন গুণে সেই যুতা।
প্রসূতি পালন বিনা শিবে শক্তি ভূতা॥
যার নাম স্মরণে দারিদ্র দুঃখ জাএ।
মহাপদ পাএ সেই ইশেদ (ঈষৎ) লীলাএ॥
তাহান চরিত্র রচিবারে করি আশা।
লোক পরিতোষেরে করিব দেশী ভাষা॥
আছে অতি পশ্চিমে নগর উজায়নী।
বিক্রম কেশরী রাজা নৃপ শিরোমণি॥
তথাএ বৈসে এক সাধু নামে ধনপতি।
মহাধনবন্ত সেই নগর বসতি॥
নিধিপতি সুতা লক্ষপতির দুহিতা।
লহনা খুলনা তান এ দুই বনিতা॥
ভুতগা * লহনা অতি দুর্ব্বগা † খুলনা।
করিলেন্ত ছাগল রক্ষক নিয়োজনা॥

* ভুতগা=সুভাগা? † দুর্ব্বগা=দুর্ভাগা?

আর এক দিনে ছা[গ]ল হাজিল* রাখিতে।
জয় রব শব্দ শুনে [...]পর্য্যটিতে॥
সরোবর তীরে ঘঠ[...]র আরোপন।
পঞ্চ উপচারে পূজা পূজে নারীগণ॥
এ সকল দেখিয়া খুলনা কহে বাৎ।
কহ দেখি ফল মাগো ভজিলুম্ তোমাৎ॥
জথ আদি অন্ত কথা সকলি কহিল।
নারীগণে কাকুতি শুনি উপদেশ দিল॥
ভক্তিয়ে পূজয়ে যদি দুর্গত-নাশিনী।
অবিলম্বে সিদ্ধি হৈব জিনিবা সতিনী॥
অপুত্রার পুত্র হএ নির্ধনীর ধন।
বন্দীয়ে স্মরিলে হএ বন্ধন মোচন॥
এই উপদেশে অষ্ট দূর্ব্বা চাউল লৈয়া।
খুলনাএ ব্রত করে সমাহিত হৈয়া॥
ব্রাহ্মণী কহিল কালকেতুর প্রস্তাপ (প্রস্তাব)।
যেন মতে ভবানী প্রসন্ন হৈলেন্তাক॥ †
কলিঙ্গেতে মহাগিরি বিন্তে অন্তরিন। ‡
মহাটবী আছে মহামায়ার অধীন॥
তার সন্নিহিতে বৈসে ব্যাধ কালকেতু।
পশু পক্ষীগণের বিনাশ মুখ্য হেতু॥
যথা তথা জাএ পশু বিপিন বিচারি।
কার পিতা কার পুত্র কার মারে নারী॥
অবশিষ্টে জে য়াছিল হৈয়া একমতি।
স্তবে গিয়া মঙ্গলচণ্ডিকা ভগবতী॥
রক্ষ রক্ষ সুখদা§ মোক্ষদা ক্ষেমঙ্করি।
পরিত্রাহি পরিত্রাহি ত্রিভুবনেশ্বরি॥
দুর্গত-নাশিনি দুর্গা দুঃখ বিনাশিনি।
উদ্ধার উদ্ধার মোরে মথন গেহিনি (?)॥
মহা দুঃখ দূর কর ইসেদ (ঈষৎ) লীলাএ।
জনম সাফল তার তুহ্মিত সহায়॥

ব্যাধরূপে যম কালকেতু দুরাচার।
তুহ্মি যদি কর মাতা এহাতে নিস্তার॥
স্থাবর জঙ্গম জথ তোমার সৃজন।
মোহকে* রক্ষিতে মা না চিন্ত পরিশ্রম॥
সেবক বৎসলা দেবী গোধা রূপ ধরি।
রহেন গিয়া কালকেতু পন্থ অনুসারি॥
প্রভাতে চলিল ব্যাধ পশু বধিবারে।
সুবর্ণ গোধিকা দেখে পন্থের মাঝারে॥
শুনিয়া ব্যাধের কাল ধনুর টংকার।
সেই বনে পশু পক্ষী না রহিল আর॥
পশু না পাইয়া ব্যাধ ভ্রমিয়া হতাশ।
চিন্তাযুক্ত হৈয়া ব্যাধ ঘন এরে (এড়ে) শ্বাস॥
পুনরপি গেল সেই গোধিকার পাশ।
ঘরেতে নিবারে গোধা করিলেন্ত আশ॥
বা[ন্ধি]য়া লইল গোধা করিয়া যতন।
গৃহিণীর স্থানে দিল করিতে রন্ধন॥
কাটিবারে নিল যদি ব্যাধের রমণী।
গোধারূপ এরি (এড়ি) হৈলেন ত্রিলক্ষ (ত্রৈলোক্য) মোহনী॥
বিস্ময় ভাবিয়া গেল স্বামীর গোচর।
বিবিধ কঠুর (কঠোর) বাক্যে ভশ্চিল† বিস্তর॥
কোন কালে নহি হয় এ ছার (তোর?) দুর্ম্মতি।
কিবা সুখে ঘরে আন পরেয়ার ‡ যুবতী॥
পরদার-ছলে রাজা [...] রিবেক দণ্ড।
জেবা আছে জাতিকুল হৈবা লণ্ড ভণ্ড॥
স্ত্রীর বিরূপ বাক্য শুনিয়া তখন।
ঘরে গিয়া দেখে মঙ্গলচণ্ডিকা চরণ॥
গৌরবর্ণা অভয়া বরদা দ্বিনয়না।
দ্বিভুজ পরমোজ্জ্বলা প্রসন্নবদনা॥
রক্ত বস্ত্র রক্ত মাল্য রক্ত অভরণ।
রক্ত পদ্মাসনে দেবী গন্ধানুলেপন॥
শিরে শশধর শোভে বিচিত্র মুকুট।
কাঞ্চন কাঞ্চুলি গাএ শিরে জটাজুট॥

* হাজিল—হারাইল।
† হৈলেন্তাক—হৈলেন তাক (তাকে)।
‡ বিন্তে অন্তরিন—বিন্ধ্যপর্ব্বত মধ্যে?
§ মূলে 'সুখদা' স্থলে 'সুদক্ষদা' আছে।

* মোহকে—আমাকে। † ভশ্চিল—ভৎ'সিল।
‡ পরেয়ার—পরের।

মস্তক ধামাল্য * * চম্পক কলিকা।
নব ঘন মধ্যে যেন স্বরে (?) বিজুলিকা॥
ভ্রমরের কুল শোভে উপরে তাহার।
সুগন্ধি সৌরভ লোভে করয়ে ঝঙ্কার॥
গণ্ডেতে মণ্ডিত মণি কুন্তল (?) যুগল।
কোটী চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীমুখমণ্ডল॥
স্বর্ণ মণি রচিত কঙ্কণ দুই করে।
রত্ন মণি হার পৈরে স্তনের উপরে॥
কুটিল কুন্তল শোভে সিন্দূরের রেখা।
রাহুর গলিত যেন সূর্য্যে দিছেন দেখা॥
ললাট-চন্দ্রের মধ্যে গন্ধের তিলক।
চন্দ্রের গর্ব্ভেতে যেন কলঙ্ক শশক॥
বাহুযুগে অঙ্গেতে কেয়ুর বিভুষিত।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য আজানুলম্বিত॥
বাক্য সুধাধর দন্ত মুক্তা গ্রন্থিল।
চারু হাস্য দেখি যেন বিজুলি [illegible]॥
তিল ফুল সমতুল নাসা অবতংসী।
ভুবন মোহন গতি জিনি রাজহংসী॥
পয়োধর মৃগমদ কুঙ্কুমে লেপিত।
কনক কদলী জিনি সিন্দূরে জড়িত॥
কুলিসের অবয়ব দেখি মধ্যভাগ।
বিম্বুফল সমতুল অধরের রাগ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ হেম অঙ্কুরী অঙ্গুলে।
হেমের মেখলা খোল নিতম্ব বিপুলে॥
ত্রিভুবন হোতে রূপ আনিয়া সকল।
একত্র করিয়া বিধি নির্ম্মাণ (নির্ম্মাল ?) কেবল॥
দির্ব্ব (দিব্য) মূর্ত্তি দেখি ব্যাধ পাসরে আপনা।
রতি সহস্র জনে যার না ধরে তুলনা॥
সম্ভ্রম উপক্ষি* ধার্য্য (ধৈর্য্য ?) ধরিল যতনে।
প্রদক্ষিণ হৈয়া পড়ে চণ্ডিকা চরণে॥
কি নাম তোমার মাতা দেয় (দেও) পরিচয়।
কোন কাজে আইলা পাপ ব্যাধের আলয়॥
মঙ্গলচণ্ডিকা আমি ভুবন পূজিত।
মোর পশু হিংসা না করিয় কদাচিত॥

পার্ব্বতী চরণে ব্যাধে [illegible]মিয়া কহে।
তোমা দরশনে দুঃখ [illegible]দ্র না রহে॥
শিবদা শিবদা তুহ্মি সর্ব্ব[illegible] শিবদা।
মাতা মেধা মানদা মঙ্গল মঙ্গলদা॥
সৃষ্টি রক্ষা আপনে আপনা পুনি তোস (দোষ ?)।
পশু না বধিলে মাতা অন্য মতে পোষ॥
কিবা পশু কিবা ব্যাধ তোমার সৃজন।
মোহকে* রক্ষিতে মা না চিন্ত পরিশ্রম॥
তুষ্ট হৈয়া দেবী দিলেন হস্তের কঙ্কণ।
এহারে ভাঙ্গাই খাও জথ পাও ধন॥
[illegible]বে বোলে তোমার দাস কুবের শতেক।
উচিত যে দিলা ধন তপস্যা জথেক॥
এই পাপ উদর মুঞি কিরূপে ভরাইমু।
এহারে খাইলে আর দিনে কি করিমু॥
দেবী বোলে এইখান করিয় খনন।
জথ ইচ্ছা তথ নেয় অমূল্য রতন॥
স্তবিয়া বিবিধরূপে পুনি পড়ে পাএ।
ধনী বাদে হৈব রাজা দণ্ডেতে সহায়॥
আশ্বাসিয়া দেবী গেলেন আপনা ভুবন।
নিধি লৈয়া নিজ পুরে করিলেন গমন॥
পার্ব্বতী প্রসাদে কালকেতু ধনবন্ত।
নৃপতি গোচরে কহে দোসাহু দুরন্ত॥
শুনিয়া সশ্রিঙ্গ (কলিঙ্গ ?) নৃপতি আদেশিল।
কোটোয়ালে ব্যাধ বন্দী করিয়া রাখিল॥
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ স্মরি স্থির করি মতি।
ভাবে মহাভয়-বিনাশিনী ভগবতী॥
তুহ্মি দেবী দীনময়ী (?) মায়া মহামায়া।
লৈলুম পাপ তাপ ভয়ে তুয়া পদছায়া॥
ত্রাহি ত্রাহি তুহ্মি সে গিরিজা গুণময়ী।
যারে কৃপা কর তুহ্মি ভুবন বিজয়ী॥
পরিত্রাহি পরিত্রাহি পর্ব্বত পুত্রিকা।
শিবে সর্ব্বাস্বরি† শিবা সর্ব্বত্রে সাধিকা॥
অনন্য গতিক মাতা মুঞি পাপমতি।
মুই উদ্ধার হৈতে আর নাই গতি॥

* উপক্ষি—উপেক্ষি।

* মোহকে—মোকে।
† সর্ব্বাস্বরি—সর্ব্বেশ্বরি ?

কথ অপরাধ কৈলুম [illegible]মার চরণে।
ধন দিয়া প্রাণ লয়ে[illegible]ও) কিসের কারণে॥
স্তুতি বশ হৈয়া দেবী গেলা অন্তস্পুর।
রাজারে জে স্বপ্ন কহে হইয়া নিষ্ঠুর॥
মোর পুত্র কালকেতু মুঞি দিছম্ ধন।
তোর কোন ধন লৈয়া কার প্রয়োজন॥
সপুত্রে বান্ধবে যদি জীতে কর সাধ।
শীঘ্র মুক্ত কর ব্যাধ না কর বিবাদ॥
নিগড় গলিত হৈছে দেবের অনুভাবে।
দুস্বপ্ন দেখিল রাজা ব্যাধির প্রস্তাবে॥
মোচন করিয়া মুক্ত বহু কৈল মান।
অর্দ্ধ রাজ্য সহিতে পাঠাএ নিজ স্থান॥
পার্ব্বতী প্রসাদে কালকেতু নিস্তরিল।
অরণ্যেতে নারীগণে জয়কার দিল॥
খুলনায়ে স্তুতি ভক্তি করিল অপার।
হাজিছে* ছাগল পাএ জাএ নিজ ঘর॥
স্বপ্নে সঙ্কট দেখে লহনা সুন্দরী।
খুলনাকে নিজপুরে আনে আগুসারি॥
স্নান করি বসন ভূষণ সাজাইয়া।
স্বামীর সাক্ষাতে পাঠাইল জল দিয়া॥
পরনারী জ্ঞানে সাধু ক্রোধ হৈল অতি।
লহনায়ে জানাইল খুলনা যুবতী॥
বিনোদ খুলনা সঙ্গে ছিল কথ দিন।
বাণিজ্যে চলিল সাধু হইয়া ধনহীন॥
দুই নারী আদেশিল ভোজ্যার্ঘ দিবারে।
খুলনা চণ্ডিকা পূজে পঞ্চ উপচারে॥
খুলনা না দেখি নিবর্ত্তিয়া ঘরে জাএ।
ক্রোধ হৈয়া ঘঠ ঠেলে চরণের ঘাএ॥
হাহা করি স্বামীর ধরিল দুই পাএ।
অভয়ার ঘঠ প্রভু ঠেলিতে না জুয়াএ॥
সান্ত্বাইয়া স্বামীরে বলিল প্রিয়বাণী।
গর্ব্ভের সন্ধর্ব্ব (?) জানি লৈলা পত্রখানি॥
পুত্র হৈলে নাম তান থুইয় শ্রীপতি।
কন্যা হৈলে নাম তান থুইয় সরস্বতী॥

ডিঙ্গা সব সাজাইয়া চলিল ধনপতি।
সমুদ্রের মধ্যে তান নানান দুর্গতি॥
নদী প্রবেশিয়া দেখে এক অদভুত।
পদ্ম পত্রে বসি কন্যা গিলে গজযুথ॥
ত্রাসে শালবাহনেতে জথ কথা কৈল।
মিথ্যা জানি সাধু বন্দী করিয়া রাখিল॥
উজানীতে পুত্র প্রসবিল খুলনাএ।
নাম থুইল শ্রীয়মন্ত পিতার আজ্ঞাএ।
পঞ্চম বরিযে কৈল কঠিনী প্রদান।
আর এক দিনে গেল পাঠকের স্থান।
হাত হোতে খড়ি জে পড়িল গড়াইয়া।
ধামাদি বিপ্রেরে বোলে খড়ি দে তুলিয়া॥
ক্রোধ হৈয়া বিপ্রে বোলে না চিন আপনা।
কহ দেখি তোমার জনক কোন জনা॥
অপমানে ঘরে গেল কান্দিয়া বিস্তর।
মায়ে সতমাএ তানে দিল পদুত্তর*॥
মোহরে† জারজ বোলে ধামাদিয়ার পো।
আপনা নাশিমু যদি হেনহি সে হও॥
তবে তান মাএ সত (মাত্র) কহিতে লাগিল।
তোমার জে বাপে পত্র জাইতে দিয়া গেল॥
না কান্দ না কান্দ হের পুত্র শ্রীয়পতি।
সদাএ গিয়াছে তোমার বাপ ধনপতি॥
বিবাদ না হৈয় পুত্র না হৈয় ফাফর।
হের দেখ পত্র তোর পিতার অক্ষর॥
এ বলিয়া পত্র দিল শ্রীপতির করে।
শ্রীয়মন্তে পত্র পড়ে অক্ষরে অক্ষরে॥
পত্র পঠি হৈছে দেখে দ্বাদশ বৎসর।
বাপের উদ্দেশে জাইমু তার সর্জ্জ (সজ্জা ?) কর।
ভেট লৈয়া ভেটিবারে গেল নরবর।
নমস্কার করিলেক সাধুর কোঁয়ার‡॥
রাজার সাক্ষাতে সাধু নোয়াইয়া মাথা।
মোহরে§ জানাই দেয় বাপ আছেন জথা॥
রাজার সাক্ষ্যাতে সাধু হইল বিদায়।
মায়ের সাক্ষ্যাতে ছিরা ধীরে ধীরে জাএ॥

* হাজিছে—হারাইছে।

* পদুত্তর—পদোত্তর। † মোহরে—মোরে।
‡ কোঁয়র—কুমার। § মোহরে—মোরে।

দণ্ডবত হৈয়া পড়ে মায়ের দুই পাএ।
অষ্টদূর্ব্বা তণ্ডুল জে দিলেনত মাথাএ॥
বিষম সঙ্কটে পুত্র ভাবিয় ভগবতী।
তাহান চরণ বিনে অন্ত নাই গতি॥
আর এক অষ্টদূর্ব্বা দিল সতমাএ।
আঞ্চলে বান্ধিয়া সাধু হইল বিদায়॥১১০
শ্রীমন্ত চলিল পিতৃ উদ্দেশ কারণ।
দেখে কন্যা গজ গিলে সেই পদ্মবন॥
ত্রাসে শাল বাহনেতে একথা কহিল।
সৈন্যে সামন্তে রাজা চাহিবারে আইল॥
কোথাএ হস্তী কোথায় পদ্ম কিছু না দেখিল।
মিথ্যা জানি শ্রীপতিরে কাটিবারে নিল॥
মায়ের উপদেশ স্মরি স্থির করি মতি।
ভাবে মহাভয় বিনাশিনী ভগবতী॥
তুমি দেবি দীনমহী (?) মায়া মহামায়া।
লৈলুম পাপ তাপ ভয়ে তুয়া পদছায়া॥
ত্রাহি ত্রাহি তুমি সে গিরিজা গুণময়ী।
যারে কৃপা কর তুহ্মি ভুবন বিজয়ী॥
পরিত্রাহি পরিত্রাহি পর্ব্বত-পুত্রিকা।
শিবে সর্ব্বাস্বরি* শিবা সর্ব্বত্রে সাধিকা॥
অনন্য গতিক মাতা মুই পাপমতী।
মুই উদ্ধার হৈতে আর নাহি গতি॥
উপরে আকাশবাণী হৈল ঘোরতর।
না কাট না কাট মোর দাসীর কোয়রা†॥
অলক্ষ্মী না হৈব যদি পুরীতে প্রবেশ।
অর্দ্ধরাজ্য সহিতে পাঠাও নিজ দেশ॥১২০
ত্রাসে শালবাহনে করিল কন্যাদান।
বন্দি হোতে ধনপতি আনে বিদ্যমান॥
পিতা পুত্র পরিচয় হৈল সেই ঠাই।
চলিল উজানি ডিঙ্গা সকল সাজাই॥
পূর্ব্বে জথ ডিঙ্গা সাজাইছিল ধনপতি।
মঙ্গলচণ্ডিকার বরে পাইলেন শ্রীপতি॥
ডিঙ্গা সব সাজাইয়া মহা মহারঙ্গে।
ঘাটেতে লাগাইল নৌকা সর্ব্ব মহারঙ্গে॥

অর্ঘ মঙ্গল দিল লহন[illegible]না।
ঘরে নিল পতি পুত্র [illegible] তিনজনা॥
ভেট লৈয়া ভেটিবারে গেল নরবর।
নমস্কার করিলেন্ত সাধুর কুমার॥
শুনি শ্রীপতির পাটন কতুক* রহস্য।
শ্রীপতিরে কন্যা বিহা দিবাম অবশ্য॥
ঘরে ঘরে মঙ্গল করেন অনুষ্ঠান।
বিক্রমকেশরী রাজা কৈল কন্যাদান॥
প্রসাদে সুন্দর মণি মাণিক্য নির্ম্মিয়া।
তার মধ্যে অষ্টদল প্রতিমা স্থাপিয়া॥
বিল্বপত্র অখণ্ড ষোড়শ উপচারে।
পূজরে (পূজয়ে?) মঙ্গল চণ্ডী মঙ্গল বাসরে॥১৩০
নানাবিধ বলি দেহি জথেক বিহিত।
পঞ্চশব্দি (শব্দে?) বাদ্য বাজে হৈয়া হরসিত॥
জয় জয় জননী জগত সনাতনী।
নরকে না কর গতি নম নারায়ণি॥
ভবানী ভিতিকা ভূতা হর ভগবতী।
জন্মে জন্মে হৌক তুয়া চরণেতে গতি॥
ইহ জন্ম অরোগিতা বিপক্ষ বিনাশ।
পরলোকে হৌক গৌরীপুরেতে নিবাস॥
পুত্রে পৌত্রে অভিরামে বাড়ে ঠাকুরাল।
তিলমাত্র আপদে না লংঘে কোন কাল॥
যাবত জীবন মাতা তুয়া গুণ গাই।
মত্যুকালে রাতুল চরণে দিবেন ঠাই॥১৩৬

"ইতি চৈত্র মাহাত্ম্য সমাপ্ত।"

শাকে রসাবাণ শৈলেন্দুবামা।
ঋষের্ভানু প্রাহ সূর্য্যসুতঃ থরামা (?)॥

শ্রীরামগতি আচার্য্যাক্ষরস্চ শ্রীরামতনু সর্গার পুস্তিকচ্চ॥ সন ১১৯৬ মঘী তারিখ ৩০ চৈত্র। ফুলবির্মুদিন শনিবারে বেহান বাদে সমাপ্তঃ॥"

পরিশেষে বলা উচিত যে, এই পুঁথিখানি চট্টগ্রাম—পটীয়া উচ্চ ইংরেজী স্কুলের পণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীআবদুল করিম।

* সর্ব্বাস্বরী—সর্ব্বেশ্বরী। † কোয়র—কুমার।

* কতুক—কৌতুক?

পদ্মা।

১

কত ভালবাসি পদ্মা, আমি তব জল,
কত আশা ক্রোড়ে করি,
কত শক্তি বুকে ধরি,
কত দূর হ'তে আসে করি কল্ কল্,
কত সন্তাপের তনু করিয়া শীতল।

২

প[illegible]নি শরীরে, পদ্মা, আজিও শৃঙ্খল,
উন্মুক্ত প্রবাহরাশি,
উন্মত্ত পরাণে হাসি,
ধায় যেন মন্ত্রপূত রজত তরল,
অথবা আবেগে গলি প্রবৃত্তি প্রবল।

৩

ধর না হৃদয়ে কোন ফুল্ল শতদল,
পারে না তব শকতি,
সহিতে কুলযুবতী,
পঙ্কিল তড়াগে গিয়া হাসে খল্ খল্;
বঙ্গ-বামা-সম শুধু প্রাঙ্গনে উজল।

৪

উদ্দাম কেশরীসম সমীর চঞ্চল,
প্রস্ফুটিত প্রেমাবেশে,
তোমার হৃদয় দেশে
ঢালে আলিঙ্গন রাশি যবে সুবিমল,
তাণ্ডবে কতই স্ফীত তব বক্ষঃস্থল।

৫

কত ভাঙ্গ গড় তুমি দেবতা [illegible],
কত বর, কত শাপ,
কত [illegible] কত পাপ,
কতই অমৃতধারা, কত হলাহল,
তোমার প্রসাদে ভুঞ্জে ভ্রান্ত ধরাতল।

৬

এখনো আশঙ্কা মাখা তোমার কবল,
এখনো দর্পিত নর,
তোমা দেখে পায় ডর,
এখনো অদৃষ্টবল করিয়া সম্বল,
ভাসে তব বক্ষে বঙ্গতরণীর দল।

৭

প্রদোষ রক্তিমাধারী জলদ পটল,
ও বিশাল বক্ষদেশে,
খেলে যবে হেসে হেসে,
তরঙ্গের নৃত্যে তব হইয়া বিভল,
কতই কৌতুকে দেখে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল।

৮

জন্মিয়াছি বঙ্গভূমে সরস শ্যামল,
দেখিনি সমুদ্রবারি,
দেখিনি আগ্নেয়গিরি,
দেখিনি গর্ব্বিত হ্রদ তুষারে ধবল,
যা কিছু ভীষণ দেখি তোমার ও জল।

৯

দুর্ব্বল এ মাতৃভূমে সকলি দুর্ব্বল,
গো মেষ মনুষ্য হয়,
দীপ্ত দুর্ব্বলতাচয়,
সবল পশ্চিম ত্যজি তুমিই কেবল,
তাই এত ভালবাসি, পদ্মা, তব জল।

১০

ঘিরে আছে চারিদিকে মৃদুতা কোমল,
কোমল তেজের হাসি,
কোমল কবির বাণী,
সজীব নির্জীব মাঝে তুমিই কেবল,
তাই এত ভালবাসি, পদ্মা, তব জল।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

স্বাবলম্বন।

অবনীশচন্দ্র বড়লোকের ছেলে; সেইজন্য তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন অবনীশচন্দ্র। তাহার পিতা দুর্গাপুরের প্রবল প্রতাপী জমিদার। সুতরাং অবনীশের নাম অন্বর্থ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অবনীশের শৈশবে পদ্মার কোপদৃষ্টি ও রাক্ষসী-ক্ষুধায় তাহাদের জমিদারীর অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তৎস্থানে দয়া করিয়া পদ্মা একটা চর অন্যত্র তুলিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে যাইয়া, উকিল কৌন্সলি বাকী জমিদারীটুকু গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। পদ্মা ও উকিলের কবলভ্রষ্ট যে সামান্য জমি উদ্বৃত্ত রহিল, তাহাতে পূর্ব্বানুসৃত চাল-চলন বজায় রাখিতে গিয়া প্রকৃত দারিদ্র্য আসিয়া তাহাদিগকে পাইয়া বসিল। অবনীশের নাম শূন্যার্থক হইয়া পড়িল।

অবনীশ স্কুলে পড়ে। সে স্বশ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেধাবী-ছাত্র। বিনয়ী, শান্তশীল ও সচ্চরিত্র। সে জলপানী আদায় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে লাগিল। সকলে আবার মনে করিতে লাগিল, অবনীশ চাকুরি করিয়া অবনীশ হইতে পারিবে।

অবনীশ যথারীতি ছাত্র-জীবনেই কবিতা-রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে লেখক-বৃত্তি অবলম্বন করিল।

লোকে মনে করিল, অবনীশের এইবার অবনীশ হইবার আর কোন আশা নাই। বঙ্গের লেখকগণকে রচনা ক্ষমতা দেখিয়া প্রায়ই বিচার করা হয় না, নামে বিচার। অবনীশ অজ্ঞাতনামা; তাহার উচিত ছিল, কোন অপ্রথিত-নামা বিজনবাসী পত্রিকার পরিচিত বা সুপারিশে পরিচিত সম্পাদকের শরণাপন্ন হওয়া। তিনি নামটা একটু চালাইয়া দিলে শনৈঃ শনৈঃ উচ্চে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অবনীশ এরূপভাবে আত্মপ্রসার ঘৃণা করিতেন এবং কোন সম্পাদকের পুত্রকে আদর করিয়া তাঁহার মন ভিজাইতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন। কাজেই তাঁহার কোন রচনা আজ পর্য্যন্ত ছাপায় উঠিল না।

সংসার এদিকে অচল হইয়া উঠিয়াছে। পিতামাতার কাতরতা, প্রতিবেশীর শূন্য-স[...]নুভূতি, গ্রামবৃদ্ধের অমূল্য প্রশ্নবচন, অবনীশকে চিন্ত[...]চ করিয়া তুলিল। অবনীশের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া পড়িল। তাহার স্ব-বিবেচনায় তাহার যেটি শ্রেষ্ঠ রচনা, তাহা লইয়া সে একজন নামজাদা সম্পাদকের সহিত বহুকষ্টে সাক্ষাৎ করিল। সম্পাদক রচনা পড়িয়া বিজ্ঞভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, একরকম, চলন-সই হইয়াছে বটে, কিন্তু তুমি অজ্ঞাত-লেখক, বিবেচনা করিয়া দেখিব। দুই একটা প্রকাশিত হওয়ার পর রচনার মূল্যের কথা উত্থাপন করিও।" কোন প্রবন্ধ-দুর্ভিক্ষের মাসে অবনীশের রচনাদ্বারা সম্পাদক পত্রিকার পাদ-পূরণ করিলেন। গুণগ্রাহী-পাঠকগণ মনে করিলেন, "সম্পাদক জহুরি বটে, কোন্ নিভৃত খনি অন্বেষণ করিয়া এ মহারত্ন আবিষ্কার করিলেন।" অবনীশ হাসিলেন, আর হাসিলেন সম্পাদক।

সম্পাদককুল লেখকের মুখাপেক্ষী ও প্রসাদ ভিখারী হইয়াও আপনার গম্ভীর চাল ছাড়েন না। সম্পাদক অবনীশকে আমলই দেন না। তিনি বলেন, "ও রকম abstruse বিষয় কয়জন লোকে পড়ে? তোমার মন, তোমার ক্ষমতা যাহা লিখিতে চাহিবে, তাহা লিখিলে চলিবে না; লোকে যাহা চাহে, আমি পাঠকের মন বুঝিয়া যাহা ফর্‌মাস করিব, তাহাই লিখিতে হইবে।"

অবনীশ সাময়িক পত্র ছাড়িয়া গ্রন্থ প্রণয়নে মনসংযোগ করিলেন। অর্থাভাব। ছাপাইবার জন্য প্রকাশকদিগের শরণাগত হইতে হইল। তাঁহারা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া সকলেই একই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন, "দর্শন, বিজ্ঞান কে পড়িবে? সমালোচনা অর্থাৎ একটু সভ্য-ধরণে কড়া-গালাগালি, নাটক নভেল যদি লিখিয়া আনিতে পার, তখন দেখা যাবে।" আবার ফর্‌মাস!

অর্থাভাব বড় কড়া প্রভু! মন যাহা না চায়, সে তাহা করায়। অবনীশ নাটক লিখিয়া অর্থ সংগ্রহ ও বঙ্গের নাট্যসমাজ সংশোধন করিবেন, স্থির করিলেন। থিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয়েরা দুই একখানি নাটক দেখিয়া হাস্যমধুর স্বরে বলিলেন, "বাপু, শুধু বক্তৃতা, শুধু sermon, শুধু moral philosophyর পাঠ দিলে, কি কেহ এ নাটকের অভিনয় দেখ্‌তে আসিবে? রং বে-রঙের নাচ গান চাই, একটু শ্রুতিকটু অশ্লীল ইয়ারকি চাই,

বাঙাল কি ব্রাহ্মকে একটু [...]-কটাক্ষ করা চাই, তবে ত পালাটা জমিবে। এগুলে[...] cast করে, ঐ রকম করে' এনো, দেখা যাবে।" আ[...]র সেই ফর্‌মাস!

শিশুপাঠ্য পুস্তক। Text-Book Committeeর মহামহোপাধ্যায়দিগকে তুষ্ট করিবার মত নীচতা স্বাধীনচেতা অবনীশের ছিল না। সে ক্ষেত্রেও বিফল মনোরথ।

সংসার অচল; অর্দ্ধাশন অনশন। একদিন বকুলতলে শান-বাঁধান বেদীর উপরে গ্রামবৃদ্ধদিগের পাশা ও তামাক এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের তিব্বতে অনধিকার প্রবেশ, রুষ-জাপানের যুদ্ধ, ডেরাডুনের দাঙ্গা, ভাগলপুরের প্লেগ, কংগ্রেসের উপকারিতা, নফর দারোগার কুকীর্ত্তি, লেডি লাটের পোষাক, তাতার দান, তিলকের প্রতি রাজরোষ, হনলুলুর সভ্যতা প্রভৃতি বহু জ্ঞাত অজ্ঞাত বিষয়ের অনধিকার চর্চ্চা চলিতেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ অবনীশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দারিদ্র্যব্যঞ্জক পরিচ্ছদে উন্নত-মস্তকে সেই পথে যাইতেছিল। এক বৃদ্ধ ডাকিলেন। অবনীশ আহ্বান-হেতু বুঝিল, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক নম্রতায় সে শুনিতে বাধ্য হইল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ হে, তুমি নাকি একটা চাকুরি হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছ? কেন, এ আবার কি পাগলামি?

অবনীশ। আমি চাকর হ'তে পারিব না।

বৃদ্ধ। এঃ, পাগল ছেলে। বাঙ্গালিকুলে যেদিন জন্মেছ, সেদিন জেনেই জন্মেছ, যে তুমি চাকর। 'গোলামের জাতি শিখেছ গোলামি,' আরে, তা' ছাড়া আর উপায় কি?

অবনীশ তর্ক করিতে নারাজ। শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বলিল, "বেতনও বড় সামান্য ছিল। মোটে পঁচিশ টাকা দিতে চায়। আমার শত অভাব সত্ত্বেও আমি আমার শিক্ষার অমর্য্যাদা করিতে পারি না।"

বৃদ্ধ। এঃ, বোকা ছেলে, আরে গভর্ণমেণ্টের কাজে উপরি কত? এই হারাধনের বাপ বামাচরণ মাইনে আর কত পেত? হৌসের মুৎসুদ্দি ছিল, যাবজ্জীবন দোল দুর্গোৎসব ঘটা করে' করেছে; মরবার সময় ছেলের জন্যে কোম্পানির কাগজে দু'টি লক্ষ টাকা রেখে গেল। ঐ বেণীর বাপ রামেশ্বর কমিসেরিয়েটে ১৬৲ টাকা মাইনের সরকার ছিল। তার ছেলেরা বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়েও এখনো বচ্ছরে দশহাজার টাকা মুনফা আছে। বাপু মাইনেতে কি করে, উপরি আয়ই ত' আয়।

অবনীশ। আমাকে চুরি করিতে বলিতে আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। দেশের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, চুরি করাটাও প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আরো গভর্ণমেণ্টের চাকুরি বলিয়াও আমি চাকুরি গ্রহণ করি নাই।

বৃদ্ধ একটু ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কেন, গভর্ণমেণ্টের চাক্‌রীই ত' চাক্‌রী, বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়া পেন্সন খাওয়া যায়। আর যদি চাকর হইতে হয়, অবনীশ, রাজার চাকর হওয়াই ত ভাল।

অবনীশ। আমাদের রাজা কৈ? আমাদের দেশ বহুরাজার শাসনাধীন। গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে শুধু গভর্ণ বা শাসন করেন, প্রীতির চক্ষে দেখেন না, গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আদেশ প্রচার করিয়া দেশের সমস্ত পদ স্বজাতি ও স্বজাতির এদেশজ-বৎসদিগের জন্য রাখিয়া চাকুরিগত-জীবন-বাঙালীকে মুষ্টিমেয় অন্নসংগ্রহেও বঞ্চিত করিতেছেন। সে অবস্থায় সামান্য চাকুরি গ্রহণে লাভ কি? আমার মতে স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত।

বৃদ্ধ একটু কাশিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মত সব বাঙালী ক্ষেপিয়া উঠে নাই, তাই আজো দেশে দুই চারিটা লোকের মুখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নতুবা দুর্ভিক্ষ দ্বিগুণতর হইত।

অবনীশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আপনারা এই সোজা কথাটা বুঝেন না কেন? দেশী লোক অল্প পয়সায় পাওয়া যায়, কাজও ভাল হয়। দেশী কর্ম্মচারী ব্যতীত গভর্ণমেণ্টের চলা দুষ্কর। আরো এদেশে গভর্ণমেণ্ট অধিক সাহেব আমদানি করিবে না, আমেরিকার কাণ্ডটা এখনো ইংরাজ বিস্মৃত হয় নাই। যদি এখন সব দেশী লোক চাকুরি ছাড়িয়া দেয়, কাল গভর্ণমেণ্টের কাজ অচল হইয়া উঠিবে, টেলিগ্রাফে বিলাত হইতে লোক আনাইলেও কুলাইবে না। তখন অবশ্যই গভর্ণমেণ্ট আমাদের ন্যায্য দাবী পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবেন। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রীতিতে কিছু আদায় করিবার আশা করা দুরাশা মাত্র।

বৃদ্ধ। তবে তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ?

অবনীশ। ব্যবসায় বা ঠিকার কাজ করিব স্থির করিয়াছি।

বৃদ্ধ। পুঁজি?

অবনীশ। দুই চার টাকা আমার সঙ্গে আছে।

অবনীশ চলিয়া গেল। এক বৃদ্ধ অপর বৃদ্ধের হাতে হুঁকা চালান করিবার উপলক্ষে চোখ টিপিয়া বলিলেন, "র‍্যালে সাহেবের 'Discontented B. A.' নমুনা দেখিলে।" পূর্ব্ব বৃদ্ধ বলিলেন, "ছোঁড়া কতকগুলো পাশই করিয়াছে, বিদ্যাবুদ্ধি বড় একটা হয়নি।" আর একজন বলিলেন, "কতকগুলো কেবল কুতর্ক করিবার ক্ষমতা হয়েছে।" আর এক বৃদ্ধ বলিলেন, "ওর চেয়ে আমার শিবে ছোঁড়া ভাল। বি, এ, ফেল্ ক'রে দারোগাগিরি নিয়েছে। মাহিনা ৩০ টাকা হ'লে কি হয়, মাসে উপরি রোজগার দু তিন শ টাকা করে থাকে।" ইত্যাকার সমালোচনা চলিতে লাগিল। সেদিনকার পাশা খেলার আসরটা ভাল জমিল না।

অবনীশের প্রবন্ধ মাঝে মাঝে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। বাঙলা মাসিকে লিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের আশা দুরাশা। পত্রিকার গ্রাহকই বা কোথায় যে সম্পাদক প্রবন্ধের মূল্য দিতে পারেন। একটি পত্রিকার সম্পাদক কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাইবেন, অবনীশকে পত্রিকা পরিচালনের ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। অবনীশ চাকুরি হিসাবে নহে, ঠিকা হিসাবে ভার গ্রহণ করিল। সম্পাদক কতকগুলি নাম করা লেখকের প্রবন্ধ দিয়া বলিলেন, "খবরদার, ইঁহাদের বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণাশুদ্ধিও ভয়ে ভয়ে সংশোধন করিবেন, আর কিছুতে হাত দিবেন না। যাঁহারা তেমন নহেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে একটু আধটু descretion খাটাইবেন।" তথাস্তু। কিন্তু প্রবন্ধগুলি দেখিয়া অবনীশের ক্ষোভ হইতে লাগিল, মহাপ্রভুদিগকে তাঁহাদের নিজের বেশে সাধারণে উপস্থিত করে। বর্ণাশুদ্ধি ব্যাকরণাশুদ্ধি ও অস্পষ্ট জটিল রচনাতেই অনেকের কৃতিত্ব ও বাহাদুরী। অবনীশ বুঝিল, ছাপান রচনার অধিকাংশই সিংহ-চর্ম্মাবৃত-গর্দ্দভের ন্যায়, পরের খোলসে আত্মগোপন করিয়া বাহির হয়।

অবনীশের ঠিকার চুক্তি ফুরাইয়া গেল। এক মহাজনের পণ্য বিক্রয় করিয়া দিবার ভার লইয়া সে চট্টগ্রামে নৌকা লইয়া রওয়ানা হইল। সন্দীপের নিকট নৌকা ডুবিল। অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত। কাহারো নিকট যাচ্ঞা করিতে সে ঘৃণাবোধ করিল। মিঞাজান নামক ঠিকা গাড়ীওয়ালার নিকট কোচম্যানী স্বীকার করিল। দুই তিন সপ্তাহ নানা উপায়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েকটি টাকা উপার্জ্জন করিয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

কলিকাতায় আসিয়া তাহার একটিমাত্র টাকা পুঁজি। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সে ছোট আদালতের নিকটে একটা পানের দোকান করিয়া বসিল। পান আর তামাক সে ভদ্রভাবে সকলকে দিত। তাহার বহু সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ হইত। কেহ বি, এ, এম্, এ, পাশ করিয়া ২০৲ টাকায় এপ্রেন্টিস্, কেহ বা ২৫৲।৩০৲ টাকার permanent হইয়াছেন। অবনীশের স্বাধীন চেষ্টার রোজগারও মাসে ২৫৲।৩০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভদ্র চাকরগণ অভদ্র পানওয়ালার সহপাঠীরূপে পরিচিত হইবার ভয়ে, অবনীশের দোকানের দিকে ঘেঁসিতেন না। যাহাই হউক, অবনীশের ভদ্রতা ও বিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া এবং (প্রকৃত কথা লুক্কায়িত থাকে না) তাহার সৎসাহস দেখিয়া বহু ভদ্রব্যক্তি তাঁহার খরিদদার হইয়াছিলেন। তাঁহারা অবনীশকে সিগারেট রাখিতে অনুরোধ করিতেন। অবনীশ বলিত, "দেশের কষ্টার্জ্জিত পয়সাকে বিলাতী ভস্মে পরিণত করিয়া লাভ কি? দেশী সিগারেট কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন, রাখিব।"

অবনীশ পথে চলিতেন, উন্নত-মস্তকে, সামান্য স্বদেশজ পরিচ্ছদে; আর লোকে কাণাকাণি করিত, "এম, এ, পানওয়ালা।" অমনি এডিসনের "Dignity of Labour সৎসাহস প্রভৃতির আলোচনা ত্রিংশৎ মুদ্রার এম, এ, চাকরদের মুখে ফুটিয়া উঠিত। অবনীশ হাসিত। প্রত্যেক নূতন কাজে প্রশংসা ও নিন্দা দুইই অবশ্যম্ভব।

আয় যখন ৩০৲।৪০৲ টাকায় উঠিল, অবনীশ পানের সঙ্গে খাবারের, মিষ্টান্নের দোকান করিলেন। দুই জন কারিকর নিযুক্ত হইল। প্রথম প্রথম আয় ব্যয় সমান সমান চলিতে লাগিল। অবনীশ বুঝিলেন, এ ব্যবসায়ে লাভ হইবে। ক্রমে লাভ একশত টাকায় উঠিল। মিষ্টান্নের ব্রাঞ্চ দোকান হাইকোর্টের নিকট, হাবড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেসনের নিকট, বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে ক্রমে ক্রমে খুলিতে লাগিল। তাহার দুর্দ্দিনেও যে সকল বাল্যবন্ধুর শ্রদ্ধা ও প্রীতি নষ্ট হয় নাই, তাঁহাদের কয়েকজনকে সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের কৌলিক সাধের চাকুরি ছাড়াইয়া এই ব্যবসায়ে গ্রহণ করাইল এবং সকলকে এক একটি দোকানের কর্ত্তা করিয়া দিল। নিজে একখানা বাইসিকেল কিনিয়া সকল দোকান দেখিয়া বেড়াইত; এবং এক্ষণে অবসর হওয়ায় তাহার চিরেপ্সিত সাহিত্য-চর্চ্চা আবার আরম্ভ করিতে পারিল।

মিষ্টান্নের দোকানগুলি ক্রমশঃ ভদ্রতর হইতে লাগিল। প্রত্যেক দোকানে দুইটি ঘর; একটি হিন্দুদিগের, অপরটি অহিন্দুদিগের। কাঁসা পিতলের বাসন ভাল মাজা না হইলে ভদ্রলোকে ব্যবহার করিতে চাহেন না; এবং একের ব্যবহারের পর তাহা খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার না করিলে ব্যবহারে রুচি হয় না। এজন্য আজকাল অনেকে বিলাতী এলামেল বা কাচপাত্রের বিশেষ পক্ষপাতী। অবনীশ বিদেশকে পয়সা দিতে নারাজ, এলুমিনিয়ম ধাতুর একশতপ্রস্ত পাত্র তাহার প্রত্যেক দোকানে, কাহাকেও কাহারও উচ্ছিষ্ট পাত্রে খাইতে হইত না। এবং যেমন কতকগুলি ব্যবহার হইয়া যাইত, অমনি তাহা পরিষ্কৃত হইয়া থাকিত। অবনীশের এই স্বদেশপ্রীতি, ব্যবসায়-বুদ্ধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সকল ভদ্রলোক তাহাকে ভালবাসিত। তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ইণ্ডিয়ান মিরর, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, নেশন, নিউ ইণ্ডিয়া, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, প্রতিবাসী প্রভৃতি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রভৃতি বহু কাগজের স্বত্বাধিকারী তাহার দোকানে বিনা মূল্যে বা বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তে কাগজ দিতেন; ইহাতেও বহু ভদ্রলোক তাহার দোকানে আকৃষ্ট হইত। ইহাই তাহার দোকানের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব।

অবনীশ সকল বন্ধুকে মিলাইয়া অপর একটি যৌথ কারবার আরম্ভ করিল। কুড়ি টাকায় উৎসর্গিত-জীবন-বন্ধুগণ উন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অবনীশের ব্যবসায় সুদূর প্রথিত হইয়া উঠিল।

ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য অবনীশকে মধ্যে মধ্যে বিদেশে যাইতে হইত। সমাজের ভ্রূকুটি ভয়ে সে সমুদ্র

পারে যাইতেও কুণ্ঠিত হইত না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সে এক দোকান করিয়া ফেলিল।

এই জন্য সে কয়েক বৎসর দেশে আসিতে পারে নাই। যখন সে গৃহে ফিরিল, [illegible] দারিদ্র্যও যে সকল বন্ধুকে [illegible] রাখিয়াছিল, অর্থ-সম্বন্ধ তাঁহাদের অধিকাংশকেই [illegible] থাকিতে দেয় নাই। অবনীশ ব্যথিত হইল, কিন্তু কিছু না বলিয়া যৌথ কারবার হইতে আপনার অংশ বাহির করিয়া লইল, যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহাও সে পাইল না। সে ক্ষুণ্ণ নহে, যাঁহাদের নিকট সে অজস্র উপকার পাইয়াছে, তাঁহারা যে দয়া করিয়া তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সে আপনাকে কথঞ্চিৎ ঋণমুক্ত মনে করিয়া আশ্বস্ত হইল। কিন্তু মানুষের চিত্তকে বিশ্বাস নাই, বন্ধুপ্রীতি এখনও অটুট আছে, কিন্তু চিত্ত যদি ঘাতসহ না থাকে। এই জন্য সে ব্যবসায়-সংস্রব ত্যাগ করিল।

ভদ্র দরিদ্র গৃহস্থের পছন্দমত একটি কন্যা বিবাহ করিয়া অবনীশ দক্ষিণাফ্রিকায় চলিয়া গেল। উদ্যোগী-পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন। ইংরাজ বুয়ারের শত অত্যাচার অবিচার হইতে স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিয়া নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া অবনীশ ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে লাগিলেন। বিদেশবাসী স্বদেশীদিগের মধ্যে জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রীতি বৃদ্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন।

এদিকে পদ্মার কৃপায় অবনীশের নষ্ট জমিদারী জাগিয়া উঠিল। অবনীশ দেশে বিদেশে ইচ্ছামত থাকিয়া দেশের কল্যাণে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে লাগিল। অবনীশ এখন যথার্থ অবনীশ।

আমাদের দেশে এরূপ অবনীশের যথেষ্ট আবশ্যক রহিয়াছে, যাঁহারা দেশহিতে নিযুক্ত হইবেন এবং এই হতভাগ্য অধঃপতিত জাতিকে স্বাবলম্বন ও dignity of lobour নিজের চরিত্র দিয়া বুঝাইয়া দিবেন। পশ্চাতে যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ঠেলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সে স্রোত শুধু একটা পন্থা চায়, সম্মুখের ক্ষীণ বাঁধটা আরো কয়েকজন অবনীশ মিলিয়া একটু ভাঙিয়া দিতে পারিলেই হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্যর জর্জ্জ বার্ডউড্।

ভারতবন্ধু স্যর জর্জ্জ বার্ডউড্ মহোদয়ের নাম অনেকের নিকট পরিচিত। অদ্য আমরা তাঁহার সম্বন্ধে গোটাকতক কথা প্রদীপের পাঠকগণের নিকট বলিব।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর জর্জ্জ খৃষ্টোকার মোলেস-ওয়ার্থ বার্ডউড্ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেলগামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরলোকগত জেনারেল খৃষ্টোফার বার্ডউডের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বার্ডউড প্রথমতঃ বিদ্যা অধ্যয়নার্থ প্লাইমাউথে নিউ গ্রামার স্কুলে প্রেরিত হন এবং তৎপর এডিনবর্গ ইউনিভার্সিটিতে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এম, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেই বৎসরেই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসা বিভাগে নিযুক্ত হন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া বার্ডউড্ কালুদঘি, সাউদারেন মারাট্টা হর্সের (Southern Mahratta Horse) ভার প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরের শেষ ভাগে তিনি সোলাপুরে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নে স্থানান্তরিত হন। এখানে তিনি সময় সময় অষ্টম মান্দ্রাজ কেভেলরি, তৃতীয় বোম্বে ইনফেন্ট্রি এবং সিভিল ষ্টেসনের চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি মহামান্য কোম্পানীর 'অযোধ্যা' জাহাজের মেডিক্যাল চার্জ্জ পাইয়া পারস্য সাগরে গমন করেন। তিনি মোহাম্মরা অবরোধের সময় উপস্থিত ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার এখানকার কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী স্বর্ণ-পদক পুরস্কার দেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বার্ডউড্ বোম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের এনাটমি ও ফিজিওলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ভারত পরিত্যাগ পর্য্যন্ত তিনি প্রায় সকল সময় অধ্যাপকের কার্য্যেই নিরত ছিলেন।

লর্ড এলফিন্‌ষ্টোন স্বপ্রতিষ্ঠিত 'গভর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল মিউজিয়ামে'র উন্নতিকল্পে চেষ্টিত ছিলেন। বার্ডউড্ বেলগাম, কালুদঘি, সোলাপুর হইতে শুষ্ক চারাগাছ, মৃতপক্ষী প্রভৃতি নানা প্রকারের বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই যাদুঘরের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। লর্ড এলফিন্‌ষ্টোন তাঁহার অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যাদুঘরের সেক্রেটারি ও কিউরেটর নিযুক্ত করেন। এই সময় বার্ডউড, প্রসিদ্ধ হিন্দুচিকিৎসক ডাঃ ভাউকো ধাজির (Bhawco dhajee) উৎসাহে ২০০,০০০ পাউণ্ডেরও অধিক ব্যয়ে ভিক্টোরিয়া য়্যালবার্ট মিউজিয়াম এবং ভিক্টোরিয়া গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভিক্টোরিয়া উদ্যানের নিমিত্ত বরোদার ভূতপূর্ব্ব গাইকোবাড়, মহারাজা কুণ্ডোরো প্রভৃতি বার্ডউডের দ্বারা প্রায় ৩৫০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে মহারাণীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আনয়ন করান। এই প্রস্তরময়ী-মূর্ত্তি এখন এস্‌প্লানেডিতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সময় বার্ডউড তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Cotalogue of the Economic Products of the Presidency of Bombay' প্রকাশ করেন। তাঁহার ভারত পরিত্যাগের পূর্ব্বে ইহা দুইবার মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থখানি কেবল ভারতেই আদৃত হয়, এমন নহে, ইংলণ্ডেও ইহার সমধিক আদর হইয়াছিল এবং ফ্রান্সের অধ্যাপক Garcin de Tassy উহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

সার্জ্জন মেজার এইচ, জে, কার্টার এফ, আর, এস, পদত্যাগ করিলে, বার্ডউড্ বোম্বের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক হন। তাঁহার হস্তে সোসাইটি পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিল। তিনি এই সময়েই উক্ত কার্টার মহোদয়ের পদত্যাগে, এলফিন্‌ষ্টোন ভাণ্ডারের এবং বোম্বের শিক্ষাভাণ্ডারের সম্পাদক মনোনীত হন। সার্জ্জন হেইনিসের (Haines) মৃত্যুর পর তিনি স্যর আলেক্‌জাণ্ডার গ্রাণ্ট কর্ত্তৃক এবং তৎপর দুইবার সিনেট কর্ত্তৃক বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। তিনি এই সকল কার্য্য প্রশংসার সহিত নির্ব্বাহ করেন। এই সকল সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ থাকায়, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বের সেরিফ নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের একান্ত অনুরোধে Sir Bartle Frere, বার্ডউড্‌কে স্পেশল কমিশনার করিয়া প্যারিসের বিশ্বজনীন প্রদর্শনীতে (Universal Exhibition) প্রেরণ করেন। এই সকল কার্য্যে কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, পরে নানারূপ চিকিৎসাতে কোনরূপ ফল

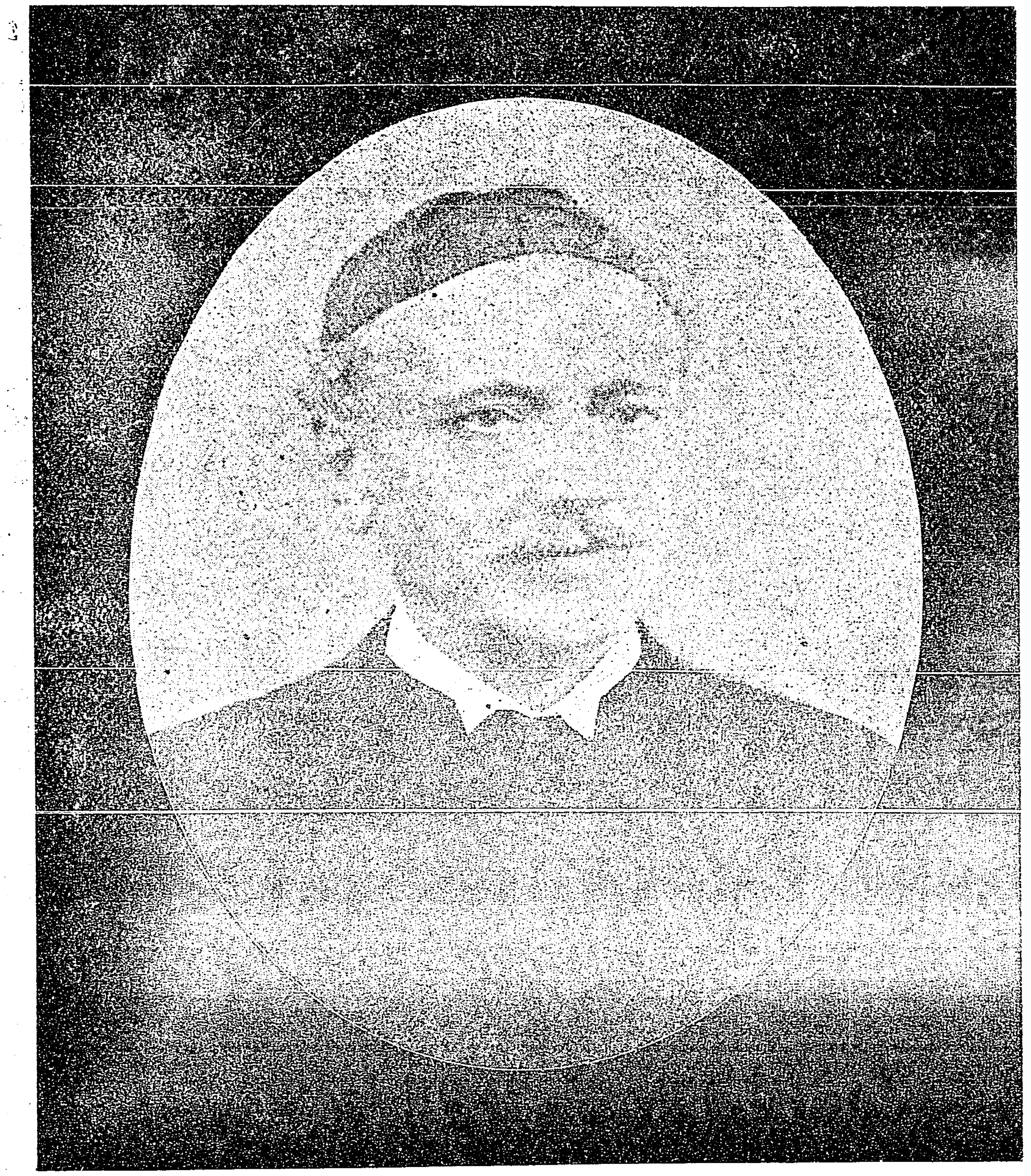

সার জর্জ্জ বার্ডউড্।

না পাওয়ায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করেন। বিদায়কালে তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি, ইউনিভারসিটী, এবং গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের ছাত্রবর্গের নিকট হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এগ্রি-হর্টিকালচারেলের অভিনন্দন-পত্রখানি মূল্যবান এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত। এত বড় প্লেটখানি 'প্রদীপে' প্রকাশ করিবার উপায় নাই, কাজেই আমরা কেবল পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। *

AN

ADDRESS

VOTED BY THE

AGRI-HORTICULTURAL SOCEITY

OF

WESTERN INDIA

TO

GEORGE C. M. BIRDWOOD

Honorary Secretary,

BOMBAY.

JULY, 1868.

পেন্‌সনের সময় হইবার পূর্ব্বেই যদিও বার্ডউড্ বাধ্য হইয়া কার্য্যত্যাগ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন,তথাপি বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারত-সেক্রেটারি তাঁহার জন্য বিশেষ পেন্‌সন নির্দ্দিষ্ট করেন। তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী ভিক্টোরিয়া ভারত-সাম্রাজ্ঞীরূপে বিঘোষিত হইবার সময়, দিল্লী দরবারে তিনি ভারত-নক্ষত্র (Companionship of the orden of the Star of India) উপাধিতে ভূষিত হন। বার্ডউড্ ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অল্পদিন পরেই 'Genus Boswellia' গ্রন্থ প্রচার করেন। এই পুস্তকে তিনি বিভিন্ন বৃক্ষাদির পরিচয় দিয়াছেন। তৎপর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'Hand-Book of the Indian Court'* এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে 'The Industrial Arts of India' গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থদ্বয় বহুস্থানের বহুব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তিনি যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'Officer of the Legion of Honor' এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নাইট উপাধি-গৌরবে ভূষিত হইয়াছিলেন।

১৮৮৬ সালে বার্ডউড্, রয়েল কমিশন, ঔপনিবেশিক কার্য্যকারী সভার এবং ভারতীয় প্রদর্শনীর সভ্য মনোনীত হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিস আন্তর্জাতিক

* The journal of Indian Art and Industry—Vol. VIII.—Illuminated cover of Address presented to Sir G. C. M. Birdwood.

* প্যারিস প্রদর্শনীর পর আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট এই পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

SANDRINGHAM, NORFOLK,
January 27, 1879.

My dear Dr. Birdwood,

The Paris Exhibition being now at an end, I am anxious to convey to you the expression of my warm thanks for the valuable services which you have been so good to render to the Royal Commission in connection with the Indian section. These services were of the greatest assistance to the members of that Committee in enabling them to overcome the difficulties which they encountered and in lightening their labours.

I wish to take this opportunity of saying that I cannot speak in too high a sense of the hand-book which you brought out on India. It is unusually acknowledged to be a work of importance and utility, and bears witness not only to the vast knowledge of act and the correct judgment of the just means of promoting the highest development of the industries of India which you possess, but it contains also some very valuable and novel contributions of the history of Indian and Eastern commerce, and, as such, it is much appreciated by learned foreigners and by the best judges at home.

Although but a slight return for the care and industry you have bestowed on the work, I propose to place the copyright of the hand-book at your disposal, and it will give me much pleasure to hear that you accept my offer.

In conclusion I have great satisfaction in sending you a print of myself, with my autograph attached to it.

Believe me, my dear Dr. Birdwood,
Very sincerely yours,
Albert Edward, P.

Dr. Birdwood, C. S. I.

প্রদর্শনীর, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সেকৃশনের চেয়ারম্যান হন। চিগাকো প্রদর্শনী প্রভৃতিতেও তিনি চেয়ারম্যান ও সভ্য হইয়াছিলেন।

বিভিন্ন প্রদর্শনীর সংস্রবে থাকিয়াও বার্ডউড্ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এল, এল, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হন।

বার্ডউড্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন কাগজ পত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথম ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে Athenæum পত্রে ইহার উল্লেখ করেন, তৎপর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এতৎসম্বন্ধে তাঁহার 'Report on the Miscellaneous old Records of the India Office' পুস্তক প্রকাশিত হয়; এই পুস্তক ১৮৮৯ এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়। তাঁহার পরামর্শানুসারে Messrs. H. Stevens & Sons ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'Court Minutes of the East India Company' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে বার্ডউড্ একটী বিস্তৃত মনোরম ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ বারণার্ড কোয়ারির 'First Letter Book of the East India Company' পুস্তক প্রকাশিত করেন, ইহার ভূমিকাও বার্ডউড্ কর্ত্তৃক লিখিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পাদন কালে বার্ডউড্ Hakluyt সোসাইটির সুযোগ্য সেক্রেটারি মিঃ উইলিয়াম ফষ্টারের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু বার্ডউডের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—ইংরেজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি করা। ১৮৮৫ সালে তাঁহার ভারতে প্রত্যাগমন হইতেই বোম্বের প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট তাঁহার নাম এতই সুপরিচিত হইয়াছিল যে সকলেই তাঁহাকে তাহার নিজের এক জন বলিয়া মনে করিত। তিনি তদ্দেশবাসীদিগের প্রতি যেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তাহারা তাঁহাকে আপনার জন করিয়া ফেলিয়াছিল। বোম্বাই কেন, ভারতের প্রত্যেক শ্রেণীর নিকট বার্ডউড্ প্রিয়, এবং ইহারই ফলে তিনি তাঁহার সমধিক প্রিয়ভূমি বোম্বে নানাবিধ শিক্ষা-মন্দির স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়া আফিসে স্পেশাল য়্যাসিষ্টাণ্টের কার্য্যে বিংশতি-বর্ষ নিযুক্ত থাকিয়াও বার্ডউড্ ক্ষণকালেরতরে ভারতের খনিজ ও শিল্পের উন্নতির চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। তাঁহার পূর্ব্বে ডাঃ ফর্‌বিস্ রয়েব ও ডাঃ জে, ফার্‌বিস্ ওয়াট্‌সন নামক দুই জন মহোদয় এ বিষয়ে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মিউজিয়াম বিজ্ঞান এবং শিল্পবিভাগের অন্তর্গত হয় এবং এই পরিবর্ত্তনের জন্য ইণ্ডিয়া আফিসে, ইণ্ডিয়ান প্রোডাক্টসের (Indian Products) রিপোর্টারের পদ উঠিয়া গেলেও, বার্ডউড্ ঐ কার্য্যই চালাইতেছিলেন। তিনি সরকারী কার্য্য ব্যপদেশে, এবং ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদিতে ভারতের উন্নতির কথাই বেশী আলোচনা করিতেন। তাঁহার ভারতত্যাগে, বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণই বিশেষ অভাব বোধ করিয়াছে। ইহাও নিরাপদে বলা যাইতে পারে যে, পশ্চিম ভারতের (Western India) কোন লোকই একবার বার্ডউড্ না দেখিয়া লণ্ডনে যান নাই। তিনি প্রত্যেক আগন্তুককেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন এবং সুমিষ্টবচনে আপ্যায়িত করিয়া ও তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া বিদায় দিতেন। বার্ডউড্ ইণ্ডিয়া আফিসের যে ঘরে থাকিতেন, তাহার স্যাম্পল্ রুম প্রভৃতির চিত্র ইণ্ডিয়ান আর্ট জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল প্রকাশ করিবার সুবিধা এস্থলে নাই। আমরা তাহা হইতে কেবল বার্ডউড্ মহোদয়ের সৌম্যমূর্ত্তি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুই পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

কফি ও উহার চাষ।

আমাদের দেশে চা-র আধিপত্য ক্রমে যতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কফি এখনও তাদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। এখন কোন কোন সৌখিনবাবু সখ করিয়া শীতকালের দিনে কখনও কখনও কফি পান করেন, এবং কলেজের কোন কোন ছাত্র পরীক্ষার সময় রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন মাত্র; নচেৎ প্রাতঃসন্ধ্যা দুগ্ধ চিনি-সহযোগে মিষ্টান্নপূর্ণ রেকাবির সহিত উদর পূরণের রূপান্তররূপে এখনও উহার ব্যবহার এদেশে প্রচলিত হয় নাই। শীঘ্র যে না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কফির ব্যবহার বৃদ্ধি হউক বা না হউক, উহার চাষ কি প্রকারে করিতে হয় তাহা জানিবার আমাদের প্রয়োজন আছে।

মনুষ্য অর্থের জন্য কত পরিশ্রম করিতেছে, কত মূলধন খাটাইয়া তবে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। ধনিগণের মধ্যে কেহ কেহ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, বিস্তর লোকজন রাখিয়া চা-বাগান করিয়া লাভবান হইতেছেন। কৃষকগণ ধান ফেলিয়া পাটের চাষ আরম্ভ করিতেছে। গৃহস্থগণ আম, কাঁঠালগাছ কাটিয়া কদলির চাষে মনোযোগ করিতেছেন। অল্পব্যয়ে যাহাতে অধিক লাভ হয়, সকলেই এইরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন এবং করাও কর্ত্তব্য। এই হিসাবে বাঙ্গালায় কফির চাষ আমাদের একটি চিন্তা ও পরীক্ষা করিবার বিষয়। ভারতবর্ষে উহার প্রচলন অধিক না হইলেও, শীতপ্রধানদেশে এবং এখানকার সাহেব মহলে, উহার আদর ও মূল্য কম নহে, অথচ আমার বিবেচনায় এখানকার মৃত্তিকা ও জলবায়ু কফি-গাছের পক্ষে অনুকূল এবং চা-র তুলনায় ইহার আবাদ সকল বিষয়ে সুবিধাজনক।

ঠিক কোন্ সময় হইতে কি সূত্রে মনুষ্যসমাজে কফির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। উহার সহিত মানুষের প্রথম পরিচয়ের বিষয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বস্তুবিচার' নামক বালকবালিকা-পাঠ্য-পুস্তকে যেরূপ লিখিয়াছেন, পাঠকের অবগতির জন্য এস্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—"আরবদেশীয় কতিপয় পশুপালক দেখিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের যে যে পশু কফি বৃক্ষের ফল খাইত, তাহারা রজনীতে অধিক নিদ্রা যাইত না এবং প্রফুল্লচিত্তে ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। তাহারা এই সংবাদ সন্নিহিত ধর্ম্মোপাসক-দিগকে জানাইলে পর, তাঁহারা সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিলেন যে, কফির যথার্থই উক্তরূপ গুণ আছে। অনন্তর তাঁহাদিগের হইতেই কফির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে নানাদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতে লাগিল।"

ইংলণ্ডে কফির উপকারিতার কথা আবিষ্কৃত হইবার অনেক পূর্ব্বে আফ্রিকার কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ কাফি ব্যবহার করিত। মধ্য ও পূর্ব্ব আফ্রিকা ইহার আদি উৎপত্তি স্থান। আফ্রিকাবাসিগণ কি প্রণালীতে ইহা ব্যবহার করিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পারস্যগণ কর্ত্তৃক আফ্রিকার মরুভূমি হইতে এসিয়াখণ্ডে উহা প্রথম আনীত হয়, তৎপরে আরব হইতে ক্রমে সমগ্র এসিয়া ও ইউরোপে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইতে লাগিল। ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ফ্রান্সে থিভেনট (Thevenot) নামক পরিব্রাজক কর্ত্তৃক প্রথম আনীত হয়। তৎপরে পাস্‌কোয়া (Pasqua) নামক একজন গ্রীক্ ভৃত্য উহা ১৬৫২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে প্রথম আনয়ন করে।

মোচা ও জাভাদ্বীপের কফি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সুমাত্রা দ্বীপেও কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথায় উহার বীজের পরিবর্ত্তে চা-র ন্যায় পাতা ব্যবহৃত হয়। সমগ্র পৃথিবীর আবশ্যকের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক অংশ একমাত্র আমেরিকার ব্রেজিল হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। জাভাদ্বীপের কফির বীজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং মোচায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। সিংহলদ্বীপে যে কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া খ্যাত।

কফিবৃক্ষের পত্রাবলী দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশীয় টগরগাছের পাতার ন্যায়, বর্ণ অপেক্ষাকৃত গাঢ় এবং মসৃণ। কফি বৃক্ষের পত্রহীন কাণ্ড বা শাখার দিকে দেখিলে সহসা শেফালিকা বৃক্ষের কাণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। গাছের অবয়বও দেখিতে বহুল পরিমাণে একটি অনতিবৃহৎ শেফালিকা বৃক্ষের অনুরূপ। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট এই উভয়

জাতীয় বৃক্ষ এক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য কি না জানি না। শেফালিবৃক্ষের ন্যায় কফিবৃক্ষের প্রথম বা আদিকাণ্ডের উপরিভাগ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ শাখা হয় এবং তাহারই প্রশাখা-গুলিতে ফল জন্মে। ফলগুলি অপক্কাবস্থায় উজ্জ্বল হরি-দ্বর্ণের থাকে, পাকিলে ঘোর লালবর্ণ ধারণ করে। আকার ছোট ছোট দেশীয় কুল বা বড় বড় বৈঁচি-ফলের মত। এই ফলের বীজমধ্যস্থ শস্য হইতেই পানোপযোগী কফি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে নিয়মে ফল হইতে বীজসংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা পরে বিবৃত হইবে। কফি বল ও ধাতুরক্ষকারক। ইহা পান করিলে রজনীতে নিদ্রা অল্প হইয়া থাকে।

কোন্ জমি কফি চাষের পক্ষে প্রকৃষ্ট, অথবা কোন্ জমি নিকৃষ্ট তাহার আলোচনা করা উপস্থিত সময়ে আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ এখনও আমার সে অভিজ্ঞতা জন্মে নাই এবং পরীক্ষার উপযুক্ত অবসরও হয় নাই। তবে বিশ্বাস, যে সকল ভূমিতে অধিকাংশ ফলকর বৃক্ষাদি ভালরূপ জন্মিয়া থাকে, সেই সকল ভূমিই ইহার চাষের পক্ষে অনুকূল। কৃষি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অল্প, কফির চাষও কুত্রাপি দেখি নাই। প্রায় তিন বৎসর গত হইল, লেখকের পিতাপিতৃব্যকর্ত্তৃক কোন সাহেবের একটি বাগানবাটী ক্রীত হয়। তথায় একস্থানে উনবিংশতি-সংখ্যক কফি বৃক্ষ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের কোনরূপ আবাদ না করা সত্ত্বেও প্রচুর ফলোৎপত্তি ও কফির আবশ্যকীয়তা চিন্তা করিয়া, বাঙ্গালায় উহার আবাদ লাভজনক কি না মনে মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় এবং তাহারই ফলে, সাধারণের চিন্তা করিবার অবসর প্রদানার্থে এই প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়াস। কৃষিতত্ত্ববিদ্ ও উদ্যানস্বামিগণের পরীক্ষা এবং ইহার বিষয় চিন্তা করা, একান্ত আবশ্যক মনে করি।

কিরূপ মৃত্তিকা বা সার কফি বৃক্ষের পক্ষে উপকারী তাহা ঠিক বলিতে না পারিলেও, সাধারণ মৃত্তিকায় উহা উত্তম জন্মিতে পারে। এই অনুমানের কারণ, উল্লিখিত গাছগুলি যেখানে আছে, তথাকার মৃত্তিকার কোন প্রকার বিশেষত্ব নাই, অথচ গাছগুলি বিলক্ষণ তেজস্বী ও ফল-দায়ক। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কৃষকগণ যে মাটীকে সাধারণতঃ দোআঁশ মাটী বলে, উহাও তাহাই, অর্থাৎ উহাতে এঁটেল ও বালির ভাগ প্রায় সমান আছে।

কফির আবাদের জন্য বিশেষরূপে স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয় না। সাধারণ উ[illegible]তির ন্যায় শীতাতপ-বায়ুসঞ্চালিত সমতল ভূমিতে উ[illegible] উৎকর্ষতা লাভ করি-লেও, সমস্তদিনব্যাপী প্রখর রৌদ্রহীন, ছায়া ও রৌদ্রপূর্ণ ফলকর বৃক্ষের উদ্যান মধ্যেও কফিগাছের আবাদ করা যাইতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ সখের বাগানের বিস্তৃত-পথ-পার্শ্বে অন্যান্য ফলকর অপেক্ষা কফি শ্রেণী দেখিতেও বেশ মনোরম, অথচ বৃক্ষপালনও সুবিধাজনক। কিন্তু ব্যব-সায়ার্থে আবাদ করিতে হইলে, একত্র সংলগ্ন বিস্তৃত মুক্ত-জমির প্রয়োজন, নচেৎ কফিফল বা বীজ সংগ্রহ করিতে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

বীজ হইতে কফির চারা করিতে হয়। এই চারা প্রথমে কিছুদিন হাপরে রাখিয়া, একটু বড় হইলে ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। যেমন তুঁষহীন ধান্য বা খোলাহীন কোন শস্যে বীজ প্রায় অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ বাজারে বিক্রীত আবরণহীন শুষ্ক কফিবীজ হইতে চারা উৎপন্ন হয় না। বপনোপযোগী বীজ কোথায় পাওয়া যায় বলিতে পারি না। কলিকাতার কোন কোন নার্শারিতে* চারা বিক্রয় হইয়া থাকে।

কফিক্ষেত্রে প্রতিবৎসর চারা রোপণ করিতে হয় না। একবার রোপণ করিলে বৃক্ষ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। কফির চারা শ্রেণিবদ্ধ করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। চারা বসাইবার পূর্ব্বে, প্রথমে ক্ষেত্র হইতে তৃণ লতা প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া একবার সমগ্র জমি খনন বা কর্ষণ করা কর্ত্তব্য। স্থান প্রস্তুত হইলে রজ্জু ফেলিয়া পাঁচ ছয় হস্ত ব্যবধান একটি করিয়া চারা সারমিশ্রিত মৃত্তিকার সহিত রোপণ করিলে ভাল হয়। অস্থিচূর্ণ-সার কফিগাছের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। গোময়ের সার, রেড়ি বা সরিষার খৈলও দেওয়া যাইতে পারে। কফি বাগানের প্রতি সারিগুলির মধ্যে ব্যবধান অন্ততঃ সাড়ে ছয় বা সাত হাত হইলে ভাল হয়। চারা রোপণ করা হইলে যত্ন সহকারে তাহার পালন করিতে হয়। গাছ কিছু

* Cossipore Practical Institution, Cossipore; Manicktola Nursery এবং Bengal Nursery, Manicktola এই তিন স্থানে চারি আনা হইতে আট আনা মূল্যে এক একটি কফির চারা বিক্রয় হইয়া থাকে

বড় হইলেও শীত ঋতুতে মৃত্তিকার রসাভাব বোধ হইলে সময়ে সময়ে জলসেচন আবশ্যক এবং প্রতি বৎসরেই একবার করিয়া গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া মাটী খুসিয়া দেওয়া উচিত। গাছের তলায় সার প্রতিবৎসর না দিলেও ক্ষতি নাই। মোট কথা আম্র, লিচু, পেয়ারা, লেবু প্রভৃতি ফলকর বৃক্ষকে যে প্রণালীতে পালন করিতে হয়, আমার বিবেচনায় ইহার পক্ষেও তাহা ছাড়া বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই।

বৃক্ষ রোপণের পর সচরাচর দুই তিন বৎসরের মধ্যে ফল হইতে আরম্ভ হয় এবং বৎসরে একবার করিয়া ফল-দান করিয়া থাকে। গাছ যতই বাড়িতে থাকে ফল ততই অধিক পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। এদেশে কতদিন পর্য্যন্ত গাছ জীবিত থাকে এবং কতদিনই বা ফলোৎপাদনে সমর্থ থাকে তাহা জানিবার সুযোগ এখনও পাই নাই। তবে বিশ বাইশ বৎসরের মধ্যে যে উহার উৎপাদিকা-শক্তি বা জীবনী-শক্তির লোপ হয় না, এরূপ মনে করিবার উপ-যুক্ত প্রমাণ পাইয়াছি। সন্ধান দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত কফি-গাছ কয়টির রোপণকারীর নিকট হইতে অবগত হইয়াছি যে, গাছগুলি দশ বার বৎসরের অধিক রোপিত হইয়াছে। এখনও উহাদের বর্দ্ধনশীলতা যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে যে আরও দশ বার বৎসর এই প্রকার সতেজ থাকিয়া ফলপ্রদান করিবে, ইহা মনে করিতে কোন প্রকার দ্বিধা হয় না। এডেন, জাভা, মোচা, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে কফিবৃক্ষ হইতে একাদিক্রমে বিশ বৎসর ফল পাওয়া যায়।

কফিগাছ ঊর্দ্ধে চৌদ্দ পনের হাত পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর বার হস্তের অধিক হয় না। কফি বাগানে এত উচ্চ গাছও দেখিতে পাওয়া যায় না। তথায় চারি পাঁচ হস্ত প্রমাণ রাখিয়া উপরের শাখা বা শাখার ঊর্দ্ধাংশ ছেদন করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা দুইটি উপকার হইয়া থাকে। প্রথম, শাখাছেদনজনিত অনেক নবীন শাখা জন্মে, সুতরাং গাছ বেশ ঝাড়াল হইয়া অধিক পরিমাণে ফল প্রদান করে। দ্বিতীয়, বৃক্ষ অনোচ্চ হইলে কফি পাড়ার পক্ষে সুবিধা হয়, নচেৎ উহা পাড়িতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এমন কি চাষ করিতে হইলে বৃক্ষের উচ্চশাখা হইতে কফি সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক বা আঁকুষি সাহায্যে কফি পাড়া যায় না, কারণ উহার শাখা প্রশাখা বড়ই ভঙ্গপ্রবণ। কোন কোন পুস্তকে লেখা আছে, গাছ নাড়া দিয়া কফি সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি গাছ নাড়া দিলে ফল অতি অল্পই পড়িয়া থাকে। তদপেক্ষা অতি পরিপক্ক ফলগুলি শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে আপনা হইতে শাখাবিচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইতে দেখা যায়।

গাছের শাখাছেদন ভিন্ন উহার কৃষিতে আর একটি বিশেষত্ব আছে, যাহা অন্যক্ষেত্রে আবশ্যক হয় না। সমগ্র কফি বাগানের জমি সর্ব্বদা বিশেষতঃ ফল পরিপক্ক হইলে পরিষ্কার এবং সম্ভবমত সমতল করিয়া রাখা উচিত। এই কারণ পূর্ব্ব হইতেই জমির উপরিভাগের তৃণাদির মূল নাশ করিতে চেষ্টা করিলে আর প্রতিবৎসর অধিক শ্রম করিতে হয় না। গাছ একবার তৈয়ারি হইয়া গেলে, যদিও আর অধিক দেখিতে হয় না, তথাপি কফি পাকি-বার সময় বিশেষরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। এই সময় গাছের তলা মৃণ্ময় গৃহের মেজে বা দেওয়াল-নিকানের ন্যায় গোময় দ্বারা পাঁচ সাত দিন অন্তর বেশ করিয়া পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন ভূপতিত কফি বা বীজ সংগ্রহ করা অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ। সংসা-রের ব্যবহারের জন্য অতি অল্পসংখ্যক গাছ হইলে, তলায় কাপড় পাতিয়া দেওয়া চলিতে পারে। আরবদেশে গাছের তলায় কাপড় পাতিয়া সজোরে গাছ নাড়া দিয়া কফি সংগ্রহ করে।

বর্ষার পূর্ব্বেই কফিগাছে ফুল ধরে। ফুলের বর্ণ শ্বেত, মধ্যে কিঞ্চিৎ লালের আভা আছে। সপুষ্প কফি-বৃক্ষ দেখিতে অতি মনোরম এবং ফুলের সৌরভও সুমিষ্ট। শ্রাবণ ভাদ্রমাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং ঐ-সকল ফল কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ হইতে পাকিতে আরম্ভ হইয়া চৈত্রমাস পর্য্যন্ত থাকে। তখন অসংখ্য রক্তবর্ণ ফলপূর্ণ নতমুখী ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট কফিগাছগুলি আর একপ্রকার সুন্দররূপ ধারণ করে। দেখিলে মনে হয়, পুষ্পিতাবস্থার মদোন্মত্ত সুন্দরী যুবতীর উন্নতভাব একণে মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে। পক্কাবস্থায় কফিফলের গন্ধ ভাল নয়, আস্বাদন মিষ্ট। ফলের ভিতরে শাঁস নাই, পুরু খোলার ভিতর দুইটি বড় বড় বীজ

একটির গায়ে একটি লাগিয়া থাকে। ঐ বীজমধ্যস্থ শস্যই বাজারে বিক্রেয় কফি। কফিগাছে ফল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে। এতদপেক্ষা অধিক ফলন অন্য কোন বৃক্ষে দেখি নাই। প্রত্যেক শাখার প্রায় প্রতি গাঁইটে অর্থাৎ পত্রমূলে দশ বারটি হইতে পনর ষোলটি পর্য্যন্ত ফল ধরিতে দেখা যায়।

কফি বাগানের জন্য যদিও সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে লোক রাখিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ফল পাকিবার সময়, অন্ততঃ পাকিতে আরম্ভ হইলে অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিতে হয়। এই সময় ফলগুলি রক্ষা করা ও সংগ্রহ করাই প্রধান কার্য্য। বাদুড় ও অন্যান্য নিশাচর পক্ষীতে রাত্রিকালে অনেক ফল নষ্ট করে, এই কারণ গাছে জাল দিতে হয়, অথবা ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে বংশখণ্ড বাঁধিয়া তাহার ঊর্দ্ধভাগ চিরিয়া যে প্রণালীতে এদেশের উদ্যানরক্ষকগণ লিচুগাছ পক্ষী, কাটবিড়ালী হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ সময় সময় দড়ি টানিয়া শব্দ করিয়া পাখী তাড়াইতে হয়। শুনিয়াছি আলোক দেখিলেও ঐ সকল জন্তু পলায়ন করে। বোধ হয়, মাঝে মাঝে লণ্ঠনের ভিতর আলো দিতে পারিলেও অনিষ্টকারী জন্তুরা নিকটে আসে না। জাল দেওয়া অপেক্ষা শেষোক্ত যে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা ভাল, কারণ সকল গাছে জাল দিতে ব্যয়ও অনেক এবং উহাতে কফি পাড়িবার বিশেষ অসুবিধা হয়। দুই পাঁচ দিনে সমস্ত ফল পাকে না, সুতরাং প্রতিদিন জাল উন্মোচন পূর্ব্বক কফি পাড়া এবং পুনরায় চাপা দেওয়া বিশেষ অসুবিধাজনক, এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়।

পক্ষী, কাটবিড়াল প্রভৃতিতে কফি নষ্ট করে সত্য, আবার উহাদের দ্বারা উপকারও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিস্তৃত কফিক্ষেত্রে কুঁড়ে বাঁধিয়া প্রায় তিনমাস কাল সমস্ত রাত্রি জাগরণ বা গাছে গাছে প্রতিদিন লণ্ঠন বাঁধিয়া দেওয়া নিতান্ত সহজসাধ্য নহে এবং তাহাতে ব্যয়ও আছে। তদপেক্ষা সমগ্র উদ্যানটি যদ্যপি বেশ পরিষ্কার রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে পক্ষী প্রভৃতিতে ফল ভক্ষণ করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, অন্ততঃ রক্ষা করিবার, জড় করিবার ও বীজ বাহির করিবার ব্যয়ের তুলনায় সে ক্ষতি অল্প। পক্ষী সকল ফলের খোসা ভক্ষণ করিলেও বীজ আদৌ খায় না। পরিত্যক্ত বীজগুলি তথায় ফেলিয়া দেয় বা মুখে করিয়া বাগানের অন্য স্থানে লইয়া যায়। রজনীর ভোজনাবশিষ্ট বীজগুলি প্রাতে লালাযুক্ত থাকে, বৈকালে বেশ শুষ্ক হইলে তখন সম্মার্জ্জনী সহকারে সংগ্রহ করিতে হয়। পক্ষিগণ খোসাও সকল সময় ভক্ষণ করে না, কাটিয়া তলায় ফেলিয়া দেয় ... খিতে পাওয়া যায়। যদি উহারা ফলগুলি মুখে করিয়া অন্যত্র না লইয়া, বৃক্ষমূলে বসিয়া ভক্ষণ করিত, তাহা হইলে উহাদের আগমন সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় হইত।

কফি পাকিয়া যখন লাল হইতে ক্রমশঃ পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে, তখন উহা গাছ হইতে তুলিবার উপযুক্ত সময়। তুলিবার কালে শুধু ফলগুলি ধরিয়া টানিলে অনেক সময় ক্ষুদ্র শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, তজ্জন্য সাবধানপূর্ব্বক পাড়া উচিত। প্রথমে প্রতিদিন কফি তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। তৎপরে সংগৃহীত কফি সকল গৃহের ছাদে বা চেটাইয়ের উপর ছড়াইয়া আট দশ দিবস রৌদ্রে শুখাইতে হয়। উহা বেশ শুষ্ক হইলে পর বীজ বাহির করিবার উপযুক্ত হয়।

শুষ্ক ফলের ভিতর হইতে সহজে এবং স্বল্পব্যয়ে বীজ বহির্গত করিবার উপযোগী কোন যন্ত্র আছে কি না, জানি না। আমি দেখিয়াছি, আমাদের চিরপরিচিত ঢেঁকির দ্বারা কফি হইতে বীজ বাহির করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। ইহাতে ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্পই হইয়া থাকে, কারণ সামান্য গ্রাম্য স্ত্রীলোকদিগকে অল্প পারিশ্রমিক দিয়া উক্ত কার্য্য অনায়াসেই করান যাইতে পারে। তৎপরে চূর্ণ খোসা হইতে বীজ পৃথক করা আর একটি কার্য্য। ইহাতেও আমাদের কুলার সহায়তায় দেশীয় প্রথা অবলম্বন করা যাইতে পারে। এই কার্য্যও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সহজে সমাধা হইতে পারে। কুলায় করিয়া একবার ঝাড়িলেই সমুদয় খোসা পৃথক হয় না, এই কারণ প্রথমবার ঝাড়ান হইলে পুনরায় একবার রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া লইলে অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হয়। অবশিষ্ট খোসাগুলি হস্তের দ্বারা বাছিয়া ফেলিতে হয় বা সমুদায় কফিগুলি একবার জলে ধুইয়া লইলে খোসা উপরে ভাসিয়া উঠে, তখন সহজে বীজ সকল পৃথক করা যায়, অথচ বীজগুলি কথঞ্চিৎ

পরিষ্কার হইয়া থাকে। কাঁচা ফল রৌদ্রে শুখাইবার পূর্ব্বে একবার সামান্য রকম থেঁৎলাইয়া দিলে শুখাইতে সময় কিছু অল্প লাগে এবং বীজ পৃথক করিবার পক্ষেও কিছু সুবিধা হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত পক্ষীপরিত্যক্ত বীজ হইতে শস্য বাহির করিতেও উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায়। এই সকল আঁইসের ন্যায় পাতলা আবরণযুক্ত বীজ হইতে শস্য বাহির করা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য। ইহাতে ঢেঁকির পরিবর্ত্তে বৃহদাকার কাঠের হামানদিস্তা ব্যবহার করিলে সুবিধা হয়। এই বীজ-অভ্যন্তস্থ শস্যগুলি উক্ত আবরণমুক্ত হইলেও উহা আর এক প্রকার পাতলা ও অতি লঘু উজ্জ্বলবর্ণের পদার্থের দ্বারা আবৃত থাকে। একখানি নূতন মাদুরি বা কোন অমসৃণ স্থানে ঘর্ষণ করিয়া একবারমাত্র কুলায় ঝাড়িয়া লইলে কিছুকাল বাতাসে ছড়াইয়া দিলেই ইহা পরিষ্কার হইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিশাচরপক্ষিগণের দ্বারা আমরা উপকারও পাইয়া থাকি। সেই উপকারগুলি ইহা—১ম গাছ হইতে কফি পাড়ার অপেক্ষা ঝাঁটা দিয়া সংগ্রহ করিতে সময় ও পরিশ্রম অনেক অল্প লাগে। ২য়—আস্ত ফল শুখাইতে যে সময় লাগে, বীজ শুখাইতে তদপেক্ষা অনেক কম সময় লাগে। সুতরাং প্রতিদিন রৌদ্রে দেওয়া এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে তোলার পরিশ্রম লাঘব হয়। ৩য়—আস্ত ফলাপেক্ষা ভূপতিত বীজ হইতে শস্য পৃথক করার পারিশ্রমিক কম। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, কফিভক্ষক—জন্তুদিগকে যদ্যপি বাগানে আসিতে না দিবার কোন প্রকার ব্যবস্থা আদৌ না করা হয়, অথচ প্রতিদিন সুপক্ক ফল পাড়িবার ব্যবস্থা থাকে, তাহাতে ক্ষতি আছে। বৃক্ষে সুপক্ক ফলের অভাব হইলেও পক্ষিগণ ফলাহারে বিরত থাকে না, অগত্যা তাহারা অর্দ্ধপক্ক ফলগুলি ভক্ষণ করে। সুতরাং ঐ সকল ফল হইতে যে কফি হয় তাহাও উৎকৃষ্ট হয় না।

কফির আবাদ এ প্রদেশে লাভজনক কৃষি হইতে পারে কি না, পাঠকগণকে এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর প্রদান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কফি সম্বন্ধে লেখকের যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা সামান্য হইলেও আবশ্যকীয় হইতে পারে বিবেচনায় এ স্থলে লিখিত হইল। প্রয়োজন হইলে উহার চাষের বিস্তারিত বিবরণ সহজে সংগ্রহ হইতে পারিবে। শুনিয়াছি "Watt's Dictionary of Economical Products—নামক গ্রন্থে কফিগাছের কথা লেখা আছে।

ইচ্ছা ছিল, কফিবাগানের বিঘা প্রতি দশ বৎসরের আয় ব্যয়ের একটা আনুমানিক স্থূল হিসাব প্রদান করিয়া অদ্য প্রবন্ধ শেষ করিব, কিন্তু সকল বিষয় সঠিক জানা না থাকায়, তাহা পারিলাম না। দশ বৎসরের হিসাব দিবার কারণ, কফি বাগানে প্রথম দুই তিন বৎসর কোন আয় হয় না, কেবল ব্যয় হইয়া থাকে ; অথচ এই সময়ের ব্যয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে প্রতি বৎসর ব্যয় ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং আয় বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। পাঁচ বৎসরের পর হইতে আয়ের তুলনায় ব্যয় সামান্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কয়েকটি কফিগাছের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকটিতে গড়ে নয় সহস্র কফি হইয়া থাকে। উহার ওজন দশসের হইলেও ব্যবহারোপযোগী কফি বীজ পাঁচপোয়া অর্থাৎ আড়াই পাউণ্ডের অধিক পাওয়া যায় না। কলিকাতার বাজারে নয় দশ আনা করিয়া পাউণ্ড বিক্রয় হয়। আমরা আড়াই পাউণ্ডের মোট মূল্য ন্যূন সংখ্যা এক টাকা ধরিলাম। এক বিঘা জমিতে একশত অশীতিসংখ্যক গাছ হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে বিঘা প্রতি একশত আশী টাকার কফি উৎপন্ন হয়। জমির খাজানা, সারের মূল্য, লোকের মজুরি কফি পাড়াই, উহা রৌদ্রে দেওয়া, বীজ পৃথক করা প্রভৃতির খরচ আশী টাকা ধরিলেও বাৎসরিক একশত টাকা আয় হইয়া থাকে। এস্থলে বলা উচিৎ বিনা আবাদে যে পরিমাণে কফি জন্মিয়া থাকে, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। রীতিমত আবাদ করিলে ফল অধিক জন্মার সম্ভব। বোধ হয় ইহা বলাই বাহুল্য যে, কেহ না মনে করেন, যে বৎসর হইতে বৃক্ষ প্রথম ফলিতে আরম্ভ করে সেই বৎসর হইতেই এই পরিমাণে আয় হইয়া থাকে। আমি একটি প্রমাণ বৃক্ষের ফলোৎপত্তি দেখিয়া আয়ের আনুমানিক হিসাব দেখাইয়াছি। গাছ ছোট থাকিলে যেমন ফল কম হয়, তেমনি বড় হইলে একটি গাছ হইতে চারি পাউণ্ড কফিও পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

পাহাড়ী বাবা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার উপনগর ভবানীপুর। ভবানীপুরের অংশ-বিশেষের নাম বকুলবাগান। এই বকুলবাগানে দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন একজন সঙ্গতিপন্ন বড় লোক। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা বড়ই দুঃস্থ ছিল। ঐ সময়ে পিতৃমাতৃহীন হইয়া এই বকুলবাগানে মাতুলালয়ে তিনি প্রতিপালিত হন। তাঁহার মাতুলের নাম ৺সারদাচরণ ঘোষাল। মাতুল মহাশয়ের বিশেষ যত্ন সত্ত্বেও বাল্যকালে দুর্গাদাস ভালরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। যৌবনে পাড়ার এক সখের থিয়েটারের দলে মিশিয়া তাঁহার চরিত্রদোষও ঘটে। তবে মাতুলের অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া তাঁহার ভরণপোষণের কোন কষ্ট ছিল না। মাতুল মহাশয় দুর্গাদাসের বিবাহও দেন। সুতরাং দুর্গাদাসের স্ত্রীর প্রতিপালন ভারও মাতুল মহাশয়ের স্কন্ধে পড়ে। উপার্জ্জনের কোন চেষ্টাই দুর্গাদাসের ছিল না। এই কারণ এক দিবস মাতুলানী তাঁহাকে বড়ই ভৎসনা করেন। সেই দিন রাত্রে দুর্গাদাস দেখিলেন—তাঁহার স্ত্রীও সেই ভৎসনার প্রতিধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তখন তাঁহার মনে ভয়ঙ্কর ধিক্কার জন্মে। পর দিন প্রভাতে তিনি মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে তিনি লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন লাহোরের কমিসরিয়েট আফিসে তাঁহার মাতুলেরই প্রতিবাসী শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেশীয় লোকের মধ্যে এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। দুর্গাদাস বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাবও ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাদরে দুর্গাদাসকে আশ্রয় দিলেন। ক্রমে সে সদ্ভাব বিশেষ আত্মীয়তায় পরিণত হইল। শিবনাথ বাবু দুর্গাদাসকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। শিবনাথের স্ত্রী বিমলাও তাঁহাকে দেবরের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিল। কয়েক মাস পরে শিবনাথের চেষ্টায় কমিসরিয়েট আফিসে দুর্গাদাস বাবুর এক গোমস্তাগিরি চাকুরীও জুটিল। এই চাকুরীহইতেই দুর্গাদাসের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়।

কসারিয়েটের গোমস্তাগিরি চাকুরী উপলক্ষে দুর্গাদাক সীমান্তের অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছি। শিবনাথ বাবুও লাহোর হইতে অম্বালায় এবং অলা হইতে সিমলা পাহাড়ে বদলি হইয়া যান; সুতরাংথন আর উভয়ের একত্রে থাকা হইল না। ১৮৭৮—৯ খৃষ্টাব্দের শেষ আফগান যুদ্ধে দুর্গাদাস বাবুকে অভিযানে সঙ্গে যাইতে হয়। এক্ষেত্রে দুর্গাদাসের উপার্জ্জনাশাতীত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মাতুলের নিকট কাহাকেও কোন টাকা বা পত্রাদিও পাঠাইতেন না—এমন কি তাঁহার স্ত্রীরও কোন সংবাদ লইতেন না। তবে তিনি সে উপার্জ্জনের একটি পয়সাও এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অপব্যয় করিতেন না—সমস্তই সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল—লক্ষ টাকা সঞ্চিত না হইলে আর তিনি দেশে ফিরিবেন না। এদিকে লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইল। তখন আর দেশের প্রতি তাঁহার সেরূপ মায়া রহিল। তার পর যখন তাঁহার মাতুল ও মাতুলানীর মৃত্যুসংবাদও পাইলেন, তখন দেশের অবশিষ্ট মায়াপাশ তিনি এককালীন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে শিবনাথ বাবুর সহিত তাঁহার মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎও হইত। সে সময় পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে শিবনাথ দুর্গাদাসকে বড়ই অনুরোধ করিতেন। এমন কি বিমলা এক সময়ে সিমলায় দুর্গাদাসের বিবাহের এক সম্বন্ধও স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গাদাস পুনরায় দারপরিগ্রহও করিলেন না, এবং দেশেও ফিরিয়া গেলেন না। শেষে শিবনাথ বাবুও যখন পেন্সন লইলেন এবং নানা কারণবশতঃ দেশের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করিয়া সিমলা পাহাড়ের সন্নিকট সংসারু পাহাড়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন, তখন আর কেহ দুর্গাদাসকে দেশে গিয়া সংসারী হইতে অনুরোধ করিতেন না। সুতরাং দুর্গাদাসও তখন একটা অনুরোধেরস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেল। দুর্গাদাসের বয়ঃক্রমও ক্রমে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল।

এই সময় চিত্রল অভিযান হয়। এই অভিযানের সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে নানারূপ কষ্ট পাইতে হয়। এই উপলক্ষে কোন পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীর সহিতও তাঁহার মনোবিবাদ ঘটে, তখন তিনি পেন্সনের প্রার্থী হন। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে, অগত্যা তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কিন্তু দেশে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার মাতুলের বৃহৎ পরিবারবর্গের মধ্যে একমাত্র পৌত্র ভিন্ন আর কেহ জীবিত নাই। তাঁহাদের অবস্থাও অতিশয় শোচনীয়। মাতুলপুত্র এক ব্যবসা করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। শেষে সেই মনোকষ্টেই তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তখন সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভদ্রাসন বাড়ীখানি ২।৪ দিনের মধ্যেই নীলামে উঠিবে। দুর্গাদাস বাবু অনেক অর্থ লইয়া দেশে গিয়াছিলেন। সেই অর্থে তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল—মাতুলের ভদ্রাসন বাড়ী নীলামে খরিদ করা। সে বাড়ীর অবস্থাও ভাল ছিল না—সুতরাং খরিদের পরেই তাঁহাকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সে বাড়ীর মনের মতন পরিবর্ত্তন ও সংস্কার আরম্ভ করিতে হয়। তখন তাঁহার অনেক আত্মীয় স্বজন আসিয়া যুটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় ও সেই মাতুল পৌত্রটিকে তিনি আপনার পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন।

দুর্গাদাসের ভাগিনেয়ের নাম অতুলচন্দ্র এবং মাতুল-পৌত্রের নাম অনুকূল চন্দ্র। এই দুইটি পিতৃমাতৃহীন বালক লইয়া দুর্গাদাস এই প্রবীণ বয়সে এক নূতন সংসার পাতিলেন। নিরাশ্রয় বালক দুইটিরও আশ্রয় হইল। তিনি অতি যত্নে তাহাদিগকে লালন পালন ও তাহাদের শিক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অতুল ও অনুকূল উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক ছিল। তাহারাও বিশেষ যত্নের সহিত একত্রে এক শ্রেণীতেই পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়া দিল। উভয়ের একত্রে আহার, একত্রে শয়ন এবং একত্রে পাঠাভ্যাসের কারণ উভয়ের মধ্যেও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। বিশেষ প্রশংসার সহিত এক সঙ্গে উভয়েই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। উভয়ের প্রথম পরীক্ষায় এইরূপ সন্তোষজনক ফল দেখিয়া দুর্গাদাসের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি উভয়কে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় অনুকূল প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে অতুলের পীড়া হওয়ায় তাহার সে পরীক্ষার ফল সেরূপ সন্তোষ-জনক হইল না। দুর্গাদাস তখন অতুলচন্দ্রকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করিলেন, আর অনুকূলচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই বি, এ পড়িতে লাগিল। দুই বৎসর পরে অনুকূল বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং তাহার পর বৎসর বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিল। অতুলচন্দ্রও মেডিকেল কলেজের দুইটি পরীক্ষায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তবে এখনও পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, সুতরাং তাহার শেষ পরীক্ষার এখনও বিলম্ব ছিল।

অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে দুর্গাদাসের মাতুলবংশের আর এক ব্যক্তির সহিত আমাদের এই আখ্যায়িকার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং তাঁহার পরিচয় এই স্থলেই দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে। তিনি তাঁহার মাতুলের খুল্লতাত ভ্রাতা সুতরাং সম্বন্ধে দুর্গাদাসের মাতুল বলিয়াই গণ্য। তাঁহার নাম ভৈরবচন্দ্র ঘোষাল। এই বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ের দুর্গাদাস বিশেষ সম্মান ও ভক্তি করিতেন। তবে এক বিষয়ে দুর্গাদাসের সহিত এই ঘোষাল মহাশয়ের বড়ই মতের অনৈক্য ছিল। ঘোষাল মহাশয় অতুল ও অনুকূল-চন্দ্রের বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় ভাগিনেয় বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের কথা শুনিলেই দুর্গাদাস শিহরিয়া উঠিতেন। অনুকূলচন্দ্র ওকালতি আরম্ভ করিলেন। একদিন ঘোষাল মহাশয় দুর্গাদাসের নিকট তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তখনও কিন্তু দুর্গাদাস সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা অনুকূলচন্দ্রের ওকালতির আয় কিছু কিছু আরম্ভ হইলেই তাহার বিবাহ দেন। সে সম্বন্ধে কেহ তাঁহাকে কোনরূপ জেদ করিলে তিনি নিজের গৃহত্যাগের কারণ দেখাইয়া সকলকে বুঝাইতেন। এখন এই দুইটি আত্মীয়ের বিবাহ দিয়া অনায়াসেই তিনি সংসারী হইতে পারিতেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি সেরূপ স্বার্থপর নহে, সেই কারণ তিনি নিজের সুখ অপেক্ষা এই পুত্রতুল্য যুবকদ্বয়ের ভবিষ্যৎ সুখের প্রতিই অধিকতর লক্ষ্য রাখিতেন।

একদিন রাত্রে আহারাদির পর দুর্গাদাস শয়ন করিতে যাইবেন—এমন সময় তাঁহার নামে একখানি তারের সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি সে সংবাদের আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। নিকটেই অতুলচন্দ্র উপবিষ্ট ছিল। পাঠ শেষ হইলে, তাহাকে কহিলেন—“দেখ অতুল, শিবনাথের স্ত্রী ও তার কন্যা কাল সকালে পঞ্জাব মেলে এসে পৌঁছিবে। অনুকূল এখানে নাই—তোমায় কি কাল সকালেই কলেজে যেতে হবে?”

অতুলচন্দ্র বিনীতভাবে কহিল—“না মামা বাবু, কাল থেকে আমায় আর সকালে কলেজে যেতে হবে না। তিনটার সময় গেলেই চল্‌বে। আমাদের ‘হস্পিটাল ডিউটী’ শেষ হয়েছে।”

দুর্গাদাস বাবু কহিলেন—“তবে শোবার পূর্ব্বে কোচম্যান্‌কে বলো—সে যেন খুব ভোরে উঠে গাড়ী জোড়ে, আর সেই গাড়ীতে তোমায় নিয়ে হাবড়া ষ্টেশনে যায়। বোধ হয়, পঞ্জাব মেলটা ছয়টার সময় পৌঁছায়, তার পূর্ব্বে তোমার সেখানে পৌঁছান আবশ্যক। তুমি তাদের আপাতক আমাদের বাড়ীতেই নিয়ে আস্‌বে।”

“যে আজ্ঞে”—বলিয়া তখন অতুলচন্দ্র মাতুল মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস। ভোর হইয়াছে, কিন্তু তখনও সূর্য্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা কাল বিলম্ব আছে। প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে। দূরে কোকিলের সুমধুর কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। নিদ্রাভঙ্গের পর কাককুলও নীরব নহে। কোকিলের সেই মধুর কণ্ঠস্বরের সহিত কি জানি কেন—তাহারাও প্রাণপণে তাহাদের সেই কর্কশ কণ্ঠরব মিশাইতেছে। আবার অন্য এক পক্ষীবরের তীব্র কণ্ঠস্বর যেন থাকিয়া থাকিয়া একবারে সপ্তমে উঠিতেছিল। সে স্বর সকলেরই পরিচিত, সুতরাং সে পক্ষীর নাম আমরা এস্থলে গোপনই রাখিলাম। এইমাত্র গ্যাসের আলো নিবাইয়া গেল, সুতরাং এখনও অল্প অল্প অন্ধকার রহিয়াছে। রাস্তায় দুই একজন মাত্র লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। [illegible]য় একখানি পাল্কী গাড়ী তীরবেগে চৌরঙ্গী রোড [illegible]য়া উত্তর মুখে ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে [illegible] এবেগে সে গাড়ী ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল। মোড়ে পৌঁছিয়াই গাড়ীখানি মুহূর্ত্তের মধ্যে পশ্চিম মুখ করিল। মোড়ে [illegible]ণ্ডায়মান এক জন পুলিস প্রহরী একবার কট্‌মট্‌ [illegible] গাড়ীর দিকে চাহিল। বোধ হয়, সেরূপ বেগে গাড়ী [illegible]লান যে আইনবিরুদ্ধ—তাহার সেই কট্‌মটে চাহনি স্পষ্টাক্ষরে যেন সেই কথাই বলিতেছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে গাড়ী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, সুতরাং পুলিস প্রহরীর সে চাহনির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া [illegible]।

এইরূপে ভীষণ বেগে সেই [illegible]াড়ী গঙ্গার পুল পার হইয়া একবারে হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। সে গাড়ীর মধ্যে একমাত্র অতুলচন্দ্র বসিয়া ছিলেন। গাড়ী থামিতে না থামিতেই তিনি সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। তার পর পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন। গাড়ীকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়াই তিনি দ্রুতগতিতে ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ষ্টেশনের ঘড়িতে দেখিলেন যে তখনও পাঁচটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে। অনুসন্ধানে জানিলেন যে ঠিক ছয়টার সময় পঞ্জাব মেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিবে। সুতরাং তাঁহার এত তাড়াতাড়ির কোন আবশ্যকই ছিল না। এইবার কিন্তু যেন তাঁহার অস্থির মন অনেকটা সুস্থির হইল। তখন তিনি ষ্টেশনের পুস্তকের দোকান হইতে একখানি সেই দিনের ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র ক্রয় করিলেন, এবং একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই একটা টং করিয়া শব্দ হইল। সেই শব্দে সংবাদপত্র পাঠ হইতে তাঁহার চক্ষু অন্য দিকে আকর্ষিত হইল। তিনি চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—বুঝিলেন—গাড়ী আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তখন তিনি সংবাদপত্র পাঠ পরিত্যাগ করিয়া গাড়ীর প্রতীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় তাঁহার মনে এক বিষম চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি যাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা [illegible]ছেন, তাঁহাদের সহিত তিনি আদৌ পরিচিত নহেন, [illegible] কি জীবনেও কখন তাঁহাদের দেখেন নাই। সুতরাং [illegible]রূপে তাঁহাদের চিনিয়া লইবেন—এই ভাবনাই তখন [illegible]হার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। তবে কে কে আসিতেছেন, সে কথা তিনি জানিতেন—[illegible]কমাত্র ভরসা ছিল। একজন বিধবা স্ত্রীলোক, সেই [illegible]ধবার সহিত তাঁহারই এক অবিবাহিতা কন্যা। অতুলচন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এমন কত বিধবা অবিবাহিতা কন্যা লইয়া এই গাড়ীতে আসিতে পারে। আজ তাঁহারা ৺কাশীধাম হইতে আসিতেছেন—এ কথাও অতুলচন্দ্র জ[illegible]তেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদিগকে চিনিয়া বাহির [illegible] তাঁহার পক্ষে সহজ বোধ হইল না। এই সময় [illegible]ঠাৎ অতুলচন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল যে তাঁহাদের সঙ্গে এক জন পাহাড়ী স্ত্রীলোক মাত্র আছে, অন্য অভিভাবক আর কেহ নাই। তখন তাঁহার মন আশ্বস্ত হইল। অল্পক্ষণ পরেই পঞ্জাব মেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। সেই পাহাড়ীয়া স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকায় অতুলচন্দ্র অনায়াসেই বিধবা ও তাঁহার কন্যাকে চিনিয়া লইতে পারিলেন। তখন তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া অতুলচন্দ্র সেই বিধবাকে প্রণাম করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। সে পরিচয়ে বিধবা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলা বাহুল্য—বিধবা অন্য কেহ নহেন—আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বিমলা।

বিমলার সহিত যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, প্রথমেই অতুলচন্দ্র কুলীর দ্বারা সে সমস্ত নামাইলেন। তাহার পর, যে গাড়ী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়ীতে সমস্ত উঠাইয়া দিলেন। বিমলা, তাঁহার কন্যা মহামায়া এবং পরিচারিকা লোহিয়াও সেই গাড়ীতে উঠিল। তখন অতুলচন্দ্র সেই গাড়ীর কোচবাক্সে উঠিবার জন্য যাইতেছিলেন, এমন সময় বিমলা তাঁহাকে সেই গাড়ীর মধ্যেই বসিতে অনুরোধ করিলেন। অগত্যা অতুলচন্দ্র সেই গাড়ীর মধ্যেই আসিয়া বসিলেন। তখন গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আবার অতি দ্রুতবেগে সেই গাড়ী দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

গঙ্গার পুলের উপর দিয়া যখন সেই গাড়ী চলিয়াছে, তখন হঠাৎ অতুলচন্দ্র দেখিলেন—কি অপূর্ব্ব রূপ! গাড়ীর মধ্যে তাঁহারই ঠিক্ সম্মুখে বসিয়া যে বালিকা বিস্মিতনেত্রে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছে—সেই বালিকার কি অপূর্ব্ব রূপ! আ মরি মরি! এমন রূপ ত কখনও অতুলচন্দ্রের নয়নগোচর হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা গত হইল—বালিকা গাড়ী হইতে নামিয়াছে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে অতুলচন্দ্রও এই বালিকার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে রূপ কেন তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করে নাই—তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। হঠাৎ তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় কোন অসাধারণ শক্তি পাইল না কি? অতুলচন্দ্র একবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন।

অতুলচন্দ্রও যখন অবাক্ হইয়া বালিকার সেই যৌবনোন্মুখ স্বর্গীয় মুখশ্রী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় বালিকার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সচঞ্চল দৃষ্টি ঘুরিয়া ঘুরিয়া হঠাৎ একবার অতুলচন্দ্রের চক্ষুর উপর আসিয়া পড়িল। উভয়ের চক্ষে চক্ষে মিলিল। বালিকার সেই চঞ্চল দৃষ্টি একবারে স্থির হইল কেন? এতক্ষণ বালিকা যেরূপ বিস্মিতনেত্রে ও চঞ্চল দৃষ্টিতে গঙ্গাবক্ষস্থিত অসংখ্য জাহাজ, নৌকা, ও কলিকাতা সহরের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিল, হঠাৎ সে দৃষ্টির এ পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন? বালিকার আকর্ণবিস্তৃত বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় বিস্ময়বিস্ফারিত হইলেও তাহাদের চঞ্চলতা অকস্মাৎ কোথায় অদৃশ্য হইল? এদিকে বালিকার দৃষ্টি অতুলচন্দ্রের চক্ষের উপর স্থির হইতে না হইতেই কিন্তু তাহারা অবনত হইয়া পড়িল। কি আপদ! অতুলচন্দ্র অল্পক্ষণ পরে পুনরায় ভয়ে ভয়ে বালিকার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। তখনও সেই পলকহীন বিস্ময়বিস্ফারিত কমললোচন দুইটি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত রহিয়াছে! কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ বালিকা আগ্রহের সহিত চারিদিকে যে সকল অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছিল, কি যাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ তাহাদের সে সৌন্দর্য্যের লোপ হইল? কই বালিকা ত একবারও আর তাহাদের প্রতি ফিরিয়া চাহিতেছে না! অতুলচন্দ্রের বড় সুখেই ব্যাঘাত ঘটিল। বালিকার অজ্ঞাতসারে তাহার সেই অপূর্ব্ব মুখশ্রীদর্শনসুখে অতুলচন্দ্র তখন বঞ্চিত হইলেন।

কিন্তু সে কথা তাঁহার মুখ হইতে আর বাহির হইল না। তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় কেবল মহামায়ার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মহামায়া এই সময় কহিল—"তোমাদের বাড়ী-ঘর আমায় দেখাবে এসো না দাদা।"

দাদার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ কামিনীকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া দাদা আর সে স্থানে থাকিতেই পারিলেন না। অতুলচন্দ্র চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কামিনীকে কি কথা বলিয়া গেলেন। কামিনী আসিয়া মহামায়াকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী-ঘর দেখাইতে আরম্ভ করিল।

বিমলাকে দুর্গাদাসের গৃহে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল বাস করিতে হইল। বিমলার বাড়ী মেরামত শেষ হইয়া গেলে, বিমলাই জেদ করিয়া তখন নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এই দুই সপ্তাহ কালের মধ্যেই অতুলচন্দ্রের মানসিক অবস্থার বড়ই একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। বাল্যকাল হইতে লেখা পড়ায় অতুলচন্দ্রের আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহ দেখা যাইত। কিন্তু মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা সন্নিকট হইলেও এখন আর পাঠে তাঁহার সে যত্ন ও আগ্রহ দেখা গেল না, যে দুই তিন জন বন্ধুবান্ধবের সহিত অতুলচন্দ্রের বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তিনি এখন তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া তাহারাও অতুলচন্দ্রের মনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন কিছুই ধরিতে পারিল না। এখন অতুলচন্দ্রকে কলেজে যাইতে হয় না। তিনি দিবারাত্র বাড়ীতেই থাকিতে পান। তবে সম্মুখে পাঠ্য পুস্তক খোলা পড়িয়া থাকে আর তিনি আকাশ পাতাল ভাবিতে থাকেন। সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরের মধ্যে ছুটিয়া আসিতে হয়। কি জন্য আসেন, বুঝিতে পারেন না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত থতমত খাইয়া যান। কখন বা একটু ছুতা করিয়া কিছু সময় অন্তঃপুরে অতিবাহিত করেন। আবার কি মনে পড়িয়া ছুটিয়া বাহিরে পড়িবার ঘরে আসেন। নিজের মানসিক দুর্ব্বলতার দরুণ অনেক সময় মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া থাকেন।

যে দুই সপ্তাহ বিমলা দুর্গাদাসের গৃহে রহিলেন, সেই দুই সপ্তাহ অতুলচন্দ্রের দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। এক সপ্তাহ পরে অনুকূলচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বরাবর অতুল ও অনুকূল একত্র আহার করিতে বসিতেন। কিন্তু এখন হইতে অতুলচন্দ্র সে প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। পরীক্ষা সন্নিকট, সুতরাং নির্দ্ধারিত সময় এখন আর আহার করিলে চলিবে না—এইরূপ ভান করিতেন। আসল কথা পূর্ব্বের ন্যায় আহারে আর তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। পাছে সে কথা অনুকূলচন্দ্র জানিতে পারেন, সেই জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। এক পরীক্ষার দোহাই দিয়া অতুলচন্দ্র সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন। তার পর বিমলা, মহামায়া ও লোহিয়া চলিয়া গেলে, অতুলচন্দ্রের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মহামায়াকে লইয়া বিমলা নিজ গৃহে দুই দিন বাস করিতে না করিতেই কিন্তু কন্যার বিবাহের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গুরুদেবের আজ্ঞা পালন তাঁহার পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে বাস করিতে হইলে বিবাহাদি সামাজিক নিয়ম পালন করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যে শুভ কার্য্যের উপর কন্যার যাবজ্জীবনের সুখ নির্ভর করিতেছে, মা হইয়া কোন্ প্রাণে কন্যার সে শুভ উদ্বাহ কার্য্য পালন না করিয়া থাকিতে পারেন? এক দিকে অপত্যস্নেহ এবং অন্য দিকে গুরুদেবের আজ্ঞা! অপত্য স্নেহের দিকে কন্যার সুখ, ঐশ্বর্য্য ও নারীধর্ম্ম পালন আর অপর দিকে লোকনিন্দা, সমাজ ভয়, ও কন্যার ধর্ম্মচ্যুতি আশঙ্কা। সুতরাং বিমলা বড়ই বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। অবশেষে এ বিপদে বিমলা দুর্গাদাস বাবুর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এক দিন বৈকালে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে বিমলা নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। নির্জ্জনে উভয়ের অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা পরামর্শও হইল। এই উপলক্ষে পাহাড়ী বাবার সম্বন্ধে অনেক কথাও দুর্গাদাস জানিতে পারিলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি কহিলেন—"মহামায়ার বিবাহ আরো ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। শিবনাথ দাদা কি বুঝে ছিলেন জানি না। কিন্তু এখন যা শুনছি তাতে আর কিছুতেই বিলম্ব করা হবে না। সে সম্বন্ধে তোমার কিছু ভাবতে হবে [illegible] ম শীঘ্র মহামায়ার উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে দেবো [illegible]"

বিমলা তখন [illegible] [illegible]রিয়া কহিলেন—"ঠাকুরপো, তোমায় আর কি ব[illegible] এ কাজটি [illegible] অতি গোপনে সমাধা [illegible] পাহাড়ী [illegible] কোন রকমে না জা[illegible]

"পাহাড়ী বা[illegible] [illegible]রেছে।"—খটাখট খড়মের শব্দের সহিত কথা [illegible]তে বলিতে স্বয়ং পাহাড়ী বাবা কোথা হইতে [illegible]লে দাঁড়াইলেন। ভয়ে বিমলা চীৎকার ক[illegible] আর দুর্গাদাস [illegible]হত ব্যক্তির ন্যায় স্তম্ভিত [illegible]

([illegible])

[illegible]নাথ [illegible]টোপা[illegible]

দ্বি[illegible]য় [illegible]

ব্রহ্মে আমি প্রায় [illegible]ন ব[illegible] করিয়াছিলাম ঐ সময়ের মধ্যে আমি এই [illegible] অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম [illegible]ক্ বর্ণনার স্থ[illegible] এ প্রবন্ধে নাই। বি[illegible] এক দিনে বা দুই দিনে লাভ হয় না [illegible] কিন্তু তাহ[illegible]ম ক্রমে বর্ণন করা অপেক্ষা এক [illegible]ন তিন বৎস[illegible]পী অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা আমি [illegible]কতর উপযোগী [illegible] করি এবং তজ্জন্য সেই পন্থাই অবলম্বন করিলাম।

ব্রহ্মবাসিগণের প্রাচীন ভূগোল বিশ্বাস [illegible]দের মত অদ্ভুত ও রূপকপূর্ণ। ইহাদের বিশ্বাস মে[illegible] বীর ঠিক মধ্যস্থলে সংস্থাপিত। পৃথিবীর [illegible] কটা হংসডিম্বের ন্যায় [illegible] উহার অর্দ্ধভাগ স্থলপূর্ণ। মেরুর চতু[illegible]ক ক্রমান্বয়ে সা[illegible] সাতটি দ্বীপ। উহার [illegible]ধ্যে দক্ষিণ দিকস্থ [illegible] ভারতবাসী ও ব্রহ্মবাসী [illegible] বাস করে। তাহ[illegible] অপর ক[illegible] কটি ক্ষুদ্রতর [illegible]পে ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরা বাস করে। আমাদের ন্যায় ইহারাও সপ্ত নাগলোকের অস্তিত্বে [illegible]ম্পূর্ণ আস্থাবান্।

বর্ম্মা জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদের প্রাচীন পুস্তকে নানা প্রকার বিচিত্র মত দেখিতে পাওয়া যায়। ত[illegible] বলে, এক সময়ে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বর্গে বাস করিত। কোনও অন্যায় কার্য্যের জন্য দেবতারা তাহাদিগকে স্বর্গচ্যুত করিয়া মর্ত্তে প্রেরণ করেন। আধুনিক শিক্ষিত ব্রহ্মবাসীরা বলেন, ঐ কাহিনী রূপক মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোনও স্মরণাতীত যুগে ভারত হইতে আসিয়া এই দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবাসীরা ভারতবর্ষকে নিতান্ত ভক্তির চক্ষে দেখিতেন বলিয়া তাহাকে স্বর্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন [illegible] অধিকাংশ নব্যব্রহ্ম ভারত ও ভারতবাসীকে নিতান্ত [illegible] চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, আ[illegible] ভারতবাসীরা দলে দলে তাহাদের দেশে যাইয়া [illegible] অন্নে ভাগ বসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তৎ[illegible]ন্ধে অপরাপর কথা সময়ান্তরে বিবৃত করিবার [illegible] হইল। ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা [illegible] মতে [illegible] স্থাপন করেন না। তাঁহাদের ম[illegible]নেরা ইহাদের [illegible]র্ব্বপুরুষ। [illegible] সম্বন্ধে আমার [illegible]বিশেষ মতামত [illegible]। তবে [illegible]দের চৈনিক ন[illegible]সন্দেহ, বৌদ্ধ[illegible] ও নিতান্ত [illegible] প্রকৃতি দর্শনে তাহাদিগ[illegible] প্রাচীন ও [illegible]চীনের মধ্যবর্ত্তী [illegible]তি বলিয়া মনে হয়। নবাগতের চক্ষে একটি বিষয় [illegible]শেষ বিচিত্র ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিলক্ষণ [illegible]ভেদ। একদেশ[illegible] পুরুষের মধ্যে ওরূপ স্পষ্ট পার্থক্য [illegible]ইবার প্রকৃত কা[illegible] পর্য্যন্ত কেহই আবিষ্কার ক[illegible] সমর্থ হয়েন নাই।

[illegible]শে পুরুষেরা নিতান্ত খর্ব্বকায়। উচ্চতায় সচরাচর পাঁচফুট তিন ইঞ্চির অধিক হয় না। তাহাদের নাসিকা বিলক্ষণ চ[illegible], বর্ণ [illegible]ম। এই স্থানে আর একটী [illegible]রাখা [illegible]ত। [illegible]র ও দক্ষিণ ব্রহ্মের অধি[illegible] মধ্যে [illegible] পার্থক্য অনুভূত হয়। দক্ষিণ[illegible] প্রায় [illegible]র্ণ, উচ্চতায় পাঁচফুট পাঁচ ইঞ্চি [illegible]সামান্য [illegible] [illegible]কে বলেন, উত্তর [illegible]ন (ব্রহ্মবা[illegible] [illegible]না